সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

গ ল্প সং গ্র হ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের
গল্পসংগ্রহ

সম্পাদক
স্বপন মজুমদার

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

সূচি

মৌলিক গল্প

অনুবাদ গল্প

পরিশিষ্ট

আভাষ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০০-৬০) গল্প লিখেছিলেন, তথ্য হিশেবে সম্পূর্ণ অজানা ছিল না আমাদের। কিন্তু জানা ছিল না তার পরিমাণ বা গুণমান। তাঁর দশটি খশড়া-খাতার[১] প্রথমটিতেই (১৯২৩-২৪) তিনটি গল্পের[২] মুসাবিদা ছিল। স্বাক্ষরহীন দুটি অনুবাদ-গল্প[৩] ও স্বনামে 'উপন্যাসের উপক্রমণিকা'[৪] নামে একটি অসমাপ্ত আখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবনকালে। সম্প্রতি তাঁর রক্ষিত কাগজপত্রের[৫] মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ চোদ্দটি মৌলিক ও তেরোটি অনুবাদ-গল্পের খশড়া থেকে তোলা, প্রয়াসী থেকে পরিণত — কোন-কোনটির একাধিক — পাঠ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্র মিলিয়ে মনে হয়, মৌলিক গল্পগুলি রচনার সময় এক দশকের — ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ — মধ্যে। অর্থাৎ *তন্বী*-র সমকালেই এই গল্প লেখার শুরু, শেষ *অর্কেস্ট্রা*-পর্বে এসে। স্নাতকোত্তর শিক্ষাকাল থেকে অ্যাটর্নিশিপের শিক্ষানবিশি চলছে তখন। বিবাহ (২২ জুলাই ১৯২৪) -পূর্ব ও -পরবর্তী জীবনে ব্যাপ্ত এই গল্প লেখার পরিসর। মধ্যে বিরতি ঘটেছে জাপান, আমেরিকা ও ইয়োরোপ সফরের ফলে। বিদেশ থেকে ফেরার পরেও অন্তত একটি উপন্যাস-অভিলাষী বড়ো গল্প লেখার নিশ্চিত সন-তারিখ পাই আমরা, *পরিচয়* পত্রিকাও প্রকাশিত (১৩৩৮ শ্রাবণ) হয়ে গেছে ততদিনে। বিদেশী গল্পের অনুবাদ শুরু হয় গল্প লেখার প্রথম যুগেই, যদিও প্রকাশ ১৯৩৬-এ *পরিচয়* পত্রিকা ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরের পর্বে, পত্রিকার ক্ষিদে মেটাতে।[৬]

গল্প লেখা বা অনুবাদের উৎসাহ সাময়িক উত্তেজনা ছিল না সুধীন্দ্রনাথের জীবনে। মনে হয়, তাঁর গল্প লেখার আয়োজনটি ছিল একান্ত গোপন ও ব্যক্তিগত এক অভিসার — আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে দু-একজনকে অনুলিপি (হয়তো এমন-কি শ্রুতিলিপির) কাজে ব্যবহার করলেও তাঁর প্রকাশ্য রচনাকর্মের অন্তর্ভূত ছিল না এই সৃজন-পরিসর। এমনও হ'তে পারে, কোন-কোন গল্পে কুশীলবরা ছিলেন পারিবারিক বৃত্তে পরিচিত। গল্পগুলি লিখেই কি নিজেকে নির্মুক্ত করতে চাইছিলেন তিনি? অথবা তাঁর মনোনয়নে গল্পগুলি অভীষ্ট মানে পৌঁছতে পেরেছে কি-না — এ-বিষয়েই দ্বিধা ছিল লেখকের? আর সেইসব কারণেই গল্পগুলিকে যথাসম্ভব অপ্রচারিত রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ?

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

গল্প লেখার প্রথম যুগে কবিতার সঙ্গে গল্পেরও খশড়া করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতায়। কিন্তু কয়েকটি প্রয়াসের পরই তার উত্তরণ হয়েছে ফুল্'স্ ক্যাপ ফোলিও কাগজের জোড়াপাতায়।

রুলটানা ফুল্'স্ ক্যাপ কাগজ (কম-বেশি 34 × 21 সেমি) লম্বায় মাঝখান থেকে দু-ভাঁজ ক'রে ওকালতনামার মতো পাতার দু-পিঠে অর্ধাংশে লেখার অভ্যাস ছিল সুধীন্দ্রনাথের।

সংশোধন-সংযোজন হ'ত অন্য অংশে। কালো কালির প্রতি ছিল তাঁর পক্ষপাত।* পরিমার্জনের বিস্ময়কর ধৈর্য ছিল তাঁর। যাকে আমরা বলছি পাণ্ডুলিপি, তার আছে একাধিক স্তর : প্রাথমিক খশড়া থেকে মুদ্রণ-প্রতি (প্রেস-কপি) প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত আরও একাধিক মার্জিত পাঠ। সাধারণভাবে বলা যায়, মার্জিত পাঠ থেকে মুদ্রণ-প্রতি অনুলিপি করা হয় অভাঁজ কাগজে পাতাজুড়ে।

সব প্রাক্তন পাঠ রক্ষিত না-হওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, বর্তমান সংগ্রহভুক্ত পাণ্ডুলেখ কোন্ স্তরের। এর মধ্যে যেমন আছে নিতান্ত প্রাথমিক খশড়া, তেমনি আছে পরবর্তী পাঠ — কোনটির দ্বিতীয় বা তৃতীয়, আবার কোনটির-বা মুদ্রণ-প্রতি। অধিকাংশ পাণ্ডুলেখ তারিখহীন হওয়ায় নির্দেশ করা যাবে না তাদের রচনাকালগত পরম্পরা। তবে লেখকের হাতের লেখার বিবর্তন (যেমন 'য'-ফলার অর্ধবৃত্ত রূপ থেকে ত্রিবক্র রূপ) বা ভাষার ওপর অধিকারের ক্রমার্জিত পরিণতি অনুসারে এগুলির রচনাক্রম বিষয়ে ধারণা করা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে অনুমান হিশেবে, প্রামাণ্য উপাদান হিশেবে নয়।

প্রথমদিকের খশড়ায় বা মার্জিত পাঠে রচনার তারিখ দেওয়া থাকলেও ক্রমে সেই অভ্যাস স্খলিত হয়ে এসেছে ; কোথাও তারিখ আছে সন নেই, কোথাও কোনটিই নেই। তারিখ ও হাতের লেখা মিলিয়ে রচনাক্রম অনুমান ক'রে গল্পগুলি বিন্যস্ত করেছি আমরা। লক্ষ করার মতো, অনুবাদ গল্পে সময়ের কোন চিহ্ন রাখেননি সুধীন্দ্রনাথ ; সেখানে হাতের লেখার বিবর্তনই আমাদের অনন্য আশ্রয়। ব'লে রাখা ভালো, রচনাকালের ক্রম ভঙ্গ ক'রে তাঁর জীবনকালে মুদ্রিত গল্পগুলিকে রাখা হয়েছে মৌলিক ও অনুবাদ — উভয় গুচ্ছেরই সূচনায়।

মৌলিক গল্প

'উপন্যাসের উপক্রমণিকা'। প্রতিভা বসু সম্পাদিত *বৈশাখী* বার্ষিকী, ১৩৬২, কবিতাভবন, পৃ ১-২০। মূল রচনা : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ ; পরিমার্জিত। প্রাক্তন পাঠ পরিশিষ্টে (১)।

'ফাঁকি'। ১৭ পাতা ; একপিঠে পাতাজুড়ে কালো কালিতে লেখা। পৃ ৫-৯ অন্য হাতের লেখা। শেষ লেখা-পাতার পেছনে [১৮] গল্পনাম ও রচনাকাল (১৩৩০ আশ্বিন) আখ্যাপত্রের মতো দেওয়া। তোলা পাঠ।

'বিলেত-যাত্রা'। ১৯ পাতা ; পৃ ১-৭ একপিঠে পাতাজুড়ে কালো কালিতে লেখা ; পরের ১২ পাতা (পৃ ৮-৩০) দু-পিঠে পাতাজুড়ে লেখা। শেষ লেখা-পাতার পেছনে [৩১] গল্পনাম ও লেখকের স্বাক্ষর আখ্যাপত্রের মতো দেওয়া। গল্পটির সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে [সম্ভবত] দ্বিতীয় এই খশড়া মূল পাঠ হিশেবে সংকলিত। আদি রচনা (১৩৩০ মাঘ) এবং পরবর্তী [সম্ভবত তৃতীয়] একটি অসম্পূর্ণ পাঠ পরিশিষ্টে (যথাক্রমে ২ ও ৩) সংকলিত।

'দুকূলহারা'। ৩৪ পাতা ; একপিঠে পাতাজুড়ে কালো কালিতে লেখা। অতিরিক্ত একটি শাদা পাতার পেছনে গল্পনাম, লেখকের স্বাক্ষর এবং রচনাকাল (২৪-২৯ মাঘ [১৩৩০]) আখ্যাপত্রের মতো দেওয়া। তোলা পাঠ ; খাতায় লেখা আদি পাঠ পরিশিষ্টে (৪) মুদ্রিত।

* সঙ্গের বিবরণে এমনসব অভ্যাসের ব্যত্যয় হ'লেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় নয়।

'চার্বাক চট্টোপাধ্যায়'। পরিবর্ধিত কিন্তু খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি। ১৯ পাতা (অসম্পূর্ণ), একপিঠে পাতাজুড়ে কালো কালিতে লেখা। এর মধ্যে পৃ ১৭-১৯ অন্য হাতের লেখা। ২০-৪৩ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি অপ্রাপ্ত। ৪৪-৫৫ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খশড়া মনে হয় ; একপিঠে পাতাজুড়ে পেন্সিলে লেখা। শেষে সমাপ্তিসূচক ইতিরেখা আছে। প্রথম খশড়া-খাতা থেকে আদি রচনার ৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা জুড়ে দিয়ে আখ্যানের মধ্যবর্তী লুপ্ত অংশের ধারাবাহিকতা পূরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাহিনী-অংশে মিল হ'লেও, অপ্রাপ্ত পৃষ্ঠাগুলি অনেক পরিবর্ধিত ছিল অবশ্যই। আদি পাঠ এক্সারসাইজ খশড়া-খাতায় ; রচনাকাল (১৩৩০ [মাঘ-চৈত্র]) সেই সূত্র থেকে নিরূপিত। সম্পূর্ণ আদি পাঠ পরিশিষ্টে (৫) সংকলিত।

[নামহীন গল্প ১] ৫ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১০। অসম্পূর্ণ।

'স্বপ্নাবসান'। ৩৭ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৭৩। নীল কালিতে সংশোধন। 'প্রণয়-স্মৃতি' নামে প্রাক্তন পাঠ পরিশিষ্টে (৬) মুদ্রিত।

[নামহীন গল্প ২] ৪ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৮। গল্পের ভণিতা মাত্র, অসম্পূর্ণ। সূচনাংশে নামহীন গল্প ৩-এর সূচনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

[নামহীন গল্প ৩] ৮ পাতার পাঁচটিতে লেখা ; পত্রাঙ্ক ১-৯ ; অন্য পৃষ্ঠা না-লেখা। প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকের কোণে লেখা[শুরু?]র তারিখ। স্খলিত অংশ বাদে পড়া যায় শুধু '[২রা?] আষাঢ়'। সূচনাংশে নামহীন গল্প ২-এর সূচনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। শুরুতে 'প্রথম পরিচ্ছেদ' উল্লেখ থেকে মনে হয়, দীর্ঘতর গল্পের পরিকল্পনা ইচ্ছা ছিল।

[নামহীন গল্প ৪] ১ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-২।

[নামহীন গল্প ৫] ৯ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১৮। প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকের কোণে লেখা[শুরু?]র তারিখ : ২রা ফাল্গুন, ১৩৩২।

'খ্যাতি'। ২৫ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৪৯। পৃ ৮-১০ অন্য হাতের লেখা। প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকের কোণে লেখা শুরুর তারিখ : ১৪ই আষাঢ়। পত্রাঙ্কহীন শেষ পাতার [৫০] অর্ধাংশে গল্পনাম, লেখকের স্বাক্ষর ও রচনাকাল : ১৪ই-৩১শে আষাঢ় ১৩৩৩ আখ্যাপত্রের মতো দেওয়া।

'রূপকথা'। ৫ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৯। প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকের কোণে লেখা শুরুর তারিখ : ১৮ই শ্রাবণ [১৩৩৩?]।

[নামহীন গল্প ৬] প্রথম ৩০ পৃষ্ঠা জোড়াপাতায় ১-১৫ সংখ্যাযুক্ত ; ১৬-১৭ প্রতি পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক ; পরের ৩৮ পৃষ্ঠা জোড়াপাতায় ১৮-৩৬ সংখ্যাযুক্ত ; ৩৭ পাতার শেষ ৮ পঙ্‌ক্তি থেকে তার অপরার্ধ, ৩৮ জোড়াপাতা ও ৩৯-এর প্রথম ৫ পঙ্‌ক্তি বর্জন ক'রে (দ্র পরিশিষ্ট ৭) পরিবর্তে নতুন ৩৭ জোড়াপাতা সংযুক্ত ; ফলে ৩৭ সংখ্যা দু-বার চিহ্নিত ; পরের ২ পাতা বা ৪ পৃষ্ঠা যা ছিল বা হ'তে পারত ৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ ও অপরার্ধ এবং ৪০ জোড়াপাতা সংখ্যাবিহীন ; পরের ৩৮ পৃষ্ঠা আবার ৩৯ জোড়াপাতা থেকে শুরু হয়ে ৫৭ জোড়াপাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে মূল গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ১১৫। অসম্পূর্ণ। প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকের কোণে লেখা[শুরু?]র তারিখ : 'আষাঢ় — ৬ই জুন ১৯৩০'। আষাঢ় ঠিক হ'লে ১৫ জুনের পরে হবে, ৬ জুন ঠিক হ'লে হবে জ্যৈষ্ঠ ২৩।

অনুবাদ গল্প

'রূপকথা'। নিজের সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *পরিচয়* পত্রিকায় (৫ : ৩, ১৩৪২ মাঘ-চৈত্র, পৃ ৪৩০-৪২) প্রকাশিত। পাণ্ডুলিপি ৪টি জোড়াপাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১৫। পেন্সিলে সংশোধন। প্রথম চিন্তায় নাম ছিল 'অপ্সরী' ; পাঠ সামান্য ভিন্ন। ৪টি জোড়াপাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১৫। পাতার দু-পিঠে অর্ধাংশে পেন্সিলে লেখা। উৎস-রচনা অনুবাদক-নির্দেশিত।

'ভালোবাসা'। মাসিক *পরিচয়* পত্রিকায় (৬ . ১, ১৩৪৩ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ ৫৩-৬৩) প্রকাশিত। পাণ্ডুলেখের ৮ পৃষ্ঠার একদিকে পাতাজুড়ে কালো কালিতে লেখা ; মনে হয় মুদ্রণ-প্রতি। উৎস-রচনা অনুবাদক-নির্দেশিত। প্রথম চিন্তায় নাম ছিল 'বিয়োগান্ত' ; পাঠ ঈষৎ ভিন্ন। ৪টি জোড়াপাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১৫। পেন্সিলে সংশোধন।

'বসন্ত-বন্যা'। ১০ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-২০। মূল : ইভান্ তুর্গেনিয়েভের গল্প, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম 'স্প্রিং টোরেন্টস্'।*

[নামহীন অনুবাদ ১] ২০ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৩৯। পাণ্ডুলিপির প্রথম দু-পৃষ্ঠায় ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যা-দুটি কেটে ১ ও ২ করা হয়েছে। গল্পের শুরুতে ৩ সংখ্যা ছিল, সেটি পরিচ্ছেদ-সূচক। আগের পৃষ্ঠাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রস্পের মেরিমে-র 'কারমেন' গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ।*

[নামহীন অনুবাদ ২] ২১ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৪২। নীল কালিতে লেখা। প্রথম পাতার ওপরে 'Horeb' লেখা ছিল। *বাইব্‌ল্*-এর এই পর্বতশৃঙ্গটির সঙ্গে গল্পের সংযোগ আপাতত সমাধান করা গেল না।

[নামহীন অনুবাদ ৩] ৩ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-৫। অসম্পূর্ণ। মূল : য়োরিস্ কার্ল য়্যুইস্‌মাঁস্-এর গল্প, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম 'লা বাস্'।*

[নামহীন অনুবাদ ৪] ৮ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১৬। মূল : আনাতোল ফ্রাঁসের গল্প, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম 'অ্যাট্ দ্য সাইন্ অফ্ রেন্ পেডোক্'।*

'খামখা খুশি'। ৬টি জোড়াপাতা ; দু-পিঠ মিলিয়ে একটি পত্রাঙ্ক, ১-১২ ; অর্থাৎ লেখা পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৪। পাতার দু-পিঠে অর্ধাংশে পেন্সিলে লেখা, নীল কালিতে সংশোধন। প্রথম চিন্তায় নাম ছিল 'পরমানন্দ'। ক্যাথরিন ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের 'ব্লিস্' গল্পের অনুবাদ।*

[নামহীন অনুবাদ ৫] ইউনিভার্সাল এক্সারসাইজ খাতার (১৯৩১) পাতার অর্ধেকে প্রথম ৮ পৃষ্ঠা লেখা ; শেষ পাতাটি [৯] খাতার মলাটে ভেতরের দিকে আড় ক'রে লেখা।

[নামহীন অনুবাদ ৬] ২ পাতা, ৩ পৃষ্ঠা। অসম্পূর্ণ।

'দ্বৈপায়ন'। ১ পাতা, ২ পৃষ্ঠা। অসম্পূর্ণ। মূল : ডি. এইচ্. লরেন্সের 'দ্য ম্যান হু লাভ্‌ড্ আইল্যান্ডস্'।*

[নামহীন অনুবাদ ৭] ৫ পাতা, ৯ পৃষ্ঠা। অসম্পূর্ণ।

[নামহীন অনুবাদ ৮] ১ পাতা, ২ পৃষ্ঠা। অসম্পূর্ণ।

তারকা-চিহ্নিত ছয়টি গল্পের উৎস-রচনা শনাক্ত ক'রে দিয়েছেন অধ্যাপক সুদেষ্ণা চক্রবর্তী।

পরিশিষ্ট

১ ['উপন্যাসের উপক্রমণিকা'] চার নম্বর বুল্ ডগ্ এক্সারসাইজ খাতার একদিকে পাতাজুড়ে লেখা ; পত্রাঙ্ক ১-৩০। অবশিষ্ট পাতা অব্যবহৃত।
২ 'বিলেত-যাত্রা'। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম খশড়া-খাতা* — চিত্তরঞ্জন এক্সারসাইজ বুক্-এর পেছনদিক থেকে শুরু ক'রে ২১৬-১৫৭ পৃষ্ঠায় পাতাজুড়ে লেখা। লেখার শেষে রচনার তারিখ : মাঘ, ১৩৩০।
৩ 'বিলেত-যাত্রা'। গল্পটির তৃতীয় পরিবর্ধিত পাঠ। ২২ পাতা ; পত্রাঙ্ক ৮-৫১। প্রথম ৭ পৃষ্ঠা ও শেষের পাতাগুলি অপ্রাপ্ত। সুধীন্দ্রনাথের অভ্যাসসিদ্ধ খশড়া।
৪ 'দুকূলহারা'। পূর্বোক্ত খাতায় ১৫৬-৯৬ পৃষ্ঠায় পাতাজুড়ে লেখা। লেখার শেষে রচনার তারিখ : '২৯শে মাঘ, ১৩৩০'।
৫ 'চার্বাক চট্টোপাধ্যায়'। পূর্বোক্ত খাতায় ৯৪-৫৫ পৃষ্ঠায় পাতাজুড়ে লেখা। লেখার শেষে তারিখ নেই ; তবে এই খাতার সব খশড়াই ১৩৩০ চৈত্রের মধ্যে, তারপরে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় খাতা। সুতরাং ১৩৩০ মাঘ থেকে চৈত্রের মধ্যে লেখা।
৬ 'প্রণয়-স্মৃতি'। 'স্বপ্নাবসান' গল্পের প্রাক্তন পাঠ। ৮ পাতা ; পত্রাঙ্ক ১-১৬। শেষ পাতায় শাদা অর্ধাংশে 'স্বপ্নাবসান' গল্পের কবিতার খশড়া পেন্সিলে।
৭ নামহীন গল্প ৬-এ একটি সম্ভাব্য উপকাহিনী সংযোজনের জন্য পরিবর্ধিত পাঠ।

সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে বর্ণ- ও শব্দ-স্খলন, বর্ণাশুদ্ধি ও বর্ণবিন্যাসের অসমতা গল্পের পাঠপ্রচয়ের একটি বড়ো প্রতিবন্ধক। বারাণসীতে স্কুলজীবনে সংস্কৃত অন্যতম পাঠ্যবিষয় হ'লেও বানান-বিধানের কোন সংস্কার তাঁর মধ্যে তেমন পোক্তভাবে গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে মনে হয় না। এ-বিষয়ে যেমন কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি রপ্ত হয়ে ওঠেনি সুধীন্দ্রনাথের, তেমনি — হয়তো সেই কারণেই — তাঁর অভ্যাসের পরিবর্তনও হয়েছে বহুলভাবে। অথচ এইসময়েই নতুন শব্দগঠনের সাহস — এমন-কি সামান্য অধিকারও — অর্জন করছেন তিনি ক্রমে-ক্রমে। সম্ভবত এই গল্পগুলি লেখায় একই সঙ্গে কাজ করছিল সত্বরতার আবেগ আর আত্মপ্রকাশের তাড়না। আর তাই অর্থ, বানান বা বাক্য বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়ে উঠতে পারেননি তাঁর পাণ্ডুলেখে।

বর্তমান মুদ্রণে আমরা বর্ণবিন্যাসে সমতারক্ষার চেষ্টা করেছি মাত্র ; কিন্তু বলা যাবে না, এই বিন্যাসই তাঁর অবিকল্প প্রবণতা অথবা প্রাচীন বা নবীন কোন একটি বিশেষ ধারার তিনি পক্ষপাতী। স্থানিক উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণসংস্থান, বর্ণ- বা শব্দ-স্খলন ও অশুদ্ধির পরিমাণ এতটাই সুপ্রচুর সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলেখে, যে একান্ত প্রয়োজন না-হ'লে তৃতীয় বন্ধনীতে স-চিহ্ন সংশোধন বা সংযোজন ক'রে পড়ার ব্যাঘাত ঘটানো হয়নি, নীরবে শুদ্ধ করা হয়েছে।

নিরন্তর অনুশীলনে কোন ভাষাকর্মী কতটা দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, তার অসামান্য নিদর্শন সুধীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলির পাঠ-পাঠান্তর। বাঙলা ভাষা ব্যবহারে তাঁর দুর্বলতা তিনি যেন স্তরে-স্তরে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিলেন কঠোর সংস্কারের মধ্য দিয়ে। শুরুর দিকে তাঁর বাক্য

* এই লেখার শেষে সূত্র ১ দ্রষ্টব্য।

ছিল অনিশ্চিত, শব্দ-ব্যবহার অস্থির, বক্তব্য অপরিণত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংকর শব্দের প্রয়োগ-সংকট, আঞ্চলিকতার দুর্মর লক্ষণ। আবার এরই পাশে ছিল গুরুগম্ভীর তৎসমের সঙ্গে লোকপ্রচল বাঙলা শব্দের ব্যবহার। ক্রমে এই ব্যত্যয়ী বৈশিষ্ট্যগুলিই ভাষাশক্তিব চিহ্ন হয়ে উঠবে তাঁর পরিণত রচনায়। তবে লক্ষ করার মতো, ব্যঙ্গবঙ্কিম বক্রবাচনে আর সফল সংলাপ রচনায় তিনি পারদর্শী প্রায় প্রথম থেকেই। কবিতার ভাষায় যে-শিল্পসিদ্ধি তিনি লাভ করবেন অনতিবিলম্বে, তারই যেন প্রস্তুতি চলছিল গল্পের সংস্কারসূত্রে।

সময়ের দূরত্বে এসে এই গল্পগুলিকেও তাই কোন পাঠকের মনে হতে পারে ভাষা ব্যবহারে ঈশিত্ব অর্জনের এক প্রস্তুতি যেন। এই গল্পগুলিই ধরিয়ে দেয় সেই বয়সেও তাঁর বিস্ময়কর পাঠ-পরিধি। ফ্লবেয়র ও প্রুস্তের সংস্কার-প্রবণতা সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করেন সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু তখন তাঁর বাসনালোক রোমান্টিক কল্পনার মহিমায় বিভোর। রবীন্দ্রনাথের ভাব আর ভাষার স্ফটিকচূর্ণ দীপ্তিময় ক'রে তোলে তাঁর প্রকাশকে। সমাজ-হিতৈষার তুলনায় বেদনাবর্ণিল অনুভূতির শিল্পিত স্বভাবই তাঁর কাছে তখন কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। বিপ্লবী শেলিকে নয়, প্রেমিক শেলি ও ভের্লেনকে ভালোবেসেছেন তিনি সে-পর্বে ; মলার্মে বা ভালেরি তখনো অধরা তাঁর কাছে। উক্তি ও উপলব্ধির অন্বয় তাঁর মননে ধরা দেয়নি। আঠারো শতকীয় যে-যুক্তিপরম্পরা সুধীন্দ্রনাথের অভীষ্ট হয়ে উঠবে পরিণত বয়সে, তার সাক্ষাৎ তখনো ঘটেনি এই গল্পমালার বয়ানে। জীবনযাপন থেকে উঠে-আসা অভিজ্ঞতার তুলনায় বইয়ের জগৎই হয়ে উঠেছে তাঁর চিন্তা-চেতনার ভুবন।

ভাবনাসূত্র

যে-কালপর্ব সুধীন্দ্রনাথের গল্পের প্রেক্ষিত, তার সূচনা সিপাহী অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্মে এবং বিস্তার বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে গল্পগুলির রচনাকাল পর্যন্ত। মন্থনকালের এই বাঙালি সমাজকে অন্দর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। চোরবাগানের দত্ত-পরিবারে একইসঙ্গে বাধা পড়েছিল বিত্ত ও বিদ্যা। পাশ্চাত্য রীতির উপকরণে সাজানো সদর আর পুজোপার্বণের উপচারে ভরাট অন্দর, হ্যাট-কোট আর চটি-চাদর সহাবস্থানের পরিসর খুঁজে পেয়েছিল দত্ত-পরিবারে।

হরপ্রসাদ যে তিন ইংরেজ কবির কথা বলেছিলেন, তাঁরা আর নেপোলিয়ন বা ইতালীয় একত্রকরণের নায়করা তখনকার যুবসমাজের আরাধ্য। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ না-পেলেও 'সুলভ টাকার প্রথম স্বাদে আত্মহারা বাঙালি তখন ছুটছে স্বর্ণমৃগের পিছনে', লক্ষ করতে ভুল করেননি সুধীন্দ্রনাথ। সমাজ-ইতিহাসের এই পটভূমি ব্যাখ্যায় সুধীন্দ্রনাথের চিন্তায় অভিনবত্বের পরিচয় পাই যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মানির প্রতিরোধে বেলজিয়মের ভূমিকা বা সহমরণ নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সন্তানের বিবাহে মায়েদের উৎকণ্ঠার মধ্যে কার্যকারণসূত্র খুঁজে পান তিনি। সাময়িক ঘটমান ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ আরও লক্ষ করেছেন ফিরিঙ্গি বা স্বদেশী হওয়া যেন একই লক্ষ্যের দুই বিকল্প পথ, পক্ষপাত যদিও প্রথমটির প্রতি। সে-চেষ্টায় বিফল হলে দ্বিতীয়টিতে সফলতা যেন অবধারিত। এর যে-কোন একটি পথেই নিশ্চিত হতে পারে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপ ; গল্পের

উত্তমপুরুষ কথকের কাছে দুই-ই অবশ্য ঈষৎ অনুকম্পার উপলক্ষ, ব্যঙ্গের পাত্র। এরই মধ্যে একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় গান্ধি ও কংগ্রেস-পন্থার প্রতি শ্লেষও।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পের জগৎ প্রধানত মানসিকতায় মধ্যশ্রেণীর, অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত, বাঙালি নাগরিক সমাজকে ঘিরে গড়া।* তার চিন্তাজগৎ মধ্যচিত্ত ইঙ্গ-বঙ্গ-সুলভ সংস্কার ও প্রগতির মধ্যে দ্বিধাভক্ত। পশ্চিমের সম্মোহনে এ-সমাজ মুগ্ধ ; পরিচয় যথেষ্ট গভীর হওয়ার আগে থেকেই সমর্পণে চরিতার্থ। হিন্দুয়ানির প্রত্যক্ষ অহমিকা না-থাকলেও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে অপ্রসন্ন মনোভাব প্রচ্ছন্ন নয়, তবে খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টানদের বিষয়ে সসম্ভ্রম অনুরাগ দৃষ্টি এড়ায় না।

সামান্য প্রতিরোধ বা প্রতিকূলতা থাকলেও নারী-পুরুষের সামাজিক যোগাযোগের পরিসর উন্মুক্ত এ-সমাজে, তাই প্রেমবৈচিত্র হয়ে উঠেছে সুধীন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান বিষয় : অনুরাগ থেকে বিচ্ছেদ, অভিমান থেকে প্রত্যাখ্যান, বিবাহ সত্ত্বেও ব্যবধান, প্রেমাভাব থেকে প্রতারণা। পরবঞ্চনা আর আত্মবঞ্চনায় ভরা এ-প্রেমের মূলে আছে প্রত্যাশারই গভীর এক অস্পষ্টতা। এ-প্রেমে চরিতার্থতার উদ্‌যাপন নেই, আছে কেবল অনিকেত অস্থিরতায় আত্মকরুণার অতৃপ্তিময় তিক্ত স্বাদ। সে-পরিণতি অবশ্য প্রধানত প্রেমিকেরই নিজের রচনা, কদাচিৎ সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিষমতা এতে ইন্ধন যোগায় মাত্র।

সুধীন্দ্রনাথের গল্প আত্মপ্রক্ষেপময়। অধিকাংশ গল্পেরই আখ্যানবস্তু প্রণয়, এবং ব্যর্থ প্রণয়, সংরাগতীব্র প্রেম ও নিরুত্তাপ বিবাহ, সমাজবাধা, বিবাগ ও নিরাশা। পারিবারিক অবস্থান, বয়সের উল্লেখ, বোর্ডিং স্কুল, অ্যাটর্নিশিপ, সাহিত্য-পাঠ ও -রুচি অনেকটাই হয়তো তাঁর জীবন-ঘটনা বা চিন্তা-প্রবণতার সঙ্গে মিলে যাবে। কোন-কোন আখ্যান-মুহূর্তের সাদৃশ্যময় পুনর্ব্যবহার থেকে মনে হয়, তার পেছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা অসম্ভব নয়। মিলন, এমন-কি চুম্বন ও তার পরবর্তী অবসাদ ও আত্মধিক্কারের অভিজ্ঞতা প্রায় অভিন্ন মনে হয় গল্পগুলিতে। অনেকেরই মনে হতে পারে, জীবন থেকে গল্পের উপাদান পেলেও জীবনও কোন-কোন ক্ষেত্রে হয়তো এই গল্পগুলিতে প্রকাশিত তাঁর পূর্বপোষিত ধারণা ও ঘটনা অনুসরণ করেছিল।

গল্পের উত্তমপুরুষ কথক প্রেমাতুর, তার চোখে নারী প্রবলা। তার বাসনালোকের প্রধান নির্ভর নারী : জায়া, বান্ধবী বা বিচ্ছিন্না প্রেয়সী। যে-বিবাহ প্রেমজ নয়, সে তো তার কাছে উদ্বন্ধনে মৃত্যুর মতো। 'ভার্যা! সে চিরকাল ভার হ'য়েই থাকবে। অন্য কোনো সম্পর্ক তার সঙ্গে সম্ভব নয়।', আর তাই তারা তাচ্ছিল্যের 'মেয়েমানুষ' হ'য়েই থাকে সুধীন্দ্রনাথের গল্পে। আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে চার্বাকের তুলনায় তাকে মনে হয় একান্ত রক্ষণশীল। এই দুই বিরোধী প্রবণতার সমাবেশ — 'নৈরাশের তিক্ততা', 'অপারগের বিদ্রোহ' ও 'জীবন-অনীহা' একদিকে, অন্যদিকে জীবন-সৌন্দর্যের বোধ, আত্মোপলব্ধি ও শ্রেয়োমন্যতার বিপ্রতীপতা তৈরি ক'রে তোলে ভ্রান্ত গর্ববোধ, অপ্রণয়ের সন্ধিগ্ধতা, সিদ্ধান্ত নেয় স্বেচ্ছায় সন্তানহীনতার। নিজের বিষয়ে অতৃপ্ত, অনিশ্চিত, অসন্তুষ্ট ও অসুখী এই মানুষটির জন্য অবশিষ্ট থাকে শুধুই 'সীমাহীন বিষাদ'।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পে পিতা বা পিতৃস্থানীয় পুরুষের প্রভাবশীল উপস্থিতি — বিশেষ ক'রে দুই

* গোবিন্দপুরে জমিদারের প্রতি তথাকথিত আনুগত্য, ধূর্ত চাটুবৃত্তি, সম্পত্তি-রক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যভিচার পর্যন্ত গড়ানো পল্লীসমাজকে বলা যায় এই সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম।

প্রজন্মের সম্পর্ক — লক্ষ করবার মতো ব্যতিক্রমী একটি বৈশিষ্ট্য। এবং হরিচরণ-বিষ্ণুচরণ, প্রবোধ-বিনোদবাবু, তরুণ-মাইটর সাহেব, অমরেশ-পিতৃদেবের সে-সম্পর্কে বৈচিত্র আনতে পেরেছেন সুধীন্দ্রনাথ। কোথাও পিতা ও পুত্র পরস্পরের বৈরী, সম্পর্ক ভীতির ; কখনো পুত্র পিতার প্রতি অনুকম্পায়ী, অথচ অনুযোগপ্রবণ। তুলনায় মা বা মাতৃসমা চরিত্র শুধু সংখ্যায় অল্প নয়, তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিস্তার অথবা গল্পে তাঁদের অভিঘাত নিতান্ত নগণ্য। ক্বচিৎ যখন তাঁদের দেখা পাই সুধীন্দ্রনাথের গল্পে, সংসারে সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা ক'রে নিজেদের হাসিমুখের আড়ালে তাঁরা যেন প্রচ্ছন্ন রাখেন উপেক্ষিতের কুণ্ঠিত বেদনা।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে বন্ধু ও জীবনে ব্যর্থপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক ; 'বিলেত-যাত্রা'য় কথক সুরেশের বন্ধু শম্ভু, 'খ্যাতি'র প্রবোধ ও দীনেশ, নামহীন গল্প (৬)-এ অমরেশ ও তরুণ ; আর শিক্ষক মহেন্দ্রবাবু ও উমেশদা। এই বন্ধুতার মধ্যে একদিকে যেমন আছে বন্ধুর ইচ্ছা চরিতার্থতায় বা বিপন্নতায় তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া, অন্যদিকে তেমনি আছে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক। শিক্ষকরা যেমন সেখানে ছাত্রের আশ্রয়ভর বন্ধু, মাননীয়, আদর্শ-স্থানীয়, তেমনি ছাত্ররাও শিক্ষকের সস্নেহ অবলম্বন।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পের সবথেকে উপভোগ্য, তাৎপর্যময় ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রসঙ্গ, বর্তমান সম্পাদকের বিবেচনায়, সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা। উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত আখ্যানের মতো, এখানেও আমরা লক্ষ করি বইয়ের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। গল্পকারের বয়ানে স্পষ্ট স্বীকৃতি পাই, তাঁর অভিজ্ঞতা প্রধানত গ্রন্থ-লব্ধ। য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার গতিপথ ও পর্ব-পর্বান্তর যেন তাঁর নখদর্পণে। প্রেমের মননগত একটি মাত্রাও তৈরি হয় এমন কবি লেখক ও তাঁদের রচনাপ্রসঙ্গকে নিয়ে। গত শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে সাহিত্যের স্বাশ্রয়ী মূল্য বা সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক, শিল্পসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ রচনা-প্রকৃতি বিষয়ে বিতর্ক এক শিল্পিত আবহ তৈরি করে সুধীন্দ্রনাথের গল্পে। সম্পূর্ণত না-হ'লেও তার অনেকটাই হয়তো মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে লেখকের নিজস্ব সাহিত্যরুচির সঙ্গে। জ্যাঠামশাই, বিজন সেন বা অমরেশের পিতৃদেবের বইয়ের ঘরের বর্ণনা মনে হয় প্রধানত তাঁর নিজের আদর্শ সংগ্রহের আদলে সাজানো। 'কাব্যের মুক্তি' ইশতেহারের প্রস্তুতি যেন চলতে থাকে গল্পগুলির সাহিত্য-প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে।

গল্পকারের মন প্রায় সব বিষয়েই প্রতীচ্য-মুগ্ধ। সদর্থে সাহিত্য-প্রসঙ্গে যেমন, তেমনি নঞর্থে স্বাদেশিকতার সারহীন সুযোগসন্ধানের উদ্ঘাটনে ; এমন-কি নারীরূপের বর্ণনায়ও তাঁর পক্ষপাত পাশ্চাত্য ধারণার অনুবর্তী। লিলি ও প্রতিভা দু-জনেই সুন্দরী, কিন্তু বিদেশী ও দেশী ধরনের রূপসী। রূপের দিক থেকে তৃতীয় একটি উদাহরণ 'বিলেত-যাত্রা'র তৃতীয় খশড়ার (পরিশিষ্ট ৩) মঞ্জুলিকা ; রূপের সঙ্গে কর্মে ও চিন্তায় মননশক্তির স্পর্শ যেন প্রথমজনকে যথার্থ বিদুষী ক'রে তোলে। কিন্তু হয়তো সময়ের সীমাবদ্ধতায় সায় দিয়ে সুধীন্দ্রনাথকেও দেখাতে হয়, প্রতিভা স্বেচ্ছায় সনাতন ভারতীয় স্ত্রীর মতো স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চায়, আবার আধুনিক ও প্রগতিশীল হ'য়েও লিলি পিতৃতান্ত্রিক অবরোধ থেকে মুক্তি পায় না। তথাকথিত এই সাবেক ও প্রগত ভাবনার এক দ্বন্দ্বময় মিশ্রণ পাওয়া যায় মালতীর মধ্যে।

চরিত্র ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সুধীন্দ্রনাথের মনোযোগের পরিচয় আছে তাঁর গল্পে। উত্তম-

পুরুষ কথক নিজের মনোগত অভিপ্রায়, দুর্বলতা বা ছলনা প্রকাশ করেন অকপটে। আচ্ছন্ন অবচেতনের উন্মোচনের দৃষ্টান্ত আছে তাঁর গল্পে ; মনের কারখানাঘরে চলতে-থাকা বিকলনও তাঁর গল্পে অবয়ব পায়। কিন্তু সেগুলি কোন প্রবাহ তৈরি করে না, যেন ঘটনার বাহিরানায় থম্‌কে যায় তাঁর চিন্তাসূত্র। চরিত্রের প্রকাশরূপের প্রবলতা মনের স্পর্শাতুর অনুভূতির ভাবরূপকে রুদ্ধ করে পদে-পদে।

'চার্বাক চট্টোপাধ্যায়' গল্পে জনপ্রিয় সমকালীন বাঙলা উপন্যাসের প্রচলিত ছাঁচ বিষয়ে তীব্র শ্লেষ থাকলেও, পাঠককে মানতেই হয়, সুধীন্দ্রনাথের গল্পের বয়ান স্বতন্ত্র হ'লেও চরিত্রের পরিণতিতে বাস্তব সামাজিক অবস্থা সম্ভবত তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের' অনুসারী করেছিল। গত শতকের তৃতীয় দশকে কোন কবি-লেখকের রচনা প্রকাশের সমস্যা ও সংগ্রামের বেশ কিছু পরিচয় আছে সুধীন্দ্রনাথের গল্পে। লেখা ফেরৎ-আসা বা তার বিরুদ্ধে মুষ্ট্যাঘাত সমিতির প্রতিবাদের অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গচিত্র অথবা 'খ্যাতি' গল্পে রচনা প্রকাশের পেছনে সাহিত্য-অতিরিক্ত অন্য বিবেচনার প্রয়োগ ঐ-সময়ের সাহিত্য-পরিবেশের এক বিশ্বস্ত চিত্র মনে হয়।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পেব ভাষা অনেকসময়েই মনে হয় যেন প্রবন্ধের। এর ফলে বহু চিন্তাবীজ প্রসঙ্গ আলোচনা যেমন সুগম হয়েছে, তেমনি প্রতিহত হয়েছে গল্পের গতি। এই ত্রুটি অবশ্য অনেকটাই লাঘব হয়েছে সংলাপ-রচনার কুশলতায়। এ-বিষয়ে তাঁর বাক্‌সিদ্ধি যেন গল্পগুলির রক্ষাকবচ। তাঁর এই দক্ষতা বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ব'লেই সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথের গল্পে আখ্যান বয়ন বা ঘটনা অথবা চরিত্র বিশ্লেষণের তুলনায় সংলাপ বেশি মনোযোগ পায়। গল্পের টান ধ'রে রাখে চরিত্রানুযায়ী ভাষা। বিশেষ ক'রে মেয়েদের মুখের ভাষায় তিনি সঞ্চার ক'রে দিতে পারেন প্রাণের স্পন্দন। ক্রোধে বা করুণায়, বিদ্বেষে বা মিনতিতে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে সংলাপের গুণে। যে-ব্যঙ্গ-'বক্রিম' ভাষাব্যবহার তাঁর পরিণত গদ্যের — আর অবশ্যই হাইনে অনুবাদের — ব্যক্তিচিহ্ন হয়ে উঠেছিল, তার স্বাক্ষর আছে এই আদি পর্বের গদ্যে ও নাগর রসিকতায় ভরা পদ্যের অনুশীলনের মধ্যেও। 'শিল্পগত আত্মপ্রকাশের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা হিংস্র না-হ'লে, এ-অবস্থায় তিনিও হয়তো সহৃদয় পাঠক নামক কপোলকল্পিত দাতাকর্ণের কাছে অপরিমেয় অনুকম্পার আবেদন পাঠাতেন।' — এ-জাতীয় বাক্য অজস্র ছড়িয়ে থাকে তাঁর আখ্যান জুড়ে।

সুধীন্দ্রনাথের ভাষানির্মাণের একটি বৈশিষ্ট্য প্রবাদের ব্যবহার। দেশজ প্রবচনের পাশে তিনি অনুবাদও ক'রে দেন প্রবাদ। আবার কখনো গভীর পর্যবেক্ষণ থেকে রচনা করেন প্রবচনময় উক্তি : 'পর্যাপ্তির পরে আসে অনটন, সৌদামিনীর শেষে জাগে ঘনান্ধকার, সংরাগের সীমান্তে থাকে ঘৃণা এবং অবসাদ।' অন্যদিকে, সম্পূর্ণ শব্দগঠনের নিয়ম মেনে তৈরি করেন 'অন্তম' বা 'বক্রিম'। 'গাড়ল' বা 'মাগী'র মতো অশিষ্ট শব্দ যেমন প্রয়োগ করেন, তেমনি প্রচলিত ব্যবহারের বিপর্যয় ঘটিয়ে প্রয়োগ করেন 'মামুলি', 'চপলতা' বা 'মুষ্টিমেয়' শব্দগুলি ; পদ্যের 'সনে'র মতো 'পুছবি'-জাতীয় শব্দ ব্যবহারেও তাঁর শুচিবায়ু থাকে না। তাঁর গল্পে হাল্‌কা রসিকতার ছড়ার পাশাপাশি সংস্কৃত ছন্দের বাঙলা রূপান্তরও ভাষাপ্রয়োগে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেয়।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পে চার্বাক, লিলি বা মাধবীর সঙ্গে ফিরে দেখার মতো দু-চারটি ঘটনা ছাড়া আকস্মিক কাকতালের আশ্রয় বেশি নেননি গল্পকার। প্রকৃতি বর্ণনাও সংখ্যায় অল্প ও অকারণে দীর্ঘ নয়। কিন্তু গল্প যখনই দীর্ঘ হ'য়ে ওঠে তাঁর হাতে, পাঠক হয়তো ঈষৎ বিভ্রান্ত হন

কেন্দ্রচ্যুতির সম্ভাবনায়। অমরেশ ও তার পিতৃদেবের মধ্যে প্রজন্মগত আদর্শ ও বিশ্বাসের ব্যবধান বিষয়ে আলাপ গড়িয়ে যায় তরুণ ও মাইটর সাহেবের আখ্যানে, সেখান থেকে উমেশদা ও মালতীর উপাখ্যানে। গল্পের পাত্র থেকে অমরেশ হয়ে যায় গল্পের কথক। 'বিলেত-যাত্রা' গল্পও পরিবর্ধনের সূত্রে (পরিশিষ্ট ৩) নিয়ে আসে একটি স্বতন্ত্র উপকাহিনীর জটিলতা। গল্পটি নতুন মাত্রা পায়, কিন্তু গল্পের ভরকেন্দ্র স'রে যায় অন্যত্র।

স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি বিরাগ সুধীন্দ্রনাথের গল্পে মনে হয় ছদ্মপ্রচ্ছদের মতো। কালিদাস বা নামহীনভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বহু অনুষঙ্গ তো বটেই, বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, এমন-কি *উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম*-এর মতো বই বিষয়েও গল্পকারের মন্তব্য পাঠকের পুনর্বিবেচনা দাবি করে। ভিক্টোরীয় যুগের স্বভাববাদ বা প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরূপ না-হ'লেও, লেখকের পক্ষপাত যে রোমান্টিকদের প্রতি, অথচ শুদ্ধ শিল্পের ধারণা যে তাঁর প্রশ্রয় পায় না, অস্পষ্ট থাকে না পাঠকের কাছে। ভারতীয় পুরাণের বহু চরিত্রগত অনুষঙ্গও অনায়াসে উঠে আসে তাঁর গল্পে। এমন-কি 'রূপকথা' নামে মৌলিক গল্পটিতে পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে রসিকতা করতেও দ্বিধা করেননি সুধীন্দ্রনাথ।

উল্লেখগত দু-একটি স্খলন আছে সুধীন্দ্রনাথের গল্পে। জয়দেবের প্রেয়সীর নাম লোকমতে পদ্মাবতী ; *গীতগোবিন্দম্*-এর 'চারুশীলে' সম্বোধন সম্ভবত বিশেষণসূচক। 'দুকূলহারা' গল্পে শেলির কবিতা 'To –'র (মরণোত্তর কবিতা, 1824) পাঠ ঈষৎ ভিন্ন :

> 'I fear thy kisses, gentle maiden;
> Thou needest not fear mine;
> My spirit is too deeply laden
> Ever to burthen thine.'

অনুবাদ গল্পের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের নির্বাচনের কোন অভিপ্রায়গত তাৎপর্য উঠে আসে না এই পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে। সমকালীনতা বা বিশেষ কোন রুচির পরিচর্যা নেই এই গল্পগুলিতে। মনে হয়, তাঁর পাঠপরিধির মধ্যে যা তাঁর ভালো লেগেছে, এমন গল্পই অনুবাদ করতে নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। তবে প্রতিটি পূর্ণায়ত অনুবাদেই আছে আখ্যানের এক নাটকীয় বাঁক -- এই একটি সাধর্মসূত্রেই বাঁধা যায় গল্পগুলিকে। সম্ভবত যে-সব গল্প তাঁকে আর আকর্ষণ করেনি, অথবা সময়াভাবে, এমন বহু গল্পই তিনি সমাপ্ত করেননি। তবে প্রকাশিত হ'লে তখনকার বাঙলা গল্পসাহিত্যে তাঁর এই অনুশীলন আখ্যান-বিষয়ে ও আখ্যান-গঠনে অবশ্যই ভিন্নতার স্বাদ এনে দিতে পারত ব'লে মনে হয়।

গল্প লেখা শেষ পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের স্থায়ী পরিচয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবনের এক উতরোল ও বিক্ষুব্ধ পর্বের আত্মপ্রকাশের সাক্ষী হয়ে আছে এই পাণ্ডুলেখমালা। এক নিশ্চয়াত্মিকা প্রজ্ঞায় ভালো আর মন্দ, ঠিক আর ভুলকে অনিবার্যভাবে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়ার যৌবন-দম্ভকে 'কী বিষম গর্ব! কী দারুণ ভ্রান্তি!' ব'লে বুঝতে পারার বেদনাময় অভিজ্ঞতায় উত্তরণের ইতিহাস যেন এই আখ্যানগুচ্ছ। তাঁর কবিতার মতো তাঁর গল্পেরও প্রবণতা ছিল চলমান ইতিহাসকে স্মৃতি-সত্তার অন্তর্গত ক'রে নেওয়া। অধিকাংশ গল্পই তাই ঘটনাকাল থেকে দূরে এসে স্মৃতির পুনঃরচনা। একটি অনামা গল্পে (৬) উপন্যাস ও ইতিহাসের সীমায়ন করেছেন তিনি এইভাবে : 'উপন্যাসের হাওয়াখানায় অশরীরীদের বাস,

তাই হয়তো সেখানে ভিত-ছাদের মধ্যে মাখামাখি থাকা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের সমাধিস্তূপকে সইতে হয় স্মৃতির মতো অতিকায় জীবের ভার, কাজেই বনেদ থেকে শুরু না-করলে সে-ইমারত নিরাপদ হয় না।' সুধীন্দ্রনাথের গল্পে এই বুনিয়াদ তৈরির আয়োজন বেশি, ইমারত হয়তো শেষ হয় না . আলাপের বিস্তার আভোগের তীব্রতাকে গভীরতায় পৌঁছতে অবকাশ দেয় না।

ঈষৎ অগ্রকালীন 'ফোর আর্টস্ ক্লাবে'র *ঝড়ের দোলা* বা সমকালীন প্রথম পর্বের *কল্লোল*-এর গল্পনির্মাণের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের গল্পের আপাতসদৃশতাও লক্ষ করতে পারেন কোন পাঠক। কবিতায় যে-সংহতিগুণ তাঁর ব্যক্তিত্বের স্মারক, গল্পে প্রকাশ পায় তাঁর ভিন্ন, প্রায় বিপরীত, এক ব্যক্তিসত্তা। সুধীন্দ্রনাথের আখ্যান-রচনা যদি পূর্ণতা পেত, তাহ'লে তিনি হয়তো সহযাত্রী হয়ে উঠতে পারতেন ধূর্জটিপ্রসাদের। কিন্তু সে-পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সুধীন্দ্রনাথ ; 'জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলা', হয়তো জীবনেই কোন পূর্ণতার স্বাদ তাঁকে মুক্তি দিল বিপন্ন আত্মতা থেকে , গল্প নয়, জীবনকেই নতুনভাবে রচনা ক'রে নিতে চাইলেন সুধীন্দ্রনাথ।

অবিন্যস্ত, স্তূপীকৃত ও মিশ্রপাঠের কিছু দস্তাবেজকে যে অপূর্ণতা সত্ত্বেও অবশেষে গ্রন্থবদ্ধ করা গেল, এই প্রাপ্তিটুকু আনন্দের। প্রায় আবিষ্কারের মতো সুধীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলির পাঠপ্রচয়ের সমস্যাতেও ছিল অভিযাত্রার রোমাঞ্চ। আশা করি, পাঠকও সেই আনন্দ-রোমাঞ্চের স্বাদ পাবেন গল্পগুলি পড়ে।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পসংগ্রহ সম্পাদনার কাজে যখনই প্রয়োজন হয়েছে সহায়তা করেছেন সাংস্কৃতিক পাঠ ও নথি বিদ্যাসত্রের বর্তমান গবেষক শ্রীস্রবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন শ্রীসুব্রত সিন্‌হা। বিদ্যাসত্রের অধিকর্তা শ্রীসুকান্ত চৌধুরীর উদ্দীপক উৎসাহ এই গ্রন্থপ্রকাশে প্রেরণা দিয়েছে। তাঁকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

দে'জ-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখরের প্রশ্রয়ে, শ্রীদিলীপ দে ও শ্রীমান্ শুভঙ্কর দে-র প্রযত্নে রূপায়িত হ'ল *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গল্পসংগ্রহ*। এই বইয়ের প্রকাশরূপের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁদের। আমার অতুষ্টির অত্যাচারেও এঁদের সহনশীলতা অকল্পনীয়। তার প্রতিদান আমার সাধ্যের অতীত। তা সত্ত্বেও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তার দায় বর্তমান সম্পাদকের।

স্বপন মজুমদার

১ সুধীন্দ্রনাথের খশড়া-খাতা কালানুক্রমে সংখ্যানির্দেশ করেছিলাম রাজেশ্বরী দত্তের অনুরোধে, শৌরীন্দ্রনাথ দত্তের 'অবাচী' বাড়িতে, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*-এর দে'জ সংস্করণ প্রস্তুতিকালে। অর্থাৎ খাতার সংখ্যা সুধীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত নয়।

২ প্রথম খাতার (চিত্তরঞ্জন এক্সারসাইজ বুক) পেছনদিক থেকে শুরু ক'রে ১৬২ পৃষ্ঠা জুড়ে লিখেছিলেন তিনটি গল্প : 'বিলেত-যাত্রা' (২১৬-১৫৭), 'দুকূলহারা' (১৫৬-৯৬) ও 'চার্বাক চট্টোপাধ্যায়' (৯৪-৫৫)।

সুধীন্দ্রনাথের খশড়া-খাতা, চিঠিপত্র, কবিতার বইয়ের মুদ্রণ-প্রতি ও সংশোধিত প্রুফ এখনও রক্ষিত আছে কবির ভ্রাতুষ্পুত্র, হরীন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র, শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। খশড়া-খাতা ব্যবহার করতে দিয়ে বিশেষভাবে বাধিত করেছেন শ্রীদত্ত।

৩ 'রূপকথা', *পরিচয়,* ৫ : ৩, ১৩৪২ মাঘ, পৃ ৪৩০-৪২ ও 'ভালোবাসা', তদেব, ৬ : ১, ১৩৪৩ শ্রাবণ, পৃ ৫৩-৬৩।

৪ মুদ্রণ-প্রতিতে নাম নেই।

৫ সুধীন্দ্রনাথের এই পাণ্ডুলেখগুলি রাজেশ্বরী দত্তের কাগজপত্রের সঙ্গে গচ্ছিত ছিল কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে, প্রথমে রিজেন্ট পার্কের ও পরে বিধাননগরের বাড়িতে। কবির ভাগিনেয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের উৎসাহে এই অমূল্য সম্ভার তাঁরা তুলে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অছিত্বে 'স্কুল অফ্ কাল্চারাল্ টেক্সট্স্ অ্যান্ড রেকর্ডস্'কে।

৬ *পরিচয়,* ৬ : ১, ১৩৪৩ শ্রাবণ থেকে পরিবর্তিত হয় মাসিকপত্রে , তখন থেকে গল্পের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেল বিপুলভাবে।

সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ্ কাল্চারাল্ টেক্সট্স্ অ্যান্ড রেকর্ডস্-এ স্থানান্তরিত হওয়ার পর সুধীন্দ্রনাথের দুটি গল্প পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : 'দুকূলহারা', *বিভাব,* ৮৯, ২৫ : ২, বইমেলা ১৪১০, পৃ ১-১৯ ও 'স্বপ্নাবসান', *কালি ও কলম* (ঢাকা), ১ : ৬, ১৪১১ শ্রাবণ, পৃ ২৬-৪১। দুটিরই রচনা-পরিচয় স্বপন মজুমদার-কৃত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

গ ল্প সং গ্র হ

মৌলিক গল্প

উপন্যাসের উপক্রমণিকা

বংশ-পরম্পরায় যজমানি ক'রে, হরিচরণের পূর্বপুরুষেরা অল্পে-অল্পে সম্পত্তি বাড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার পিতা বিষ্ণুচরণকে তখনকার সরল জমা-খরচেও ধনকুবের বলা চলত না। পিতৃবিয়োগের পরে হরিচরণের ঐশ্বর্য শহরময় যে-প্রতিষ্ঠা পেলে, তার মূল পুত্রের কৃতিত্বে নয়, বিষ্ণুচরণের নির্ভুল দূরদৃষ্টিতে। তাঁর বিষয়বুদ্ধির বিকাশ মিউটিনির পরবর্তী যুগে ; তাই হয়তো তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতি-ব্যবসায়ের ডাকে সাড়া দিলে, পরলোকের পথ যদি-বা খোলে, তবু ইহলোকে আদৌ এগোনো যাবে না। ফলে তাঁর নাতিদীর্ঘ শিখা তৈলচিক্কণ সীমন্তের পিছনে অনায়াসে লুকোল, তাঁর চটি-চাদর নির্বিবাদে হ্যাট-কোটের প্রাধান্য মানলে, তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের পাট কমতে-কমতে, শেষে কেবল দুর্দিনের জন্যেই তোলা রইল। কিন্তু এততেও সেকালে যাকে ফিরিঙ্গি বলত, সে-নাম কেনা তাঁর সামর্থ্যে কুলোল না। হয়তো কেনার ইচ্ছাও ছিল না, কারণ অপচয় — তা সে অর্থ, বাক্য, বা চেষ্টা, যারই হোক্-না-কেন — তাঁর ধাতে সইত না। সম্ভবত তিনি জানতেন যে সাহেবিয়ানা, একটা সীমা ছাড়ালে, নিজের কলে প'ড়ে, নিজেই মরে। শক্তিমানের অনুকরণ বাঞ্ছনীয় ; কেন-না নকলনবিশের বাঁদরামি দেখলে, নিজের উৎকর্ষে সন্দেহ ঘোচে, এবং তারপর সেই মজার জন্তুটাকে কলা-মুলো খাওয়াতে আর কার্পণ্য থাকে না ; কিন্তু খুশিমনে প্রতিদ্বন্দ্বীর উন্নতিকামনা সাদা-কালো সকলের পক্ষেই অস্বাভাবিক।

সুতরাং বিষ্ণুচরণের আনকোরা বাড়িতে একদিকে যেমন মখমলে-মোড়া কুরসি-কেদারা, গির্জার ঘণ্টাওয়ালা ঘড়ি, না-দেখা উলঙ্গিনীদের তৈলচিত্র, শ্বেত পাথরের মূর্তি ও ফুলদানি, চীনে মাটির জন্তু-জানোয়ার, হুইস্কি-ব্র্যান্ডি, মুরগি-মটন ইত্যাদির অভাব ছিল না, অন্যদিকে তেমনি শালগ্রাম শিলা থেকে আরম্ভ ক'রে, দোল-দুর্গোৎসব অবধি হিন্দুদের প্রত্যেক পূজা-পার্বণ সমান সম্মান পেত ; এবং এই দুই বিপরীত বিধানের কোন্‌টা তাঁকে টেনেছিল ভক্তির সূত্রে আর কোন্‌টা ভয়ের গুণে, সে-সম্বন্ধেও নিরুক্তির অবকাশ নেই। আপাতত দু-নৌকায় পা রেখে, তিনি এমন অটলভাবে ভবনদী পেরিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁকে নিরপেক্ষ মনে করাই হয়তো সবচাইতে সঙ্গত। অন্তত পক্ষে এ-কথা ভাবায় দোষ নেই যে বিষ্ণুচরণ বৈষয়িক প্রয়োজনকে আধ্যাত্মিক প্রেরণার চেয়ে বড়ো ব'লে মানতেন ; তিনি জানতেন যে আচার আর চারের মধ্যে বিন্দু-বিসর্গের প্রভেদ নেই, অনুষ্ঠান মাত্রেই রুই-কাৎলাকে ছিপে গাঁথার উপায়। মাঝে-মাঝে যখন দেব-দেবী ছাড়া চলত না, তখন তিনি ফেলতেন মন্ত্র-তন্ত্রের

জাল ; আবার কার্যগতিকে সাহেবসুবোকে দরকার পড়লে তাঁকে নিতে হ'ত বিলেতি মসলার শরণ। আসলে আর্য-ম্লেচ্ছ কাউকে অযথা আশকারা দিতে তাঁর মন, সরত না — এমন-কি, একমাত্র পুত্র হরিচরণকেও নয়।

সত্য বলতে কী, শুধু বিষ্ণুচরণ কেন, পিতা মাত্রেই ভাবতে বাধ্য যে হরিচরণের মতো পুত্র দুরদৃষ্ট। তার অন্তঃকরণ স্বভাবত নরম ছিল বটে, কিন্তু আরো স্বাভাবিক ছিল তার বেতসীবৃত্তি। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা যে-অভ্যাসকে জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা-রূপে দেখতে শিখেছেন, সেই ন্যূনতম চেষ্টার ধর্মে হরিচরণ দীক্ষা নিয়েছিল প্রাক্তন প্রেরণায়। তবে এ-কথা ঠিক যে সময় থাকতে ছেলের চরিত্রগঠনে মন দিলে, বিষ্ণুচরণ তার সাত জন্মের সংস্কারকেও সংস্কৃত করতে পারতেন। কিন্তু দেবতাদের অনেক ভয় ও লোভ দেখানোর পরে হরিচরণ যখন ভূমিষ্ঠ হ'ল, তখন তাঁর যৌবন তো বিগত বটেই, এমন-কি জরাও দ্বারাগত। সে-অবস্থায় তিনি ঠাওরালেন যে ছেলেকে মানুষ ক'রে তোলার মতো অবকাশ তাঁর মিলবে না ; তাই সে-পণ্ডশ্রমে বাকি জীবন না-কাটিয়ে, তিনি চক্রবৃদ্ধির সার্থক হিসাবে ডুবে গেলেন। কালে ধরা পড়ল যে তাঁর মৃত্যুভয় অমূলক ; কিন্তু এ-আবিষ্কারের বহু পূর্বেই সুলগ্ন ফুরিয়েছিল।

অবশ্য যে অদরকারী জিনিসটা সমাজে শিক্ষা নামে পরিচিত, তাতে হরিচরণ ইতিমধ্যে বেশ দখল দেখিয়েছিল ; চার-পাঁচজন মাস্টারের প্রযত্নে স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলো সে পেরিয়ে চলছিল রীতিমতো সুযশের সঙ্গে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্যে তার মেধা ততটা প্রশংসাভাজন নয়, যতটা দায়ী তার নিরীহতা। পড়ার চেয়ে কুঁড়েমিই হয়তো তাকে বেশি টানত ; কিন্তু পৈতৃক দণ্ডবিধির ধারায় উজান বেয়ে, সে যে-দু-একবার বিষ্ণুচরণের সামনে পৌঁছেছিল, সে-ক্ষেপ-ক-টার দুর্বহ স্মৃতি হরিচরণ বৃদ্ধবয়সেও ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। এ-রকম ক্ষেত্রেও বিষ্ণুচরণের গলা চড়ত না, কিন্তু হরিচরণের মুখে জবানবন্দি ফুটত বিনা-জেরায় ; এবং ছেলের ঊর্ধ্বশ্বাস বক্তব্য শান্তভাবে শুনে, বাপ যখন একদৃষ্টে তার দিকে চাইতেন, তখন তার মনে হ'ত তার অস্থি নেই, মাংস নেই, দেহ নেই, নিঃসঙ্গ, নীরব, নিরাশ্রয় ব্রহ্মাণ্ডে তার অনাবৃত আত্মাপুরুষ একজোড়া অপলক চোখের আকর্ষণ এড়াবার বৃথা চেষ্টায় কেবলি ছুটছে। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ত পিতৃকণ্ঠের গাম্ভীর্য ; এবং সেই বিলম্বিত আর পুত্রের চৌদুন উৎকণ্ঠা সঙ্গতের ধার ধারত না, শুধু পরস্পরের তাল কাটত। অথচ বিষ্ণুচরণের গোটা-গোটা কথার মধ্যে তিরস্কারের আভাস পর্যন্ত থাকত না ; এবং প্রায় প্রত্যেকবার তিনি এই ব'লে থামতেন, 'আচ্ছা এখন যাও ; কিন্তু মনে রেখো আমার সময় দামী, ভাবনারও অভাব নেই।' ততক্ষণে হৃৎকম্পের জলদে হরিচরণের কানে লাগত তালা ; এবং সে পালাবার পথ পেত না বটে, কিন্তু নিষ্কৃতির আদেশ তার মাথায় না-ঢুকে, বেগ জাগাত পায়ে।

অতএব সে শীঘ্রই শিখলে যে সুখের দুরাশায় স্বস্তিবিসর্জন নির্বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা ; এবং তার অকালপক্ক অনুমান যদিও তখনই ধরতে পারলে না যে অজ্ঞাতবাস কুরুক্ষেত্রের সূচনা, তবু সে শৈশবেই আবিষ্কার করলে যে বিষ্ণুচরণের মতো অন্তর্দর্শী পিতার অগোচরে থাকা যে-পুত্রের অনন্য অভিলাষ, তাকে গুরুমহাশয়দের প্রশংসাপত্র যতখানি আওতা দেয়,

সংক্রামক ব্যাধিও তেমন রক্ষাকবচের সন্ধান রাখে না। সে আরো দেখলে যে ব্যাপারটা খুব শক্ত নয় — মগজ পেটের মতো, অভ্যাসে তারও ভূরিভোজন সয়। তাছাড়া বাপের নজরে না-পড়াই ভালো ছেলে হওয়ার একমাত্র মুনাফা নয় ; তার ফলে খেলা নামক ধস্তাধস্তি, আড্ডা নামক হল্লা, ছুটি নামক হাঙ্গামা ইত্যাদিকেও অনায়াসে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

কপালগুণে তার শিক্ষকও মিলল উপযুক্ত। মহেন্দ্রবাবু ছিলেন সেকালের এক রোমহর্ষক এম.এ.। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও তাঁর ভোগে আসত ; কিন্তু প্রবেশিকা পাশের পরে ছ-বৎসর তিনি এমনই একাগ্রচিত্তে সরস্বতীর ধ্যানে মগ্ন রইলেন যে দেবীর পাষাণহৃদয়ও ভক্তের জন্যে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল ; এবং উপায়ান্তর না-দেখে, তিনি, মহেন্দ্রবাবুর চোখের মাথা খেয়ে, তাঁর প্রাণ বাঁচালেন। দৈবজ্ঞদের ভাবিকথন আরো একটা ক্ষেত্রে অপূর্ণ থেকে গেল ; যশোস্থানে ফাঁক পেয়ে, শনি তাঁর অর্থস্থান জুড়ে বসল ; এবং জজিয়তির আশা ছেড়ে, মহেন্দ্রবাবু অগত্যা নামলেন মাস্টারিতে। কিন্তু এখানেও সুনাম অর্জন তাঁর ভাগ্যে ছিল না। একনাগাড়ে দু-তিনটে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, তিনি মাস-কয়েকের মধ্যে মানলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা আর যাদুবিদ্যা ঠিক এক জাতের নয় : বড়োলোকের বাড়িতে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার জন্যে শেষোক্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তিই অপরিহার্য।

তবে অভ্যাসদোষ সহজে যায় না ; এবং ঘটনাচক্রে হরিচরণের ভার যখন তাঁর উপরে পড়ল, তখন মনের কোণে আশার বালাই না-রাখলেও, তিনি প্রকাশ্য সদুপদেশে নির্বন্ধাতিশয় দেখাতে লাগলেন ; এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাশার অঙ্ক হয়তো শূন্য ছিল ব'লেই, তাঁর নূতন ছাত্র তাঁকে অবিলম্বে স্তম্ভিত ক'রে দিলে। এতদিনে তিনি বুঝলেন মাটির মানুষ কথাটির যথার্থ তাৎপর্য কী। হরিচরণের তুলনায় মাটিও হয়তো যথেষ্ট নরম নয় ; তাকে মনে হ'ত একেবারে কাদায় তৈরি, পলি-পড়া আবাদের মতো নির্বিবাদ ও নির্বিচার। তার রসস্থ মনে অকালবৃদ্ধ মহেন্দ্রবাবুর শীর্ণ স্বপ্নও যেন মুহূর্তে পেলে আকাশকুসুমের পরিণতি। তিনি ভাবলেন, এইবাব বুঝি তাঁর জীবনেও শোধবোধের পালা এসেছে : দুষ্ট গ্রহের অত্যাচার, দুর্মুখ জগতের অবজ্ঞা, সে-সমস্তের দাদ তিনি এই একটি ছেলের সাহায্যে তুলবেন ; জজ কোন্ ছার, হরিচরণ উঠবে ভাইস্-চান্সেলারের পদে, এমন-কি — কিন্তু এখানে তাঁর উপবাসী কল্পনা সদ্যোজাগ্রত দুঃসাহসের অনুগমন করতে পারলে না, শুধু এইটুকু ব'লেই, তাঁকে ক্ষান্ত হতে হ'ল, 'তখন দেখা যাবে অন্ধ কে — আমি, না সমাজ, আমি, না ভগবান।'

পুত্র-পরিবার থাকলে, মহেন্দ্রবাবুর মনে হয়তো অতটা বিষ জমত না। কিন্তু বাংলা দেশে তখন নিরুদ্দেশ যাত্রার ধুম ; সোনার তরী বন্দরে-বন্দরে সার বাঁধেনি বটে, তবু একবার মানুষ মারলে, বাঘ যেমন মানুষ ছাড়া আর কোনো শিকার খোঁজে না, তেমনই সুলভ টাকার প্রথম স্বাদে আত্মহারা বাঙালি তখন ছুটেছে স্বর্ণমৃগের পিছনে। মহেন্দ্রবাবুর মতো অকিঞ্চন, অকুলীন, অসুস্থ পাত্রের অনূঢ় থাকাই সে-অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু অপুত্রকের কপালেও বাৎসল্যের বিড়ম্বনা দুর্ঘট নয় : বরঞ্চ তার বেলাতেই ব্যসনটা চক্ষুলজ্জার মাথা খায়। অন্ততপক্ষে মহেন্দ্রবাবু ছাত্রের সম্মতি চাননি ; তাঁর বুভুক্ষু ভালোবাসা পাওয়া মাত্র হরিচরণকে গিলে ফেলেছিল। তবে তাকে শুধালেও, সে না বলত না ; কারণ বিরোধের

নামেই তার আত্মাপুরুষ আঁৎকে উঠত। উপরন্তু কারও হৃদয়ে সর্বেসর্বা হ'তে পারা তার কাছে এতই অভাবনীয় ছিল যে সেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সামনে আত্মরক্ষা কোনোমতেই তার সাধ্যে কুলোল না। তার মনের অবিশ্বাসকুণ্ডলী কেমন যেন এলিয়ে পড়ল। তার মজ্জাগত জাড্যে কীসের একটা জাগরণ দেখা দিলে, আজন্মের সুবিধাবাদ কাটিয়ে, হরিচরণ একদিন পণ করলে যে অচির ভবিষ্যতে সে-ও মহেন্দ্রবাবুর যোগ্য হবে।

দুর্ভাগ্যবশত মানুষের জীবনে সিদ্ধিই সঙ্কল্পের একমাত্র পরিণতি নয় ; পণ করা যত সহজ, পণ ভাঙা হয়তো তার চেয়ে অনায়াস ; এবং আমরা যে-শূন্যের অন্তর্গত, তা স্বভাবত সর্বতোভদ্র ব'লেই, মনোরথের গতি অবাধ। কিন্তু পুরুষকারের সঙ্গে যদি সোনার পাথরবাটিই তুলনীয় হয়, তবু মানবধর্মে দুঃখবাদের স্থান নেই ; কারণ আমাদের ভাগ্যবিধাতাও পরিসংখ্যানশাস্ত্রের বিধান মানেন, এবং উক্ত বিধি গড়পড়তা পঞ্চাশবার যেমন সত্যপ্রতিজ্ঞের বাধ সাধে, তেমনই আর পঞ্চাশবার বাক্‌সর্বস্বের মুখে পড়ায় ফুল-চন্দন। অতএব সার্থকতার জন্যে প্রয়োজন শুধু নিরবধি কাল অথবা সুযোগের অনন্ত পুনরাবৃত্তি : অভিজ্ঞতার যতরকম প্রকারভেদ আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটা আয়ত্তে এলে, একদিন-না-একদিন হয়তো কেবল বিয়োগের সাহায্যে অমৃতযোগে পৌঁছনো যাবে। অন্ততপক্ষে অঙ্ক ক'ষে দেখানো সম্ভব যে অবিরাম কথা-কাড়াকাড়ি খেলতে পেলে, ছ-টা বানরে শেক্‌সপীয়রের সমগ্র রচনাবলি লিখে ফেলতে পারে, এবং তা যখন সম্ভব, তখন এতেও সন্দেহ নেই যে নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে ব্যাঘাত না-ঘটলে, হরিচরণও অবশেষে মহেন্দ্রবাবুর মুখ রাখত। সে-চেষ্টায় সে যে হার মানলে, তার জন্যে হয়তো মহেন্দ্রবাবুই দায়ী।

না, দায়ী কথাটা একটু বেশিরকমের কড়া শোনাচ্ছে। কারণ ভাইস্‌-চান্সেলারি অথবা তার চেয়ে আরো বড়ো লক্ষ্যভেদের ব্রহ্মাস্ত্র মহেন্দ্রবাবুর মতো অকারী মানুষের কাছে না-থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যদিক থেকে ভাবলে, আবার এটাও নিশ্চিত যে যারা আজন্ম অপদার্থ, তারা মনে-মনে কৃতকর্মাদের কৃপাদৃষ্টিতে দেখে। সে যাই হোক্‌, এ-কথা জোর গলায় বলা চলে যে মহেন্দ্রবাবু আসলে তাঁর ছাত্রের জন্যে কোনো পথই ছ'কে দিতে পারেন-নি, তিনি তাঁর প্রভূত বাগ্মিতা ব্যয় করেছিলেন উন্নতির বিপদ বর্ণনায়। উদাত্ত মুহূর্তে তিনি হরিচরণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-নাটক গড়তেন, তার নায়ক স্বেদ-ক্লেদ-মেদের ধার ধারত না ; মনে হ'ত সে যেন ঋষি-কল্পিত পরমাত্মা — নিরাকার ও নিরবদ্য ; তার কেবল গুণ আছে, দোষ নেই ; মহত্ত্ব আছে, ক্ষুদ্রতা নেই ; উদ্যম আছে, নৈরাশ্য নেই ; শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির অপচয় নেই।

'জগৎ', মহেন্দ্রবাবু বলতেন, 'মহত্ত্ব ছাড়া জগৎ চলতে পারে না। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ, প্রতিপত্তি, এমন-কি স্বাস্থ্য বা সামর্থ্য, এগুলোর কোনোটা অপরিহার্য নয়। দরকার কেবল নিজের উৎকর্ষে আস্থা রেখে, চারপাশের গাড়লদের এড়িয়ে যাওয়া। তারা চরছে, চরুক ; থাক্‌-না তাদের স্বাস্থ্য ; তাদের বুদ্ধিও তো সেই স্বাস্থ্যের মতোই ভোঁতা। কুকুর চাঁদকে দেখলে চেঁচায় ; কিন্তু সেইজন্যেই চাঁদ কি তার প্রতিযোগে নেমে আসবে? না, হাসতে-হাসতে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির উপর দিয়ে নিজের গন্তব্যে চ'লে যাবে? ধরো, আমি যদি

এই মূর্খদের কাছে বাহবা চাইতুম, তবে ক্ষতি হ'ত কার — তাদের, না আমার? ওদের সঙ্গে রেষারেষি মানেই নিজেকে খাটো করা। শঠই শঠকে হারাতে পারে, তেমনই জানোয়ারকে হটাতে পারে জানোয়ার। থাকুক ওরা ওদের খোঁয়াড়ে, ওদের পাশ কাটিয়ে চলো, ওদের চিৎকার সইতে শেখো ; কিন্তু ওদের কখনো ভুলতে দিও না যে, আমরা — আমরা —।'

মহেন্দ্রবাবু বক্তৃতা শেষ করতেন না ; কিন্তু তাতে হরিচরণের দুঃখ ছিল না। সে অত কথার ধার ধারত না, এমন-কি সমস্তটা তার মাথায় ঢুকত কি-না সন্দেহ। তবে যেটুকু সে বুঝত, তাতে তার সম্মতি ছিল এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে তার সমগ্র বোধশক্তি সেই সহজাত কুটুম্বিতার রহস্যে তন্ময় হ'য়ে যেত ; মাস্টারমশাইয়ের স্বীকারোক্তি শোনার অবকাশও সে পেত না। অতএব তার অমনোযোগে হৃদয়ের অভাব খুঁজে লাভ নেই ; এবং সত্যই সে মহেন্দ্রবাবুকে যতখানি ভালোবেসেছিল, ততখানি বা সে-ধরনের নিষ্কাম ও সশ্রদ্ধ ভালোবাসা সে কখনো আর কাউকে দিতে পারেনি। এমন-কি বিষ্ণুচরণের সঙ্গে তার একমাত্র সঙ্ঘর্ষের কারণও বোধহয় মহেন্দ্রবাবু।

একদিন হরিচরণ মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বোট্যানিক্যাল বাগানে বেড়াতে যাবে ব'লে প্রস্তুত, এমনসময়ে সদর দরজার কাছে এক বৃদ্ধ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। শশব্যস্ত হরিচরণ খবর নিয়ে জানলে যে বুড়ো তাদেরই একটা বস্তির প্রজা ; এক বছরের খাজনা বাকি পড়ায় আদালত থেকে তার উচ্ছেদের হুকুম হয়েছে। 'আমি কী করব', ব'লে সে পাশ কাটিয়ে পালাবার উপক্রম করছিল ; কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর নিবদ্ধদৃষ্টি তাকে থম্‌কিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ বললে, 'বাইশ বছর আপনাদের আশ্রয়ে আছি, ধর্মাবতার ; কখনো কোনো কিস্তির খেলাপ হয়নি। আট মাস আগে জোয়ান ছেলেটা একদিনের ওলাওঠায় মারা গেল। তাই — ।' বেচারা আর এগোতে পারলে না, নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু অশ্রুর দমক থামল না, তাকে চোখ বুজে, মাথা নোয়াতে হ'ল।

এতে হরিচরণের মন যে খুব ভিজল, তা নয় ; কিন্তু তার চোখে যেন অনুকম্পার ছোঁয়াচ লাগল ; দুরবস্থা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সে উগ্র স্বরে বললে, 'তা, আমার কাছে এসেছ কেন? বাবা সাতদিন বাদে কলকাতায় ফিরবেন, তখন তাঁকে জানিও।'

বৃদ্ধের চোখে তখনো জল শুকোয়নি। সে জবাব দেবার আগেই, চেঁচামেচি শুনে, বিষ্ণুচরণের গোমস্তা মারমূর্তি ধ'রে, তার সামনে এসে, হাত-পা নেড়ে বললে, 'ব্যাটার-ছেলে, আর কাঁদুনি গাইতে জায়গা পাসনি, তোকে-না চ'লে যেতে বললুম। ছোটোলোকদের ভালো কথায় কিছু হয় না, মুখের ওপর ঘা-কতক জুতো পড়লে তবেই শায়েস্তা —।'

বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে কেমন একটা সঙ্কোচ দেখা গেল, বিনামাপ্রহার যেন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ময়লা গামছার কোণে চোখ মুছে, সে নিরাশ, নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'রাগ করবেন না, গোমস্তাবাবু ; হুজুর হুকুম দিলেই চ'লে যাব। কিন্তু আপনি তো জানেন ঘর আমি ইচ্ছে ক'রে জুড়ে নেই। ছেলেটা মারা গিয়ে অবধি —।'

গোমস্তা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'দারোয়ান।' এই সুযোগে চুপিচুপি পালাবার মৎলবে, হরিচরণ মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকালে ; কিন্তু তিনি চোখ ফেরালেন না, ভুরু কুঁচকে আধোমুখে দাঁড়িয়ে

রইলেন। অগত্যা গোমস্তার আস্ফালনে বাধা দিয়ে, সে বুড়োকে বিরক্তির সুরে বললে, 'তকরার ক'রো না ; এখন কী চাও, শুনি।'

বৃদ্ধ কাতর কণ্ঠে জানালে যে পুত্রবিয়োগের পর থেকে স্ত্রীর স্বাস্থ্য একটু-একটু ক'রে ভাঙতে-ভাঙতে গত দু-হপ্তা সে একজ্বরী হ'য়ে প'ড়ে আছে ; অনেক হাতে-পায়ে ধরায় পাড়ার ডাক্তারবাবু একবার এসেছিলেন ; কিন্তু তিনি রোগীকে জবাব দিয়ে গেছেন ; আর ক-টা দিনেরই-বা ওয়াস্তা, এই ক-টা দিন যাতে তারা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পায় — এইটুকু তার আর্জি।

সে আবার সংযম হারিয়ে, হরিচরণের পায়ে হাত রেখে, বললে, 'ধর্মাবতার, ভগবান সাক্ষী, আমি আপনাদের ফাঁকি দিতে চাই না। নগদ এক আধলাও আর আমার নেই ; বুড়ি মারা গেলে পর যা দু-একখানা বাসনকোসন, গয়নাগাঁটি আছে, বেচে দেনা শোধ ক'রে চ'লে যাব। কিন্তু এই ক-টা দিন —।'

হরিচরণ কিছু বলার আগেই গোমস্তা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে শুরু করলে, 'তোমার পরিবারের শ্বাস হয়েছে ব'লে, আমাদের ভাড়াটে রাস্তায় ব'সে থাকবে? এখানে ও-সব ন্যাকামি চলবে না ; বড়োবাবু ব'লে গেছেন, আদালতের হুকুম পেলেই চুলের মুঠি ধ'রে ঘর থেকে বার ক'রে দিতে। দেখি তোকে কে রক্ষে করে।'

হঠাৎ হরিচরণের আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠল : এই সামান্য বিষয় নিয়ে কি তার সমস্ত বিকেলটা মাটি হবে? তাছাড়া বুড়োর আবদার তো এমন কিছু অন্যায় নয়। সত্যিই তো, বেচারা এই অবস্থায় যায় কোথা? অতএব সে কর্কশ গলায় গোমস্তাকে বললে, 'তুমি অত ওস্তাদি ক'রো-না দিকি!' তারপর আড়চোখে মহেন্দ্রবাবুকে দেখে নিয়ে, বৃদ্ধকে বললে : 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না ; বাড়িতে কেউ নেই, রুগী রেখে এসেছ, যাও, শিগ্‌গির ফিরে যাও! এ-ক-দিন আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

২

আদালতের পেয়াদা সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলে ; এবং বৃদ্ধও কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করতে-করতে মুমূর্ষু স্ত্রীর শয্যাপ্রান্তে ছুটল ; কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই চুকল না। শহরে ফিরতেই ঘটনাটার শাখা-সমন্বিত ইতিহাস যখন গোমস্তার মারফতে বিষ্ণুচরণের কানে পৌঁছল, তখন তাঁর অটল ধৈর্যও কিছুক্ষণের জন্যে ভেঙে পড়ল। অবশ্য তিনি তখনই বুঝলেন যে জিনিসটা আসলে অতি তুচ্ছ ; কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে তিনি শিখেছিলেন যে কড়া-ক্রান্তি যার নজর এড়িয়ে যায়, তাকে দশ-বিশ লাখের হিসাব রাখতে দেওয়া নেহাৎ মিছে! তাঁরই ছেলে! তার কি এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? একটা কোথাকার দাগাবাজ এসে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেললে, আর জন্ম-জন্মান্তরের শিক্ষা-সংস্কার ধুয়ে-মুছে সাফ হ'য়ে গেল। হঠাৎ বিষ্ণুচরণ চোখে অন্ধকার দেখলেন ; তাঁর সন্দেহ রইল না যে তাঁর জীবন ব্যর্থ, তাঁর সাধনা বৃথা, এতদিন ধ'রে প্রাণপাত ক'রে তাঁর বিষয়বৃদ্ধি, সে কেবল পাঁচ ভূতের নাচের আসর জমাবার জন্যে।

আসন্ন সর্বনাশের অপচ্ছায়া তাঁকে যেন গিলতে এল ; এবং আরব্ধ ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কে নায়কের ভূমিকা তাঁর কাঁধে চাপবে না জেনেও, তিনি যেমন আশ্বস্ত হলেন না, তেমনই সে-পদে হরিচরণের নিয়োগ অবশ্যম্ভাবী বুঝেও, তাঁর ঔচিত্যবোধ তৃপ্তি পেলে না। বরং তাঁর সবল আত্মপ্রতিষ্ঠায় ঘুণ ধরল, এবং সেই সঙ্গে তিনি না-মেনে পারলেন না যে মানুষের মহত্তম প্রচেষ্টা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ফুৎকারজাত বুদ্বুদের চাইতে অচিরস্থায়ী। তারপর অদৃষ্টের অবিচারে জীবনধারণ তাঁর অসহ্য ঠেকল ; এবং তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে দেব-দেবীরা আসলে আজকালকার ঝি-চাকরের মতো। তাদের পারিশ্রমিক যে-পরিমাণে বাড়ে, পরিশ্রম কমে সেই অনুপাতে ; এবং শেষ পর্যন্ত তারা কেবল চায়, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। উপরন্তু যদি কোনো কারণে তাদের নিরন্তর প্রত্যাশা অপুরস্কৃত থেকে যায়, তবে ইহলৌকিক ইতরদের ন্যায়, তারাও শুভবুদ্ধির আপদ ঘুচিয়ে, অন্নদাতাকে মারতে ওঠে, এবং সে-অবস্থায় তাদের মনেও পড়ে না যে প্রভুশ্রেণীর উচ্ছেদে তাদেরই সমূহ বিপদ। এমন-কি অধিকারভেদ চুকিয়েও, তারা থামে না, যে-অহিংসা ও ধৈর্য, যে-আদানপ্রদান সমাজ-ব্যবস্থার মূল, তার গোড়ায় কুড়ুল চালায় ; এবং আশ্চর্যের কথা এই যে সমাজের অধস্তন স্তরে অরাজকতার নির্দেশ নামে দায়িত্বহীন দেবলোকের দৃষ্টান্ত থেকে।

অন্তরঙ্গের অভাব বিষ্ণুচরণকে এ-পর্যন্ত টলাতে পারেনি ; কিন্তু এইবার তিনি নিঃসঙ্গতার নিরুপায় যন্ত্রণায় নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেললেন। শিল্পগত আত্মপ্রকাশের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা হিংস্র না-হ'লে, এ-অবস্থায় তিনিও হয়তো সহৃদয় পাঠক নামক কপোলকল্পিত দাতাকর্ণের কাছে অপরিমেয় অনুকম্পার আবেদন পাঠাতেন। কিন্তু দুঃসময়েও সাহিত্যপদবাচ্য বাচাল উচ্ছ্বাসের শরণ নিতে তাঁর বিবেকে বাধল ; এবং সেইজন্যে তিনি গ্রীক নাট্যকারদের প্রতিধ্বনি ক'রে এ-কথা বলার প্রয়াস পেলেন না যে, নিরাপদে শেষ শয্যায় না-পৌঁছে যে-মানুষ সুখী পদবী চায়, সে জন্মমূঢ় ; তখন তাঁর মনে পড়ল যে তিনি হৃদ্‌রোগী, এবং হৃদ্‌রোগীর মৃত্যু যেমন অনিশ্চিত, তেমনই অনিবার্য। সঙ্গে-সঙ্গে হরিচরণের অপ্রতিকার্য অপদার্থতার বিষয়েও তাঁর সব সংশয় চুকল। কারণ স্মার্ত পণ্ডিতের বংশে জন্মালেও বিষ্ণুচরণ নৈয়ায়িকদের কৃপার চক্ষে দেখতেন ; অন্ততপক্ষে তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না যে নির্বিকল্পের বিচারে কাকতালীয় ন্যায় হাস্যকর বটে, তবু তাছাড়া কর্মবীরের গত্যন্তর নেই। সুতরাং যেই তাঁর স্মরণে এল যে তাঁর পুত্রলাভ উক্ত রোগের পার্শ্ববর্তী, তৎক্ষণাৎ তিনি এ-সিদ্ধান্তেও সায় দিলেন যে পুত্রই তাঁর শনি, এবং পুত্রের অনাচারেই তাঁর অপঘাত ঘটবে।

ইতিমধ্যে হরিচরণের বয়স অবশ্য আঠারো বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল ; এবং তার আসার পরে, কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতিতে নয়, অবিরত শ্রীবৃদ্ধিতেও বিষ্ণুচরণ সমসাময়িকদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। উপরন্তু স্বার্থের খাতিরে সত্যের অপলাপ বিষ্ণুচরণের কাছে যদিও নিত্যকর্মের অগ্রগণ্য ছিল, তবুও তথ্যের অবমাননা সর্বদাই তাঁর দুঃসহ লাগত ; এবং সেই-জন্যে পুত্রের সম্বন্ধে তাঁর তদানীন্তন মনোভাবে মতিভ্রমের সাক্ষ্য না-খুঁজে, আমাদের মানা উচিত যে প্রমাণের অভাব যুক্তির সাহায্যে ঘুচিয়ে, তিনি সেদিন ভেবেছিলেন যে হরিচরণ মাতৃহন্তা ব'লেই পিতৃদ্রোহী। দর্শন-বিজ্ঞানের ধার না-ধারলেও, বিষ্ণুচরণ জানতেন যে

দৈনন্দিন জীবনে কার্যকারণের শৃঙ্খলা অকাট্য ; এবং সহধর্মিণীর অকালমৃত্যুর যে-ব্যাখ্যা তাঁর পরিচিতবর্গের সমর্থন পেয়েছিল, সেটার বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গতিবোধ তুলত তুমুল তর্ক। তাঁর স্ত্রী মনের দুঃখে মারা গেছেন — এই জনরব কতখানি ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার পরিচায়ক, তা বিষ্ণুচরণের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি হাড়ে-হাড়েই বুঝতেন ; এবং সত্য বলতে কী, পারিপার্শ্বিক বিদ্বেষ তাঁর আত্মপ্রসাদ জাগিয়ে দিত। কিন্তু হিংসা উদ্রেকের অনেক পদ্ধতি আছে : তার জন্যে মন অভিধেয় অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব-স্বীকার অনাবশ্যক ; এবং মাঝে-মাঝে উক্ত উপসর্গের অবতারণা অনিবার্য বটে, তবু তার উৎপাতে দেহপাত সম্ভব, এমন আষাঢ়ে গল্প একেবারে অসার্থক।

তার চেয়ে এ-রকম অনুমান অনেক সহজ যে হরিচরণের মায়ের মতো দুর্বল স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্ভধারণের কষ্ট দুঃসহ এবং পুত্রপালনের হাঙ্গামা মারাত্মক। অবশ্য এমন বিশ্বাসের সাহায্যেও তাঁর পত্নীবিয়োগের দায় হরিচরণের উপরে এসে পড়ে না। কিন্তু স্থানে-অস্থানে হেতুবাদের গান গাইলেও, ভূয়োদর্শী বিষ্ণুচরণ একাধিকবার দেখেছিলেন যে মানুষ মাত্রেই কোনো একদিন অহেতুকের শরণ নিতে বাধ্য ; এবং সেইজন্যে তাঁর বোধ হয়েছিল যে পৈত্রিক সম্পত্তি নিঃসঙ্কোচে উড়িয়ে দিতে যে-ছেলের এতটুকু ভাবনা নেই, মাতৃহত্যার অপবাদ তাকে বেশ মানায়। পক্ষান্তরে এ-কথা নিশ্চয়ই স্মরণীয় যে অনুরক্তি আর অনুকম্পার পথ্য ব্যতীত অনেক জীব বাঁচে না ; এবং তারা সচ্ছলতার অভাবকে যদিও বহুদিন পর্যন্ত উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে তবু উল্লিখিত অবস্তুদুটোয় সত্যকার টান ধরলে, তাদের প্রাণসংশয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এমনতর আশুক্লান্ত প্রাণীদের অস্তিত্ব-কল্পনা বিষ্ণুচরণের সাধ্যে কুলোত না ; এবং যেহেতু জীবন-নির্বাহনীতির অনেকখানিই দুর্বিষহকে এড়িয়ে যাওয়া, তাই তাঁর দাম্পত্যজীবনে মমতার অনটন তিনি কখনো অনুভব করতেন না। অনুভব করলেও, তাঁর আচার-ব্যবহার একটুও বদলাত না। কারণ হরিচরণ জন্মাবার ঠিক আগে ও পরে বিশ্রাম্ভালাপ দূরের কথা, বিষ্ণুচরণ মরবার অবকাশ-সুদ্ধ পেতেন না। সে-যুগে প্রায়ই তিনি কাজে বেরোতেন ভোর ছ-টায় ; স্নানাহার কোথায় কেমন ক'রে সারতেন, তা অনেকসময় নিজেও মনে রাখতে পারতেন না ; এবং রাত্রি দশটা-এগারোটায় যখন শ্রান্ত দেহে ও সুপ্ত মনে বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রেমালাপ থাক্, চাকর ডেকে, বেশ পরিবর্তনও প্রত্যহ তাঁর ঘ'টে উঠত না।

বিষ্ণুচরণ তখন ভাবতেন ত্রিভুবনে কাম্য শুধু ঘুম, ঘুম, মৃত্যুর সহোদর ঘুম। স্বভাবের কার্পণ্যবশত তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের উপদ্রব ভালোবাসতেন না ; কিন্তু নিঃস্বপ্ন নিদ্রা মরণেরই নামান্তর ব'লে, উক্ত দৌরাত্ম্য তাঁকে অগত্যা মানতে হয়েছিল ; এবং তাঁর কর্মপ্রবৃত্তি ছিল এমনই ব্যাপক যে সাধারণত সুপ্তাবস্থাতেও তিনি আয়-ব্যয়ের অঙ্ক কষতেন। তবে ক্বচিৎ-কদাচিত সে-স্বপ্নের রূপান্তর ঘটত ; এবং তারপর যে-ছবি তাঁর মুদ্রিত চোখের সামনে ভেসে উঠত, তাতে প্রকাশ পেত এক অমানুষিক হেমন্ত-সন্ধ্যার অচিন্ত্য বিবিক্তি। সে-সময়ে তিনি দেখতেন কোনো অবাধ প্রান্তরের প্রান্তে একটা বরফের পাহাড় নীল আকাশের নিচে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে : তার পিচ্ছিল অতট অস্তগামী সূর্যের কিরণে স্বর্ণাভ ; এবং সেই

অসম্ভব খাড়াই বেয়ে তিনি উপরে চড়ছেন অতি সন্তর্পণে, প্রাণপাত পরিশ্রমে। তাঁর গন্তব্য পাহাড়ের অভ্রভেদী চূড়া। সেখানে যে-শিশুটি মুখ ঢেকে তাঁর অপেক্ষা করছে, সে তাঁরই সন্তান। অথচ সে নিরতিশয় দুর্লভ ; তার কাছে যাওয়ার পথ পথ নয়, পথের বিড়ম্বনা ; এবং সেই দুর্গম শিখরে পৌঁছুতে যে পরিমাণ একাগ্রতার প্রয়োজন, তা তাঁর নেই ; কারণ খাতের আড়াল থেকে উপহাসকের অদৃশ্য দল অশ্লীল হাসি হেসে, কেবলই তাঁর একাগ্রতা ভেঙে দিচ্ছে।

প্রতিবার ঠিক এইখানে এসে তাঁর স্বপ্ন কেটে যেত, এবং ক্ষোভে ও শ্রান্তিতে গলদ্‌ঘর্ম বিষ্ণুচরণ চোখ মেলে চাইতেন অন্তর-বাহিরের রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে। তারপরে আবার ঘুমনোর চেষ্টাও তাঁর সাহসে কুলোত না ; এবং জানালার দিকে তাকালেই ধরা পড়ত যে দিনের কর্মনিষ্ঠা সুদূরপরাহত। তখন সুষুপ্ত পত্নীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কী করার আছে, তা তাঁর মাথায় আসত না। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনীর অচেতন দেহে উত্তেজনা উৎপাদন যদিও শক্ত ছিল না, তবু সে যে জীবন্ত, ডাকলে সত্য-সত্যই সাড়া দেবে এমন কল্পনাও হাস্যকর লাগত। খানিকক্ষণ নিরুৎসুক চেষ্টার পর কেমন একটা নির্বিশেষ বিষাদ তাঁকে যেন ছেয়ে ফেলত ; এবং তাঁর মনে হ'ত আদিরসের মাধুরী নিছক রূপকথা। কিন্তু সময়ে-সময়ে তাঁর সমাহিত সংযমের পরতে-পরতে জমতে থাকত অকথ্য অভিযোগের বিষ ; এবং বরফ-ঢাকা আগ্নেয় পাহাড়ের মতো মনের আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে তিনি ভাবতেন যে দুর্গ্রহের দারুণ ঋষ্টিতে তিনি জন্মেছেন ব'লেই তাঁর জীবনে পাশব পরিশ্রম রয়েছে, নেই মানবীয় বিশ্রাম ; স্ত্রী রয়েছে, নেই সংসার ; প্রভূত সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আজ পর্যন্ত অনাগত। তেমন রাত্রে অভ্যস্ত মিতভাষণ তাঁর শ্বাস চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাত, চর্যার বারণ সত্ত্বেও মন চাইত অমানুষিক অত্যাচারে উদাসিনীকে তিনি বিধ্বস্ত করেন, এবং তারপরে, তার অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটা অনির্বাণ যাতনায় জেগে উঠলে, তাকে শোনান তাঁর প্রচ্ছন্ন ধিক্কারের অফুরন্ত ইতিহাস, তাঁর বঞ্চনাবোধের দুঃখ, তাঁর দুরাশার অনির্বচনীয় উন্মাদনা।

সৌভাগ্যক্রমে এইধরনের অসংহত ভাবকে ভাষায় গাঁথার জন্যে সময় তিনি কখনো যোগাতে পারতেন না ; অভিপ্রায়ের সঙ্গে অভিব্যক্তির সন্ধি হবার অনেক আগেই ভোরের সুস্থ আলো আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ লজ্জা থেকে তাঁকে বাঁচাত। কিন্তু একদিন এই ভ্রান্তিবিলাস নাটিকার ক্রমানুবর্তনে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা দিলে — সে তার শেষ অঙ্কে, প্রায় শেষ দৃশ্যে। আজ উনিশ বৎসর বাদে বিষ্ণুচরণের হঠাৎ মনে পড়ল যে সেদিনে তাঁর ক্লান্তি মাত্রা ছাপিয়েছিল, এবং পরবর্তী নিঃস্বপ্ন নিদ্রার আর যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না। সেদিন তিনি প্রায় তাঁর আদর্শে পৌঁছেছিলেন — এমন ঘুম তাঁকে ঘিরেছিল যার মধ্যে মৃত্যুভয় প্রবেশপথ পায়নি, সর্বত্র ছড়িয়েছিল মৃত্যুর নিরুপাধি নির্বাণ। তাহ'লেও সে-মহানিদ্রা টেঁকেনি : কোথায় বুঝি চেতনার একটু লেশ থেকে গিয়েছিল ; এবং সেই ছিদ্র বেয়ে, তাঁর কানে এসেছিল যেন এক বিশ্বব্যাপী উপনিপাতের আকস্মিক নির্ঘোষ। তখন অনাদি অসূর্যের অশেষ ভার ঠেলে, চোখ খুলতে তাঁর সমস্ত শক্তি ফুরিয়েছিল ; এবং বোধহয় সেইজন্যেই

তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেননি যে সুষুপ্তির গভীরে যে-শব্দকে শুনিয়েছিল বাইবেল-বর্ণিত প্রলয়তূর্যের মতো — আসলে তা পার্শ্বস্থ পত্নীর জাগ্রত কণ্ঠস্বর।

তারপরেও ঘুমের ঘোর কাটতে চায়নি ; এবং ইতিমধ্যে 'টাকার পাহাড়', 'মনের পাওনা', 'বাঁচার লজ্জা' ইত্যাদি একাধিক সুপরিচিত বাক্য বিষ্ণুচরণের গোচরে এলেও, সে-কথাগুলোর পরস্পর সম্পর্ক অথবা স্ত্রীর প্রকৃত বক্তব্য তাঁর মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও তিনি লক্ষ না-ক'রে পারেননি যে সঙ্গিনীর নরম গলায় যেন প্রভুত্বের নির্বন্ধ লুকিয়ে আছে, তার অযাচিত আত্মনিবেদনে যেন উহ্য রয়েছে বিজয়ার দর্প। অনভ্যস্ত হ'লেও, এই অনুক্ত দাবির উত্তর বিষ্ণুচরণের অবিদিত ছিল না। কিন্তু তাঁর চরিত্রগত দার্ঢ্য তখনো মূর্ছাপন্ন। অতএব সর্বনাশা হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে মুখস্থ বক্তৃতাও যথাকালে তাঁর মনে পড়ল না ; এবং এই অন্যায় যুদ্ধে আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় ভেবে না-পেয়ে, তিনি তাঁর অবসন্ন হাতখানাকে সহধর্মিণীর কাঁধে রাখলেন মিনতির ভানে। পরবর্তী ঘটনা অবচেতনার অন্তর্গত ; এবং সম্ভবত সেইজন্যেই তাঁর দিশাহারা, দিনান্ধ স্মৃতি বহুদিন পর্যন্ত কত শত অতল গহ্বরে কী যেন খুঁজে বেড়ালে, অন্ধকার আকাশের অসীমে কার অভিসারে ছুটল, এবং শেষকালে গ'লে-গ'লে, মিশিয়ে গেল অব্যক্তির নিরুদ্দেশে। শুধু একটা পরাভববোধ অতঃপর তাঁর সঙ্গ নিলে ; এবং সেই লজ্জাকর অনুভূতি আরম্ভে অসংহতরূপে দেখা দিয়ে, পরিণামে ধরলে তাঁর আপাতনম্র স্ত্রীর মূর্তি। তথাচ তার কটাক্ষ এড়ানোর সুযোগ মিলল প্রায় অবিলম্বে ; এবং হপ্তা-কয়েক বাদে তিনি যখন শুনলেন যে পত্নী অন্তঃসত্ত্বা, তখন হিতবুদ্ধির অছিলায় শোবার ঘর বদ্‌লে, তিনি হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

তারপর? তারপর বিষ্ণুচরণ তাঁর পত্নীকে আর সহধর্মিণী ব'লে ভাবতে পারলেন না, তাকে দেখতে লাগলেন পুত্রের ধাত্রী হিসাবে ; এবং তাঁর জীবনে যেহেতু অবৈধতার অবকাশ ছিল না, তাই প্রবৃত্তির আপদ একেবারে না-চুকলেও, স্ত্রীসংসর্গ তাঁর কাছে অসম্ভব ঠেকল। উপরন্তু ইন্দ্রিয়সেবা শুধু পাত্রের মুখাপেক্ষী নয়, তার জন্যে অনুকূল স্থান ও কাল অত্যাবশ্যক; এবং শেষোক্ত উপাদানদুটোর অভাব ঘটেছিল ইতিপূর্বেই। কারণ কলকাতার মতো প্রকাণ্ড শহরেও বিষ্ণুচরণের উদ্যম যেন বাড়তে পাচ্ছিল না ; অতৃপ্ত কর্মপ্রবর্তনার পথ্যসংগ্রহে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কলকাতার বাইরে, বাংলার বাইরে, এমন-কি ভারতের বাইরে। ফলে বছরে অন্তত আট মাস তাঁর বিদেশে-বিদেশে কাটছিল ; এবং বাকি চার মাসে এমন লহমা খালি থাকছিল না যাতে গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো যায়। তৎসত্ত্বেও স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে-সংবাদ ক্রমাগত তাঁর কানে আসছিল, তারপরেও আহার-নিদ্রায় তাঁর রুচি রইল বটে, তবু তাঁর দুর্বোধ্য দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। তবে তিনি জানতেন যে দুঃসময়েই ঠিকে ভুল সবচেয়ে বিপজ্জনক ; এবং অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, স্ত্রীর চিকিৎসাতে তেমনই তিনি, ব্যয়ের বহর দেখেও, কোনোরকম ত্রুটির ফাঁক রাখলেন না। কিন্তু শহরের সেরা ডাক্তারেরা-সুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হার মানলেন, জিতল যদৃচ্ছার দুর্ধর্ষ অব্যবস্থা ; এবং একদিন জরুরি তারের তাগিদে হাতের কাজ ফেলে মান্দ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে, তিনি শুনলেন যে তাঁর পত্নী আগের রাতে নিদানবহির্ভুক্ত অসুখে মারা গেছেন। অদৃষ্টের এই মোক্ষম চালে বিষ্ণুচরণ

মাৎ হলেন না, নিশ্চয় ; কিন্তু সেই গৈবী খেলোয়াড় তাঁকে রীতিমতো সন্ত্রস্ত ক'রে তুললে ; এবং আক্রোশ আতঙ্কের প্রকারভেদ ব'লে, তাঁর অন্তরাত্মা সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষেপে উঠল যে অন্তর্হিত বোড়ে তাঁর বর্তমান দুর্দশার উপলক্ষ, তার উপরে।

আজ এত বছর বাদে, শয্যাকণ্টক সইতে-সইতে, বিষ্ণুচরণ যেন স্পষ্ট বুঝলেন স্ত্রীবিয়োগের দিনে তিনি কেন শোকে মুষড়ে পড়েননি, শিশু পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠেছিলেন ; এবং না-মেনে উপায় কী যে শোচনা একেবারেই চেষ্টার অপব্যয়? কারণ অতীত — অর্থাৎ যা নেই, তার অস্তিত্বস্বীকারে যদি-বা বিপ্রলাপ না-থাকে, তথাচ যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার গুণে ভূত বর্তমানে বেঁচে ওঠে, তাতে সাশ্রু মমতার লেশমাত্র নেই ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে এ-প্রশ্নও অবশ্যজিজ্ঞাস্য যাদের আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাগাল পাই না, তারা আসলে অনুপস্থিত কি-না। হয়তো তাদের পীড়নসাধ্য দেহই আদিভূতে মেশে, কিন্তু চক্রান্তের জালে আবহমানকাল আমাদের ঘিরে রাখে তাদের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ; তাদের স্বরূপ আর কখনো ধরতে, ছুঁতে পারা যায় না বটে, তবু তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বংশপরম্পরায় বিরোধেরই বীজ বোনে ; ধনুর্ধর হয়তো-বা মরে, তবে মরার আগে লক্ষ্যভেদের মন্ত্র শিখিয়ে যায় সন্তানকে। আকস্মিক উত্তেজনায় বিষ্ণুচরণ বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলেন, এবং শূন্য ঘরে পায়চারি করতে-করতে, নিরুত্তর রাত্রিকে শুনিয়ে-শুনিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'না, তা কখনো ঘটতে দেব না ; আমার বাড়িতে বিভীষণের জায়গা নেই। আমার কাছে যখন টাকাই সব, তখন আমার পয়সায় যারা মানুষ, তাদেরও আজীবন সুদ কষতে হবে।'

পরের দিন সকালেই বিষ্ণুচরণ ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। তবে ততক্ষণে তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন ; এবং তাঁর মুখ দেখে, হরিচরণ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে না তাঁর রাত কেটেছে কী ভয়াবহ, অথচ অশরীরী, দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কিন্তু সাময়িক দিব্যদৃষ্টির কল্যাণে সে যদি-বা ধরতে পারত পিতার গভীরে কতখানি বিষ মন্থনের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তাহ'লেও তার দুঃসাহস তখনই উবে যেত কি-না সন্দেহ। কারণ উপেক্ষিত উদারনীতির প্রাণপণ প্রবক্তা যে সেই, এই নাটকীয় আত্মনিয়োগের উন্মাদনায় সে সম্প্রতি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ; এবং যথাকালে দেখা গেল বটে যে সে স্বভাবত নির্ভীক নয়, বিদ্রোহের পাঠ, না-বুঝে, মুখস্থ করেছে মাত্র, তবু সেই ভ্রান্তিবিলাসের উপসংহারে যবনিকা নামতে তখনো ঘণ্টা-খানেক দেরি ছিল। ইতিমধ্যে পিতার কণ্ঠস্বর হরিচরণের কাছে বরঞ্চ হাল্‌কা ঠেকল ; এবং তাঁর হাবভাবে অপ্রত্যাশিত রূঢ়তার অভাব তার শুভবুদ্ধিকে সতর্ক হবার অবকাশ দিলে না।

এ-রকমের অন্যমনস্কতাও তার জীবনে এই প্রথম ; এবং পরে তার শত্রুরা যেমন তাকে হঠকারী বলার সুযোগ পায়নি, তেমনই তার পার্শ্বচরেরা জানত যে তার আপাতসরল চরিত্রে মূঢ়তার সংস্পর্শ নেই। কিন্তু ষোলো থেকে বিশ-বাইশ বছর পর্যন্ত বিপজ্জনক বয়সে মানুষ মাত্রেই অল্প-বিস্তর স্বপ্ন দেখে ; এবং ওই-সময়ে বিপাকবিমুখ হরিচরণও, ক্বচিৎ-কদাচিৎ ফাঁকা কথার ফাঁপা আওয়াজে মেতে, অজানার অভিসারে পা বাড়াত মন্ত্রমুগ্ধের মতো। অবশ্য বিজ্ঞের বিবেচনায় ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিও অমার্জনীয় ; এবং এ-কথা খুবই সত্য যে জীবনের এই অনন্য সঙ্কটে সে যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলত, তবে তার অদম্য ভোগস্পৃহার অভিলষিত

পরিতৃপ্তি অতখানি পিছিয়ে যেত না। কিন্তু এখানেও তার সপক্ষে অনেক কিছু স্মরণীয় ; এখানেও আমরা মানতে বাধ্য যে পদস্খলনের যতখানি প্ররোচনায় তার যতটুকু দুর্গতি ঘটেছিল, কর্মফল সাধারণত তত সহজে চোকে না।

তাছাড়া হরিচরণের নিগ্রহ শুধু মতিভ্রমেরই শাস্তি নয়, সে-প্রসঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর অসামান্য বাক্‌প্রতিভাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন যে মানুষ একদিকে ফাঁকি পড়লে, অন্যদিকে প্রাপ্যের অধিক পুরস্কার পায় ; এবং সর্ব বিষয়ে অকর্মণ্য মহেন্দ্রবাবু যে অন্তত ভাষাব্যবহারে অলৌকিক নৈপুণ্য দেখাবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই ব্যাপারে যেটা বিস্ময়াবহ, সে হচ্ছে তাঁর বাক্যের কৈবল্য, তাঁর নিষ্কাম বাগাড়ম্বর। লোকে অনেকসময়েই নিছক আলাপের খাতিরে কথা কয় বটে, কিন্তু বাক্যের পিছনে যে বস্তুর পটভূমি আছে, তা শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারে না। মহেন্দ্রবাবু আর সকলের উপরে টেক্কা দিয়েছিলেন এইজন্যে যে চেষ্টা করলেও, ভাষার ব্যবহারিক ভিত্তি তাঁর মনে থাকত না। অর্থাৎ তাঁর বাগ্মিতা ছিল আধুনিক যুগের বিশুদ্ধ কাব্যের মতো, যা শ্রোতার চিত্তকে কোনো বহিরাশ্রয়ের দিকে টানে না, তাকে মজায় ধ্বনিবিজ্ঞানের সার্বভৌম ও সার্বজনীন বিধিনিষেধের সাহায্যে। কিন্তু শুধু সাম্প্রতিক কবিরা নয়, গণপতিরাও প্রায়ই অনুরূপ মন্ত্রে সিদ্ধ ; এবং ঘটনাচক্রের ইতর-বিশেষ ঘটলে, মহেন্দ্রবাবুও হয়তো সাভোনারোলার পদাঙ্কে চলতে পারতেন। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ যখন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে গর্জে উঠত, তখন হরিচরণের সর্বাঙ্গে লাগত পুলক ; তখন যুক্তি, তর্ক বা অভিপ্রায়ের আভাসটুকুও দিবাস্বপ্নের বাধ সাধত না — কেবল তার শিরা-উপশিরায় ছুটে বেড়াত একটা উদ্দাম উৎসাহের বিদ্যুদ্‌বেগ।

অবশ্য মহেন্দ্রবাবুর আকাশবাণী যে একেবারেই অভিধানের ধার ধারত না, এমন অপবাদ অমূলক ; এবং তাঁর বক্তৃতায় কান পেতে, অর্থগ্রহণের প্রয়াস পেলে, ধরা পড়ত যে পৃথিবীতে যেমন দুঃখ ও দৈন্য, অনাচার ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নেই, তেমনই মহেন্দ্রবাবুর প্রিয়জনেরা প্রত্যেকে ধর্মযুদ্ধের অগ্রনেতা। কিন্তু রোমাঞ্চ আর বিচারবুদ্ধি কদাচিৎ পা মিলিয়ে চলে ; এবং দেহাত্মবাদের কল্যাণে হরিচরণের শারীরিক উত্তেজনা যে অব্যাহত কল্পনাবিলাসের সুযোগ যোগাত, তার লক্ষ্য ছিল সাধনাশূন্য সার্থকতা। তবে সৌভাগ্যবশত হরিচরণের জাগ্রত সুপ্তাবস্থা বেশিক্ষণ টিঁকত না ; তার অসার ভাবলোকের সীমা মেপে দিত প্রবল পরাক্রান্ত পিতার সুশাসিত সাম্রাজ্য ; এবং সে অনেক ঠেকে শিখেছিল যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় প্রকাশ্যে সেই প্রতাপশালী প্রতিবেশীর আধিপত্য মেনে নেওয়া।

কিন্তু এ-বারে যেহেতু অব্যবহিত প্রতিফলের প্রশ্ন ওঠেনি, উপরন্তু হুইটম্যানি শুভবাদের তাৎকাল্যে গুরুর সাধুবাদ শুনিয়েছিল প্রণবের মতো অমোঘ, তাই স্বভাবত স্থিতিস্থাপক হরিচরণ হিতবুদ্ধির নাম-সুদ্ধ ভুলতে বসেছিল। অবশ্য পরিণামচিন্তায় আত্মবিসর্জন দেওয়া কখনো তার ধাতে সইত না ; এবং যোগাযোগ অন্যরকমের হ'লে, সে যেমন অবিলম্বে বুঝত যে সেই প্রজা সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বেশ একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে, তেমনই

সঙ্গে-সঙ্গে হঠকারিতাখণ্ডনের উপায়ও তার মাথায় এসে যেত। কিন্তু সেদিন তারা যখন বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছল, তখন সারি-বাঁধা সেগো গামের চূড়ায় সোনার কাঠি ছুঁইয়েছে কার্তিকের অপরাহ্ন, এবং সেই মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত মহেন্দ্রবাবুর মুখে সক্রেটিসের গুণগান। অন্ততপক্ষে তখন তাঁর মনে পড়েনি যে উক্ত গ্রীক মনীষীর প্রভাবে একাধিক অপরিণতবয়স্কের অধঃপাত দেখেই, সমসাময়িকেরা তাঁকে যমালয়ে পাঠাতে চেয়েছিল ; এবং সেই ভুলের প্রসাদেই মহেন্দ্রবাবু নিঃসংশয়ের ঝোঁকে বলেছিলেন, 'অন্তর্দর্শীর কাছে যে-কাজ সৎ, তার ফলাফল নিয়ে কখনো মাথা ঘামিও না, হরিচরণ। মানুষের চৈতন্য একটা বৃহত্তর চৈতন্যের ভগ্নাংশ ; সেই শুদ্ধ চৈতন্যে যে-চেষ্টার উৎপত্তি, তার সাফল্যই নিশ্চিত নয়, তার পরিণামও মঙ্গলময়। নচেৎ প্রাচীনেরা মানুষকে আত্মজ্ঞ হতে শেখাতেন না, রটাতেন না যে পুণ্যকর্ম আর জ্ঞান এক ও অদ্বিতীয়। কারণ, শ্রেয় সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নেই ; তা তোমার বেলাও শ্রেয়, তোমার বাবার বেলাও, এবং তাকে চেনার একমাত্র উপায় জ্ঞান, আত্মজ্ঞান।'

ইষ্টের নির্দ্বন্দ্বে তার অধিকার যে জন্মগত, এ-কথা মাস্টারমশাইয়ের কাছেও সুপ্রকট জেনে, হরিচরণ বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদ পেলে বটে, কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর নিরুদ্বেগ হাব-ভাব তার পছন্দ হ'ল না। হয়তো তার সহজ বুদ্ধিই তাকে দেখিয়েছিল যে সার্বজনীন বোধি চিরাচরিত বিবেকের ছদ্মবেশ মাত্র ; এবং তাই গুরুদেবের বক্তৃতায় সায় দিতে-দিতেও, সে ভাবতে পেরেছিল যে সক্রেটিক্ আত্মজ্ঞান কেবল তাদের পক্ষে সম্ভব, যারা মহেন্দ্রবাবুর মতো কাণ্ডজ্ঞানে একেবারে বঞ্চিত। তবে এটা যে দোষ ধরার সময় নয়, তাতে তার সন্দেহ ছিল না ; এবং তাই তিনি থামলে, সে শুধু অভিযোগের সুরে বললে : 'বাবাকে তো আপনি চেনেন না ; সেইজন্যে মহাপুরুষদের নজির বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে ভালো ক'রে জানি ব'লেই আমার সন্দেহ হয় যে তাঁর শরীরে হয়তো রক্ত-মাংসের লেশ নেই। জগতে টাকা ছাড়া আরো কিছু আছে, জীবনে সদাসর্বদা চলছে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব, এমন আশঙ্কাও তাঁর মাথায় আসে না। তাঁর কাছে সুবিচারের আশা — হুঁঃ।'

মহেন্দ্রবাবুর মুখে কিছুক্ষণ কথা সরেনি ; তারপরে ভিজে চোখ আকাশে তুলে, তিনি অত্যন্ত করুণ গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা যদি হয়, তবু শোক পেও না, হরিচরণ ; বরং যীশুর অনুকরণে ভগবানকে তোমার পিতার অজ্ঞানতা ক্ষমা করতে ব'লো। এটা যেন সব-সময়ে মনে থাকে যে সৃষ্টির শুরু থেকে সকল মহাপুরুষকেই অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছে। তুমিও যদি অগ্নিপরীক্ষা পেরোতে পারো, তবে হয়তো তুমিও বসবে তাঁদের সঙ্গে একাসনে ; আর তখন পিতৃস্নেহের দরকার পড়বে না ; একজন মানুষের যে-স্নেহ তুমি হারাবে, তার লক্ষগুণ, কোটিগুণ ভালোবাসা তোমাকে দেবে বিশ্ববাসী। বিড়ম্বনা মাত্রা ছাড়ালে, বিপদ সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠলেও, মনে রেখো যে যোগ্যকেই ভগবান ডেকে নেন সঙ্কটের মধ্যে। তোমার জীবনে এইটাই অমৃতযোগ ; প্রাণ গেলেও, একে ফিরিও না।'

এরপর সাতদিন হরিচরণ মুখ খোলার অবসর পায়নি, কেবল কান পেতে ছিল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উদারনীতির অফুরন্ত আত্মকথায় ; এবং আস্তে-আস্তে সেই শান্তিপ্রদ বাক্যস্রোতের

অবিরাম কল্লোলে সে এমনি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ল যে শেষের কয় রাত্রি তার অভাবে সে যেন ঠিকমতো ঘুমুতে পারলে না। মানুষকে তলিয়ে দেখার তাগিদ সে কখনো অনুভব করেনি, সত্য ; তবু পিতার চিন্তাধারায় তার দীক্ষা ঘটেছিল হয়তো-বা প্রাক্তন পরিচয়ের সূত্রে। অন্ততপক্ষে সে-ও বিষ্ণুচরণের মতো অন্তরে-অন্তরে জানত যে সর্বহারাদের সঙ্গে তার প্রভেদ জন্মান্তরীণ, এবং এই প্রভেদকে আবহমানকাল বজায় রাখাই তার কর্তব্য, তথা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কিন্তু পিতা যেখানে মনোভাব গোপন অনাবশ্যক মনে করতেন, পুত্র সেখানে আত্মরতির সুযোগ খুঁজত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ে ; এবং তার গুরুভক্তি উক্ত আত্মম্ভরিতারই রূপান্তর কি-না, তা-ও বিবেচ্য। বুদ্ধি দিয়ে না-বুঝলেও, সে হয়তো অবচেতনার সাহায্যেই ধরতে পেরেছিল যে সমাজে মহেন্দ্রবাবুর মতো মরীয়াদের সংখ্যাই অধিক ; সুতরাং তাদের চটালে চলবে না, তাদের ভাবতে দিতে হবে যে আসলে তারাই জগতের অভিভাবক, তাদের পরামর্শ ব্যতীত, তাদের সমর্থন ভিন্ন, সমাজপতিদের জীবন অতিষ্ঠ।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে ; এবং মহেন্দ্রবাবুর মতো আশুতোষ মানুষকে খুশি করার জন্য আয়কর সম্পত্তির অবমাননা যে অপব্যয়, এমন একটা আশঙ্কা তাকে পেয়ে বসেছিল। অবশ্য অতঃপর মাস্টারমশাই যে আমরণ তার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবেন, সে-বিষয়ে হরিচরণের এতটুকু সন্দেহ ছিল না ; এবং সেই সঙ্গে এ-কথা ভাবতেও তার ভালো লাগছিল যে মহেন্দ্রবাবুর মতো বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ মানুষকেও সে যখন স্তোক্‌বাক্যের দ্বারা বশ মানিয়েছে, তখন বিষ্ণুচরণের মতো স্থূল প্রকৃতির মানুষকে মুঠোর মধ্যে আনা তার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব। এই চেষ্টার ফল ফললে, একটা সামান্য সম্পত্তির কয়েকদিনের আয় ছেড়ে দেওয়া শুধু যে সঙ্গত নয় অবশ্যকর্তব্যও বটে, তা হরিচরণ অনায়াসে বুঝেছিল, এবং বুঝেছিল ব'লেই, সে ঠাউরে নিয়েছিল যে মাস্টারমশাইয়ের প্ররোচনা ভিন্ন তার এক দণ্ড চলবে না।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ (আদিরচনা : ১৯৩২। পরিবর্তিত।)

ফাঁকি

আমার তখন বাইশ কি তেইশ বছর আন্দাজ বয়স হবে। সবে পরীক্ষাগুলার বোঝা নামিয়ে উপাধি-শোভিত শির [শামলা] আকাশে তুলে সগর্বে বেড়ানোর সুখ অনুভব করছি। মুক্তির আস্বাদ পেয়ে চারদিকে মুক্তির সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। পশ্চিমের প্রসর্পিত প্রতীতি-সমূহের উদ্দীপনায় আমার মন তখন উদ্ভাসিত ; বিয়েটা একটা কুসংস্কার এবং ভীতির জিনিস ব'লেই জ্ঞান করতাম। তাই যখন ঘটক-প্রভুদের গমনাগমন শুরু হ'ল, তখন আতঙ্কে আমি শিহরিত হলাম। আমার নবার্জিত স্বাধীনতা বেশিদিন টিঁকল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল বোঝা নামতে-না-নামতে আরেক যে-ভার আমার মাথায় এসে চড়ল, তা কোমল হ'লেও দুর্বহ।

বাবা একদিন ডেকে বললেন, 'মিত্তিরদের বাড়িতে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ; সেখানে তোকে বিয়ে করতে হবে।' শুনেই তো আমার আত্মারাম, ওই আত্মাটুকু বিয়োগ করলে যে-পাখিটি অবশিষ্ট থাকে তার মতো ডানা ঝট্‌পট্ ক'রে, উড়ে যাবার নিষ্ফল প্রয়াস পেলে। ভয়ক্ষিপ্ত হিয়াকে কিয়ৎ পরিমাণে সংযত ক'রে কপট হাসি হেসে আমি বললাম, 'আজ্ঞে-এঁ-এঁ-এঁ-,-অ্যা...উম্...এখন যদি...ইস্...এখন যদি দিন-কতকের জন্য অন্তত এ-বিষ[ ]য় চিন্তা না-করেন...তো ভালো হয়।'

'কেন, বন্ধ রাখতে গেলাম কী দুঃখে? না, ও-সব হবে না ; আগামী বৈশাখেই একরকম ঠিক করেছি।'

'আজ্ঞে আমার ইচ্ছা, উপার্জনক্ষম হ'য়ে তবে...।'

'উপার্জনক্ষম হ'য়ে? কেন, আমার কি এমন সংস্থান নেই যে তোর স্ত্রীকে প্রতিপালন করি। সাতবার জ'ন্মে আমার মতো উপায় কর দিকি—দেখি। উপার্জনক্ষম!'

'আজ্ঞে, আমিও ঠিক সেই কথা ভাবি ব'লেই বলছি ; শেষে কি ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।'

'এ কি ঠাট্টার কথা হ'ল? জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। একটা মেয়েমানুষ কি হাতি যে খেয়ে-খেয়ে দেউলে ক'রে দেবে। তোর নিজের নবাবির পয়সা জুটবে, আর স্ত্রীকে খাওয়াতে গেলেই যত গোল। আজকালকার ছেলেগুলো হ'ল কী? আমার বাবা যদি আমায় একটা বিয়ের জায়গায় সৌভরি মুনির মতো পঞ্চাশটা দারগ্রহণ করতে বলতেন, আমি মুখে টুঁ শব্দটি না-ক'রে তাই করতাম।'

পিতৃভক্তির এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেদিনের মতন আমায় নীরব ক'রে দিলে। সন্তান-সন্ততির নাম করলাম না রুচিবিরোধের ভয়ে।

এইরকম ক'রে যে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়লাম তার থেকে যুক্তি-তর্কের রাস্তা দিয়ে যতই বাহির হ'তে চেষ্টা করি ততই এই যাত্রাস্থলীতে ফিরে আসি যে আমার ধারণা মস্ত ভুল, বিয়ে করা একটা কিছু শক্ত কাজ নয় ; আর আমায় মিত্তিরদের মেয়ে-রূপ উদ্বন্ধনে শীঘ্রই ঝুলতে হবে।

এমনি করতে-করতে কেমন ক'রে যে একদিন নববধূর সমাগমে আমাদের বাড়ি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল, তার ঠিকঠিকানা আজও পেলাম না। তবে এইটা বুঝলাম যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সম্বন্ধে কূট রাজনৈতিকদের দলে যে একটা ধুয়ো চ'লে আসছে সেটা সম্পূর্ণ [ভিত্তিহীন]। ভারতে যার অন্য কোনো সম্পদ নেই তারও চাবিতালার মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠরত্ন লুকানো আছে,—স্ত্রীরত্ন।

২

বঁধুয়ার গড়নপেটন, সব ভালো। প্রশস্ত ললাট, পদ্ম-আঁখি, বেণুনাসা, প্রবালোষ্ঠ, দাড়িম্বদন্ত, মৃণালসূত্রবক্ষ ইত্যাদি-ইত্যাদি সকল মামুলি ঐশ্বর্যই ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটা সৌষ্ঠব ছিল যেটা বড়োই বিরল—লম্বজিহ্বা তার নাম। সেইটা লক্ষ ক'রেই জীবন-প্রাতে কাব্য রচনা করেছিলাম :

বলি শুনগো, শুনগো, সুন্দরী,
মম অলজ্জাবতী বল্লরী,
লয়কারী জিভ, লোল, লক্‌লক্,   তাম্বুলমদে লাল চক্‌চক্
ওগো, লহ তারে আজ সম্বরি।

কিন্তু, হায়, এমন অর্ধঘণ্টাপ্রসূত, অনুপ্রাসপ্রবণ, অজবিলাপও যখন সেই অঙ্গটির অবরোধ-সাধনে অসমর্থ হ'ল, তখন সে অপ্রতিভার আবরু সম্বন্ধে আমি নিরাশ হ'য়ে গেলাম।

তাঁর ভালোবাসার সীমা ছিল না ; বরং উল্টো। তিনি এক স্বামীর মধ্যে প্রণয় এবং বাৎসল্য, উভয় রসেরই সংমিশ্রণ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁকে যদি ফ্রয়েড দেখতেন তাহ'লে অপত্যস্নেহ আর [অনু]রাগের গভীর সংযোগ প্রমাণ করবার জন্য গাদা-গাদা, রাশি-রাশি, পাঠ্যাপাঠ্যের প্রণয়ন করতে হ'ত না। তাঁর—আমার সহধর্মিণীর—এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল যে যদিও আমার বয়স প্রায় তাঁর দ্বিগুণ, তবুও আমি একজন একান্ত নাবালক ; আমার বোধশক্তি এতই ক্ষীণ যে উচিতানুচিত কার্যের নির্ধারণে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি আমাকে এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে সর্বদা ব্যগ্র থাকতেন।

আমার একটা প্রধান দোষ ছিল—এখন অনেকটা কমেছে—যার অস্তিত্ব আমি বিবাহের পূর্বে কখনো উপলব্ধি করিনি : সেটা হচ্ছে আমার একান্ত চপলতা। যদি ভামিনী মুখুজ্যেদের বাটীর শ্যামলীগোরুর পুত্ররত্ন লাভের কথা বলতেন, বা বিধুর মার ছেলের শ্যালার ভায়রাভায়ের পিসতুতো সম্বন্ধির শ্বশুরের ভূতপূর্ব ঐশ্বর্যেব খবর দিতেন, আমি এইসমস্ত গুরুতর বিষয়ে প্রবল ঔদাসীন্য দেখিয়ে বাজে খবরের কাগজের কিংবা দুর্বোধ্য ইংরেজি ব[ই]য়ের পাতা উল্টোতেম।

এতেও আমার কলঙ্ক-কলাপের শেষ হয়নি। নিয়মহীনতার বিসদৃশ ফল আমার মোটেই জানা ছিল না। কাজেই বাড়ি ফেরার সময় কখনো নির্দিষ্ট ছিল না : আসতে কোনোদিন-বা ৭টা বাজত, কোনোদিন-বা ৮টা ; আর যেদিন ৯টা পেরিয়ে যেত সেদিন আমি যে-কাণ্ড ঘটাতাম তাতে যে ধরাতল রসাতলে যেত না এইটাই অত্যাশ্চর্য। আরো যে কত দোষ ছিল তার আর ইয়ত্তা নেই।

প্রথম-প্রথম আমি তাঁকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছিলাম যে চন্দ্রের গৌরব কলঙ্কে। কিন্তু যখন নিত্য একটা ক'রে অস্বাভাবিকতা আর পাপ আমার মধ্যে দেখা দিতে লাগল, তখন লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে, শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা জলাঞ্জলি দিলাম।

৩

বছর-দেড়েক ধ'রে যখন আমার প্রিয়ার রসনার রসালাপে আমাদের বাড়ি ঝঙ্কৃত, আর আমার পরান কম্পিত, তখন নিম্নলিখিত কথোপকথনের মাঝে স্বীয় নির্গুণতার অপর একটা উজ্জ্বল নিদর্শন পাই। রাত্রি ৯টা আন্দাজ হবে ; আমি একক ; রচনায় ব্যস্ত। করুণ রসের উৎস ছুটিয়ে দিয়ে আমার নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদে বিলাপের রবে গগন ফাটাচ্ছে ; আর আমি মনে-মনে ভাবছি এমন লেখা কালিদাস নিজেও লিখতে পারতেন না ; তাঁর রতিবিলাপ এর পাশে ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, উপমায়, মাধুর্যে পরাভূত। হঠাৎ বোধ হ'ল যেন বিধাতা আমার দর্পচূর্ণ করবার জন্য শিরোপরে বাজ হানলেন ; কিন্তু সে-বিভীষিকা বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, কারণ বজ্রের নির্ঘোষ যতই গম্ভীর হোক্-না-কেন তাতে তো আর প্রিয়জনের রাগরঞ্জিত কণ্ঠস্বরে 'কী হচ্ছে' মন্ত্র ধ্বনিত হয় না। বুঝলাম ভাবে এতই বিভোর হয়েছিলাম যে আমার চিত্তাকাশের একমাত্র চন্দ্রের উদয় মোটেই লক্ষ করিনি। তখনো হৃৎস্পন্দ থামেনি, কাজেই একবার দন্তরুচির বিকাশ করলাম মাত্র। আমার মুখের অমলতা সৌদামিনীর কার্য করলে, পরক্ষণেই আবার সেই মেঘাবৃত বদনমণ্ডল থেকে জলদমন্দ্র নির্গত হ'ল, 'কী হচ্ছে?' এবার অনেকটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল, তাই কান্তার এই অন্ধতার লক্ষণে অণুমাত্র বিচলিত না-হ'য়ে, উত্তর করলাম, 'রসধারা সেচন।'

'সবেতেই মশকরা!'

প্রিয়ার অলোকসামান্য আবিষ্কার আমায় নির্বাক ক'রে দিলে।

'কোথায় একটু সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম, তারও জো নেই। দুপুর-রাত্তিরেও লেখা!'

'তোমার উদ্দেশেই তো এটা লিখছি ; প্রাণের সকল ব্যথাই তোমার চরণে উৎসর্গ করছি।'

'আমি অত-শত কবিত্বের ধার ধারি না। আজকে আমার 'চামেলি' যখন জিজ্ঞাসা করলে, "তোর বর কী করে?" আমি তো ভেবেই আকুল। কেমন ক'রে বলি যে বাজে কাজে দিন কাটায়, কোনোই পেশা নেই।'

'তুমি বললে না কেন আমার হৃদয়বল্লভের কার্য হচ্ছে সৃষ্টি করা ; তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র

কবির বংশধর, আর আমার ক্ষণিক অদর্শনে দক্ষরাজের মতো পাগল হ'য়ে শত-শত মর্মোচ্ছ্বাস লিখে ফেলেন।'

এ-কথায় কান না-দিয়ে গৃহিণী বললেন, 'সত্যি, পুরুষমানুষ হ'য়ে জ'ন্মে লোকে যে বাড়ি ব'সে-ব'সে ছড়া লিখে সময় কাটাতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। আমি যদি মেয়েমানুষ হ'য়ে না-জন্মাতুম তো তোমায় দেখিয়ে দিতুম কী ক'রে রোজগার কত্তে হয়।'

তিনি যদি বিধাতার বিরলে-রচা রমণী না-হ'য়ে মামুলি পুরুষমানুষ হতেন তাহ'লে আমার ভাগ্যে তাঁর মতো দেবী ঘ[জু]টত না, আর সেইজন্য আমাকে এই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ দেখাতে অক্ষম হতেন তা বুঝাবার চেষ্টা না-ক'রে, আমি ধাঁ ক'রে ব'লে উঠলাম,

না যাচি গজাদি, অশ্বের দল,
বিত্তে চিত্ত নহে চঞ্চল,
তোমার মুখের খরতর বাণী শ্রেষ্ঠ বিভব, সম্পদ মানি,
তুমি, প্রিয়ে, মোর সব সম্বল।

দু-একরকমের আগুন আছে যা জল পড়লে নেবে না, বরং দ্বিগুণ হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে। পত্নীর চিত্তে যে-বহ্নি জ্বলছিল তাকে আমার এই প্রেমার্দ্র ভজন প্রশমিত করলে না ; বাক্যশিখা শত-শত লেলিহান জিহ্বা বার ক'রে ছুটে এসে আমায় দগ্ধ করলে। বহুত বাগ্‌বিতণ্ডার পর আমার জ্ঞান হ'ল যে আলস্য আর অপদার্থতা অন্যসকল দোষকে হারিয়ে দিয়ে আমার উপর একাধি—ঠিক বলতে গেলে দ্ব্যধি—পত্য স্থাপন করেছে। এবং আমার এত অধিক বয়স পর্যন্ত পিতার গলগ্রহ হ'য়ে থাকা প্রেয়সীর কুসুমকোমল অন্তরে দারুণ পীড়ার সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে লভ্য নোবেল পুরস্কারের টাকা তাঁর ধূলিধূসর পায়ে অর্পণ করব এই আশ্বাসবাণী তাঁর কাছে এতই অপ্রীতিকর হ'ল যে আমি তদ্দণ্ডে প্রতিশ্রুত হলাম যতদিন পর্যন্ত আমার হাত সোনার কাঠি হ'য়ে না-ওঠে ততদিন আর কালিদাসকে পরাভূত করবার চেষ্টা করব না। যখন আমার পরশমাত্র তাঁর গাত্র সুবর্ণে পরিণত হবে তখন, তার আগে না, পুনরায় মানসরঙ্গিণী কাব্যদেবীর পূজা আরম্ভ করব।

৪

প্রতিজ্ঞার সহজত্ব সম্বন্ধে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট কবিরা প্রকৃষ্ট বর্ণনা ক'রে গেছেন,—সে-বিষয়ে আমি অধিক কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। বাগ্‌দেবীর আরাধনা দুঃসাধ্য নয় ; কিন্তু তাঁর তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা সহোদরার সাধনা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। আইনের অধিষ্ঠাত্রীর পৃষ্ঠপোষক পূজারীর উপর একটা প্রবল পক্ষপাত আছে ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পুরোহিতের দক্ষিণা এত অধিক যে তিনি প্রায় দুষ্প্রাপ্য, তাই আমার অনুষ্ঠান তাঁর অধিনেত্রীত্বের অভাবে ফলবতী হয়নি।

আমি যখন আদালত-সৌধের চারিপাশে লাঞ্ছিত ভ্রমর-সদৃশ উপজীবিকা অন্বেষণে বারংবার ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাবা মারা গেলেন। আত্মীয়স্বজনকে অকূলপাথারে ভাসিয়ে দিয়ে পরলোকে গমন কথাটা দৈনিক কাগজে শোকসংবাদেই প'ড়ে আসছিলাম, এতদিন তার

যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। পিতৃদেবের এই আকস্মিক তিরোধানে এই বাক্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারলাম! আমি তাঁর একমাত্র পুত্র : সেইজন্য, বোধ করি, আমার বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করেছিলেন। এই প্রীতির নিদর্শন যতই গৌরবকর হোক্-না-কেন, তার পরিণাম আমার পক্ষে সুখের হ'ল না। তাঁরও বোধহয়, এইরূপ অনুভূতি হয়েছিল, কারণ, আমার মনে হয়, মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে যেন বিমর্ষ দেখেছিলাম। একরকম বলতে গেলে তাঁর শবদেহের উপর শকুনি-গৃধিনীর মতো পালে-পালে পাওনাদার এসে জুটল। অবশেষে, সব ঋণ পরিশোধ ক'রে ভদ্রাসনটা মাত্র বজায় রইল।

সত্য-সত্যই অকূলপাথারে ভাসলাম। পদে-পদেই সেই স্বর্গগত আত্মার অভাব ভীষণভাবে নিপীড়ন করতে লাগল! সংসার-সমুদ্রে আমার ক্ষুদ্র ভেলা সামান্য বাতাসেই ডুবু-ডুবু, এক হাত সম্মুখে যায় তো দশ হাত পেছয়, এইরকম করতে-করতে চলতে লাগল। পিতা আমাকে সূচীর আঘাত থেকেও কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন স্মরণে এলে কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভ'রে উঠত।

এইসময় আমার চোখে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল : বর্তমানে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা লাভ করা বিলাসিতার চরম। তাতে ক'রে কোনো উপকার সাধিত হয় না, বরং অপকার। যেটুকু আত্মনির্ভরের ছায়া বাঙালির প্রাণে থাকে সেটুকুও এই জ্ঞানালোকের প্রচণ্ড দীপ্তিতে কোথায় মিলিয়ে যায়। আমরা অপদার্থ, সব-কাজের-বাহিরে হ'য়ে পড়ি। এই শিক্ষা নিতে পারে তারাই যারা প্রভূত সম্পত্তির মালিক ; অপরের পক্ষে সেটা একটা বিড়ম্বনা-বিশেষ। নানা কাজের চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখলাম যে আদালতের গমনাগমনে দুর্মূল্য জুতা ক্ষয় করা ছাড়া অপর কোনো কর্মের যোগ্য আমি নই।

জগতে এমন কোনো বস্তু নাই যা সম্পূর্ণ ভালো বা খারাপ। এই বিষম ক্ষতির ফলে আমি একটা জিনিস লাভ করলুম সেটা হচ্ছে শান্তি, সেটা হচ্ছে স্ত্রীর সুশাণিত বাক্যাবলির আঘাত থেকে বাঁচোয়া, সেটা হচ্ছে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ। অবশ্য অর্ধাঙ্গিনীর কাছে সাংসারিক অবস্থা অবিদিত ছিল না। হয়তো বা তিনি ভেবেছিলেন যে আমাকে বাহ্যিক উপায়ে উৎসাহিত করবার প্রয়োজন হবে না ; অথবা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে বুঝেছিলেন এখন অলঙ্কারাদির কথা কিয়ৎপরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হবে। সে যে-কারণেই হোক্ আমি অল্প-সময়ের জন্য বাঁচলাম।

এইসময়ে একটা ঘটনা ঘটল যার প্রারম্ভে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে মুক্তি পেলাম। পূর্বেই বলেছি আমার অনেকগুলি নূতন ধারণা ছিল ; ফলত বিবাহের পূর্বে নবীনপন্থীদের সঙ্গে খুব বেশি মিশতাম। এই সূত্রে মিসেস্ বোসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। মিসেস্ বোস বিদুষী ও সুন্দরী ছিলেন এবং একসময় তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ মৈত্রী ছিল। কিন্তু উদ্বন্ধনে মৃত্যুর পর থেকে সে-জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল! মাঝে-মাঝে ন-মাসে ছ-মাসে আমি ভূতের মতো এক-একবার তাঁদের দেখা দিয়ে আসতেম। কায়ামুক্ত প্রেতাত্মারা, শুনেছি, নিশাচর ; দিবসের আগমের সাথে-সাথে তাঁরা নাকি উধাও হন। এই নিয়মের কারণ কী তা ঠিক বলতে পারি না ; তবে, বোধহয়, তাঁদের শাঁকচুন্নি-

প্রিয়াদের প্রেতলোকে রাত্রি হবার আগে ফিরবার কঠোর আদেশ থাকবে, আর যেহেতু এই লোকটা পাতালের কাছে যেখানকার রজনী নিশ্চয়ই আমাদেব দিবাভাগের সমসাময়িক, তাই কুঁকড়ো-কণ্ঠের কাকলির সনে তাঁরা ছায়ায় মিলিয়ে যান। অন্তত আমার নিজের অভিজ্ঞতা এইরূপ ; অতীত লীলাভূমিতে অন্ধকার হবার অপেক্ষা করতে কখনো সাহসী হইনি।

সে যাই হোক্, আমার আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনে মিসেস্ বোস সেই সুদূর সৌহৃদ্য স্মরণ ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম, ফলে, অশেষ দুঃখ আছে যে বুঝতে বেশিক্ষণ লাগল না। তাঁকে তো কোনোরকমে বিদায় দিলাম। ভেবেছিলাম প্রাণাধিকা বোধহয় দেখতে পাবেন না ; কিন্তু, হায়, আশা সর্বত্রই কুহকিনী। মিসেস্ বোস বেরুবার সময় যে-দ্বারে ছায়াপাত করেছিলেন সেই দরজাতেই পুনরায় আরেকটি রমণীর প্রতিবিম্ব পড়ল, অবিলম্বে ভার্যার প্রবেশ। মুখ ধূপিকামণ্ডিত, কণ্ঠস্বর রূঢ়, চক্ষে হাসির লেশ নেই। আমার বদন যদি কোনো আলঙ্কারিককে দেখাবার সুযোগ হ'ত, তিনি ব'লে উঠতেন : 'শুষ্কং হাস্যং তিষ্ঠত্যগ্রে।'

'ও-নির্লজ্জটা কে?'

'আমার একজন বন্ধু।'

'ও! আমি মনে করেছিলুম বুঝি কোনো দাইমাগী হবে।'

আমি নিরুত্তর।

'মেয়েমানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বটা কীরকম?'

'এই ধরো-না তোমার সঙ্গে যেরকম।' কথাটা ব'লেই তার গুরুত্বটা উপলব্ধি করলুম : কিন্তু *শিশুপাঠ*-এ বা *আখ্যানমঞ্জরী*-তে পড়েছিলেম নির্গত বাক্য আর নিক্ষিপ্ত তীর উভয়ের স্বভাবই একরকম, তাদের ফেরানো অসম্ভব। এই দার্শনিকত্বের উপর নির্ভর ক'রে অবিচল রইলাম, অন্তত বাহিরে। যা ভেবেছিলাম তা হ'ল না।

'আমার সঙ্গে! পোড়া কপাল আর কী! আমি তো জীবনে কখনো একটা ভালো কথা শুনলাম না, কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা।'

'পণ্ডিতেরা বলেন যখন হৃদয় অত্যন্ত আলোড়িত হ'য়ে ওঠে তখন প্রাণের কথাটা মুখ দিয়ে বেরোয় না, অন্য নানারূপ কথা দিয়ে তাকে ঢাকবার চেষ্টা করা...।'

'এর মানে?'

'আরেকটু যদি ধৈর্য ধ'রে শুনতে তো বুঝতে পারতে। তোমায় দেখলে আমার প্রাণ অনুরাগে এমন মন্থিত হ'য়ে ওঠে যে আমি আসল কথাটা চাপা দিয়ে বাজে কথা সৃষ্টি করি।'

'ওইজন্যই বলছিলুম কোথায় একটা কাজের কথা বলতে এলুম, তা-না প্রাণে রস উথ্‌লে উঠল। ব'লে দিলেই হয় আমায় নিয়ে পোষায় না, আমায় দেখলে গা জ্ব'লে ওঠে, তাহ'লে আমিও বাপের বাড়ি গিয়ে বাঁচি, তুমিও ওই-মাগীটাকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো।' অশ্রুপাত।

'প্রিয়ে, তোমার অশেষ কারুণ্য তাই আমায় নিয়ে বাস করতে পারো, অপরে পারবে কেন? আর কী দেখেই-বা অন্যে আসবে, কোনো গুণ নেই মোর কপালে আগুন।'

'তাহ'লে প্রাণে-প্রাণে ইচ্ছে আছে, মুখে বলতে চাইছ না?'

'তা থাকলেও তোমার কোনো ভয় নেই। শুনেছি, পুরাকালে যে-নারীর বক্ষে নখাঘাত থাকত তাকে দেখলে কামীরা পাগল হ'য়ে যেত ; কিন্তু যে-নরের বুকে রসনাঘাত আছে তাকে দেখে আজকালকার কামিনীরা যে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে এ-কথা তো কখনো শুনিনি।'

দুঃখের বরষা এখনো থামল না। অশ্রুমতী নিরুত্তরে দুইটা আরক্ত চক্ষুর দ্বারা আমায় নীরব ভর্ৎসনা ক'রে সবেগে প্রস্থান করলেন। আমিও পাছে-পাছে মানভঞ্জনের পালা অভিনয় করতে গমন করলাম।

হায়! সে-ক্রোধের কিছুতেই উপশম হ'ল না ; গৃহিণীর অমৃতবর্ষিণী বাক্যাবলি আমার চিত্তের পুষ্টিসাধন করা ছেড়ে দিলে। শেষে আমি হতাশ হ'য়ে, মরীয়া হ'য়ে সারাদিন বাড়ির বাইরে কাটাতে লাগলাম। তাতেই আমার উদ্দেশ্যের সাধন হ'ল। দুই-একদিন আমার যথেচ্ছার আনাগোনা সহ্য করার পর প্রিয়া এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিলেম, তাই সহজে বন্ধন স্বীকারে অনিচ্ছুক ; উত্তর করলেম, তাঁর আভরণ সংগ্রহে ব্যস্ত আছি ; মোকদ্দমার কার্য এত বেশি হ'য়ে উঠেছে যে মরবার সময় পর্যন্ত আমার নেই।

এতেও, বোধহয়, বেশিদিন স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারতাম না। দিন-কয়েক পরে যখন তাঁর চরণে উপহার দেবার সময় হ'ত, তখন আর কদলী ভিন্ন গতি ছিল না! রম্ভাতে নৈবেদ্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু এই ফলটা অনেক দেবীর প্রিয় নয়। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হলেন। তাঁর (আমার স্ত্রীর) একটি পুত্র জন্মাল। 'তাঁর' বললাম, আমার নিজের নাম করলাম না, এতে তাঁর পাতিব্রত্য সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিগ্ধ না-হয় ; যে-শিশুটি ভূমিষ্ঠ হ'ল তার উপর আমার অধিকার অল্পই ছিল। গৃহিণীর স্বৈরিতা এখন বিভক্ত হ'য়ে পড়ল। আমি কতকটা উপভোগ করতে লাগলাম আর এই নবাগতটি বাকি অংশটা পেলে।

৫

কয়েক বৎসর গত হ'ল। আমার স্ত্রীর প্রায় সব সময়টুকুই ছেলে দখল ক'রে বসল। কাজেই, সেই প্রতিশ্রুত আভরণগুলির কথা তাঁর মনেই রইল না। আমিও, এদিকে, কিছু-কিছু ক'রে কাজ পাচ্ছিলাম ; কিন্তু পীততনু ঐশ্বর্যকে এখনো বন্দিনী করতে পারিনি। আমার চালচলন প্রায় বিবাহের আগেকার মতোই হ'য়ে পড়েছিল।

কামশাস্ত্রবিদেরা বলেন যে, এক শ্রেণীর প্রণয়ী আছে, যারা নিজেদের কষ্ট না-দিলে প্রীতির সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে না। আমি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেললাম যে আমিও এই পালের একজন। কারণ, প্রিয়তমার প্রতি প্রণয়ের প্রগাঢ়ত্ব অনুভব করবার জন্য আমি প্রচণ্ড বিচ্ছেদব্যথার দ্বারা নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে লাগলাম। ক্রমশ এমন হ'য়ে এল যে, আর পারতপক্ষে তাঁর নিকটেই যেতাম না, দূর থেকেই উপাসনা করতাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই অপূর্ব ত্যাগ সত্ত্বেও, আমি 'প্রণয়ীচূড়ামণি' আখ্যা লাভ করতে পারিনি।

সেদিন খেতে ব'সে গৃহিণীর মুখশ্রী দেখেই আমার মনে খট্‌কা লাগল। পুরানো মাঝিরা মেঘমুক্ত আকাশ দেখলেও বলতে পারে ঝড়ের আশঙ্কা আছে কি-না। প্রিয়ার আননাকাশ দেখে-দেখে আমারও তেমনি একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল, কোনোরকমে নাকে-মুখে গোটাকয়েক অন্ন গুঁজে, কাজের ওজরে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু, হায় রে অদৃষ্ট, তা হ'ল না।

পত্নী কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বললেন, 'এখন তো আর তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।'

আমি একটা অস্বাভাবিকরকমের বড়ো গ্রাস তাড়াতাড়ি গিলে, কাশতে-কাশতে উত্তর দিলাম, 'সে-দোষ কি আমার? তোমার জন্যেই তো এমন হয়েছে। নয়তো কি আমার ইচ্ছে যে তোমার কাছ থেকে এক পা-ও নড়ি! তুমিই তো জোর ক'রে আমার হাত থেকে আঁচল ছিনিয়ে নিয়ে আমায় আদালতে-আদালতে চ'রে বেড়াবার আদেশ দিয়েছ।'

কী কুক্ষণেই কথাটা বলেছিলুম। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'পয়সা উপায় করছ সে তো অনেককাল থেকে শুনছি; কিন্তু আমার কপালের দুঃখু তো ঘুচল না।'

আমি একগাল হেসে বললুম, 'অল্পস্বল্প কিছু তোমায় দিতে তো মন ওঠে না। সঙ্কল্প করেছি এক ক্রোর টাকার কম তোমাকে অঞ্জলি দেব না।'

'এক ক্রোর টাকাতে আমার কাজ নেই। বেশ আমার মুখ না-চাও, ছেলের দিকে মাঝে-মাঝে দেখো।'

'ছেলে তোমার ছেলে ব'লেই আমার কাছে আদরের। আমি একেশ্বরবাদী, কাজেই অপর কারুর দিকে মুখও ফেরাই না, দেখা তো দূরের কথা', এই ব'লেই আমি তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলুম।

'আহা, একটু না-হয় বসলে, আমি তো আর তোমায় খেয়ে ফেলছি না।'

'সে দুরূহ সৌভাগ্য হবে না ব'লেই উঠছি। আর, কী জানো, তোমার কাছে বেশিক্ষণ বসলে তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। তা, ঘরে ব'সে থাকলে তো আর চলবে না, তাই আমি মায়া বাড়াতে অনিচ্ছুক।'

'অত ঠাট্টা কেন? না-হয় আমি অপদার্থই হলুম, হাজার হোক্ স্ত্রী তো বটে! সেটা অবশ্য তোমার মোটেই ভালো লাগে না; কিন্তু আমি তো আর তোমার পায়ে ধ'রে সাধ্যসাধনা করিনি, ওগো আমায় বিয়ে করো, ওগো আমায় বিয়ে করো। আর যখন ইচ্ছে থাকলেও ফেলে দিতে পারবে না, তখন না-হয় আরেকটু বসলেই। এ পোড়া প্রাণেরও শেষ নেই।'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'ছি, ছি, অমন অলক্ষুণে কথা ব'লো না। কে কাকে ফেলে দেয় তার ঠিক নেই। সত্যি বলছি, যদি নিজেকে তোমার পায়ের কড়ে-আঙুলের যোগ্য ব'লে জানতুম তো আমার কোনো খেদ থাকত না। আর তুমিই তো আমায় মানুষ ক'রে তুলেছ। কোথায় বাজে কবিতা লিখে দিন কাটাতুম, তা ছাড়িয়ে আমার মাথায় শামলা-মুকুট পরিয়েছ। আমি আর যা-হই অকৃতজ্ঞ নই। তোমায় ফেলে দেব! কালিদাসের যেমন কমলা, জয়দেবের চারুশিলা, চণ্ডিদাসের রজকিনী রামী, তুমিও আমার ঠিক তেমনি। তুমি না-থাকলে আমি

গলায় দড়ি দিতুম। কিন্তু কী করি বলো? তোমার কাছে যদি একঘণ্টাও বসি, তার মানে তোমারই এক ক্রোর টাকা থেকে ষোলোটি টাকা চুরি করলুম।'

আমি এক ঘণ্টায় ষোলো টাকা রোজগার করি শুনে প্রিয়া একটু খুশি হ'লেন। কিন্তু সেটাকে তৎক্ষণাৎ চেপে উত্তর দিলেন, 'এই ষোলো টাকার জন্য এত মাথাব্যথা? আচ্ছা আমি তোমায় ষোলো টাকা দিচ্ছি।' এই ব'লেই তিনি উঠলেন।

আমি তো অবাক। আমার প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগের কারণ খুঁজতে-খুঁজতে, তাঁকে বাধা দিয়ে বললুম, 'আরে সে কী কথা। তোমার জন্যই সব। তা তুমি যদি ষোলো টাকাকে টাকা না-মনে করো, আমি কি তার জন্য ছুটব। যাক্ বেটা মক্কেল চুলোয়, থাকুক বেটা জজ চোখ রাঙিয়ে, আজকে তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রেই দিন কাটাব।'

'কেন, প্রেমালাপ ছাড়া আর কোনো কথা থাকতে পারে না কি? তুমি কি ভাবো তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শুধু প্রেমালাপের?'

'না শুধু তা নয়, তবে প্রধানত তাই।'

'আমি বলছিলুম যে, কালকে চামেলির সঙ্গে দেখা হ'ল।'

আমি মনে-মনে ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে লাগলুম। এই চামেলির দোহা[ই]য়ে আমায় যে কত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল তার আর ইয়ত্তা নেই।

'তা চামেলি আর যিনি সেই চামেলির ঘ্রাণের জন্য সতত তার মুখে লুব্ধ ভ্রমরের মতো মুখ ঠেকিয়ে ব'সে আছেন, তাঁরা ভালো আছেন তো?'

'পুরুষমানুষের মনটাই খারাপ; তারা মনে করে স্ত্রী শুধু চুমু-খাওয়া আর প্রেমালাপ করার জন্য। মেয়েমানুষের বেঁচে থাকা শুধু ওই দুটি কারণের জন্য।'

'আমার বিবাহিত জীবনটা এত সুখের যে, আমি ভাবি, তোমার সইয়েরও ঠিক তেমনটি। সে যাই হোক্, চামেলি কী বললেন?'

'আমায় জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে তোর কী নতুন গয়না হ'ল?" আমি আর কী জবাব দেব, লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলুম।'

আমি অনেকক্ষণ থেকেই এমনি একটা কিছু শুনব, ভেবেছিলুম ; তাই একটা মতলব ঠিক করা ছিল। উত্তর দিলুম, 'এই, তার আর কী হয়েছে! আমি আজই তোমায় গয়না এনে দিতে পারি। কিন্তু বেশি গয়না পরলে তোমার অমন দুধে-আল্‌তা রং দেখতে পাব না, তাই আনি না। দেখো, আমি এক কাজ করি ; আজ রাত্রেই তোমার জন্যে পাঁচ হাজার টাকার একখানা কোম্পানির কাগজ নিয়ে আসব। তাতে তোমার সম্পত্তিকে সম্পত্তিও হবে আবার আয়কে আয়ও হবে। কী বলো?'

তিনি আমার ব্যগ্রতা এবং উৎসাহ দেখে একটু সন্দিগ্ধ হলেন ; কিন্তু খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, 'বেশ, তাই ভালো।'

আমি আর বাক্যব্যয় না-ক'রে চঞ্চল প্রস্থান করলুম।

মরীয়া হ'য়ে একটা ভীষণ ফন্দি ঠাউরেছিলুম। সেটা হচ্ছে যে, কতকগুলো পুরানো দলিলপত্রে কোর্টের শিলমোহর লাগিয়ে, সেগুলোকে কোম্পানির কাগজ ব'লে চালাব।

বুঝেছিলাম গৃহিণীকে আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সত্যকারের পাঁচ হাজার টাকা জমানো তো চারটিখানি কথা নয়। এই সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করা বেশি শক্ত হ'ল না। আদালতের চাপরাসিকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে খানকয়েক স্ট্যাম্প কাগজের উপর বাহার ক'রে মুদ্রাঙ্কিত করালুম ; তারপর সেগুলোকে একখানা নেকড়ার লেফাফার মধ্যে পুরে, তার উপরে লাল কালি দিয়ে প্রেয়সীর নাম লিখে, চাপকানের পকেটে রেখে দিলাম। অবশ্য এর সুদ ব'লে বছরে-বছরে কিছু দিতে হবে, কিন্তু আমার এখন এমন অবস্থা এসেছিল, যাতে সে-টাকা ব্যয় করতে গায়ে লাগত না।

যখন ভরণীর হাতে সেগুলো পড়ল, তখন তাঁর মুখে যে-হাসি দেখেছিলাম, তার মূল্য এই নকল পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে অনেক বেশি। আমার প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু পূর্বে তাঁর বদনমণ্ডলে তেমন আনন্দের চিহ্ন আর দেখিনি।

এই কৃত্রিম কোম্পানির কাগজ আসল লোহার সিন্দুকে বন্ধ হ'ল। তারপর বছর-বছর যথাযথভাবে সুদ দিয়ে যেতে লাগলাম।

এই আমার প্রথম কপটাচার, এই আমার শেষ। এর জন্য হয়তো-বা নরক ভোগ করতে হ'তে পারে। কিন্তু বিধাতার যদি অর্ধাঙ্গিনী থাকে, শাস্ত্রকারেরা তো ব'লে থাকেন প্রকৃতি ও পুরুষ না-মিললে সৃষ্টি হ'তে পারে না, তা যদি হয়, আর তাঁর যদি এককড়াও বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই এই অপরাধের জন্য আমায় মাপ করবেন। আর যদি শাস্তিই পাই, নরকের আগুন যে চোখের অনলের চেয়ে বেশি তপ্ত আর সেথাকার যন্ত্রণা যে বাক্যযন্ত্রণার চেয়ে অধিক কষ্টসহ, তা তো বোধ হয় না। যে-কোনো ভুক্তভোগী বিচারক আমায় বেকসুর খালাস দেবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই।

৬

অনেক বৎসর কেটে গেছে ; এখন আমার চুলে পাক ধরেছে ; ছেলে কলেজে পড়ছে। গৃহিণীও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছেন। তাঁর যুদ্ধপর্বের শেষ পালা কাল অবসান হ'য়ে গেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আর কুরুক্ষেত্রের সূত্রপাত হবে না। এখন শান্তিপর্বের আরম্ভ।

আমার জীবনকে তাঁর আদর্শ-মাফিক গঠন করতে সমর্থ হয়েছি। এখন আমার পয়সার অভাব নেই। জীবন-প্রভাতে যখন ব্যয় করবার লিপ্সা ছিল, সামর্থ্য ছিল, তখন অর্থ জোটেনি। কাজেই খরচ করার অভ্যাসটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। যা বাড়িতে আনতাম তা দেবীপূজাতেই উঠে যেত। আমার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির মালিক ছিলেন আমার ভার্যা। তিনি আমার সোমনাথ, এই দীন পূজারীর সকল বৈভব তাঁর উদরগত না-হ'লেও করতলগত হ'ত। না, তাঁকে রত্নগর্ভা মোটেই বলা চলে না। কেন-না, যে-পুত্রটিকে তিনি জঠরে ধরেছিলেন, সেটি একটি আস্ত অকালকুষ্মাণ্ড। এই মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রায় সমাপিত হয়েছিল আর কী।

এর মূলে হচ্ছে সেই নকল কোম্পানির কাগজ। যদিও আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে আমি অনেক পাঁচ হাজার টাকাই তাঁকে অর্পণ করতে পারতাম, তবুও যখন দেখলাম

যে আমার অসীম দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পেলে না, তখন ক্রমে নিজেও ভুলে গেলাম যে সেগুলো আসল নয়। বৎসরে দু-বার ক'রে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ত। সে সুদ আনবার জন্য। সেদিন সেগুলোকে নিয়ে যাবার দিন ; কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, প্রিয়তমা সেগুলো আমায় দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

এখন, আমার অনুপস্থিতির সময় সহসা সে-কথা তাঁর মনে পড়ল। সুপুত্রকে ডেকে, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে যাবার জন্য তার হাতে দিলেন। বুদ্ধিমান্ সন্তান তো দেখে হেসেই খুন। তার মা মহা চ'টে গিয়ে এই অদ্ভুত হাসির কারণ অনুসন্ধান করলেন। প্রত্যুত্তরে শুনলেন, সেগুলোর চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনো কোম্পানির কাগজ ছিল না। ক্রোধের ক্রমশ বৃদ্ধি হ'তে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কি অজ্ঞ না বাঙাল যে তাঁকে কোম্পানিব কাগজ কাকে বলে শেখাতে হবে। এত বৎসর ধ'রে এই কাগজ দেখিয়ে সুদ পেয়ে এলেন আর আজ বললেই হবে যে সেগুলো মেকি। পুত্রের হাসি দ্বিগুণ বেগে চলল। তার গর্ভধারিণী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে আজকালকার [ছেলেরা] এক-একটি আস্ত গাধা, যেহেতু তারা কোম্পানির কাগজ কাকে বলে জানে না। এবং এটাও তাকে বললেন যে, আমি বাড়ি এলেই আমায় উপদেশ দেবেন, তাকে কলেজ ছাড়িয়ে দিতে। এখনকার ছোঁড়াদের ধারণা হয়েছে যে তারা বাপ-মায়ের চেয়ে বেশি বিদ্বান্ ; কিন্তু তিনি অমন অনেক বি.এ. পাশ-করা ছেলেকে সাতজন্ম শিখিয়ে দিতে পারেন।

যদিও সে-কুলাঙ্গারটাকে নিবৃত্ত করেছিলেন, তথাপি একটা বিষম খট্‌কা লেগেছিল। তাই আমি বাড়ি আসতেই আমার উপর আক্রমণ শুরু হ'ল।

'আমায় কি কচি খুকি পেয়েছ যে কতকগুলো মসলাবাঁধা কাগজ দিয়ে বুঝিয়ে দেবে সেগুলো কোম্পানির কাগজ!'

আমি তাঁকে বলতে পারতুম যে সব কাগজই সমান, অন্তত দার্শনিকের চক্ষে ; বরং মসলাবাঁধা কাগজই শ্রেয় ; কেন-না যদি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে তাহ'লে মসলাবাঁধা কাগজে মসলার গন্ধ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কোম্পানির কাগজে বহ্ন্যুৎসব ছাড়া আর কিছুই হবে না। কিন্তু অনেক ঠেকে শিখেছিলাম যে এ-সব ক্ষেত্রে অল্পভাষী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই দু-এককথায় তাঁর উত্তেজনার হেতু শুধালাম।

তিনি সমস্ত কথা বিবৃত ক'রে বললেন।

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'আমার আজীবন সাধনার ফল কি এই? তোমায় ঠকাব! আর আমিই না-হয় ঠকালাম, তা ব'লে কোম্পানি তো আর শুনবে না। তারা কী হিসাবে এতদিন ধ'রে টাকা দিয়ে এল। আমি মানছি, তোমার চাঁদমুখ দেখলে টাকার ছালা উপহার দিতে পারত ; কিন্তু তুমি তো আর সুদ আনতে যাওনি, এই মুখপোড়াই গেছ্‌ল। তবে তারা দিলে কী ব'লে।'

তিনি কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

আমি আবার বললাম, 'বেটার আসপদ্দা দেখো দিকি, তোমায় বলে কি-না, কোম্পানির

কাগজ চেন না। আজকালকার ছেলেগুলো এক-একটা আস্ত গোরু। ওর ভাগ্যে অনেক দুঃখু আছে।'

'আমিও তো তাই বলি। তুমি কি কখনো আমায় এমন ক'রে ঠকাতে পারো। হাজার হোক্ মানুষ তো বটে।'

'আমি মানুষ, অন্য কিছু নই জেনে প্রীত হলুম। তুমিও মানুষ, খুব উঁচুদরের হ'লেও মানুষ মাত্র, দেবী নয়। সন্দেহ, রাগ, উষ্মা ইত্যাদি-ইত্যাদি দোষ-গুণ দিয়ে তোমার শরীর তৈরি। তাই বলি, সন্দেহ যখন একবার মনে ঢুকেছে, তখন আর ও-পাপ রেখে কাজ নেই। আমায় ওই-কাগজগুলো দাও, ওগুলোকে বেচে তোমায় নগদ কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা এনে দিই। তোমারও আর খট্‌কা থাকবে না, আর আমাকেও বারে-বারে কোম্পানি- বাহাদুরের কাছে ছুটতে হবে না।' আমার প্রাণে-প্রাণে ভয় ছিল ভবিষ্যতে এমন [পরিস্থিতি] এলে সকল রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যাবে।

তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

বলাই বাহুল্য, পরদিন প্রত্যুষেই সে-আবর্জনাগুলোকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে সর্বভুক্‌কে দিয়ে খাওয়ালুম ; এবং বৈকালে আফিস থেকে আসবার সময় একটি থলি ক'রে পাঁচ হাজার রৌপ্যমুদ্রা এনে, তাঁর পাদমূলে অর্পণ করলুম।

এই ঘটনার পর আমার চোখ খুলে গেছে। আজকালকার নব্যসম্প্রদায়ের লোকেরা 'স্ত্রীশিক্ষা' 'স্ত্রীশিক্ষা' ক'রে চেঁচান, কিন্তু সেটা একটা মস্ত ভুল। যদি আমার প্রিয়তমা শিক্ষিতা হতেন – উঃ – তাহ'লে কী যে হ'ত তা ভেবেও পাই না!

বিয়ে হয়েছে প্রায় পঁচিশ বর্ষ হ'ল। ক্রমশই ওটা গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। কবিতার খাতা অনেকদিন পুড়িয়ে ফেলেছি। এখন আর বাবাকে দোষ দিই না, কারণ আমার নিজের ছেলের বিয়ের বয়স হ'য়ে আসছে। তাকে একটা কথা বলতে পারব যে, পিতামহের কথায় বাবা সৌভরির মতো পঞ্চাশটা বিয়ে করতে রাজি ছিলেন বটে, কিন্তু করেননি ; আর আমি আমার পিতার কথায় স্বয়ং রণচণ্ডিকাকেও বরণ করতে কুণ্ঠিত হইনি।

এখন এইটে বিচার্য হচ্ছে, কার পিতৃভক্তি বেশি গভীর।

১৩৩০ আশ্বিন

বিলেত-যাত্রা

সে আজ অনেকদিনের কথা। মনে হয় যেন সে আরেক যুগের কাহিনী। কতদিন আগে তা ঠিক স্মরণে নেই ; আর থাকলেও বলব না, কেন-না তাহ'লে আমার বয়সের সঠিক সমাচার দেওয়া হবে। তবে, এইটুকু বলতে পারি যে, কেউ তখন ছেলেমানুষ বললে, রাগে জ্ব'লে উঠতুম ; আর আজ যে-জন বয়সটা এক বছরও কম মনে করে, তার পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছা হয়।

আমি অনাথ। মায়ের প্রাণের উপাদানে আমার প্রাণের গঠন। শুনেছি, বাবার আর মার প্রীতিবন্ধন এতই সংহত ছিল যে বর্ষনেমির একবার সম্পূর্ণ বিবর্তনের পূর্বেই বাবাও মার অনুবর্তী হলেন। আমি রইলুম পাছে ; আমায় প্রতিপালন করবার ভার রইল জ্যাঠাইমার উপর। জ্যাঠাইমার সন্তান-সন্ততি ছিল না ; কাজেই সেই বিরাট বুকের সঞ্চিত মাতৃস্নেহের অধিকারী হলুম একা আমি। তিনি একদিনের তরেও আমায় জানতে দেননি, আপনার মায়ে আর পালিত[কা] মায়ে কী তফাৎ। বলাই বাহুল্য, আমার ভাগ্যে আদরের একটু আধিক্য ঘটেছিল।

জগতের নিয়ম হচ্ছে, একদিকে পর্যাপ্তি হ'লে অপরদিকে বঞ্চিত হ'তে হয়। আমার অদৃষ্টেও এই সত্যের আংশিক সাফল্য দেখেছিলুম। জ্যাঠামশাইও আমাকে ভালোবাসতেন, কিন্তু জ্যাঠাইমার স্নেহে যে-অবিচলতা, যে-অতলস্পর্শিতা ছিল, জ্যাঠামশায়ের স্নেহে সেটার অভাব উপলব্ধি করতুম। তাঁর বাৎসল্য পার্বত্য নদীর মতো চপল, ফেনিল, মুখর, কিন্তু অগভীর। তা ব'লে কেউ যেন মনে করেন না যে, আমি যখন যা চেয়েছি তা পাইনি। মোটেই না। একরকম বলতে গেলে বাল্যে আমাদের গৃহস্থালিতে আমার ইচ্ছাই ছিল আইন। বোধ করি জ্যাঠামশাই মাঝে-মাঝে বুঝতেন, এটা আমার পক্ষে ভালো হচ্ছে না ; কিন্তু গৃহিণীর বিরক্তির ভয়ে আমায় বাধা দিতে সাহসী হননি।

আমরা মফস্বলে থাকতুম। বিশ-ত্রিশ বিঘে বাগানের মাঝে একতলা বাড়ির চিত্র আমার মনে আজও বেশ স্পষ্ট আছে। পড়াশুনার হুড়ো ছিল না। ইস্কুলে যাবার তাড়া ছিল না। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর জ্যাঠাইমা প্রকাশ্যে ঘুমুতে যেতেন ; আর জ্যাঠামশাই একটা মস্ত চুরুট জ্বালিয়ে, আরামকেদারায় শুয়ে, খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঢুলতেন। আমায় বই নিয়ে, অঙ্কের খাতা নিয়ে বসতে হ'ত পড়তে। জ্যাঠামশায়ের চুরুটটি ছিল আমার মুক্তির নিশানা। যখন দেখতুম, সেটা সহসা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেল তখনই বুঝতুম, আমার

কষ্টের অবসান হয়েছে, তিনি সুখতন্দ্রাগত। অমনি আমার চোখের জড়িমা কেটে যেত, অঙ্কের খাতার পাতাগুলি নিয়ে হাওয়া খেলা শুরু ক'রে দিত, রাজভাষা দারুণ অপমানে ধূলায় গড়াগড়ি খেত, আর আমি কেঠো চেয়ার ছেড়ে আমবাগানের স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় তৃণাসনে স্বপ্নসৌধ বিরচনে বিভোর হতুম।

আমার বিচার্য ছিল, 'বড়ো হ'য়ে কী হব।' অদৃষ্টকে অনেকবার দোষ দিতুম সে আমায় ছোটো ক'রে রচনা করেছে ব'লে। আমার প্রথম আদর্শ হচ্ছে, নেপোলিয়ন হওয়া। বেশ মনে আছে, সেই টিনের তলোয়ার কাঁধে ক'রে মাটির কেল্লা জয় করতে যাওয়া। তখন যদি কেউ আমায় বলতেন যে, যুদ্ধ আমার যোগ্য পেশা নয়, তাহ'লে তদ্দণ্ডে সেই টিনের কৃপাণে তাঁর মাথা ছিন্ন না-ক'রে দিই, অন্তত দীর্ণ ক'রে দিতুম। কিন্তু আজ যদি ধানিপট্কার আওয়াজ শুনি তো ছুটে গিয়ে গৃহের কোণে শশকের মতো মুখ লুকাই। আমার সকল কাঁচা কল্পনাই পরিণামে এমনি হয়েছে। একবার মনে আছে, জ্যাঠাবাবুর কাছ থেকে শার্লক হোম্স্, ডিটেক্টিভের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম যে, অপরাধীর অন্বেষণেই জীবনযাপন করব। তখন অপরাধ সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলো সরল ছিল। কিন্তু আজ কে অপরাধী, কে বিচারক তা নিয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ জাগছে। আর ডিটেক্টিভ্ তো দূরের কথা, এখন লাল রঙের আভাসমাত্র পেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এইরকম কত যে আকাশকুসুম আমার বুকের ভিতর ফুটে উঠত আবার মিলিয়ে যেত, তার আর ইয়ত্তা নেই বা মনে নেই। তবে প্রধানত যা কখনো হ'তে চাইনি সেটা হচ্ছে, রূপকথার রাজপুত্তুর। এর কারণ বোধহয়, রূপকথা বেশি না-শুনতে পাওয়া। আরো একটা কারণ থাকতে পারে,—তখন ভাবিনি যে পৃথিবীকে জয় করতে হবে ; মনে-মনে জানতুম, বড়ো হ'লেই সসাগরা ধরণী আমার পায়ে ঘরণীর মতোই লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু আজ যদি কোনো কিছু আমার একান্ত সাধের থাকে, তবে সেটি ওই বিশ্বজয়ী রাজপুত্তুরের মতো চিরকিশোর থাকা।

এখন মাঝে-মাঝে ভাবি, সেই দারুন দুপুর-রোদ্দুরে কী ক'রে বাগানে শুয়ে থাকতুম। তখন অবশ্য 'ঠিক দুপ্পুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা' বাক্যটার তাৎপর্য বুঝতে পারতুম না। সে-সময় বিনিদ রাতই এই শ্রেণীর প্রাণীদের জন্য রাখা ছিল ; দুপুর ছিল ভবিষ্যতের স্বামিত্বে। কিন্তু আজকে রাত্রির তো কথাই নেই, নিঃসুপ্তি, নিরিবিলি মধ্যাহ্নেও তারা দলে-দলে এসে, পাকা আমের উপর মক্ষিকার মতো, আমায় ছেঁকে ধরে। এখন আমি বেশ স্পষ্টই বুঝেছি, জ্যাঠামশাই কাগজ দিয়ে মুখ ঢাকতেন আমায় আড়াল করার জন্য নয়, কেবল এই ভূতের ভয়ে।

তারপর একদিন শরৎ-সন্ধ্যায় মে[হে]দি ঝোপের মধ্যে ব'সে কী একটা কল্পনায় মগ্ন ছিলুম, হঠাৎ অস্তমেঘের কিরণ বেয়ে পশ্চিমের প্রথম সাড়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলে। সেদিন থেকে আর সকল আদর্শ, সকল স্বপ্ন, সকল ধ্যান খ'সে প'ড়ে গেল, শুধু জেগে রইল ওই এক কামনা, ওই এক সাধনা, ওই এক তৃষ্ণা,—বড়ো হ'য়ে বিলেত যাব। বিকার শিশুর অধিকার, সত্য বটে, কিন্তু আবার স্থিরত্ব এবং নিঃসংশয়তাও তার বিশেষত্ব। এইদিন

থেকে বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না. যদিও সেখানে গিয়ে কী করব, কী হব ইত্যাদি বিষয়ে আমি মুহুর্মুহু মত বদলাতুম। আজকে হ'লে হয়তো সাতবার ভাবতুম, অজানা জায়গায় আমার স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো হানি হবে কি-না ; সেখানে গিয়ে আর কী লাভ, একটা লেজ হবে না তো, তবে মিছে পয়সা খরচ ক'রে আর কী হবে ; সেই বিষম.শীতে যদি নিউমোনিয়া হয়, ইত্যাদি-ইত্যাদি নানান কথা। কিন্তু বালক অজানিতকে, নূতনকে ভয় করে না। অনিশ্চিতেই তার আনন্দ, তাতেই তার উল্লাস, তাতেই তার আশা-ভরসা সকল কিছু নিহিত রয়েছে। অচিনকে সন্দেহের চোখে দেখে প্রৌঢ়।

২

আমার বিশ্বাস, যে-আগুন অপরসকলকে গ্রাস ক'রে আমার মনে জ্বলেছিল, তা-ও অন্যান্য বহ্নির মতোই নির্বাপিত হ'ত, হয়তো বেশিদিন থাকত, কিন্তু পরিশেষে নিবে যেতই যেত। কিন্তু তা হ'ল না, যখনই সেটা নির্বাণোন্মুখ হ'য়ে আসত, জ্যাঠামশাই তাতে ঘৃতাহুতি ঢেলে আবার তাকে তাজা ক'রে তুলতেন। কাজেই, সেটা মাঝে-মাঝে ছাই-চাপা পড়েছে বটে, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণ মরেনি। আমি যখনই কিছু একটা অন্যায় কাজ করতুম, শুনতুম যে, এমন করলে আমার বিলেত যাওয়া ঘটবে না। শেষে বিলেত একটা ভূস্বর্গ-বিশেষ, সেখানে ছেলেরা লক্ষ্মী, শান্ত, বয়স্কেরা রাগশূন্য, দয়ালু ; সেখানে সবই পূর্ণ, সবই সুন্দর, সবই সুখের, এমনি একটা প্রতীতি আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল।

এতদিন সন্ধ্যা ছিল জ্যাঠাইমার কাছে দাবিদাওয়া, আবদার, অত্যাচার করবার জন্য ; কিন্তু এখন থেকে সেই সময়টা জ্যাঠাবাবুর কাছে দরবার করতে যেতুম, বিলেত-অমরার আখ্যায়িকা শুনবার অভিলাষে। জ্যাঠামশায়ের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল,—তিনি অনুর্বরকে উর্বর করতে পারতেন, ছোটোকে বড়ো করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, নীরসকে সরস করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর হাতে ক্ষীণ ছায়া, কৃত্রিম ডালপালা সংযুত হ'য়ে প্রাচীন বটের আকার ধারণ করত। আমার মনে হয়, তিনি ছেলেবেলা থেকে চেষ্টা করলে একজন মস্ত রাজনৈতিক নেতা হ'তে পারতেন। হয়তো কথাটা অতি সামান্য, আমি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হব। কিন্তু সেই দক্ষ শিল্পীর স্পর্শে জাহাজে প্রথম পদার্পণের দিন থেকে আমার জীবনের সুপক্ক কাল অবধি ফুটে উঠত। সেই ক্ষুদ্র কাঠামোর উপর কত রং-বেরঙের কারুকার্য রচিত হ'ত,—যথা ডানাকাটা পরীর সঙ্গে আমার বিবাহ ; গৃহ আলোকিত ক'রে পুত্ররত্নের জন্ম, এবং পরিশেষে একটা লাট-লুট কিছু হওয়া। এর মাঝে থাকত আদালতে আমার একচ্ছত্রত্বের ইতিহাস, ভবিষ্যতের স্ফটিক প্রাসাদের কথা, দেশ-বিদেশ ভ্রমণের গল্প, আমার চরণোপান্তে অতীত-বন্ধুদের উমেদারি। এমন-কি পৌত্র-পৌত্রীদের জীবনীও বাদ যেত না। সেইসময় একটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম, আমি যা হওয়াই ধার্য করি-না-কেন,—তা সে জজই হোক্, ডাক্তারই হোক্, ব্যারিস্টারই হোক্, আর যাই হোক্, জ্যাঠামশায়ের মতে, আমার ঔৎকর্ষ অনিবার্য। তাঁর চক্ষে, বেশি না-হোক্ আধ ঘণ্টার জন্যেও, আমি সর্বশক্তিমান্ হ'য়ে উঠতুম।

আগে-আগে ভাবতুম আমার বিলেত যাওয়ার বাসনা প্রণোদিত ক'রে, জ্যাঠামশাই কাপট্যের পরিচয় দিয়েছেন। আজ আর সে-ভ্রম নেই। আমার চোখ থেকে ক্রোধের অন্ধতা কেটে যাওয়া অবধি বুঝতে পেরেছি, সে-সময় তাঁর আমায় বিলেত পাঠাতে সত্যই ইচ্ছা ছিল।

তাঁর মধ্যে সাহেবিয়ানার একটা প্রবল প্রয়াস আমি বরাবরই লক্ষ ক'রে এসেছি। চালচলনে, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, খাওয়াদাওয়ায়, পোশাক-আশাকে তিনি ছিলেন পাকা সাহেব। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল মুসলমানি আমলের পণ্ডিতদের মতো,—যাদের একঘরে করাই ছিল কার্য, নিবারণেই ছিল আনন্দ, উদারতাতেই ছিল আতঙ্ক, সঙ্কীর্ণতাই ছিল পোষ্য। কাজেই তিনি স্বদেশী দীনতাগুলি ছাড়তে পারেননি, আর বিদেশী মহত্ত্বগুলিও নিতে পারেননি। ফিরিঙ্গিয়ানা ছিল তাঁর খোলোস, স্মার্তয়ানা তাঁর মজ্জা। মানসিক দিক থেকে তাঁকে ইউরেশিয়ান বলা চলে। পোশাক যতদিন নূতন থাকে, ততদিন তাতে শীত-তাপ আটকায়। তাঁর বয়স যতদিন অল্প ছিল, রক্ত গরম ছিল, দেশী কুসংস্কারগুলো বর্তমান থাকলেও ছিল প্রচ্ছন্নভাবে ; কিন্তু পরদেশী আস্তরটা যতই জীর্ণ হ'তে লাগল, গোঁড়ামিটা ততই প্রস্ফুটিত হ'য়ে চলল। অবশেষে তিনি সেই পুরানো ধারণাতেই ফিরে এলেন যে, কালাপানি পার হ'লে হিন্দুর হিন্দুত্বের হানি ঘটতে পারে। আমি বলছি না, তাঁর জাত যাওয়ার ভয় ছিল, তিনি বর্ণাশ্রমধর্মকে একটা দারুণ কুসংস্কার ব'লে ভাবতেন। কিন্তু সপ্তসিন্ধুর পরপারের দৈত্যপুরী বেচারা বাঙালি-সন্তানের পক্ষে বিপদসঙ্কুল, এ-কথা তিনি মানতেন, যদিচ তাঁর ভয়ের নিদান স্বয়ং দৈত্য কি দৈত্য-পত্নীরা, তা আমি এখনো ঠিক করতে পারিনি। আমার জ্যাঠামশায়ের জীবনীতে হিন্দুধর্মের অবিনশ্বরতা প্রমাণিত। নব্যতন্ত্রীরা হয়তো বলবেন, 'তা নয় ; তাঁর ইতিহাস হচ্ছে স্বভাবের চরম বিজয়ের কাহিনী।'

৩

মন্থর গতিতে দিন যায় ; আমার উৎসাহ বর্ধিষ্ণু বেগে চলে, জ্যাঠামশায়ের আগ্রহ অল্পে-অল্পে মন্দ হ'য়ে আসে। ক্রমশ তাঁর মনে সন্দেহের বীজ প্রবেশ করলে ; দিন-কয়েক পরে সেগুলো অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠল ; সময়ের গমনের সঙ্গে-সঙ্গে শাখা-পল্লব ছড়িয়ে গেল। শৈশব ছাড়িয়ে এখন কৈশোরে এসে পৌঁছেছিলুম, তাই তাঁর সঙ্গে গল্প করার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে যখন বিলেত যাওয়ার প্রসঙ্গে কথাবার্তা হ'ত, তখন আর আমার আগামী-জীবনের অব্যর্থ উন্নতির উপর তাঁর সেই প্রাচীন বিশ্বাস খুঁজে পেতুম না। এখন শুনতুম কর্মহীন ব্যারিস্টারের দুঃখ, বিলেতি শিক্ষার অসম্পূর্ণতা, কাঁচাবয়সে বিদেশ যাওয়ার ফলাফল, ইত্যাদি-ইত্যাদি নানান কথা।

ঠিক হয়েছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রে আমি বিলেত যাব। কিন্তু পরীক্ষায় আমি চিরদিন অপটু। হয়তো-বা একটা বিষয় আমি মাঝারিরকমের জানি। কিন্তু যখন সেই রং-বেরঙের কাগজখণ্ডগুলি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ দন্তপঙ্ক্তি বের ক'রে, আমার পানে চেয়ে কুটিল, নির্মম হাসি হাসে, তখন হৃদয়ের সঞ্চিত দৌর্বল্যই জেগে ওঠে,—যা জানি যা না-জানির

অকূলপাথারে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়। পরীক্ষকদের বিচক্ষণতারূপ কষ্টিপাথরে আমার খাদেরই পরখ হয়েছে, সোনার ভাগটা কখনো ধরা পড়েনি। বোধকরি এই খাদের বহুলতার জন্যই জীবনের অনেক কঠোর ব্যবহার অনায়াসেই সহ্য করতে পেরেছি। যে-সব খাঁটি সোনার চাঁদ,—সুখের বিষয়, আকাশের বুকে সোনার চাঁদ না-মিললেও, ভারতের বুকে এমন পদার্থ মোটেই বিরল নয় ; যে-সব খাঁটি সোনার চাঁদ ছেলেরা তাদের প্রস্তরবৎ হৃদয়ে বিশুদ্ধতার চিহ্ন আঁকতে পেরেছিলেন তারা এমন ব্যবহৃত হ'লে এতদিনে বেঁকে তেউড়ে কী যে হ'য়ে যেত তার ঠিক নেই।

সে যাই হোক্, সে-বার প্রবেশিকা আমি ভালো ক'রেই পাশ করলুম। আমার এই কৃতিত্বে সকলেই চমৎকৃত হয়েছিল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম আমি। ছাত্রবৃত্তির ছাপ সোৎসাহে বহন ক'রে জ্যাঠামশাইকে দেখাতে গিয়েছিলুম। সে-গৌরবটীকা অদ্যাবধি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে পারিনি।

তা দেখে জ্যাঠামশাই একটু মৃদু হেসে বললেন, 'খুব ভালো! খুব ভালো! আশীর্বাদ করি চিরকাল এমনি ক'রে বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।' তখন বুঝিনি, আজ বুঝেছি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে হ'লে নিজের মুখ কালো করতে হয়। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে, আবার বললেন, 'কলকাতায় তোমার জন্য একটা ছোটো বাড়ি নিয়েছি। আমার বন্ধু শরৎ তোমার তত্ত্বাবধান করবে। তা তুমি যাবার জন্য চট্ ক'রে তৈরি হ'য়ে নাও।'

আমি প্রথম তাঁর কথার গুপ্ত অর্থটা বুঝতে পারলুম না। তাই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিসের বাড়ি?'

'আমার মনে হ'ল মেসে থাকতে পারবে না ; যা একটি ক্ষুদ্র নবাব হ'য়ে উঠেছ। তাই বাড়ি নিয়েছি।'

আমি আরো আশ্চর্য। 'মেসেই-বা থাকতে গেলুম কেন?'

'পড়তে-শুনতে হবে না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রেই কি পড়ার পাট শেষ হ'য়ে গেল না-কি?

'না, পড়ার পালা সাঙ্গ হয়নি, কিন্তু কলকাতা ইউনিভার্সিটির অধিকার খতম হয়েছে।'

'দেখো, তোমায় এতদিন বলিনি, তোমার এক্‌জামিনের পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে। আমি অনেক ভেবে ঠিক করেছি, এত অল্পবয়সে তোমার বিলেত যাওয়া হ'তেই পারে না। আরেকটা পরীক্ষা পাশ করো, তখন না-হোক্ দেখা যাবে। এখন তোমার মন কচি, নরম। এইটাই সাবধান হবার সময়। এইসময়েই অধিকাংশ লোক উচ্ছন্নে যায়। কাঁচা বেলায় অনায়াসেই খারাপ পথে যাওয়া যায়। আরেকটু বড়ো হও, মন শক্ত হোক্, তারপর যেও।'

কাঁচা মাটি বিকৃত হ'লেও করুণ করের স্পর্শে সহজেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কাঁচা মনের রেখা অনুতাপের অশ্রুতে ধৌত হ'য়ে যায় ; কিন্তু শুক্‌নো হ'লে অল্পাঘাতেই তা চূর্ণ, এ-কথা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করিনি, কারণ তখন নিজেও তা ভালো ক'রে জানতুম না। আমি নিরুত্তরে নৈরাশ্যের বোঝাখানি নিয়ে সেই শৈশবের তরুচ্ছায়ায় তিক্তলোরের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলাম। শুনেছি লোকে যখন ডুবে যায়, তখন নাকি একনিমেষের মধ্যে জীবনের

সকল চিত্র প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। সেদিন আমি এই উক্তিটার আংশিক সত্য উপলব্ধি করেছিলুম। আশাভঙ্গের সমুদ্রে ডোববার কালে অতীতের সুখস্মৃতি হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে আরো তীব্রতর ক'রে তুলেছিল।

আহারে আমার রুচি গেল, মুখের হাসি উধাও হ'ল, চিন্তা এসে বাসা বাঁধলে আমার মাথার ভিতর। এর আগে যা বলেছি তাই হয়েছে, আর আজ যে জীবনের সকলের অপেক্ষা বড়ো সাধ বিফল হবে তা কখনো ভাবতে পারিনি। তাই বোধহয় আঘাতটা অত গুরুতর লেগেছিল। প্রথমত্বের একটা হৃদয়স্পর্শিতা আছে, যা পরত্বে অনুপস্থিত। ক্রিশ্চানদের মতে আমাদের বর্তমান দুঃখ-কষ্ট, সবই, সেই আদিম পাপের ফলে। প্রথম প্রণয়ের ক্ষণস্থায়ী অসীমতা লিখে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। প্রথম চুম্বন অনির্বচনীয়। তেমনি প্রথম নৈরাশ্যও সীমাহীন, উপমানহীন, বিরাট, বিশাল, বর্ণনার অতীত। মনে হয়েছিল যেন বুকখানার ভেতরে কে সীসে ভ'রে দিয়েছে, মাথার মধ্যে বৃশ্চিক ছেড়ে দিয়েছে, সমস্ত অঙ্গে ক্লান্তি, সুপ্তি, অবসাদ বিস্তার ক'রে দিয়েছে। এখন সেদিনের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আজ ভাবি, জীবন যদি আমায় এমনি আঘাত ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত, তাহ'লে আমার কৃতজ্ঞতার মাত্রা থাকত না, নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী ব'লে মানতুম। কিন্তু তখন বোধ হয়েছিল, এই বুঝি চরম পরম ব্যথা।

৪

কলকাতায় এলুম। প্রথম-প্রথম কিছুই ভালো লাগত না। কলেজে যেতে কান্না পেত। বাড়ি থেকে এক পা-ও নড়তে ইচ্ছে করত না। কাজের মধ্যে ছিল, বিলেতি ইউনিভার্সিটিগুলোর সম্বন্ধে পড়া ; কিন্তু তাতে ফল হ'ল উল্টো। চিত্তের চাঞ্চল্য কল্পনার এবং চিন্তার তাড়নায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। শেষে সঙ্গীহীন শহরে আমার গেঁয়ো প্রাণ নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় অস্থির হ'য়ে উঠল।

এইসময় আমার শম্ভুর সঙ্গে আলাপ হয়। শম্ভু আমার অভিভাবক শরৎবাবুর ছেলে। সে বি.এ. পাশ ক'রে ওকালতি পড়ত। আমাদের দু-জনের সৌহৃদ্য সে-সময় জগতের অষ্টমাশ্চর্য ব'লেও গণ্য হ'তে পারত। মধ্যবয়সে চার-পাঁচ বছরের তফাৎ, তফাৎ ব'লেই ধরা হয় না। এখন যদি শম্ভুকে কেউ বয়স জিজ্ঞাসা করে, সে বলে যে, সে আমারই বয়সী ; আর আমায় প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিই যে, সে আমার চেয়ে অন্ততপক্ষে আট-দশ বছরের বড়ো। কিন্তু তখন আমরা যে এই ব্যবধানটা লঙ্ঘন করেছিলুম, তা খুব আশ্চর্যের বিষয়। আমাদের মৈত্রী ছিল আন্তরিক, মুখের নয়।

যেহেতু আমার জীবনের উপর শম্ভুর প্রভাব প্রবল, আমার মনে হয় এইখানে তার বিষয়ে দু-চারটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তার কাজ ছিল অকাজ। বি.এ. পাশ ক'রে সে যে একজন কর্মহীন পুরুষ হ'য়ে পড়েছে, এইটা সকলকে জানিয়ে দিতে সে সর্বদা উৎসুক। অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এর আগে বা পরে আমি তার মতো আমুদে, মজলিসি, আলাপী লোক আর দেখলুম না। দুনিয়ায় এমন জিনিস ছিল না যা সে

জানত না, এমন ব্যাপার ছিল না যার সম্বন্ধে কথা বলতে পারত না, এমন লোক ছিল না যাকে সে সমালোচনা করত না। শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে যেমন পটু ছিল, তেমনি আবার শিং গজিয়ে প্রবীণদের পালেও প্রবেশ করতে সে কুণ্ঠা বোধ করত না। সকল সন্দেহ সে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিত, সকল দুঃখ হেসে ডুবিয়ে দিত। এককথায় বলতে গেলে তার মতো তুখোড় শহুরে ছেলে মেলা দুষ্কর। আমায় 'সভ্য' করার ভার সে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিলে।

ছেলেবেলায় কথা চাপা থাকে না। আজ যদি আমাদের প্রথম পরিচয় হ'ত, তাহ'লে আমার মনে যে-কথাটি সতত জাগছে তার অস্তিত্বও সে ঘুণাক্ষরে জানতে পারত না। কিন্তু তখন আলাপ হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার কুষ্ঠি, কুলুজি, সকলই, শম্ভুর কাছে ব্যক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। আমার বিষণ্ণতার কারণ শুনে সে তো হেসেই খুন, বললে, এই সামান্য বিষয় নিয়ে যে-লোক দিনরাত মুখ ফুলিয়ে ব'সে থাকতে পারে, তার ত্রাণের আর কোনো উপায় নেই। আমায় মানতেই হবে যে, যখন তার কাছে থাকতুম তখন সকল অভিমান, সকল নিরাশা আমার মন থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ হ'য়ে যেত। আর যখন একান্তই অবুঝ হ'য়ে উঠতুম, তখন শম্ভু আমায় বলত, 'আমি তোমার জ্যাঠামশাইকে বেশ ভালো ক'রেই চিনি, তাঁর কথার নড়চড় হবে না। তুমি আরেকটা এক্‌জামিন্‌ দাও, তারপর যদি তোমার বিলেত যাওয়ায় কোনো বিঘ্ন ঘটে, আমায় যা মুখে আসে তাই ব'লো।' এমনি তার সম্মোহনী যে, তাকে যা-ইচ্ছে তাই বললে যে আমার বিলেত যাওয়া কিছুমাত্র এগুবে না, এমন সন্দেহ একদিনের তরেও আমার মনে উদয় হয়নি, অন্ততপক্ষে যতক্ষণ তার সামনে থাকতুম।

কলকাতার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প'ড়ে দু-বছর দেখতে-না-দেখতে কেটে গেল। মাধ্যমিক পরীক্ষাটা রগ ঘেঁষে কোনোরকমে উত্তীর্ণ হলুম। এক্‌জামিন্‌ দিয়েই জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। এইবার কালাপানি পার হওয়া সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু শম্ভুর কাছ থেকে আমার পাশের সঠিক সংবাদ আসবার আগে পর্যন্ত সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারিনি। জ্যাঠামশায়ের এবং আমার মধ্যে পূর্বের অন্তরঙ্গতা আর ছিল না। আমার দিক থেকে ছিল একটা দারুণ অভিমানের আড়াল, জ্যাঠামশায়ের দিকে ছিল চক্ষুলজ্জার ব্যবধান।

শম্ভুর তার যখন পৌঁছল তখন দুপুর। জ্যাঠামশাই আদিম পদ্ধতি অনুসারেই কাগজে মুখ ঢেকে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। আমি নির্মমভাবে জুতার শব্দ করতে-করতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। অবশ্য, কী মীমাংসা হবে, তা আমার আগে থেকেই জানা ছিল ; কিন্তু এই অনিশ্চিততা আমার আর সইছিল না, তাই তাড়াতাড়ি তার নিষ্পত্তি করতে গেলুম।

আমার জুতার আওয়াজে তিনি চম্‌কে উঠলেন। কাজেই মেজাজটা যে একটু তিরিক্ষি হ'য়ে গেল, সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। তিনি কাগজখানা মুখ থেকে নামিয়ে সন্তর্পণে নির্বাপিত চুরুটিকাটি পুনরায় ধরালেন।

কোনো সূচনা বা ভূমিকা না-ক'রেই আমি বললুম, 'আপনি সে-বার বলেছিলেন যে,

আই.এ. পাশ করলে বিলেতে পাঠাবেন। এইমাত্র তার পেলুম যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আপনার মত পেলে যোগাড়যন্তর করতে শুরু ক'রে দিই।'

তিনি খানিকক্ষণ নির্বাক হ'য়ে চুরুট টানতে লাগলেন, তারপর মুখের কোণ থেকে ধূম-শলাকাটি নামিয়ে আমায় বললেন, 'ভারি খুশি হলুম। তুমি আসা অবধিই আমি এ-সম্বন্ধে ভাবছি। তোমার জ্যাঠাইমার সঙ্গেও কথা হয়েছিল। আমাদের দু-জনেরই মত যে এখন তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। এখন তোমার যা-বয়স, সেটাই হচ্ছে মানুষের জীবনের মধ্যে সকলের চাইতে ভয়ের সময়। বড়ো হ'লে আমার কথার অর্থ বুঝতে পারবে। এই সময়টা বাঁচিয়ে চলতে পারলে, একরকম বলা যায় উচ্ছন্নে যাবার আর আশঙ্কা নেই। উপস্থিত ও-ধারণা ছেড়ে দাও। একবার যদি ব'খে যাও তাহ'লে সারাজীবন তার ফলভোগ করতে হবে। তখন মনে-মনে আমায় গালাগাল দেবে, ভাববে আমার কর্তব্য আমি করিনি।'

আমি উত্তর দিলুম, 'দেখুন, ব'খে যাওয়া এখানে যতখানি সম্ভব, বিলেতে তার চেয়ে বেশি নয়। কলকাতাতে আমি অভিভাবকহীন রয়েছি, আর বিলেতি ইউনিভার্সিটিতে যে কলকাতার অপেক্ষা বেশি প্রলোভন আছে, তা তো মনে হয় না। ইচ্ছে করলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানেই ব'খে যেতে পারি। আর দেখুন, আমার বিশ্বাস মানুষের ন্যায়পথে থাকা-না-থাকা সম্পূর্ণ নিয়তির উপর নির্ভর করে।'

তিনি রেগে গিয়েছিলেন ; উত্তর দিলেন, 'সেইজন্যই তো তোমায় পাঠাতে চাচ্ছি না। এখানে তবু চোখের সামনে না-থাকলেও কাছে রয়েছ, দরকার হ'লে তোমায় আটকানো যেতে পারবে। তোমার যে-সব অদ্ভুত ধারণা হচ্ছে, তাতে সেখানে গেলে যে কী ধিঙ্গি হবে, তা কে জানে!'

'তাহ'লে কি আপনার আমায় বিলেত পাঠাতে আদৌ ইচ্ছা নেই?'

'না, আমি তা বলছি না। আর কিছুদিন যাক্, একটা বিয়ে-থা করো, তারপর অনায়াসে যেও।'

'আপনার বিশ্বাস যে আমি সেখানে গেলে ব'খে যাব। বিয়ে ক'রে গেলে সে-সম্ভাবনাটা কী ক'রে কমবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বিগড়ে যাওয়া-না-যাওয়া তোমার হাত। কিন্তু বিগড়ে গেলেও একটা মেম বিয়ে ক'রে আনতে পারবে না তো। তা হ'লেই হ'ল। এখনো সব বুঝবার তোমার ক্ষমতা হয়নি, যদিও ভাবো যে একটা মস্ত বুদ্ধিমান্ হ'য়ে গেছ, শেষে সারাজীবন পস্তাতে হবে।'

'মাফ্ করবেন। আপনার ধারণা আমি ব'খে যাব, বিয়ে ক'রে গেলেও যাব। তা যদি হয়, তাহ'লে বিয়ে দিয়ে সেখানে পাঠালে অন্যায়ের পথে চলায় সম্মতি দেওয়া হ'ল না কি? যদিও তেমন হবার কোনো আশঙ্কা নেই, তবু আমার মনে হয় এই দুয়ের মধ্যে মেম বিয়ে করাটাই শ্রেয়স্কর, এবং সেটাই অল্প অপরাধ।'

বয়স্থরা ভেবে থাকেন, তাঁদের কনিষ্ঠেরা চিরদিনই কচি খোকাটি থাকে। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বা স্ত্রী-পুরুষেব সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের কোনো কথা জানা বা বলা উচিত নয়। এই ধারণাটার মূলে হয়তো অর্থ ছিল, কারণ তখন বাল্যে—ঠিক বলতে গেলে শৈশবে, বিবাহের

ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন আর তার কোনো মানে নেই, যেহেতু অন্তত পুরুষের পক্ষে সে-প্রথাটা উঠে গেছে ; আর যৌন বিষয়ে এঁচোড়ে-পক্বতা নারীদের মধ্যে মোটেই বিরল নয়।

সে যাই হোক্, জ্যাঠামশায়ের মুখ লাল হ'য়ে গিয়েছিল। তার কারণ বোধ করি, ক্রোধ, সঙ্কোচ দু-ই। তিনি বললেন, 'আমি এ-প্রসঙ্গে তোমার জ্যাঠামি শুনতে চাই না। বিলেত যদি যেতে চাও, বিয়ে ক'রে যেতে হবে।'

এবার আঘাতটা কমই লেগেছিল, রাগটাই হয়েছিল বেশি। 'যাওয়া হোক্ বা না-হোক্, আমি বিয়ে করতে রাজি নই', এই কথা ব'লে আমি দ্রুতপদে সেখান থেকে চ'লে এলুম।

সেইদিন বিকেলে পশ্চিমের বারান্দায় ব'সে, জগতের অসামঞ্জস্য, অভিভাবকদের অত্যাচার, অদৃষ্টের অন্ধতা, ইত্যাদি নানা গুরুতর বিষয় চিন্তার অবসরে, আপনার দুঃখে আপনি বিভোর হ'য়ে, সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করছিলুম, এমনসময় পাশের ঘর থেকে জ্যাঠাইমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

'দোষ তোমার। আমি তো তখুনি বলেছিলুম, "যখন যাবে, তখন তার কথা। এখন থেকে বিলেত-বিলেত ক'রে নাচানোর দরকার কী!" ওর জীবনটা যদি ছতিচ্ছন্ন [শতচ্ছিন্ন] হ'য়ে যায় তো সে দায়িত্ব তোমার।'

জ্যাঠামশায়ের গলা গম্ভীর স্বরে বলছিল, 'হ্যাঁ, সেটা আমার ব'লেই এখন পাঠাতে চাচ্ছি না। কিন্তু ভুগতে হবে তোমাকেই। আমি আর ক-দিন বলো? যদি মেম-বউয়ের সঙ্গে ঘর করতে পারো তো ওকে পাঠাও। আমার কী?'

এই অখণ্ডনীয় যুক্তির ফলে জ্যাঠাইমা চুপ ক'রে গেলেন। আমি তাঁর দরদ হারালুম।

৫

সকলের হাত এড়িয়েছিলুম, কিন্তু শম্ভুর কাছে পার পেলুম না। সে যখন আমার কাছ থেকে সেই নেপথ্য হ'তে শ্রুত জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমা-সংবাদ শুনলে, তখন প্রথমটা ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। সে বলেছিল, 'এতে তোমার দুঃখ করবার কিছুই নেই। সহমরণ উঠে যাবার পর থেকে সকল মা বা মাতৃস্থানীয়ার মনে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, বুঝি-বা তাঁদের অধিকার বেহাত হ'য়ে যায়। অবশ্য, তাঁদের রাজত্ব ক্ষুদ্র, কিন্তু এই অল্পতাই হচ্ছে এই ভীতির কারণ। যদি দৈনিক কাগজ পড়ার অভ্যাস থাকে তো জানবে যে, জার্মানির বিজয়াকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করেছিল সেই মুষ্টিমেয় বেলজিয়ামটি। ইউরোপের মানচিত্রে বেলজিয়াম যতটা জায়গা জুড়ে আছে, সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে একটা ভাঁড়ার ঘর তার চেয়ে বেশি স্থান নেয়। অতএব সেই অধিকার রক্ষা করার জন্য মাতারা যখন হুলুস্থূল বাধান, তার জন্য আক্ষেপ কেন?'

আমার বিলেত যাওয়ায় জ্যাঠাইমার অমত আর এই দীর্ঘ বক্তৃতা কোন্ যুক্তির সূক্ষ্ম সূত্রে সংযুক্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, 'তোমার জ্যাঠাইমার সহানুভূতি শুকিয়ে গেছে ভয়ে ; তিনি তোমার জ্যাঠার মতে সায় দিয়েছেন আত্মরক্ষার চেষ্টায়। বিলেত গিয়ে তুমি অপর যা-ইচ্ছে করতে পারো, তাতে তাঁর কোনো আপত্তি হবে না, কিন্তু ওই যে মেম-বিয়ের কথা

উঠেছে, তাতে তাঁর আত্মা শুকিয়ে গেছে। ১০।১২ বছরের দেশী মেয়ের ভয়েই যখন মাতৃকুল আকুল, তখন বিবি বিষয়ে তিনি যে সামান্য সন্দিগ্ধ হয়েছেন, সেটা আর আশ্চর্য কী? তাঁর প্রাণ বধূমাতার শুশ্রূষার জন্য লালায়িত ; কাজেই, তুমি যেখানে গিয়ে এমন স্ত্রী আনতে পারো, যে সেদিকও দিয়ে যাবে না, তেমন জায়গায় তিনি তোমায় যেতে দিতে নারাজ। তুমি যদি একটি আস্ত গর্দভ না-হ'তে তো জানতে যে, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে আত্মগত ঐশ্বর্য ছেড়ে পরগতের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করা। এই কারণেই মা ছেলের ভক্তি, ছেলের সেবা হেলায় ছেড়ে, পুত্রবধূর শ্রদ্ধার জন্য ব্যাকুল হন ; এইজন্যই নিজের বাগানের ফল ছেড়ে, বালক পরের বাগানের ফল চুরি করে ; আর লোক নিজের স্ত্রী ছেড়ে পরের স্ত্রীর পেছুনে দৌড়ায়।'

আমার এ-সমস্ত বাচালতা ভালো লাগছিল না, তাই চুপ ক'রে রইলুম।

তারপর খানিক বাদে শম্ভু আবার বললে, 'তুমি কি বিলেত যেতে একেবারে কৃতসঙ্কল্প?'

আমি একটু চ'টে উত্তর দিলুম, 'সে-বিষয়ে বৃথা বাক্যব্যয়ে কী হবে, বিশেষত তোমার নিকট।'

'আরে চট্‌ছ কেন? যদি একান্তই মনঃস্থির ক'রে থাকো তো বলো, আমি একটা উপায় বাৎলে দিই।'

আমি আরো চ'টে বললুম, 'রাতদিন অত ঠাট্টা ভালো লাগে না। অমন ঢের উপায় দেখেছি, উপায় দেখবার আর সাধ নেই। কারুর সাহায্য, কারুর দরদ আমি চাই না, যা করবার নিজেই করব। তবে, এইটা জেনে রাখো, আমি বিলেত যাবই যাব, তা তুমি মশকরা করলেও যাব, জ্যাঠামশাই চোখ রাঙালেও যাব, আর জ্যাঠাইমা কাঁদুনি গাইলেও যাব,—যাবই যাব, যাবই যাব, যাবই যাব।'

আমার এই আকস্মিক উত্তেজনার মূলে হচ্ছে, নৈরাশের তিক্ততা, অপারগের বিদ্রোহ। যদিও শম্ভু এমন একটা কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবুও সে আসল ব্যাপারখানা বুঝে নিলে, পরিহাস ছেড়ে আমায় বললে, 'তা, তুমি যদি একান্ত মনঃস্থির ক'রে থাকো তো আমার একটা ফিকির আছে। তুমি আবার যে ধর্মভীরু মানুষ, শুনলে হয়তো আঁৎকে উঠবে। তবে যদি শরীর পাতন কিংবা ধর্মের সাধন অবস্থা হ'য়ে থাকে তো বলি।'

'প্রস্তাবনাটা একটু কম ক'রে আসল নাটকটার অবতারণা করলে ভালো হয় না?'

'আমার মতলব অকাট্য। যে-কারণে তোমার জ্যাঠাইমা তোমার বিলেত যাওয়ায় অমত করছেন, সেই কারণেই তিনি তাতে মত করবেন।'

'হেঁয়ালি ছেড়ে ভদ্দর ভাষায় মনের কথাটা বললে বাধিত হব।'

'তাঁর অসম্মতির ভিত্তি হচ্ছে যে, তুমি সেখানে গিয়ে মেম বিয়ে করতে পারো। আচ্ছা, ধরো তুমি এখানেই একটা অযোগ্য বিয়ে করার জন্য মেতে উঠলে, তাহ'লে কী হয়?'

'আকাশখানা যদি হঠাৎ ভেঙে পড়ে তাহ'লে কী হয়? এমন প্রসঙ্গের উল্লেখ করার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। শুধু-শুধু অযোগ্য বিয়েই-বা করতে যাব কেন? আর গেলেই-বা মিলছে কোথায়?'

'সে-ভার আমার, তুমি রাজি আছ তো?'

'মোটেই নেই। তোমার গাঁজাখুরি রেখে দাও। ঠাট্টার স্থান, কাল, পাত্র আছে।'

'না, তোমায় নিয়ে আর চলল না। আমার এমন ফন্দি মাঠে মারা গেল। তাইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে, বানরের গলায় মুক্তার মালা।'

উপমা-সংমিশ্রণ অলঙ্কারশাস্ত্রে যে কতদূর দো[দূ]ষণীয়, তা তাকে বোঝাবার চেষ্টা না-ক'রে, আমি এই সঙ্কীর্তিত অভিসন্ধির আশায় ব'সে রইলুম।

সে বললে, 'তোমায় বিয়ে করার জন্য কে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে? নাই-বা করলে বিয়ে, কিন্তু বিয়ে করবার জন্য তুমি যে পাগল, এ-কথাটা প্রকাশ করতে কি কিছু দোষ আছে?'

'কিছুই না, তবে বিয়ে তো আর ইচ্ছে করলেই হয় না। মেয়েমানুষ যদি হতুম, না-হয় প্রথম মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের হাতে নিজেকে চিরদিনের জন্য সঁপে দিতুম। দেবতা যদি হতুম, না-হয় কলাগাছটাছ একটা কিছুকে বধূ করতুম। কিন্তু পোড়া বিধি ক্ষুদ্র মানুষ ক'রেই সৃষ্টি করেছে, সুকোমলা অবলাও করেনি আর তোমার পুত্তুরও করেনি।'

'সে-ভাবনা তোমার নয়। আমি যদি একটি উপযুক্ত পাত্রী—।'

'আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অনুপযুক্ত পাত্রী বলো।'

'আচ্ছা তাই। আমি যদি একটা অপাত্র[ী] যোগাড় করতে পারি, তুমি তার জন্য আত্মহারা হ'তে পারবে তো?

'হ্যাঁ। সেটা কিছু শক্ত নয়। তোমার সঙ্গে যেদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা করেছি, সেদিন থেকে পাত্রাপাত্রের বিচার ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তাতে ক'রে বিলেত যাওয়ায় কী সুবিধে হবে?'

'বুদ্ধি যদি একটু কম মোটা হ'ত, তাহ'লে আমায় আর এতক্ষণ ধ'রে সেই কথা বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করতে হ'ত না। তুমি যদি একটা ব্রাহ্মিকা বিয়ে করো, তাহ'লে নিশ্চয়ই তোমার জ্যাঠা-জ্যাঠায়ের মতে করবে না। আমার প্ল্যান হচ্ছে এইরকম : আমি তোমার জ্যাঠা-মশাইকে লিখব যে এখন আর তোমার দেখা পাওয়া যায় না। শুনছি, তুমি নাকি একদল ফন্দিবাজ ব্রাহ্মদের হাতে পড়েছ। তাদের একটি কুৎসিত কন্যারত্ন আছে, সেটিকে তোমার গলায় ঝোলাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এইসঙ্গে তোমার ভাবী পত্নীচারিত্র্য সম্বন্ধে এবং রূপগুণের একটু বর্ণনা ক'রে দেব ; এবং পরিশেষে এটাও লিখতে ভুলব না যে তোমায় শীঘ্র না-বাঁচালে তুমি অচিরেই জাহান্নম নামক রম্যস্থানে গমন করবে। এখন বলো এমন ভার্যা লাভ আর কালাপানির পারে জাত খোয়ানো এ-দুটার মধ্যে কোন্‌টা বেশি বাঞ্ছনীয়। রাজি আছ?'

অন্যসময় হ'লে রাজি হতুম না ; কিন্তু তখন প্রতিহিংসা-কামনাটা অপর সকল চিত্তবৃত্তিগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে, আমার উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছিল। যদিও এমনতর বিবাহ করতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তবু তাঁদের জব্দ করবার জন্য, অল্পক্ষণ অনিচ্ছার ভান ক'রে, শম্ভুর প্রস্তাবে সায় দিলুম।

৬

সবই বন্দোবস্ত অনুযায়ী চলতে লাগল। শম্ভু একটি ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলে। আমায় মানতেই হবে যে শম্ভু মানুষ হিসেবে বিশেষ। আমার নব বন্ধুরা সর্বতোভাবে তার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছিল বটে। আর তাঁদের কন্যারত্নটি! তার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব,—অর্থাৎ কথায় তার রূপ বর্ণনা করা যায় না ; বরং চিত্রকর হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতুম। বিধাতা যে খেয়ালি, তা আমি অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করছি ; কিন্তু তাঁর মর্জির বহর যে কতদূর, তা এই প্রথম অনুভব করলুম। আমি যদি এই প্রিয়ার বিরহে কোনো 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' কাতর হ'য়ে পড়ি, তাহ'লে মেঘকে সত্য-সত্যই বলতে পারব, 'যা তত্র স্যাদ্‌যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ'। কেন-না, বিধাতার মানবী-গঠন বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা জন্মাবার পর এমন সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই নারী গড়বার সময় ধাতা ঠিক করতে পারেননি, কোন্ উপমান লক্ষ ক'রে তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হবেন। এই ক্ষেত্রে দেহখানিতে যে নারকেল গাছের প্রতিকৃতি ফোটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমার কাল্পনিক ভার্যার ঠাট নারকেল গাছের মতোই লম্বা এবং ক্ষীণ। এমন-কি খেংরা কাঠিটি পর্যন্ত বাদ যায়নি, হাত-পাগুলি সম্মার্জনীর মতন সূক্ষ্ম। কিন্তু তার মুখে এসে আমি বড়োই বিপদে পড়লুম। সে-আনন নানা উপাদানে রচিত। সেই অবয়বটির সাধারণ আকার চন্দ্রের সমান, কিন্তু সেটা পূর্ণচন্দ্র নয়, দ্বিতীয়া অথবা, খুব জোর তৃতীয়ার শশীকলার মতন লম্বা এবং অস্থূল। নাসাটি বংশীসদৃশ, কিন্তু সে-বেণু রাখালের নয়, সাপুড়ের। সে শিখরিদশনা, আকারে না-হ'লেও রঙে, আকারটা অনেকটা কাঁইবিচি গোছের। 'শ্রোণিভারাদলসগমনা' উক্তিটা তার সম্বন্ধে ঠিক না-হ'লেও,—সে ঝঞ্ঝার মতো তীব্র, তির্যক গতিতে চলত — সে 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং' ছিল বটে, যদিও সে-নম্রতা তালগাছের একপেশে দাঁড়ানোর মতোই কমনীয়, এবং ওই-তরুসদৃশই বিনা-বোঝায়। তার বর্ণ শ্যামার প্রায়, আর সেই মুখমসীর উপর পাউডার-বাহার অনেকটা সাদা-কালো মোসেইকের মেজের মতো। এখন জিজ্ঞাসা করি, এমন রমণী গ'ড়ে বিধি কি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, না অনভিজ্ঞতার ঢেঁটরা পিটেছিলেন? অবশ্য, ভবিষ্যতে যে-সকল ললনার সৃষ্টি করলেন তাদের মধ্যেও এই উপমাগুলি বর্তমান ছিল, কিন্তু সে-সব শশীবদনাদের দেখলে আমাদের মনে দ্বিতীয়াব চন্দ্রেব চিত্র ফুটে ওঠে না, শুধ্ সুধাংশুর কথাই স্মরণে আসে।

উপরোক্ত বর্ণনা দেখে কেউ যেন না-মনে করেন যে এমনি কোনো কান্তার উদ্দেশ্যেই কালিদাস *মেঘদূত*-এর বিখ্যাত শ্লোকটি লিখেছিলেন। সেখানে কবি এক যুবতীর কথা বলেছেন। আমি যে-রূপসীর বিষয়ে বলছি, তিনি আর যাই হোন্, যুবতী ছিলেন না। অনুমান করি, তাঁর বয়স তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে-কোনো সংখ্যায় নির্দেশ করা যেতে পারে। আরেকটি পার্থক্য আমি লক্ষ করেছিলুম : কালিদাস-কান্তা সংস্কৃত,বা প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করতেন, কিন্তু এই বিদুষী বক্র বাংলা এবং ভুল ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ করতেন। তবে আমায় এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে ইনি কবিমানসবাসিনী না-হ'লেও, অহিফেন-সেবী

কেন গণিতশাস্ত্রবিদের মানসকন্যা হ'তে পারেন। কেন-না, এঁর বয়ান দেখিয়ে শিশুকে পাঁচ লেখা, অঙ্গ দেখিয়ে সরলরেখা আঁকা, এবং ভঙ্গি দেখিয়ে কোণ সম্বন্ধে শেখানো যেতে পারে।

তাঁর নাম ছিল মাধুরী।

এখন দেখা যাবে শম্ভু আমায় এক উপমা-সঙ্গমে এনে হাজির করেছিল। আমি এত রূপের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না, কাজেই যে-বিস্ময় হৃদয়ের অন্তঃপুরে অনুভব করেছিলুম, তা আর লুকিয়ে রাখতে পারিনি, মুখে ফুটে উঠেছিল। তার ফলে শম্ভুর কড়া হাতের রামচিম্‌টিটি চিরদিন মনে থাকবে। সে-কাল্‌সিটে এক মাসেও সম্পূর্ণ মিলায়নি। সে যাই হোক্, আমায় স্বীকার করতেই হবে, শম্ভুর পছন্দ আছে।

সব সরঞ্জাম তৈয়ের হ'লে শম্ভু জ্যাঠামশাইকে এক চিঠি লিখলে যে, আমি এক ব্রাহ্মিকাকে বিয়ে করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছি। মেয়ে, ঠিক বলতে গেলে অনূঢ়া বুড়িটির যেমন ছিরি, তেমনি চালচলন। এই বিবাহ সবদিক থেকেই অচিন্তনীয়। সে আমায় বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনোই ফল হয়নি। এ-ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায়ের অনিতিবিলম্বে কলকাতায় আসা দরকার। দেরি হ'লে সর্বনাশ হবে। এই চিঠিখানি পাঠানোর পরদিন জ্যাঠামশায়ের তার পেলুম, তিনি কলকাতায় আসছেন। তাড়াতাড়ি শম্ভুর কাছে পরামর্শের জন্য গেলুম।

সে তারখানা দেখে বিচক্ষণভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'মাছে টোপ গিলেছে, এখন হচ্ছে খেলানোর দরকার। যদি ঠিকভাবে খেলাতে পারো, তাহ'লে তোমার বিলেত যাওয়া অনিবার্য।'

আমি বললুম, 'বিলেত যাওয়া যতদূর ছিল ততদূরেই রয়েছে, তবে একটা বিষম কাণ্ড যে অনিবার্য, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

সে উত্তর দিলে, 'লঙ্কাকাণ্ডই রাবণের প্রথম হার, আর রামের প্রথম জিৎ।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে রামের পক্ষেই ন্যায়টা ছিল। ওইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার গরমিল হ'য়ে গেল। তবে ভরসা আছে যে, আমারও একটি হনুমান সহায় আছে। এখন তার যুক্তিটাই শোনা যাক্।'

সে আর এ-কথার প্রতিবাদ না-ক'রে বললে, 'তুমি তোমার জ্যাঠামশাইকে আনতে স্টেশনে যেও না, বরং তোমার হবু অর্ধাঙ্গকে চায়ে নেমন্তন্ন করো।'

'তাহ'লে কি আর রক্ষা আছে। একেই তো জ্যাঠামশাই অগ্নিশর্মা হ'য়ে আসছেন ; তার উপর যদি বাসায় এসে দেখেন যে, গুণধর ভাইপো তাঁকে আনতে না-গিয়ে বাড়িতে ব'সে আশনাই করছে, তাহ'লে সেখানেই একটা হুলুস্থূল বেধে যাবে।'

'আমি তো তাই চাই। তুমি যাও, এই বেলা তাদের চায়ের নেমন্তন্নটা করোগে।'

আমি তার বাড়ি থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলুম, এমনসময় সে পেছু-পেছু ছুটে এসে বললে, 'দেখো আরেকটা কথা। জ্যাঠামশাই যদি তোমায় বিলেত যাওয়ার কথা বলেন তো তুমি ঘোর অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রো।'

আমি আর দ্বিরুক্তি না-ক'রে চ'লে এলুম। শম্ভুর উপরে আমার একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে যে-বিষয়ে হাত দেয়, সেটা যে কখনো বিফল হবে, এমন ধারণা আমার মনে স্থান পেত না। অল্পবয়সে আস্থা সহজেই আসে।

৭

পরদিন সন্ধ্যার সময় চায়ের আসর যখন খুব জ'মে এসেছে, বাসার দরজায় একটি ট্যাক্সি থামল, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে লাগল,—অবশ্য আনন্দে নয়, ভয়ে। অল্পক্ষণ বাদে জ্যাঠামশাই ঘরে এসে ঢুকলেন, সঙ্গে শম্ভু। আমি তো অবাক : এদের দু-জনের দেখা হ'ল কোথা? শম্ভুকে তাঁর পেছুনে দেখে কতকটা আশ্বস্তও হলুম। পরে যাই হোক্, আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই।

ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে, আহূতদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলুম। সে-সময় জ্যাঠামশায়ের মুখভঙ্গি আলেখ্যের উপযুক্ত হয়েছিল।

আমি বললুম, 'এঁদের নেমন্তন্ন করেছিলুম ব'লে স্টেশনে যেতে পারিনি, মাফ্ করবেন।'

তিনি বললেন, 'না-ক'রেই-বা করছি কী, বলো? ভাগ্যিস শম্ভু ছিল, নয়তো কী যে করতুম ভেবে পাই না। আমার কলকাতার সঙ্গে তো তেমন পরিচয় নেই, নয়তো তোমায় স্টেশনে যাবার জন্য তারও করতুম না। যাক্ সে-কথা।'

এখানে মাধুরী উচ্চ গলায় জ্যাঠামশাইকে বললে, 'আমরা অসবর্ণ বিবাহ-বিধির চর্চা করছিলুম। আপনার মত কী শোনা যাক্।'

জ্যাঠামশায়ের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল, তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাধুরী যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে, তখন অপরের নির্বাক হ'য়ে ব'সে থাকা ছাড়া উপায় নেই, কেন-না তার বাক্যস্রোত অফুরন্ত, সে-বন্যার সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য ; তার নাক, চোখ, মুখ এবং হস্তদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গই একসাথে বক্তৃতা শুরু করে। কাজেই আমার ইষ্টমন্ত্র জপ সফল হ'ল। জ্যাঠামশাই একটুক্ষণ বরদাস্ত ক'রে শ্রান্তির ওজরে চম্পট দিলেন। জানি না আমাকে আরো কতক্ষণ এই শ্রবণ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'ত, কিন্তু শম্ভু সহায় হ'ল। সে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, 'ওহে, ভুলে যাচ্ছ নাকি, আজ আমাদের বাড়িতে তোমাদের জ্যাঠা-ভাইপোয় যে খেতে যাবার কথা ছিল। সাতটা প্রায় বাজে।' এতেই শান্তি পেলুম, আপদ বিদায় হ'ল।

নিমন্ত্রিতেরা চ'লে গেলে আমি শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি হে ব্যাপারখানা কী খুলেই বলো না।'

সে জবাব দিলে, 'খোদ জ্যাঠামশায়ের মুখেই শুনবে ; আমি চললুম।'

আমি বললুম, 'বাঃ, তুমি বাধালে হাঙ্গাম, আর আমি সইব হ্যাপা। তা হ'তে পারে না, তোমায় ছাড়ছি না।'

সে আমার অনুরোধের উত্তর দেবার আগেই জ্যাঠামশাই এসে হাজির হলেন। শম্ভু দু-একটা বাজে কথা বলার পর উধাও হ'ল। আমি তাকে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে

পারলুম না, কারণ জ্যাঠামশাইকে জানানো হয়েছিল, তাতে-আমাতে এখন মনোমালিন্য ঘটেছে। তাই বুকের অশান্ত গুর্‌গুরুনি সত্ত্বেও, আমায় একাই সমরে অবতীর্ণ হ'তে হ'ল।

জ্যাঠামশাই কোনো প্রস্তাবনা না-ক'রেই বললেন, 'ওই মাগীটা নাকি তোমায় ফাঁসাবার মতলবে আছে?'

তিনি কী বলছিলেন আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, তবুও না-বোঝার ভান ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনার কথার মানে?'

'নেকা, মানে বুঝতে পারলে না! মানে, তোমায় ফাঁদে ফেলে দিয়ে বিয়ে করবার জোগাড় করছে নাকি? আমি আশা করেছিলুম, তোমার বুদ্ধি এত কম নয়, কিন্তু—।'

'আপনি বোধহয় জানেন না, মিস্ ব্যানার্জিকে রাজি করতে, আমায়—।'

'মিস্ ব্যানার্জি? ও কি বামুন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার ওখানে বিয়ে করা হ'তেই পারে না। স্বজাত হ'লেও এ-বিয়ে হ'তে দিতুম না, তার ওপরে আবার যখন বামুন ও-বিয়ে কখনোই হবে না।'

আমি একটু গরম হ'য়ে বললুম, 'মাফ্ করবেন, আমি ওঁকে বিয়ে করবই। আপনার মতো উদারচেতা লোকের কাছ থেকে আমি সামান্য জাতের জন্য আপত্তি কখনো আশা করিনি। আর আপনিই তো শিখিয়েছিলেন যে জাত-বিচার একটা মস্ত কুসংস্কার, সেটা যতদিন আমাদের সমাজ থেকে না-যায় ততদিন আমাদের মঙ্গল নেই। আজ আবার আপত্তি করলে চলবে কেন?'

তিনি একটু সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, 'দেখো, জাত-বিচার খারাপ হ'তে পারে, কিন্তু সেটার উপরেই তো আমাদের সমাজের ভিত্তি. সেটা লঙ্ঘন করলে সমাজও চুরমার হ'য়ে যাবে। সব জিনিস [নিজের] মতানুযায়ী করা যায় না, বিশেষত যখন সভ্যসমাজের মধ্যে বাস করতে হয়।'

তিনি আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি ধাঁ ক'রে ব'লে উঠলুম, 'অর্থাৎ নিজের বেলা আঁটিসুঁটি পরের বেলা দাঁতকপাটি। বক্তৃতা দেবার সময় বলব জাত-বিচার উঠিয়ে দাও, কিন্তু কাজের বেলা জাতটা সম্পূর্ণ বজায় রেখে চলব। আমার ধারণা, আমার মত অন্যরকম।'

এবার তিনি সত্যকারের ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। 'তোমার ধারণা! তোমার মত! এক রত্তি ছেলের আবার ধারণা, মত কী। এ-বিয়ে কিছুতেই হবে না।'

'আমার নিজের জীবনকে, আমার নিজের ধারণায় গ'ড়ে তোলবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আগে একবার যখন বিলেত যেতে চেয়েছিলুম, তখন আপনি বাধা দিয়ে আমার জীবনের গতি বদ্‌লে দিয়েছেন। এবার আর আমি কারও বারণ মানব না।'

'বিলেত যেতে চাও যাও। আমিও ভাবছিলুম তোমায় এবার পাঠাব, কিন্তু এ-বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না, বিশেষত তুমি এখন বড্ড ছেলেমানুষ ; এর মধ্যে বিয়ে করবে কী?'

'আপনি নিজেই বলেছিলেন বিলেত যাবার আগে বিয়ে ক'রে যাও, তখন কি আমার অল্পবয়সের কথা মনে পড়েনি। নিজে বিয়ে করতে গেলেই কি বয়সটা ক'মে যায়। আর

বিলেত যাওয়া? যখন যাবার জন্য অস্থির হয়েছিলুম, তখন যখন হয়নি, এখন যেতে আদৌ ইচ্ছে নেই। ধন্যবাদ, বিলেত যাওয়ার সাধ মিটে গেছে।'

'না, তা ইচ্ছে যাবে কেন? ও-মাগীর মোহে প'ড়ে যদি কোনো ভালো ইচ্ছে থাকত সেটাই আশ্চর্যের বিষয় হ'ত।'

'মিস্ ব্যানার্জি অপরের কাছে যাই হোন্, আমার কাছে তিনি দেবী, তাঁকে অপমান করলে আমার গায়ে লাগে।'

'হ্যাঁ, দেবী কেমন জানা আছে। শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করো, অনেক দেবীত্বের পরিচয় পাবে অখন।'

'শম্ভুর অন্য লোকের সম্বন্ধে কথা কইবার কী অধিকার আছে, জানবার জন্য আমার বড়ো ব্যগ্রতা হচ্ছে। আমি কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই না, নিজে যা-জানি তাতেই তুষ্ট থাকব।'

'তোমার হ'ল কী, নিজের জ্যাঠা-জ্যাঠাই, নিজের বন্ধু-বান্ধব, সকলকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা পেত্নীর জন্যে পাগল হয়েছ?.তাতেও আবার সে তোমার ডবল বয়সী। আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে শুনলুম যে, ওরা তোমার টাকার লোভেই এমন কাজ করতে ব্যস্ত হয়েছে। শোনো, আমার কথা শোনো : আমি কালই তোমার বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। এ-পাগলামি ছাড়ো।'

এমনি কত যে তর্ক চলল তার আর ইয়ত্তা নেই। শেষে যখন রাত বারোটার সময় শুতে গেলুম, তখন জ্যাঠামশায়ের গলা ভেঙে গেলেও আমায় নিরস্ত করবার আশা ভঙ্গ হয়নি।

৮

জ্যাঠামশাই আমায় বাগাতে পারলেন না। শেষে তিনি এমন-কি মাফ্-সুদ্ধ চেয়েছিলেন। আমায় বললেন, 'দেখো, আমি বুঝতে পারছি যে তুমি প্রতিশোধ নেবার জন্যে এমন করছ। তোমায় আশা দিয়ে বিলেত পাঠাইনি তার জন্যে আমি বিশেষ অনুতপ্ত। কিন্তু আমাদের জব্দ করবার জন্যে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে কী ফল।'

তাতে আমি উত্তেজনার ভান ক'রে বলেছিলুম, 'আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না। বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে একবার খুব কাঁচাবয়সে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা অনেকদিন পরিত্যাগ করেছি। আমি মাধুরীকে সত্য-সত্যই ভালোবাসি, এখন তাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে প্রস্তুত নই। বারে-বারে বিলেত যাওয়ার কথা বলার তাৎপর্য আমি নিতে [বুঝতে] পারলুম না।'

কাজেই জ্যাঠাইমাকে তার করা হ'ল কলকাতায় আসতে। তিনিও এসে হাজির। আবার তর্ক চলল, কত রাগ, কত উষ্মা, কত মান, কত অভিমান, কত বাক্, কত বিতণ্ডা সমাধা হ'য়ে গেল। অবশেষে শম্ভু আমায় উপদেশ দিলে যে এইবার আমার রাজি হবার সময় হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জ্যাঠাইমার সঙ্গে আমার নিম্নলিখিত কথোপকথন হয় :

জ্যাঠাইমা বললেন, 'বাবা, আমার নিজের ছেলেপিলে হয়নি, তোর ওপর আমার আশা-ভরসা সব নির্ভর করছে। তা, তুই যদি পর হ'য়ে যাস, তাহ'লে আমি আর বাঁচব না।'

'সে কী, জ্যাঠাইমা, আমি পর হ'য়ে যেতে গেলুম কেন? আমি আর যা-হই অকৃতজ্ঞ নই। কেমন ক'রে ভুলব যে তুমি আমায় মায়ের বাড়া যত্ন-আদর করেছ?'

'সে-ডাইনির হাতে পড়লে কি আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে? ওরে সে জাদু জানে, নয়তো কি আমার দুধের বাছাকে অমন ক'রে বশ করতে পারত! এতদিন তোকে কখনো কিছু জোর ক'রে বলিনি, আজ আমার এই অনুরোধটি রাখ্।'

আমি বললুম, 'কিন্তু জ্যাঠাইমা আমার সকল ইচ্ছেতেই যদি তোমরা অমত প্রকাশ করো, তাহ'লে আমার প্রতি কি দারুণ অবিচার করা হয় না?'

'আমি কোনোদিন তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করিনি। এই দেখ্-না তোর বিলেত—।'

আমি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, 'সে-কথা যাক্। বিলেত যখন না-যাওয়াই সঙ্কল্প করেছি, তখন ও-কথা নিয়ে চর্চা ক'রে কী হবে?'

'না, না, বাবা, রাগ করিস কেন? বিলেত যাবি বৈ-কি।'

'কখনোই নয়। তোমরা ভেবো না যে ঘুস দিয়ে আমায় ভোলাতে পারবে। সে বাপু যাই বলো, আমি মাধুরীকে বিয়ে করবই করব।'

'আমি বেঁচে থাকতে নয়। তুই তো অমন ছিলি না। শোন্, আমার কথাটি শোন্, শেষে যদি পস্তাতে হয়, তো বলিস। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, অমন ক'রে দ'গ্ধে-দ'গ্ধে মারিসনি। বিলেতে যা, বাছা, একটা বড়ো কিছু হ'য়ে আয়, বাপ-পিতেমর নাম রাখ্।'

'কিন্তু বিলেতে যখন যেতে চেয়েছিলুম, তখন তো ভেবেছিলে যে সেখানে গিয়ে মেম বিয়ে ক'রে বাপ-পিতেমর মুখে কালি দেব। মিস্ ব্যানার্জি কি মেমের চেয়ে খারাপ?'

'ঢের! ঢের! তাদের আর কোনো গুণ না-থাক্ চেহারাখানা আছে। ওরে, এখন বুঝতে পারছিসনি, ও-ডান তোর বুকের রক্ত শুষে খাবে।'

'ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবছি না, কিন্তু মাধুরীকে বিয়ে না-করলে আমার বুকের রক্ত এখুনি যে শুকিয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ নেই।'

'কেন তোকে কলকাতায় আসতে দিয়েছিলুম রে। আহা, ছোটো বৌ যখন মারা গেল তখন আমার হাতে তোকে সঁপে দিয়ে বলেছিল, দিদি, দেখো, আমার ছেলেটির ভার তোমায় দিলুম। ওর যেন কোনো বিপদ-আপদ না-হয়।' সে সতী-লক্ষ্মী স্বর্গে চ'লে গেল, আমায় এই নরক-যন্ত্রণা সহ্য করতে পেছুনে রেখে। আমার নিজের ছেলে যদি এমন করত তাহ'লে এত কষ্ট হ'ত না, কিন্তু তুই যে—।'

তাঁর কথা আর শেষ হ'ল না, তিনি উচ্চকণ্ঠে কান্না শুরু ক'রে দিলেন।

আমি স্ত্রীলোকের চোখের জল কখনো সহ্য করতে পারি না। অবশ্য, যখন স্থিরচিত্তে বিচার করি তখন বুঝি যে, নারী-নয়নকোণে অশ্রু কখনো সম্পূর্ণ শুকায় না ; কিন্তু সে-ঝর্না

একবার ঝরতে শুরু হ'লে তার স্রোতের মুখে আমি দিশাহারা, আত্মহারা হ'য়ে পড়ি। সেইজন্যই বোধহয় রমণীরা আমায় অত সহজে ভিজিয়ে ফেলতে পারেন। জ্যাঠামশাই যা সাতদিনে করতে পারেননি, জ্যাঠাইমা তা সাত মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করলেন।

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম, 'আহা, জ্যাঠাইমা, ও কী! ও কী! এতে কান্নার কী আছে! আচ্ছা, তোমার নিজের যদি একান্ত অনিচ্ছে হয়, মাধুরীকে না-হয় বিয়ে করব না। কিন্তু বিলেত যেতে আমি রাজি নই।'

তাঁর অশ্রু পলকে উধাও হ'ল, মুখে হাসি ফুটল। তিনি ভাঙা গলায়, হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'আমার বাছাকে ভালো ক'রে বললে, সে যে সব করতে পারে, তা আমি জানি। তাই, কাল সন্ধের সময় উনি যখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমি বললুম, "আচ্ছা, তাকে রাজি করাবার ভার আমি নিলুম। তোমরা কথা বলতে জানো না তাই তোমাদের কথা থাকে না। কিন্তু দেখ্ বাবা, তুই বিলেতটা যা।" '

'ওই-অনুরোধটি আমায় ক'রো না।'

'তুই বুঝতে পারছিসনি। আমি জানি এই ঘা-টা তোকে কত লাগবে। এখানে থাকলে তাকে ভুলতে পারবিনি আর সে-রাক্ষুসীও তোকে ছাড়বে না। নতুন দেশে যা, নতুন জিনিস দেখে এ-সব পুরানো কথা ভুলে যাবি।'

এইরকম অনেক যুক্তি-তর্কর পর আমি বিলেত যেতে সম্মত হলুম। যাবার সময় জ্যাঠাইমা বাষ্পাকুল লোচনে, অর্ধরুদ্ধ কণ্ঠে আমায় বলেছিলেন, 'দেখিস বাবা, সেখানে যেন আবার একটা কাণ্ড ঘটাসনি।'

তাঁর উপদেশ বিফল হয়নি,—ফিরে এসেছি অক্ষত।

মাধুরী সম্বন্ধে দু-কথা ব'লে খতম ক'রে দি[ই]। শুনেছি, আমি বিলেত যাওয়ার কিছুদিন বাদে এক অশীতিপরের সঙ্গে তার মালাবদল হয়। বৃদ্ধ বেচারির এ বিপুল সুখ বেশিকাল স্থায়ী হয়নি। বিধির চোখ টাটাল, মাধুরীপতি মাধুরীকে অনেক বিষয় দিয়ে স'রে পড়লেন। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি, সাক্ষাৎ হ'লে ইচ্ছা আছে আরেকবার তার পাণিপ্রার্থী হব। অবশ্য এ-বারটা তাকে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করতে দ্বিধাবোধ করব না।

১৩৩০ মাঘ

দুকূলহারা

ছেলেবেলা থেকেই অবলা আমার চোখে প্রবলা। আমার জীবনগঠনে তাঁদের কোমল হাতের দায়িত্ব যে কতটা, তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত। যতদিন মনে পড়ে, একজন-না-একজন নারী আমার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছেন, দেখতে পাই। কবে থেকে এমন শুরু হয়েছে বলতে পারি না ; তবে প্রথম যেদিন এই তথ্যটা আবিষ্কার করি, তখন আট-নয় বছরের বেশি বয়স হবে না। তখন চলছে আমার এক দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার অধিকার। একদিন আমি হঠাৎ জানতে পারলুম যে, তাঁকে ছেড়ে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাঁর বয়স আমার তিনগুণ না-হ'লেও দ্বিগুণ ; তিনি থাকতেন আমাদের বাড়িতেই ; চেহারাখানার কথা ঠিক মনে নেই, তবে নেহাৎ মন্দ ছিল ব'লে বোধ হয় না। এখনো বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে একটা ছুটির সারাবেলা হিন্দু সমাজের অন্যায় অত্যাচারের কথা ভেবেই কেটে গিয়েছিল। কেন-না তাঁর সঙ্গে পরিণীত হবার এই তুচ্ছ আত্মীয়তা ছাড়া আর যে কোনো বাধা থাকতে পারে, তা আমি মোটেই ভাবিনি। তখন অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসটা অটুট ছিল ; তাই বিধাতার কাছে অনেক প্রার্থনা জানিয়েছিলুম, অনেক পূজা মেনেছিলুম, যাতে ক'রে পলকের মধ্যে আমরা উভয়ে ক্রিশ্চান কি মুসলমান হ'য়ে যাই। সেদিন জানতুম না যে, হিন্দুর দেবতায় আর মুসলমানের দেবতায় সতত বিরোধ, তাঁরা আর যা-করুন বা করতে পারুন, সহসা ধর্ম বদ্‌লে দিতে নারাজ এবং অক্ষম। অবশ্য আমার প্রথম প্রণয়ের দৌড় কয়েক ঘণ্টা মাত্র ; কিন্তু তারই মধ্যে ব্যর্থপ্রণয়ীর সকল কষ্টই আমায় সহ্য করতে হয়েছিল। এমন-কি প্রিয়ার নিষ্ঠুর পরিহাস-সুদ্ধ বাদ যায়নি। অবশেষে কথাটা যখন মার কানে উঠল, তখন বকুনি থেকে আরম্ভ ক'রে প্রহারে গিয়ে আমার নির্যাতনের অন্ত হ'ল।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দান শুরু হয় বাড়িতে। সেটা কতদূর সত্য তা জানি না, কিন্তু অনুরাগ যে বাড়িতেই আরম্ভ হয়, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নেই। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ। জানি, এ-কথা শুনে অনেকে শিউরে উঠবেন, বলবেন এটা বিকৃতচেতাদের বিষয়ে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অলীক। তাঁদের কাছে আমার আর্জি এই যে, তাঁরা যেন মনু-পরাশরের রচিত চশমা ছেড়ে স্বাভাবিক চোখে নিজ-নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সুস্থ দৃষ্টি চশমার সাহচর্যে ঝাপ্‌সা হয়। এ-দোষটা চশমা-কারকের নয়, বা চশমার নয়, শুধু চশমা-ব্যবহারীর, যেহেতু তিনি যোগ্যতা না-বিচার ক'রেই চশমাখানি তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়েছেন।

এই পূর্বরাগ-অভিনয়ের উপর যবনিকা পতন হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, 'শতং বদ মা লিখ' বাক্যটা কতদূর মিথ্যা। লেখার একটা গুণ আছে যে, সেটা লোকে সাধারণত পড়ে না ; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার মোটেই বিরল নয়, বিশেষত যখন কথাটা অন্য লোকের বিষয়ে। তাই সেদিন থেকে স্ত্রীজাতিকে দূর থেকেই ভালোবেসে এসেছি, মুখ ফুটে বলতে সাহসই হয়নি (দু-একবার ছাড়া)।

২

আমার প্রকৃতির কতকটা পরিচয় দিয়েছি। এখন যদি বলি যে ললিতার প্রভাব অল্পবয়স থেকেই অনুভব ক'রে আসছি, তাহ'লে সেটা কিছু আশ্চর্য শোনাবে না।

ললিতা ছিল আমার বাল্যসখী। তার পিতা মিস্টার পি. সি. চ্যাটার্জি সেকালের একজন বিখ্যাত বারিস্টার এবং নামকরা সাহেব। মিস্টার চ্যাটার্জির পুরা নাম আজ অবধি জানলুম না। বোধ করি খাঁটি সাহেব-পুঙ্গবদের নাম একাক্ষরাবৃত্তি হবে। সে যাই হোক্, দেশী ললিতা তাঁর হাতে প'ড়ে বিলেতি 'লিলি' হয়েছিল। আমরাও তাকে এই নামেই ডাকতুম। বিদেশী ছাঁচেই তাকে গড়বার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাংলা তাকে শেখানো হয়নি, কিন্তু ইংরেজিতে তার অসাধারণ দখল ছিল। ওই-ভাষায় এমন বই ছিল না যা সে পড়েনি, — পাঠ্য, অপাঠ্য, কুপাঠ্য সকলরকম।

নামের সার্থকতা বড়ো-একটা দেখা যায় না। আমি একজন শশীমুখীকে জানতুম, তাঁকে মসীমুখী বললেই ভালো হ'ত। কিন্তু লিলি সত্যই কুমুদের মতো অমল ; তার মনে ছায়ার, নীচতার লেশমাত্র ছিল না। চেহারাও লিলির মতোই অনুদ্ধত, লিলির মতোই কোমল, লিলির মতোই পবিত্র। সাধারণের চোখে সে হয়তো সুন্দরী ব'লে ঠেকবে না। দেশী মতে তার একটু কম লম্বা হওয়া উচিত ছিল। মুখখানি আরেকটু পুরুষ্টু এবং সুগোল হ'লে ভালো হ'ত ; ললাটখানি একটু বেশি প্রশস্ত, গলা একটু অধিক দীর্ঘ। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতে সৌন্দর্যের বিচার হয় শুধু মুখ দেখে। দেহের গঠনের উপর লাবণ্য আর রূপের যে কতটা নির্ভর, তা আমরা বুঝি না, বা বুঝতে চেষ্টা করি না। তাই অনেক বিখ্যাত রূপসীর ঠাট কাঠ-সদৃশ, অপরের-বা জালার মতন। এককথায় বলতে গেলে দেশী সুন্দরীরা মুখসর্বস্ব! লিলির মুখ নিখুঁত না-হ'লেও, তার দেহখানি ছিল নির্দোষ। সে-অঙ্গে কোথাও একটি সরলরেখা ছিল না ; সকল অবয়বই বক্রিম, এবং পূর্ণ, কিন্তু বেশি পূর্ণ নয়। আমি তাকে অনেকবার বলেছি, 'লিলি, তুমি সুন্দর যেহেতু চাঁদ সুন্দর। তোমাদের দু-জনের মধ্যেই ওই ষোড়শ কলাটির অভাব।' আর তার চোখ। অমন চোখ আমি আগে কখনো দেখিনি। যখন ছায়ায় থাকত, তখন মনে হ'ত ধূসর ; কিন্তু যদি তাতে আলোর একটি রশ্মি লাগত, অমনি সে দুটি পাটল মখমলের মতো হ'য়ে উঠত। মনে আছে, একবার Impressionist School-এর একটি রমণীর ছবি দেখেছিলুম। তাতে মুখের অন্যান্য অংশ ক্ষীণ রেখায় পরিব্যক্ত ক'রে শিল্পী চোখদুটিকে অস্বাভাবিকরকমের বড়ো ক'রে এঁকেছিলেন। তখন বোধ হয়েছিল, চিত্রটা অর্থহীন, অসুন্দর। কিন্তু লিলির মতো মেয়ের ছবি আঁকতে গেলে চোখের উপর সমস্ত জোর

দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, কারণ তার আননের বিশেষত্বই ছিল তার চোখ। সে দুটি সত্যই যেন তার আত্মার গবাক্ষ।

লিলির সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। শৈশবে আমরা অনেক স্বামী-স্ত্রী খেলা করেছি, অনেক ঘরকন্না পেতেছি, আবার অনেক মারামারিও করেছি। পুনরায় কৈশোরে সে মেয়েমানুষ ব'লে নাক সিঁটকেছি, অনেক ঘৃণা করেছি। ফের যৌবনের প্রারম্ভে তাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছি। আমাদের দু-জনের অনেক পার্থক্য, অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও, মনের একটা মিল ছিল। আমরা উভয়েই ছিলুম নবীনপথের পথিক, উভয়েই ছিলুম পুরাতন-দ্রোহী। তবে সে ছিল গরম, আমি ছিলুম নরম। আরেকটা সূত্র আমাদের কঠিন বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল, সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ, আর বাংলা ভাষার প্রতি দারুণ বিরাগ।

আমার ইস্কুল-জীবন কলকাতার বাইরে অতিবাহিত হয়েছিল। ছুটিতে যখন দেশে আসতুম, তখন লিলির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হ'ত বটে, কিন্তু আমাদের সখ্যের অবিচ্ছিন্নতা ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছিল। সেটাকে আবার জমিয়ে তুলতে পেরেছিলুম এই সাহিত্যচর্চার সাহায্যে। ইংরেজি কাব্য পড়া এবং আলোচনা করা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের রুচির মিল ছিল না।

কলা বিষয়ে লিলির আদর্শ ছিল Victorian, অর্থাৎ সে ভাবের ঔদার্যের, ভাবের শিক্ষা-প্রদত্তের পক্ষপাতী ছিল। অর্থের প্রাচুর্য না-থাকলে সে কলার আদর করতে পারত না। আমি তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করতুম যে সাহিত্য অর্থের বোঝা, সুশিক্ষার বোঝা মাথায় ক'রে বেশিদিন বাঁচতে পারে না। সেইজন্যই ইংরেজি সাহিত্যের একটা যুগ অত নিষ্প্রাণ। ডাক্তার জনসনের লেখায় এই উদ্দেশ্য আছে ব'লেই তা অত অল্পায়ু, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা মানের ধার ধারত না-ব'লেই অত উপাদেয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ—তাঁর কাব্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য, তাই সেগুলা কীট্স্ বা শেলির কবিতাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। এই কারণেই অস্কার ওয়াইল্ড সুখপাঠ্য আর পিনেরো অপাঠ্য। হিউগোর লেখার মধ্যে উদারতার ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তা অসুন্দর ; আর আনাতোল্ ফ্রাঁস নিরর্থ কিন্তু রূপের রসের সাগর। পরিশেষে এটাও তাকে বলেছিলুম যে, ভের্‌লেন ফরাসি কাব্যসুন্দরীকে অর্থ-উদ্দেশ্যের কারাগার থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন ব'লেই, বর্তমান ফরাসি কবিতা সজীব হ'য়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য আমাদের কাছে হেয় ছিল, নচেৎ তাকে দেখিয়ে দিতে পারতুম যে, বৈষ্ণব-পদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতই প্রশংসনীয় হোক্-না-কেন, কাব্যের দিক থেকে তা টিঁকে না। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকেরা মানের অংশটা একটু কম ক'রে, রসের দিকে লক্ষ্যটা যদি একটু বেশি রাখতেন, তাহ'লে তাঁদের এত শীঘ্র পাত্‌তাড়ি গুটুতে হ'ত না।

তখন বয়স ছিল অল্প, চিন্তা ছিল অনুপস্থিত, অভিজ্ঞতা ছিল পুস্তক-লব্ধ। কাজেই ধার ক'রে ভাবনা আনতে হ'ত। ওঃ, কী তর্কই হ'ত, যেন আমারা দু-জনে হচ্ছি জগতের হর্তা, কর্তা, বিধাতা ; মানবের সুখদুঃখের কর্ণধার, জীবন-গঙ্গার ভগীরথ। দু-ঘণ্টার বিচারে আমরা

যে-সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে ফেলতুম, সেগুলি নিয়ে কতশত মনীষী গত পাঁচ হাজার বৎসর মাথা ঘামিয়েও দিশাহারা হ'য়ে গেছেন। তবে নিজের পক্ষে একটা কথা ব'লে রাখি, আমার অপরাধটাই ছিল কিঞ্চিৎ লঘু, কারণ আমি বেশি আশা করতুম না।

জীবনের সঙ্গে পরিচয় লিলির চেয়ে আমার একটু বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের কারণ, জীবনের গতি, এ-সব খোঁজা আমি অনেকদিন থেকেই ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু লিলি যেমন অর্থহীন সাহিত্য পছন্দ করত না, তেমনি জীবন যে খেয়ালী, তা-ও বিশ্বাস করত না। তার বিশ্বাস ছিল, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আপনাকে পূর্ণ ক'রে তোলা, আপনাকে উৎকর্ষের চরম সীমায় নিয়ে যাওয়া। সে ভাবত বিকাশের অন্ত নেই। আমার মধ্যে এ দারুণ ভ্রান্তিটা ছিল না। আমি জানতুম একটা গণ্ডির বাইরে মানুষ কখনোই এগুতে পারে না, সেইজন্যই সভ্যতার পতন এবং অভ্যুদয় আমরা ইতিহাসে বার-বার দেখতে পাই। লিলি এ-কথা শুনলে রেগেই আগুন হ'ত। বলত, 'তুমি হচ্ছ ভীষণ pessimist। তাই যদি হবে তবে এই যে যুগ-যুগ ধ'রে মানুষ প্রয়াস ক'রে আসছে তার মানে কী?'

আমি উত্তর দিতুম, 'মানে? মানে কিছুই নেই। যা-আছে তাই থাকবে। সকলই একটা অন্ধ নিয়তির চাকায় প'ড়ে একই জায়গায় ঘুরছে। কিন্তু মানুষ আশা না-হ'লে বাঁচতে পারে না; আর আশা অন্ধ, তাই সত্যকে কখনো দেখতে পায় না; তাই ভাবে, বুঝি মানুষ এগুচ্ছে।

এ-কথা তার সহ্য হ'ত না, সে জিজ্ঞাসা করত, 'তবে কি বলতে চাও, তোমার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য কোনো আদর্শ, কোনো লক্ষ্য নেই।'

আমি বলতুম, 'হ্যাঁ আছে, একটিমাত্র, জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলা। আমার মনে হয়, জীবন একখানি পারসি গাল্‌চের মতো। গাল্‌চে-রচয়িতার শুধু একটা আদর্শ থাকা চাই, সেটা হচ্ছে যেন রংগুলো চোখে বেখাপ্পা না-লাগে। কিন্তু লাল রং এতটা দিতে হবে, সবুজ রং এতটা দিতে হবে, এমনতর বাঁধা নিয়ম নিয়ে কারপেট তৈরি করা যেতে পারে না। খেয়াল, রুচি এই দুটোই হচ্ছে পারসি গাল্‌চের সৌন্দর্যের কারণ। আমি আর কোনো অপরাধ মানিনে, কেবল সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে যে-পাপ, তা দমন করা উচিত মনে করি।

এইসব শুনে লিলি আমায় pessimist বলত বটে, কিন্তু আমি আবার তাকে optimist বলতুম। কাজেই শেষ জয় যে কার হ'ত, তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত।

তবে আমরা উভয়েই সমানভাবে বিশ্বাস করতুম যে, উপস্থিত রীতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক, অর্থাৎ দু-জনেই মনে করতুম, আমরা শ্রেষ্ঠ, আমাদের মতে যেটা ভালো সেটাই হওয়া উচিত। অপরপক্ষেরও যে কিছু বলবার থাকতে পারে, তা আমাদের কল্পনাতেও আসত না। সে বলত শিক্ষা ভালো হ'লেই, মানুষ আপনি বদ্‌লে যাবে। আমি বলতুম, শিক্ষা যে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা খারাপ, তা এখনো আবিষ্কার হয়নি, এবং হ'লেও মানুষ তা নিতে চাইবে না। তাকে জোর ক'রে ভালো করতে হবে।

সেদিনকার তর্কের কথা মনে পড়লে, আজ হাসি পায়। কী বিষম গর্ব! কী দারুণ ভ্রান্তি! কিন্তু আমি বরাবর ব'লে আসছি, ভুল আর দম্ভ যৌবনের অধিকার। তাব জন্য তাকে মার্জনা করা যেতে পারে।

আমার যুক্তিতর্কের ফলে লিলির মত না-বদ্‌লালেও, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা যে পেকে উঠছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩

আমাদের সম্বন্ধ ছিল মৈত্রীর। কবে সে-সৌহৃদ্য প্রণয়ে পরিণত হ'ল, তা ঠিক ক'রে বলতে পারি না। শুনেছি উত্তাপ সব দ্রব্যের মধ্যেই নিহিত থাকে, প্রচ্ছন্নভাবে। বোধ করি, আমার মনেও তেমনি ক'রেই আসক্তি লুকানো ছিল বাল্যকাল থেকেই। কিন্তু অল্পবয়সের সেই নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা আমি ভুলতে পারিনি। এখন আর চট্ ক'রে মনের কথা প্রকাশ করতুম না।

লিলির কাছে যখন থাকতুম, তখন তর্ক ক'রে, গল্প ক'রে সময় সুখেই কেটে যেত। কিন্তু যখন তাকে ছেড়ে যেতুম তখনই আকাঙ্ক্ষা আকুল হ'য়ে উঠত। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলুম লিলি সুন্দরী, কেন-না তার রূপ শস্তা আপাতরমণীয় ছিল না। তেমনি অনেক বিনিদ্র রাত জেগে উপলব্ধি করেছিলুম, তাকে কত ভালোবাসি। প্রখর কামনায় হৃদয় মন্থিত হওয়া সত্ত্বেও যে আপনাকে ধরা দিয়ে ফেলিনি, তার জন্য নিজেকে নিজে বাহাদুরি না-দিয়ে থাকতে পারছি না। আর ঘটনাচক্রের আকস্মিক বিবর্তন না-হ'লে, সে-গোপনকথাটি যে কখনো প্রকাশিত হ'ত, তা মনে হয় না।

সে আজ অনেকদিনের কথা, স্মৃতি একটু মলিন হ'য়ে এসেছে। তাই সেদিন লেখা ডায়ারি থেকে উদ্ধৃতি করছি :

'আজকের দিনটা চিরকাল আমার মনে অঙ্কিত থাকবে। আমার কোনো কুসংস্কার নেই, তবু মনে হচ্ছে কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিলুম। মানুষের ভাগ্যে এত সুখ, এত আনন্দ থাকতে পারে, তা আমি আগে ভাবিনি। মনে হচ্ছে, সকল কামনা মিটে গেছে, সকল সাধনা সার্থক হয়েছে, সকল ভোগ শেষ হ'য়ে গেছে। আজ যদি মরণ এসে আমাকে ডাকে, আমি তাকে বলতে পারব, চলো, আমি যেতে প্রস্তুত।

'লিলিদের বাড়িতে আজ একটা "টেনিস-পার্টি" ছিল। আমার যেতে একটু বিলম্ব হ'য়ে গিস্‌ল। সেখানে পৌঁছে দেখি দু'টি পাকা খেলোয়াড়ে নিজেদের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত, আর অভ্যাগতেরা তাই দেখতে তন্ময়। লিলিকে সেই জনতার মধ্যে দেখতে পেলুম না। কেই-বা আমায় পুছবে, কেই-বা আমায় বসবার জন্য একটু স্থান ক'রে দেবে! বেহারাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, মিস্ বাবার তবিয়ৎটা ভাল না-থাকার জন্য, তিনি নিচে আসেননি, নিজ কামরায় আছেন। আমি তার খোঁজে গেলুম।

'লিলি তার বসবার ঘরে একটা সোফার উপর শুয়ে বই পড়ছিল। আমি যেতেই বইখানা মুখ থেকে নামিয়ে বল্‌লে "বাঃ, তোমায় 'ফ্লানেল্‌স্' পরে তো বেশ দেখাচ্ছে।"

'আমি বললুম, "সেটা তো কিছু আশ্চর্য নয় ; আমি চিরদিনই সুপুরুষ। কিন্তু রুগী সাজ্‌লে তোমায় বেশ মানায়।"

'সে একটু সপ্রতিভ হেসে বললে, "না সাজা নয়, সত্যই আজ শরীরটা ভালো নেই,

তাই আর রোদ্দুরে বেরুইনি।" তারপর একটু থেমে, আবার বললে, "তা, তুমি আমার কাছে ব'সে রইলে কেন, যাও খেলো গে।"

' "খেলার কি আর জো রেখেছ : যে দুটি জোঁক খাড়া করেছ, অন্য লোকের সাধ্য কি টেনিস্ কোর্টে প্রবেশ করে। আর আমার খেলার বহর তো জানোই। এত লোকের সামনে বাঁদর সাজতে প্রস্তুত নই। বরং তোমার কাছে বসি। কী পড়ছিলে?"

' "শেলি। শেলি যে কত বড়ো সমাজ-সংস্কারক, তা আমি আগে ভালো ক'রে উপলব্ধি করিনি।"

' "তোমার পুরানো রোগ গেল না। কাব্য পড়ছ, তাতে সমাজ-সংস্কারের আভাস পাওয়া যায় কি-না তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ধারণা পেতে চাও যদি, তবে মিল্ বেন্থাম্ পড়ো, শেলিকে নিয়ে অত টানাটানি কেন! আর দেখো, যেখানেই শেলি কবিতার বহিঃরেখার মধ্যে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন, সমাজের অত্যাচার, স্ত্রী-পুরুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চালাতে চেষ্টা করেছে, সেখানেই বিপদ ঘটিয়েছে। সেইজন্যই সে কখনো কীট্সের বিশুদ্ধতার অংশী হ'তে পারেনি।"

'এইরকমভাবে খানিকক্ষণ তর্ক চলতে লাগল। কথার উত্তেজনায় লিলি উঠে বসেছিল। আমি চেয়ার ছেড়ে তার পাশে গিয়ে স্থান অধিকার করলুম। কিন্তু আগের ব্যবধানটাই ছিল ভালো। কাছে যেতেই হঠাৎ বিনা-কারণে আমাদের বাক্য রোধ হ'য়ে গেল। কী একটা অজানা সঙ্কোচ আমাদের পেয়ে বসেছিল। তার বিষয়ে বলতে পারি না, তবে আমার নিজের মনে হচ্ছিল, যেন আমার বুকটা বর্ষার মেঘের মতো বিদ্যুতে ভরা ; কখন যে হঠাৎ চিক্মিক্ ক'রে উঠবে তা জানা নেই। কোনো এক অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা আমায় গিল্তে আসছিল। কীসের জন্য এই অসহ্য প্রতীক্ষা? এ যেন ঝড়ের আগে গুমোটের মতো।

'আলাপের মধ্যে এমনি এক-একটা আচম্‌কা বিরাম এসে পড়ে, যা শেষ করতে, যা ভাঙতে আমরা অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু মুখ ফোটাতে পারি না। সাধারণত এইরূপ নীরবতার মূলে থাকে কথার অভাব, ভাবের অল্পতা ইত্যাদি ; কিন্তু আজকের স্তব্ধতাটা তেমন নয়, এর উৎপত্তি যেন বাক্যের প্রাচুর্য থেকেই। আমার বোধ হচ্ছিল, যেন এরপর যা বলা হবে সে অনেকদিনকার কথা, তা জানতে লিলির বা আমার, কারুরই, বাকি নেই।

'এমনি অবকাশকেই আমি অনেকদিন থেকে ভয় ক'রে আসছিলুম। যা ভয় করেছিলুম, আজ তাই হ'ল।

'আমি বইটা নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলুম। দুইজনেই নির্বাক্। দুইজনেই অধোমুখ। দু-একবার হাতে হাত ঠেকল, চোখে চোখ পড়ল, আর অমনি আমার ঘাড়ে কী একটা ভূত চাপল। আমার লজ্জা কেটে গেল, প্রতিহত হবার ভয় কেটে গেল, আমি ব'লে উঠলুম, "আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি, শেলি একটা কথা ব'লে গেছেন, যেটা চিরন্তন সত্য।

I fear thy kisses, gentle maiden,
  Thou need'st not fear mine,
For my heart is too deeply laden
  Ever to burden thine."

'লিলির গালে একনিমেষের জন্য স্নায়ুর সকল রক্ত ছুটে এল ; চোখে একটা কীসের দীপ্তি জ্ব'লে উঠল। মুহূর্তেই সে-বহ্নি নিভে গেল, গালদুটি থেকে সকল রক্ত চ'লে গেল, সে দুটো ফ্যাকাসে, স্বচ্ছ হ'য়ে পড়ল। এক সেকেন্ডের মধ্যেই এইসমস্ত সম্পন্ন হ'য়ে গেল, কিন্তু আমার কাছে সেই একপল মনে হচ্ছিল, একটা যুগ ব'লে। আর চুপ ক'রে থাকতে পারছিলুম না। কী একটা বলতে যাচ্ছিলুম, এমনসময় হঠাৎ সে আমাকে তার নিজের দিকে টেনে নিলে। উঃ, হাত দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। মনে হ'ল গালটা বুঝি পুড়ে যায়। তারপর ক্ষুদ্র এক অণুপলের জন্য তার তপ্ত ঠোঁট আমার মুখ স্পর্শ ক'রেই কীসের সঙ্কোচে বিরত হ'ল। আমার মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলছিল ; শিরায়-শিরায় শোণিত যেন কেটে বেরুতে যাচ্ছিল। কী একটা অশান্তি, কী একটা অতৃপ্তি আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। কিন্তু লিলির উপরে এই প্রথম চুম্বনের ফল হয়েছিল অন্যরূপ। তার সকল শক্তি, সকল প্রয়াস, সকল উত্তাপ সে যেন সেই চুমোর মধ্য দিয়ে আমায় চালান ক'রে দিয়েছিল। তার অবসন্ন, স্পন্দহীন, শ্লথ দেহখানা বাহুর মাঝে তুলে নিলুম ; সে-চুমোর বৃষ্টি আর থামে না। লিলি নির্বাক্, নিশ্চেষ্ট, কেবল তার ব্যাকুল চোখদুটো যেন আমায় বলতে লাগল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আর সইতে পারি না।"

'তাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে আমি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলুম। তখনো প্রবল বেগে নিঃশ্বাস বইছিল। একটু প্রকৃতিস্থ হ'তেই জিজ্ঞাসা করলুম, "লিলি এর মানে কী?"

'সে বললে, "কৈফিয়ৎ তো আমার দেয় নয়, আমার প্রাপ্য।"

'আমি বললুম, "বিশেষ কিছু কৈফিয়ৎ দেবার নেই। অল্পকথায়, তোমায় ছেড়ে আমার থাকা অসম্ভব। অনেকদিন থেকে জানতে পেরেছি তোমায় ভালোবাসি ; কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করতে সাহসী হইনি। আর চেপে রাখতে পারলুম না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আজ আর পারলুম না। আমি তোমায় ভালোবাসি — কত ভালোবাসি তা ব'লে বুঝাতে পারব না।"

'সে সরলভাবেই বললে, "ভালোবাসা জানানো তো মেয়েমানুষের কাজ নয়, নচেৎ অনেকদিন আগেই জানাতুম। যতদিন মনে পড়ে তোমাকে, শুধু তোমাকে ভালোবেসে এসেছি। কিন্তু বলি কী ক'রে? কী জানি, তুমি আমাকে হয়তো অবজ্ঞার চক্ষে দেখো। আজ তোমার কথায় হঠাৎ আত্মসংযম হারিয়ে ফেললুম ; লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তোমার কাছে ধরা দিলুম। এখন আমায় নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করো।"

'আমি তার হাত চেপে ধরলুম, বললুম, "লিলি, তোমার কি আমার উপর এতদূর বিশ্বাস হবে যে তুমি তোমার সমস্ত জীবন আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারবে?"

'সে কোনো উত্তর দেবার আগেই সিঁড়ির উপর জুতার আওয়াজ শুনা গেল। আমি তার হাত ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "আমি আজ চললুম, আমায় মাফ্ করো, কিন্তু এখন তৃতীয়ের উপস্থিতি আমার সহ্য হবে না। কাল আমি মি. চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা ক'রে তার কাছ থেকে তোমায় চেয়ে নেব। কিন্তু আজ আর থাকতে পারছি না। এখন নির্জনতার জন্য আমার অন্তরাত্মা উৎসুক, উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।" '

আমার এই আবেগ দেখে কেউ যেন চট্ ক'রে আমায় sentimental আখ্যা দিয়ে দিয়ে না-বসেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, তখন আমার বয়স খুব জোর বাইশ। আরেকটা কথা। বেচারা বাঙালি-সন্তানের ভাগ্যে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার এত সুযোগ ঘটে না যে, সে প্রথম প্রণয়ে সম্পূর্ণ নভেলিয়ানা বিবর্জিত হ'তে পারে। আমাদের নারী সম্বন্ধে অধিকাংশ ধারণাই পুস্তক থেকে নেওয়া, বিশেষত ইংরেজি পুস্তক থেকে। কাজেই আমার উপরোক্ত উপন্যাসী উচ্ছ্বাসে বিশেষ বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

৪

গোল বাধল কিন্তু এখন থেকেই। আবার পুরানো ডায়ারি থেকে গোটাকয়েক ছত্র তুলে দিই। এটা হচ্ছে তার পরদিনের কথা।

'আজ সকালে উঠেই প্রথম কথা মনে পড়ল যে লিলি আমায় ভালোবাসে। ছুটে তাদের বাড়ির দিকে যেতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ফিরে এলুম। ভোর ছ-টার সময় কারুর সঙ্গে দেখা করা চলে না, এমন-কি লিলির সঙ্গেও নয়।

'বেলা আর কাটতে চায় না। খবরের কাগজ নিয়ে বসলুম, কিন্তু কী পড়ছি মাথায় ঢুকল না। খালি মনে আসছে কাল সন্ধ্যাবেলার কথা। একখানা বই নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগালুম। কিন্তু তার প্রতি পাতায়-পাতায় দেখতে পেলুম শুধু লিলির লজ্জারুণ মুখখানি। শেষে পড়ার ভান ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যে সুখস্বপ্নে নিমজ্জিত হলুম। কিন্তু ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করবার শক্তিও আমি আজ হারিয়ে ফেলেছিলুম। মনকে নানা বিষয়ে নিবেশ করতে চেষ্টা করলুম ; কিন্তু চিন্তাগুলো কেমন এলোমেলোধরনের হ'তে লাগল। আমার মস্তিষ্কে কেবল একটি ছবি স্পষ্ট হ'য়ে জাগছিল,—লিলির দ্বিধা-কম্পিত, রক্তোজ্জ্বল, সঙ্কুচিত অধর আমার মুখ স্পর্শ করছে। যা-ই ভাবতে যাই এই চিত্রখানি স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগল।

'এমন ক'রে ১০টা আন্দাজ বাজিয়ে দিলুম। লিলির কাছে প্রতিশ্রুত ছিলুম যে, মি. চ্যাটার্জির সঙ্গে আমাদের বিবাহের কথা কইব। কিন্তু সাহসে কুলাল না। ১০৷৷০ বাজতে তাদের বাড়ি গেলুম। এই বেশ প্রশস্ত সময়। মি. চ্যাটার্জি এখনি অফিস চ'লে যাবেন। লিলির সঙ্গে অবাধে কথা কইবার অনেক সময় পাব।

'হায় রে আশা! যা-ঘটল, তা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। এ কী? এর মানে কী? কেন? কেন এমন হ'ল?

'বেহারাকে দিয়ে লিলির কাছে খবর পাঠালুম যে, তার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার আছে। বেয়ারা ফিরে এসে বললে যে লিলির শরীর খারাপ। আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। আমি ভাবলুম, লিলি বুঝতে পারেনি আমি এসেছি। উজবুক চাকরটা কী বলতে কী বলেছে। তাই একটা কাগজের উপর লিখে পাঠালুম "লিলি, তোমায় না-দেখে আর থাকতে পারছি না। ৬টার সময় একবার আসতে যাচ্ছিলুম, অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করেছি। যদি শরীর বিশেষ খারাপ হ'য়ে না-থাকে তো কাছে যেতে অনুমতি দাও। শপথ করছি, পাঁচ মিনিটের বেশি থাকব না।"

'এ-বারেও বেহারা ফিরে এসে জানালে মিস্ বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে অক্ষম। আমি আকাশ থেকে পড়লুম। তার কী এত শরীর খারাপ যে, আমায় এককলম লিখে পাঠাতে পারলে না। কী করব ঠিক করতে পারছিলুম না। এমনসময় দেখি মি. চ্যাটার্জি আদালতে যাচ্ছেন। আমি ছুটে তাঁর দিকে গেলুম, জিজ্ঞাসা করলুম, "লিলির অসুখ করেছে শুনলুম ; কী হয়েছে? বিশেষ কিছু?" তিনি একবার আমার দিকে ফিরে চাইলেন। চোখদুটো ঘৃণায় ভরা। তারপর আমার কথার কোনো জবাব না-দিয়ে, সটান গিয়ে গাড়িতে চড়লেন। আমি অবাক্। চাকরটার দিকে ফিরে দেখতেই, সে হাসি সংবরণ করলে। আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্ব'লে উঠল। মনে হ'ল, লজ্জায় মুখ বুঝি জবার মতো লাল হ'য়ে উঠেছে, কান দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কোনো কথা না-ব'লে চাকরটাকে সজোরে এক লাথি মারলুম। মোহ যখন কাটল, তখন দেখি বাড়িতে ফিরে এসেছি।

'এর কারণ কী? মি. চ্যাটার্জি আমায় চিরদিন যথেষ্ট স্নেহ ক'রে এসেছেন। আজকে হঠাৎ লোকজনের সামনে আমার প্রতি কেন এ-অবিচার? অবশ্য, আমার জানা উচিত ছিল যে, মানুষের ভাগ্যে এত সুখ চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু এই দারুণ অপমানের কারণ কী?'

কারণ যে কী, তা বুঝতে অনেকদিন লেগেছিল। মনে পড়ে, সেদিন রাত্রে লিলিকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কী লিখেছিলুম স্পষ্ট স্মরণে নেই, তবে তাতে যে তিক্ত দ্রোহের গরল ঢেলে দিয়েছিলুম, তাতে আর সন্দেহ নেই।

সে-চিঠির আর জবাব আসে না। এক সপ্তাহ কেটে গেল, তবু লিলি নিরুত্তর। ঠিক করেছিলুম, যেচে, গায়ে-পড়া হ'য়ে আর তার সন্ধান করব না ; নিজেকে যথেষ্ট হীন করেছি আর নয়। কিন্তু তা হ'ল কৈ? আর স্থির হ'য়ে থাকতে পারছিলুম না, ভাবলুম তাদের বাড়ি যাই। কিন্তু ভয় হ'ল, এবার হয়তো প্রবেশ করতেই পাব না। কাজেই আত্মসম্ভ্রম পায়ে দ'লে, দন্তে তৃণ ক'রে লিলিকে পত্র লিখলুম, 'আমার অপরাধের সীমা নেই। অন্য কারুর কাছে হ'লে ক্ষমা চাইতে সাহস করতুম না। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ আমার নয়। মি. চ্যাটার্জির ঘৃণা-ভরা চাহনির অর্থ আমি আজ অবধি বুঝতে পারলুম না। সেই নিষ্ঠুর অপমানে আমার অপেক্ষা ধীর লোকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। কাজেই তার জন্য আমায় এক্‌লা দায়ী করা অন্যায়। তুমি আমায় ভালো ক'রে জানো। রাগ যে আমার মজ্জাগত নয় তা তোমায় বুঝাতে হবে না। সে যাই হোক, সকল অপরাধ আমি একাই মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। যদি সামনে আসবার অনুমতি দাও নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে তোমার কাছে মার্জনা পেতে পারব ব'লে আশা রাখি।'

অনিশ্চিতের মর্মঘাতী তাড়না থেকে এবার অব্যাহতি পেলুম। লিলি চিঠির জবাব দিলে। পত্রখানা ইংরেজিতে লেখা, মর্ম কতকটা এইরূপ :

'প্রিয়তম,

'এই সম্বোধন আর কাউকে কখনো করিনি, ভবিষ্যতে করবার সম্ভাবনাও খুব অল্প। এতদিন কল্পনাতে তোমার নামের পূর্বে এই বাক্যটির ব্যবহার করেছি। লেখায় প্রয়োগ এই প্রথম এবং এই শেষ। এটা আমার ক্ষত অন্তরের চরম ক্রন্দন ব'লে জেনো।

'তুমি মার্জনা চেয়েছ। কিন্তু মার্জনার আগে দোষ থাকা চাই। কোন্ অপরাধের জন্য তোমায় ক্ষমা করব? যদি মাফ্ কাউকে চাইতে হয় সে আমায়। একনিমেষের অসংযমের পরিণাম এত শোচনীয় হবে, ভাবিনি। কিন্তু অসাবধানতা অপরাধ স্খালন করে না। যতদিন মনে পড়ে তোমায় প্রীতির চক্ষে দেখে আসছি। তুমি যখন স্নেহ করেছ তখন আশায় বিভোর হয়েছি, যখন অবজ্ঞা করেছ তখন নীরবে অনেক কেঁদেছি। কিন্তু অন্তরের কথা প্রকাশ করতে সাহস হয়নি, কেন-না কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি তুমি আমায় ভালোবাস। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করতে পারিনি যে, আমার মূক থাকার অন্য কোনো কারণ ছিল না। আমি ভালো ক'রেই জানতুম তোমার আর আমার মধ্যে সামাজিক বৈষম্য কতটা। সে-ব্যবধান লঙ্ঘন ক'রে আমাদের মিলন যে কখনো ঘটতে পারে তা আমি সম্ভব মনে করিনি। কাজেই চুপ ক'রে ছিলুম।

'তারপর সেদিন তোমার তপ্ত চুম্বনে সকল সংশয়, সকল সন্দেহ, সকল কুণ্ঠা পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছিল। ভ্রমান্ধ হ'য়ে ভেবেছিলুম, জয় হবে। সকলেই আশা করে যে তার নিজের জন্য বাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম হবে।

'সেদিন তুমি যাবার পর বাবা ঘরে এলেন। দু-একটা বাজে কথার পর আমায় বললেন যে আমার বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন ; এক পাত্র ঠিক করেছেন, সে আমার সঙ্গে পরদিন দেখা করতে আসবে। আমি তো স্বর্গ থেকে নরকে পড়লুম। তাঁকে তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিলুম যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার বিয়ে দেবেন না। তিনি জানালেন যে, তা করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছা নেই, এবং সেইজন্যই তিনি সেই যুবকটিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তখন আমায় বাধ্য হ'য়ে আমাদের প্রণয়ের কথা বলতে হ'ল। উঃ, তাঁকে অমন রাগতে আর আমি পূর্বে দেখিনি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এ-মিলন তিনি কখনোই ঘটতে দেবেন না। আমায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করতে মানা, তোমায় চিঠি লিখতে বারণ। এর কারণ, তুমি জিজ্ঞাসা করছ? অল্পকথায় তোমার-আমার বিবাহ হিন্দু সমাজের সকল রীতি, সকল পদ্ধতির বিরুদ্ধে। তার উপরে আবার তোমার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়।

'গর্ব ছিল যে আমি স্বাধীনা, সমাজ-বাঁধন ছিন্ন করেছি। সে-ভুলও আজ গেছে। যদি বন্ধনমুক্ত হতুম তো সবার বারণ দ'লে তোমার আলিঙ্গনে আপনাকে বিলিয়ে দিতুম। কিন্তু সে-সাধ্য আমার নেই। এমন-কি এ-কথাও বলতে পারব না, তোমায় যদি মিলল না, তবে অপর কাউকেও গ্রহণ করব না; বাঙালির মেয়ের পক্ষে চিরদিন অনূঢ়া থাকা সম্ভবসিদ্ধ নয়। একবার অন্যায় করেছি, তাই ব'লে মিথ্যা শপথে অপরাধ দ্বিগুণ করব না। কাজেই তোমার কাছে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর অন্য গতি নেই।

'তোমায় চিঠি লেখা বারণ। অনেক ক'রে একবার লেখবার অনুমতি পেয়েছি। তাই জবাব দিতে এত দেরি হ'ল। এই শেষ সুখটা. এই শেষ ভোগটা আমার স্বপ্নজীবনের অন্তিম মুহূর্ত অবধি স্থগিত রেখেছিলুম।

'হয়তো তোমার সেদিনের আবেগ ক্ষণিক। তা যদি হয় তো এ-সব তোমায় বলা বৃথা। কিন্তু ব'লে শান্তি পাচ্ছি ব'লে বললুম। তবে বিদায়!'

চিঠিটা প্রথমবার প'ড়ে ঠিক বুঝতে পারলুম না। গত ১৫।১৬ দিনের অবিরাম চিন্তায় আমার বোধশক্তি দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। ক্রমে-ক্রমে যখন স্পষ্ট ক'রে বুঝলুম তখন মনে যে-আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, তাতে জগৎ ধ্বংস হ'তে পারত। সেখানাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা ক'রে ছিঁড়ে ফেললুম, পায়ের তলায় ফেলে তার উপরে তাণ্ডবনৃত্য করলুম ; জুতা দিয়ে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইলুম ; অবশেষে আগুনে পোড়ালুম ; কিন্তু তবুও শান্তি পাই না। ইচ্ছা হ'তে লাগল ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার ক'রে দিই। এমনি আকস্মিক উত্তেজনাতেই লোকে খুন-জখম করে। ছুটে বেরুলুম লিলিদের বাড়ি যাবার জন্য। সন্ধ্যার শীতল হাওয়া মুখে-চোখে লাগতে আমার জ্ঞান যেন ফিরে এল। আবার আস্তে-আস্তে ঘরে ফিরে এলুম।

তারপরে এল অবসাদ। উঃ, সে যেন সমস্ত আকাশ আমার কাঁধে বোঝা হ'য়ে চেপে আছে। মনে হ'তে লাগল প্রতি পদক্ষেপে যেন বসুন্ধরাকে টেনে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে অন্ধকার হ'য়ে গেল। কিন্তু উঠে আলো জ্বালাবার জন্য যেটুকু শক্তির আবশ্যক তাও আমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিল। সামান্য অঙ্গচালনা, এমন-কি নিঃশ্বাস ফেলাটি অবধি বোধ হচ্ছিল একটি বিরাট, অশেষ, অসীম যন্ত্রণা ব'লে। আর আমার মনটা। সেটা যেন কে ধুয়ে-মুছে সাফ্ ক'রে দিয়ে গেছে, কিন্তু ভালো ক'রে নয়। সে যেন কোনো ছোটো ছেলের শ্লেট। মোছা সত্ত্বেও তাতে কত কী রঙ্‌হীন রেখা, কত কী গভীর আঁচড় বিদ্যমান, কিন্তু একটিও পড়া যায় না, একটির[ও] কোনো মানে হয় না। চিন্তা ছিল না, কিন্তু চিন্তার সকল দারুণ কষ্ট, নিষ্ঠুর পীড়া অনুভব করছিলুম। অনেক রাত্রিতে অসুখের ভান ক'রে শুতে গেলুম। বিছানায় শুতেই চোখ জড়িয়ে এল, কিন্তু ঘুম হ'ল না, বিশ্রাম হ'ল না।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এইসমস্ত নির্মম ঘাত-প্রতিঘাতের স্মৃতিটা ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু লিলির চিঠিখানা দিন-দিন আমার হৃদয়ফলকে দীপ্ততর হ'য়ে উঠছে। এত যাতনার মধ্যেও আমার লিলির সারল্যের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে। অসত্য তার মোটে সহ্য হ'ত না।

...

মি. চ্যাটার্জি বোধ করি আমার গুণপণা বাবাকে জানিয়েছিলেন ; কেন-না এইসময় বাবার সহিত একটা তুমুল কলহের কথা অল্প-অল্প মনে পড়ছে। কিন্তু তার ফলাফল বেশিদূর এগোয়নি, কারণ দু-একদিন পরেই আমার nervous breakdown ঘটল। শুনেছি অনেকদিন ভুগতে হয়েছিল।

রোগমুক্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেলুম যে, লিলির বিয়ে হ'য়ে গেছে। কবে কার সঙ্গে জানবার কৌতূহল রইল না। এবার আর রাগ হ'ল না, কেবল একটা সীমাহীন বিষাদ আমার সমগ্র হৃদয়খানার উপর ঘনঘোর ছায়া বিস্তার করলে। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত তাড়ার প্রয়োজন কোথায় ছিল?' এদিকে আমায় নিয়ে যখন জীবন-মরণে সংগ্রাম চলছিল,

ঠিক সেইসময়েই লিলির মধ্যে নূতন-পুরাতন প্রণয়ে দ্বন্দ্ব ঘটেছিল। আমার ক্ষেত্রে প্রাচীনেরই জয় হয় ; আর লিলির মন নূতনে জিনে নিলে। বাঃ নিয়তির পরিহাস বড়ো মজার।

৫

বঙ্গসমাজে শুধু যে মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়, তা নয়, ছেলেও ওই অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে পারে। অনেকদিন থেকেই নানা দিক হ'তে বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। একে তো মোটামুটি ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে, তার উপর আবার যখন 'এম্.এ., বি.এল্.' দুটি লেজ গজাল, তখন তো আর কথাই নেই। সঙ্ক্ষেপে বলতে গেলে বিবাহ-বাজারে আমি সর্বতোভাবে গণ্য, মান্য এবং পণ্য ছিলুম ; অনেক মেয়ের বাপের বাঞ্ছিত ধন ; অনেক মেয়ের মা-র আকাশকুসুম। স্বয়ং পাত্রীদের কী তা ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধহয় সুখ-স্বপ্ন হ'য়ে থাকব।

সে-সময় আমার এই বিবিধ গুণ আমার নিজের কাছে বিরক্তির কারণ হয়েছিল মাত্র। কিন্তু আজকে সেই সুদূর দিনের কথা স্মরণ করলে গৌরব অনুভব করি। জীবনে অন্য কোথাও গণ্যমান্য তো হ'তেই পারিনি, এমন-কি পণ্য হওয়াও সম্ভব হ'ত কি-না সন্দেহ আছে। কেন-না ক্রীতদাসের অন্য কোনো গুণ থাক্ বা না-থাক্, অন্তত দৈহিক বল থাকা আবশ্যক ; আমার পোড়া ভাগ্যে সেটিরও অভাব। কিন্তু যে-লোক সকল ক্ষেত্রে অনাদৃত, সকল স্থান হ'তে বিতাড়িত, সকল কাজে অপটু, সে যে বিয়ে করার অযোগ্য, এমন কথা তো কখনো শুনিনি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে যত অকর্মণ্য, অপদার্থ, প্রজাপতি-দেবের তার প্রতি তত বেশি কৃপা। ছেলেবেলায় কাঁচাবুদ্ধির তাড়নায় ভাবতুম, এমন হওয়া গর্হিত ; কিন্তু আজ সে-ভ্রম গেছে। নিঃস্ব বাঙালি-সন্তানের অবজ্ঞা সর্বত্র। তার উপর আবার যদি তার গর্ব করবার, জোর করবার, শাসন করবার, আদর পাবার, ভয় দেখাবার শেষ স্থানটি কেড়ে নেওয়া যায়, তাহ'লে তার প্রতি দারুণ অত্যাচার করা হয় না কি? তাই এখন আমি বলি, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্বশুরালয় চিরদিন সমভাবে বজায় থাক্, সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাক্।

সে যাই হোক্, পরিণয়-পাশ এতদিন কোনোরকমে এড়িয়ে আসছিলুম ; কিন্তু বিধাতা বাম হলেন। আমার মুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। আমার রোগমুক্তি হাওয়ার পরে দেহ, মন শিথিল হ'য়ে পড়েছিল ; আত্মরক্ষা করবার বা প্রতিবন্ধ ঘটাবার সামর্থ্য আর ছিল না। এর আগে বাবার সহিত অনেক তর্ক করেছি, অনেক বিবাদ করেছি, তাঁর রাগে ভীত হইনি, তাঁর দুঃখে বিচলিত হইনি, বিয়ে করতে রাজি হইনি। এবার সুস্থ হবার পর আবার যখন এই প্রস্তাব উঠল তখন আমি বাধা দেবার দু-একবার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিলুম। আমার ঔদাসীন্যের ভিতরে প্রতিশোধের কামনা যে ছিল না, তা নয়। ভেবেছিলুম লিলি যদি এত শীঘ্র ভুলতে পারলে, আমিও পারব, অন্তত তাকে দেখাব যে আমি ভুলেছি। হায়, হায়, তখন বুঝিনি, আগুন নিয়ে খেলতে গেলে গৃহদাহের আশঙ্কা আছে।

এদিকে যত দিন যেতে লাগল, দেহ যত সবল হ'তে লাগল মন ততই সন্দিগ্ধ হ'তে লাগল। মাঝে-মাঝে বুঝতে পারতুম কাজটা কতটা অন্যায় হচ্ছে। তখন যদি উপায় থাকত তো এ-বিয়ে হ'তে দিতুম না, কিন্তু সে-পথ বন্ধ হয়েছিল। তাহ'লেও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে

নির্দোষ ব'লে মানতে পারি না। এ[ত]খনো জোর ক'রে বিবাহ স্থগিত ক'রে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। অবশ্য পিতৃদেব বিষম কুপিত হতেন ; কিন্তু কারুর রাগকে ভয় করতে কখনো শিখিনি। সমস্ত গোল বাধালে অবমানিতের তীব্র জিগীষা, বিতাড়িতের নিষ্ঠুর বিদ্রোহ, বঞ্চিতের প্রখর দেমাক।

তারপর সেই শুভ (ঠিক বলতে গেলে অশুভ) দিন এসে উপস্থিত হ'ল। আরেকবার আমায় জীর্ণ ডায়ারির শরণাপন্ন হ'তে হচ্ছে।

'আজকে আমায় ঘিরে আনন্দের উৎস উঠছে, কিন্তু আমার অধরে হাসি কোথায়? ওই যে-নহবৎ বাজছে, মনে হচ্ছে, ও যেন আমারই কান্না। জীবনে আমি একটা আদর্শমাত্র অবলম্বন করেছিলুম, মনে এক ভাব মুখে এক ভাব কখনো রাখব না। স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিপক্ষে কখনো কিছু করব না। তাইজন্যই কি আমার স্কন্ধে চিরতরে অপলাপের বোঝা চাপল? কখনো কিছুর কারণ খুঁজিনি, জীবন যেমন এসেছে তেমনি তাকে নিয়েছি, কিন্তু আজ না-জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পারছি না, আমার একার উপরে এ-অভিশাপ কেন? আমি কি এতই বলবান্ যে এই অগ্নির ভিতরে দিয়ে আমার পরখ হবে। না, না, আমি তা সইতে পারব না। চিরদিন ভেবে আসছি, জগৎটা মোটের উপর মন্দ নয়, কিন্তু আজ আমার সে-বিশ্বাস কোথায়? এই আলো, এই হাওয়া, আজকের নব বসন্তের পুলক, মনে হচ্ছে এ-সবই একটা বিরাট মায়া ; ওটা একটা লোক-ভুলানো আস্তরণ মাত্র। একবার যদি অপসারিত হয় অমনি ধরণীর দুঃখ-দীর্ণ ললাট, ব্যথা-শিহরিত অঙ্গ, ক্রন্দনাপ্লুত আনন প্রকট হ'য়ে পড়বে। এতদিন যা-বুঝিনি, আজ জেনেছি, জীবন-ষোড়শীর নয়নকোণে সূর্যাস্ত প্রতিফলিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায়। দেখতে বড়োই সুন্দর, কিন্তু একবার তলিয়ে ভাবলে, তার মধ্যে যে কত বেদনা, কত নিষ্ফলতা লুকানো আছে, সকলই স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে।

...

'বিয়ে তো হ'য়ে গেল, কিন্তু যাতনার এই তো সবে শুরু। কোথায় তার শেষ কে জানে! উঃ, সেই বিয়ের রাত্রি। মানুষ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে এত কষ্ট সহ্য করতে পারে তা আগে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। সকলের চেয়ে নির্দয় পরিহাস হচ্ছে যে এত আঘাতের মধ্যেও মুখখানা সহাস রাখতে হবে, চিরকালের জন্য!'

'আমার স্ত্রী! কথাটার যথার্থ মানে বুঝতে পারছি না। তার সনে আমার কী সম্বন্ধ? পুরুতে একবার মন্ত্র পড়ালে, হাতে হাত স্পর্শ করিয়ে দিলে, আর দু-জনে এক হ'য়ে গেলুম। এ-বাঁধন আর জীবনে ছিঁড়বে না। ভার্যা! সে চিরকাল ভার হ'য়েই থাকবে। অন্য কোনো সম্পর্ক তার সঙ্গে সম্ভব নয়।

'একটা কথা কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি, 'কেন এমন করলুম?' আমার ফিলসফি এ-পরীক্ষা সইতে পারছে না। ভেবেছিলুম, জীবনের কাছে কোনো দাবিদাওয়া করব না। কিন্তু যা-আসে তা মাথা পেতে নেবার শক্তি কই? আরেকটা কথা। নিজের জীবন নষ্ট করার অধিকার আমার থাকতে পারে, কিন্তু পরের জীবন ছারখার করছি কোন্ নীতির জোরে? সে হয়তো অনেক আশা করেছিল!'

৬

সুদূর ব্যবধানের দূরবীক্ষণ চোখে এঁটে আজ দেখতে পাচ্ছি, আমার স্ত্রী সুন্দরী ছিল। কিন্তু তখনো লিলির ছবি অস্পষ্ট হয়নি। লিলি ছিল নারী বিষয়ে আমার উপমান ; কাজেই তার পাশে প্রতিভাকে রূপসী ব'লে বোধ হয়নি। কিন্তু সে-দোষটা প্রতিভার রূপের নয় আমার চোখের। অবশ্য, লিলির চেহারাখানা, তার মনের মতো, বিলেতি-ধরনের ছিল, আর প্রতিভার সৌন্দর্য দেশী ছাঁচের। আমি আগে বলেছি লিলি ছিল ফুলের মতো। কেন-না তার রূপ উপলব্ধি করতে হ'লে সৌন্দর্য বিষয়ে যে-আইনকানুন আছে সেগুলা ভুলে যেতে হয়। গোলাপও লাল এবং চুনীও লাল, কিন্তু গোলাপকে চুনীর চেয়ে শ্রেয়স্কর মনে করতে হ'লে সভ্যতা-জনিত কতকগুলা সংস্কার ভুলে যাওয়ার দরকার, এবং সেইসঙ্গে অনাড়ম্বর-প্রিয়ও হওয়া চাই। কাজেই লিলিকে লোকে সুন্দরী বলত না। কিন্তু প্রতিভা ছিল ঘসা-মাজা জহরতের মতো। বেশভূষার পরিপাট্যে, সংস্থাপনার গুণে তার রূপের অধিকতর বিকাশ হ'ত। ফুলও সুন্দর, মণিমাণিক্যও সুন্দর, কোন্‌টি বেশি ভালো বলা শক্ত, কারণ সেটা রুচির উপর নির্ভর করে। তেমনি লিলি এবং প্রতিভা উভয়ই সুন্দরী ছিল,—একজন স্বভাবসিদ্ধ, অপরজন শিল্পসিদ্ধ। কিন্তু এ-সব কথা, এ-পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করার শক্তি তখন আমার ছিল না। আর যে-লোক ঠিক করেছে যে, একটা কিছু ভালো নয়, তাকে সেটা যে ভালো তা বোঝানো একরকম অসম্ভব। তাই আমি তখন ঠিক করেছিলুম, যে প্রতিভা কুশ্রী না-হ'লেও সুশ্রী নয়।

আমার এই বিভ্রমের জন্য বিশেষ ক্ষতি হ'ত না ; কারণ প্রথম দু-চারদিন বাদে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ রূপের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আমার আরেকটা যে-ভ্রান্তি ঘটেছিল, তার পরিণাম ভয়াবহ। আমি ভেবেছিলুম যে, প্রতিভা আমায় ভালোবাসে না, আর যদিও বাসে তো সে-প্রেম লিলির মতো প্রগাঢ় নয়। আজ জেনেছি তার প্রীতি কত গভীর। আমি মনে করেছিলুম যে, এত অল্পসময়ের মধ্যে তার আমায় ভালোবাসা সম্ভব নয়, বিশেষত আমি যখন তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিই না। তখন জানতুম না, বাঙালির মেয়ে স্বামী হবার বহু আগে থেকেই স্বামী ধারণাটার সহিত পরিচিত এবং তার প্রতি অনুরক্ত। তাইতেই চার চক্ষুর মিলন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা তাদের কুমারীহৃদয়, তাদের মহান প্রাণ, তাদের অসীম প্রীতি পতির পায়ে বিলিয়ে দিতে সমর্থ হয়,—তা সে-পতি যতই অযোগ্য হোক্, বা যতই উদাসীন থাকুক্। এ-কথা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছিল, কাজেই তার বিরাট প্রেমের প্রতিদান দিতে পারিনি, চেষ্টাও করিনি।

মা আমার বাল্যেই মারা গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে অন্য কোনো স্ত্রীলোকও ছিলেন না, তাই আমি ছাড়া প্রতিভার আর অপর গতি ছিল না। সে যখন দেখলে যে, আমাদের উভয়ের সম্পর্ক নিকট করবার জন্য আমার দিক থেকে কোনো প্রয়াসের আশা নেই, তখন লজ্জা, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের কাঁধেই সেই ভার তুলে নিলে।

প্রতিভা প্রথম ভেবেছিল, নিজেকে আড়ালে রেখে কেবল সেবায় আমায় তুষ্ট করবে। দেখতুম, আমার সকল প্রয়োজনই বলবার আগে থেকেই সাধিত হচ্ছে। সে নিজে হাতে

আমার কাজের টেবিল ঝাড়ত, কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখত, খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বাবধান করত। আমার সকল অভাব পূর্ব হ'তেই পূরণ হ'য়ে থাকত। কিন্তু যখন তাতে আমার মন পেলে না, তখন প্রসাধনে আলাপনে আমার চিত্তাকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল। আমি মনে-মনে হাসতুম, আর তার সেবা নির্বিকারে গ্রহণ করতুম। শেষে এই সেবা যে আমার ন্যায়ত প্রাপ্য এমন একটা বিশ্বাস আমায় আশ্রয় করেছিল। তাই যদি পান থেকে চুন খসত অমনি আমার অন্তরাত্মা তিরিক্ষি হ'য়ে উঠত। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-ব্যবধান ছিল, সেটা কমাবার জন্য একদিনও চেষ্টা করিনি। আমি ভাবতুম, আমি তো ওকে চাইনি, ও স্বেচ্ছায় এসেছে; আমি এর চেয়ে ভালো ব্যবহার করতে পারব না, তাতে ওর যদি না-পোষায় ও চ'লে যাক্। কিন্তু যাবে কোথায়, সে তো আমার চরণে বাঁধা ক্রীতদাসী! এ-কথা একদিনের জন্যও মনে উদয় হয়নি। স্ত্রীলোকের জন্য আমি কষ্ট পেয়েছি, তাই স্ত্রীলোক যে আমার হাতে কষ্ট পাবে, সেটা কিছুই বিচিত্র বা অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হ'ত না। একটা প্রচণ্ড নির্দয়তা আমায় পেয়ে বসেছিল।

একদিনের কথা এখনো বেশ মনে আছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, আমি আমার বসবার ঘরে এক্‌লা ব'সে আছি, এমনসময় প্রতিভা এসে হাজির হ'ল। আমি পূর্ববৎ রাস্তার দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম। একবার ঘাড় নেড়েও তার উপস্থিতি স্বীকার করলুম না। তার বেশের পরিপাট্য দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। বেছে-বেছে তার শ্রেষ্ঠ শাড়িখানি পরেছিল, যত্নে কেশবিন্যাস করেছিল। পরিচ্ছদে যে কতটা শিল্পের প্রয়োজন, প্রতিভা তা ভালো ক'রেই জানত। অন্যসময় হ'লে, বা অন্য স্ত্রীলোক হ'লে আমি স্বীকার করতাম যে সে সুন্দরী, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শুধু হাসি এল। সে আস্তে-আস্তে, দ্বিধাভরে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ক্ষাণিক বাদে তার উষ্ণ কম্পিত হাতের স্পর্শ স্কন্ধে অনুভব করলুম। প্রস্তুত ছিলুম না ব'লেই বোধহয় আমার গা যেন শিউরে উঠল, কাঁধটা সঙ্কুচিত হ'ল। আমি পাশ কাটিয়ে তার মুখের দিকে চাইলুম। উঃ, তার চোখের মধ্যে কী বিপুল ব্যথা, কী গভীর ব্যাকুলতা, কামনা যেন উথ্‌লে উঠছে।

একটুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে প্রতিভা বললে, 'তুমি রাতদিন কী ভাবো বলো দিকি। তোমার স্বর কেমন প্রায় ভুলেই গিছি।'

আমি হেসে উত্তর দিলুম, 'তা বেশ সময় কথা কইতে এসেছ। এখন তো দেখছি কোথায় বেরুচ্ছ। তাই বুঝি যাবার সময় একবার ঝাঁকিদর্শন দিয়ে আপ্যায়িত ক'রে যাওয়া হচ্ছে। আর দোষ হ'ল আমার।'

সে বললে, 'কে বললে আমি বেরুচ্ছি?'

আমি বললুম, 'তুমি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিয়েছ ব'লে তো আর আমি কানা হ'য়ে যাইনি, হয়তো পরে কেঁদে-কেঁদে হ'য়ে যেতে পারি, কিন্তু এখনো হইনি। তুমি কিছু বলো না ব'লে কি আর বুঝতে পারি না। তোমার বেশ বলছে তুমি বেরুচ্ছ।' এই ব'লেই আমি হো-হো ক'রে উচ্চ স্বরে হাসতে শুরু ক'রে দিলুম।

প্রতিভার চোখদুটো নীরব ভর্ৎসনায় একবার ভ'রে উঠল, পরমুহূর্তেই রুদ্ধ অশ্রুতে ঝল্‌মল্ ক'রে উঠল। সে আর কোনো কথা না-ব'লে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে যখন শুতে গেলুম, দেখলুম প্রতিভা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গালে শুষ্ক অশ্রুর কৃষ্ণরেখা। ঘরের এককোণে তার শ্রেষ্ঠ বসনখানি হতাদরে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

৭

চার-পাঁচ বছর এমনিভাবে কেটে গেল। তারপর বাবা মারা গেলেন। আমারও কলকাতার শেষ বন্ধন টুটল। এতদিন কোনোরকমে টিঁকে ছিলুম, কিন্তু এখন আর এক্‌লা সংসার করতে মন সরছিল না। আমি ঠিক করলুম, ভবঘুরে বেরুব। গোড়ায়-গোড়ায় প্রতিভাকে এক্‌লা ফেলে যেতে দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু অনেক ভেবে যাওয়াই ঠিক করলুম। মনকে চোখ ঠারলুম এই ব'লে যে, এমন অনাদরে আর বেশিদিন থাকলে প্রতিভার মনে যে অবশিষ্ট প্রীতিটুকু আছে, তা-ও ঘৃণায় পরিণত হবে। বিচ্ছেদের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে-সময় দোষগুলো ভুল হ'য়ে যায়, কেবল গুণগুলো মনে থাকে। আরো ভাবলুম যে নূতন জায়গায় নূতন দৃশ্যে পুরাতন বিস্মরণ হ'য়ে যাবে। পরে ফিরে হয়তো বেশ সুখেই তার সহিত ঘর করতে পারব। কিন্তু প্রতিভার যে অত আপত্তি হবে তা কখনো ভাবিনি।

সে যখন শুনলে আমি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যাচ্ছি, তখন আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বললে, 'তা হবে না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি যদি এক্‌লা থাকতে না-পারো তো তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকোগে।'

সে বললে, 'আমার বাপ-মা নেই, কাকীর সঙ্গে বনে না, আমি সেখানে যাব না।'

আমি বললুম, 'তবে আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব, তোমার কোনো কষ্ট হবে না। তুমি এখানেই থাকো।'

সে বললে, 'যদি একান্তই যাবে তো আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।'

আমি উত্তরে বললুম, 'আরে তা-ও কী হয়। মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে কি দেশভ্রমণ হয়। ছিঃ, প্রতিভা, অমন অবুঝ হ'লে চলবে কেন!'

সে বললে, 'আমি অবুঝ হলুম? এখানে কী নিয়ে থাকব? যখন সন্তান চেয়েছিলুম তুমি সে-কামনা পুরাওনি। আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কী আছে?'

আমি বললুম, 'সে পুরানো কথা তোলবার কী দরকার? তোমায় তো বলেছি, তুমি ছেলেপুলে ভালোবাসতে পারো, আমার বাপু, ও-সব পোষায় না।'

সে উত্তর দিলে, 'আমার কি তবে কোনো অধিকার নেই? আমায় যখন বিয়ে করেছ তখন ফেলতে চাইলে চলবে কেন?'

আমি এবার চ'টে গিয়েছিলুম। প্রত্যুত্তরে বললুম, 'আমি অত অধিকার-টধিকার বুঝি না। তোমার অভাব কোন্‌খানে আমি বুঝতে পারছি না। যাদের ছেলে না-হয় তাদের যদি স্ত্রীকে না-নিয়ে এক পা-ও না-নড়বার হুকুম থাকে তাহ'লে তো আর সংসারে বাস করা চলে না। বিয়েই না-হয় করেছি, নিজেকে বিক্রি ক'রে দিইনি তো। যতদূর সম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্য তা তোমার জন্য ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আমি অচল হ'য়ে ব'সে থাকতে পারব না।"

সে বললে, 'হ্যাঁ, স্বাচ্ছন্দ্যের হানি একদিনও হয়নি বটে. কিন্তু সুখের কথা তুলে আর লাভ কী? কথায় কথা বেড়ে যায়।' তার নিজের বর্ধনমুখ রাগকে সংযম[ত] ক'রে বিনীত স্বরে আবার বললে, 'আমি তোমায় অচল হ'য়ে ব'সে থাকতে বলছি না, রাগ-গোসা করছি না, পায়ে ধ'রে মিনতি করছি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো। আমি যদি একমিনিটের জন্যও বোঝা হ'য়ে উঠি তো আমায় রাস্তায় ফেলে যেও।'

আমি বললুম, 'এ তো আর ছেলেখেলার কথা নয়। সে হ'তে পারে না। তুমি এখানে থাকো, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।'

তিন-চারদিন পরেই আমি বেরিয়ে পড়লুম। যাবার দিন প্রতিভার কাতর মিনতি-মাখা ছবিখানি আজও হৃদয়ে খোদা রয়েছে। তার চাহনি যেন বুকে বিঁধতে লাগল। মনে হ'ল কাজটা ভারি অন্যায় হ'ল, ফিরে যাই। তারপরে মনে পড়ল তার দাবির কথা। ভাবলুম, আমি তো তাকে আমায় বিয়ে করবার জন্য সাধ্যসাধনা করিনি, আমার উপর তার কিসের দাবি? একটু শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। মেয়েমানুষকে নেই[লাই] দিতে নেই, সর্বদা শাসনে রাখা দরকার।

৮

সারা ভারতবর্ষটা চ'ষে ফেললুম। কত শহর দেখলুম, কত নদী পার হলুম, কত পাহাড়ের চূড়ায় উঠলুম। কোথাও কিন্তু দু-দণ্ড স্থির হ'য়ে থাকতে পারছিলুম না। এতদিন যে-চঞ্চলতা হৃদয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, তা আজ যেন ছাড়া পেয়ে আমায় কষাঘাত ক'রে সারা ভারতটা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল। অতীতের বোঝা আমার বুক থেকে অনেকটা নেবে গিয়েছিল, কিন্তু নবীনের নেশা এখনো কাটেনি।

প্রায় মাস-ছয়েক গত হ'ল। শেষে পুরীতে এসে পৌঁছুলুম। তখন গরমের মুখ, পুরীর মরসুম, লোক আর ধরে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লোকের ভীড় ছেড়ে, বেলার এক দূরপ্রান্তে এক্‌লা বসেছিলুম। কয়েকদিন ধ'রে কলকাতায় ফেরবার জন্য মনের মধ্যে ইচ্ছা জেগেছিল। সেদিন হঠাৎ প্রতিভাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠলুম। ভাবছিলুম, সিধা কলকাতায় যাব, না পথিমধ্যে দু-একটা জায়গা সেরে যাব ; এমনসময় চোখের সামনে দিয়ে সহসা কে একটি স্ত্রীলোক চ'লে গেল। মনে হ'ল আমার দিকে একবার চকিতদৃষ্টিতে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। কে ও? অঙ্গভঙ্গী যেন চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে। ও না লিলি!

আমার বুক একবার কেঁপে উঠল, তারপর একদম যেন থেমে গেল। আমি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তার পেছু-পেছু ছুটলুম। লিলি বুঝি বুঝতে পেরেছিল, আমি তাকে ধাওয়া করছি, সে-ও তার গতির বেগ বাড়ালে। আমি ডাকলুম, 'লিলি!' তার পা আরো জোরে চলল। আবার ডাকলুম, 'লিলি।' এবারে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো থেমে গেল, তারপর মনে হ'ল বুঝি এক-যুগ পরে আমার পানে ফিরে চাইলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লিলি, কীসের ভয়ে আমার কাছ থেকে পালাচ্ছিলে।'

সে সে-কথার উত্তর না-দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এখানে?'

'ভবঘুরে। আর তুমি?'

'শরীর ভালো নেই, ডাক্তারের উপদেশে। আজ সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, যাই।'

'অত ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। এত বৎসর তোমার সন্ধান করিনি। আজ যখন দেখা হয়েছে, সহজে ছাড়ছি না। তোমার কাছ থেকে একটা কৈফিয়ৎ প্রাপ্য আছে।'

'তুমি কী জিজ্ঞাসা করবে জানি। "কেন বিয়ে করলুম?" কিন্তু আমি তো কোনোদিন বলিনি যে কুমারী হ'য়ে থাকব।'

'তা বলোনি বটে, কিন্তু এটাও বলোনি যে দু-দিন না-যেতে-যেতে বিয়ে করবে। আমার যেমন রোগ হয়েছিল তাতে ইহজগৎ ছেড়ে যাওয়া কিছুই অসম্ভব ছিল না। সে-খবরটার জন্য দু-পাঁচদিন অপেক্ষা করলে কি কোনো ক্ষতি হ'তো। তোমার বাবাকে আমি চিনি, তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিয়েতে অমত ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু তোমার অনিচ্ছার উপর ব্যস্ত হ'য়ে বিয়ে দেওয়ার তিনি পাত্র নন। এই তাড়াতাড়ির কারণ জানবার অধিকার কি আমার নেই?'

'অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু কারণ আমি নিজেও জানি না। আগে ভাবতুম, বিনা-কারণে কোনো জিনিস হয় না। কিন্তু অনেক ঠেকে শিখেছি যে জীবনের শতকরা নব্বইটি ঘটনার কোনো কারণ বা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

সে এই ব'লে যেতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আরেকটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়। আমাদের আর দেখা হবে কি-না জানি না, তাই কৌতূহল নিবৃত্তি ক'রে নিচ্ছি। তুমি কি সুখী?'

তার মুখ লাল হ'য়ে উঠল। সে রূঢ় স্বরে উত্তর করলে, 'আমায় সে-প্রশ্ন করবার কারুর অধিকার নেই, এমন-কি তোমারও না।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার কথা জানি না, তবে আমি তোমায় একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি। চিরদিনই তুমি আমার এবং আমার সুখের মধ্যে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে ; কিন্তু হঠাৎ তার শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল, লিলি কেমনতর বদ্‌লে গেছে। কী, কোথায় বদ্‌লে গেছে ঠিক করতে পারছিলুম না। তার কারণ বোধহয় সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোক।

তার কটি এখন অক্ষীণ। সে-আঘাত যে বুকে কীরূপ বেজেছিল, তা ব্যক্ত কবতে পারব না। আমার নিঃশ্বাস রোধ হ'য়ে এল। মনে হ'ল, এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন। আবার লিলির দিকে চাইলুম। না, এ তো স্বপ্ন নয় ; এ যে সত্য! আমার গা, হাত, পা কাঁপছিল, মাথা ঘুরছিল। মনে হ'তে লাগল মুখে কে যেন সেই বেলাভূমির সঞ্চিত বালুরাশি পুরে দিয়েছে, কণ্ঠে একটা কীসের কঠিন তাল ভ'রে দিয়েছে, বুকে জ্বেলে দিয়েছে সামনের সমুদ্রের বাড়বানল। কে যেন লক্ষ-লক্ষ কামানের হুঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে আমার কানে বলছিল, 'প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চনা, সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটা ভীষণ প্রবঞ্চনা চলছে।' হৃদয়ের তিক্ততা আর চাপা দিতে পারলুম

না, বিকট, বিকৃত হাসি হেসে বললুম, 'ওঃ, বুঝেছি। আমার প্রশ্নের আর উত্তর দেবার দরকার নেই।'

লিলির গাল থেকে সমস্ত রক্ত ছুটে পালাল। তার চোখের আগুন নিবল, সে আস্তে-আস্তে প্রস্থান করলে। মনে হ'ল, সমগ্র আকাশ যেন তাকে মাটির দিকে চেপে ধরছে। আমি দৃষ্টিহীন নয়নে তার পানে চেয়ে রইলুম।

৯

আবার মুসাফিরখানা থেকে মুসাফিরখানায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। মনে নূতন ক'রে আগুন জ্বলেছিল, কাঁধে যেন এক অশান্তির ভূত চেপেছিল। বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পরিত্যাগ করলুম। প্রতিভার স্মৃতি মন থেকে একরকম মুছে গিয়েছিল। একপল বিরাম নেই, কোনো আশ্রয় নেই, কেবল ঘোরা, কেবল ঘোরা।

...

প্রায় দু-বছর কেটে গেল।

তখন আমি আগ্রায়। একদিন সন্ধ্যার ধূমলিমায় তাজমহলের যমুনার উপর চাতালটায় বসেছিলুম। সেদিন পূর্ণিমা ; তাজমহল অমল আলোকে ধৌত। চারিদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। কোথাও একটি শব্দ নেই, কোথাও একটি মানুষ নেই। বসন্ত তখনো যায়নি কিন্তু তার পালা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ফুলগুলো সব পূর্ণপ্রস্ফুটিত ; দখিন হাওয়া যাবার আগে কিশলয়ের সঙ্গে শেষ খেলা খেলে নিচ্ছে ; চারপাশে সবুজের লহরী ; আর পাতার গানে সেই শান্তিটাকে যেন আরো শান্ত ক'রে তুলছে। আমার বোধ হ'ল, আমার মনেও তেমনি ক'রেই নূতনের তরঙ্গ উঠছে, একটা অনন্ত নির্বাণ সমস্ত অন্তর দখল ক'রে নিয়েছে। মনে হ'ল, আমার জীবনের আদর্শে এতদিনে পৌঁছুতে পেরেছি। অতীত প্রেম তখন বেদনহীন, তিক্ততাহীন, এই তাজমহলের মতোই পবিত্র, অরূপ। এখন আর তার কাঁদন নেই, এখন আছে শুধু শান্তি, সৌন্দর্য, কান্তি, অমলতা। হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা সব গেছে, জেগে আছে শুধু বিপুল গৌরব। আজকে আমার জীবন ছায়াহীন, দোষহীন, কেবল সুন্দর, কেবল রূপময়। প্রতিভা'কে মনে পড়ল। তার রূপের কথা হৃদয়-বীণায় আজকে নূতন ঝঙ্কার তুললে। আর লিলি? লিলি যেন বহু আগে দেখা, স্বপ্নের তুলিকায় আঁকা, আধোবিস্মৃত কোমল ছবি।

এখন আর গৃহী হ'তে আমার কোনো বাধা নেই। ঠিক করলুম, পরিব্রাজকবৃত্তি খতম ক'রে কলকাতায় ফিরব।

অশেষ আগ্রহে কলকাতার জন্য রওনা হলুম। গাড়িতে ঠিক করলুম প্রতিভার অনুরাগের সুদ-আসল সব ফেরৎ দেব। আঃ, সে-রেলপথ আর ফুরায় না।

বাড়িতে এসে পৌঁছুলুম প্রায় আড়াই বছর পরে। বাড়িতে কোনো সংবাদ দিইনি। ইচ্ছা ছিল প্রতিভাকে অবাক ক'রে দেব। বাড়িতে ঢুকেই 'প্রতিভা' 'প্রতিভা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কোনো সাড়া নেই। অনেকক্ষণ বাদে একটা অচেনা চাকর বেরিয়ে এল। সে

জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কে?' আত্মপরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বৌমা কোথায়।' সে বললে, 'জানি না, মাস-খানেক আগে তিনি কোথায গেছেন, বোধহয় বাপের বাড়িতে।'

আমার কথাটা ভালো লাগল না। আমায় না-জানিয়ে প্রতিভা বাপের বাড়ি গেছে বিশ্বাস হ'ল না। তারপর মনে পড়ল যে সে আমার অস্তিত্ব-সুদ্ধ জানত না। কিন্তু মন তবু প্রবোধ মানলে না। কত সন্দেহ, কত সংশয় আমায় অভিভূত ক'রে ফেললে। আমার খুড়শ্বশুরের কাছে তার করলুম। সন্ধ্যার সময় তারের জবাব এল, 'প্রতিভা এখানে নেই। এক মাস আগে তার শেষ চিঠিতে জেনেছি, সে তোমার কাছে যাচ্ছে।'

আমি তারটা হাতে ক'রে গৃহকোণে ব'সে পড়লুম। ভাবছিলুম, এই ঘরেই কতবার প্রতিভাকে লাঞ্ছনা দিয়েছি। যতদিন তাকে চাইনি সে আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্য লালায়িত হ'য়ে ঘুরত। আর আজ যেই তাকে না-হ'লে আমার চলে না, অমনি—।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছিল। চাকরটা এসে বললে যে তার রাত্রে থাকার কথা নয় ; অনুমতি পেলে সে যায়। ক্রমশ শহরের কোলাহল থামল, পথ বিজন হ'ল। আমি অন্ধকারের মধ্যে নিঃসাড়ে ব'সে দেখছিলুম আমার জীবনের ধ্বংসাবশেষ।

সন্ধ্যার আগে থেকে মেঘ করেছিল। কালবৈশাখীর প্রথম উষ্ণ উচ্ছ্বাস আমার শিথিল মুষ্টি থেকে তারখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল। নিচে থেকে অনর্গলিত দ্বারপতনের শব্দ ভেসে এসে আমার একাকীত্ব স্পষ্টতর ক'রে তুলল। তারপর আকাশ চিরে বৃষ্টি নামল ; সে যেন বিধাতার তপ্ত অশ্রু!

২৪-২৯ মাঘ ১৩৩০

চার্বাক চট্টোপাধ্যায়

আমার বাংলা লিখতে শুরু করার একটা ইতিহাস আছে। তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়েছি। তাঁর প্রণয় কষ্টে এড়াতে পেরেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি আমার সমস্ত দেহ-মনের উপরে এমন গোটাকয়েক সোহাগ-চিহ্ন দিয়ে দিয়েছিলেন, যা সহজে মুছে ফেলা অসম্ভব। এইসমস্ত নখ-দংষ্ট্রাঘাত দেবাদিদেব প্রজাপতির কাছে বিশেষ আদরের, সত্য। তার কারণ কী, ঠিক জানি না। তবে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কামুক ছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই — সরস্বতীর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা আমরা সকলেই অবগত আছি, এবং সেইজন্যই বোধহয় নখ-দশন-চিহ্নিতদের প্রতি তাঁর দয়া। অথবা এ-ও হ'তে পারে যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় রীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পিতামহ নামের সার্থকতা প্রচার করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর কন্যা, এমন বাপের বেটী হ'য়েও, বড়োই হালফ্যাশানের হ'য়ে পড়েছেন। এইধরনের লাঞ্ছনা তাঁর এতই অপছন্দ যে, আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রেমিকদের কাছে আসা তো দূরের কথা, আমরা যে-দেশে বাস করি, সেটি সুদ্ধ প্রায় পরিত্যাগ করেছেন।

অনেকে হয়তো বলবেন, বেশ, ভারতীর সাহায্য যদি না-মিলে অন্তদেশের কলাদেবীর আহ্বান করতে আপত্তি কী? আপত্তি আর কিছুই নেই, কেবল আবাহনী-মন্ত্রটি জানা নেই। আমরা চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর পরিশ্রম ক'রে আর যা-শিখি, শিখি, মোদ্দা দেশী বা বিদেশী বাগ্দেবীর আরাধনায় যে বিভিন্ন মন্ত্রের আবশ্যক, সেটা শেখা ঘ'টে ওঠে না। এই দুটো মন্ত্রের সংমিশ্রণে যে একটা অদ্ভুত বাণীর সৃষ্টি হয়, তাতে সরস্বতীর মন ভেজানো অসম্ভব।

বৃথা তর্কবাগীশেরা এখানে বলবেন, ওটা তোমার গায়ের-জোরি কথা। মাইকেলকে ভুললে চলবে কেন? আমি অস্বীকার করছি না যে মাইকেলের আঁচ-ধাঁচ বিলেতি ছিল, এবং তিনি আলাপে-প্রলাপে বঙ্গভাষার ব্যবহার করতেন। কিন্তু মাইকেল অভিধান খুঁজে-খুঁজে এমন সমস্ত দাঁত-ভাঙা শব্দের সন্ধান বের করেছিলেন যে, বাগ্দেবী তাঁর আবাহনী-গান শুনে বুঝতে পারেননি, সেগুলি অসংস্কৃত। স্বর্গ যে কতদূর, তা যাঁরা সেখানে যেতে চেষ্টা ক'রে থাকেন, তাঁরা বেশ ভালো ক'রেই জানেন। কাজেই 'অমৃত-ভাষিণী দেবী'র কানে মাইকেলের ডাক একটু অস্পষ্ট শুনানো আশ্চর্য নয় ; আর মিল না-থাকার দরুন দেবভাষা ব'লেও ভ্রম হ'য়ে থাকতে পারে। অবশ্য সরস্বতীর ভ্রান্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সরল মনে কাছে এসে তিনি প্রবঞ্চনাটা যেই বুঝলেন, অমনি উধাও হলেন।

কিন্তু, আমি মাইকেলের চাতুরী, বা কলাদেবীর পূজাপদ্ধতির কথা বলতে আসিনি, আমার বাংলা লেখার ইতিবৃত্ত শুনাতে এসেছি। তাই বাধ্য হ'য়ে এইসমস্ত চিত্তাকর্ষক কাহিনী ছেড়ে শুষ্ক ইতিহাসের অবতারণা করতে হচ্ছে।

বৃদ্ধার প্রীতি যতই গৌরবকর হোক্-না-কেন, কেবল তাই নিয়ে যুবক তুষ্ট থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় তার যাই হোন্, তিনি মোটেই নবীনা নন। কাজেই আমি তাঁকে নিয়ে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলুম, রাখলেও বিপদ ফেললেও প্রমাদ। আর ফেলেই-বা করব কী? তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘ বসবাসের ফলে অপর সমস্ত বিষয়ে অপারগ হ'য়ে পড়েছিলুম। এমনি তাঁর প্রেম!

আমার মতো যুবকদের জন্য দুটি প্রকৃষ্ট পন্থা খোলা আছে, — একটি হচ্ছে গলাবাজি, অপরটি কলমবাজি। কিন্তু প্রথমটি আমার পক্ষে বন্ধ, কারণ আমার কণ্ঠের একটি অদ্ভুত রোগ আছে। বেশি লোক দেখলেই সেই অঙ্গটি শুষ্ক হ'য়ে যায় ; তা দিয়ে গোমুখী ধারার মতো কলস্রোতে বক্তৃতা আর বেরয় না। তাই আমায় অগত্যা লেখকই হ'তে হ'ল।

রাজনীতি পরিত্যাগ করলুম ব'লে রাজভাষার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ ছিল না। তাই দিস্তে-দিস্তে কাগজ মসীময় ক'রে সম্পাদক-কুলকে অস্থির ক'রে তুললুম। ব্রিটিশ জাতির আদর্শ হচ্ছে সমতা। যে-ডাকে প্রবন্ধ পাঠানো যায়, তাতেই আবার ফেরৎও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই সম্পাদকদলের সঙ্গে আমার অবিশ্রান্ত সমর চলতে লাগল। এ-যুদ্ধের একটা বিশেষত্ব ছিল, — শত্রুপক্ষকে দেখবার জো নেই, এবং উভয় দলেরই শরাসন এক, পোস্ট অফিস।

কতদিন যে এই কুরুক্ষেত্র চলত তা জানি না, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হলেন। কোনো এক ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে আমার একটি প্রবন্ধ ফেরৎ এল ; তার উপরে লেখা ছিল : 'আমরা একান্ত দুঃখিত যে, আপনার প্রবন্ধ ছাপাতে পারলুম না। কিন্তু অমনতর ইংরেজি আমরা ছাপাতে সাহস করি না। বিশুদ্ধতার জন্য এবং অর্থপ্রবণতার জন্য আমাদের একটা খ্যাতি আছে। সেটা বিসর্জন করতে আমরা অনিচ্ছুক, এমন-কি আপনার চরণেও। অতএব আশা করি আমাদের ক্ষমা করবেন।'

এই লিপি পেয়ে আমি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঠিক করলুম, সম্পূর্ণ বিদেশী বর্জন ক'রে মহাত্মা নামে প্রসিদ্ধ হব। ইংরেজিতে লিখে আমার নিজের কোনো স্বার্থ সাধিত হয় না। আমার চেষ্টা যাতে ইংরেজি ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হয়। বেশ ছেড়ে দিচ্ছি দেখা যাক্ ক্ষতি কার! মনে-মনে এটাও শপথ করলুম যে, যদি পরে কখনো ইংরেজেরা আমায় তোষামোদ ক'রে আবার লেখনী ধরতে অনুরোধ করে, তখন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে এই অপমানের সুদ-সুদ্ধ প্রতিশোধ আদায় করব।

লিখতে যাওয়ার এক মহামুশকিল আছে, একটা ভাষার দরকার। ইংরেজি ছাড়লুম, কিন্তু ইংরেজি আমায় ছাড়ে কই? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগে একজন বলেছিলেন, আমাদের ইংরেজিতে কথাবার্তা, লেখাপড়া, ভাবনাচিন্তা ইত্যাদি তো করতেই হবে, এমন-কি ইংরেজিতে স্বপ্ন-সুদ্ধও দেখতে হবে। তাঁর উপদেশ আমি গ্রহণ করেছিলুম, অবশ্য আংশিকভাবে। অর্থাৎ যে-ভাষায় আমি চিন্তা-অচিন্তা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আলাপ-প্রলাপ ইত্যাদি

সম্পন্ন করতুম, তা ইংরেজি না-ও হ'তে পারে, কিন্তু বাংলার কোনো সম্পর্ক রাখত না। তাই হঠাৎ যখন আমার শ্রীহস্তধৃত লেখনের অগ্রে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে ফেলতে চাইলুম, তখন মহাবিপদে পড়লুম। দেখলুম, বাংলা আমার দান চায় না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। কাজেই যে-সব অমূল্য রত্নগুলি মাসিক পত্রিকায় পাঠাতে লাগলুম, সেগুলি উপাখ্যানের বানরের গলায় মুক্তার হারের মতোই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ধূলায় গড়াগড়ি যেতে লাগল। এবারে হয়তো কলম-চালনা একেবারেই ছেড়ে দিতুম, কিন্তু বঙ্গভূমির এবং আমার নিয়তিদ্বয় অন্যরূপ অভিরুচি করলেন। আমার চার্বাক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

২

সেদিন আমার শততম ছোটোগল্পটি অশ্বমেধের অশ্বের মতো সমস্ত সম্পাদকের হস্ত ছাড়িয়ে পুনরায় আমার কাছে ফিরে এসেছে। সেই ফিরে-আসা, ধূলিধূসর রচনাটি হাতে ক'রে আমি ভাবছিলুম, সাহিত্য-জগতে যখন শতক্রতু উপাধি পেয়ে গিয়েছি, তখন এইবার ক্রিয়াকলাপ বন্ধ ক'রে বাণপ্রস্থের অবসাদময় জীবনের ব্যবস্থা করা যাক্। কিন্তু অদৃষ্টের যে একটা প্রধান দোষ আছে, পরের চরকায় তৈল প্রদান করা, তাই আমার বাসনার প্রতিবিধান করলে। ঠিক সেইসময় আমার এক বিংশ শতাব্দীয় বন্ধু এসে বললেন, 'আজ "মুষ্ট্যাঘাত" সমিতির একটি অধিবেশন আছে। চলো সেখানে যাওয়া যাক্। সে-দলে ভীড়ে গেলে হয়তো তোমার অনেক সুবিধা হ'তে পারে।' আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, যে-ব্যক্তি বাণপ্রস্থ অভিলাষী তার মুষ্টি-পদাঘাতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। আমায় তাঁর অনুবর্তী হ'তে হ'ল।

পথে যেতে-যেতে এই সমিতির কতকটা পরিচয় পেলুম। সভাপতির নাম চার্বাক চট্টোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত কবি (যদিও তখনো তাঁর কোনো লেখাই আমি পড়িনি)। পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুষ্টি-ব্যবহারে লেখকদের কীর্তি প্রচার করা। যদি এই সভার সভ্য সম্বন্ধে কোনো পত্রিকা রূঢ় সমালোচনা প্রকাশ করে, তবে তার ভবলীলা অচিরেই সমাপিত হবার সম্ভাবনা।

ক্রিশ্চানরা বলে, শয়তান বহুরূপী। কখনো প্রিয়া, কখনো বন্ধু, কখনো দেবতা, কখনো জন্তু, নানা রূপ ধ'রে দুর্বলচেতা মানুষদের সম্মুখে উদয় হ'য়ে, দুর্নিবার বিলোভন দেখিয়ে তাদের ধর্মপথ, ন্যায়পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস পায়। আমার বিশ্বাস 'কৃষ্ণরাজ' সেদিন সখার বেশে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। নচেৎ ঠিক যেদিন কর্মজীবন থেকে অবসর নেব স্থির করলুম, সেদিনই চার্বাকের সঙ্গে আলাপই-বা হবে কেন, আর পুনরায় নূতন উদ্যমে সাহিত্যচর্চার প্রলোভন জাগবে কেন? সেদিন শয়তানই যে সুহৃদ্‌রূপে আমায় 'মুষ্ট্যাঘাত সমিতি'র দিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কেন-না শয়তানের আরেকটা কর্ম হচ্ছে মানুষকে জ্ঞান দান করা, — যদিও ক্রিশ্চান ধর্মগ্রন্থে সে-কথার উল্লেখ নেই। তা, চার্বাকের মতো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হ'লে, চারিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা যে বেড়ে যায়, অস্বীকার করা চলে না।

সভায় গেলুম। সমিতিটির কয়েকটি বিশেষত্ব আমি লক্ষ করেছিলুম! সভ্যদের কারুরই গোঁপের রেখা স্পষ্টতর হয়নি। যেহেতু তাঁদের কাউকেই [.?.] শ্রেণীভুক্ত করা চলে না, আমায় বাধ্য হ'য়ে বলতে হচ্ছে, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে অল্পবয়স্থ হবেন। বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে তাঁরা লিখতে শিখলেনই-বা কবে, পুস্তক-প্রকাশ করলেনই-বা কবে আর সমালোচিত হলেনই-বা কবে, ভেবে-ভেবে আমি কূলকিনারা পেলুম না। কেন-না সব লেখার আগেই মক্‌শো করার প্রয়োজন, তা সে ক-খ লেখাই হোক্, কবিতা লেখাই হোক্ আর নাটক, নভেল লেখাই হোক্। তাই শেষে ঠিক করলুম যে মুষ্ট্যাঘাতের সদস্যরা সকলেই জন্ম-কবি, সকলেই সহ-জ লেখক। সমস্যার মীমাংসা ক'রে যেমন কতকটা প্রকৃতিস্থ হলুম, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ও হ'ল, এইসমস্ত ক্ষণজন্মাদের কাছে আমি বেচারা লগ্নভ্রষ্ট পাত্তা পাব কী ক'রে! তারপর গুটিকয়েক বক্তৃতা শুনে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। ওরে বাপ্‌রে, তার একটি বর্ণ বোঝে কার সাধ্য! কিন্তু সেগুলি শুনে যে আনন্দ হয়নি, এ-কথা বলতে পারি না। ভাবলুম, হ্যাঁ একটা জায়গায় এসেছি বটে! এমন বক্তৃতা যারা দিতে পারে তারা নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।

সভাভঙ্গের পর চার্বাকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। নরসুন্দর এবং দর্জির হাতে পড়লে চার্বাক সুপুরুষ ব'লে পরিগণিত হ'তে পারত। কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন লম্বা-লম্বা রুক্ষ চুল আর অহিফেন-সেবী স্বপ্নবৎ পোশাকে তাকে অনেকটা মধ্যযুগের ইউরোপীয় সঙের মতো ক'রে তুলেছিল। সে সকল বিষয়েই অসাধারণ ছিল। কথা কইত সপ্তম সুরে, নচেৎ গলাটা মন্দ ছিল না ; এবং বলবার ভঙ্গিটা বদ্‌লালে, তার বাক্যের মধ্যে যে অনেক ভাববার বিষয় আছে, তা স্বীকার করতে হ'ত। কিন্তু তার কথার মধ্যে হঠোক্তি আর দম্ভের মাত্রাটা কিছু বেশি ছিল, যেন সে যা-বলছে তাছাড়া জগতে আর কোনও সত্য থাকতে পারে না। কাজেই সে উচিত-কথা বললেও তাকে প্রতিবাদ করবার ইচ্ছাটা দুর্দম হ'য়ে উঠত। তার বয়স প্রায় আমার সমান, বা কিছু অধিক হবে।

দু-একটা কথার পর আমি তাকে বললুম, 'আপনার কাব্য পড়বার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আপনার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছি।'

সে বললে, 'আমার কাব্য পড়েননি শুনে আনন্দিত হলুম। আমার ইচ্ছে নয় আমার কাব্য সকলে পড়ে। আর আমার বক্তৃতা আপনি আসবার আগেও অনেককে মুগ্ধ করেছে।'

আমি তো স্তম্ভিত। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে আমার জ্ঞান অল্পই কিন্তু লোকে যদি না-পড়লে, তবে কাব্য লেখার সার্থকতা বুঝতে পারলুম না।'

'আপনার জ্ঞান যে অল্প, তা আপনার কথা থেকেই বুঝতে পারছি — বিশদ ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।'

অপরে কেউ এমন কথা বললে তাকে যে কী করতুম, বলতে পারি না। কিন্তু যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তেমন লেখকদের প্রতি এ-সময়ে আমার আস্থাটা প্রগাঢ় ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ভুলতে পারিনি যে চার্বাক মুষ্ট্যাঘাত সমিতির মালিক। তাই চুপ ক'রেই রইলুম।

সে আবার বললে, 'কলার আদর্শ হচ্ছে মহত্ত্ব। যা-লিখলুম তা যদি সকলেই পড়লে তবে আর বৈশিষ্ট্য রইল কোথা?'

আমি বললুম, 'যেটা সাধারণের দুর্ব্যবহারেও অমলিন থাকে সেটাই কি সত্যকার মহৎ নয়?'

সে বললে, 'এবার হয়তো-বা বলবেন যে-কাপড় পাঁকে চুবিয়ে নিলে ময়লা হ'য়ে যায় সেটা বাস্তবিক সাদা নয়।'

আমি প্রত্যুত্তরে বললুম, 'এ-দুটো কথা এক হ'ল না। আর লোকে যাতে আপনার লেখা না-পড়ে, তাই যদি আপনার অভিরুচি, তবে এই সম্পাদক-চৌদ্দপুরুষনাশিনী সভার সৃষ্টি করেছেন কেন?'

'আপনার বুদ্ধির দৌড় অনেক আগে থেকেই বুঝে নিয়েছি। যে-বিষয়ে জানেন না সে-সম্বন্ধে ব'কে আর ভালো ক'রে পরিচয় দিচ্ছেন কেন? আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে সম্পাদকেরা আমাদের লেখা নিক্। আমরা তার জন্য থোড়াই তোয়াক্কা রাখি। কিন্তু তারা যখন আমাদের জন্য কিছুই করছে না, তখন আমাদের লেখার সমালোচনা করবার তাদের কী অধিকার আছে?'

'সমালোচনা করবার অধিকার সকলেরই। আসল জিনিসের সমালোচনায় কোনো অপকার হয় না, তা সে-সমালোচনা যতই অন্যায় হোক্। আর যাঁরা তেমন সমালোচনার ভয়ে পাত্‌তাড়ি গুটান, তাঁদের আসরে না-নামাই উচিত ছিল।'

চার্বাক উত্তর দিলে, 'আসল জিনিস, ভালো জিনিস আপনি চিনবেন কী ক'রে, যে অত বড়ো-বড়ো কথা কইছেন। কুকুরের চেঁচাবার অধিকার আছে; কিন্তু তাই ব'লে যদি গৃহস্থের বাড়ির সামনে শোরগোল করে, গৃহস্থ কি তা সইবে? কখনোই না। তদ্দণ্ডে লগুড়াঘাতে তাকে দূর ক'রে দেবে।'

আমি এবার তার অন্যায় তর্কে চ'টে গিয়েছিলুম, তাই জবাব দিলুম, 'গৃহস্থেরা সাধারণ মানুষ। তারা নিজেদের তো মামুলির স্রোত থেকে পৃথক্ রাখে না; তাই তাদের এমন ব্যবহার শোভা পায়। কিন্তু কুকুর চাঁদকে দেখে যখন চেঁচায়, চাঁদ যদি তখন তাকে তাড়াবার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসে, তাহ'লে আমরা চাঁদকে আর চাঁদ ব'লে মানব না। আমি ভালো-মন্দর বিচার করতে অক্ষম হ'তে পারি; কিন্তু লিখেছি অনেক, এবং আপনার তুলায় তৌল করলে আমি একজন মস্ত লেখক, কেন-না আমার লেখা সম্পাদক ছাড়া আর কেউই পড়েনি। আমার আদর্শ অন্যরূপ। কুকুরে চিৎকার করলে কুকুরের গলা ভেঙে যাবে, চাঁদের তাতে ক্ষতি বা বৃদ্ধি নেই। সাধারণেই দেখুক আর আপনার মতো কবিই দেখুক, চাঁদ সব সময়েই হাসছে।'

আমিও একজন লেখক শুনে চার্বাক একটু নরম হ'ল। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'মশায়ের লেখা কীসে বেরিয়ে থাকে?'

আমি বললুম, 'কিছুতেই না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষেরা আমার লেখার মূল্য বুঝতে পারেন

না। তাই তো আপনাদের সভার শরণাপন্ন হয়েছি। আশা আছে আপনারা সহায় হ'লে তাঁদের অন্ধতা কেটে যাবে।'

সে বললে, 'পত্রিকায় লেখা বার ক'রে দেওয়া আমাদের কাজ নয় ; আর যে এইসকল ঘৃণ্য জিনিসের সংস্পর্শে নিজেকে কলুষিত করে, সে আমাদের ত্যাজ্য। আপনার যদি আমাদের দলে মেশবার ইচ্ছে থাকে, তাহ'লে আপনি ওই কর্মটি করবেন না। তার চেয়ে একখানা বই বার করুন-না কেন?'

লিখতে গেলে যে-আত্মশ্লাঘার প্রয়োজন, তা আমার সম্পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু আমার লিপ্সার দৌড় ছিল মাসিকপত্র পর্যন্ত। মানে, আমি যে একজন খুব উঁচুদরের লেখক তা আমি জানতুম, এবং এটাও মানতুম যে আমার লেখা সকলের পড়া উচিত ; কিন্তু মৎ-প্রণীত গ্রন্থ যে অপরে পয়সা খরচ ক'রে পড়বে, সে-দুরাশা আমার মনে স্থান পায়নি। লোকের মাসিকপত্র নেবার অনেক কারণ আছে, যথা ছবি, বিজ্ঞাপন, ইজ্জত, ইত্যাদি-ইত্যাদি। তাতে প্রবন্ধ বা অন্যান্য যা-পাঠ্যবিষয় থাকে, তা পড়বার জন্য কারুর মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। এটাই হচ্ছে মাসিকের গুণ। কিন্তু নগদ মূল্য একটাকা খরচ ক'রে বই কিনলে সেখানা প'ড়ে দেখার একটা দায়িত্ব এবং আগ্রহও সঙ্গে-সঙ্গে কিনতে হয়। তাই আমার লক্ষ্য মাসিক-রূপ তরুশিরেই নিহিত ছিল, খমধ্যশিখরে প্রধাবিত হয়নি। আমি বললুম, 'বই বার করতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু পড়বে কে?'

চার্বাক বললে, 'আপনাকে এই একঘণ্টা বোঝাতে চেষ্টা করছি যে সৎসাহিত্য লোকের পড়বার জন্য লেখা হয় না।'

আমি বললুম, 'তা যদি না-হয়, তবে আমার সৎসাহিত্য লেখার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।'

সে বললে, 'থাকলেও শক্তি নেই বললেই ভালো হ'ত। বেশ, আপনার যদি বিক্রির দিকেই লক্ষ্য হয়, তাহ'লে আমার উপদেশ-মাফিক চলুন, লোকের চিত্তাকর্ষণ করা শক্ত হবে না। আপনার কী লেখা অভ্যাস, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, না দার্শনিক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ?'

আমি জানালুম যে গল্প লেখাই আমার উদ্দেশ্য, এবং বিশ্বাস যে, তাতে আমার কিছু শক্তি আছে।

সে বললে, 'বেশ, তাহ'লে একটা গল্প লিখুন যাতে কলিকাতার বিখ্যাত ধনীর পুত্র কুমতি বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাধ্বী স্ত্রী সুশীলাকে ছেড়ে যাইজি ভুবনমোহিনীর মোহে মশগুল হ'য়ে রয়েছে। শেষে ভুবনমোহিনী কুমতির ভদ্রাসনে এসে মৌরসিপাট্টা গাড়লে, আর সুশীলা তার পদসেবায় নিযুক্ত হ'ল। একদিনের তরেও সুশীলার মুখে কেউ টুঁ-শব্দটি শোনেনি। অন্যে যখন তাকে বিদ্রোহ করতে বলত, স্বামীকে ত্যাগ ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে যেতে উপদেশ দিত, সে উত্তর দিত, সে কী? স্বামী যাকে ভালোবাসেন তার পদসেবা করব সে তো বহুজন্মের তপস্যার কথা। ক-জনের এমন সৌভাগ্য হয়। না, আমি ভুবনমোহিনীর দাসী হ'য়েই জীবন কাটাব।' কিন্তু তার মনের ভেতর দারুন আন্দোলন চলবে। শেষে মরার আগে সে ভুবনমোহিনীকে ডেকে তার হাতে স্বামী কুমতিকে সমর্পণ ক'রে ব'লে যাবে, 'আমি ওঁকে সুখী করতে পারলুম না, তুমি ক'রো।' তারপর কুমতি হঠাৎ সুমতি হ'য়ে পড়বে।

ভুবনমোহিনীকে তাড়ানোর দুটো উপায় আছে। হয় কুমতি, এখন সুমতি, তাকে 'পাপীয়সী', 'রাক্ষসী', 'মায়াবিনী' ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণের সহিত পদাঘাত ক'রে রাস্তায় বের ক'রে দেবে ; নচেৎ ভুবনমোহিনী কুমতির লোহার সিন্দুক থেকে চার-পাঁচ লাখ টাকার গয়না চুরি ক'রে পালাবে। শেষোক্ত পন্থাটাই বেশি বাঞ্ছনীয় ব'লে আমার মনে হয়। কারণ তাহ'লে দশ লাখ, বিশ লাখের কথা তো বলা হবেই, — যার যত অর্থাভাব সে তত লাখ, ক্রোরের কথা শুনতে ভালোবাসে — আবার পুলিশ, ডিটেক্‌টিভের কথাও উত্থাপন করা চলবে ; আর অন্তে ভুবনমোহিনীকে দ্বাদশবর্ষ সশ্রম কারাদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে। শেষ পরিচ্ছেদে হয় কুমতি সব সম্পত্তি দেবোত্তর ক'রে দিয়ে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে যাবে ; আর না-হয় সুশীলার বোন সরলাকে বিয়ে ক'রে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাকবে। বিয়ে দিয়ে নভেল শেষ করাই ভালো। মধুরেণ সমাপয়েৎ। তা আসল বিয়ে মধুর না-হ'লেও বইয়ের বিয়ের কথা পড়লে জিভে জল আসে। এর উপরে যদি 'বন্দে মাতরম্', 'জয় ভগবানের জয়', 'খদ্দর পরলে ভদ্দর হয়' ইত্যাদি দু-চারটে বুলি ঝাড়তে পারেন, তাহ'লে তো আর কথাই নেই। রামধনুক রঙের প্যাড বাঁধাই হওয়া চাই, মূল্য যোলো আনা। এমনতর একখানা *পতি পরমগুরু* ছাপান দিকি, কেমন বিক্রি না-হয়!'

এখন হবি তো হ, আমি ঠিক এইরকমেরই একখানি উপন্যাস লিখব ঠিক করেছিলুম। তবে তার অন্য নাম দেবার ইচ্ছে ছিল, — *সতীর দান* বা *ভগ্নহৃদয়* এমনি গোছের একটা কিছু। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলুম যে বাড়ি গিয়েই তার প্রথম পরিচ্ছেদটা সর্বভুক্‌কে আহুতি দেব। এখন যদি বলি যে চার্বাকের উপর আন্তরিক চটেছিলুম, তাহ'লে সেটা কিছুই আশ্চর্য শোনাবে না। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করতে পারি না যে, তার প্রতি আমি আকৃষ্টও হয়েছিলুম। অবশ্য গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম যে, তার মুখে-মনে মিল নেই, কিন্তু তার সকল কথাই যে ঢঙের খাতিরে তা বুঝতে আমার বিলম্ব হয়েছিল। আজ জেনেছি তার এই চাল শুধু নিজেকে জাহির করার জন্য। কিন্তু তখন তো আর তার পুস্তক-প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, কাজেই তার ব[ই]য়ের বিক্রি কত তা ঠিক জানতুম না। পরে শুনেছি যে এই মুষ্ট্যাঘাত সমিতি স্থাপনের সঙ্গে তার নাম এতই প্রচার হ'য়ে পড়েছিল যে এক বছরের মধ্যে তার বইয়ের আট-দশ সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। প্রাচীন উদ্ভটকার বলেছেন, 'ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জনঃ'। অনেক দেখে শিখেছি, বক্রয়ানা আত্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠপন্থা।

চার্বাকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কোনো কারণ নেই, যদিও তখন গোপনে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলুম। সত্য, হয়তো সে না-বললে বই প্রকাশের ইচ্ছা আমার মনে জাগত না, কিন্তু কলমপেশা ছাড়লে যে আমার সুখের মাত্রা কিছু কম হ'ত, তা তো বোধ হয় না, বরং উল্টো। শুনেছি, ইভ্ প্রলোভনে প'ড়ে নন্দন হারিয়েছিলেন ; আমিও এই নররূপী সর্পের পরামর্শে আমার অপ্রকাশিত জীবনের শান্তি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি।

৩

চার্বাকের সঙ্গে আলাপ হবার তিন-চারদিন পরে বিকালে এক বন্ধুর সহিত কথা কচ্ছি, চাকর এসে খবর দিলে, চার্বাকবাবু এসেছেন। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলুম, আমার কাছে তার কী দরকার থাকতে পারে? কিন্তু মনে-মনে যে গর্ব অনুভব করেছিলুম, অস্বীকার করতে পারি না। আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল লেখক, আর চার্বাক নামজাদা কবি। তাই সে যে আমার বাড়িতে যেচে আসবে, এ কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমার বন্ধুটিও স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন, তার কারণ কিন্তু অন্য। তিনি ধর্মভীরু মানুষ, কাজেই চার্বাক নামধেয় লোক যে এখনো সশরীরে বিদ্যমান, এই সংবাদটা হজম করতে তাঁর কিঞ্চিৎ সময় লেগেছিল। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার জন্য কিছু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন ; কিন্তু তাঁর অভিলাষ অপূর্ণ র'য়ে গেল : চার্বাক ঘরে প্রবেশ করলে।

আমি তাকে অভিবাদন ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এই যে। ভালো আছেন তো?'

সে তো চ'টেই আগুন। 'আপনার চোখ যে খারাপ তা তো আগে শোনাননি। ভালো যদি না-থাকব তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কী ক'রে?'

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দিলুম, 'তা দেখুন, বাইরে দেখে তো সবসময় বোঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে উঠে হেঁটে বেড়াবার শক্তি থাকলেও অসুখ ভিতরে লুকানো থাকে।'

'সেটাও যে আমার পক্ষে সত্য নয়, আপনার বোঝা উচিত ছিল। নয়তো আপনার কাছে আসতে সাহস করতুম না। আপনার বাক্যাবলির এমনি গুণ যে তাতে সুস্থ শরীরও ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। যখন স্বেচ্ছায় সে-যন্ত্রণা বরণ ক'রে নিয়েছি তখন বুঝতে হবে, খুব ভালোই আছি।'

এ-কথার আর কী জবাব দেব? কাজেই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য আমার বন্ধুটির সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবার সূত্রে বললুম, 'ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত কবি শ্রীচার্বাক চট্টোপাধ্যায়।'

তা ব'লেও কি নিস্তার আছে ছাই! চার্বাক ধাঁ ক'রে ব'লে উঠল, 'আপনাকে সেদিন অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম — এখন দেখছি বৃথাই — আমার বিখ্যাত হবার কোনো সাধ বা প্রয়াস নেই।' তারপর আমার বন্ধুটির দিকে ফিরে বললে, 'আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে, নিবেদন কেন, প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ ক'রে আমার কাব্যগ্রন্থ *সারণ*-খানি পড়বেন না।'

আমার বন্ধুর মুখখানি অঙ্কনের উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছিল। 'আশ্চর্য হ'লে লোকেরা বদন ব্যাদান করে শুনেই আসছি, প্রত্যক্ষ দেখলুম এই প্রথম।

চার্বাক ফের আমার দিকে ফিরে বললে, 'দেখুন, আরেকটা কথা। ভবিষ্যতে আমার নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করবেন না।'

এইবার আমি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তাই চট্‌ ক'রে বললুম, 'আপনি যে শ্রীহীন তা আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি। বৃথা ব'লে আর কষ্ট করছেন কেন?'

'যদি জানেন তো অজ্ঞের মতো আমার নামের আগে শ্রী জুড়ে দিলেন কেন? আমার লক্ষ্মীমন্ত হবার কোনো বাসনা নেই। লক্ষ্মী বৈশ্যের দেবতা, আমার তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার মতে শ্রীযুত হওয়া বেনেপনার চূড়ান্ত।'

আমার বন্ধুটি মৃদু স্বরে বললেন, 'কিন্তু, একটা প্রাচীন পদ্ধতি চ'লে আসছে, সেটাকে অযথা লঙ্ঘন ক'রে কী লাভ, কাউকে কামড়াচ্ছে না তো আর।'

চার্বাক বললে, 'প্রাচীন পদ্ধতি? আমি পদ্ধতি-টদ্ধতির ধার ধারি না। বাঁধা পথে চলা আমার পেশা নয়। নিয়মের গণ্ডিতে আটকানো থাকে সাধারণ মানুষে। আমরা যা-করব সেটাই পদ্ধতি হবে। সেইজন্যই তো আমি চার্বাক নাম নিয়েছি।'

আমি বললুম, 'কীরকম?'

সে উত্তর দিলে, 'জানতেন না? বাপ-মায়ে আমার নাম দিয়েছিল লক্ষ্মীপদ। আমি দেখলুম, আমি কারুর পায়ের তলায় থাকতে পারি না, বিশেষত লক্ষ্মীর চরণে।'

আমার সুহৃদ্ তো অবাক। তিনি বললেন, 'সে কী মশাই? বাপে-মায়ে নাম দিলে আর আপনি তাকে — ।'

চার্বাক তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, 'বদ্‌লে দিলেন? আজ্ঞে হ্যাঁ বদ্‌লে দিয়েছি। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমার বাবা ছিলেন ৫০্ মাইনের কেরানি। তাঁর কাছে লক্ষ্মীই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তাই ব'লে আমার চোখও যে আর বেশি উঁচুতে চাইতে ঝল্‌সে যাবে, তার কোনো মানে নেই। আর বাপের দেওয়া নাম তো সকলেরই আছে। তাতে আর নূতনত্বের মাধুর্য রইল কোথা? তাইতেই আমি চার্বাক নাম গ্রহণ করেছি। এর কারণ কী, আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন। কারণ দুটো : প্রথম, এ-নামটি আর কারুর পছন্দ হয় না ; দ্বিতীয়, যদি আদিম ভারতে কেউ পূজনীয় বা অনুসরণীয় থাকে তো সে হচ্ছে ওই এক মহাপুরুষ। আমার বিশ্বাস আমি যদি তখন জন্মাতুম, তাহ'লে চার্বাক হতুম। অবশ্য এমন নাম আমি আবিষ্কার করতে পারতুম যা আর আগে অপরে ধারণ করেনি। কিন্তু মহর্ষি চার্বাকের উপরে উঠবার শক্তি আমার নেই। তাঁর কাছে পরাস্ত হ'তে হ'ল।'

আমার বন্ধুটি আবার বললেন, 'যাঁরা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, যাঁদের কাছে আপনি সব বিষয়ে ঋণী, তাঁদের দেওয়া নাম আপনি কী ক'রে উল্টে দিলেন বুঝতে পারলুম না।'

চার্বাক বললে, 'ঋণী? ঋণী কীসের? আমার প্রতিভা, তা কি তারা দিয়েছে? তাহ'লে ৫০ টাকা মাইনের কেরানি ছাড়া অপর কিছু হ'তে পারতুম না। আমার বুদ্ধি, তা কি তারা দিয়েছে? তাহ'লে লক্ষ্মীর শ্রীপদ ছাড়া অপর কিছুই বুঝতুম না। ঋণী কী? আমি কারুর ধার ধারি না। শাস্ত্রে লক্ষ বাজে কথার মধ্যে একটি খাঁটি কথা পাওয়া যায়, 'স্বনামো পুরুষঃ ধন্য'। আমি যা করেছি তা নিজের জোরে, নিজের বুদ্ধিতে। কৃতজ্ঞতার আমার অভাব নেই ; কিন্তু যার যা-প্রাপ্য তার বেশি কিছু দিতে আমি নারাজ। চট্টোপাধ্যায় আখ্যাটা বদ্‌লে দিইনি, এটাই আমার পূর্বপুরুষদের ভাগ্য। আমার জন্ম ছাড়া আমি আর কিছুর জন্য বাপ-মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ নই। আর তা-ও ভাবলে গোল বাধে। আমার জন্ম দেবার সময় তারা কি আমার কথা ভেবেছিল, না নিজেদের কাম —।'

পূর্বেই বলেছি, আমার বন্ধুটি একটু পুরানো ধরনের ছিলেন। এ-কথাগুলো আমার মতো নবতন্ত্রীর কাছেই যখন কটু লাগছিল, তখন তাঁর নিকটে যে বিষবৎ বোধ হবে সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। খুব কম ক'রে বললেও, চার্বাকের রুচিটা কিঞ্চিৎ অমার্জিত এবং তাতে শিষ্টতারও

ঈষৎ অভাব। বন্ধুবর সত্যসত্যই মর্মাহত হ'য়ে বললেন, 'ওটুকু কৃতজ্ঞতার ধার ধারছেন কেন ; তার চেয়ে বলুন-না আপনার জন্মতেও আপনার পিতার কোনো হাত নেই।'

অপর কেউ হ'লে থেমে যেত, কিন্তু চার্বাক চাটুজ্যে চুপ করবার পাত্র নয়। সে একটু হেসে বললে, 'সে সৌভাগ্য যদি হ'ত তাহ'লে কি আর বলতে বাকি রাখতুম? আমার জীবনের প্রধান দুঃখ হচ্ছে যে আমি অনিয়মে জাত সন্তান নই। আমার বাবা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে দাসবৃত্তি সম্বন্ধে যে-নিষেধ আছে সেটা ভুলেছিলেন বটে, কিন্তু 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' বিধানটা ভুলতে পারেননি।'

আমি দেখলুম, যদি আর বেশিক্ষণ চুপ ক'রে থাকি তাহ'লে নূতন-পুরাতনের যে চির-বিরোধ সেটার চাক্ষুষ রক্তাক্ত প্রমাণ পাব। তাই আমার প্রাচীন সখার ক্রোধবহ্নি প্রশমিত করবার জন্য ভর্ৎসনার একটু ঈঙ্গিত ক'রে চার্বাককে বললুম, 'আপনি ঠাট্টা করছেন, তা বুঝেছি, কিন্তু পরিহাসের পাত্রাপাত্র আছে তো, নিজের বাপ-মাকে নিয়ে ঠাট্টাতে একটু কুরুচির আভাস কি নেই?'

চার্বাক এতক্ষণ চটেনি কিন্তু এবার রুক্ষ স্বরে বললে, 'আগে রুচি কাকে বলে শিখুন, তারপর কুরুচি সম্বন্ধে বিচার করবেন। আপনার কাছে থেকে রুচি বিষয়ে উপদেশ নিতে আমি আসিনি। আপনি বোধহয় জানেন যে পূর্বকালে — যার আপনারা এত বড়াই করছেন — পূর্বকালে মহাত্মা মাত্রেরই জন্মের ঠিক ছিল না। এমন-কি আপনাদের আদর্শ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরও নয়। মহাপুরুষদের যে ক্ষণজন্মা বলে সেটার তাৎপর্য কী? একটা-না-একটা মুহূর্তে তো সকলেই জন্মায় ; কিন্তু আত্মদানের সংযমশূন্য অবৈধ পরম মুহূর্তে যে জন্মায় তার জন্মই সার্থক। আমার একটা খেদই হচ্ছে ওই, তাইজন্যেই আমি নিজেকে সর্বতোভাবে বড়ো ব'লে মনে করতে পারি না।'

আমার বন্ধুটি বোধ করি এতক্ষণে চার্বাককে পাগল ব'লে সাব্যস্ত করেছিলেন, তাই মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'মশাই বোধ করি অবিবাহিত, নচেৎ অমন কথা বলতে সাহস করতেন না, কী জানি গৃহিণী যদি উপদেশ-মাফিক ক্ষণজন্মার মাতা হ'তে প্রয়াস পান।'

চার্বাক বললে, 'আজ্ঞে তা বলতে পারব না। সে-নিয়মটা পালন করেছিলুম, ওই জন্মের দোষেই বোধহয়। কিন্তু আমি চিরকালই স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাই আমার সহধর্মিণীকে মুক্তির এমনি আস্বাদ দিয়েছিলুম যে, তিনি শেষে কায়াবন্ধনও সহ্য করতে পারলেন না। আশা করি অশরীরী হ'য়ে পতিপ্রাণা এখন আমার প্রতীক্ষায় নরক গুল্‌জার করছেন।'

আমার বন্ধু শিউরে উঠে দুর্গামন্ত্র জপ ক'রে বললেন, 'মশাই, সাবধান, সাবধান, যে-দয়াময় তাঁকে আপনার কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনি আবার দণ্ডধরও হ'তে পারেন। এইবারে নম্র হোন্, তাঁর ধৈর্যেরও সীমা আছে। তিনি আপনাকে অনেক সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে যদি উত্তরোত্তর বেড়েই যান তাহ'লে ঝড়ে পতন আপনার ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী।'

চার্বাক বললে, 'তাঁর ধৈর্যের সীমা আছে কি-না জানি না, তবে আমার সহিষ্ণুতার গণ্ডি যে আপনি পার হ'য়ে গেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। আপনার সঙ্গে আর বকতে পারি-

নে। আমি দুগ্ধপোষ্য নই যে জুজুর ভয় দেখিয়ে আমায় ঘুম পাড়াবেন। আজ প্রায় বিশ বৎসর নাগাদ আমার বিচারবুদ্ধির ভয়ে বরং তিনিই নিস্তব্ধে আমার উপর থেকে স্বীয় অধিকার গুটিয়ে নিয়েছেন। আর যে-ঝড়ের কথা বললেন, সেটা অজ্ঞের মতোই বলেছেন। হিমালয়কে কি ঝড়ে কিছু করতে পারে এবং তার নিঃশ্বাসই প্রভঞ্জন হ'য়ে আপনাদের মতো শিকড়-নির্ভরদের উপড়ে দিয়ে চ'লে যায়। খুব হয়েছে, নির্বুদ্ধির আর কত পরিচয় দেবেন।'

আমার সখার আর সইল না, তিনি আসন ছেড়ে উঠে চার্বাকের দিকে দেখিয়ে আমায় বললেন, 'এইরকম অশ্লীলভাষী, বর্বর নাস্তিকের সঙ্গে যতদিন সম্পর্ক রাখবে, ততদিন ভদ্রসমাজকে আর আহ্বান ক'রো না।' এই ব'লেই তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন, আমাকে ক্ষমাভিক্ষা করার বা অনুনয় করার আর সুযোগ দিলেন না। আমার কাছে তাঁর তিরোধানটা বড়োই মর্মস্পর্শী লাগল — অনেকটা যেমন *পাণ্ডব-গৌরব*-এর ভীম যখন কৃষ্ণকে তাঁর শাঠ্যের জন্য আবমাননা ক'রে, দ্বৈরথসমরে বিফল মনোরথ হ'য়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে দ্রুত করতালির মধ্যে বেগে প্রস্থান করেন।

চার্বাক হাসতে লাগল।

৪

আমায় একটা কথা স্বীকার করতে হবে, যার জন্য হয়তো লোকে আমায় বিকৃতচেতা বলবেন। সেটা হচ্ছে যে চার্বাকের সহিত আমার সখ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি বুঝতুম যে তার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা শুভকর নয়, কিন্তু তার কী সম্মোহনী ছিল, যা এড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। আমি চিরদিন বিশ্বাস ক'রে আসছি যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা লাভ করা ; আর যেহেতু সে-সম্পদটা কারাগারের মধ্যে লাভ করা যায় না, আমি নানারকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। চার্বাক যে একটা অসুলভ এবং চিত্তগ্রাহী শ্রেণীর লোক তা মানতেই হবে।

নিজের দোষ ঢাকতে, অন্তত কমাতে সকলের চেষ্টা থাকে ; তাই এটা না-ব'লে পারছি না যে আমাদের মৈত্রী সম্পূর্ণ আমার অভিলষিত নয়। আমার স্বাভাবিক একটা নম্রতা আছে, যার জন্য বন্ধুত্ব-স্থাপনে প্রথম চেষ্টা সাধারণত আমার দিক থেকে হয় না। চার্বাকের যে-পরিচয় দিয়েছি তার থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে তার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে চট্ ক'রে কেউ এগুবে না, আমার মতন নিরীহ লোকে তো নয়ই। বোধহয় আমার এই নিরীহতাই আমাদের নৈকট্যের মূল। তখন বুঝিনি কিন্তু আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, সে-সময়ে চার্বাক কতটা একাকী ছিল। আমি ভুলিনি যে সে মুষ্ট্যাঘাত সমিতির সভাপতি ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু সে-সভায় তার বুদ্ধিবৃত্তির সমকক্ষ কেউ ছিল না ; আর থাকলেও তার অদ্ভুত ধারণাগুলি শুনে তার কাছে কেউ এগুতে সাহস করত না। তাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল বটে সঙ্কীর্ণতানাশ আর বেনেপনা উচ্ছেদ, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে বেনেপনার অংশটা কিছু বেশি। মুষ্ট্যাঘাতের সভ্যরা আর যা-হোন্ অনন্যসাধারণ নন, অবশ্য চার্বাক ছাড়া।

লেখার দরুন যে বন্ধুলাভ হয়, চার্বাকের তা ঘটেনি। অবশ্য তার কবিতা হালফ্যাশানের

যুবকদের মধ্যে দিন-কতকের একটা ধুয়ো হয়েছিল। কিন্তু তার স্থিতি অল্পদিনের জন্য। তার বই কিনত তারা যারা তার সঙ্গে অল্পসময়ের জন্য কথা বলেছে। সম্পাদক-প্রভুদের শুভদৃষ্টি পেলে সে যে খুব বিখ্যাত হ'তে পারত, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যজগতে তাকে কেউ চিনত কি-না জানি না, বোধহয় না। তার কাব্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার জন্যে সে এই দলের আদর পেতে পারে।

আমার একটা ভয় হচ্ছে, বুঝি তার লেখার প্রতি অন্যায় করছি। তার কবিতার সঙ্গে আমার এমন জানাশুনা নেই যাতে ক'রে সমালোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই অপরিচয়ের জন্য দোষ আমার নয়। তার সাথে আলাপ হবার দিনই আমি তার বই *সারণ* কিনি। কিন্তু *সারণ* বোঝবার জন্য যত টাকার অভিধানের দরকার তত সম্পত্তির মালিক আমি নই। আমার কাছে তার বইখানি যে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল তার কারণ আমার বাংলা ভাষায় অনধিকার হ'তে পারে। কিন্তু তাকে যখন এই কাঠিন্যের হেতু জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সে বলেছিল, 'আমার চেষ্টা যাতে সাধারণে বুঝতে না-পারে। কলার আদর্শ বদ্‌লানো দরকার। এতদিন শুধু সৌন্দর্যেই লোকে তুষ্ট থাকত, আমার কাজ হচ্ছে কলাকে আভিজাত্য দান করা। ঠিক বলতে গেলে জগতে এ-অবধি একটা কবিও জন্মায়নি ; আমিই প্রথম। সেইজন্যেই আমার বইয়ের নাম দিয়েছি *সারণ*। এতদিন যত কাব্য লেখা হয়েছে সবগুলোকে শুদ্ধ করবার জন্য তার সৃষ্টি। যদি সহজ চাও গদ্য আছে, পদ্যতে হাত দিতে যাও কেন।'

সে-সময়ে তার কথাগুলোকে ভেবেছিলুম অমূল্য ; আর তার কাব্যগ্রন্থকে রত্নাকর ; সমুদ্রের মতোই তার মধ্যে অসংখ্য মণিমাণিক্য বোধহয় নিহিত ছিল, কিন্তু আমি ডুবুরি না-হওয়ার দরুন সেগুলি উদ্ধার করতে পারিনি। অবশেষে যখন নিম্নলিখিতধরনের দু-একটা ভাবসাগরে হাবুডুবু খেলুম, তখন রত্নলাভের লোভ সংবরণ করতে হ'ল। সেই থেকে তার ধারেও যেতে ভয় হ'ত। দুটি নমুনা দিচ্ছি :

গলে গুণ-রজ দিয়ে কিংশুক,
প্রবিষ্ঠে বাঁধা ফুল-কৌতুক,
বঙ্ক অলীকে মলয়জ টীপ ;
প্রতীক পুলকে প্রাবৃটের নীপ,
ব্রীড়িত লপন গৌর-সুমনা
হ্লাদিনী-রসনা, হ্লাদিনী-নয়না,
মায়াবিনী আসে বসন্তরাতে
যোষিতার রূপে ক্ষপাকর সাথে।
ও যে কৌণপি, বেশে প্রেয়সীর!
অপলে উহার হবি অবলীঢ়।

কোনো কষ্টে এটার অর্থ বুঝতে পেরেছিলুম ; কিন্তু যখন :

গুঞ্জনালস, নীল নিষিক্ত,
স্থাণু কেশন্ত উরস লিপ্ত,

ইন্দিবরেতে স্রগেক কুপ্ত
সারগ-স্তেন-পুঞ্জ।

এই পঙ্‌ক্তি-ক-টা দেখলুম, তখন নিজের বুদ্ধিহীনতা বিষয়ে কোনোই সংশয় রইল না। তাই বলছি, চার্বাকের কবিতা সম্বন্ধে আমার সমালোচনা করা সাজে না। তবে কৌলীন্যই যদি আর্টের আদর্শ হয়, তাহ'লে চার্বাক সকলের অপেক্ষা বড়ো শিল্পী।

এখন দেখা যাবে যে, যদিও এইধরনের কাব্য লিখে চার্বাকের একদল শিষ্য হয়েছিল, এমন রচনায় জনপ্রিয় হওয়া দুষ্কর। কাজেই তার বন্ধুর অভাব ছিল। আমার একটা গুণ আছে, যে যা-বলে নির্বাক হ'য়ে শুনে যেতে পারি ; তাই অনেকেই আমায় অনুকম্পার চোখে দেখে থাকেন। চার্বাক যে শেষে আমার সঙ্গে সখ্য পাতিয়েছিল, সেটা আমার গুণের জন্য নয়, আমার জিহ্বার জড়তার জন্য।

পূর্বে বলেছি এতে আমার কোনো হাত ছিল না। সেটা সত্য হ'লেও সর্বাংশে সত্য নয়। আমি অবশ্য তার সহিত ভাব করবার জন্য লালায়িত ছিলুম না। কিন্তু একবার যখন বিস্ময় কেটে গেল, তখন যে তাতে গর্ব অনুভব করিনি, এবং সেটাকে বজায় রাখবার জন্য চেষ্টা করিনি, তা বললে অন্যায় হবে। তবে আমার দিক থেকে একটা কথা বলবার আছে, তখন বয়স ছিল অল্প, — সে-সময় লোককে হতভম্ব ক'রে দেবার ইচ্ছাটা প্রবল থাকে। চার্বাককে সঙ্গী পেলে এই স্পৃহাটা যে পূর্ণ হওয়া সম্ভব, তা তো না-বললে চলবে না।

সে যাই হোক্, তার সঙ্গে আলাপ বেশ জ'মে উঠল। প্রায়ই তার বাড়ি যেতুম। কত বিষয়েই চর্চা হ'ত। না, আমাদের যে-কথোপকথন হ'ত তাকে চর্চা বলা চলে না। কেন-না চর্চার মধ্যে মতের বিনিময় উহ্য আছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সেটা ঘটত না। চার্বাক অপরের মত, অপরের বিচার সহ্য করতে পারত না। সে নিজের মর্জি অনর্গল প্রচার ক'রে যেত, আর আমি অবিচ্ছিন্ন নীরবতার আড়াল থেকে অবধান ক'রে যেতুম ; এবং সোৎসাহ বিস্ময়ে মনে-মনে তার তারিফ করতুম। সে-সমস্ত কথাবার্তার কথা তুলতে গেলে খান-দশেক *মহাভারত* রচনা করতে হয়। আরেকটা কারণে সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে সাহস হচ্ছে না। যে-সমস্ত বিষয় আলোচনা হ'ত সে-সবের কথা লিখলে আমায় আর সমাজে বাস করতে হবে না। হয়তো-বা লালপাগড়ির তাড়া খেতে হবে, — এমন-কি সেই ভূস্বর্গ আন্দামানেও বাস করতে হ'তে পারে ; নচেৎ টিকি-, টাক-, শুভ্রকেশ-যুক্ত শীর্ষসমূহের আনন্দ-অনুমোদন সঞ্চালিত, সুরুচি-অমল-পদ্মবাহী বক্তৃতা-নদীর প্রবাহে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। আমার বিশ্বাস আমি বাইরন অপেক্ষা নিকৃষ্ট কবি নই ; কিন্তু তাঁর মতো পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করতে অনিচ্ছুক। আর ভারতে ডাইভোর্স-প্রথা না-থাকলেও, গৃহিণীরা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সম্মার্জনী ধারণ করতে পারেন। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবার আমার কোনো লিপ্সা নেই। তাই 'শতং বদ মা লিখ' উপদেশটাই গ্রহণ করছি।

কিন্তু তাই ব'লে তার সঙ্গে শেষ, — শেষই-বা বলি কেমন ক'রে, কেন-না তারপরে আমাদের আরেকবার মিলন হয় ; — চার্বাকের সঙ্গে শেষ কথার ইতিহাস না-দিয়ে থাকতে পারছি না।

আমার তখন নূতন বিয়ে হয়েছে, কাজেই আমি বিবাহের ঔৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিয়ে বেড়াতুম। তাই চার্বাককে বললুম, 'চার্বাক, একটা বিয়ে ক'রে ফেলো। তোমার প্রথমা স্ত্রী তোমার উপযুক্তা হয়তো হননি, কিন্তু এবার নিজে দেখে-শুনে মনের মতো সঙ্গিনী করো। বুঝলে হে, একটি সুখ-দুঃখের অংশী না-হ'লে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর তুমি স্বভাবতই একটু উচ্ছৃঙ্খল, তা যদি অর্ধাঙ্গকেও শান্ত করতে পারো তাহ'লেই মঙ্গল।'

সে বললে, 'লাঙ্গুলহীন শৃগাল জাতভায়েদের পুচ্ছ কাটতে চিরকালই ব'লে আসছে। কিন্তু তুমি আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ, নেড়া বেলতলায় দু-বার যায় না। উপদেশ যখন খুঁজব তখন দিও, তার আগে নয়।'

আমি তার অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, 'যুগ-যুগ ধ'রে দেখে আসছি প্রতিভা পত্নী বরদাস্ত করতে পারে না। শেক্স্পীয়র, মিল্টন, দান্তে, পেট্রার্ক ইত্যাদি কত লোকের কথা আর বলব। যদি আমার মধ্যে বৈশিষ্ট্য না-থাকত স্ত্রী নিয়ে সুখে বাস করতে পারতুম, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমি সমষ্টি থেকে পৃথক্। আরেকটা কী জানো, বিয়েটার বিস্তার যদি আমরণ অবধি না-হ'ত তাহ'লেও-বা না-হয় আরেকবার চেষ্টা ক'রে দেখতুম। এখন যা-চলছে তাতে বিবাহ সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্ক হ'য়ে দাড়িয়েছে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু যারা শ্রেষ্ঠ তাদেরই বিয়ে করা বেশি দরকার। পুরানো প্রবাদ আছে "বাপ কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া, কুছ ভি নেহি তো থোড়া থোড়া।"'

সে বললে, 'হ্যাঁ খুব মানি, কিন্তু বিয়ে ছাড়াও বাপ হওয়া যায়।'

আমি তো আঁৎকে উঠলুম, 'অ্যাঁ, তাহ'লে সমাজের বন্ধন রইল কোথা ; সতীত্ব রইল কেথা? ভারতের ওই একটা গৌরব আছে তার স্ত্রীজাতি আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।'

সে বললে, 'অর্থাৎ স্ত্রী সতীত্বের খাতিরে স্ত্রীত্ব হারিয়েছে। যারা চিরদিন চঞ্চলতার জন্য বিখ্যাত তারা এখন স্থাণু হ'য়ে পড়েছে। ভারতের মর্যাদার কথা না-বললেই ভালো। যখন তার মানসম্ভ্রম ছিল তখন অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল। আদ্যিকালের আদর্শ বদ্যিবুড়ি ছিল না। সে-স্থান নিয়েছিল শচী, যে লক্ষ ইন্দ্র পরিবর্তনের মধ্যেও অবিকার থাকে ; সে-স্থান নিয়েছিল মন্দোদরী, যে এক ভাই মরলে অপর ভাইকে বরণ করে, সে-স্থান নিয়েছিল লক্ষ-লক্ষ দেবীরা, অপ্সরীরা, অবৈধতাতেই যাদের আনন্দ। আর সমাজ-বন্ধনের কথা বলছ মিছেই। তার ভয়েই আমি ময়ূর-ছাড়া কার্তিকটি হ'য়ে রয়েছি। যদি আমি কখনো আবার বিয়ে করি, তাহ'লে আমার স্ত্রীকে বলব, 'দেখো বাপু, তুমি তোমার পথে চলো, আমি আমার পথে চলি। আমি সূর্যের মতো, আমার তেজ যদি-না সহ্য করতে পার অন্যত্রে যেতে পারো, কিন্তু আমায় শানযন্ত্রে ফেলে কেউ খর্ব করতে পারবে না। এককথায় তুমি চ'রে খাও।'

এর আর কী জবাব থাকতে পারে, তাই ব্যঙ্গ স্বরে বললুম, 'দেখছি তোমার স্ত্রী হওয়া বেশ সুখের।'

সে উত্তর দিলে, 'যত সুখের ভাবছ তত নয়। স্বেচ্ছাচার করতে গেলে যে মনের জোর থাকা চাই, সেটা বড়োই বিরল, অন্তত বাঙালির মেয়ের মধ্যে। আরেকটা জিনিস যা আমি

সহ্য করতে পারি না সেটা হচ্ছে ধর্মভাব, আস্থা। তুমি কি এমন স্ত্রীলোক দেখেছ, তা তিনি হিঁদুই হোন্, আর ব্রাহ্মই হোন্, যার মনে এই ময়লাটা নেই। প্রথমটি যিনি না-করতে পারবেন, আর দ্বিতীয়টি যিনি করবেন, তিনি আমার গৃহে স্থান পাবেন না। এখন বোঝো সেটা কত শক্ত।'

অবশ্য সেটা শক্ত, কিন্তু সে যে-কারণে বলছিল সে-কারণে নয়। এর মধ্যে কঠিন অংশ হচ্ছে এই দুটো জিনিসকে মেলানো, স্বেচ্ছাচারের অধিকার দিলে তাকে ধার্মিক হ'তে বারণ করি কী ক'রে? সে যাই হোক্, আমি নির্বাক হ'য়ে রইলুম। চার্বাকের সঙ্গে তর্কে আমি পারতুম না। বিকৃততত্ত্বের যেখানে আবশ্যক সেখানে সে অজেয়। তাকে যদি বলা যেত, 'প্রমাণ করো ভাত সাদা', সে হয়তো অকৃতকার্য হ'ত। কিন্তু ভাত যে কালো তা, চোখের অস্বীকার সত্ত্বেও, সে বুঝিয়ে দিতে সম্পূর্ণ পারগ।

৫

এরপর আর চার্বাকের সঙ্গে দেখা হয়নি, যদিও যে-লোক পূর্বে চার্বাক ছিল তাকে বহু বৎসর পরে একবার দেখেছিলুম ; কিন্তু সে-কথা যথাসময়ে বলব।

আমাদের বিচ্ছেদের নানা কারণ ছিল। বিবাহ সম্বন্ধে তার মতামত যে আমার কাছে অত্যন্ত গর্হিত ব'লে বোধ হয়েছিল, তা আমায় মানতেই হবে ; যদিও সংসারী হবার আগে আমার অভিমত কতকটা এমনিই ছিল, কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে আমি আর তেমন অনিষ্টজনক ধারণাকে প্রশ্রয় দিতুম না। আশা করি আমার এই একরার শুনে নবীনপন্থীরা নাক কানে তুলবেন। তাঁদের কাছে আমার পক্ষ থেকে ইতিহাসকে আমি সাক্ষী মানতে রাজি আছি। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক অধিনেতার কথা ভুললে চলবে না। পরিবর্তনশীলতা একটা গুণ। এই গুণটি শুধু যে ভারতবর্ষের বৈলক্ষণ্য তা নয়। ইংলন্ডের শ্রমজীবীদলের প্রতিনিধিবর্গের কথা অবিশ্বাসীদের স্মরণ করতে বলি। আর লাটেদের ভারতে আসবার পূর্বে যে-আর্দ্রহৃদয়তা থাকে সেটা যে অনেকসময় হিন্দুস্থানে পদার্পণের সঙ্গে শুকিয়ে যায় তার অনেক প্রমাণ ভূতে এবং বর্তমানে পাওয়া যায়। (অবশ্য এ-দোষ তাঁদের না-ও হ'তে পারে। কলেজ স্কোয়ারের বক্তৃতায় শোনা যায় ভারত মরুভূমি হয়েছে। মরুর একটা প্রযোজ্য হচ্ছে শুষ্কতা।)

দার্শনিকেরা ব'লে থাকেন দায়িত্ব এলে পর সহৃদয়ত্ব চ'লে যায়। আমি যা-বুঝি, যতদিন পকেটে হাত পড়বার সম্ভাবনা নেই, ততদিন উদারতা দেখাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু পকেটের কাছাকাছি এলেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। আর যদি কেউ চাবিতালার মধ্য থেকে স্ত্রীরত্ন অপহরণ করবার যোগাড় করে, তাহ'লে সাবধান হ'তেই হবে। কাজেই চার্বাকের সহিত আর বেশি ঘনিষ্ঠতা করা আমি সঙ্গত মনে করলুম না।

আরো একটা কারণ ছিল। এতদিন ইতস্তত ক'রে শেষে একখানা বই বার করাই স্থির করেছিলুম। মনে-মনে আশা ছিল যদি অপরে তাকে না-ও পড়ে, অন্তত গৃহিণী তাকে প্রীতি এবং বিস্ময়ের চোখে দেখবেন। কিন্তু আশা সর্বত্রই কুহকিনী। সে-সাধও আমার মেটেনি।

আমার এই আশাভঙ্গ থেকে প্রমাণ পেয়েছি প্রবাদগুলো কতদূর ভিত্তিহীন। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, পুরুষ স্বীয় ভামিনীর কাছে কখনো মহান্ নয় ; যদিও জনশ্রুতি বলে, 'মানব মাত্রেই ভার্যার চক্ষে মহিমামণ্ডিত।' কিন্তু থাক্ সে-কথা। এটা তো আত্মচরিত নয়, চার্বাকের কাহিনী।

এই পুস্তক-প্রকাশের ঝঞ্ঝাটে যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকত (সেটা অবশ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা কাল) তা নবপ্রণয়িনীর মানভঞ্জন এবং তাঁর কানে প্রেমগুঞ্জনেই অতিবাহিত হ'ত। এখন জিজ্ঞাসা করি চার্বাকের চালচলন লক্ষ করা বা তার চোখা-চোখা বাক্যাবলি শ্রবণ করার কি এই সময়? তার সঙ্গে আলাপ করতে গেলে মাথা স্থির এবং বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ সজাগ রাখার দরকার। কিন্তু আমি যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলুম, তাতে মস্তিষ্ক তো হৃদয়ের কাছে হার মেনেছিলই, এমন-কি স্বীয় নৈসর্গিক ঔদ্ধত্য ভুলে, চরণবিশেষে লুণ্ঠিতও হ'ত।

তাই যখন চার্বাকের পত্রখানা পেলুম, তখন স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলুম। সেটাতে সে তার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিল। চিঠিখানা এইরকম :

'এই লিপিখানি যখন তোমার হস্তগত হবে, তখন আমি যেখানে যাব সেখানে সকলেই যায় বটে, কিন্তু আমি যে-পথে যাচ্চি তা দিয়ে নয়। এই ক্ষেত্রে চার্বাক চট্টোপাধ্যায়কেও অন্যের অনুসরণ করতে হ'ল। তুমি নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করছ, কোন্ সে-স্থান যা আমার পদরজে পুণ্যভূমি হ'য়ে উঠবে। সেটা আর কোথাও নয়, শমনদেবের রাজত্ব। আর যে-পন্থা ধ'রে যাব, সেটি আত্মকৃত বর্ত্ম। আশা করি সেখানে আমার যোগ্য সমাদর করা হবে। নরকেই যে আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ হচ্ছে, এটা তোমার মতো অল্পমতিকেও বোঝাবার দরকার হবে না। তবে যম যে বিষম ফাঁফরে পড়েছেন তাতে আর সন্দেহ নেই, কেন-না আমার মামুলি কুম্ভীপাকে সানাবে না, বিশেষ ব্যবস্থা চাই।

'তুমি বলছ, "তা তো বুঝলুম কিন্তু আত্মকৃত পথ তো সম্পূর্ণ বিজন নয়।" নয়, আমি মানছি। কিন্তু সেখানে লোকের চলাফেরা বিরল। আরেকটা জিনিস তোমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো দরকার। নিজের রচা মার্গও নানারূপের হ'তে পারে। আমি চিরদিনই ব'লে আসছি জনসাধারণ অজ্ঞ, এমন-কি যারা নরকে যায় তারাও। জ্যামিতির রচয়িতা একটা সমস্যার মীমাংসা করেছেন যেটার নাম হচ্ছে 'রাসভ-সাধ্য' অর্থাৎ গাধাতেও দুটো পথের মধ্যে অল্প পথটাই যে গ্রহণ করে সেটার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ গাধার চেয়েও নির্বোধ, তার প্রমাণ এই 'রাসভ-সাধ্য'টাই ; সে কত বড়ো বোকা যাকে ছবি এঁকে, মাপজোক্ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয় যে, বক্ররেখার চেয়ে সরলরেখাই খর্ব। সেইজন্য মানুষ মহাপ্রস্থান করবার আগে শুয়ে পড়ে। আমি কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা করেছি। পাতাল যে নিচে তা বোধহয় তুমিও জানো ; তাই আমি ঠিক করেছি মনুমেন্টের চূড়া থেকে লম্ফ দিলেই সেখানে চট্ ক'রে গিয়ে পড়ব। এ-মার্গ, সহজ ব'লেই, কেউ অবলম্বন করেনি, অন্তত আমি যতদূর জানি। তবে যদি দেখি সেটা চলাপথ তাহ'লে রাস্তা বদলাতে হ'তে পারে।

'আরেকটা বিষয়ে তোমায় আশ্বাস দিয়ে যাই। যদি কেউ বলে যে চার্বাক ভীরু, তাই সে জীবনের দায়িত্ব এড়িয়েছে, তাকে তুমি শ্রীহীন চার্বাক চট্টোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দেখতে ব'লো। তোমার মহান্ বন্ধু কাপুরুষ নয়, অন্য যা-হোক্ আর তা-হোক্।'

চিঠিখানা ঠিক চার্বাকের অপর লেখাব মতন। তার অর্থ খুঁজে পেলুম না। তখন শিখিনি মরণ হচ্ছে পালাবার প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'কেন, সে আত্মহত্যা করলে কেন?' চার্বাকের মধ্যে কোনোদিনই কারণের বহুলতা ছিল না, এই কথা ব'লে মনকে প্রবোধ দিলুম। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে যে-শান্তি অনুভব করিনি, তা বলতে পারি না। এখন আর আমার অদূর জীবনের কোনো স্মৃতিই রাখতে ইচ্ছে ছিল না। চার্বাকের সঙ্গে সেকালের সকল বালাই চুকে গেল। এখন আর আমার শিষ্টতা, সাধুতা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ করতে পারবেন না। কিন্তু মুখে খুব শোক প্রকাশ করলুম। দু-একটা প্রবন্ধও লিখলুম।

তবে খবরের কাগজে 'মনুমেন্টে আত্মহত্যা' 'উদীয়মান কবি নিজের প্রাণ নিজেই লইল' ইত্যাদি রোমহর্ষক শীর্ষ না-দেখে একটু বিচলিত হয়েছিলুম। কিন্তু পরে মনে পড়ল চার্বাক অপর বর্ত্মও খোলা রেখেছিল।

৬

চার্বাক অপসারিত হবার পর তার শূন্য গদি আমিই অধিকার করলুম। তবে আমার করগত হ'য়ে 'মুষ্ট্যাঘাত সমিতি' শিথিল-পাণি হ'য়ে পড়ল। আমার মধ্যে গোলামিয়ানার প্রভাব এত বেশি যে আমার হাত মুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না, যুক্ত হবার জন্যই লালায়িত হ'য়ে থাকে। তাই সম্পাদকদের একটু দয়া হ'ল ; তাঁরা প্রকৃতিগত কুণ্ঠা ছেড়ে আমার লেখা দু-একখানা বইয়ের সুখ্যাতি করলেন। তাঁদের গলা স্বভাবতই একটু ধরা থাকে (অন্তত সুখ্যাতি করা দরকার হ'লে) ; তাই আসল উক্তির চেয়ে সে খাঁক্‌রানির আওয়াজটাই সাধারণত একটু প্রখর হ'য়ে থাকে। আমার অদৃষ্টেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু আমার অভিযোগ করার কিছুই নেই যেহেতু তাঁদের স্তোকোক্তি নিকটস্থ দু-চারজনের কর্ণে প্রবেশ করেছিল। যদিচ আমার ইতিবৃত্তের অন্তে বলতে পারব না, 'অতঃপর তাহারা দু-জনে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন', তবুও, আমার বিবাহিত-জীবনে সচরাচর যে-সকল কণ্টক থাকে, তৎ-ভিন্ন অভাবনীয় কিছু ঘটেনি। অল্পকথায়, একরকম মন্দ কাটছিল না।

কিন্তু এ তো গেল আমার নিজের কথা ; চার্বাকের সঙ্গে এর কিছু সম্পর্ক নেই। আমি দিন-দিন বড়োই পুরানো ফ্যাশানের হ'য়ে পড়ছি, কাজেই তার কাহিনীর শেষ অবধি না-ব'লে থাকতে পারছি না। এই তোড়জোড় দেখে যেন কেউ মনে না-করেন যে আমি দান্তের উপরে টেক্কা দিয়ে কুম্ভীপাকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হব। এখন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, সত্য ; এবং আগামী জগতের কথা যে আমার চিন্তায় প্রথম স্থান দখল করেনি, এ-কথা বললে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু প্রবল স্পৃহা থাকলেও এখানে নরক-চিত্রের অবতারণা করতে পারব না। এই দুঃখময় পৃথিবী নিয়েই আমায় তুষ্ট থাকতে হবে।

চার্বাকের শেষ চিঠি পাবার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেছে। সম্প্রতি আমায় কাশীতে যেতে হয়েছিল। একদিন সকালবেলা দশাশ্বমেধের ঘাটে ঘুরছিলাম, হঠাৎ দেখি একটি লোক একটি ছোটো ছেলেকে চান করিয়ে উঠে আসছে। লোকটিকে দেখে মনে হ'ল চিনি, কিন্তু কে ঠিক করতে পারলুম না। তারপর ধাঁ ক'রে চিনতে পারলুম। এ না চার্বাক চাটুজ্যে? সে

তো আগুনের চরকিতে অনন্তকাল ধ'রে ঘুরে মরছে। কিন্তু মানুষে-মানুষে এমন সৌসাদৃশ্য থাকতে পারে বিশ্বাস হ'ল না। সে কাছে আসতে তার দিকেই ছুটে গিয়ে বললুম, 'চার্বাক, তুমি এখানে?' সে একবার আমার দিকে রোষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করলে, তারপর বললে, 'কে হে বাপু, না-জেনে-শুনে লোকের সঙ্গে কথা কও।' আমি বললুম, 'মাপ করবেন মশাই, আমার একজন বন্ধু ছিল ঠিক আপনার মতন দেখতে। সে আত্মহত্যা করেছে, হঠাৎ আপনাকে দেখে সে ব'লে ভ্রম হয়েছিল।' সে শিউরে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মশায়ের নাম জানতে পারি?' আমি আত্মপরিচয় দিলুম। তার মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে বললে, 'আরে, আগে বলতে হয়। কোনো ভুল নেই, আমিই চার্বাক ছিলুম বটে, কিন্তু এখন যে লক্ষ্মীপদ সেই হয়েছি। তা, ভায়া দুঃখু ক'রো না, বুড়ো হ'য়ে গিয়ে চোখ খারাপ হ'য়ে গেছে, দেখতে পাইনি। আর চট্ ক'রে পরিচয় দিতে বাধো-বাধো ঠেকে। ছেলেবেলার উচ্ছৃঙ্খলতার কথা মনে আনতে ইচ্ছে করে না।'

আমার বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছিল। যতই আশা হ'য়ে থাকুক্-না-কেন আমি অন্তরে-অন্তরে ভেবেছিলুম এ কখনোই চার্বাক নয়। আমার অনুভূতিটা বিশদ ক'রে বলা শক্ত, সেটা নৈরাশ কি আনন্দ? আমি উজবুকের মতো বললাম, 'তুমি বেঁচে?' সে বললে, 'দেখতেই তো পাচ্ছ, খুব বেঁচে।' আমি বললাম, 'তবে সে-চিঠি?'

সে সপ্রতিভভাবে বললে, 'সে অনেক কথা, তখন ঠিক করেছিলুম, মরব। মরতুমও, কিন্তু ঠিক সেইসময় এক তার পেলুম যে আমার এক পিসি মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন, আমায় দেখার জন্য তাঁর সাধ। আমি ভাবলুম সবার আগে অন্যের কামনা মেটাতে দোষ নেই। কিন্তু আসার আগেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর উইলে আমায় সকল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন, কিন্তু একটা শর্ত ছিল। তাঁর পালিত একটি কন্যা ছিল। আমায় তাকে বিয়ে করবার আদেশ দিয়েছিলেন। আমি যদি তা না-করতে ইচ্ছুক হই, তবে সেই মেয়েটি সকল সম্পত্তি পাবে। আরেকটি শর্ত ছিল, আমায় পিসির নামে একটি কালীমন্দির স্থাপন করতে হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কী করলে?'

সে বললে, 'তাই বলতে যাচ্ছিলুম। তুমি জানো আমি চিরদিনই নিয়তি ব'লে একটা জিনিস আছে মানি। আমি দেখলুম এটা তাঁরই চক্র। মরা আর হ'ল না। এই গুরুতর দায়িত্ব আমায় কাঁধে ক'রে নিতে হ'ল। এটা আমার কর্তব্য।'

রাগে আমার আগাপাশতলা জ্বলছিল, আমি বললুম, 'মোটেই না, তোমার কর্তব্য হচ্ছে মরা।'

সে বললে, 'মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে বাঁচা। আর এতগুলো টাকা মেয়েমানুষের হাতে পড়লে কি আর রক্ষে আছে; উচ্ছন্নে যাবে। তার প্রতিও আমার একটা কর্তব্য রয়েছে, এটা ভুলছ কেন? আমার চিরদিনই ধারণা যে আমি একটা কিছু বড়ো কাজ করবার জন্যই জন্মেছি। তা, আতুরের সাহায্য করার চেয়ে আর কী বড়ো কাজ আছে।'

সে আর কত কী বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আতুরটি কে হ'ল?'

সে বললে, 'কেন, আমার পিসির পালিত কন্যা, উপস্থিত আমার স্ত্রী। তাকে আমি যে-সঙ্কট থেকে বাঁচিয়েছি তার জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

আমি আর তাকে এগুতে দিলুম না, প্রশ্ন করলুম, 'তোমার পিসিমার সম্পত্তির মূল্য কত হবে?'

সে বললে, 'তা লাখ চার-পাঁচ হবে। এক দোকানই তো লাখ-তিনেক টাকা হবে।'

আমি বললুম, 'কীসের দোকান?'

সে বললে, 'আমার পিসে এক কাপড়ের দোকান থেকে পয়সা করেন, সেটা আমাদের লক্ষ্মী। তাই সেটাকে বিক্রি করিনি। কিন্তু আর শরীর বইছে না। কত দিক দেখি বলো। আমায় আবার ব্রাহ্মণসভার সভাপতি করেছে।'

এবার আর আমি থাকতে পারলুম না। বললুম 'সে কী চার্বাক, তুমি ব্রাহ্মণ সভার — ?'

সে বাধা দিয়ে বললে, 'আঃ, তোমায় বললুম তো ওই নাম ভুলে যাও। চার্বাক চাটুজ্যে মারা গেছে। ভুল স্বয়ং ঈশ্বরেরও হয়, নচেৎ আমার মতো আস্তিককে নাস্তিকতার মোহে ফেলতেন না।'

এর আর কী উত্তর দেব, শুধু তার পূর্বকার কথা মনে পড়ল। আমি চুপ ক'রে রইলুম।

সে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে বললে, 'এখন যাই, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। ছেলেটার আমাশয় হয়েছিল। কিছুতে সারে না, মা কালীর কাছে মানত করেছিলাম সারলে তাঁর পায়ে ওর চুল দেব। বেলা ১০টা অবধি ভালো সময় আছে। তবে যাই। তা দেখো আমার বাটীতে বিকেলে এসো-না।' ব'লে আমায় তার ঠিকানা দিলে। আমি হাঁ ক'রে দাড়িয়ে রইলাম। একটু গিয়ে সে আবার ফিরে এসে বললে, 'না হে, আজ বিকেলে 'নারী-সংযম' সভার অধিবেশন আছে। আমি না-থাকলে হবে না, আমি তার পাণ্ডা। তা দেখো, মাগীগুলো আজকাল যা বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছে, তাতে তাদের একটু সামলানো দরকার। আরেকটা কথা মনে পড়ল, তুমি আগে লিখতে-টিখতে ; এখনো কি সে-স্বভাব আছে নাকি?'

আমি বললুম, 'সে-দোষ এখনো যায়নি।'

সে বললে, 'তা আমার পত্রিকায় লেখা দিও, ছাপাব। কিন্তু তাতে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ব'লে চেঁচিও না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী কাগজ?'

সে বললে, '*রমণী-রক্ষা* আমাদের সভার মুখপত্র। সে-সব কথা দেখা হ'লে হবে অখন। আজ চললুম। কাল বিকেলে কিন্তু ঠিক এসো।'

আমি অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে *বাইবেল*-এর একটা কথা মনে এল : 'অপরকে বিচার করতে যেও না, নিজের মধ্যে অনেক কিছুই বিচার্য আছে।'

১৩৩০ [ফাল্গুন-চৈত্র]

[নামহীন গল্প ১]

নমস্কার, মশাই, নমস্কার। এখনো তাহ'লে এখানে আছেন দেখছি। আমাদের শহরটি ক্ষুদ্র বটে কিন্তু এর আকর্ষণী অসীম। আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন আমারও ধারণা ছিল যে আমি এ-নগরীর দু-দিনের অতিথি, ছুটির মেয়াদ ফুরুলে কলকাতার জাগ্রত জীবনে আবার ফিরে যাব। কিন্তু সে হ'ল আজ পনেরো বছর আগের কথা। সেদিন থেকে আজ অবধি বুঝে উঠতে পারলুম না যে মায়াবিনীর অলখ শিকল আমার কোন্ অঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে রেখেছে। কী বললেন, আপনার স্থিতিতে এ-নগরের কোনো হাত নেই, মোহিনী শক্তিটা সম্পূর্ণ আমারই? আমার এত বড়ো সুখ্যাতি আর কেউ কখনো করেনি। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু যার চোখে একবার চাল্‌শে ধরেছে আত্মগরিমার সূক্ষ্মরেখাগুলো তার আর দৃষ্টিগোচর হয় না ; তার নজরে ফুটে ওঠে দূরের বস্তু। কাজেই আপনার স্তুতি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সর্বনাশ! বলেন কী মশাই! মাত্র পনেরোদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আর এরই মধ্যে আপনি পনেরো বছর আগেকার লুপ্ত ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার ক'রে ফেলেছেন! আশ্চর্য আপনার অধ্যবসায়! আজ্ঞে না, এইখানে আমায় মাপ করতে হ'ল। আমার লেখাগুলোর বিনিময়ে আপনার মতো সজ্জনকে আমরণ ক্রীতদাস ক'রে রাখতে প্রচণ্ড প্রলোভনটা আমায় সংবরণ করতে হচ্ছে। আরে ছি, ছি! সে কী কথা! ভুল বুঝবেন না, আপনার রসগ্রহণের ক্ষমতাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখছি না, শুধু আপশোস করছি নিজের অদূরদর্শিতার জন্যে। পনেরো বছর আগে যদি জানতুম যে আজ আপনার মতো একজন গুণগ্রাহীর সন্ধান পাব, তাহ'লে না-হয় আমার কবিতার বইগুলোকে বহ্নিবক্ষে না-দিয়ে কীটের জঠরেই নিবেদন করতুম। হাঁ, হাঁ, সে-সবই স্বীকার করছি। আমার খ্যাতির অভাব ছিল না, অনুরাগে অনটন পড়েনি, আর বিদ্বেষের মাত্রাটাও অস্বাভাবিকরকমের কম ছিল বললে অন্যায় হবে, শুধু ঘাটতি ছিল আমার বইয়ের চাহিদায়, বিরলতা ছিল ক্রেতার দলে। কাজেই পাঁচ-ছ-হাজার বই সঙ্গে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে বেরুনোর থেকে সেগুলোর ভস্মাবশেষ বায়ুভরে শহরময় ছড়িয়ে দেওয়াটাকে যে আমি শ্রেয়স্কর ব'লে ভেবেছিলুম, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অবশ্য এমন না-ক'রে, সেগুলোকে ওজনদরে বিক্রি করা যেতে পারত। আমার গৃহিণী সেই মত প্রকাশ করেছিলেন ; আর এটাও আমায় মানতে হচ্ছে যে আমাদের সে-সময়কার আর্থিক অবস্থাকে সচ্ছল আখ্যা দেওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু এ-পথের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াল

আমার অহঙ্কার। আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলুম যে প্রতিভাকে কবর দেওয়ার চেয়ে তার পাংশুকণা বিতরণ করা অনেক ভালো, কেন-না তাতে ক'রে ভক্তবৃন্দের ভাবী অনুযোগ বন্ধ হ'য়ে যাবে : পরে আর কেউ বলতে পারবে না যে স্মৃতিস্তূপ নির্মাণ করার সমস্ত সুবিধা আমি অনুরাগীদের দিইনি। কিন্তু ভগবান একদিন-না-একদিন দর্পের প্রতিবিধান করেনই করেন। গর্বান্ধ হ'য়ে সেদিন তেমন না-করলে, আজ আর আপনার কাছ থেকে কার্পণ্যের অখ্যাতি অর্জন করতে হ'ত না।

না, না, তা মোটেই নয়। ক্রেতার অভাবকে আমি অনুযোগের একটা উপলক্ষ করতে চাই না ; সমালোচকের তাড়নাকে আমি স্বাস্থ্যদায়ক ব'লেই বিবেচনা ক'রে এসেছি। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে অনেকরকমের অভিনয় দেখেছি, সকলেব চেয়ে হাস্যাস্পদ ব'লে মনে হয়েছে অনাদৃত প্রতিভার গৌরবময় ভূমিকাটিকে। কখনো তেমন সুযোগ ঘটেনি, অথবা সুযোগ এলেও আত্মসঙ্কোচকে কখনো তেমনভাবে জয় করতে পারিনি, নচেৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের আমি জানিয়ে দিতুম যে তাঁদের আমি ঈর্ষা করি না, তাঁদের কৃতিত্বকে আমি খর্ব করতে চাই না, তাঁরা আমার বিরাগভাজন নন, আমার নমস্য। সাফল্য জিনিসটা খুব ভালো ; আর যেহেতু দাঁত না-থাকলে দাঁতের মর্যাদা জানা যায় না, ও-পদার্থটা যে কতদূর কাম্য তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। আর সত্যি বলতে কী সমৃদ্ধির দূষণীয়তার চিত্রটা আমার মতে একটু অতিরঞ্জিত। যাঁদের থাকা-না-থাকায় জগতের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার ফল অশুভ নয়। শূন্য আসরে অভিনয় করলে কল্পিত দর্শকদের বিমোহিত করার সম্ভাবনার থেকে আত্মমুগ্ধতার বিপদটা যেন অধিক ব'লে বোধ হয়।

হাঁ, হাঁ, আমি তা তো অস্বীকার করিনি। কিন্তু ক্রেতার অভাব আর পাঠকের অভাব সমার্থবাচক নয়। অমনি পেলে অনেকেই আমার বই সাদরে নিতেন ; এমন-কি আমার কবিতা না-প'ড়েই অনেকে তার নিন্দা বা স্তুতি গাইতেন। নবজাত পত্রিকাগুলির ভিতরে আমার লেখা পাওয়ার জন্যে একটা তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতাও মাঝে-মাঝে দেখা যেত। শুধু যখন সেই লেখাগুলোই পুস্তকাকারে বেরুত তখন তাদেরই সমালোচকেরা আমার রচনায় অদৃষ্টপূর্ব ত্রুটি হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলত, এবং সুরুচিপ্রিয় পাঠক উদ্যত হস্ত সভয়ে সংবরণ ক'রে নিয়ে আমার জহরতের প্রচ্ছন্ন খাদ ধ'রে দেওয়ার জন্যে প্রশংসা করতেন জহুরির। এর জন্যে সমালোচকদের কাছে আমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেন-না এই উপায়ে তাঁরা আমায় যে-প্রতিপত্তিটা দিচ্ছিলেন তা কু-ই হোক্ আর সু-ই হোক্, খ্যাতি বটে। আমার বিশ্বাস যে আমার বই কেনবার জন্যে যদি জনসাধারণের মধ্যে হুড়োহুড়ি প'ড়ে যেত, তাহ'লে আমার নামে কলকাতা শহর মাঝে-মাঝে ভয়ে-বিস্ময়ে শিউরে উঠত না। যার সঙ্গে মাসে একবার ক'রে দেখা হয়, তার দোষগুণের বিচার জনশ্রুতির উপর ছেড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু যার সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে হয়, তার সম্বন্ধে ঘৃণার ও প্রীতির মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অসম্ভব, অতএব অত খ্যাতি সত্ত্বেও আমার বই কেনার সময়ে লোকে যে-ঔদাসীন্য দেখাত তার জন্যে আমি দুঃখ করছি না। তবে কবিতায় যৌবনের জ্বালা নিবৃত্ত হ'লেও জঠরের জ্বালা দ্বিগুণ হ'য়ে ওঠে। কাব্যকে আর দারিদ্র্যকে একঘাটে জল খাওয়ানো অভাবনীয় কৃতিত্ব।

তবে শেষাশেষি আমার অবৈতনিক সাহচর্যের জন্যে নেতাদের দলে এমন একটা রেষারেষি আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো আমার বইগুলো ফ্যাশানের একটা অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াত, অবশ্য তখন যদি আমার আর্থিক ও মানসিক, মুখ্যত মানসিক, অবস্থা আমায় আরো দিনকতক মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকবার শক্তি, সাহস বা অবকাশ দিত। কিন্তু তখন সবুরে মেওয়া ফলানোর মতো অধ্যবসায় তো আমার ছিলই না, বরং উল্টে মনে হয়েছিল যে, মেওয়াগাছের চারাটার আমূল উৎপাটন ক'রে, নিজে-সুদ্ধ লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হ'তে পারলে তবে আমার ব্যর্থতার গ্লানি বুঝি-বা প্রশমিত হবে।

কথাগুলো আপনার কাছে হয়তো প্রলাপের মতো লাগছে। হয়তো-বা আপনি ভাবছেন যে আমি কেঁচোমাটিকে পাহাড় ক'রে তুলছি, অথবা স্মৃতির কুয়াশার ভিতর দিয়ে অতীতের পানে চাইলে পরমাণুর সামঞ্জস্য এমনিভাবেই গুলিয়ে যায়। হয়তো আপনার প্রত্যয়ই ঠিক : আমি অস্বীকার করতে পারব না যে আমি একজন ভাববিলাসী, কল্পলোকের একটি বাসিন্দা, একজন রোমান্টিক, সম্ভবত এই গতাসু জাতির সর্বশেষ নমুনা।

আপনার ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার হাসির পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি। না, না, তার জন্যে আমি মোটেই ক্ষুণ্ণ নই ; ওটাকে সংযত করবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষত যখন এই সঙ্কল্পনা, এই romanticism আমার স্বোপার্জিত সম্পত্তি নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, তখন এই বৈকল্যের জন্যে আমি জগতের ক্ষমাভিক্ষা করা আবশ্যক মনে করি না।

কীরকম? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত নাম থাকতে পিতৃদেব যেদিন আমার নামকরণ করলেন ফাল্গুনী, সেদিন থেকেই গন্তব্য সম্বন্ধে আমার আর কোনো নির্বাচন ছিল না ; সেদিন থেকেই স্থির হ'য়ে গেল যে জীবনের পথে আমায় চলতে হবে এই সঙ্কল্পনার বোঝায় আড়ষ্ট হয়ে। আমার পিতার বিষয়ে আপনার অজ্ঞতা যে কতটা তার প্রমাণ আপনার ওই অবিশ্বাসের হাসি। হাঁ, হাঁ, তিনি যে একজন নাম-করা কবি ছিলেন তা বাঙালি মাত্রেই জানে,—অতএব এখানে আপনার আবিষ্ক্রিয়ার তারিফ করতে পারলুম না। কিন্তু কবিত্বের জন্যে,প্রতিভার জন্যে তাঁর কোনোরকমের গর্ব ছিল না, তিনি বড়াই করতেন তাঁর প্রজ্ঞার, তাঁর বিচার-নিরপেক্ষ বোধিশক্তির। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের সূত্রপাত আমার থেকে। মা-র মুখে শুনেছি যে আমি ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই আমার ভবিষ্যৎ তাঁরা বহু আলোচনার পরে স্থির করেছিলেন। পিতার দূরদর্শনে আমার আগামী-জীবনের কোনো গৌরব নাকি প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন যে কবির ছেলের কবি হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং কাব্যের আর যশের সখ্য নিরবিচ্ছিন্ন। আর যেহেতু কল্পনার ও সঙ্কল্পনার মূল ধাতুটা একই, তফাৎ শুধু পরিমাণের, তাই আমাদের যুগে কবি এবং রোমান্টিকের অর্থ ছিল একই।

শুধু আমার নিয়তি নিরূপণ ক'রেই যদি পিতৃদেব নিরস্ত হ'তেন, তাহ'লে আমার কিছুই বলবার থাকত না ; কিন্তু তিনি ছিলেন সাবেকি মানুষ। তাঁর একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে কবি হওয়ার মেহনত সংসারী হওয়ার পরিশ্রমের চেয়ে অনেক বেশি। আপনার কাছে কথাটা হয়তো একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তার কারণ আপনাদের যুগে কবিতার আর প্রেরণার সম্পর্কটা অভিন্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সময়ে যে দেবদত্ত শক্তির সাহায্যে নব্য-কবিরা মায়ের

পেট থেকে পড়তে-না-পড়তে কালিদাসকে হার মানিয়ে দেন সে-সম্পদের সন্ধান অজ্ঞাত ছিল। আপনি হাসছেন, কিন্তু কথাটা যথার্থ। প্রেরণার পসার আমাদের চোখের সামনে বেড়ে উঠেছে। আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন এমন-কি সদ্যোজাত শিশুকে চিনিতে ভেজানো সল্‌তে চুষিয়ে স্তন্য পানের মহলা দেওয়ানো হ'ত। কাজেই আমার ভাগ্যে কাব্যের কসরতের একটু বাহুল্য ঘটেছিল। ভোর পাঁচটায় উঠে সাঁৎসেঁতে বনবাদাড়ের ভিতর দিয়ে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া পাঁচ-ছ-বছর বয়সে বিশেষ প্রীতিকর হ'তে পারে না, বিশেষত যদি সে-দৃশ্যটার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করতে হয় কোনো স্বভাবকবির কাছে। এ তো গেল চোখকে সতর্ক করবার জন্যে। এছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করবার জন্যে শুরু হ'ল ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা পড়া, আবৃত্তি ও অনুবাদ। এবং সর্বশেষে হাত পাকানোর জন্যে আরম্ভ হ'ল দিস্তের পর দিস্তে ভ'রে লেখা এবং সেগুলো বাবাকে শুনিয়ে আগুনে পোড়ানো। উঃ, এ-কথা মনে পড়লে দেহ এখনো ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে।

স্বপ্নাবসান

অ্যাটর্নি আফিসের আবহাওয়ায়, ভাবভঙ্গি, আসবাবপত্র বা অভ্যাগতবৃন্দের মধ্যে এমন কিছু নেই যার সংস্পর্শে জেগে উঠতে পারে মেদুর-করুণ সুদূর অতীতের ছবি। দেবতাদের স্বাধিকারবোধ সম্ভবত খুব বেশি। একের আসরে অপরে আসতে চান না, বিশেষত আইনের অধিষ্ঠাত্রীর মন্দিরে স্বপ্ন-দেবীর আগমন অত্যন্ত বিরল। কিন্তু আজকে আমার ভাগ্যবিধাতা অন্যরূপ অভিরুচি করেছেন। এই চিরাভ্যস্ত আবেষ্টনেও [/প্রতিবেশেও] যে-স্মৃতি বাঁধা-কর্মে অন্যমনা ক'রে দিয়ে প্রকাশের ভাষা খোঁজে, তাকে দমিয়ে রাখবার ক্ষমতা আমার নেই। জানি নে অদৃষ্টে কী আছে? প্যারিসের দেবী-নির্বাচনের ফলে হয়েছিল সর্বনাশ।

আমি যে শপথ করেছিলুম যে, এইসমস্ত বিষয় লিখে আর কাগজ নষ্ট করব না। কিন্তু এতদিন বেঁচে থেকে এই জ্ঞানলাভ হয়েছে যে, প্রলোভনকে জয় করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। আর যদি ভাঙতেই না-পারলুম, তবে প্রতিজ্ঞা ক'রে লাভ কী? অনুশোচনার মধ্যে যে একটা তীব্র হর্ষ-বিষাদ আছে, তার প্রতিরূপ কি অন্য কিছুতে মেলে? তাই আজ ফের পঁচিশ বৎসর পরে কলম ধরলুম, মনের কথা বলতে। যে যাই বলুক্, কাগজের উপর অবাধে কলম চালানোর শব্দ আমার কানে চিরদিনই মধুর ; সে যেন মলয়ের চুম্বনে কিশলয়ের মর্মোচ্ছ্বাস।

পঁচিশ বৎসর পরে লেখনী ধরেছি শুনে, ভেবে যেন আপনারা ভীত হবেন না, বাংলাতেও বুঝি কোনো এক প্রুস্তের আবির্ভাব হ'ল। প্রুস্ত প্রথম পুস্তক লেখবার পর সতেরো বৎসর নীরবে থেকে হাত পাকিয়েছিলেন, বুদ্ধি শানিয়েছিলেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। আমিও পঁচিশ বৎসর চুপ ক'রে আছি কিন্তু উপরোক্ত কারণে নয়। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষের স্তব্ধতায় আমার হাত পাকেনি, কাঁপতে শিখেছে ; বুদ্ধি বাড়েনি, গেছে তেউড়ে। আর অভিজ্ঞতা? সে-কথা না-তোলাই ভালো। ইতিমধ্যে আমি যা সঞ্চয় করেছি তা অর্থ, অভিজ্ঞতা নয়।

ইস্কুলে যখন পড়তুম, আমাদের পণ্ডিতমশাই প্রায়ই বলতেন, 'যাহা নেই ভারতে, তাহা নেই জগতে।' কথাটা কতদূর সত্য বলতে পারি নে, কিন্তু এটা নিশ্চয় জানি যে, ভারতে অপর সকল হওয়া সম্ভব হ'লেও চতুর্দশ খণ্ডব্যাপী উপন্যাস লেখার সম্ভাবনা অল্পই। উপন্যাসের উপকরণ মানুষ ও সজীব মন, বিশেষ তার প্রসার যদি চৌদ্দ সংখ্যা অবধি হয়। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাংলা দেশে হয় না। অন্তত আমার তো হয়নি। লোকে বলে ডাক্তার

এবং আইনজীবী সত্যিকারের মানুষ চেনে। আমার কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা 'মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি' না-হ'লেও, মনুষ্যরূপী মৃগদের ধরবার, মারবার কলকৌশলের অন্বেষণেই আসেন। অ্যাটর্নির আফিসে পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত ক'রে হয়তো আমার শিক্ষা হয়েছে মৃগয়া সম্বন্ধে, হয়তো আমার কৃতিত্ব হয়েছে ফাঁদ-নির্মাণে, হয়তো আমি পারদর্শী হয়েছি গণিতশাস্ত্রে, কিন্তু চির-প্রাণের সন্ধান খুঁজে পাইনি। কাজেই আমা হ'তে প্রুস্তের অনুকরণ হবে না। আজকে যা-লেখবার জন্যে কলম চালাচ্ছি, তা এই পঞ্চবিংশতি বর্ষ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, তার পূর্বের দশ-বিশ বৎসরব্যাপী স্বপ্নপ্রয়াণের শেষাঙ্কের কাহিনী মাত্র।

কয়েক লাইন উপরে যে 'আপনারা' ব'লে সম্বোধন করলুম, সে কাদের? পাঠকদের? অভ্যাসের এমনি দোষ। লেখক হবার, কবি হবার দুরভিলাষ যিনিই করেন, তাঁর আর একা থাকবার উপায় নেই। তিনি ভাবেন তাঁদের কলমের একটু আঁচড় দেখবার জন্যে, তাঁদের মুখের কথার ঈষৎ উচ্চারণ শোনবার জন্যে শত দর্শক, লক্ষ শ্রোতা বিস্ফারিত নয়নে, বিস্তৃত কর্ণে অপেক্ষা করছে। ফলত তাঁর সব কথা বলতে হয় বিচার ক'রে, সব কর্ম করতে হয় হিতাহিত বিবেচনার পরে। সঙ্ক্ষেপে তাঁর জীবন উচ্চচিন্তার, অমৃত-সন্ধানের অভিনয় মাত্র। সহজ কবি কথাটা শুনতে বেশ, বস্তুত ওই শ্রেণীর জীবের সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়া দুষ্কর। আমারও একদিন এমন গেছে। তখন মহাসমারোহে নিজেকে লেখক ব'লে, আদর্শের উপাসক ব'লে, 'mighty somnambulist of a shatterd dream' ব'লে, স্বপ্নচারী ব'লে প্রতিপন্ন করতে মত্ত হ'য়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সে-পাগলামি আজকে নেই। আজ যে লিখছি এটা শুধু আত্মপ্রসাদের জন্যে, এটা শুধু নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে, এটা শুধু লেখার মধ্যে যে-আনন্দ আছে, যে-বিলাস আছে, সেইটি উপভোগের জন্যে। আজ লিখছি না-লিখে উপায় নেই ব'লে, আজ লিখছি আত্ম-ব্যঞ্জনার সেফ্‌টি-ভাল্‌ভের পথ দিয়ে বাষ্পাকুল হৃদয়কে লাঘব করবার জন্যে। যখন এই ক্ষণিকের উন্মাদনা ফুরিয়ে যাবে, উন্মাদনা কথাটা ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করলুম, কেন-না আজ একটা অশান্তির, অস্থৈর্যের, অতৃপ্তির দানব আমার লেখনীর অগ্রে আবির্ভূত হয়েছে ; হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তা দিয়ে আর কারবারনামার জটিলতা বেরচ্ছে না, মাথার মধ্যে কূটতত্ত্ব প্রবেশ করতে চাচ্ছে না। আমার প্রাণ-মন-বুদ্ধি খুঁজছে সেই mot juste, সেই আসল কথাটি, সেই ঠিক কথাটি, সেই অবশ্যম্ভাবী কথাটি--যেটি পেলে আমার সাহিত্যিকের অহমিকা তুষ্ট হবে, আমার ভাব-নীহারিকা আকার পাবে, আমার অন্তরের অস্পষ্ট ক্রন্দসী মুখর হ'য়ে উঠবে, আমার চিন্তা-সাগর-মন্থন-ধন লক্ষ্মী সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে আমার চোখের সামনে উদয় হবেন।--এই মুহূর্তের উন্মাদনা যখন ফুরাবে, খানকয়েক সাদা কাগজ নষ্ট করা যখন শেষ হবে, তখন এই আয়াসসাধ্য পত্রগুলি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব।

উপরোক্ত ছত্রগুলি প'ড়ে দেখলুম, মন্দ হয়নি। কিন্তু ওগুলি কি সত্য? না, যে-অভিনয়ের কথা কিছু আগে বলেছি, তাতেই ভরা? লিখতে বেশ লাগল, শুনতেও নেহাৎ খারাপ হয়নি, তাই কাটলুম না—মায়া করলে। কিন্তু নিজের মনকে আঁখি ঠারার মতো বোকা আমি নই। আমি জানি, মুখে হাজার অন্যরকম বলি, লেখা সমাধা হ'লে-পর ছাপাব, ভস্মীভূত করব

না। লোকেও কিনবে এবং কেউ-কেউ পড়বে, কেন-না এ-রচনাটা বিজ্ঞাপিত হবে প্রেম-কাহিনী ব'লে। গল্প-লেখক ব'লে আমার একটা খ্যাতিও আছে। অনেকসময় মনে হয় এই খ্যাতিটা যদি না-থাকত তো বাঁচতুম। কবি ও অ্যাটর্নি, এই উভয়ের সংযোগ শুভদায়ক নয়। সমালোচকেরা একটু নাক সিঁটকে বলেন, 'ওঃ উনি তো ব্যবহারজীবী। হ্যাঁ, তাঁর পক্ষে লেখাটা মন্দ নয়, সখের রচনা হিসেবে বেশ চলতে পারে।' আবার মক্কেলরা সন্দেহ করেন, বুঝি দেবাধিকারলুব্ধ বিমানবিহারীকে দিয়ে মর্ত্যবাসীর ন্যায্য প্রাপ্য, স্বত্ব, স্বার্থ অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করা কঠিন হবে। দুই নৌকায় পা দেওয়া বেশিক্ষণ যুক্তিযুক্ত নয় ; বিস্মৃতি-নদীর গর্ভে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা সতত বর্তমান।

আমার বিশ্বাস যে, রচনাতে আমার একটা স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি আছে। সেটা যে ঐশীশক্তি বা গৌরবের বিষয় বা তাতে যে কোনো প্রতিভা প্রকাশ পায়, এ-কথা বলা ভুল। তবে মানসিক বা নৈসর্গিক বিষয়ে আমি বেশ গুছিয়ে লিখতে পারি। এই ক্ষমতাটাকে যে কেন প্রতিভা ব'লে বর্ণনা করা হয়, তা আমার কাছে দুর্বোধ্য। অনেকে পাকযন্ত্রের কোনো ক্ষতি না-ক'রে দিনে আট-দশবার খেতে পারেন, বিনা-চেষ্টায় বারো ঘণ্টা ঘুমুতে পারেন, বিনা-ক্লেশে বিশ-পঁচিশ মাইল হাঁটতে পারেন ; অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনৈতিক মীমাংসা করতে পারেন, আপাতসত্য নীতিগর্ভ বক্তৃতা আওড়াতে পারেন, পাড়ার অমুক ঘোষের চরিত্রের স্খলন-পতন-ত্রুটির আলোচনায় অতি মন্থর দিনকেও হনন করতে পারেন ; এমন-কি কেউ-কেউ ধৈর্যচ্যুতি না-ঘটিয়ে, আইন-কেতাবের ধূলিধূসর বোঝা না-নেড়ে, সমস্ত আটঘাট বেঁধে চুক্তিপত্রের গোলকধাঁধায় অনায়াসে বিচরণ করতে অসমর্থ নন। কই তাঁরা তো অমানুষ-শ্রেণীভুক্ত হন না। অমানুষ বলছি, কেন-না জগতের সমক্ষে প্রতিভাশালী ব্যক্তি পাগল বা অতিকায় জন্তুরই শামিল। আর আমারও এই যে লেখার শক্তি, এ হচ্ছে বিশেষধরনের লেখার অভ্যাস। আমি ছন্দের নিয়ম রক্ষা ক'রে, অক্ষরের মিলের, চরণের মর্যাদা মেনে, উপমার সাম্য রেখে, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অবমাননা না-ক'রে স্বচ্ছন্দেই চলতে পারি ; কিন্তু অভিযোগপত্রের ছেদহীন, ক্রিয়াহীন অসীমতার মধ্যে আমি হ'য়ে যাই একদম দিশাহারা। অতএব মক্কেলদের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক নয়।

যেটা আমার সহজে আসে, যেটা করতে আমার ভালো লাগে, সেটা করব, তাতে কারোর ক্ষুণ্ন হবার বা অভিযোগ করবার কিছু নেই। কারণ, আমি লিখি, অবশ্য সেটা কেউ কোনো-দিন পড়বে এই প্রত্যাশায় লিখি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার রচনা পড়বার জন্যে উপরোধ-অনুরোধ করিনে, বা মাথার দিব্যি দিইনে, বা পরকালের অনিষ্টের ভয় দেখাইনে। কাজেই যদি এই পাতাগুলি পাঠান্তে কারো মনে সন্তাপ উপস্থিত হয় বা কেউ অসন্তুষ্ট হন, তাহ'লে সে-দুঃখ স্বেচ্ছাকৃত, তার জন্যে আমায় ক্ষমাভিক্ষা করতে হবে না। অবশ্য অধ্যয়ন যাঁদের পেশা, অলক্ষ্য বাণ-নিক্ষেপ যাঁদের উপজীবিকা, নীতি ও নিয়মের চশমার ভিতর দিয়ে বিশ্বজগৎকে নিরীক্ষণ করা যাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, মন যাঁদের অলস, চিন্তা যাঁদের অবশ কিন্তু জিহ্বা যাঁদের ক্ষিপ্র,—অর্থাৎ কিনা যাঁরা হচ্ছেন পেশাদার সমালোচক, তাঁরা চিরপ্রথানুসারে বলবেন, অনেক কথাই বলবেন। কেউ বলবেন যে, আমার এই গল্পটির মধ্যে রুশ সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি

জাজ্বল্যমান। কেউ দেখাবেন যে, ফরাসি বস্তুতান্ত্রিকদের বিকৃত ভাবে আমার আখ্যায়িকাটি দুষ্ট। কেউ-বা আবিষ্কার করবেন যে, আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল, আবিল বেনোজলে আমার মন-প্রাণ পরিপ্লুত। আবার কোনো-কোনো বিচক্ষণ সমঝদারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রবীণ বঙ্গীয় লেখকদের কাছে আমার অস্বীকৃত ঋণ স্পষ্টতম হ'য়ে উঠবে। প্রাচীনেরা আর্যরাজবৃন্দকে স্মরণ করবেন, দুর্গামন্ত্র জপ করবেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার পুতিগন্ধে রামনাম উচ্চারণ করবেন, কলির সূর্যাস্তের আগুনের ঝল্‌কায় চক্ষু মুদ্‌বেন, *গীতা* থেকে ধর্মসংস্থাপক, দুষ্কৃতি-বিনাশক ভগবানের পুনরাগমনের শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রে, নিরাশ হ'তে মানা করবেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে ম্লেচ্ছ প্রভুর ঔদাসীন্যে বিস্মিত হ'য়ে শাস্ত্র-কথিত তপ্ত তৈল-কটাহের কথাটি মনে করিয়ে দিতে ভুলবেন না। অপরপক্ষে নবীনেরা হ'য়ে যাবেন অবাক প্রাচীনের আত্মম্ভরিতা দেখে, অসন্দিগ্ধ অন্ধতা দেখে ; তাঁরা দেবেন উপমা, নব বসন্তের শাখায় বিগত বসন্তের সময়-বিস্মৃত জীর্ণ পাতার শিথিল আলিঙ্গনের সঙ্গে ; তাঁরা করবেন নাসিকাকুঞ্চন, ভাবালুতাকে বাস্তবিকতা ব'লে চালানোর প্রবঞ্চনায় ; তারপরে সত্যের নিরাবরণ রূপের বিস্তৃত বর্ণনা ক'রে, 'পিয়োর আর্ট'-এর জন্ম দিয়ে, সাহিত্যের সহিত কামশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ ক'রে, parents complex তথ্যটির আবিষ্কার ক'রে, সাধু রচনার রীতিকলাপকে ফুৎকারে ধূলিতে লুটিয়ে, নবযুগের প্রচণ্ড মার্তণ্ডের জ্বালাময়ী রশ্মিতে অনিমেষ নয়নে, চিরন্তন নূতনের স্তোত্রে দীর্ঘ বক্তৃতার উচিত সমাপ্তি করবেন।

কথাগুলো কি একদম মিথ্যা? আগে-আগে যখন আপাত-সত্য মন্তব্যে অধীর হ'য়ে পড়তুম, তখন তা-ই মনে হ'ত বটে ; কিন্তু বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বাহবার বাসনা কেটে গেছে ; কাজেই এখন ভাবি, সমালোচকদের অভিযোগ, যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, বিবেচনার ধার না-ধারলেও, তার মধ্যে কতকটা অজ্ঞান-প্রসূত সত্য আছে। বর্তমান সময়ে লেখক হবার প্রধান আপত্তি হচ্ছে যে, নূতন ক'রে বলবার আর কিছু নেই। সভ্যতার অরুণোদয়ে আদিম কবিরা যখন রসনার ও রচনার প্রভূত শক্তি আবিষ্কার করেন, তখনো ভাষার পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধিত হয়নি, অজ্ঞাত সম্ভাবনার আকর তখনো অব্যয়িত ঐশ্বর্যে ভরপুর ; ফলত বিনায়াসেই তাঁরা নূতনের সৃষ্টি ক'রে ধন্য হ'য়ে গেছেন। তখন সর্বসাধারণের জন্যে শিক্ষা-সরবরাহের ব্যবস্থা হয়নি, মুদ্রাযন্ত্রের অত্যাচার শুরু হয়নি, প্রতিযোগিতার মানুষ-দৌড়ের মজা জগৎ বোঝেনি ; কাজেই তাঁদের মামুলি অনুভূতি-ভরা, যুক্তবর্ণ-গম্ভীর একঘেয়ে পয়ারগুলি আমাদের কাছে পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে, ভাবপ্রবণতায় অতুল মনে হ'ত। তখন শ্রোতা ছিল অল্প, যারা বুঝত তারা কাব্যালোচনা করত, কাজেই অরসিকদের হাতে প'ড়ে তাঁদের কাব্যের অমর্যাদা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। যে কাব্য পড়তে জানে, তার আবৃত্তিতে সাধারণ কবিতাও অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে, আর অজ্ঞদের নীরস, প্রাণহীন, বোধহীন, রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বহুপরিশ্রমসাধ্য বর্তমানের নব-নৃত্যচপল, ঝঙ্কারমুখর ছন্দগুলিও শোনায় পাগলের প্রলাপের মতো। বিশেষত, প্রাচীন কবিদের উপাসক ও শিষ্যগণ হচ্ছেন একলব্য শ্রেণীয়, তাঁদের ইষ্টমূর্তি হচ্ছে মন-গড়া। অজানিতের, অপ্রত্যক্ষের, কাল্পনিকের একটা পরম গুণ এই যে, তিনি দোষত্রুটি-হীন। ভক্তবৃন্দের কাছে অসন্দিগ্ধ ও অপঠিত হ'য়ে থাকার সৌভাগ্য আমাদের নেই।

পুরানো ঔপন্যাসিকদেরও আমাদের অপেক্ষা একটা বিশেষ সুবিধা এই ছিল যে মানুষ তখন ছিল সরল। বনস্পতির শাখা-প্রশাখা যেমন কালের সহিত বক্রতর হ'য়ে ওঠে, তেমনি নর-চরিত্রও জটিল, দুরূহ ও বৈষম্যবহুল হ'য়ে পড়ছে। কৃষিযুগের প্রথমে মালির কার্য সহজ, কিন্তু অর্কিড্-উৎপাদন শ্রমসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ। তখন কতকগুলি আদিম সর্বজনীন মিথ্যার উপর নির্ভর ক'রে গল্প বলা চলত ; কিন্তু আজকাল কথককে নিজের মিথ্যা নিজে আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়। তখনকার পাঠক বা শ্রোতা সভ্যতার খাতিরে প্রণয়কে একটা কিছু অদ্ভুত, অলৌকিক পদার্থ ব'লে ভাবতে শেখেনি ; তারা জানত যে প্রেমের সূত্রপাত আসক্তিতে অর্থাৎ একটা ক্ষুধায়। যেহেতু কোনো ক্ষুধার বিবৃ[স্তৃ]ত বর্ণনা করতে গেলে অবরতা, ইতরতা অথবা সত্যগ্রাহিতা অনিবার্য, সেহেতু তারা প্রেমের অস্তিত্ব ইশারাতেই বুঝে নিয়ে তুষ্ট থাকত এবং সেকালের শিষ্ট প্রবৃত্তিগুলি, যেমন—জয়াকাঙ্ক্ষা, অসীম সাহসিকতা, পুষ্পবৃষ্টি, অগ্নিবৃষ্টি, সশরীরে স্বর্গ-নরকে গমন, বিধাতার রাগ-তাপ, পতিতপাবনের অমায়িকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অদ্ভুত অপূর্ব মিথ্যা কথা মুগ্ধচিত্তে শুনত। কাজেই সে-যুগে গল্প বলার পেশা ছিল সহজ, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক মিথ্যাই সহজে আবিষ্কার করা যায়, কেন-না স্বচক্ষে যুদ্ধ দেখবার সৌভাগ্য বড়ো একটা হয় না, এমন-কি যাঁরা নিজেরা যোদ্ধা তাঁদেরও নয় ; স্বর্গ-নরক, ভগবান, সাহস ইত্যাদি বিষয়েও এই যুক্তি খাটে। কিন্তু অধিক বা অল্প পরিমাণে যে-অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে, সে-সম্বন্ধে নূতন মিথ্যার সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরাই, যাঁদের প্রতিভা ব'লে সেই অমানুষিক ব্যাধিটি আছে।

অতএব আমার মতো অপ্রতিভাশালীদের অনুরাগের আলোচনা করতে হ'লে পরের ধনে পোদ্দারি করা ভিন্ন গতি নেই। আধুনিক ভারতের গৌরব, আধুনিক ভারতের স্বকীয়তা হচ্ছে পাতিব্রত্যে, প্রণয়ে নয় ; বিশেষত সে-নব্যপ্রেমে তো নয়ই, যা আমাদের নবীন পাঠকেরা সদাসর্বদা খোঁজেন। Platonic love, অর্থাৎ যার স্বপ্নাবেশে অনিন্দ্যসুন্দরী বিবাহিতা যুবতী ও কন্দর্পসমান অনূঢ় যুবক রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিভৃতে নির্জনে এক্লা, ঠিক বলতে গেলে দোক্লা, একত্রে বাস ক'রেও সম্ভোগসুখের লালসে আত্মহারা হ'য়ে পড়েন না, তাদৃশ প্রীতি অস্মদ্দেশেই সম্ভব, যেখানকার আলোক সত্যই মলিন, যেখানকার সূর্য কুজ্ঝটিকার যবনিকা ভেদ ক'রে রক্তকে উত্তাল নৃত্যে মাতিয়ে তুলতে পারে না, যেখানকার মানবসংখ্যা এখানকার অপেক্ষা কম, যেখানে অন্ধকারে থেকে-থেকে লোকের চোখ এতই ক্ষীণ হ'য়ে পড়েছে যে, প্রতিবেশীর পর্দাটানা গৃহের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না, যেখানকার গৃহগুলির ছাদ ব'লে কিছু নেই, সবই চাল। কেনো এক ভাবুকের ভাষায় আমাদের দেশের স্বভাব হচ্ছে, 'তরুণস্তাবৎ তরুণীস[র]ক্ত'। কাজেই আধুনিকতা আমাদের আনতে হয় ধার ক'রে, চুরি ক'রে।

কিন্তু ভাগ্যদোষে চুরিও আজকাল হ'য়ে পড়েছে আয়াসসাধ্য। আমি যদি আজ নব-*দুর্গেশনন্দিনী* লিখি, তাহ'লে 'স্বত্ব-সংরক্ষণ' আইন ভাঙার অপরাধে গুরুতর জরিমানার আশঙ্কা আছে। এক বণিকের ঐশ্বর্য সহস্র শ্রমিকের সর্বস্বে। এমনতর লুণ্ঠনকে বলে সাফল্য, কৃতকার্যতা। তেমনি দশজন পাশ্চাত্য লেখকের সম্পদ নিয়ে আমাদের নামকরা, জনপ্রিয়

উপন্যাসগুলি রচিত। স্তেনবৃত্তি আমরা সইতে পারি, কিন্তু *দুর্গেশনন্দিনী*-র মতো দম্‌কা দস্যুতা আমাদের আর বর্‌দাস্ত হয় না। কালের সঙ্গে আমাদের ধর্মবুদ্ধি বাড়ছে। না, তাকে চুরি কিছুতেই বলা চলে না, বরং তাকে ঋণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

দিন-কতক আগে সংস্কারকরা ভারতের নামে একটা অপবাদ দিতেন যে, ভারত স্থবির, তার চলবার শক্তি, জীবনীশক্তি চ'লে গেছে, সে আর বাইরের কিছু, নূতন কিছু, চট্‌ ক'রে নিতে পারে না। আমরা, নব্যভারত, আজ তাই উঠে-প'ড়ে লেগেছি প্রমাণ করতে যে, এ-অপবাদ অসত্য। অর্থনৈতিক্‌ বলেন যে, জগতের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হবে সেইদিন, যেদিন শ্রমবিভাগ শুধু কোনো বিশেষ দ্রব্য-উৎপাদনে সীমাবদ্ধ না-থেকে, শুধু গতিশীল, ফ্যাক্টরিশীল দেশের মধ্যে আটক না-থেকে সমস্ত বিশ্ব-জুড়ে চলবে। একটি শহরের একটি শ্রেণীর গুটিকয়েক লোক যে আল্‌পিনের মাথাটি তৈরি করবে তা নয়, একটি দেশের এমন-কি একটি মহাদেশের সমস্ত অধিবাসী এমনি ক'রে পিনের মুণ্ডে একনিষ্ঠা দেখাতে পারলে তবে মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াবে। তাঁদের মতে ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের যেমন পৃথক্‌-পৃথক্‌ কর্মে এক-একটা প্রাকৃতিক দক্ষতা থাকে, তেমনি একটা জাতির একটা বিশেষ কিছু পণ্যের নির্মাণে নৈপুণ্য আছে এবং সেইটিকে পূর্ণবিকশিত করতে পারলেই জাতির মঙ্গল, অর্থাৎ তবেই তারা মানুষ নামটুকু রেখে বাকি সবরকমে যন্ত্রশ্রেণীয় হ'য়ে যাবে। অর্থনীতির এই কূট মতবাদটিকে সাহিত্যের কার্যে লাগানো কি কম কৃতিত্ব? এরপরে ভবিষ্যৎ যখন আমাদের দিকে পেছন ফিরে তাচ্ছিল্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নির্দেশ ক'রে বলবে যে, আমরা ব্রহ্মার মানসজাত বংশে কুলাঙ্গার, তখন আমরা মার্জনীয় গর্বের সহিত প্রত্যুত্তর দিতে পারব যে, আমরা ছিলেম সময়ের অগ্রদূত, বিজ্ঞান ও কলার মৌলিক মিলন প্রমাণিত হয়েছিল আমাদের দ্বারা, উপন্যাসে শ্রমবিভাগের স্রষ্টা হচ্ছি আমরা ; অতএব অগ্রদূতদের প্রাপ্য আমরা পেয়েছি, আমরা সর্বত্র, সর্বদা অনাদৃত। আশা করি, সেইসময় *বারোয়ারি* ইত্যাদি এক-আধখানি উপন্যাসের রত্নোদ্ধার অসম্ভব হবে না।

কিন্তু শ্রমবিভাগের এই রূপটি, এই আভাসটি, বর্ণনা করবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলেম না, এটা হচ্ছে পথ-প্রাসঙ্গিক। আমার বলবার ইচ্ছে হচ্ছে যে, পশ্চিম যদি মন, বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদির নির্মাণে শ্রেষ্ঠ হয়, বেশ: তারা তাই করুক্‌ ; তাদের ধারণা, সত্য-মিথ্যা, আসল-মেকি, খাঁটি-ভেজাল, মহৎ-তুচ্ছ, সমস্তই নির্বিচারে আমরা আমদানি ক'রে আমাদের নিজের কাজে লাগাব। আমাদের ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব হচ্ছে কথা, সুন্দর, অসুন্দর, অর্থবান্‌, বাজে, সমস্তরকমের কথা ; কাজেই তাদের ধারণা আমরা আমাদের কথায় খাটিয়ে শ্রমবিভাগ মতটার কর্মকারিতা প্রমাণ ক'রে দেব। তাকে চুরি বললে ভারতপ্রসূত তুলোয় ম্যান্‌চেস্টারের সুতো তৈরিকে বা ম্যান্‌চেস্টারের সুতোয় ঢাকার শাড়ি বয়নকেও বলতে হয় চুরি। বড়োজোর এ-প্রয়াসকে পরিহসনীয় বলা চলে। কিন্তু তাতেও আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বাঙালি নারীকে ফ্রয়েডীয় nymphomaniac করা, বা বিকুঞ্চিত শান্তিপুরের ধুতির সহিত মার্কিন জিফারের কামিজ ও স্কচ-টুইডের কোট পরার চেয়ে সেটা অধিক হাস্যাস্পদ নয়। শুধু শেষোক্ত সংমিশ্রণ আমাদের চোখ-সওয়া, প্রথমোক্তটি নয়, এইমাত্র প্রভেদ।

আমার এই সব যুক্তি সমালোচক-বুদ্ধির অতীত হ'তে পারে, কিন্তু এইবারে যা-বলছি তাতে তাঁরা মুখে যতই রাগ প্রকাশ করুন, মনে-মনে অপার গৌরব অনুভব করবেন। আমরা, আধুনিকেরা, প্রাচীনদের তুলনায় ঢের বেশি সুচিন্তিত; গভীর, মরমীয়া কথা বলি, কিন্তু বর্তমানের পাঠকরাও (এর মধ্যে সমালোচকরাও গণ্য) সেকেলে পাঠকদের চেয়ে অধিক মনস্বী হ'য়ে পড়েছেন, কাজেই তাঁদের এতে সন্তুষ্টি হয় না, তাঁরা চান অভাবনীয় নব্যয়ানা। তাই আমাদের নূতনের খোঁজে, এটা-ওটা-সেটা পাঁচটা মিশিয়ে একটা অদ্ভুত খিচুড়ি বানিয়ে দিতে হয়। পুরানো ফ্যাশানের ভোজ্য-রসিক বেনিডিক্‌টিনের অবিমিশ্র সৌরভের জন্যে আক্ষেপ করতে পারেন, কিন্তু কক্‌টেলের বিস্বাদে যে অপূর্ব-কল্পিত বর্ণ-বিন্যাস আছে, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

বর্তমানের চিরপ্রসিদ্ধ হীনতার খণ্ডনে কলম চালিয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি, কিন্তু লোকের কথার প্রতি আমার নিজের কোনো অনাস্থা নেই। বরং জনশ্রুতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই জিহ্বার তাড়নেই আমি প্রথম লেখা আরম্ভ করি। আমার পিতার কবি ব'লে কিছু নাম-ডাক ছিল। অতএব মসীকে অসি অপেক্ষা বলস্বী ভাবা তাঁর পক্ষে মার্জনীয়। মার্জনীয় নয় শুধু সেই ভ্রান্তি যে কবির পুত্রও কবি। উত্তরাধিকারসূত্রে কপি হওয়া অসম্ভব না-হ'লেও কবি হওয়া শ্রমসাধ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন সেকেলে কবি, এ-দেশী কবি, বাস্তবকে ভুলে যাওয়াতেই ছিল তাঁর গর্ব, আদর্শের অশেষ অন্বেষণেই তিনি নিজের কবি-আখ্যার সার্থকতা বোধ করতেন। কাজেই তাঁর একমাত্র পুত্র যে অলেখক হ'য়েও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারে, তা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হ'ত না। তাইজন্যে জ্ঞান হ'য়ে অবধি শুনে আসছি যে, কবিত্বের প্রচ্ছন্ন অগ্নিতে আমার অন্তঃকরণ এতই উত্তপ্ত যে, মাঘ-চন্দ্রিকার দশনব্যাদক পূর্ণতার দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে চেয়ে বিরলে না-ব'সে থাকতে পারলে আর সে-উষ্ণতার প্রতিবিধান হবে না। সভা-সমিতিতে এমনতর সুনামের উপর ভর দিয়ে অর্থহীন দীর্ঘ বক্তৃতার গোড়াপত্তন করা মন্দ নয়, কিন্তু অভিভাবকদের মনে ঈদৃশ ধারণা উদয় হ'লে নিঃসহায় বালকের জীবনযাত্রা একটু বিসদৃশ হ'য়ে উঠতে যে পারে, তা নিঃসন্দেহ। যৌবনের প্রারম্ভে প্রত্যুষে পাঁচটার সময় সূর্যোদয় দেখা সখের খাতিরে দু-একদিন চলতে পারে, কিন্তু আট বৎসর বয়সে নিত্যকর্ম হ'লে প্রীতিকর হয় না, বিশেষত যদি ঘুমচোখে সেই দৃশ্যটা ছড়ায় বর্ণনা করতে হয়। অপরাহ্ণে সমবয়সীদের সঙ্গ ছেড়ে শ্মশ্রুযুক্ত পিতার সহিত ধাত্রী-কথিত প্রেতপ্রিয় নির্জন অরণ্যানীতে ঘুরে-ঘুরে শ্লোকের পাদপূরণ করা এবং কাব্যকথা শোনা, শিশুর শরীর বা মনের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নয়।

এমন কতদিন চলত বলতে পারি না। কিন্তু অল্পবয়সেই আমার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই ক্ষতিটাকে সে-সময় শুভাদৃষ্ট ব'লেই মনে হয়েছিল। এমন মনোভাবকে বিকৃতচিত্তের পরিচায়ক বললে অন্যায় হবে। আমরা এক্‌লা থাকতুম, কেন-না আমার পিতার আরেকটা সাবেক ভ্রান্তি ছিল যে হিন্দু যৌথ পরিবারের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, অলসতা ইত্যাদি ভয়াবহ দোষগুলি সতত বিরাজমান। আর যেহেতু কবির কর্তব্য মানুষকে নিজের আদর্শ দেখিয়ে শেখানো, তার উচিত এ-সমস্ত বর্জন ক'রে নির্জনে স্বাধীনতার আরাধনা করা। আজকে আমি

আমার পিতার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ; আমি জানি, মুক্তি পারিজাত, গজমোতি, স্পর্শমণি শ্রেণীয় একটি সুন্দর সংস্কার মাত্র, তার আস্বাদ কোথাও মেলে না, স্তব্ধ বিজন গিরিশৃঙ্গেও না, জনারণ্যেও না। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। আমার মা একা আমার তত্ত্বাবধান করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করলেন না, আত্মীয়দের পরামর্শে আমি এক বোর্ডিং স্কুলে প্রেরিত হলুম।

আমায় স্বাধীনতা দিলে আমার লেখার ব্যাধি হয়তো চিরদিনের জন্যে ছেড়ে যেত, কিন্তু আমার দুষ্কৃতি আমার খ্যাতিও আমার সঙ্গে-সঙ্গে ইস্কুলে গিয়ে হাজির। সহপাঠীরা সাধারণত চমৎকার প্রত্নতাত্ত্বিক। তখন শুরু হ'ল আমার নির্যাতন, ঠিক বলতে গেলে চিকিৎসা। পাঠশালার শিক্ষার বিরুদ্ধে বা গুরুমশাইদের বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য থাকতে পারে, কিন্তু ছাত্রদের যে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রাথমিক উপায় জানা আছে, তা সর্বদা স্বীকার্য। আমি তাদের স্থূল বিদ্রূপ সহ্য ক'রে তাদের পরিবর্জন ভাঙবার বিভিন্ন মার্গের অনুসন্ধানে বেশ তুষ্ট থাকতে পারতুম এবং দিন-কতক বাদে আমার সমাজচ্যুতি শেষ হ'তই হ'ত, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কথাটা উঠল শিক্ষকদের কানে। সেখানকার কর্তৃপক্ষদের একটা প্রধান গর্ব ছিল যে, তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে সম্পূর্ণ আধুনিক। আমাদের ইস্কুলের প্রস্‌পেক্‌টাসে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে ছাপা ছিল, 'ছাত্রদের স্বাভাবিক বৃত্তি, অভিরুচি, ক্ষমতা, ঝোঁকগুলিকে এখানে বাধা দেওয়া হয় না। আমরা জানি যে, শিশুই হচ্ছে মানবের পিতা। বর্তমান বালকের মধ্যে ভবিষ্যতের যে-মহাপুরুষ লু[সু]প্ত রয়েছেন তাঁর আগমনের পথ আমরা পরিষ্কার ক'রে দিই মাত্র।' কিন্তু দুরদৃষ্টবশত ছাত্রকুলের অকূলে তাঁদের অতিমানুষের অন্বেষণ এতদিন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কাজেই আমার অসাধারণ খ্যাতি তাঁদের শ্রবণগোচর হ'তেই তাঁরা আমাকে আঁধার ঘরের শেষ সল্‌তের মতো যত্ন আরম্ভ ক'রে দিলেন। পিতৃ-দত্ত শিক্ষার পুনরারম্ভ হ'ল, আমার সম্বন্ধে হেডমাস্টার এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সহপাঠীদের ঘৃণ্য থেকে মান্য ও অনুসরণ্য হ'য়ে পড়লুম। একেই বলে দাস-চিত্তবৃত্তি। এবারে আমার দুঃখ আরেকটু বাড়ল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশীয় কবিদের দুর্বোধ্য লাইনগুলি মুখস্থ এবং অনুকরণ করবার আদেশ পেলুম। আর শিখলুম শাঠ্য। সে-বয়সে অপর জাতির বিষম ভাষায় কাব্য যে ভালো লাগত তা বলতে পারি না, কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তরে সেগুলিকে উপাদেয় আখ্যা দেওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। আর বাড়ল বেগার। সঙ্গীদের আত্মীয়-স্বজনদের বিয়ে-থা হ'লে আমার আহার-নিদ্রার অবকাশ থাকত না। বেনামী কারবারের মৌলিক তথ্যটা আমার সেই সুদূর-অতীতে শেখা।

কিন্তু কেমন ক'রে বলব যে সে-সমস্ত প্রয়াস মিথ্যা, নিষ্ফল, অহিতকর। যে-শিক্ষার জাদু-গাল্‌চে বঙ্গগৃহের নিষেধ-শাসনের অভ্রভেদী প্রাকার লঙ্ঘন ক'রে সাহিত্যের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচরণের পন্থা উন্মুক্ত ক'রে দেয় সে কি কোমলমনা বালকের পক্ষে বৃথা? কখনোই না। আরেকটা কথা, কবিতা লেখা সে যে শিক্ষণীয়, সুরচনা সে যে আয়াসসাধ্য। সাধারণের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, কবি মায়ের পেট থেকে প'ড়েই কাব্যে কান্না জুড়ে দেয় ; যে, কবিত্ব সে একটা মেওয়ার মতো কিছু অপেক্ষ-সাপেক্ষ মাত্র, তার জন্যে কিছু

পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু মেওয়াও শুধু সবুরে ফলে না, উৎকৃষ্ট মেওয়ার প্রত্যাশী হ'লে, অনেক খুঁজে ভালো মেওয়ার চারা জোগাড় করতে হয়, অনেক দুর্গন্ধ স'হে সার দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়, অনেক পিঠে-কোমরে ব্যথা করিয়ে সেই চারা রোপণ করতে হয়, অনেক জল-তাপ ভুগে জল-সেচন করতে হয়, তারপরে যখন প্রথম ফল ফলে, দৃঢ়চিত্তে সেই ফল খাবার লোভ সংবরণ ক'রে, তা দিতে হয় ফেলে। এমনি অনেক চেষ্টার পরে ভালো মেওয়া হয়তো ফলতে পারে, আবার ব্যর্থ-শ্রম হবার আশঙ্কাও অনুপস্থিত নয়। অতএব আজকালকার প্রেরণা-চালিত কবিদের আমি দূর থেকে ঈর্ষা করি এবং প্রণাম করি, কিন্তু তাঁদের শক্তির হদিস খুঁজে পাই না। কৈশোরে যখন সংশোধনে, বর্জনে অধীর হ'য়ে যেতুম, তখন আমাদের গুরুরা আমাদের আশ্বাস দিতেন ব'লে ফ্লোবেয়ারের কথা, যিনি সম্বন্ধবাচক পদের উৎকর্ষসাধন-মানসে একটি বাক্যের পরিমার্জনা করতেন তিন সপ্তাহ ধ'রে। অবশ্য আমি কখনো সেই অধ্যবসায়ের অংশী হ'তে পারিনি। কিন্তু আমাদের বাল্যে নবজাত শিশুকেও দু-একদিন চিনির জলে ভেজানো সল্‌তে চোষাতে অভ্যাস না-করিয়ে মাতারা স্তন্যদানে সাহসী হতেন না।

অনেক কথা বললুম, এর মধ্যে বাজেও আছে কাজেরও আছে ; কিন্তু আমার আখ্যায়িকাটি, যেটি বলবার অছিলেতে এইসমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা, সেটি এখনো যত দূরে তত দূরেই, তার নামগন্ধ-সুদ্ধ এখনো করিনি। পাঠকেরা হয়তো অস্থির হ'য়ে গেছেন, কিন্তু আমার উক্তি শুনতে তাঁরা বাধ্য, কেন-না রাজনীতি, সমাজনীতি, দণ্ডনীতি, কামনীতি, নারী-বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয়ে নব্য লেখকদের অফুরন্ত মন্তব্য পড়তে যখন তাঁরা কুণ্ঠিত নন, বার্ধক্যের মার্জনীয় বাচালতা, বয়সের অক্ষতিকর অধিকার অগ্রাহ্য করা অন্যায় হবে। কিন্তু তাঁদের ভয় নেই, আমার গল্প আর আটক থাকবে না। বৃদ্ধ হ'লেও বাজে বকার সীমা আছে।

আজকে যখন চিরপ্রথানুসারে বেয়ারা চারটার সময় অফিসে চা এনে দিলে, তখন আমি নিত্যনৈমিত্তিক হস্তান্তর-পত্রের খসড়ার অর্থ বোঝবার প্রাণপণ যত্ন করছিলুম এবং অকৃতকার্য হচ্ছিলুম। আজকেও অন্যমনে চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুললুম, কিন্তু তার পরিণাম হ'ল আশ্চর্য। অভ্যস্ত একাগ্রতা আজ আর এল না, উল্টে দলিলের যতটুকুও-বা মানে মাথায় ঢুকেছিল, কার্যে যতটুকুও-বা আগ্রহ ছিল, এক চুমুক চা গলাধঃকরণ করতেই, সেটুকুও ধুয়ে-মুছে গেল সাফ হ'য়ে, মন চলল উড়ে, কোথায় কে জানে! অ্যাটর্নির পেশা নির্বাচন করার আত্ম-নির্বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিৎ কটূক্তি ক'রে বিবাগী অন্তরকে অমুক চাটুজ্যের পিতৃ-পিতামহের আর্থিক জীবনে পুনর্নিবিষ্ট করবার নিষ্ফল চেষ্টা করলুম একবার, দু-বার, তিনবার। শেষে ব্যর্থমানস হ'য়ে, মন দিলেম চা-র প্রতি। দেখলুম, আজকের চা-টা অন্যদিনের মতো নয়, তাতে দুধ নেই চিনি নেই, আছে কয়েক ফোঁটা নেবুর রস, এবং সেটি দার্জিলিঙের মামুলি শিরোভূষণ নয়, চৈনিক পরিশ্রমের চরমোৎকর্ষ, এইমাত্র প্রভেদ। সেই স্যন্দিত সুবর্ণ-রসের শক্তি কিন্তু অদ্ভুত, সে যে শুধু ক্লান্তির গ্লানি মুছিয়ে দিলে তা নয়, অর্থের মমতা-সুদ্ধ দিলে ভুলিয়ে। মনে হ'ল যেন এমন চা কোথায় খেয়েছি, কিন্তু অতীতের কোনো সুগন্ধ যে তাতে

মাঝে-মাঝে আভাস দিচ্ছিল, তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলুম না। শেষে যখন অন্তিম ঢোঁকটা গিলে আন্তরিক অনিচ্ছা-সহিত পেয়ালাটাকে ধীরে-ধীরে পিরিচের উপর নামিয়ে রাখলুম, তখন হঠাৎ স্মরণপটে জেগে উঠল পনেরো বৎসর পূর্বের এক সন্ধ্যার স্পষ্ট ছবি। (এখানে সমালোচক বলবেন, প্রুস্তের প্রতিচ্ছায়া। সেই মহালেখকের কাছে আমার পরম ঋণ আমি নতশিরে স্বীকার করছি।)

মনে হ'ল যেন, কোনো চৈনিক পরীর ইন্দ্রজালে আমার আফিস-কামরার সঙ্কীর্ণ প্রাকার-চারটি ধ্বংসে প'ড়ে সেই উপাদানেই নির্মিত হ'য়ে উঠল সেই বিজন সেনের পরিচিত লাইব্রেরি-কক্ষ। ঘরখানা এতই প্রকাণ্ড আর দরজা-জানালা এতই অপ্রচুর যে তার চির-সান্ধ্যছায়ার মধ্যে ব'সে প্রান্তগুলো ভালো ক'রে লক্ষ হ'ত না। মনে হ'ত, তার ব্যাপ্তি যেন জ্ঞানের অস্পষ্ট প্রদোষ থেকে প্রজ্ঞানের সায়াহ্ন-ধূমলিমা অবধি। আর বই, শ্রেণীর পর শ্রেণী, তাকের পর তাক, শেল্‌ফের পর শেল্‌ফ্, বই, বই, চারদিকে কেবল বই। কোথাও-বা সংস্কৃত, অনলঙ্কৃত মূলবর্ণের আস্তরণের মধ্য থেকে প্রকাশ পাচ্ছে গ্রীসীয় কলার, রোমক আর্টের চিরন্তন বিশুদ্ধ নগ্নতা ; কোথাও-বা কাঞ্চনবহুল স্থলদঞ্চলের ভিতর থেকে আভাস দিচ্ছে শ্লথ, অর্ধাবৃত রিনেসেন্স্-সুন্দরী, কোথাও-বা ঔজ্জ্বল্যহীন, নীরস শুষ্ক মলাটের মধ্যে বাঁধা রয়েছে মন্থরগতি, স্থূলবুদ্ধি, বৃহদায়তন অষ্টাদশ শতাব্দীয় ইংল্যান্ড। কোনো কোণে রোমান্টিক যুগের বিচিত্রিত ভাবালুতাকে ঢেকে রেখেছে ইন্দ্রধনুচ্ছটা ; এক কোণে স্তূপীকৃত পীত পুস্তকগুলি স্খলিতপ্রায় ফরাসি সভ্যতার আশু, অবশ্যম্ভাবী মরণ জ্ঞাপন করছে। কোনো শেল্‌ফে রক্ত-পাটল বন্ধনীর মধ্যে বিরাজ করছে ডস্টয়েভ্‌স্কি, যেন কোনো শষ্পহীন উত্তপ্ত গিরিশৃঙ্গ বুহ্যুৎপাতের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কষ্টে দমন ক'রে রেখেছে ; তার পাশে চিকন-সবুজ মলাটের মধ্যে টুর্‌গিনিএভ্‌গুলি, যেন নবদূর্বাশ্যাম তটকে চুমে বসন্তের বিগলিত তুষার কলগাথায় সমুদ্রের পানে ধেয়ে চলেছে ; তার পাশে এক কোণ থেকে উঁকি মারছে হরিৎ চেকোভ্‌গুলি, যেন অশোকডালে ব'সে অচিন ক্ষুদ্রায়তন পাখি ক্ষুদ্র, ক্ষিপ্র, অরূপ তানে শাশ্বত সত্যকে দূর-দূরান্তরে প্রচার করছে। একদিক ছেয়ে টিকিট-মারা বহুবর্ণ আধুনিক পুস্তকগুলি, রং-বেরঙের উর্দিপরা, রণক্লান্ত, অপভাষী সৈনিকের মতো শিষ্টাচারের প্রতি, সাধুতার প্রতি, ধর্মের প্রতি, নীতির প্রতি, সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি, সত্য-মিথ্যার প্রতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অবজ্ঞার, সন্দেহের অট্টহাসি হাসছে। সকলের চেয়ে নিচে বর্ণবৈচিত্র্যহীন, ফিকে গোলাপি, সোনার জলে আঁকা বাংলা সাহিত্য তুলার আবরণে সনাতন তুচ্ছতা, সনাতন ভঙ্গুরতা যত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। তারও নিচে পোকায়-খাওয়া, সময়জীর্ণ সংস্কৃত পুঁথির পিঙ্গলপত্রগুলি বাহিরের ক্বচিৎ হাওয়ায় কঙ্কালের মতো খস্‌খস্ ক'রে উঠছে।

বিজন সেনের বাড়িতে প্রতি রবিবার আমাদের আড্ডা বসত। সেই সুবৃহৎ কক্ষের মাঝখানটিতে আসমানি রঙের রেশমের কউচ- কেদারার কোমল আলিঙ্গনে ছয়টি শ্লথ বপুকে হেলিয়ে দিয়ে আমরা জীবনের আলোচনায় বিভোর হ'য়ে যেতুম। আর যাতে ক'রে অত আরামের মধ্যে নিদ্রাতুর হ'য়ে না-পড়ি, মিসেস্ সেন নকল কটেজ পটারির পেয়ালা ভ'রে

আমাদের নেবু-সুগন্ধিত চৈনিক চায়ের সরবরাহ করতেন একপাশের একখানা 'ঠান্‌দি'-চেয়ারের বিরাটত্ব থেকে।

মিসেস্ সেনের জীবনে দুটো সংরাগ ছিল, একটি হচ্ছে কবিতা, অপরটি প্রণয়। শুনেছি যৌবনে নাকি তিনি নিজে কাব্য লিখতেন, কিন্তু এখন আমাকে প্রণোদিত ক'রেই তাঁর উৎসাহ চরিতার্থতা পেত। হাজার অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তার প্রথমজীবনের মর্মোচ্ছ্বাস আমরা বার করতে পারিনি। আমরা যে মিসেস্ সেনকে জানতুম, তিনি ছিলেন অকাল-জরাজীর্ণা, পলিতকেশিনী, ক্ষীণাঙ্গী, তাঁর মধ্যে পূর্ণযৌবনা রূপসীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যেত না অথবা তার স্থান বার্ধক্যের গাম্ভীর্য অধিকার করেনি। তিনি যেন বার্ধক্য-লক্ষণযুক্তা কোনো ভাবালু কিশোরী—জীবনের দুঃখ-গ্লানিকে অনুরাগের অরুণিমায় ঢেকে রাখবার জন্যে সতত ব্যস্ত। কিন্তু লোকে বলত যে, পূর্ণিমা সেন বয়েসকালে নাকি বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ, গম্ভীর নীতিবান্ বৃদ্ধের কিন্তু তখনকার দিনের উড্ডীয়মান যুবকের বিস্মৃত চরণচ্যুতির উপলক্ষ। তিনি আমাদের সেই অনর্গল তর্কে যোগ দিতেন না, শুধু মধুর হাসতেন এবং ভগ্ন রৌপ্যঘণ্টার মতো মৃদুল, অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করতেন, আর চা চাই কি-না। আমি ছিলেম তাঁর প্রিয়পাত্র, কারণ সে-দলের মধ্যে কবি ছিলেম আমি এক্‌লা। আর যেহেতু তাঁর চোখে কবিরা পরমপ্রণয়ী, আমাকে সেই বাক্‌যুদ্ধের থেকে পৃথক্ থেকে তাঁকে শোনাতে হ'ত আমার প্রণয়জীবনের শেষ অভিজ্ঞতার ইতিহাস। বাস্তবিক যে অন্তরের ব্যাপারে আমার খুব, বা একটুও, কৃতিত্ব ছিল, তা নয়, তিনিও সে-কথা ভালো ক'রে জানতেন। তবুও আমার কল্পিত প্রণয়িনীদের ইতিবৃত্তগুলিকে সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে তিনি আনন্দ পেতেন, এবং আমিও তাঁর স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতা বিদূরিত করবার কোনো প্রয়াস করতুম না। কাজেই আমাদের মিলত ভালো।

বিজন সেন ছিলেন কিন্তু ঠিক উল্টোধরনের। বাক্যই ছিল তাঁর আনন্দ, তর্ক ছিল তাঁর পেশা, সাহিত্য ছিল তাঁর সখ। মিসেস্ সেনের মতে, তাঁর মার্জিত, সুচারু, সবল বার্ধক্যে ঘুণ ধরিয়েছিল তিনটি দুর্বলতা। প্রথমটি হচ্ছে স্থানে-অস্থানে তাঁর সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য পরিচয়ের প্রয়াস। ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল বটে, কিন্তু সমালোচকেরা তাঁকে ইংরেজি-নবিস বলত ব'লে প্রৌঢ়ে তিনি দেবভাষা শিক্ষা শুরু করেন। ফলে বিদ্যার চেয়ে বিদ্যাভিমানটা গিয়েছিল বেড়ে। তাঁকে চটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাঁকে ইংরেজিবিদ্ উপাধি দেওয়া। আমার মনে আছে, এক বিয়েবাড়িতে বহুদিন বাদে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় এক বন্ধু আনন্দ প্রকাশ করাতে, তিনি, 'always at your service' বাক্যটির বৈদ্যুতিক তর্‌জমায় 'মে ত্বং দাসঃ' পদটির ব্যবহার অম্লানবদনে করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় দুর্বলতা, রাজনৈতিক আসব-তরে দুর্দান্ত স্পৃহা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একাধিপত্যে তাঁর আশ মিটত না, কেন-না সাহিত্য, বিশেষত পাশ্চাত্য সাহিত্য, তিনি সত্য বুঝতেন ; তাঁর মন সর্বদা লালায়িত ছিল পলিটিক্যাল একচ্ছত্রত্বের জন্যে। সাধারণ সময় হ'লে তাঁর বুদ্ধির টানে না-হোক্, তাঁর অর্থের চুম্বকত্বে তিনি অনেক নেতাকেই পদলুণ্ঠিত করতে পারতেন, কিন্তু অসহযোগের পশ্চিম-বর্জন-যজ্ঞে সাগ্নিক হোতার আসন গ্রহণ করা তাঁর মতো পুরানোধরনের প্রতীচী-প্রিয়

শান্তিকামীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। কাজেই ম্যানচেস্টার-বস্ত্রের ধ্বংসাগ্নি-ধূম-কলঙ্কিত অহিংসাপূর্ণ অসহযোগকে গালিকলুষ করবার নিষ্ফল ব্রত তিনি তাঁর শেষজীবনের আদর্শ করেছিলেন। এর সঙ্গে ছিল তাঁর বয়স ভাঁড়াবার ব্যর্থ দুর্বলতা। বয়স সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-বৎসর-সূচক নীরব হাসি হেসে, প্রসঙ্গের পরিবর্তন করতেন। কিন্তু এই দুর্বলতার ফলে, সমবয়স্কদের বর্জন ব্যতীত কোনো ক্ষতি হ'ত না, বরং আমাদের মতো ছোক্‌রাদের চর্ব-চোষ্যের বিপুল আয়োজন থাকত। তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না, অতএব এই অতিথি-সৎকারে কারুর আপত্তি থাকা অন্যায়।

যে-রবিবারের স্মৃতি আজ আমার মনে মুহুর্মুহু উদয় হচ্ছে, সেদিন আমি ঈষৎ চ'টে গিয়ে নীরবে বসেছিলুম। আমাদের কলাবিদের সঙ্গে আমার মতের মিল কিছুতেই হ'ত না, কিন্তু সেদিন তিনি একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন। সময়ের সহিত চলার তাঁর অভ্যাস আমার বেশ জানা ছিল, কিন্তু ফ্যাশানের গতি যদি ঘোড়দৌড়ের সমান ক্ষিপ্র, তীব্র হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে ক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী ধীরগামী মানুষের তার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। ফলে গমনবেগ বাড়ে না, কিন্তু নিঃশ্বাসটা একটু অশ্লাঘনীয়-রকমের দ্রুততা প্রাপ্ত হয়। গুহা-শিল্প, দিল্লি, কাঙ্‌ড়া ইত্যাদিকে যখন তিনি বজ্র-নির্ঘোষ সমালোচনায় ধ্বংস-ভ্রংশ ক'রে আদিম জৈনদের ও প্রথম বৈষ্ণবদের আলেখ্য-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন, তখন আমার সঙ্গেও তাঁর কিঞ্চিৎ যুদ্ধ ঘটল। আমি বলেছিলুম যে, অজন্তা বা বাগ সম্বন্ধে কোনো তর্ক করার প্রয়োজন নেই এবং মুসলমানেরা ও রাজপুতেরা নারীর দেহ সম্বন্ধে অথবা পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হ'লেও পুরুষের গঠন এবং বর্ণবিন্যাসের রীতি জানত, কাজেই সেই যুগের ইউরোপীয় কলার সমকক্ষ না-হ'লেও, চিত্রাঙ্কনীতে তাদের কৃতিত্ব অল্প নয়। কিন্তু যাদের তুলির দৌড় খানকয়েক পুঁথি চিত্রিত করা অবধি, অথবা আলপনার পদ্ধতি দিয়ে খানকয়েক কীট-নিবাবক পাটা অঙ্কিত ক'রেই যাদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা, গম্ভীর ভাষায় কলার আসরে যে কী ক'রে তাদের আবাহন করা যায়, তা আমার বুদ্ধির অগোচর। আমরা ফ্যাশানের খাতিরে ভুলে যাই যে, শুধু নিয়ম থাকলেই যে আর্ট হয় তা না-হ'লেও, নিয়ম ছাড়াও আর্টের অস্তিত্ব থাকে না। অস্থিতত্ত্ব, পেশিতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, সাম্যতত্ত্ব বিষয়ে নিখুঁত হ'লেও একটা আলেখ্য অপদার্থ হ'তে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ চিত্রের মধ্যে সেই অনামা গুণটির সঙ্গে-সঙ্গে এই অপর সাধারণ নিয়মগুলোও রক্ষিত হওয়া চাই। সংযমের বেদনা ব্যতীত সৃষ্টির আনন্দ পাওয়া যায় না। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যেহেতু ছবি আঁকাই তাঁর পেশা, তিনি চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে আমার অধ্যাপনা নিতে নারাজ। যারা কলা সম্বন্ধে বোঝে তারা জৈনচিত্র ও বৈষ্ণব-পাটাকে ভারতীয় কলার পূর্ণ বিকাশরূপে দেখে। আমার বেনেবুদ্ধি যদি সে-জিনিসের কদর না-বোঝে, আমার জ্ঞান-বৃদ্ধির ব্যর্থ চেষ্টা তাঁর কর্তব্য নয়। তাঁর জীবনের ব্রত হচ্ছে সৃষ্টি করা, সৃষ্টির নিয়মরচনা নয়। ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা যেন ক্রিটিক্ হওয়ার প্রগল্‌ভতা থেকে তিনি তাঁকে রক্ষা করেন। এরপরে আমি চুপ ক'রে গিছ্‌লুম। মাসিকের মলাট বা সালসার সুফল রেখায় রঞ্জিত ক'রেই হয়তো আমাদের আর্টিস্টের প্রয়াস ধন্য হ'ত, কিন্তু সে-কথা আর আমি উত্থাপন করলুম না, কী লাভ?

অবশ্য আমার আহত আত্মগৌরবের সাহচর্যে আমাদের অধ্যাপক রণবেশ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু যাঁর সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত মনুষ্যত্ব নির্ভর করছে প্রাচীন ভারতের খানকয়েক শানের উপর, তাঁর সহায়তা বিশেষ ফলদ নয়। এতদিনের ভিত্তি সময়ের বশে কিঞ্চিৎ দুর্বল হ'য়ে পড়তে পারে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কাজেই তাঁর যুক্তির মৌলিক অকার্যতা, অর্থাৎ আর্যাবর্তের লুপ্ত পাথর-বাঁধানো রাজপথগুলির সর্বগুণাকরত্বই যখন আর্টিস্টের বাক্য-কামানের চোটে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল, তখন তিনি তাড়াতাড়ি চশমা মোছায় মন দিলেন, এবং আমিও সাধারণ তর্কে ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি-বিচারের অভদ্রতার কথা উল্লেখ ক'রে মিসেস্ সেনের পাশে গিয়ে বসলুম। কলাবিদ বাক্‌যুদ্ধ করতে লাগলেন বাক্‌পটু বিজন সেনের সহিত।

কিন্তু সেদিনে মিসেস্ সেনের কাছে দশ-বারো বাটি চা ধ্বংস ক'রেও আমার মানসচারিণী ফৈরঙ্গ-রূপসীর চিঁ-চিঁ-ধ্বনিত প্রেমব্যঞ্জনা কিছুতেই জমল না, কেন-না আমার মন ব্যস্ত ছিল কতকগুলো এলোমেলো অসংলগ্ন চিন্তা নিয়ে। আমার সম্পূর্ণ আধুনিক মন সেই পুরানো ভারতের শান-বাঁধানো রাজপথগুলোর জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিল। আমি কল্পনানেত্রে দেখছিলুম ভবিষ্যৎ কলকাতার ধূলাহীন, কর্দমহীন পাথর-মোড়া চেহারা। আমি ভাবছিলুম যে, সেই সুদূর সুদিন আজ যদি আসত তাহ'লে বিমলা আর পাতিব্রত্যের অছিলায় আমার উপর অমন অত্যাচার করতে পারত না। প্রতিদান-অনিচ্ছুর পরিচর্যা করা কি দস্যুতার নামান্তর মাত্র নয়? আমার স্বাভাবিক আলস্য যদি ন-মাসে, ছ-মাসে একদিন কাটে, আমার টেবিলের ধুলোও সেই দিনে সাফ হবে। আমি যদি অপরিচ্ছন্নতা সহ্য করতে রাজি থাকি, তাহ'লে ওপর-পড়া হ'য়ে তার প্রতিবিধান করা আর আদর-কাড়ানোর হীনতা একই কথা। সত্যিকারের বিমলার এই অভ্যাসটা আমার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়, বরং বিড়ম্বনা। যেমন, কাল রাত্তিরে দুটো চোখে বাসনার সর্বভুক্ জ্বালিয়ে আমার ঘরে এসে অনাহূত প্রবেশ। সেটা কি নারী-শোভন? দিনের পর দিন বিশ্বাসনীয় মিথ্যাকথার সৃষ্টি করা আমার কর্ম নয়, তার জন্যে যে-প্রতিভার প্রয়োজন তা আমার নেই। অবশ্য তার বয়স বাড়ছে। কাল রাত্তিরে সে বললে যে; আগামী পৌষে তার বয়স ষোলো ভর্তি হ'য়ে যাবে। আর তা না-বললেও আমার নিজের তো চোখ আছে। দিন-দিন যে তার দেহ চাঁদের মতো কলায়-কলায় ভ'রে উঠছে। সেইজন্যই তো অমন আদর-কাড়ানোর প্রতি আমার ভয়। আমিও তো রক্তমাংসে গঠিত, আমারও তো প্রবৃত্তিগুলো স্বাভাবিক, যৌবনোচিত। আমি যদি সংযম করতে পারি, সে পারে না? না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জা-শরম, ধৈর্য-শৌর্য সমস্তই বিমলা হারিয়ে ফেলছে! ও কী, ও বোবা ভিখারীর মতো ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে মুখের দিকে কামনাপূর্ণ নেত্রে চাওয়া! আর আমিই-বা কাঁহাতক ছুতো বার করি। আমার সাধুতা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস কি ক্রমশই শিথিল হ'য়ে আসছে না? বয়সের ওজরে তাকে থামানো আর সম্ভব হবে না। আর হ'লেও-বা কী করছি। কাল রাত্তিরে একটা অসহ্য মুহূর্তে যখন তাকে শুধু ফাঁকা চুমু দিয়ে বিদায় দিলুম, তখন যে সেইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে ষোলো বৎসর পূর্ণ হ'লেই তাকে আমার কাছে শুতে দেব। কী মূর্খতাই করেছিলুম বিয়ের পরে মাকে ব'লে যে, আমার শপথ ষোলো

বৎসর বয়স না-হ'লে বিমলাকে আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে দেব না। আর কিছু বছর বাড়িয়ে বললেই হ'ত। আবার অপরপক্ষে, বিমলাকে এমনি ক'রে ঠেকিয়ে রাখা, সে কি তার প্রতি সুবিচার হচ্ছে? সে বেচারি তো আর নিজের ইচ্ছেমতো, সবদিকে ভেবে, সব কথা জেনে আমায় পছন্দ করেনি। সকলের চেয়ে মুশকিলের কথা হচ্ছে যে, আমার এই আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব কাউকেই বলবার জো নেই। যখন সাহায্যের উপদেশের সত্য দরকার তখন সকলেই নীরব ; বরং উল্টে মা বিমলাকে টুইয়ে দেন। এই সমস্যার মীমাংসা কোথায়?

ইতিমধ্যে মিস্টার Boss-এতে আর সুকুলবাবুতে লেগেছিল প্রতুল বচসা। মিস্টার Boss—অসভ্য ভাষায় বসু মহাশয়—একজন নবীন ব্যারিস্টার, সবে বিলেত থেকে প্রত্যাগত। সাত বছর অক্সফোর্ডে থেকে, বার-চারেক পরীক্ষায় ফেল হ'য়ে, তাঁর মনে দুটো ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল যে, প্রাচ্যবাসীরা বর্বরতা ছাড়িয়ে এখনো বেশিদূর এগোয়নি, আর বাংলাতে সাহিত্য ব'লে কোনো সামগ্রী নেই। তবে এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, পিনেরো-সদৃশ অমিশ্র ভাবালুতাকে সত্যের নামে চালানোর মতো অসীম সাহস বাংলাতে কারুর কোনোদিন হয়নি, এমন-কি শরৎবাবুরও না। এছাড়া মিস্টার বস্ লোকটি মন্দ ছিলেন না। ইংরেজিতে তাঁর বর্ণনা করতে হ'লে বলতুম, he was an amiable ass। সুকুলবাবু, তাঁর পদবীটা ভুলে গেছি, কেন-না তিনি শুধু পদবি ধ'রে সম্বোধন করলে, সেই অপমানে বাক্যহারা হ'য়ে যেতেন। সুকুলবাবু ছিলেন একজন উদীয়মান অ্যাটর্নি। শুনেছি, তাঁর কৈশোরের পশ্চিমযাত্রার ইচ্ছাটা সফল হয়নি তাঁর স্বজনবর্গের গোঁড়ামির দরুন। অবশ্য এ-জনশ্রুতি কতটা বিশ্বাসযোগ্য জানি না, তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর প্রতি এমন সন্দেহ করা আর তাঁকে বাপান্ত করা সমান কথা। তাঁর বন্ধু-বান্ধব তাঁর ছাত্রজীবনের ঔজ্জ্বল্য দেখে, আঁধারের দেশে বালারুণের সমান কনকচ্ছটা বিস্তার করতে তাঁকে অনেক ধরা-পাকড়া করেন। কিন্তু সে-সব প্রস্তাব তিনি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কথাটা সত্য হ'তে পারে, কেন-না বিবি-বিবাহের প্রতি তাঁর একটা ভীষণ আতঙ্ক লক্ষিত হ'ত এবং ভারতের অবনতির প্রধান কারণ যে বিলেতি মদের আমদানি, তাতে আর তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আজকাল তিনি হ'য়ে পড়েছিলেন একজন প্রচণ্ড স্বদেশপ্রেমিক, কেবল খদ্দর পরতেন না, বিজন সেনের ভয়ে। সেনেদের দুয়ার সর্বদা অবারিত থাকত, কিন্তু খদ্দরধারীদের সে-পথে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কাজেই মিস্টার বসেতে এবং তাঁতে কলহ স্বাভাবিক। এবং সেই চিরসমরে সুকুলবাবুর বিজয় অনিবার্য। তার কারণ হচ্ছে এই যে, মিস্টার বস্ বেশি কথা বলতে পারতেন না, পাছে কথার খাতিরে কোনো বর্বরতা বা অসভ্যতা ঘটে। কিন্তু সুকুলবাবু স্বদেশপ্রেমিক, অতএব অশিষ্টতা, অসংযত বাক্যপ্রয়োগ এবং বন্যয়ানা তাঁর একচেটে ও তাতে নিজেকে হীন করা ছেড়ে নিজেকে গরিমামণ্ডিতই করতেন। সেদিনেও মিস্টার বস্ ব্যারিস্টারেরা যে অ্যাটর্নিদের খোশামোদ করে, এই অপবাদের প্রতিবাদ করতে পারলেন না, অসভ্যতার ভয়ে।

আমিও সেই তর্কে কিছুক্ষণের জন্যে যোগ দিয়েছিলুম। তার কারণ দুটি : প্রথমটি হচ্ছে নিজের চিন্তার দৌরাত্ম্য থেকে নিজেকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে তখনো তর্কের মাহাত্ম্যের উপর, তর্কের সর্বদুঃখহারিতার উপর, তর্কের সাফল্যের উপর আমার

আস্থা ছিল অটুট। তখনো আমার শিক্ষা হয়নি যে, সত্য সহস্রাক্ষী ভিন্ন লোককে ভিন্ন ইশারায় আহ্বান করে। তখনো জানতুম না যে সত্য ব্যষ্টির জন্যে, সমষ্টির জন্যে কখনো নয়। কাজেই একটা শ্রেণীর উপর ঈদৃশ অপবাদ দেওয়া আমার সহ্য হ'ত না। কিন্তু তর্ক বেশিদূর এগুলো না, আমার মাথা আবার নিজের কথায় ভ'রে উঠল, চিন্তা আবার আমায় পেয়ে বসল।

বিলেত! বিলেত!! চওড়া তক্‌তকে রাস্তাগুলি! দু-পাশে পরিচ্ছন্ন নিয়ম-চালিত জনতা-শ্রেণী! যানবাহনের আওয়াজ ব্যতীত সমস্তই নিস্তব্ধ! তর্ক নেই, বাক্য নেই, প্রতিবেশীর প্রতি কৌতূহল নেই! ফুলের রাশ, আলোর লহর, দোকানের পর দোকান বিশ্বের বিলাসিতা পুঞ্জীভূত ক'রে রেখেছে! নারী, নারী, যেদিকেই চাও সেদিকেই নারী! বঙ্কিম রেখা, চপল নীল নয়ন, সুঠাম পদ, অর্ধাবৃত তনু, রক্তাধর, মুক্তা-ছড়ানো হাসি! আর তাদের সেই ভাষা! তাতে অস্পষ্ট কিছু নেই, অব্যক্ত কিছু নেই, অসুন্দর কিছু নেই! তাতে প্রণয়ের গূঢ়তম ব্যাকুলতা বাণী খুঁজে পায়, চিন্তার সূক্ষ্মতম কূটত্ব স্পষ্ট হ'য়ে যায়, বিষাদের অনামা তিক্তমধুরতা বিকশিত হ'য়ে ওঠে ; ভাবনার ব্যঞ্জনাতীত আতঙ্ক মুক্তিলাভ করে! লিখতে যদি হয় তো সেই ভাষায়, সত্যই রাজার যোগ্য, সম্রাটের যোগ্য, দেবতার যোগ্য ভাষা বটে!

মনে পড়ে, পশ্চিম আমাকে যেদিন ডেকেছিল। সেই ছুটির দিনে সিন্ধুপুলিনে ব'সে, সায়াহ্ন-রক্তিম সাগরের পানে তাকিয়ে আমার প্রাণও অরুণ হ'য়ে উঠেছিল কোনো-এক অপরিচিত চাঞ্চল্যে। মনে হয়েছিল, বুঝি সপ্তসমুদ্রের অজানা ওপার থেকে নামহীনা কোনো বিদেশিনী আমাকে আহ্বানলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সেই সন্ধ্যার অখণ্ড শান্তি ভেঙে গিয়েছিল তারই অলখ অগ্রদূতের শব্দহীন উদ্দাম নর্তনে। সেই কাঁচাবয়সে যখন বাঙালি বালক মায়ের আঁচলে লুকুতে চায়, আমি কবির সঙ্গে ব'লে উঠেছিলেম, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!' সে হচ্ছে তখনকার কথা যখন কত ধানে কত চাল, তা বুঝতুম না। আর আমার দুরদৃষ্ট আমার মা-ও বুঝতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, আমার যে পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাতে কষ্টে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হ'তে পারে, কিন্তু মুরগি-মটন, হ্যাট-কোটের খরচ কুলাবে না, তখন তাঁর সামান্য স্ত্রীধন, অলঙ্কারাদি বেচতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু আমার বিলেত যাওয়ার দৌড় পোদ্দারের দোকান ছাড়াতে পারেনি। কেন-না, প্রথমত, আমার পিতা ছিলেন কবি, পয়সা অর্জন তিনি ঘৃণ্য মনে করতেন ; দ্বিতীয়ত, লড়াই এল, ফলত মা তাঁর এক পুত্রকে সাবমেরিনকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হলেন। কাজেই তখন আমায় আবার কবির ভাষা ধার ক'রে বলতে হয়েছিল,

'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে বাজাও
ব্যাকুল বাঁশরি!
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা
যে যাই পাশরি।'

কিন্তু সে-সমস্ত তো গেল পুরানো কথা। এখন বিচার্য হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎজীবন। অলঙ্কার বিক্রির টাকা তো আর চিরস্থায়ী হবে না। কোষ যে শূন্যপ্রায়। আর এই গত কয়েক বৎসর মায়ের টাকায় এমন স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়েছি যে বিলাসিতা হ'য়ে গেছে আমার মজ্জাগত।

স্ত্রীলোকের টাকায় দিন কাটানো সম্বন্ধে আমার কোনো কুসংস্কার নেই, কিন্তু টাকার স্বভাব হচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া ; ভাবছি বেশ সচ্ছল অবস্থা, হঠাৎ দেখি রূপার চাক্‌তিগুলি তীব্রবেগে অদৃশ্যে উধাও হ'ল। অতএব এ-ক্ষেত্রে শ্বশুরমশায়ের উপদেশ নেওয়াই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়? কিন্তু কাজটা? আইন জিনিসটাকে আমি চিরদিনই একটা ঘৃণা-মিশ্রিত ভয়ের সঙ্গে দেখে আসছি। এটা যে এখনো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি, কে বিচারক আর কে অপরাধী। আবার অপরদিক থেকে দেখতে গেলে এটাও স্বীকার্য যে, এমন সুযোগ অল্পের ভাগ্যেই আসে। প্রথমত তো আজকাল কোথাও আর্টিকল্‌স্ নিতে গেলে ৫০০০্ টাকা গুণে দিয়ে তবে কথা। সেটা আমার অমনিতে হবে। না, আমাকে মানতেই হবে যে, আমার শ্বশুর সত্যই উদারপ্রকৃতির লোক। তিনি তো কথাই দিয়েছেন যে, কাব্য লেখা ইত্যাদি পাগলামি যদি আমি ছেড়ে রীতিমতো তাঁর অফিসে বেরুতে রাজি থাকি, তাহ'লে যতদিন-না রোজগার শুরু করি তিনি আমাকে মাসিক ৫০০্ টাকা ক'রে দেবেন এবং পরে পাশ করা মাত্র আমায় অংশীদার ক'রে নেবেন। অতএব এ-কথা বলা চলে না যে, পাঁচ বছর বেগার খাটার মতো অবস্থা আমার নয়। একমাত্র আপত্তি হচ্ছে যে, কাজটা আমার অপছন্দ। আচ্ছা, সত্যি কথা কইতে গেলে কি এটাও আমায় স্বীকার করতে হবে না যে, অধ্যাপনার কার্যও আমার ভালো লাগবে না? অবশ্য আগ্রা ইউনিভার্‌সিটিও আমায় ৫০০্ টাকা দিতে রাজি, কিন্তু সেই ৫০০্ টাকায় আমায় থাকতে হবে চিরকাল। উপস্থিত ৫০০্ টাকায় চলতে পারে বটে, কিন্তু যদি ছেলেপুলে হয়? না, সত্যই আমি বুড়ো হ'য়ে পড়ছি। কেবল এইসব দুশ্চিন্তা। বিমলার সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক, তাতে ছেলেপুলে হওয়া সম্ভবপর কি? কিন্তু এইভাবে তো আর বেশিদিন চলবে না। আর বড়োজোর মাস-খানেক। বিমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যদি বন্ধ করতে চাই তাহ'লে কি আগ্রায় পালানোই প্রশস্ত নয়? কিন্তু তা ক'রে কী ফল? তাকে যখন বিয়ে করেছি, তখন তার সঙ্গে বন্ধনটা অত আল্‌গা রাখলে চলবে কেন? সে তো আমার আচরণকে সত্যই অন্যায় বলতে পারে। বাঙালি মেয়ের পক্ষে পনেরো বছর, না, যোলোই বলতে হয়, কিছু কম বয়স নয়। এখন তার দাম্পত্য-সম্পর্ক যে কীরূপ হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে ধারণাগুলো নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। আঃ, কেন যে মরতে বিয়ে করলুম! আমার যে ওই-দুর্বলতা, জেনেশুনে কাউকে কষ্ট দিতে পারি না। কাজেই মা যখন বললেন যে, আমি বিয়ে না-করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হবেন, তাঁর জীবনের আর বেশিদিন বাকি নেই, তাঁর শেষ সাধ পুত্রবধূর মুখ দেখে মরা, তখন আর না-বলতে পারলুম না। তাঁর প্রতি আমার অনেক কর্তব্য থাকতে পারে, কিন্তু নিজের জীবন বলি দেওয়াটা সেই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আচ্ছা, জীবন বলি দেওয়ার কথা উঠছে কী ক'রে? বরং আমি যেভাবে চলেছি সেটাই কি জীবন বলি দেওয়া নয়? আমি যে শৈশবের এক নারী-স্বপ্নের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। সে যদি আমার ভালোবাসার এককণাও প্রতিদান দিতে রাজি থাকত, তাহ'লে কি সেই পত্রখানার জবাব দিত না! উঃ, সেই চিঠিখানা। কী ক'রে সে-চিঠি লিখলুম! নিজেকে কি মানুষে এমনি ক'রেই পরের হাতে তুলে দিতে পারে! কিন্তু তখন বিয়ের আতঙ্ক আমায় একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। মনে হয়েছিল যে, মরণে আর বিবাহে বুঝি কোনো পার্থক্য নেই। আমার জীবনের, বিশেষ

ক'রে, আমার যৌবনের শবযাত্রা বুঝি সেই বিবাহের শোভাযাত্রা। কাজেই আমার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম, মরবার কালে আবার সঙ্কোচ কীসের, শরম কীসের, কুণ্ঠা কীসের। এখনই যে শেষ বোঝাপড়ার সুযোগ অতিবাহিত হ'য়ে যাবে। তখন যে উত্তরের প্রত্যাশায় সে-লিপিখানা তাকে পাঠিয়েছিলুম, তা নয়। পরের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করবার মতো অসীম সাহস আমার কোনোদিনই নেই। তখন ভেবেছিলুম, আমি তো চললুম কোন্ নিরুদ্দেশের পথে, অতএব, যার জন্যে এতদিন প্রতীক্ষা করেছিলুম, তাকে সেই ব্যর্থ আশার নিষ্ঠুর বেদনার একটু ইঙ্গিত দিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিয়ের পরেও যখন দেখলুম যে, আমার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটল না, আমার অন্তরের ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'ল না, তখন ভাবতে লাগলুম, সে বুঝি-বা উত্তর দেবে। কিন্তু মাধবী সেখানা পেয়ে কী হাসিই হেসেছে। হাঃ-হাঃ, সত্যই আমার আত্মম্ভরিতা অপরিমেয়। সে যদি আমাকে একটুও ভালোবাসবে, তাহ'লে কি অপরকে বিয়ে করত? তাকে তো আর জোর ক'রে বিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। বাল্যের সেই স্মৃতি, সেটা বোধ করি স্বপ্ন-স্মৃতি। মাধবী কোনোদিন আমাকে চায়নি। আর তখন চাইলেও এখন চায় না। নয়তো কী হিসেবে সে নিরুত্তর রইল? অবশ্য আমি ঠিক করেছিলুম যে তাকে তিন বছর সময় দেব। দু-বছর হয়েছে, আরেক বছর অপেক্ষায় কী ফল? এখনো আশা? আর এ-দিকে বিমলা আমার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে কী চেষ্টাই-না করছে। এখন তাকে যদি কাছে ডাকি, সে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু আরেক বছর বাদে? শেষে কি এ-কূল ও-কূল দুই-ই যাবে? যদি তার সঙ্গে ঘর করতেই হয়, তার গোড়াপত্তন শীঘ্র করাই ভালো। না, আর দেরি নয়, আজই তাকে ডাকব। আর শ্বশুরের কথা শোনাই ভালো। লেখা খুব হয়েছে, এইবার ইতি।

এতক্ষণে বিজন সেন বেশ জমিয়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, প্রণয় ব্যতিরেকে, অন্ততঃপক্ষে নারী ছাড়া গল্প হ'তে পারে কি-না, এবং নিজেই তার উত্তর দিচ্ছিলেন। তাঁর মতে, শুধু পুরুষকে নিয়ে যেহেতু জগৎ চলতে পারে না, উপন্যাসেরও তেমনি নারী চাই। ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রণয়-ব্যঞ্জনার মতো আর সদভ্যাস নেই। হৃদয়ের ব্যাকুলতা জানাতে হ'লে মিথ্যার প্রয়োজন, সুন্দর ভাষার প্রয়োজন, উপমার প্রয়োজন। এইসমস্ত উপাদান বাদ দিয়ে কি গল্প বলা যেতে পারে? কাজেই আমাদের দেশে বক্তৃতার ক্ষমতা অনেকের থাকলেও, গল্প বলার ক্ষমতা অত্যন্ত বিরল, কেন-না এখানে পুরুষের সহিত নারীর দেখাসাক্ষাৎ ঘটে মধ্যরাত্রের তন্দ্রাতুর বাসরে, আর সে-নারী হচ্ছে নিজের স্ত্রী। নিজের ভার্যা ভোগ্য হ'তে পারে, কিন্তু লোভ্য কখনো নয়। নিজের স্ত্রী হচ্ছে বাসনা-নিবৃত্তির একটা সামগ্রী মাত্র। অতএব তাকে শুধু আলিঙ্গন দিলেই চলে, তাকে কেবল ক্ষুধার উদ্রেক অশিষ্ট, অবর, সাদাসিধে কথায় বুঝিয়ে দিলেই চলে, তাকে ভক্তি, পূজা, প্রেম দেবার কোনো দরকার নেই। পাতিব্রত্য, ঠিক বলতে গেলে পাত্নীব্রত্যই আমাদের সাহিত্যের এই দুর্দশা ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত এই সত্যটা জানত, কাজেই সংস্কৃতে প্রেমকে অনঙ্গ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। অনঙ্গকে ধরতে হ'লে অনেক কারচুপি চাই। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে, নারীকে স্বাধীন না-করলে, উপন্যাসের উৎকর্ষ সাধিত হবে না।

ইতির ঢাক্‌না দিয়ে আমি আমার চিন্তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু বিজন সেনের মন্ত্রে সেই লক্ষফণা বাসুকি আবার আমার মাথার মধ্যে গর্জন শুরু ক'রে দিল। প্রেম! নারী! না, না, বিজন সেনের কথা মিথ্যা। তাদের বাদ দিয়ে জীবন বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে, বরং তারা এসে যখন পন্থা রোধ ক'রে দাঁড়ায় তখনই জীবন অশ্রুপ্লাবিত হ'য়ে যায়, তখনই সংসার হ'য়ে পড়ে জটিল, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য চ'লে যায় তখনই। হ্যাঁ, এ-কথা মানতে হবে যে, সাহিত্যের আসরে তাদের বসানো সহজ, কিন্তু বাস্তবিক প্রণয়-জ্ঞাপনার মতো শক্ত কাজ আর নেই। যাদের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি, শুনেছি শুধু নাম, যাদের সঙ্গে কখনো কথা কইনি, দেখেছি মাত্র রূপ, তাদের নিয়ে অনেক কাব্য রচনা করা যেতে পারে, মিসেস্ সেনকে অনেক গল্প বলা যেতে পারে। কিন্তু যাকে সত্যিকারের ভালোবেসেছি, তাকে তো কই কোনোদিন প্রাণের কথা বলতে পারিনি। আমার নারী আমার কল্পনাকে মুক্তি দিয়েছে বটে, আমার লেখনীকে স্বাধীন করেছে বটে, কিন্তু আমার জিহ্বাকে করেছে একদম জড়। যে-প্রণয় সত্য অনুভূত, সে-সম্বন্ধে যে আমি সতত মূক। মাধবী! মাধবী! তাকে বলবার জন্যে বিনিদ্র-শয়নে কত কথাই রচনা করেছি, কিন্তু সে যখন সামনে এসেছে, যখন তার সেই হরিৎ-ধূসর চোখ এক মুহূর্তের জন্যে আমার মুখে ন্যস্ত হয়েছে, অমনি সে-সমস্ত দীপ্ত বচন তুষার হ'য়ে জ'মে গেছে। নারীকে আমরা স্বাধীন করব, সেটি আমাদের কর্তব্য হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের স্বাধীন করবে কে?

আমার মনে পড়ে যেদিন মাধবীর সঙ্গে প্রথম দেখা। তখন ইস্কুলে পড়ি, বয়স কত ঠিক মনে নেই, কিন্তু পনেরোর বেশি নয়, কেন-না তখনো মেয়েমানুষ বললে আমরা ঘৃণায়, ক্ষোভে অধীর হ'য়ে পড়তুম। আমারও মনোভাব যে এমনই ছিল, তা নয়, কিন্তু বয়স্যদের অবজ্ঞার ভয়ে আমার অন্তর্নিহিত নারী-বন্দনা বাক্যহীন হয়েছিল। ঈদৃশ অবস্থা সম্ভব শুধু পনেরো আন্দাজ বয়েসে, তার পূর্বে নারীর প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না, তারপরে, সেই প্রয়োজন লজ্জা-শরম, মান-অপমান সমস্তকেই ছাড়িয়ে ওঠে।

সেদিন আমাদের স্কুলের জন্মতিথি ছিল। উৎসবান্তে প্রায় অধিকাংশ ছেলেই যে যার দেশে চ'লে গেছে, বাকি সকলে এখনো খেলার মাঠ থেকে ফেরেনি। আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে যাইনি, কারণ সেদিন নিজেকে উপমাতীত, সমকক্ষহীন ব'লে মনে হচ্ছিল। এই গর্বটা মার্জনীয়, কেন-না সমস্ত অভ্যাগতদের সম্মুখে পুরস্কারের গাদা আমার হাতে তুলে দিয়ে, আমাদের হেডমাস্টার আমাকেই তাঁর স্কুলের একমাত্র আশা-ভরসা, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির চরম প্রতিষ্ঠা ব'লে বলেছিলেন। তার উপরে আমি আবার যখন আমার স্বরচিত 'অলি, পিপীলিকা ও বালক' নামক কবিতাটি আবৃত্তি করলুম, তখন সেই হল্-গৃহ অন্তহীন করতালিতে প্রায় ফেটে পড়েছিল। কবিতাটি এই :

অলি বলে, আমি তুষ্ট ঘরামি,
রত সঞ্চয়কর্মে,
রানীর আদেশে মধু বহি ক্লেশে
জিজ্ঞাসাহীন মর্মে।

পিঁপিড়া সুশীল রক্ষণশীল
বলে, কিছু নহে ব্যর্থ ;
দল বেঁধে গিয়ে মৃতেরেও নিয়ে
ভ'রে রাখি নিজ গর্ত।
বালক কুমতি শুনে এই নীতি
ব্যাদানিয়া রহে আস্য,
বুঝে না কারণ আজ্ঞাপালন
কেন সুখ, নহে দাস্য।
আমরা মানুষ, নাহি তবু হুঁস,
কীট দিবে শেষে দীক্ষা?
হউক শুদ্ধি, স্বভাব বুদ্ধি
ভুলে লহো গুরু-শিক্ষা ॥

কিন্তু আমার এই অপূর্ব গৌরব-কুসুমে কীটের মতো ছিল পূর্বদিনের স্মৃতি। আমি যখন আমার কবিতাটি আমার শিক্ষকের কাছে নিয়ে গিছ্‌লুম,—বিষয়টা তিনিই নির্বাচন ক'রে দিয়েছিলেন—তখন তাতে নিম্নলিখিত এই আটটি লাইন ছিল :

বলে পিপীলিকা, খিল কুঞ্চিকা
পারে না রাখিতে বন্ধ,
শর্করা হ'তে যবে বায়ু-স্রোতে
বাহিরায় মৃদুগন্ধ।
বিধির বিধানে কর্মের টানে
দস্যুতা তাও কৃত্য।
ললাট-দীর্ণা, চিন্তা-শীর্ণা
গৃহিণী বিজিতা নিত্য ॥

আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, সমগ্র কবিতাটার মধ্যে এই আট লাইনই সর্বশ্রেষ্ঠ ও ভগবৎ-প্রেমে পরিপ্লুত। কাজেই গুরুমহাশয় যখন এগুলো প'ড়ে রক্তমুখী হ'য়ে আমায় গালি দিতে আরম্ভ করলেন, তখন আমার চেয়ে স্তম্ভিত লোক আর জগতে ছিল না বললেই চলে। তিনি আমাকে নানারূপ মধুর সম্ভাষণ করার পরে বলেছিলেন যে, আমার সৌভাগ্য হেডমাস্টার বাংলা বুঝেন না, নচেৎ এমনিতর বিশ্বাসঘাতকতার পরে তাঁর মনুষ্যচরিত্রের উপর চিরদিনের জন্য ধিক্কার জ'ন্মে যেত। আমার কাছ থেকে তাঁরা সকলে এত প্রত্যাশা করেছিলেন ব'লেই কি আমি এমনি ক'রে নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছি? তিনি এই পদ্যটা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতেন, কিন্তু শেষের চার লাইনের সত্যকার কবিত্বের জন্য তা করলেন না। এরূপ যেন ভবিষ্যতে আর না-হয়, তাহ'লে তাঁর স্বাধীন শিক্ষার উপর একটা ঘৃণা জ'ন্মে যাবে। অতঃপর সে-বারের মতো আমায় ক্ষমা ক'রে, তিনি নিজে পিঁপড়েদের রক্ষণশীলতা এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের উপর চারটি লাইন জুড়ে দিয়েছিলেন।

গুরুমশায়ের সেই হিতোপদেশে ও অমায়িক ক্ষমাশীলতায় আমার মনে কোনো কৃতজ্ঞতা বা আত্মলজ্জা জেগে ওঠেনি, বরং একটা আত্মম্ভরিতায় আমার প্রাণ ভ'রে উঠেছিল যে, কাব্য সম্বন্ধে আমি তাঁর চেয়ে ঢের বেশি বুঝি ও ভালো লিখি ; তিনি অজ্ঞ, কাজেই আমার কবিতার মর্যাদা বুঝতে অসমর্থ। কিন্তু আমার কবিত্বের গর্ব বেশিক্ষণ টিঁকল না। হঠাৎ স্মরণে এল দুই-তিনদিন পূর্বের ব্যর্থমানসের কথা। সেদিন রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের চুম্বনে একটা কী অভূতপূর্ব উৎকণ্ঠার মধ্যে আমার গাঢ় নিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল। তারপরে আর কিছুতেই ঘুমুতে পারিনি। সারারাত শুয়ে-শুয়ে চাঁদের হাসিতে, কিশলয়ের গুঞ্জরণে, বায়ুর নিঃশ্বাসে, তরুলতার লীলায় আমি কে এক চিরন্তনীর প্রথম সংবাদ পেয়েছিলুম, কিন্তু সেই নিখিলবাসনা, রমণীর জন্য ব্যাকুলতা, ব্যক্তিপ্রেমের বিপুল রভস নারীদ্বেষী সহপাঠীদের সম্মুখে স্পষ্ট ক'রে বলতে সাহস হয়নি। অথচ আমার এমন আত্মসংযম ছিল না যে, সেই আকুলতা, সেই হর্ষবিষাদ, সেই ভাববিলাস অন্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ ক'রে রেখে দিই। কাজেই হাতে কলম নিতে হয়েছিল তার অভিব্যক্তি করতে মন্দাক্রান্তার দোহাই দিয়ে।

চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু গুরবো দ্বৌ দশেকাদশৌ চেৎ
মুগ্ধে বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনী দ্বাদশান্ত্যৌ।
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরসহসৈর্যত্র কান্তে বিরামো
মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তন্বি তাং সঙ্গিরন্তে ॥

মনে হয়েছিল, বাঃ, বেশ সহজ। কালিদাস যখন একখানা পুরা কাব্য তাতে লিখে ফেললেন, তখন আর তাকে বাংলায় পরিণত করা শক্ত কী? কিন্তু যখন মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা থেকে প্রদোষের কাকলি পর্যন্ত অনেক অভিধান উল্টে, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

ফাল্গুন্ রাত্রির চিকন কবরীর
মুক্ত বৈভব্ গগন্ গায়,
কান্তার্ শীর্ষের অমল ফুলবৎ
পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ্ তায়।

এই চার লাইন অতি কষ্টে ঘ'ষে-মেজে দাঁড় করিয়ে, অনেক কেটে-ছিঁড়েও, 'নিষ্ফল্ অন্বেষ্, দয়িতা মিলে কই', এই ছত্রটায় বিশুদ্ধতা আনতে না-পেরে, সে-সমস্তটাকে বদ্‌লে

নিষ্ফল্ ওই চাঁদ্, বিফল ফুলবন্,
ব্যর্থ প্রেম্, নাই প্রিয়ার খোঁজ্।

অথবা

যৌবন্-উচ্ছল্ বিফল বনতল্
কই গো প্রেয়সীর্ দরশ কই?

এই পঙ্‌ক্তি-কতিপয়ের উর্ধ্বে উঠতে অক্ষম হলুম, তখন আমার সব রাগটা পড়ল রমণীদ্বেষী সঙ্গীদের উপর। তাদের অত্যাচারের জন্যে কি কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে হবে? আমি যদি তরুণীর ভালোবাসা চাই, সে-কথা স্পষ্ট বলতে পারব না কেন? চারদিকেই অত্যাচার ; একদিকে ছন্দের, একদিকে সহপাঠীদের ব্যঙ্গের। কিন্তু আসল যে আমার সাহসের অভাব,

সেটা একবারও আমার মনে হয়নি। কিন্তু নিজের দোষ স্খালনের জন্যে এটুকু বলা কর্তব্য যে, সমস্ত রাত ধ'রে মাত্রার, চরণের এবং অক্ষরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার পরে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি খুব প্রখর হ'য়ে ওঠে না।

এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়ের সামনে এসে পড়েছিলুম, তা আমার নজরে পড়েনি। হঠাৎ আমার চমক ভাঙল কার হাসিতে। ওঃ সে কী হাসি, সে যেন আনন্দের অবিরত উৎস। আমার মনে হ'ল বুঝি মূর্তিমান স্ফূর্তি স্বর্গমর্ত্যের মাঝখানের অমৃতসাগর সন্তরণ ক'রে এসে আমার সামনে তার গা-ঝাড়া দিচ্ছে আর দিগ্‌বিদিকে ঠিক্‌রে পড়ছে সুধাশিকর। আমি থেমে গিয়ে দ্বিতলের জানলার পানে চাইলুম। সেথায় দেখলুম যে, সেই অপরিচিতা বালিকাটি দাঁড়িয়ে আছে, যার হরিৎ-ধূসর চোখ সেদিন স্কুল হল্‌-এ কবিতা আবৃত্তির সময় আমার দিকে কী একরকম ক'রে চেয়ে আমার মনে একটা অভূতপূর্ব সঙ্কোচের সৃষ্টি করেছিল। মেয়েটি অদৃশ্যা এক সঙ্গিনীর উদ্দেশে আমার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে কী বলছিল আর হাসছিল। তার আনত মুখের উপরে সায়াহ্ন-আভা একটা অলৌকিক অরুণিমা মাখিয়ে দিয়েছিল। সেটা ঠিক কীরূপ বলা শক্ত। তবু, উপমাটা একটু দূরানীত হ'লেও, আমার মনে হয়েছিল, সেটা মামুলি দুধে-আল্‌তা নয় ; চন্দ্রালোকে রৌপ্য-পাত্রস্থিত জলে চুনী যে ফিকে শোণিমা বিস্তার করে, সেটা সেই রং। পড়ন্ত রৌদ্রের একটি কণা তার আয়ত আঁখিতে কী এক অভাবনীয় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল ও তো মানুষের চোখ নয়, ও বুঝি দু-টুকরো ধূপছায়া মখ্‌মল। তার গণ্ডের দু-পাশ বেয়ে মাটির দিকে নেমেছিল দুইটি স্ফীত অরাল কেশের ধারা, যেন কৃষ্ণপ্রস্তর-প্রতিফলিত কোনো পাগলাঝোরা অর্ধপথে আপন গতি থামিয়ে বিজড় হ'য়ে গেছে।

সে তার রূপের আকর্ষণীতে আমার দৃষ্টিকে আর নিচে নামতে দিচ্ছিল না। যদিও বুঝেছিলুম যে এই হাসি আমাকে দেখে, তবু মনে হয়েছিল যে, আমি উপলক্ষ মাত্র, এর আসল হেতু জীবনানন্দ। কিন্তু তার সেই খুশিতে আমার চিত্তও খুশিতে ভ'রে গেল না, বরং জেগে উঠল একটা গুরুভার ব্যর্থতা, একটা অখিল অপূর্ণতা, একটা অসীম বিষাদ। হঠাৎ অকারণে আমার মাথায় সেই অসম্পূর্ণ মন্দাক্রান্তা ভেসে এল, এবারে আর অপূর্ণ আকারে নয়, বাকি চার লাইন-সুদ্ধ। আমি ব'লে উঠলুম,

ফাল্গুন্ রাত্রির চিকন কবরীর
মুক্ত বৈভব্ গগন্ গায়,
কান্তার্ শীর্ষের অমল ফুলবৎ
পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ্ তায়।
উদ্দাম্-যৌবন-বিভল-বনতল্,
রুদ্ধ দ্বার্ আজ্ ঘুচাও, ভাই।
নিষ্ফল্ কাঙ্ক্ষার্ আশুই সমভাগ্
নাই তো মোর্ তার্ হিয়ায় ঠাঁই।

আবার সেই হাসির ফোয়ারা আমায় লজ্জায় পরিপ্লুত ক'রে দিয়ে উৎসরিত হ'য়ে উঠল ; কিন্তু

আমি নড়তে পারছিলুম না, যেন আমার পায়ে শিকড় গজিয়েছিল। আমার সময়ের সংজ্ঞা হারিয়ে গিয়েছিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার চমক ভাঙল খেলা থেকে প্রত্যাগত সখাদের আহ্বানে। তখন আমি তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলুম ; কেন-না আমি অনুসরণীয়, আমার স্পর্ধার, আমার সম্মানের পক্ষে মেয়ে-ইস্কুলের জানলার নিচে উপরদিকে তাকিয়ে লাঞ্ছিত হওয়াটা মোটেই হিতকর নয়, তাতে ক'রে এমন-কি সমস্ত বিদ্যালয়ের মানহানি হ'তে পারে--এই আমার মাধবীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

পরে মাধবীর পরিচয় পেলুম। তার বাপ-মা কেউ ছিল না, বড়ো ভাই একমাত্র অভিভাবক। সে-ও আমাদের স্কুলের খ্যাতিতে মুগ্ধ হ'য়ে গৃহ ছেড়ে সেখানে পড়তে এসেছিল। এতদিন তাকে দেখিনি, তার কারণ তার শরীরের অসুস্থতা, বেচারা এসে অবধিই ভুগছিল, সবে সেরে উঠেছে। মাধবী বাঙালি নয়, মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান বোম্বাই। বয়সে আমার চেয়ে বছর-খানেক বড়ো হবে, কেন-না আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত।

আমার তার সঙ্গে আলাপ করা বিশেষ শক্ত হয়নি ; বালিকা-বিদ্যালয়ে আমার গতিবিধি ছিল অবারিত। আমি আদর্শ, অতএব আমার চারিত্রে যে বাসনা-কামনার লেশমাত্র থাকতে পারে, এ-কথা নাকচ করতে কর্তৃপক্ষের সাহসে কুলায়নি। এর উপরে আবার আমায় সমর্থন করেছিল আমাদের স্কুলের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি।

কিন্তু ওই পর্যন্তই, সে-আলাপকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করতে সমর্থ হইনি। লোকে বলে আমি সাধারণত বাক্‌পটু, কিন্তু তার সামনে গেলে আমার যত্নে-রচিত উক্তিগুলি কোথায় যে উধাও হ'য়ে যেত, আমি তার সন্ধান পেতুম না ; আমায় পেয়ে বসত একটা কীসের অজ্ঞাত সঙ্কোচ। হয়তো পনেরো-কুড়ি মিনিট চুপ ক'রে থেকে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতুম, 'মাধবী, তুমি কি টেনিস খেলতে ভালোবাস?' সে তার সেই অলস, রভস-ভরা চোখদুটো আমার মুখের উপর তুলে, আমার হৃদয়ে ব্যাকুল স্পন্দন জাগিয়ে, আমার ধমনীতে অগ্নিপ্রবাহ ছুটিয়ে শিথিল স্বরে আমায় উত্তর দিত, 'না, মোটেই না।' হয়তো আমি জানতে চাইতুম, সে কোন্ কবিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। সে খানিকক্ষণ বিজ্ঞের মতো চুপ ক'রে থেকে জবাব দিত, 'কাউকেই না। চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনন্তের সন্ধান পায় পাগলেরাই।' অতএব এরপরে তাকে যে আমার কাব্যের থেকে দু-একটা তর্জমা শুনিয়ে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করব, সেটা আর হ'য়ে উঠত না।

এমনি ক'রে দু-তিন বছর কেটে গেল, গোপনে প্রণয়গাথা লিখে আর প্রকাশ্যে মাধবীর কাছ থেকে পরিহসিত হ'য়ে। সে আমার নিকট হবার সকল প্রয়াস উপরোক্ত উপায়ে সর্বদাই ব্যর্থ করত। ফলত এতদিনেও, প্রত্যহ তিন-চার ঘণ্টা তার কাছে কাটিয়েও আমি তার কিছুই জানলুম না, কিন্তু সে বোধকরি আমার আমর্ম সমস্তই বুঝে নিয়েছিল, কেন-না শুনেছি নারীদের হৃদয়-বিষয়ে একটা স্বাভাবিক অনুভবশীলতা আছে।

এদিকে ক্রমশ পারিপার্শ্বিকদের কাছে আমার গৌরব ক্ষুণ্ণ হ'য়ে আসছিল। আমি শিক্ষকদের দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে পড়ছিলুম। আমি যে তাঁদের প্রদর্শনীয়। কাজেই যখন আমার সেইসমস্ত উচ্চ 'সম্ভাবনা' অঙ্কুরেই নষ্টপ্রায় হ'য়ে এল, তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে

পড়লেন। আজকাল আর আমার হাত দিয়ে নীতিগর্ভ কবিতাবলি বেরুত না, অবশ্য আমি পদ্য লেখা ছেড়ে দিইনি, কিন্তু এখনকার কাব্য আর শিক্ষকদের পাঠ্য ছিল না ; আমার বাগ্মিতায় স্কুল-তর্কশালার গৃহভিত্তিগুলো আর কেঁপে উঠত না ; আমার মন ছিল না তাঁদের উপদেশে, আমার প্রাণ ছিল না আবৃত্তিতে, আমার একাগ্রতা ছিল না পাঠে। সকলের চেয়ে মুশকিলের বিষয় হ'য়ে পড়েছিল যে, আমি আমার সহপাঠীদের আস্থা হারিয়েছিলুম, এমন-কি বোধহয় তাদের ঘৃণার্হও হ'য়ে গিয়েছিলুম। যেখানের শিক্ষাপদ্ধতি স্বাধীনতার বড়াই করে সেখানের শাসন সাধিত হয় আদর্শের জোরে। সেই আদর্শই যদি চরণচ্যুত হব-হব হয় তবে শিক্ষকরা সত্যই উদ্বিগ্ন হ'তে পারেন। কিন্তু তাঁদের দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবার আগেই আমার অন্যমনের কারণ অপসারিত হ'ল। মাধবী পরীক্ষা পাশ ক'রে দেশে ফিরে গেল ডাক্তারি পড়তে।

মাধবীকে আমি কতটা ভালোবেসেছিলুম, তা সে যতদিন কাছে ছিল বুঝিনি ; এমন-কি সে যাবার পরেও কিছুদিন হৃদয়ঙ্গম করতে সময় লেগেছিল, কেন-না তখন ছিলেম আমূর্ছিত। ক্রমশ যখন অল্প-অল্প ক'রে চেতনা ফিরে এল, সৌন্দর্যে যখন পুনর্বিস্ময় জাগল, বাসনা যখন দ্বিগুণ বেগে আমার অন্তরাত্মাকে পুড়িয়ে দিতে লাগল, তখন জানলুম, নারী কাম্য, তার কারণ তারা মাধবীর জাতি ; প্রকৃতি সুন্দর, তার কারণ তার মধ্যে মাধবীর উপমা খুঁজে পাওয়া যায় ; জীবন মধুর, তার কারণ তাতে মাধবীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটবার সম্ভাবনা আছে। তখন আমার দিনগুলো হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তার জন্যে প্রতীক্ষার, আমার সমস্ত কার্যগুলো তারই আয়োজন, আমার সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত চিন্তা তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। আমার বুদ্ধি বলত যে, রূপসী হিসেবে মাধবীর স্থান খুব উঁচু নয়, এমন-কি সন্ধ্যারাগদীপ্ত মাধবী আর আটপৌরে মাধবী—এ-দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ, কিন্তু আমার মন সে-কথা মানতে চাইত না। আমি জানতুম, মাধবীর চিন্তাশক্তি নেই, মাধবীর অনুভূতি মামুলি, মাধবীর বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল, কিন্তু স্মৃতিতে তার সেই একাক্ষরাবৃত্তি উক্তিগুলি অর্থমর্যাদায় অনবতুল হ'য়ে উঠত। তারপরে যখন তার বিয়ের খবর পেলুম, যখন সেই সংবাদে সংযমগত একটা শ্লথ মুহূর্তে নিজে বিয়ে করতে রাজি হলুম, তখনো তার সহিত আশুমিলনের মরীচিকা ভুলতে পারিনি। ভেবেছিলুম, কোনো এক অলৌকিক শক্তির সাহায্যে, কোনো অঘটন সঙ্ঘটনের ফলে অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে উঠবে, দুঃস্বপ্নের শেষে আমার সিক্ত উপাধানের পাশে, আমার প্রসারিত ভুজের মধ্যে, আমার ব্যাকুল বক্ষের উপরে মাধবীকে দেখতে পাব। সেইজন্যেই আমি নিজের দেহকে অপবিত্র হ'তে দিইনি, তা দিয়ে যে দেবতার অর্ঘ্যসাজন হবে। সেইজন্যেই বিমলাকে কাছে ঘেঁষতে দিইনি। সেইজন্যেই প্রফেসারি ও ওকালতির মধ্যে নির্বাচন করতে পারিনি। সেইজন্যেই তার উদ্দেশে লিখেছিলুম,

স্বপনেতে সদা ভুঞ্জিতা তুমি
তব মুখ হৃদে সঞ্চিত,
রবে চিরদিন বাঞ্ছিতা, প্রিয়ে,
রব আমি চিরবঞ্চিত ॥

সহসা আমার চিন্তাসৌধ ভেঙে পড়ল বিজন সেনের বজ্রনির্ঘোষে। তিনি খুব উত্তেজিত স্বরে বলছিলেন, 'চরকা! চরকা!! চরকা দিয়ে দেশের দাসত্ব মোচন হবে? কচু হবে। তোমরা খদ্দরের আবরণে এক দাস্যকে ঢাকতে চাচ্ছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না যে তাতে ক'রে যে আরেক দাস্যের অপ্রতিহত বিরাট স্বরূপ দেখতে পাবে তাতে অন্তরাত্মা আঁৎকে উঠবে। এখন আমরা সঙ্কুচিত হ'য়ে আছি পশু-বলের কাছে, আমরা কাঁপছি ব্রিটিশ সিংহের গর্জনে। এই দাসত্বের মূলে একটা সনাতন সত্য আছে যে, জোর যার মুল্লুক তার, অর্থাৎ তার সঙ্গে এটাও জানা আছে যে যদি কোনোদিন আমাদের তাকৎ বা কৌশল সিংহকে হারাতে পারে তাহ'লে মুল্লুক আমাদের। সিংহের বুদ্ধি বেশি নয়, তাকে একদিন শশকেও হারিয়েছিল; সিংহ কৃতজ্ঞ, তার পায়ে যদি কোনোদিন কাঁটা ফোটে আর তা যদি আমাদের ডাক্তারিতে সেরে যায়, তাহ'লে তার কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা আছে; সিংহের অন্ত হচ্ছে ফাঁদে, সে-সময় আমরা মূষিক হ'লেও তার চারদিকে বিনা-কুণ্ঠায় তাণ্ডব নাচতে পারব; পরিশেষে সিংহ মাত্রেই শিকারীর বধ্য, তাহ'লে তো আর কথাই নেই। সিংহের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় সহস্র, বিশেষ যদি সে-সিংহ সভ্য সিংহ, সার্কাসের সিংহ হয়, শেঁকো-টেঁকো নানারূপ ঔষধ আছে। কিন্তু মহাত্মাদের স্বৈরিতা থেকে আত্মরক্ষার কোনোই উপায় নেই, কেন-না আত্মা যে কায়াহীন, প্রাণহীন। গুরু মরলে তার আত্মা অবাধে শিষ্যের উপরে অর্শাতে পারে। অতএব আত্মার অত্যাচার চিরন্তন, বিশ্বজনীন, সর্বব্যাপী, বিশেষত যদি সে-আত্মা অহিংস হয়। যুক্তির জবাবে যখন অলৌকিকতার রূপকথার সৃষ্টি করা হয়, তর্কের জবাবে যখন ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া হয়, ভগ্ন প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করলে যখন অসম্ভব যুক্তি-শর্তের উদ্ভাবন হয়, যুবকের স্বাভাবিক হিংস্রতার, স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার প্রতিবর্তে যখন যিশুকে অনুকরণ করতে বলা হয়, তখন বিশ্ববিদ্রোহীও, পরমনাস্তিকও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে।'

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, তাই ভাবলুম এবারে কিছু না-বললে, লোকে মনে করবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই সঙ্গে-সঙ্গে বিজন সেনকে খেপিয়ে দেবার ইচ্ছাটাও ছিল। তাই বললুম, 'দেখুন, আমাদের দেশের মাটির গুণ হচ্ছে যে, যা এখানে একবার আসে তা মৌরসিপাট্টা পায়। এমনি ক'রে কলেরা, প্লেগ, পরিশেষে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আমাদের পরম আত্মীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ঐ দেড়শত বৎসরব্যাপী দাসত্ব কোনোদিন ঘুচবে ব'লে মনে হয় না। তাই তাকে যদি আকৃতি বদ্‌লে দিয়ে আমাদের সনাতন দাসত্বের প্রতিকৃতি ক'রে দিতে পারি তাহ'লে মন্দ কী। এ-কথা প্রত্নতাত্ত্বিকরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মনু-পরাশর-মেধাতিথি-চালিত ভারত স্বাধীন ছিল। অতএব চরকা-কল্পতরুর শিকড় যতই দৃঢ় হবে, স্বরাজ-ফল ততই শীঘ্র পাওয়া যাবে। ওতে বাধা দেবেন না। চরকাকে আধ্যাত্মিক ক'রে তোলাতে আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন, কিন্তু এ-কথা বোধহয় আপনি বিস্মৃত হয়েছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি চক্রাকার, অর্থাৎ চরকার অনুরূপ, শুধু তাই নয় চরকার সুতোর বিবর্তন হচ্ছে সৌরজগতের অন্তর্বৃত্তের মতোই প্রায়। আধ্যাত্মিকতার আর এর চেয়ে কী জোর সার্টিফিকেট্ থাকতে পারে।'

প্রাচীন ভারতের নাম শুনে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক মান্ধাতার আমলের শান-বাঁধানো রাস্তার

ইতিহাস বলবার জন্য উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বিজন সেন তাঁকে বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে শুরু ক'রে দিলেন, 'সত্যিই কি মহাত্মার মত এই?' আমি বললুম, 'তা ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু জনশ্রুতি এইরূপ।' তিনি বললেন, 'তা যদি হয় তাহ'লে তাঁর পশ্চিম-বর্জনের ভিত্তিই যে থাকে না। এর চেয়ে ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিকতা আর কী থাকতে পারে? প্রুসীয় সভ্যতাও যে এর কাছে হার মেনে গেল। আর যদি যন্ত্রকেই পূজা করতে হয় তাহ'লে যেখানে যন্ত্রের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাকে বাদ দিই কী হিসেবে? চরকার আর ম্যান্‌চেস্টারের মিলের মধ্যে হচ্ছে সেই তফাৎ যেটা পরিলক্ষিত হয় অর্ধসভ্য আর সম্পূর্ণ সভ্য মানুষের মাঝে। উভয়েই স্বভাবপ্রসূত তুলো গাছের ঐশ্বর্য অপহরণ ক'রে নিজের কাজে লাগাল, কিন্তু চরকা প্রসব করে অমার্জিত অশুভ্র স্থূলত্ব, মিল উৎপাদন করে সূক্ষ্ম, চিক্কণ অণিমা। এ-দুয়ের মধ্যেই যদি বিচার করতে হয় তাহ'লে মিলের শ্রেষ্ঠতা নিশ্চিত।' আমার কাছে বিজন সেনের যুক্তিটা খুব উঁচুদরের ব'লে মনে হ'ল না। তাই বললুম, 'কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার্য যে মিল-চালকের মধ্যে প্রাণশক্তির কোনোই লেশ খুঁজে পাওয়া ভার এবং চরকা-চালক অর্ধজীবিত হ'লেও তার ভিতরে জীবনের বৈচিত্র্য দেখা গেলেও যেতে পারে।'

বিজন সেন আরো উত্তেজিতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তা হওয়া সম্ভব যদি চরকা-চালানো সখমাত্র থাকে, কিন্তু তাকে যে তুমি কর্তব্য ক'রে তুলতে চাইছ। সে যাই হোক্, আমি চরকা-চালকের এবং মিল-মজুরের কথা বলছি না, তারা উভয়েই নিকৃষ্ট জীব, তাদের পূজা করতে আমাদের কেউ কখনো উপদেশ দেয়নি। আমাদের পূজা চাইছেন একদিকে চরকা-স্রষ্টা, অপরদিকে মিল-আবিষ্কারক। এ-দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করা কি এতই শক্ত? এ-কথা কি তুমি স্বীকার করবে না যে, যে-লোক মিল বানিয়েছিল, তার চিত্তবৃত্তি, তার বুদ্ধিমত্তা, চরকা-রচয়িতার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে? তা যদি তুমি অস্বীকার করো তাহ'লে জানব তুমি আর স্বাধীন চিন্তা করতে সমর্থ নও, তুমি আর শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তর্ক করার যোগ্য নও, তুমি দাস, দাস, পদদলিত ক্রীতদাস মাত্র।'

তর্কে আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছিল। মাধবী-বিমলা নামক উভয়সঙ্কটের অস্তিত্বই আমি ভুলে গিয়েছিলুম। নূতন উৎসাহে বাক্‌-যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মিসেস্ সেন আমাদের ক্ষান্ত ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, 'বিজন, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এটা একটা ভদ্র পরিবারের বৈঠকখানা, নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটির মিটিং-গৃহ নয়। এ-নিরীহের উপরে তোমার অব্যর্থ যুক্তির অস্ত্র চালিয়ে কী হবে? ওগুলিকে জমিয়ে রেখে দাও, ওর সহায়তা নিয়ে বরং মহাত্মাকে দ্বৈরথে আহ্বান করো। দেখতে পাচ্ছ না, এ-বেচারা একজন ঘোরতর পশ্চিম-প্রেমিক। তোমার প্রিয় দেশের জন্যে martyrdom সইছে।' মিসেস্ সেনের এটা একটা চিরন্তন ঠাট্টা ছিল। আমার হালফ্যাশানের সুটগুলিকে তিনি crown of thorn, hair shirt ইত্যাদি আখ্যা দিতেন।

মিসেস্ সেনের কথায় আমার মন বাড়ি ফেরবার জন্যে হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। আমার মনে হ'ল যে, এইসমস্ত কাল্পনিক হিতাহিতের বিচার করবার সময় আমার নেই, নিজের হিতাহিতই যে আমি ধার্য করতে পারি না। আমার বোধ হ'ল সারা দেশের ভবিষ্যৎ-মার্গ

নিয়ে তর্ক করা তাদেরই শোভা পায়, যারা নিজেদের চলার পথ একেবারে ঠিক ক'রে রেখেছে। এ-সমস্ত বক্তৃতা এক অন্ধকে আরেক অন্ধের চালনা করার মতো হাস্যাস্পদ এবং সঙ্গে-সঙ্গে অত্যন্ত করুণ, অতিশয় মর্মস্পর্শী। সকলে ব্যক্তিত্ব হারাবে, স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা আর থাকবে না, সে কি এমনই দুরদৃষ্ট। আহা. যদি কোনো উপায়ে আমি আমার চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যেতুম। যাক্, সে-কথা নিয়ে দুঃখ ক'রে কী হবে! এটা নিশ্চিত যে, সেই বুদ্ধিরিক্ত, শূন্যগর্ভ, অসার বাক্‌বিতণ্ডার ভিতর নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকা চিন্তাদমনের শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। চাই কাজ, হাড়ভাঙা, নির্বোধ কাজ যাতে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ-সুদ্ধ থাকবে না। নচেৎ সেই চিরসমস্যা মীমাংসার জন্যে মস্তিষ্কের ভিতর নীরব চিৎকার করতে থাকবে। তাকে বন্ধ করবার অন্য কোনো উপায় নেই। বিজন সেনের বাড়িতে আর ব'সে থাকবার কোনো ছুতো নেই। সন্ধ্যা হয়েছে, অতএব সম্ভবত বিনা-বিপদেই বোধহয় আমার হ্যাট-কোট-ঢাকা দেহখানি রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এখানে ব'লে রাখা উচিত যে, আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন কিশোরদের স্বদেশপ্রীতি এত অধিক ছিল যে, আমার মতো martyr-দের পথেঘাটে নানারূপ মধুর সম্ভাষণ তো শুনতে হ'তই, এমন-কি এক-আধখানা ইটপাটকেলের কোমল স্পর্শও পৃষ্ঠদেশে সইতে হ'ত, বিশেষত বিজন সেনের পাড়াতেই পশ্চিম-বর্জনের একজন মস্ত পুরোহিত মিস্টার কর থাকতেন। অন্ধকারের উপর নির্ভর ক'রে আমি সেদিনের মতো বিদায় নিলুম।

রাস্তায় বেরিয়ে যখন দেখলুম যে গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় মোটেই কমেনি এবং লোকজনের যাতায়াত অন্যদিন অপেক্ষা বেশি, তখন মনে হ'ল যে, সেদিন সন্ধ্যার পরে বিজন সেনের প্রতিবেশী সেই নেতাটির গৃহে একটা বিরাট সভার অধিবেশন আছে। কাজেই টুপিটাকে চোখের উপর টেনে দিয়ে, সিগারেটটাকে মুখের কোণে বাঁকিয়ে ধ'রে, হাতদুটোকে পেন্টুলুনের পকেটে পুরে, আমার মতে যেটা ইংরেজি-গমন, তার অনুকরণ করতে শুরু ক'রে দিলুম, পলিটিক্যাল-তীর্থযাত্রীরা যদি শ্বেতাঙ্গ ব'লে ভাবে, এই আশাতে। ফলত পথে দু-একজন আমার পানে কট্‌মটিয়ে চেয়ে যদিও আমার হৃৎকম্প ধরিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বোধহয় তাঁরা ঠিক করতে পারেননি, আমি সিংহচর্মাবৃত রাসভ, কি সত্যই পশুরাজ স্বয়ং, অন্ততপক্ষে 'সন্দেহ-প্রসাদ' থেকে আমি বঞ্চিত হইনি।

এমনি ক'রে চলতে-চলতে যখন পার্কে এসে পড়লুম, তখন লোকের ভিড় নেই। আমি একটা ফাঁড়া কাটল সেই কৃতজ্ঞতায় ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, এমনসময় একখানা ট্যাক্সি সজোরে এসে আমার পাশে দাঁড়াল এবং ভিতর থেকে সুললিত বামাকণ্ঠে ইংরেজিতে একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মশাই, বলতে পারেন মিস্টার করের বাড়ি কোথায়?' আমি চম্‌কে উঠলুম ; এ যে আমার পরিচিত স্বর, এ যে আমার কত যুগান্তরের, কত জন্মান্তরের সঙ্গিনীর গলা। হঠাৎ যে কেন অশ্রুতে আমার চক্ষু ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল বুঝতে পারলুম না। কোনো [য] কষ্টে কম্পিত কণ্ঠকে প্রকৃতিস্থ ক'রে আমি বললুম, 'মাধবী! তুমি!' সে উত্তর করলে, 'আপনি আমাকে চেনেন?' আমি বললুম, 'চিনি? সে কি শুধু একদিনের চেনা! সে-পরিচয় যে কোন্ মন্বন্তরের।' সে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কে? তুমি সুরেন

নাকি?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ—।' সে বললে, 'তোমায় এ-বানরের বেশে দেখে চিনতে পারিনি। স্বদেশের জাগরণের দিনে তোমার এ-সাজ কেন?' আমি বললুম, 'জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরিয়সী ব'লে ভাবতে পারিনি ব'লে।' সে জিজ্ঞাসা করলে, 'অর্থাৎ?' আমি জবাব দিলুম, 'অর্থাৎ স্বর্গে শুনেছি বিনা-বসনে চলে, কিন্তু মর্ত্যে সে পোষাকের পরিণাম বহরমপুরে। আসল কথা, আমি বিশ্বকে বর্জন ক'রে দেশকে খদ্দরের পর্দার আড়ালে রেখে তাকে ব্রহ্মাণ্ড ব'লে ভাবতে পারি না।' সে বললে, 'Oh! the eternal intellectual pose! I am sick of it.' আমি বললুম, 'যাক্ সে-তর্ক। রাজপথ কংগ্রেস কমিটি নয়, অথবা *Young India*-র পাতাও নয়। আমি জানতে চাই, তুমি এখানে কী করছ। আমার ধারণা ছিল, তুমি বোম্বায়ে এখন মড়াকাটা নিয়ে ব্যস্ত।' সে বললে, 'আমার ডাক্তারি পাশের আরো এক বছর বাকি ছিল, ছেড়ে দিয়েছি দেশের ডাকে। আমি বললুম, 'তার মানে দশের ডাকে।' সে বললে, 'Intellectual'-দের মহৎ প্রয়াসে নাক সেঁটকানো আমার সহ্য হয় না।' আমি সে-কথার প্রতিবাদ না-ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু কলকাতায় কী করছ?' সে বললে, 'তোমাদের মতো অবিশ্বাসীদের দীক্ষা দিতে এসেছি।' আমি জবাব দিলুম, 'আমাকে তোমার নেতৃত্ব মানানো শক্ত হবে না।' সে তাতে কিছু না-ব'লে, নিজের কথাই তুললে, 'মিস্টার কর আমাদের নেতা দাণ্ডেকরকে লেখেন যে বাংলায় নারীকর্মীর অভাব। দাণ্ডেকর আমাকে পাঠিয়েছেন। সে-কথা পরে হবে অখন, এখন আমার তাড়া আছে। ব'লে দাও মিস্টার করের বাড়ি কোথায়।' আমি তাকে বিজন সেনের প্রতিবেশীর ঠিকানা বাৎলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মাধবী, আমার চিঠি তুমি পেয়েছিলে?' সে 'হ্যাঁ' ব'লেই চ'লে যেতে যাচ্ছিল আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, 'একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' সে ব্যস্ত হ'য়ে বললে, 'তুমি নিজেই বলেছ রাস্তা কথা কওয়ার জায়গা নয়, পরে হবে অখন।' আমি বললুম, 'কাল তুমি আমার বাড়িতে চা খেতে যাবে।' 'না, দিন-তিনেক আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, তার পরে হবে। বরং তুমি তরশুদিন আমার কাছে এসো।' ব'লে সে আমাকে তার ঠিকানা দিলে। তারপরে আমি প্রতিবাদ করবার পূর্বেই ট্যাক্সি দ্রুতচালে বেরিয়ে গেল। আমি হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, এতদিন পরে এত প্রত্যাশিত পুনর্মিলন এই! জীবনের ব্রহ্মলগ্ন বাজে কথাতেই কেটে গেল। আর বেশিদূর এগুতে সাহস হ'ল না। তার মনোভাবের পরিচয় যা-পেয়েছিলুম সেটাকে ভালো ক'রে বুঝতে চেষ্টা-সুদ্ধ করলুম না। বাড়ি ফিরে গেলুম বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের যে-সমস্ত কর্তব্য ঠিক করেছিলুম, তা অকৃত রইল!

তিনদিন যে আমার কী ক'রে কাটল, তা ভগবানই জানেন। মাধবীর বাসাতে গেলুম পাঁচটার সময় বিকেলে। আমার মনে আছে, যাবার পূর্বে প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে চিন্তা করেছিলুম, কী প'রে যাব। অবশেষে ইংরেজি পোশাক পরিহার ক'রে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করলুম, যদিও খদ্দর পরবার মতো হীনতা স্বীকার করতে পারলুম না। আমি যখন পৌঁছলুম তখন মাধবী কোনো এক নেতার সঙ্গে কথাবার্তায় ছিল ব্যস্ত। আমার উপর হুকুম এল অপেক্ষা করতে। তার আত্মীয়েরা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক, গৃহস্বামী কী এক সরকারি চাকরি করতেন। তাঁরা আমি মাধবীর অতিথি ব'লে আমায় আদর-অভ্যর্থনা করলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মন যে

আমার প্রতি প্রসন্ন নয়, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগল না ; তাঁরা যেন আমার দিকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। সে-সংশয়ের কারণ কী ঠিক নির্ণয় করতে পারলুম না। সেটা কি সরকারি চাক্‌রের রাজনৈতিক দলের প্রতি অবশ্যম্ভাবী অবিশ্বাস, না মাধবীর পুরুষ বন্ধু ব'লে আমার উপর সন্দেহ?

কতক্ষণ যে তেমনি সন্দেহের কটাক্ষ সহ্য করতে-করতে এক্‌লা ব'সে থাকতে হয়েছিল, মনে নেই। আমার কাছে কিন্তু সেই অপেক্ষা মনে হয়েছিল এক যুগ। শেষে যখন ঈর্ষার বিষে আমার শরীর-মন অবসন্ন হ'য়ে পড়ল, আমার আত্মসম্ভ্রম ব'লে আর যখন কিছু বাকি থাকল না, ফিরে যাবার আর শক্তি মাত্র রইল না, ইচ্ছা তো দূরের কথা, তখন মাধবী সেই নেতাটিকে বিদায় দিয়ে আমায় আহ্বান করলে। সেই আচরণের জন্যে তাকে কিছু বলতে-সুদ্ধ সাহস হয়নি। কী ফল? জানতুম তাকে ভর্ৎসনা করতে গেলে এমন একটা কিছু শুনব যার ফলে অভিমানের মোহটুকুও আর থাকবে না। সে যে আমাকে তার বাড়িতে আসতে দিয়েছে, সেটিই কি আমার পরম সৌভাগ্য নয়? তার উপরে কীসের অধিকার?

তার সঙ্গে কী যে কথা হয়েছিল ঠিক মনে নেই ; তবে এটা শপথ ক'রে বলতে পারি যে, ভালোবাসার নামগন্ধও করিনি। কেন-না, মনে-মনে ভয় ছিল, তার উত্তর আমার আশানুযায়ী হবে না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সে আমাকে তার বিবাহের ট্র্যাজেডিটা শুনিয়ে দিতে ছাড়েনি। তার স্বামী তার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলেত চ'লে গিয়েছিলেন, তাকে সঙ্গে নিতে কিছুতেই রাজি হননি। সেই অপমান সে দেশের পূজায় ভুলতে চেষ্টা করছে। তার দুঃখ অনেক ; সে লোক-পরম্পরায় শুনেছিল তার স্বামী নাকি বিলেতে অত্যন্ত ইতরভাবে জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর দেশে ফেরবার কথা আরও এক বছর বাদে। সে ঠিক করেছে, তিনি এলে সে তাঁকে পরিহার করবে। প্রতিশোধ নিতেই হবে। মোদ্দাকথা বুঝেছিলুম যে, তার দেশপ্রীতি আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর মাত্র। আমার নিজের কথাও উঠেছিল। যেমন, তাকে সেই চিঠি লেখবার পরে আমি বিয়ে করলুম কী হিসেবে? সে-পত্রখানি কি তবে কেবলমাত্র আমার সাধুরচনার ক্ষমতা দেখাবার জন্যে? কথায়-কথায় সে এটাও নিশ্চয় জেনে নিয়েছিল, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক দাম্পত্যোচিত নয়। তার জন্যেই যে আমি এইরূপ লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করছি, তা তার অজ্ঞাত ছিল না বোধহয়, কেন-না যতদূর স্মরণ আছে, সে-কথা আমাকে একবারও বলতে হয়নি বা সে নিজেও তোলেনি।

তাকে ছেড়ে যখন সদর রাস্তায় বেরুলুম, তখন মনে হ'ল যে, তাকে নূতন ক'রে পেতে গিয়ে আমি আবার আমার জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছি। কারণ আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যে, আমি তার সঙ্গে দেশসেবায় রত হব। আগামীকল্য যখন তার কাছে যাব তখন আমায় প'রে যেতে হবে খদ্দর। এই খবর শুনলে আমার একমাত্র বন্ধু বিজন সেনের যে কী অবস্থা হবে, সে-কথা ভেবে কিছু আনন্দ উপলব্ধি করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল যে, আমি তার কাছে যতক্ষণ ছিলুম, সে আমার হাতে হাত রাখতে কুণ্ঠিত হয়নি। তবে কি সে সত্যই আমায় ভালোবাসে? বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন এই তুচ্ছ ভিত্তির উপরে আমি গ'ড়ে তুলেছিলুম এক অদ্ভুত, অপূর্ব মেঘসৌধ। তখন একবারও মনে হয়নি যে, ঈদৃশ

ইমারত অল্পায়ু এবং সেখানি যখন চুরমার হ'য়ে পড়বে তখন তার প্রাকারের তলায় চাপা প'ড়ে গৃহকারকের অন্ত্যেষ্টিও সমাপিত হ'তে পারে।

এমনিভাবে দিনে-দিনে অল্প-অল্প ক'রে তার সঙ্গে যে-ঘনিষ্ঠতা আমি গ'ড়ে তুলছিলুম, তাতে আশার চেয়ে নিরাশার অংশটাই বেশি। না, তার সঙ্গে যে-সম্পর্ক পাতিয়েছিলুম, তাকে ঘনিষ্ঠতা বলা কিছুতেই চলে না। সে হচ্ছে কুকুরের সঙ্গে মানবের যে-সম্বন্ধ। যখন সে সদয় হ'য়ে আমায় পায়ের কাছে বসতে দিত, আমি সপ্তম স্বর্গ হাতে পেতুম ; আবার যখন বিরক্ত হ'য়ে আমার প্রতি ঔদাস্য দেখাত, তখন আমি পার্থিব দেহেই কুম্ভীপাকের সকল যন্ত্রণা সহ্য করতুম। এক-একদিন যখন কোনো বিরাট সভার ক্ষণিক উত্তেজনা থেকে ফিরে আসতুম, তখন মনে হ'ত, এ-সকলি মিথ্যা। তখন মনে হ'ত যে, যে-মাধবী ইংরেজি ভাষার শ্রাদ্ধ ক'রে জনমনে ঘৃণার বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়ে জয়ধ্বনি-আরক্ত আননে গৃহে ফিরে এল, সে-মাধবী আমার আদর্শ মাধবী নয়। সে হচ্ছে এক অল্পমতি, স্তুতিপ্রিয়, বিস্ময়কামী মাধবী, তার চারিত্র্যে মহত্ত্বের স্থান নেই ; তার রূপে অপরূপের লেশ নেই ; তার কথায় অনন্তের বার্তা নেই। কিন্তু আমার এই বিদ্রোহকে আমি ত্রস্ত হ'য়ে দমন করতুম। আমার এই শেষ আদর্শটুকুও যদি যায় তাহ'লে বাঁচব কী নিয়ে! আর সমস্তই ত্যাগ করেছিলুম, আমার লেখা, আমার বন্ধু, আমার পত্নী ; বাকি ছিল ওই মাধবী। কাজেই তাকে আমি সহজ চোখে দেখতে কিছুতেই চাইতুম না।

তারপর সেই শেষ রাত্রি। সেদিন এক ঘণ্টার পরে মাধবীর বক্তৃতা থেমেছিল বটে, কিন্তু করতালি আর থামতে চায়নি। সেই জনসমুদ্র গর্জন ক'রে উঠেছিল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। 'মহাৎমা গান্ধিজি কি জয়' গানে আকাশখানা আস্ত থাকলেও, মাধবীর নামকীর্তনে উঠেছিল টলমলিয়ে। তারপরে মাধবীর যানখানাকে যখন যুবকবৃন্দ টানতে আরম্ভ করলে, তখন মাধবী আমার 'পরে একবার চরিতার্থতার কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে আমাকেও পাশে ডেকে নিয়েছিল। অনেকসময় ভাবি, আমাকে তেমন ক'রে সংবর্ধনা না-করলেই আমাদের উভয়ের পক্ষে ভালো হ'ত। কিন্তু তার কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল। সেদিনের তার সেই সপ্তাদিবায়ু বক্তৃতার লেখক ছিলেম আমি।

আমরা যখন মাধবীর বাসায় পৌঁছলুম, তখন প্রায় রাত্তির নয়টা হবে। আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই ঠিক করেছিলুম যে, মাধবীকে নামিয়ে দিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরব। তাদের বাসার সদর দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নেড়ে কবাট খোলবার জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে মাধবী বললে, 'ট্যাক্সিটাকে বিদায় ক'রে দাও-না।' আমি বললুম, 'তাহ'লে যাব কীসে?' সে বললে, 'যাবার জন্যে অত তাড়া কেন, যেও অখন। তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে একটু ব'সে যাও।' ব'লে একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি জবাব দেবার পূর্বেই আবার বললে, 'আজ বাড়িতে কেউ নেই, সকলে বায়োস্কোপ দেখতে গেছে। থাকবার মধ্যে শুধু চাকর-লোকজন।' আমি উত্তর দেবার আগে তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম তার চোখদুটো জ্বলছে নীরব নিমন্ত্রণে।

আমার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব'হে গেল। ক্লান্তিনত মাথা মনে হ'ল

যেন অভ্রভেদ ক'রে উঠল ; ভাবলুম, আমি জগতে শ্রেষ্ঠ, সেরা, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা কীসের অজানা, অনামা আতঙ্কে আমার চিত্ত ভরপুর হ'য়ে উঠল। আমি জানতুম সে-আহ্বানের অর্থ কী। কিন্তু তারপরে? আর কি কিছু বাকি থাকবে? জীবনের এই শেষ আদর্শটিকে এমনভাবে বলিদান দিতে মন সরল না। আমি বললুম, 'কিন্তু লোকে কী বলবে?'

সে বুঝেছিল আমার মনে একটা বিষম দ্বন্দ্ব চলছে। তাই কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে জবাব দিল, 'তোমার ভয় যদি আমার চেয়ে বেশি হয়, তাহ'লে যেতে পারো।' এই কথা ব'লেই সে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। গ্যাস দীপালোকিত কলকাতা আমার চোখে অন্ধকার হ'য়ে এল ; একটা কীসের পিণ্ড যেন আমার গলা রোধ ক'রে দিচ্ছিল। আমি চিৎকার ক'রে উঠলুম, 'মাধবী!' সে অর্ধরুদ্ধ দ্বার থেকে মাথা বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী?' আমি বললুম, 'আমি আসছি।' সে অর্ধ-বিরক্ত অর্ধ-তুষ্টস্বরে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে।'

...

যখন সদর রাস্তায় বেরুলুম সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। আমি কবাটটাকে সন্তর্পণে বন্ধ করতে-করতে ভাবছিলুম, 'এই?' এই চুমোর জন্যে লোকে পাগল। এই আলিঙ্গনের মাঝে লোকে সময়ের সংজ্ঞা হারায়, জীবনের দুঃখ ভুলে যায়, মরণের বিরাট নির্বাণ খুঁজে পায়। এই নারীর জন্যে লোকে খুন-সুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই প্রেমের নামে কবিদের লেখনী সজীব হ'য়ে ওঠে! এ-ই সব! এই ফাঁকির জন্যে আমি পাগল হয়েছিলাম। মাধবীর অনাবৃত রূপের কথা মনে হ'ল। সত্যই কি তাকে একদিন আমি জগতে অনবতুল ব'লে ভেবেছিলুম? তার সেই কঞ্চির মতো উরুর, পায়রার মতো বক্ষের স্মৃতি আমার মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দিচ্ছিল। তার চুমুতে যে একটা শুষ্কতার স্বাদ পেয়েছিলুম, তাতে আমার গা গুলিয়ে উঠছিল। সেই সঙ্গে-সঙ্গে মনে হ'ল মিসেস্ সেনকে বলবার মতো একটা গল্প পাওয়া গেল বটে। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্মরণ হ'ল যে, সেনের দুয়ার আমার ডাকে আর খুলবে না। আমার অতীতজীবন সে যেন কোনো জন্মান্তের স্মৃতি, সে যেন একটা সুখস্বপ্ন মাত্র। আবার মনে হ'ল এতদিনের সমস্যার অত্যন্ত সহজেই মীমাংসা হ'য়ে গেল। এখন আর আমার অ্যাটর্নি হ'তে কোনো আপত্তি নেই, বিমলার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করতেও কোনো বাধা নেই, অবশ্য যদি আমার মনপ্রাণের কোনো ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। জানলুম ভবিষ্যতে আমি মুক্ত। কিন্তু সেই জ্ঞানে অন্তরে একটুও আনন্দ পেলুম না। একটা বিপুল, অসীম, বিরাট বিষাদ আমারই দেহখানাকে-সুদ্ধ যেন করছিল নিষ্পেষণ।

আমি এইসমস্ত ভাবতে-ভাবতে হেঁটে চ'লে যাচ্ছিলুম, এমনসময় পেছন থেকে ডাক এল, 'বাবু! বাবু!' ফিরে দেখি সেই ট্যাক্সিওয়ালা-বেটা আমার পিছু-পিছু ছুটে আসছে। তার ভয় আমি বুঝি তাকে ভাড়া না-দিয়েই পালাতে চাই। তার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলুম। তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার মূল্য অল্প নয়।

[নামহীন গল্প ২]

ভাদ্র তখন শেষ হয়-হয়, কিন্তু প্রাবৃটের প্রকোপ কমেনি। সে-বার প্রথম আষাঢ়ের বপ্রক্রীড়া শুরু হয়েছিল শ্রাবণের অন্তে। বর্ষাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে-ভালোবাসা কামুকের ভালোবাসা নয়,—কিশোরীর প্রতি কিশোরের অনুরাগ। অর্থাৎ সে-প্রীতি শুধু অবসাদ-স্তিমিত নেত্রে দেখার, মুগ্ধ কর্ণে শোনার, স্বপ্নের রঙে ছবি আঁকার। তাতে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, নিবদ্ধতার সন্দেহ-সুদ্ধ অনুপস্থিত ; তাতে আছে শুধু রভস, আছে শুধু শিথিলতা। সংযমের মধ্যে রুদ্ধ হ'য়ে বর্ষাকে আমি দেখতে চাই। তার বিপুল নিখিল গৌরব সর্বাঙ্গে মাখতে আমার মন সরে না। বয়স যখন কাঁচা থাকে, কল্পনা যতক্ষণ প্রখরা, পর্যুপ্তির পরিতৃপ্তি মনে ঠাঁই পায় না ; বিশ্বরূপা নারীর সঙ্গে তখন দেখা-সাক্ষাৎ হয় মুহুর্মুহু। তাই তখন খোলা জানলায় ব'সে পুঞ্জিত মেঘের ভারে ভূমিলগ্ন-প্রায় আকাশ দেখে আমি ভাবতে পারতুম সে বুঝি কোনো প্রণয়ে অনভিজ্ঞা, প্রথম-ব্যথাহতা কুমারীর আঁসুনত আঁখি। বর্ষণের গানে আমার মনে হ'ত সে বুঝি কোনো প্রিয়াহারা পতিব্রতার অশ্রুসিক্ত বিলাপগাথা। ভেজা পাতার মধ্যে হাওয়ার সন্‌সনানি আমার কানে প্রোষিতার মর্মোচ্ছ্বাসের স্মৃতি জাগিয়ে দিত।

এতগুলো যে কথা বললুম তা আমার মনের প্রচ্ছন্ন কবিত্বের বড়াই করবার জন্যে নয়। আমি মধ্যবিত্ত মানুষ, মধ্যতার শ্লথ স্রোত থেকে মুক্তি চাই না। কবিদের আমি ভয়ের চক্ষে দেখি, প্রতিভা আমার বিচারে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। তাও আবার অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগীদের সংস্পর্শে আমার মতো সুস্থ লোকও কতকটা কালো বাষ্প দেখে কোনো অনাদ্যন্তা ষোড়শীর কাজল-নয়ন ব'লে ভেবে বসে। সে যাই হোক্, আমি আত্মকাহিনী বলতে বসিনি। বর্ষাকালে বহির্জগতের সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেত, এ-কথা সহসা শুনলে তোমরা স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে পারো, সেইজন্যেই এই দীর্ঘ সূচনার অবতারণা।

সংসারের সাথে, সমাজের সাথে, শহরের সাথে কোনোদিনই আমাব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই। তবে যাও-বা একটু আছে, সেটুকুও বর্ষার সময়ে ভিন্ন হ'য়ে যেত। পূর্বপুরুষেরা একটুখানি জমিদারি ক'রে গিয়েছিলেন, তার আয় থেকেই আমার চলত। দানাপানির খোঁজে আমায় কখনো ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয়নি। কোনোরূপ উন্নতির স্পৃহা বা প্রয়াসও আমার নেই। অতএব আমি শহরের কীসের তোয়াক্কা রাখব। আমি মামুলি মানুষ, মামুলি হ'য়েই যেন চিরকাল থাকি।

প্রতি বৎসর বর্ষার শুরুতে আমি জমিদারিতে যেতুম। তার কারণ জগতের কল্যাণচিন্তা,

মানবের কুটিলতার কথা ভাবা, জীবনের সমস্যা-পূবণ বা পরলোকের সুখান্বেষণে নয়। আমি বুঝি যা-আছে তা ভালোর জন্যেই আছে, যদিচ সে-ভালো মন্দের ভালো হ'তে পারে। কিন্তু তা নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করতে গেলে স্বচ্ছ, স্পষ্ট জিনিসও ঘুলিয়ে ওঠে। তবে জীবনের একটি পদার্থকে আমি আমার অদূরদৃষ্টির সাহায্যে কোনোদিনই তলিয়ে দেখতে পারিনি : আমার কাছে নারী একটা চিরন্তন রহস্য। সেইজন্যেই এই গল্পের সৃষ্টি। তা ক্রমশ শুনবে। এখন বলছিলুম কেন প্রতি বৎসর বর্ষাকালে জমিদারিতে যেতুম। সে শুধু তদারক করতে, কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করতে নয়। তবে বর্ষায় যেতুম, কেন-না সকলেই, আমার মতো নীরস লোকও, কাজের সঙ্গে সুখের সংমিশ্রণ করতে পারলে ছাড়ে না। আর বর্ষাকে আমি যথার্থ ভালোবাসতুম। তোমরা সকলে শহুরে, বর্ষার অসুবিধাটুকু জান, কিন্তু বাংলার শ্যামল গ্রামে তার যে নিরাবরণ সৌন্দর্যটুকু দেখতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে তোমাদের কোনো পরিচয় নেই ; এমন-কি তার ধারণাও তোমরা করতে পারো না। শুধু এটুকু বললেও বোধহয় আমার বুদ্ধির বৈধতা সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ হ'তে পারে ; কাজেই জানিয়ে রাখছি যে, আমার জমিদারি রেলপথ থেকে বহু দূরে, বর্ষাতে নদী ভরপুর হ'লে নৌকাতে যাওয়া আরামের, অন্যসময় পাল্‌কি বা অশ্ব ভিন্ন গতি নেই। শেযোক্ত দুটোই আমার শ্রমসাধ্য। তাই আমায় যেতে হ'ত বর্ষাতে।

ভূমিকার আড়ম্বরে তোমরা হয়তো মনে করছ যে আমারও বুঝি ময়নাপাড়ার মাঠে কোনো কৃষ্ণকলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, এবং তার ফলে যে কল্পনারসাত্মক অবাস্তব দিবস-কতিপয় আমি যাপন করেছিলুম, তারই ইতিহাস তোমাদের শোনাব। এ-ভুল এখানেই ভেঙে দেওয়া ভালো। আমি অনেক ময়নাপাড়ার মাঠে ঘুরেছি, কিন্তু কোথাও আলের উপরে দণ্ডায়মানা, পুব বাতাসে-বিকম্পিতা-কবরী, অনবগুণ্ঠিতা কোনো কালো পল্লীবালার কালো হরিণ-চোখ দেখে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঈশান কোণের কালো-কাজল মেখে আমার প্রাণ ভরেনি, আষাঢ় মাসের তমালবনের কালো কোমল ছায়ার স্মৃতি মনে জেগে ওঠেনি, অথবা শ্রাবণরজনীর হঠাৎ খুশি চিত্তে ঘনিয়ে আসেনি। আজ আমি তোমাদের যা-বলছি তার মধ্যে রোমান্সের কোনো ঝঙ্কার তোমরা শুনতে পাবে না। এ শুধু এক তুচ্ছ নারীজীবনের অব্যর্থ নিয়তি—একটি সামান্য বিবাহের ইতিহাস মাত্র। এ যে-রমণীর গল্প সে কবির সঙ্গে যে-কিশোরীদের মাঠের মাঝে দেখা হয় সে-শ্রেণীরই নয়। তার সম্বন্ধে কোনো অনবতুল খণ্ডকাব্য রচিত হয়নি ; সে কোনো প্রতিভাবানের হৃদয়ে রেখাপাত করতে পারেনি ; তাকে হয়তো আমি ছাড়া জগতে আর কারুর মনে নেই। আমারও আছে সে তাকে ভালোবেসেছিলুম ব'লে নয়, সে শুধু তার স্মৃতির সঙ্গে একটা কুটিল সমস্যা, একটা জটিল রহস্য জড়িত আছে ব'লে!

আমার নায়িকা এমন-কি কোনো সরলা, বিভ্রমহীনা, সহজসুন্দরী পল্লীবালিকাও নয়। সে আধুনিক শিক্ষার দূষিত ফল, আধুনিক সভ্যতার পঙ্কজ, একটি চতুরা শহুরে মেয়ে। তার উপরে আবার রূপসী বা যোড়শীও নয়।

আমার গল্পের ধারা আমি তোমাদের জ্ঞাত ক'রে দিয়েছি ; এখনো শুনতে না-চাইলে আমায়

মানা করতে পারো। নারী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তোমরা শুনতে চাও। আগে থেকেই ব'লে রাখা ভালো, আমার জীবনে তাঁদের প্রভাব অতি অল্প। কৈশোরে কোনো বালিকাকে আমি দেবী ব'লে পূজা করিনি, যৌবনে কোনো মধ্যবয়স্কার চাতুরীজালে বদ্ধ হইনি, আর আজ বার্ধক্যে কোনো যুবতীর লীলায়িত, অর্ধমুদিত তির্যক নয়নের কৃষ্ণবহ্নিতে আমার মনে আত্মসম্ভ্রম, কুল, মান, বিচারবুদ্ধি-নাশা প্রচণ্ড দাবানলও জ্ব'লে ওঠেনি। প্রণয় জিনিসটাকে আমি কবিকল্পনা ব'লে ভাবি। ওটা সভ্যতা-জাত একটা ব্যাধি, যেমন nervous breakdown, delirium tremens ইত্যাদি। আদিম মানবের হৃদয়ে অনুরাগের স্থান ছিল না, ছিল শুধু আসক্তির, যেটা স্বভাবসিদ্ধ। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আমি একটি রমণীকে কতকটা চিনেছি, সে হচ্ছে আমার স্ত্রী। অপর দু-একজন স্ত্রীলোককে জানি বটে, কিন্তু সে-পরিচয় শুধু মৌখিক, বাহ্যিক, অনেকটা প্রতিবেশীদের বাড়ি চেনার মতো অনেক পথ ঘুরে যখন অজান্তে আমাদের নিজের রাস্তায় এসে পড়ি, তখন যেমন প্রতিবেশীর গৃহখানি দেখলে হঠাৎ বুঝতে পারি ভদ্রাসনের সন্নিধানে এসে পড়েছি, তেমনি দশজনের মাঝে এঁদের দেখলে কথা ক'য়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার আনন্দে প্রাণ ভ'রে ওঠে। তার বেশি কিছু নয়। অতএব তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা বাচালতা মাত্র। এবং নিজের স্ত্রীর রূপযৌবন নিয়ে হাটের মাঝে আলোচনা করা শুধু কুরুচি নয়, সেই গতগৌরবের অস্তিত্ব-সুদ্ধ আজ মন থেকে লোপ পেয়েছে। তাঁর সঙ্গে একত্রে এতদিন বাস ক'রে একটা নির্ভরতার একটা সখ্যের সৃজন হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নারীত্বটা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। আর *উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম?* সে তো শুধু একখানি পুস্তকের শিরোনাম মাত্র। কাজেই মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু আমায় বলতে হ'লে মায়া ছাড়া আমার আর গতি নেই। মায়াকে একদিন রমণী ব'লে তো জেনেইছিলুম, এমন-কি তার মনের কতকাংশও বুঝেছি ব'লে তখন একটা গর্ব অনুভব করতুম। সে-দম্ভ আজ নেই, সত্য, কিন্তু তখনো মনস্তত্ত্বে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি পেয়েছিলুম, তার স্বর্ণ-স্মৃতি মলিন হয়নি। পরে অনেকবার দেখেছি মনস্তত্ত্বে সুবর্ণপদক পেলেও রমণীদের মনোজগতের শাশ্বত কুহেলি কাটানো কিছুমাত্র সহজ হয় না। সে যাই হোক্, মায়ার কথাই আজ তোমাদের শোনাব, কেন-না আমার সহধর্মিণীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে আমি মায়াকেই কতক-কতক চিনি। সম্পূর্ণ যে জানি না, তার জন্যে দোষ তার বা আমার কারোরই নয়, কারণ মায়া তো চিরদিনই রহস্যময়ী।

অনেক কথা বললুম কিন্তু আমার আখ্যায়িকার শুরুও হয়নি। বার্ধক্য যখন ঘনিয়ে আসে তখন কথা বলার ইচ্ছাটা অত্যধিক বেড়ে যায়! এর কারণ আমি এতদিনে স্থির করেছি, মরণের অগ্রদূত যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন মনে পড়ে আমাদের অসম্পূর্ণতার কথা, তখন মনে পড়ে যে জীবনের অধিকাংশই বিনা-টীকায় পশ্চাদ্‌বর্তীদের কাছে বেখাপ্পা দেখাবে। কাজেই সেই অল্প অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষ অখ্যাতকে ব্যক্ত করবার নিষ্ফল চেষ্টা করে। ফলে যে বিশ্রী সুশ্রী হ'য়ে ওঠে, বা অস্পষ্ট সুস্পষ্ট হ'য়ে যায়, তা নয়, কিন্তু শ্রোতাদের ধৈর্য, পারিপার্শ্বিকদের তিতিক্ষা যে ক্ষয় হ'য়ে যায় তাতে আর সন্দেহ নেই। আশা করি জরার প্রকৃতিগত বাগ্‌বহুলতা তোমরা অন্তত মাফ্ করতে পারবে।

[অসম্পূর্ণ]

[নামহীন গল্প ৩]

বর্ষাকে আমি ভালোবাসি, চিরদিনই ভালোবাসি। কিন্তু সে-ভালোবাসা কৈশোরিক, কামুকের নয়। তাতে নেই বাসনার দহন, সংরাগের উৎকণ্ঠা, অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। শুধু নামটুকু শুনেই তার শিহরণ জাগে, শুধু দূর থেকে দেখেই সে সার্থকতা পায়, শুধু বিনিদ্র ধ্যানেই তার তৃষ্ণা মেটে। তার স্বর্গ স্বার্থত্যাগ, তার নরক সমাপ্তির আশঙ্কায়। তার কণ্ঠ ভূতের ভয়ে রুদ্ধ হয়নি, সে সমাধিস্থ হয়েছে অনাগতের স্বপ্নে।

এই বর্ষাপ্রীতি আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ; আমার প্রথম রচনা *মেঘদূত*-এর বঙ্গানুবাদ। তার মধ্যে ঔৎকর্ষের লেশমাত্র আছে ব'লে ও-রচনাটার উল্লেখ করিনি, ওর নাম নিলুম শুধু প্রচলিত প্রবাদগুলোর ব্যর্থতা প্রমাণ করবার জন্যে। ও-লেখাটার মধ্যে যদি কোনো কেরামতি থাকে তাহ'লে তার জন্যে পিতৃদেব ধন্যবাদার্হ। সম্প্রতি পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আমার অনুবাদটার প্রথম খসড়া ও পরিণত প্রতিলিপি, দুটোই, হঠাৎ হাতে পড়ল। সে-দুটোকে পাশাপাশি দেখবার পর থেকে গাধা পিটিয়ে যে ঘোড়া করা যায়, সে-বিষয়ে আর আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে এই রূপান্তরের জন্যে যে-সোনারকাঠির প্রয়োজন, তার ওজন কিঞ্চিৎ দুর্বহ ; তার অদৃশ্য স্পর্শের চিহ্ন সম্ভবত আজও আমার মর্মে-মর্মে, মজ্জায়-মজ্জায় বর্তমান। সেই তর্জমাটার কাঠামো তৈরি করার জন্যে সেই কাঁচাবয়সে আমাকে যত সংস্কৃত কবিতা পড়তে, যত অভিধান হাৎড়াতে, যত বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল, তার ফলে আমার লেখাপড়ার পাট যে চিরজীবনের মতো উঠে যায়নি, স্বভাবের সঙ্গে যে আমার জন্মের মতো মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়নি, সেটাই আশ্চর্য, উল্টোটা স্বাভাবিক। শুনেছি, বর্ষার দিনে কবির বিরহী হৃদয়ে ব্যাহত অলকার স্মরণ জাগে, চিরনবীনের সবুজ প্রাণ মানসীর প্রেমাশ্রু-সিঞ্চনে অবুঝ হ'য়ে ওঠে, স্রষ্টার সংযত মনে সৌধনির্মাণের প্রেরণা আসে ; আমি কিন্তু বর্ষার ভিতরে একটা প্রগাঢ় শান্তি পাই। মেঘ আমার জানলায় উদ্‌বেগ নিয়ে উপস্থিত হয় না, নিয়ে আসে ছুটির আশ্বাস, লোকের সঙ্গে দেখা না-করার অছিলা, দিবানিদ্রার মার্জনা। বর্ষার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যে আমার তার সঙ্গে মাখামাখির দরকার হয় না, তার সৌন্দর্য আমি চোখে-চোখেই গ্রহণ করতে পারি। বন্ধুবান্ধবেরা বলেন, আমার অন্তর্দৃষ্টি জলাতঙ্কেরই নামান্তর মাত্র। আমি তাঁদের পরিহাসে ধৈর্য হারাই না, এ-রোগের দায় তো আমার নয়, পিতৃদেবের।

জীবদ্দশায় পিতৃদেব 'স্বভাবকবি' আখ্যা পেয়েছিলেন। এই উপাধির যোগ্যাযোগ্যতা

নির্ধারণের ভার আমার উপরে নেই, তাঁর প্রতিভা, সম্ভাবনা অথবা সম্পাদনের বিচার করতে আমি অক্ষম। কারণ বাপ-মায়ের সিদ্ধির সঙ্গে তাঁদের সন্তান-সন্ততির পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ যে তাতে ক'রে অল্প-বিস্তর অবজ্ঞার সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বিখ্যাত পিতার কৃতী পুত্রেরা সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : একদল যারা নিজেদের অক্ষমতা স্খালন করবার মানসে তাদের সফলতার প্রচ্ছন্ন দৈন্যের সন্ধানে জীবন অতিবাহিত করে ; অপরদল যারা নিজেদের প্রসিদ্ধিকে প্রসিদ্ধতর ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে তাদের দুর্বলতাগুলোকে বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জন দেয়, তাদের সাধনার নাম-সুদ্ধ নিতে চায় না। প্রথম দল পিতাকে উপলক্ষ ক'রে আত্মজীবনী লেখে, পিতার অকৃতকার্যতার দায় চাপায় অননুভূত প্রতিকূল প্রতিবেশের উপরে, পিতার রচনার নগণ্যতাকে রচয়িতারও কল্পনাতীত অর্থের গৌরবে অবিনশ্বর ক'রে তোলবার প্রয়াস পায়। দ্বিতীয় দল করে বিদ্রোহের অভিনয়, প্রাচীনের শত্রুতা, অক্ষমের বিনাশ ; তাদের দীপ্ত কৃপাণে কিন্তু রক্তের কলঙ্ক দেখতে পাওয়া যায় না, কেন-না সে-খড়্গের আস্ফালন শুধু মড়ার উপরে : তাদের জনক যদি সম্পূর্ণ নির্মলও হন, তবুও শুধু কেবল পুরাতন ব'লেই তিনি অপরাধী। সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বভাবটা অভাবাত্মক, কাজেই কৈফিয়তের ধার আমি ধারি না। উপরন্তু আমার শৈশব-সুখ্যাতির সিংহাসন নিয়ে এত অসুরে এত কাড়াকাড়ি করেছে যে সে-ধ্বংসাবশিষ্ট বাঁচানোর জন্যে পিতৃদেবের পঞ্জরাস্থিতে বজ্র নির্মাণ করা আজ নিতান্তই অনাবশ্যক। অতএব তাঁর লৌকিক প্রতিপত্তির কম-বেশিতে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। তবে এটা জানি—না-জানলে এই পঞ্চাশবর্ষব্যাপী সংসারযাত্রা ব্যর্থ হ'ত — টা জানি যে যোগ্যতা ওজন ক'রে মানুষকে সুনাম অথবা কুনাম কখনো দেওয়া হয় না। সেটা নির্ভর করে সাময়িক সমালোচকের খেয়ালের পক্ষপাতের বা অজ্ঞতার উপরে। এবং আমরা যারা পরে আসি, তারাও এই অবিচারের প্রতিকার করতে অক্ষম, কেন-না শ্রদ্ধা কিংবা ঘৃণা দিয়ে আমরা অতীতের স্মৃতিতর্পণ করতে পারি। কিন্তু আমাদের সহানুভূতি-সমকক্ষতাতে সে চিরবঞ্চিত। বর্তমানের দাবী মিটানোর পরে অতীতের প্রাপ্য অতীতকে ফিরিয়ে দিতে পাবে, এমন ঐশ্বর্য মানুষের নেই। তাই পিতৃদেবের পুরানো প্রতিষ্ঠা আমি নিশ্চিন্ত মনে ধ'রে নিয়েছি, তাঁর লেখা কখনো প'ড়ে দেখিনি সে-প্রসিদ্ধি অপাত্রে দেওয়া হয়েছিল কি-না। তাছাড়া আমি তাঁর কাছে সব হিসাবেই কৃতজ্ঞ ; এই নিশ্চেষ্ট প্রতিদানেই আমার বিবেক যদি সন্তুষ্ট হয়, তো বেশি খরচ করার কোনো সার্থকতা দেখি না।

সে যাই হোক্, পিতা ছিলেন স্বভাবকবি, অন্তত সাধারণের মতে। সচরাচর আমরা 'স্বভাব' বলতে 'সহজ' বুঝে থাকি। আমরা সেই কবিকে স্বভাবকবি বলি যার কবিতার মূল প্রেরণা মানুষের অবিকৃত আদিমতা, ধারাবাহিক ভাব আর প্রথাগত নিশ্চিন্ততা। কিন্তু যে-হেঁয়ালিকার আমাদের কাছে মনোযোগ প্রার্থনা করেন, কাব্যের কথায় অলস চিন্তার ঘুম ভাঙান, অস্ফুটকে অনন্যসাধারণ ব্যঞ্জনার ভিতরে বাঁধতে চান, সে-জাদুকরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকলেও আস্থা নেই, ঘনিষ্ঠতা না-থাকলেও অবজ্ঞা আছে। উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে হয়তো কেউ আমার বিখ্যাত স্বদেশ-বিদ্বেষের ছায়া দেখতে পারেন। সেই ভয়ে ব'লে রাখছি যে স্বদেশপ্রেমই আমার এ-বিশ্বাসের জন্মদাতা। যাদের পূর্বপুরুষেরা জীবনের

জটিলতম সমস্যার সমাধান করত মনীষার দ্বারায় নয়, অন্বেষণের দ্বারায় নয়, নাস্তিগর্ভ সমাধির দ্বারায় লক্ষ্যহীন দিব্যদৃষ্টির দ্বারায়, তাদের সঙ্গে সচিন্ত্য আত্মবিশ্লেষণের বিবাদ থাকাটাই স্বভাবসিদ্ধ।

পিতৃদেবের কবিতায় উপরোক্ত সহজ প্রাঞ্জলতা আছে কি-না বলতে পারি না। তবে স্বভাবকে তিনি সত্যই ভালোবাসতেন। এখানে অবশ্য স্বভাব প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করলুম। তাঁর প্রাণে ছিল নবদূর্বাদলের শ্যামলিমা, তাঁর কপালে স্তব্ধ তুষারের শান্তি, তাঁর চিন্তায় সূর্যাস্তের সংরক্ত আবির, তাঁর হৃদয়ে বিরাট আকাশের উদারতা। তাঁর মনোগঠনে পাশ্চাত্য স্বভাববাদের করচিহ্ন খুঁজে বার করা কঠিন নয়। রুসোর এই শিষ্য সভ্যতার সমস্ত ব্যাধির জন্যে একই মহৌষধের ব্যবস্থা দিতেন, যার নাম প্রকৃতির অঙ্কে পুনরাবর্তন। মানুষকে যে মানুষেই খর্ব করেছে, সে-সত্য সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই পদাঙ্কচারীর অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই আরাম-শায়িত বিপ্লবপন্থীর মন সমাজের দণ্ডনীতিকে অনিষ্টের মূলাধার ব'লে চিনেছিল, স্বভাবের নির্নিয়মকে শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা ব'লে [মনে] করেছিল। এবং অবিচ্ছিন্ন শান্তি-সমৃদ্ধির কৃপায় পিতৃদেবকে, জীবদ্দশায়, এই মতের সংস্কার করতে হয়নি।

এই মনোভাব নিয়ে মানুষ সমাজ-সংস্কারক, বিদ্রোহের পরিচালক এমন-কি সুকবিও হ'তে পারেন ; এ-কথাও মানতে প্রস্তুত আছি, যে স্বভাববাদ অটুট ও আন্তরিক বন্ধুত্বের প্রধান সহায়। কিন্তু অভিভাবকদের হৃদয়ে ওই মহানুপ্রেরণায় পরিপ্লুত হ'লে, অধীনস্তদের ভাগ্যকে সু-আখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। উদারপন্থার সার্থকতা আসে তখন, সঙ্কীর্ণ পন্থায় স্খলিত হবার সম্ভাবনা যখন থাকে প্রতি পদে বর্তমান। মৃত্যু শিয়রে এসে না-দাঁড়ালে জীবনের মধুরতা অনুভূত হয় না, মুক্তি বন্দিদেরই অর্চনীয়, বাসনার তীব্রতা বিরহের মধ্যেই বোঝা যায়। শান্তি সবসময়ে পর্যুপ্তির পৃষ্ঠপোষক নয়। স্বর্গের আভ্যন্তরিক পলিটিক্‌সে যাঁর এক রতি ব্যুৎপত্তিও আছে তিনি কামধেনুকে দৈহিক স্বাস্থ্যের আকর ব'লে ভাবলেও, মানসিক স্বাস্থ্যের আকর ব'লে কখনোই ভাবতে পারেন না। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, দাঁতের মর্যাদা দাঁত হারালেই বোঝা যায়।

পিতৃদেব বিশ্বাস করতেন যে শিশু প্রৌঢ়ের জনক। কাজেই আমার সমস্ত আবদারের প্রতিই তাঁর ছিল সমান অনুকম্পা, অসামান্য ধৈর্য। তিনি আমার এষণাগুলোকে শুধু জাগিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদের পাদচারণের জন্যে অসংখ্য পথ নিষ্কণ্ঠক ক'রে রেখেছিলেন। ফলে জীবনে সহস্রপথে ঘুরেছি বটে কিন্তু কোনোটারই অন্ত দেখিনি, প্রথম বাধাতেই পিছু হটেছি, প্রথম কাঁটাতেই মূর্ছিত হয়েছি। অবশেষে আজ আমার চলার পাট একেবারেই বন্ধ হয়েছে, আমার দেহ পঙ্গু না-হ'লেও, আমার মনের পক্ষাঘাত ঘটেছে। সেইজন্যেই আমার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিবিড়তা নেই, আমার মুষ্টি লোলুপ হ'লেও শিথিল, আমার সম্ভাবনা অনন্ত কিন্তু সম্পাদন নগণ্য, এবং একাগ্রতাই যদি মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচায়ক হয়, তাহ'লে আমায় মানুষ ব'লে বিবেচনা করা একটু শক্ত।

যতটা লিখেছি প'ড়ে দেখলুম ; মনে হ'ল কথাগুলোর মধ্যে যেন একটা অনুযোগের সুর রয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পিতৃদেবের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। ঘোড়া

ছুটলে যেমন চাবুকের অভাব হয় না, তেমনি আমার মনের মধ্যে যদি সত্যই মহত্ত্ব থাকত —তা যতই অসংহত আকারে হোক্—তাহ'লে তাকে গ'ড়ে-পিটে নেবার মানুষ মিলত নিশ্চয়ই। জাতীয় জীবনেই বলো, আর মানুষের জীবনেই বলো, আমি দেখেছি laissez-faire-এর পরমশত্রু যথেষ্ট-প্রবর্ততার আজন্ম নিন্দুক তারাই যারা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে অক্ষম, সংসারের ইষ্টানিষ্টের মাঝে যাদের অবস্থা বেণু-বনে অন্ধ ডোমের অবস্থারই তুল্য। উপরন্তু সাঁতার শেখার দুটো উপায় আছে : একটি হচ্ছে শিক্ষার্থীকে ডুব-জলে এনে ছেড়ে দেওয়া, অপরটি আনাড়িকে শূন্য কলসীর সাহায্যে ভাসিয়ে রাখা। প্রথমটিকে দুর্ঘটনাহীন বলা না-চললেও, ওর কল্যাণে যার সাঁতার শেখবার সে একপেট জল খাবার সঙ্গে-সঙ্গেই হস্তক্ষেপণের কৌশলটা আয়ত্ত ক'রে নেয়, আর জীবনে ভোলে না। শেষোক্ত উপায়ের ফলে বিপদাপদের সম্ভাবনা অল্প বটে কিন্তু সাঁতার শেখার সম্ভাবনাও তথৈবচ। তা ছাড়া বানের জলে ভেসে যায় নির্ভরাবলম্বীরাই বেশি, এবং একদিন-না-একদিন তাদের সহায়গুলি যখন কাটে, তখন সে-সর্বনাশ এমন জায়গায় ঘটে যেখানে কোনো দরদীরই হাত বাড়াবার সাধ্য থাকে না। যোজনব্যাপী যোজক পেরিয়ে কাম্যের সমীপস্থ হ'তে না-পারলেও, আজও যে আমি ভাঁটার টানে ভেসে যাইনি, সেটাই পিতৃদেবের শিক্ষার সার্থকতা।

[অসম্পূর্ণ]

ফাঁকি

আমার তখন বাইশ কি তেইশ বছর বয়স হবে। সবে পরীক্ষাশুমারের বোঝা নামিয়ে উদাসীন-শোভিত শির আকাশে তুলে সগর্বে বেড়াবার সুখ অনুভব করছি। মুক্তির আস্বাদ পেয়ে চারদিকে মুক্তির সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। পাশ্চাত্যের প্রদর্শিত প্রতীতিসমূহের উদ্দীপনায় আমার মন তখন উদ্ভাসিত; বিয়েটা একটা কুসংস্কার ভীতির জিনিষ বলেই জ্ঞান করতাম। তাই যখন ঘটক প্রভুদের গমনাগমন সুরু হল, তখন আতঙ্কে আমি শিহরিত হলাম। আমার নবার্জ্জিত স্বাধীনতা বেশী দিন টিকলনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল বোঝা নামতে না নামতে আর এক যে ভার আমার মাথায় এসে চাপল, তা কোমল হলেও দুর্ব্বহ।

বাবা একদিন ডেকে বললেন, "মিত্তিরদের বাড়ীতে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে; সেখানে তোকে বিয়ে করতে হবে।" শুনেইত আমার আত্মারাম, ওই আত্মাটুকু বিয়োগ করলে যে পাখীটি অবশিষ্ট থাকে তার মত ডানা ঝটপট করে, উড়ে পালাবার নিষ্ফল প্রয়াসে ভয়াকুল হিয়াকে কিছু পরিমাণে সংযত করে কষ্ট হাসি হেসে আমি বললাম, "আজ্ঞে—এঁ-এঁ-এঁ-,—অ্যা—উম্—এখন যদি—হুম—এখন যদি দিনকতকের জন্য অন্ততঃ এ বিষয় চিন্তা না করেন......তো ভাল হয়।"

"কেন, বউ রাখতে পারবি কি দুঃখে? না ও সব হবেনা; আগামী বৈশাখেই একরকম ঠিক করেছি।"

"আজ্ঞে আমার ইচ্ছা, উপার্জ্জনক্ষম হয়ে তবে—"

"উপার্জ্জন-ক্ষম হবে? কেন, আমার কি এমন সঙ্গতি নেই যে তোর স্ত্রীকে প্রতিপালন করি। সাতবার জন্মে তোমার মত উপায় করে দিতে দেখি। উপার্জ্জনক্ষম!"

"আজ্ঞে, আমিও ঠিক সেই কথা ভাবি বলেই বলছি; শেষে কি ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।"

"এ কি চাষার কথা হল? জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। একটা মেয়ে মানুষ কি হাতী যে খেয়ে খেয়ে দেউলে করে দেবে। তোর নিজের নবাবীর পয়সা

'ফাঁকি' গল্পের তোলাপাঠ।

'খামখা খুশি' গল্পের খসড়া।

[নামহীন গল্প ৪]

নিঃশব্দ পদচালনে রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে, অতি সন্তর্পণে, বিনা-আওয়াজে, দরজাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রাচীন কবাট, বয়স বাড়ার সঙ্গে তার সহনশীলতা গিয়েছিল ক'মে, এবং সমস্ত গতিবিধির উপর জন্মেছিল একটা তীব্র বিতৃষ্ণা। সেইজন্যে রমেশের যৌবনজনিত অস্থৈর্য্য, তাকে নিয়ে রাতদিন নাড়াচাড়া, তার বড়ই অপছন্দ। রমেশের স্পর্শমাত্র সে সইতে পারলেনা, ভাঙা গলায় অস্পষ্ট প্রতিবাদ ক'রে উঠল। রমেশের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল, যেন সে ক্ষমাতীত অপরাধী। সে খানিকক্ষণ দরজার পাশে সতর্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু যখন দেখলে গৃহখানি পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ, তখন হাঁপ ছেড়ে, একখানা প্রকাণ্ড ইজিচেয়ার অবলীলাক্রমে নীরবে উঠিয়ে এনে বারান্দার ধারে ব'সে, একটা সিগারেট জ্বালালে। মুহূর্ত-মধ্যেই তার চোখ হ'ল দৃষ্টিহারা, আর তার মন চলল অতীতের কোন্ পলাতকার পশ্চাতে, তা সেই জানে। অভুঞ্জিত সিগারেটের আগুন যখন ক্রমশ তার তর্জনী এবং মধ্যমার মধ্যে এসে পৌঁছুল, তখন তার ধ্যান ভাঙল। ওষ্ঠাগ্রে যে রূঢ় কথাগুলো ছুটে এসেছিল, সেগুলোকে সবলে সংযত ক'রে, সিগারেটের ক্ষুদ্রাংশটা ফেলে দিয়ে রমেশ আবার সীমাশূন্য শূন্যতার পানে তাকিয়ে আত্মহারা হ'য়ে গেল।

গত তিন-চার বৎসর থেকে রমেশের মধ্যে এমনি একটা কঠিন সংযম পরিলক্ষিত হ'ত, যেন সে সবসময়ই লাগাম সজোরে টেনে আছে। এখন আর তার মুখে কথা শোনা যেত না, তার শরীরে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র ধরা পড়ত না, তার গতিবিধি সমস্তই নিঃশব্দ, মন্থর, সংযত। তবে তার মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু এ-কথা যদি সত্য হয় যে, চক্ষু হচ্ছে মনের গবাক্ষ, তা হ'লে, বলতে হবে যে তার অন্তঃকরণ সততই শাম্য, শান্ত থাকত না। মাঝে-মাঝে তার নয়ন কীসের একটা নির্বাক ভর্ৎসনায়, একটা অকারণ, অনামা অসন্তোষে ভ'রে যেত, যদিও তা পলকের।

[নামহীন গল্প ৫]

গোবিন্দপুরের জমিদার বংশের রায়-গোষ্ঠীর লুপ্তশ্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন অনাথ রায়। তিনি ছিলেন অদ্ভুত লোক। তাঁর দুর্দান্ত প্রতাপে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। ফলত লোকে বলত, তিনি দৈবজাত। তাঁর নামে কাঁপত সকলেই। কেবল ছোটো শরিকের অনাদিবাবুর বৈঠকখানায় সান্ধ্য-সিদ্ধির মাত্রাটা যেদিন একটু বেশি হ'য়ে যেত, অর্ধনিমীলিত নয়নপল্লবের কোণ থেকে রক্ত-কটাক্ষ হেনে বাল্যবন্ধু শ্যামাপদর কানে তিনি গদগদ স্বরে বলতেন, 'বুঝলি শ্যামা, জারজ, জারজ, একেবারে জারজ।' কিন্তু নেশার খেয়ালে উচ্চারিত কুৎসার উপরে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করতে পারে না ; আর গোবিন্দপুর গ্রামের বিশিষ্টতাই ছিল ধর্মপ্রাণতা। উপরন্তু সেখানে অনেকদিন থেকে একটা কিংবদন্তি চ'লে আসছে যে বড়ো এবং ছোটো তরফের মধ্যে মনান্তরের কারণ পাঁচু মোড়লের তৃতীয় পক্ষের ষোড়শী স্ত্রী। হরিপূজারী অবগুণ্ঠিতা যজমান-পত্নীদের মহলে নস্যরুদ্ধ স্বরে যে অমোঘ বেদুক্তিটির পুনরাবৃত্তি করতে ভালোবাসত সেটা চিরসত্য : 'রমণী প্রলয়ঙ্করী'। তারপরে আবার অনাদিবাবুকে নিরপেক্ষ বিচারক বলা চলে না। সকলেই জানে পিত্রান্তরজ অনাথ রায় অন্তিম মুহূর্তে আবির্ভূত না-হ'লে অত বড়ো বিষয়টা আসত অনাদিবাবুরই ভাগে। অপরপক্ষ হ'তে এটাও স্বীকার্য যে পাঁচু মোড়লের নবীনা স্ত্রী অনেকদিন হ'ল প্রবীণা হ'য়ে কুম্ভীপাকে প্রস্থান করেছেন, এবং অনাদি রায়ের জন্ম সত্যই রহস্যবিজড়িত।

রায় বংশের প্রতিপত্তির আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে। একদিন প্রত্যূষে গ্রামের দরিদ্রতম পণ্ডিত জগন্নাথ বাচস্পতির পর্ণকুটিরে লক্ষ্মীদেবী দুইটি মোগলযোদ্ধৃর বেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সমাপ্ত-প্রায় জীবনের নেশা এবং পেশা ছিল ন্যায়শাস্ত্র। তাঁর জাতিজ্ঞান এইজন্যেই সম্ভবত কিছু শিথিল ছিল। সেই দুটি দাউদ-লাঞ্ছিত মোগল কুলতিলককে গৃহে আশ্রয় দিতে তিনি কুণ্ঠা করেননি। দাউদের অনুচরেরা এ-কথা মোটেই ভাবতে পারেনি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে খুঁজলে সেই দুটি মহামূল্য শিকার পাওয়া যাবে।

তাদের দিল্লি ফিরতে-ফিরতে বঙ্গ-বিজয় খতম হ'য়ে গেল। ফলত বিচক্ষণ আকবরের কাছ থেকে তাদের বীরত্বের সংবর্ধনা-স্বরূপ তারা পেলে শৌর্যের পদক, এবং তাঁর অতিথি-বাৎসল্যের পারিতোষিক হিসাবে বাচস্পতি পেলেন গোবিন্দপুরের পারিপার্শ্বিক যত জায়গীর। শুনা যায়, পণ্ডিত মহাশয় এই আকস্মিক শুভাদৃষ্টকে কোনোদিন নিজের প্রাপ্য

ব'লে ভাবতে পারেননি। আর্তের তারণ তাঁর চোখে একটা বিশেষ প্রশংসনীয় গুণ ব'লে লাগত না। তিনি জানতেন ওটা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত একটা কর্তব্য মাত্র, অতএব বিনা-লোভে পালনীয়। সেইজন্যে এই প্রভূত সম্পত্তির আয় তিনি সাধারণের কল্যাণকার্যেই ব্যয়িত করতেন। গোবিন্দপুরের সমৃদ্ধির স্রষ্টা তিনিই। অর্থ সম্বন্ধে জগন্নাথের এই অত্যন্ত আধুনিক ধারণাগুলি যদিও তাঁর পুত্র-কলত্রদের মধ্যে প্রবাহিত হয়নি, তবুও তাঁর জনহিতকর আদর্শ রায় বংশে পুরুষানুক্রমে চ'লে আসছিল। তাঁর পরবর্তীদের বিষয়ে অধিক কিছু বলবার নেই। পাণ্ডিত্যে ও অমায়িকতায় তাঁরা কেউই বংশ-প্রতিষ্ঠাতার সমকক্ষ হ'তে পারেননি। তাঁরা সকলেই সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, এবং সকলেই প্রায় অনুরূপ, শুধু এই পার্থক্যটুকু বাদে যে, কালের গতির সঙ্গে তাঁদের বংশাভিমান বেড়ে চলেছিল। তাঁরা জন্মাতেন, শ্রেষ্ঠ কুলীনের ঘরে কন্যা আদান-প্রদান করতেন এবং নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত সময়ে বৈকুণ্ঠবাসে যেতেন। আভিজাত্যের খাতিরে হয়তো-বা রায় বংশের বুদ্ধিমত্তাও তাঁদের বাহ্যিক সত্তার সঙ্গে পাল্লা রেখে কিঞ্চিৎ খর্ব হ'য়ে যাচ্ছিল। এছাড়া তাঁরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় রক্ষণশীল, অতিথি ও স্বজন-বৎসল এবং কূপমণ্ডূক ছিলেন। এ-সব গুণের জন্যেই রাজা এবং সময় পরিবর্তনেও তাঁরা সমানভাবে আদৃত হ'য়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকিরণেও বাদশাহি আমলের সায়াহ্নচ্ছটার গোলাপি আমেজেই বদ্ধমূল রয়েছিলেন।

এই লক্ষ্মীর পীঠস্থলে অলক্ষ্মী আশ্রয় নিলেন অনাথের সর্ববাদীসম্মত পিতা কালীচরণের সময়ে। তাঁর আমলেই এতকালের অবিচ্ছিন্ন পারিবারিক নির্বিরোধের মধ্যে প্রবেশ করলে অন্তর্বিবাদ। কালীচরণের দেহে গোষ্ঠীগত গুণগুলি আতিশয্য-দোষে দুষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি এত শান্তিপ্রিয় ছিলেন যে অশান্তি হ'তে আত্মরক্ষায় সতত ব্যস্ত থেকে একদিনের জন্যেও তিনি শান্তি পাননি ; তাঁর আতিথেয়তা এমন বিশ্বব্যাপী ছিল যে তাঁর উন্মুখ[ক্ত] দ্বারে সমাগত বিভিন্ন শ্রেণীর অতিথিরা একইরকম আদর পেয়ে তাদের ক্ষুণ্ণ পদমর্যাদা পরিচর্যা করতে-করতে সেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ছেড়ে পালাত ; তাঁর স্বজন-বাৎসল্যের ফলে তাঁর ভ্রাতা পার্বতীচরণ বিষয়সম্পত্তি ভাগ ক'রে নিয়ে অন্যত্রে চ'লে গেল ; তাঁর রক্ষণশীলতার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পারিবারিক ঐক্য শতধা হ'ল। অল্পকথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন সহৃদয়, সদাচারী, অল্পবুদ্ধি এবং গৃহিণীচরণাশ্রিত।

বংশগৌরবের খাতিরে কালীচরণকে দরিদ্রের ঘরে বিবাহ করতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী ছিলেন মূর্তিমতী কৌলীন্য ; তাঁর দেহ তেমনি বিশুষ্ক, তেমনি কুশ্রী, তাঁর মন তেমনি পঙ্গু, তেমনি জরাজীর্ণ, আর তাঁর হাত যুগ-যুগান্তের গমনে ক্রমশ আড়ষ্ট হ'তে-হ'তে, শেষকালে একদম বদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই ব'লে তাঁকে নির্বোধ বলা সাজে না। তিনি অন্য কিছু বুঝুন বা না-বুঝুন রায় বংশের বড়ো বধূর কী প্রাপ্য, কী স্বার্থ, কী কর্তব্য, সেগুলো খুব ভালো ক'রেই বুঝতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জগতের নিয়ম হচ্ছে, 'বিষমপ্যমৃতিম্ কচিদ্ ভবেৎ, অমৃতম্ বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া'। তাঁর লাভ অপরের লোকসান। কাজেই তিনি গোবিন্দপুরে জনপ্রিয় হ'তে পারেননি। তাতে কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষতি ছিল না। কারণ তাঁর স্বামী যে তাঁর চির-অনুগত। ফলত স্ত্রীকে তুষ্ট করতে গিয়ে কালীচরণ ভ্রাতাকে রুষ্ট করলেন।

এত ঐশ্বর্যেও কৃষ্ণভামিনীর একটা দুঃখ মিটেনি। এতদিনেও এই সম্পত্তি ভোগ করবার জন্যে একটি উত্তরাধিকারীকে তিনি জন্ম দিতে পারলেন না। এতটা সম্পত্তি যে তাঁর দেবরের করগত হবে, এই দুশ্চিন্তায় মাঝে-মাঝে তাঁর কালীচরণ-ভুজবদ্ধ নিদ্রাও ভেঙে যেত। তিনি মুখে বলতেন যে পার্বতী যদি একটু মানুষের মতো মানুষ হ'ত তাহ'লে তাঁর কোনোই খেদ থাকত না, কিন্তু তাঁর ব্যর্থতার জন্যে মনে-মনে যে তিনি পার্বতীচরণকেই দুষতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেন-না ওই হতভাগা দেবরের জন্যেই কালীচরণ কোনোদিন পুত্রের অভাব উপলব্ধি করেননি। দুই ভাইয়ের মধ্যে বয়সের এতটা পার্থক্য ছিল যে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ভ্রাতৃজনোচিত না-হ'য়ে পিতা-পুত্রের মতোই হয়েছিল। পার্বতী স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খল। সে জানত যে তার যদৃচ্ছায় বাধা দিতে তার দাদা অক্ষম—অক্ষম শক্তির অভাবে নয়, স্নেহের আধিক্যে। সে জমিদারের ছেলে, পরের বাড়ির একটা মেয়ে তার স্বেচ্ছাচারে বাধা দেবে, সে তা কেমন ক'রে সইবে। কৃষ্ণভামিনীর পক্ষ থেকে এই বলা চলে যে তাঁর সর্বতোমুখী প্রভাব ওই একটি দুগ্ধপোষ্যের কাছে খর্ব হবে, তা তিনিই-বা কেমন ক'রে বরদাস্ত করবেন। অতএব দেবর ও বৌদিদিতে একটা তুমুল গূঢ় দ্বন্দ্ব চলতে লাগল, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেচারা কালীচরণ ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই অন্তর্দাহটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল পার্বতীচরণের বিবাহের প্রসঙ্গে। কৃষ্ণভামিনী কালীচরণকে বোঝালেন যে পার্বতীর অবিলম্বে বিয়ে দেওয়া দরকার এবং সে-বিয়ে কৃষ্ণভামিনীরই এক দূর-সম্পর্কীয়া জ্ঞাতির সঙ্গে। বিবাহের প্রয়োজনীয়তার প্রকাশ্য কারণ হচ্ছে পার্বতীর জাত যাওয়ার ভয়। পার্বতী কিছুদিন থেকে ধ'রে বসেছিল যে সে কলকাতায় যাবে। দাদা তাতে মৌখিক অমত করেছিলেন বটে কিন্তু মনে-মনে আশু ভ্রাতৃবিচ্ছেদে ক্ষুণ্ণ হ'লেও তার আবদারটাকে গর্হিত মনে করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী প্রমাদ গণলেন। সামনে থেকেই তাকে আঁটা দায়, তার উপরে যদি একবার জাল কেটে চোখের বাহিরে বেরিয়ে যায় তাহ'লে যে সর্বনাশ হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার একমাত্র উপায় ছিল সেই চিরন্তনীর শরণাপন্ন হওয়া, যাকে দিয়ে মহাঋষিদের অবধি তপোভঙ্গ হ'য়ে আসছে এবং সে-ব্রতের জন্যে এমন একটি নারী চাই যে তাঁর পদানত থাকবে। অতএব এই জ্ঞাতি-কন্যাকেই তিনি নির্বাচন করলেন। তাকে দেখতে একটু নিরেস বটে, কিন্তু চিরদারিদ্র্য থেকে হঠাৎ রাজার ঘরের বউ হওয়ার কৃতজ্ঞতা অনুভব করবার মতো লোক তো আর চট্ ক'রে মিলে না। তাই তিনি স্বামীকে জানালেন যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে এই হালফ্যাশানের কলের গাড়ি ক'রে কলকাতায় যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কালীচরণ গৃহিণীর বুদ্ধিতে চমৎকৃত হ'য়ে কৃষ্ণভামিনীর জ্ঞাতিদের সঙ্গে কথা একরকম পাকাপাকি ক'রে ফেললেন।

বিবাহ-উৎসবের আয়োজনে তাঁরা এতই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, পাত্রের মতামত জিজ্ঞাসা করতে কালীচরণ বা কৃষ্ণভামিনী কারুরই মনে রইল না। পার্বতী বসল বেঁকে। দাদা তাকে অনেক বোঝালেন, সমঝালেন, কিন্তু কিছুতেই টলাতে পারলেন না। অবশেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর পার্বতী বললে যে যদি কালীচরণ নিজে পাত্রী দেখে তাকে সুন্দরী ব'লে বিবেচনা করেন, সে তাহ'লে আর অমত করবে না। কালীচরণের তখন মনে হ'ল যে

তিনি পাত্রী দেখা তো দূরের কথা তার নাম-সুদ্ধ জানেন না। অগত্যা তাঁকে এই প্রস্তাবে রাজি হতে হ'ল। কৃষ্ণভামিনী কিন্তু এই শুনে একদম রণচণ্ডিকা হ'য়ে গেলেন। তিনি জানতেন যে একবার মেয়ে দেখলে কালীচরণের মতো অন্ধ-প্রায় মানুষও শঙ্কিত হ'য়ে যাবেন। মেয়েটির অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে খঞ্জগতিও একটি দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল। মেয়েটির কোন্ গুণ দেখে তিনি তাকে পছন্দ করেছিলেন বলা শক্ত। হয়তো তিনি জানতেন যে মেয়েটির চারিত্র্য মাধুর্যে ভরা, অথবা হয়তো আত্ম-অভিজ্ঞতার থেকে তাঁর মনে এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে, দৈব-প্রেরিত রমণীদের নির্বিচারে গ্রহণ করাই রায়েদের স্বভাব। সে যাই হোক্, বিয়ে ভেঙে দিতে হ'ল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের জন্যে তিনি পার্বতীচরণকে কোনোদিন মার্জনা করতে পারলেন না।

এরপর থেকে কৃষ্ণভামিনী ও পার্বতীচরণের মাঝে যে অচিন্তনীয় ঘৃণার বিনিময় চলতে লাগল, তাতে কালীচরণ অবাক হলেন। তাঁর অস্বাভাবিকরকমের পুরু খুলি ভেদ ক'রে ক্রমশ এই ধারণাটা আস্তে-আস্তে মাথায় প্রবেশ করতে লাগল যে ভাই এবং স্ত্রী, উভয়কে তিনি একসঙ্গে রাখতে পারবেন না। তাঁর বয়স আরেকটুখানি কম হ'লে কী হ'ত বলা যায় না। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধে পুনর্বিবাহের অশান্তিপূর্ণ উত্তেজনা, রহস্যময় অনিশ্চিততা, গুরুজন-সহায়-শূন্য পাত্রী-অন্বেষণ তাঁর মতো অবসাদ-শিথিল ব্যক্তির পক্ষে অশোভন, অবিবেচনা ও অসম্ভব স্থির ক'রে, এই অর্ধঘণ্টার একাগ্র চিন্তায় ক্লান্ত হ'য়ে তিনি অন্দরে শুতে গেলেন।

কিন্তু এখন থেকে রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটানোই বেচারা কালীচরণের ভাগ্যলিখন। কলগুঞ্জিত বাষ্পশকট পাশে নিয়ে কালীচরণের মতো শান্তিপ্রিয় লোকের ঘুম না-আসাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থে তিনি পার্বতীচরণের কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হলেন। কিন্তু তাতে ফল ফলল অভাবনীয়। এখন থেকে দিন-কতক সার্দ্র দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে বক্রনয়নের বহ্নিকণাও তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। তিনি কৃষ্ণভামিনীর পরামর্শ না-নিয়েই, তাঁকে হঠাৎ খুশি করবার সদুদ্দেশ্যে গ্রামের একটি সুন্দরীর সঙ্গে চুপি-চুপি কলকাতাতে পার্বতীর বিয়ে দেওয়ালেন। তার ফলে কৃষ্ণভামিনী নিজের শয্যার ব্যবস্থা করালেন অন্যত্রে। এতদিন এঞ্জিনের শব্দ শুনে-শুনে কালীচরণ বেচারার এমন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল যে, শয়নকক্ষের এই অনভ্যস্ত কুণ্ঠাপূর্ণ আকস্মিক স্তব্ধতা তাঁর কানে উচ্ছ্বাসধ্বনির চেয়ে আরো দুঃসহ, তাঁর প্রাণে অতন্দ্রার চেয়ে আরো ক্লেশপ্রদ ব'লে লাগতে লাগল। অবশেষে অগত্যা পার্বতীর আশৈশবের সাধ, সখের যাত্রার দল গঠন-স্বরূপ ঘুস দিতে সম্মত হ'য়ে কালীচরণ ভ্রাতাকে ফেরালেন দেশে। কিন্তু নববধূর সলাজ-নম্র রূপ-যৌবনে কৃষ্ণভামিনীর অভিশপ্ত হিয়া শীতল হওয়া দূরে থাকুক্, নরকের চিরন্তন জ্বালাতে দগ্ধ হ'তে লাগল।

এরপর থেকে রায়-পরিবারের ঐক্য হ'য়ে দাঁড়াল কিংবদন্তি। বৎসরগুলো তেমনিতরই কেটে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কলহস্বনিত দিনগুলি কালীচরণের মসৃণ কপালে পদচিহ্ন রেখে তবে চ'লে যাচ্ছিল। তাঁর ঘনশ্যাম কান্তি কোথায় উধাও হ'য়ে গেল, তাঁর চুলে পাক ধরল, তাঁর ক্ষুৎপিপাসা একটা অভ্যাস মাত্র হ'য়ে পড়ল, তাঁর সন্ধ্যার মজলিশ ভবিতব্যতার ভারে

দুঃসহ হ'য়ে দাঁড়াল। তাঁর অভীষ্ট শান্তি সে শুধু আজ স্বপ্ন, তাঁর সুখ, সে কেবল ছায়া, তাঁর সন্তুষ্টি মোহ মাত্র।

কিন্তু মরীচিকার আনন্দটুকও তাঁকে আর বেশিদিন ভোগ করতে হ'ল না। তাঁর ঘরের, তাঁর মনের, গোবিন্দপুর গ্রামের নিরিবিলি, নিশুতি কোণেও শান্তির যে অবশিষ্ট মাত্রাটুকু লুকিয়ে-চুরিয়ে অগোচর থেকে গিয়েছিল, পার্বতীর পুত্র-সম্ভাবনার সংবাদে তা-ও অবলুপ্ত হ'ল। কৃষ্ণভামিনীর হতাশা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। তার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। একবার ওই ভয়াবহ সংখ্যাটা পার হ'য়ে গেলে কালীচরণের উত্তরাধিকারী যে তাঁর গর্ভে জন্মাবে না, সে কি কম ভাবনার কথা। তাঁর জন্ম-জন্মান্তের শত্রু পার্বতীর ছেলেটাই কি শেষে তাঁর উপরে কর্তৃত্ব চালাবে। কৃষ্ণভামিনী নিজেকে অক্ষয়, অব্যয় ব'লে স্থির করেছিলেন। তিনি যে একদিন এ-সংসার ছেড়ে যাবেন শমনের ডাকে, এ-কথা পলকের জন্যেও তাঁর মনে আসত না। আহা তাঁর যখন নিজের ছেলে হবে! কৃষ্ণভামিনী ভাবতে-ভাবতে বিভোর হ'য়ে যেতেন, তাঁর ছেলে হ'লে এ-সম্পত্তির মালিক তো তিনিই। তখন আর দুর্বল কালীচরণ তাকে বাধা দিতে থাকবে না, আর তাঁর ছেলে সে যদি কোনোদিন একটু ট্যাঁ শব্দ করতে সাহস করে তাহ'লে তাকে যে কী সাজা দেবেন, কৃষ্ণভামিনী ঠিক করতে পারতেন না। কেন-না ক্রোধে তাঁর মাথা ঘুরে উঠত। কিন্তু হায় এ-সমস্তই যে স্বপ্ন। তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হ'লে, আর একমুহূর্তও দেরি করা চলবে না। কিন্তু উপায়ই-বা কী। ওঃ, ওই অপদার্থ কালীচরণটা ; তাঁর স্বামীর কথা ভাবলে ঘৃণায় কৃষ্ণভামিনীর শ্বাস রোধ হ'য়ে যেত।

ফলত এরপর থেকে কালীচরণ জীবিত রইলেন শুধু নামে। রায়-বংশের বড়োবাবু গোবিন্দপুরের জমিদার আমাদের পূর্বপরিচিত নধরকান্তি কালীচরণ অনেকদিন নরকজাত হয়েছিলেন। বৈঠকখানা-বাড়ির মধ্যে, অন্দরমহলের ভিতরে যে কালীচরণ মাঝে-মাঝে চলাফেরা ক'রে বেড়াতেন, তিনি শুধু মরণের ছায়া, তিনি কেবল জীবনের পরিহাস, তিনি একটি উদ্ধারলোভী প্রেতাত্মা মাত্র। এরপরে যা-ঘটল, এই তিনশত বৎসরের একান্নবর্তী পরিবারের অঙ্গচ্ছেদ, জমিদারির ভাগবাটোয়ারা, তিন আদালতে মামলা-মোকদ্দমা, তাব কিছুর জন্যেই তিনি বস্তুত দায়ী নন। এখন থেকে তিনি শুধু উপলক্ষ, ইংলন্ডের রাজার মতো একটা গুরুগম্ভীর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য নাম মাত্র।

এই জীবন্ত মরণের যন্ত্রণা থেকেও তাঁর মুক্তি ঘনিয়ে এল। বহু পূর্ব হ'তে মাঝে-মাঝে তাঁর হৃৎকম্প হ'ত, তাঁর বুকের সেই উপেক্ষিত ধড়ফড়ানি হঠাৎ একদিন দ্রুতবর্ধিষ্ণু পীড়া ব'লে ধরা দিলে। তখন শুরু হ'ল তাঁর চিকিৎসার ঘটা। স্বামীর মন-প্রাণ যখন আগেই মহাপ্রস্থান করেছিল, কৃষ্ণভামিনী কোনো কিছুর অভাব উপলব্ধি করেননি, কিন্তু তাঁর দেহের সঙ্গে আশু বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। গ্রাম্য চিকিৎসকের মতামত শুনে তিনি একদিন সকালে হঠাৎ সেই লুপ্ত সত্যের পুনরাবিষ্কার ক'রে ফেললেন যে হিন্দু সধবার স্বামীই হচ্ছে সর্বস্ব। তখন তাঁর দেশ-বিদেশের কোনো ডাক্তারই বাদ রইল না। তাদের পরিচর্যায় কালীচরণের কোনো উপকার হোক্ বা না-হোক্, কৃষ্ণভামিনীর অন্তর্নিহিত সততা যে গ্রামের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল তাতে আর সন্দেহ নেই। এতদিন পরে, এতকালের

বিপক্ষতার পরে, কৃষ্ণভামিনী তাঁর প্রাপ্য প্রতিপত্তি ফিরে পেলেন। গ্রামের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের সন্ধ্যার আড্ডায় সকলেই একই কথার পুনরুক্তি করতে লাগল, 'আহা, কী সতীসাধ্বী, কী পতিপ্রাণা, যেন সাক্ষাৎ সাবিত্রী গো।' বৈকুণ্ঠ ভট্‌চাজ্জি বাড়ি-বাড়ি ব'লে বেড়ালে, 'আমি তো আগে থেকেই জানি, মা আমাদের স্বয়ং লক্ষ্মী।' পাঁচু মোড়ল তার দ্বিতীয়পক্ষের নববধূকে সে-রাত্রে প্রেমসম্ভাষণ না-ক'রেই বললে, 'বড়োবাবু যেদিন মাকে বিয়ে ক'রে প্রথম গ্রামে ফিরলেন, আমার তখন একবছর বয়স, কিন্তু তখনই মায়ের মুখ দেখে আমি বুঝেছিলুম অমন রূপ মানুষের ঘরে হয় না। পাগলি, অমন রূপ মানুষের ঘরে হয় না। সে যেন সাক্ষাৎ জগদম্বা।' পঞ্চতীর্থমশাই একদিন এক শ্রাদ্ধসভায় উদ্বেগরুদ্ধ কণ্ঠে *মৎস্যপুরাণ* থেকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ক'রে দিলেন যে ঠিক ওই-সময়ে, বঙ্গদেশস্থ গোবিন্দপুর নামক এক গ্রামে রায়-পরিবারের মধ্যে স্বয়ং সতী জন্মগ্রহণ করবেন। পণ্ডিতমশাই বললেন, 'অতএব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ সনাতন এবং এইখানেই মহাত্মন্ কালিদাস সঞ্জাত হয়েছিলেন। এখানে এইটুকু বলা কর্তব্য যে *মৎস্যপুরাণ*-এ রায়-বংশের নাম রাজবংশ এবং গোবিন্দপুরের স্থানে জনার্দনপুরী শব্দের ব্যবহার আছে।' সমবেত ভদ্রলোকেরা পঞ্চতীর্থের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন। এমন-কি তিনবার এল.এ. ফেল করার গৌরব-ক্ষিপ্ত, মাইনর ইস্কুলের ইংরেজিনবিস হেডমাস্টার হরিদাস হালদার অবধি কৃষ্ণভামিনীর আধিভৌতিকতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন। রবিবারের মধ্যাহ্ন-আসরে তিনি সকলকে জানালেন তাঁর সহধর্মিণীর স্বপ্নাদেশের কথা। হালদার-গৃহিণী ম্যালেরিয়াতে ভুগছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে তিনের ঊর্ধ্বে জ্বর উঠলেই তিনি অদ্ভুত-অদ্ভুত আধ্যাত্মিক স্বপ্ন দেখতেন। সে-বারে তাঁর জ্বর প্রায় পাঁচের কাছাকাছি গিয়েছিল, তাই স্বয়ং ছিন্নমস্তা তাঁর চোখের সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে খড়গ-সঞ্চালনে তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি রায়-গোষ্ঠীর বড়োবউ-রূপে জন্ম নিয়েছেন, অতএব সমস্ত গ্রাম যেন তাঁর পূজা করতে বিলম্ব না-করে। এই কাহিনীতে গ্রামের সকলেই বিস্মিত এবং ত্রস্ত হয়েছিলেন, এবং হরিদাসের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তাঁর স্ত্রী অচিরেই ছিন্নমস্তাদেবীর সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে কোন্ উপচারে পূজা করতে হবে, তা জেনে নেয়। কেবল মিত্তিরজা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে হরিদাসকে গাঁজাখোর আখ্যা দিয়েছিল। সত্যের খাতিরে এটা বলা বোধহয় আবশ্যক যে সেদিনে মিত্তিরজার সাজা তামাক হরিদাস গল্প বলতে-বলতে বিভোর হ'য়ে গিয়ে একাই নিঃশেষ ক'রে ফেলে। অতএব মিত্তিরজার উক্তি দেবীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রসূত না-হ'য়ে হরিদাসের আত্মবিস্মৃতিতে বিরক্তির অভিব্যক্তিমাত্র হ'তে পারে। কিন্তু চিরদিনই দেবদ্বিজের প্রতি মিত্তিরজার ভক্তি একটু কম।

কিন্তু দেশের যত সম্মিলিত ডাক্তার-বৈদ্যরা কালীচরণের কোনো উন্নতি করতে পারলেন না, তাঁরা সকলে একবাক্যে বললেন যে রোগী যদি নিজে বাঁচবার ইচ্ছা না-করে স্বয়ং বৃহস্পতিও তাকে রক্ষা করতে পারবেন না। কথাটা সত্য : কালীচরণের দেহ তার মৃত হৃদয়ের সহমরণ করবার জন্যে বড়োই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে পড়েছিল। কৃষ্ণভামিনী তাঁর কাছে অনেক কাঁদাকাটি করলেন, তাঁকে অনেক বোঝালেন, সমঝালেন, তাঁর পায়ে অনেক মাথা খুঁড়লেন, উঠতে-বসতে তাঁকে শোনাতে লাগলেন, 'বেঁচে আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে মনঃপূত

হ'ল না, এবার ম'রে আমায় জব্দ করবে। তা কখনোই হ'তে দেব না, কখনোই না, কখনোই না।' কিছুতেই কিছু হ'ল না। মরণকে সহায় জেনে কালীচরণ অপ্রত্যাশিত সাহস দেখাচ্ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এই বোধহয় প্রথম তিনি কৃষ্ণভামিনীর তর্জন-গর্জনে কম্পিত, তার অনুরোধে বিগলিত, তার ক্রন্দনে বিচলিত হলেন না। এমন-কি কৃষ্ণভামিনী রাজি হ'য়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাওয়ার ভয়-সুদ্ধ দেখালেন, কিন্তু তাতে কালীচরণ ঈষৎ হেসে দেয়ালের দিকে ফিরে শুলেন মাত্র।

পরিশেষে যখন ডাক্তারেরা নিরুপায় হ'য়ে রোগীকে জবাব দিলে, কৃষ্ণভামিনী তখন একদিন খবর পেলেন যে গ্রামের বাইরে বটতলার শ্মশানে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, যাঁর অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসম্ভব। পাঁচু মোড়লের শ্যালকের ওলাউঠা হয়েছিল, তাকে সন্ন্যাসী শুধু জলপড়ায় সারিয়েছেন। হারু ঘটকের মাসতুতো বোনের কাঁধে ভূত চেপেছিল, সে সন্ন্যাসীর হলুদপড়ার গন্ধে দু-ঘড়া জল দাঁতে ক'রে সদর দরজার বাইরে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে এবং সেই অবধি তার স্কন্ধারূঢ়ের কোনো সন্ধান-সুদ্ধ পাওয়া যায় না। সকলের চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে অনন্ত গয়লার গোরুর মধ্যে যখন মড়ক হয়, তখন সে সন্ন্যাসীঠাকুরের পায়ে গিয়ে পড়ে, ফলে বাবা সেই মড়ক চালিয়ে দিয়েছেন অনন্তর শত্রু নন্দ গোয়ালার গোয়ালে। এইসব ইতিহাস শুনে কৃষ্ণভামিনী আর চিন্তা করলেন না। সন্ন্যাসীঠাকুরকে তলব করলেন। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসী আসতে দ্বিরুক্তি করেননি।

এরপরে মাস তিনেক কাটল কৌতূহলে এবং উৎকণ্ঠায়। তারপর যাগ-যজ্ঞের, মন্ত্র-তন্ত্রের, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুমধামের মধ্যে একদিন উষার প্রাক্কালে গ্রামবাসীদের চমৎকৃত ক'রে কালীচরণ তাঁর পিতৃ-পিতামহদের সঙ্গে যোগ দিতে চ'লে গেলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর গোবিন্দপুর বীতশ্রদ্ধ হ'ল না, কেন-না তাঁর মৃত্যুর ঠিক নয় মাস নয় দিন পরে কালীচরণের বিধবা একটি পুত্র প্রসব করলেন। বৈকুণ্ঠ ভট্‌চাজ্জি সকলকে জানালে যে, সন্ন্যাসীঠাকুর ইচ্ছা ক'রেই কালীচরণকে তার জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে এই নবজাত শিশুর শরীরে আবির্ভূত হ'তে আদেশ দিয়েছেন। এ-কথা সে শুনেছে বাবার নিজের মুখে। পঞ্চতীর্থমশাই তাঁর প্রতিপক্ষে *গীতা*-র শ্লোক 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' ইত্যাদি উদ্ধৃত ক'রে বললেন, 'এতদ্বারা প্রমাণ হচ্ছে হিন্দুধর্ম সনাতন। ভবিষ্যতে এ-সত্যের প্রতি আর কেউ সন্দেহকলুষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে পারবে না।' শিশুর এবং সন্ন্যাসীর সৌসাদৃশ্য দেখে যাদের মনে একটুও-বা সংশয় হয়েছিল, ইংরেজিনবিস হরিদাস হালদার তার ছাপা বইয়ের সাক্ষ্য দিয়ে আশ্বস্ত করলে, সে নাকি কলকাতায় অবস্থানকালে একখানি বইয়ে পড়েছিল যে গর্ভাবস্থায় কাফ্রির ছবি দেখে-দেখে একটি শ্বেত মহিলা শেষে এক মসীকৃষ্ণ বালক প্রসব করেছিলেন। এমন-কি ঘোর অবিশ্বাসী মিত্তিরজাকে-সুদ্ধ এই কথার যথার্থতা স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি বললেন, 'যার মুখকে অত কাছ থেকে দেখা যায়, তার প্রতিমূর্তি গর্ভমধ্যে অঙ্কিত হ'য়ে না-যাওয়াটাই আশ্চর্য।' এ-কথা বলবার পর তিনি নাকি একটু কুৎসিত কটাক্ষ ক'রে হেসেছিলেন, কিন্তু এ-বিষয়ে সকলে একমত নন।

তার উপরে সন্ন্যাসীঠাকুরও আশ্চর্যরকমে অন্তর্ধান হলেন। কেমন ক'রে, কবে, কখন,

তিনি যে উধাও হলেন তা আজ অবধি অজ্ঞাত। বৈকুণ্ঠ ভট্‌চাজ্জির এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসি কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে বলেছিলেন যে বাবা এখন বারাণসীধামের একটি প্রকাণ্ড মঠের মোহন্ত হ'য়ে হিন্দু বালবিধবাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এরপরে গোবিন্দপুরবাসীরা আর কী ক'রে সন্দেহ করে। যোগশক্তির অস্বীকার কি হিন্দুধর্মের অক্ষুণ্ণ গৌরবের প্রতি অবজ্ঞা করা নয়? কাজেই কুৎসাকারীদের কথায় কর্ণপাত না-ক'রে গ্রামবাসীরা ধর্মভীরুতার পরিচয় দিত। গোবিন্দপুরের বৈশিষ্ট্যই ছিল ধর্মপ্রাণতা।

সুশোভন বিনম্রতার সহিত কৃষ্ণভামিনী পিতাহারা পুত্রের নাম রাখলেন 'অনাথ'।

১৩৩২ ফাল্গুন ২

খ্যাতি

ডাকপিওনের হাতে বিপুলায়তন পুলিন্দাটা দূর থেকে দেখে প্রবোধের মনে যে-আতঙ্ক জেগেছিল, তার যথার্থতা প্রমাণ হ'ল সে-লেফাফাখানা খুলতেই। এবারেও চিরপ্রথানুসারে একখণ্ড ছাপানো বিজ্ঞাপন সঙ্গে নিয়ে তার প্রবন্ধটি ফিরে এসেছিল ; এবারেও এই প্রত্যাখ্যানের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রবোধ দিশাহারা হ'য়ে গেল। যন্ত্রবৎ অঙ্গুলি সঞ্চালনে কাগজের ভাঁজগুলো সমান করতে করতে প্রবোধ তার প্রবন্ধের আরম্ভটা শততমবার পড়লে!

'গত মহাসমরের শেষে মানুষকে তার যুগ-যুগান্তের সমস্ত সংস্কার, তার আজন্মের সমস্ত শিক্ষা, তার সমাজনীতির সমস্ত আদেশ, তার জীবনের সমস্ত সাধনা বিসর্জন দিতে হয়েছে। মরণের নিবিড় আলিঙ্গনে সন্তুষ্টির সংহতির থেকে জাগ্রত হ'য়ে সে দেখেছে তার চিরপরিচিত প্রতিবেশের ধ্বংস, তার বহু পুরাতন আদর্শের অন্তর্ধান। কিন্তু প্রাচীনের এই বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তির মধ্যে একটা ধূলিধূসর, জীর্ণ, শীর্ণ, অনাদৃত প্রবাদকে সে চরম সত্য ব'লে চিনেছে যে, দুইটা অন্যায়ে একটা ন্যায় হয় না। সে আজ বুঝেছে যে আঘাতের প্রত্যাবর্তন করলে পৌরুষ প্রকাশ পেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে শান্তির সর্বনাশ অনিবার্য। আজ মানুষ উচ্চ কণ্ঠে বলছে, "ধর্ম সে তো বকধার্মিকতা, শাস্ত্র শুধু অপলাপ, ঈশ্বর কেবল শাসন-ভীতি"; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মন ছুটেছে বুদ্ধের প্রতি, তার প্রাণ চলেছে যীশুর পানে। শান্তির (?) অশান্ত বিক্ষোভের বক্ষে বিশ্বমানবের মিলিত কণ্ঠস্বর আজ গাইছে, "অহিংসা পরমোধর্ম।"'

প্রবোধ ঠিক করতে পারলে না এর মধ্যে গল্‌তি কোথায় ; এটা কেন সম্পাদকদের অপছন্দ হয়। এ তো নিছক সত্য, অতএব সুন্দর, অন্তত কুৎসিত নয়। অবশ্য ভাষাটা কিছু গুরুগম্ভীর, একটু অলঙ্কারবহুল, ঈষৎ খঞ্জগতি ; কিন্তু ভাবটা এবং বিষয়টাও তো দেখতে হবে। মহাত্মার অহিংসাবাদের সঙ্গে আদর্শ অহিংসাবাদের পার্থক্য নিরূপণ করা তো আর হাসি-তামাশার বিষয় নয়। Pater বলেছিলেন, বিবৃতি ও বিষয়ের সঙ্গমে রূপের জন্ম। Pater কি তবে অজ্ঞ?

আখ্...ওই-যে রোগ, ওই-যে কথায়-কথায় প্রামাণিকতার শরণাপন্ন হওয়া, স্থানে-অস্থানে পরের উদ্গীর্ণ উক্তি কুড়িয়ে এনে বুভুক্ষু আত্মাকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা, সময়ে-অসময়ে বড়ো-বড়ো নামের অবতারণা, জরাজীর্ণ শিখণ্ডিদের মধ্যবর্তী ক'রে নিজের দায়িত্বমুক্তির প্রয়াস, ও-রোগের কি আর অন্ত নেই! স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ওগুলো কেবল

সারহীন, অন্তর্লঘু কথা, সমালোচকদের চোখ-রাঙানোর উপায় মাত্র! Pater কবে কী বলেছিল সে-কথা চুলোয় যাক্ ; নিজের মন কী বলছে, সেটাই হচ্ছে আসল। এই যে-গল্প, এই যে-প্রবন্ধ, এই যে-কবিতা, এগুলো তো স্রষ্টার মনের নিদর্শন নয়, এগুলো হচ্ছে বাতাহত তুচ্ছ তৃণের শূন্যের বক্ষে নিরর্থ রেখাপাতের প্রতুল চেষ্টা! এই যে-রচনাগুলো, ওদের তলায় চাপা আছে শত-সহস্র পরাভূত আদর্শ, লক্ষ-লক্ষ দাসত্ব-স্বীকার, কোটি-কোটি আত্মত্যাগ, অগণ্য নিষ্ফলতা, অসংখ্য অসম্পাদন!

দক্ষিণের জানলা দিয়ে আষাঢ়ের মেঘমেদুর আকাশের পানে তাকিয়ে প্রবোধ ভাবতে লাগল তার সেই বছর-কয়েক আগের লেখা 'মরীচিকা' গল্পের কথা। তাতে তার দারিদ্রক্ষিপ্ত, বাঞ্ছিতার ধ্যানরত নায়ক, একদিন রাত্রে গড়ের মাঠে পাদচারণ করতে-করতে এক কিশোরীকে দু-জন মাতাল গোরার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এই বীরত্বের পারিতোষিক-স্বরূপ প্রেমের পরিবর্তে পেয়েছিল একশত টাকা। তারপর এই একশো টাকা ভিত্তি ক'রে সে বছর-কয়েকের মধ্যে একজন নামজাদা ধনী হ'য়ে উঠল। কিন্তু তার যখন এইরকম উন্নতি হচ্ছিল, সে-মেয়েটির পিতার অবস্থা তখন ক্রমশ মন্দ হ'য়ে আসছিল,—যেন তাদের লক্ষ্মীকে এই যুবকটি সেই একশো টাকার সঙ্গে অপহরণ ক'রে নিয়ে এসেছে। কাজেই বড়োলোক হ'য়ে সে যখন তার মানসপ্রিয়ার সন্ধান করলে, তাকে পেতে বেশি দেরি হ'ল না। কিন্তু অবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে তার আদর্শেরও উন্নতি হয়েছিল, অথবা এ-ও হ'তে পারে যে সেই মলয়াহত তরুবীথিকার ঘনান্ধকারে কুরূপাকে সে সুরূপা ব'লে ভেবেছিল। সে যাই হোক্, ফুলশয্যার রাত্রে যে-মেয়েটিকে সে পার্শ্বে শায়িতা দেখলে তাকে আর সুন্দরী মনে হ'ল না ; সে বারেক-দেখা সুরবালিকাটি তার দারিদ্র্যের অন্ধকারে অন্তর্ধান হ'য়ে গেল।

তখন প্রবোধের আদর্শ ছিল সচ্ছন্দতা আর লঘুতা। তখন সে যে-ভাষার কল্পনা করত সে-ভাষা সাধারণত কোনো স্বচ্ছতোয়া পার্বত্য নদীর মতো স্পষ্ট, হাস্যমুখরা, কিরণদীপ্তা, কিন্তু ভাঙনের সময় অট্টহাসিনী, ফেনিল-অধরা, উন্মাদিনী ; সে-ভাষার আত্মা উষার মতো সংজ্ঞার প্রদোষে হঠাৎ আলোর ঝিলিক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু বেচারা প্রবোধের উপর লোকমতের প্রভাবটা ছিল একটু বেশি। কাজেই *অঙ্কুর*-এর পলিতকেশী সম্পাদক যখন তার 'মরীচিকা' গল্পটিকে লঘুতাদোষে দুষ্ট ব'লে ছাপাতে অস্বীকার করলেন, তখন প্রবোধ নিশ্চয় বুঝলে তার আদর্শে একটা কিছু ভুল আছে। কিন্তু নবীন-পন্থী প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে প্রবোধ যে নূতন মরীচিকা দেখতে পেলে, তার দিকে রসপিপাসুদের ছুটে যাওয়া এতই অসম্ভব যে সে নিজেই মনে-মনে স্থির করলে সে-গল্পের নাম 'দুঃস্বপ্ন' হওয়াই উচিত। এই ফলাফলের জন্যে তার উপদেষ্টাকে সে দায়ী করতে পারেনি, যদিচ এই বিংশ শতাব্দীতে মানসীর সঙ্গে চিরমিলনটা তার কাছে লেগেছিল একটু অসঙ্গত। কিন্তু নবাকারে গঠিত সেই পুরাতন গল্পটাকে কোনো সম্পাদকের সামনে মুদ্রণের জন্যে উপস্থিত করাকে সে ভেবেছিল পণ্ডশ্রম। তাই সে-রচনাটাকে দু-চার ফোঁটা অলখ চোখের জলের সঙ্গে ভস্মীভূত ক'রে তার গাম্ভীর্য-সাধনার প্রথম অঙ্কের উপরে প্রবোধ যবনিকা টেনে

দিয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল অল্প, কাজেই সে বোঝেনি যে কলেবর-বিকারের নামই মরীচিকা।

অতীতের উপর মানুষ মাত্রেরই একটা টান থাকে ; মানবচরিত্রের এই প্রাথমিক দুর্বলতার হাত থেকে প্রবোধ যে নিষ্কৃতি পায়নি সেটা কিছু অত্যাশ্চর্য নয়। আজকাল তার সাহিত্যিক আশাভঙ্গ ঘটলেই সে তার প্রথম গল্পের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। এতদিনে তার মরীচিকা তার উচ্চ আদর্শের পূর্ণ পরিণতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, একটা লোকাতীত মহিমামণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিল। সে-আখ্যায়িকাটির এই পদবৃদ্ধি সম্পূর্ণ অকারণ নয়। সেই গল্পটির মুদ্রণ বা প্রত্যাখ্যানের উপরে নিহিত ছিল তার ভবিষ্যৎ, নির্ভর করছিল তার লেখনীর সার্থকতা।

পিতা-পুত্রের অবশ্যম্ভাবী বিরোধ প্রবোধের ক্ষেত্রে ঘটে যখন তার বয়স বাইশ আন্দাজ, যখন সে কায়ক্লেশে এম.এ. পরীক্ষাটা উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ বছর বয়সে সে নিজেকে সাহিত্যজগতে এতটা অবর্জনীয় ব'লে ভেবেছিল যে নোবেল পুরস্কার পাওয়াই যে তার ভাগ্যলিখন সে-বিষয়ে তার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সত্যের খাতিরে এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে প্রবোধের এই আত্মপ্রসাদের জন্যে তার পিতা বিনোদবাবু বিশেষরকমে দায়ী। সে কবিতা লিখতে শুরু করে পনেরো বছর বয়সে। তার কাব্য-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয় একটি মহারাষ্ট্রী কিশোরীর হাস্যারুণ স্পর্শে। মেয়েটি তাদের ইস্কুলের বালিকা বিভাগে পড়ত। একদিন সন্ধ্যার রাগে সেই মেয়েটির সাধারণ মুখশ্রী দেখে প্রবোধ প্রথম উপলব্ধি করে প্রণয় সামগ্রীটা কী! এই নবপ্রজ্ঞান-প্রসূত বিস্ময়টিকে সে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল একটি বিশ লাইনের কবিতায়। কবিতাটা পনেরো বছরের বালকের পক্ষে প্রশংসনীয়, কারণ তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু প্রবোধের দুর্ভাগ্য তার সেই বাল-সুলভ চাঞ্চল্যের নিদর্শনটি গিয়ে পড়ে তার পিতার হাতে। তার পিতা যে-কালের লোক, সে-কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোটাই ছিল ফ্যাশান, কাজেই বিনোদবাবু তাঁর পুত্রের উত্তমর্ণ নির্ধারণ করতে পারেননি। অতএব তিনি যে তাঁর পুত্রকে সম্ভাবনার অমুক্ত আকর ব'লে মনে করেছিলেন, তাঁর সে-বিশ্বাসটা মার্জনীয়।

বিনোদবাবু যখন প্রবোধকে আলিঙ্গন ক'রে গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'পুরাকালে প্রতিভার পারিতোষিক দেওয়া ছিল রাজাদের কাজ। কিন্তু এখন আর সে-কাল নেই, এখন দেওয়া দূরের কথা নেওয়াই হচ্ছে যুগধর্ম। কাজেই রাজার কর্তব্য আমার মতো একজন গরিব প্রজাকে দিয়েই চালাতে হবে। তোকে একশো টাকার বেশি দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।' তখন প্রবোধ বেচারা তাঁর এই আকস্মিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও আবেগের কারণ যে বুঝতে পারেনি, তার কারণ সে বিনোদবাবুর অতীত-জীবনের ইতিহাসটা ভুলে গিয়েছিল। এখনো বৎসরের মধ্যে অন্তত দু-বার তাঁকে একখানা লুকানো খাতার ধুলা ঝাড়তে দেখা যেত। সে-খাতাখানি হচ্ছে তাঁর নবযৌবনের কাব্যকলাপ। তিনি যে একজন নাম-করা কবি হ'তে পারেননি, তার কারণ মুখ্যত হচ্ছে তাঁর সে-শক্তির অভাব এবং গৌণত তাঁর অর্থপ্রীতি। কিন্তু বিনোদবাবু নিজে এর একটা কারণও মানতেন না ; মাঝে-মাঝে যখন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বৈঠক বসত, তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে এক সাহিত্যসভায় বঙ্কিম তাঁকে পিঠ চাপড়ে কী বলেছিলেন

সেই কথা তাদের শোনাতেন এবং উকিলানাম্ মনোরথঃ যে চিরদিনই বিফল হ'তে হবেই, এই নীতিপূর্ণ উক্তি দিয়ে তাঁর কীর্তিকাহিনীর উপর টানতেন পূর্ণচ্ছেদ। এই সভাগুলির কার্যাবলি একরকম বাঁধা ছিল। বিনোদবাবুর আত্মচরিত শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কোনো-না-কোনো বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কিন্তু, তোমার কবিতা-লতা মুকুলে শুকিয়ে গেল কেন?'—লোকে হয়তো ঈদৃশ ভাষাকে ঢঙ্ আখ্যা দিতে চাইবে, তাই বলা আবশ্যক যে বিনোদবাবুর বৈঠকখানার বৈশিষ্ট্যই ছিল সেখানকার কথাবার্তার উচ্চস্তর, চিন্তাস্রোতের অসাধারণ ধরন, আচার-বিচারের ললিত ধারা।—উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বাক্যব্যয় না-ক'রে ধোপদুরস্ত জাজিমের পানে অর্ধনিমীলিত অপাঙ্গে চেয়ে একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে স্বীয় কপালে করতেন দু-চারটে লঘু করাঘাত ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার বন্ধুবর্গও ওষ্ঠাধর আকুঞ্চিত ক'রে সমতালে একবার তাদের সমব্যথাক্লিষ্ট শির সঞ্চালন করতেন, ধীরে, মন্থরে, সন্তর্পণে।

এরপরেও যদি তার পিতার রূপজ্ঞানের প্রতি প্রবোধের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, তাহ'লে তাকে অবিশ্বাসী উপাধি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই ; আর পনেরো বছরে যে নাস্তিকতার চাষ করে তার ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। কাজেই সেই প্রতিশ্রুত একশো টাকার চেহারা না-দেখলেও প্রবোধ তার অ-তুঙ্গ ভাগ্য সম্বন্ধে ছিল অবিচল, কেন-না বিনোদবাবু যে শুধু তাকে উৎসাহিত করেছিলেন তা নয়, এমন-কি চিরপ্রথার লঙ্ঘন ক'রে বন্ধুসভায় আত্মকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে সুদ্ধ ভুলে গিয়েছিলেন। সেবারে অন্তরঙ্গদের সহিত আলাপনের সময় তাঁর স্বর হয়নি অশ্রুভারাতুর, তাঁর চক্ষু হয়নি স্মরণক্ষিণ্ন, তাঁর আবেগ হয়নি বচনাতীত। তাঁর বক্তৃতার তোড়ে বন্ধুরা তো কথা কইবার অবকাশ পাননি-ই, এমন-কি প্রায় সকলেই স্বগৃহাভিমুখে ভেসে গিয়েছিলেন। এবারকার সভার শেষ শির-চালনায় হয়নি, হয়েছিল ঈশ্বরের সহৃদয়তা বর্ণনায়। বিড়ম্বিত-প্রতিভাকে অন্ধ-প্রতিভার চালক করায় ন্যায়পরায়ণতা অবশ্যস্বীকার্য, যদিও আস্থাহারারা ঈদৃশ নিষ্পত্তিকে লাঞ্ছনার নামান্তর মনে করতে পারেন।

সাধারণত দেখা যায় যে পর্যাপ্তির পরে আসে অনটন, সৌদামিনীর শেষে জাগে ঘনান্ধকার, সংরাগের সীমান্তে থাকে ঘৃণা এবং অবসাদ। এই অনিবার্য নিয়ম সত্ত্বেও যে বিনোদবাবুর উৎসাহ সাত বৎসর অটল ছিল, সেটা সুখ্যাতির যোগ্য। উপরন্তু তাঁর মত পরিবর্তনের কারণ প্রবোধ যাই ভেবে থাকুক্-না কেন, তিনি যে বলেছিলেন যে 'কবিতার সমাপ্তি রাজদ্বারে অথবা দাতব্য-চিকিৎসালয়ে' সে-কথাটা খুবই সত্য। বিরহানলের থেকে জঠরানলকে বড়ো ক'রে দেখা সাংসারিকতার পরিচায়ক। ন্যায়ের খাতিরে এ-কথাও মানতে হবে যে প্রবোধের কলমোপজীবী হওয়ার যোগ্যতা-বিচারের ভার তিনি নিজের হাতে রাখেননি, তুলে দিয়েছিলেন পেশাদার সাহিত্যিকদের উপর। তা তারা যখন সকলে তার 'মরীচিকা' গল্পটা ফেরৎ দিলে, এমন-কি নব্যতান্ত্রিক *অঙ্কুর* অবধি সে-গল্পটাকে পরিবৃত্তি-বিনা ছাপাতে রাজি হ'ল না, তখন সনাতন-দ্রোহী *অঙ্কুর*-সম্পাদকের আপেক্ষিক ভবিষ্যদ্‌বাণীর উপরে নির্ভর করাটা কিঞ্চিৎ নির্বুদ্ধিতা। অবশ্য অপরদিক থেকে এটাও বক্তব্য যে বিনোদবাবুর এমন সংস্থান ছিল যাতে ক'রে তিনি প্রবোধকে জীবিকান্বেষণের পশুশ্রমের

থেকে মুক্তি দিতে পারতেন ; এবং প্রবোধের ঔপন্যাসিক হওয়ার প্রয়াসটা যতই হাস্যাস্পদ হোক্-না কেন, তার কাব্যাত্মবোধ সম্পূর্ণ সত্তাহীন ছিল না। বাহুল্য বর্জন করলে সে হয়তো একদিন ব্রহ্মার পুত্র না-হ'য়ে উঠলেও, পৌত্রের আসন অধিকার করতে পারত। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন ছিল অসীম অবকাশ, অনন্ত অধ্যবসায় এবং অক্লিষ্ট অর্থ, যার দ্বারা স্রষ্টাসুতদের প্রদর্শনীতে তার যাতায়াতের পথ হ'ত প্রশস্ত। বিনোদবাবুর দোষ এইটুকু যে তিনি প্রবোধকে ওকালতি এবং অনশনের মধ্যে অন্য কোনো নির্বাচনী দেননি।

প্রবোধের চিত্তপটের উপর দিয়ে তার ক্ষুদ্র জীবনের এইসমস্ত ঘটনাবলি ছায়াচিত্রের মত বেগে ছুটে গেল। উত্তেজিত হ'য়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ; এবং শ্রাব্য স্বরে নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে কক্ষের মধ্যে পদচারণের চেষ্টা করলে। সন্তর্পণ গমনে হয়তো-বা সে-ঘরের সস্তা আসবাবপত্রের আকর্ষণী এড়ানো যেত ; কিন্তু আত্ম-অভিযোগের উন্মাদনায় প্রবোধের গতিটা হ'য়ে পড়েছিল কিছু দ্রুত। কাজেই চরণাস্থির সঙ্গে কাষ্ঠ তেপায়ার কঠোর সংঘর্ষে তার বেষ্টনী স্বীয় ক্ষুদ্রতা সশব্দে প্রচার করল। নীলাভ জানু মালিশ করতে-করতে প্রবোধ আর্ত স্বরে বললে, 'না, এমন ক'রে বাঁচার কোনো অর্থ নেই। একদিকে মনের ক্ষুদ্রতা আত্মাকে পিষে ফেলছে, অন্যদিকে ঘরের ক্ষুদ্রতায় দেহকে সুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে খর্ব।'

আত্মচরিত্রের ঈদৃশ সমালোচনায় প্রবোধ নিজের প্রতি অবিচার করছিল। তার রচনা অপ্রকাশিত থাকার কারণ তার চিন্তার স্বল্পতা নয়, কিন্তু অপরিসীমতা, তার মনের সঙ্কীর্ণতা নয়, কিন্তু নমনীয়তা। মানুষের মনের উপরে পুস্তকের যে একটা মোহিনী শক্তি আছে, সে-কথা দ্বন্দ্বাতীত। অতএব যে প্রবোধ সমালোচকের শুধু ভ্রূ-উত্তোলনের দাপটে স্বীয় আদর্শ বর্জন করতে দ্বিধা করেনি, তার উপরে যে পুস্তকের প্রভাবটা একটু প্রচণ্ড হবে, তা বিচিত্র নয়। কিন্তু পরের চিন্তা ধার ক'রে আনলে মনের সমৃদ্ধিসাধন হয়তো-বা হয়, কিন্তু সাহিত্যের তাতে প্রায়ই সর্বনাশ ঘটে। অহমিকাহীন সাহিত্য টীকারই রূপান্তর ; সাহিত্য সমষ্টিবাদ মানে না। ব্যঞ্জনার গণ্ডিতে বিরাটকে বাঁধতে পারার নামই হচ্ছে শিল্প ; ভাষার মনীষার সঙ্গে আত্মার সমন্বয়ই হচ্ছে রূপ ; সূচীর ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে উষ্ট্র চালানোর হাতসাফাইকেই বলে সাহিত্য। নদী যখন কূল ছাপিয়ে অকূলের পানে ছোটে তখন ঘটে প্রলয়। অসংযত অসম্ভবের নাম মত্ততা, কিন্তু তাকে ছন্দোবদ্ধ করতে পারলেই হয় কবিত্ব। এই সহজ সত্যগুলোকে প্রবোধ বুঝত না, কাজেই তার নিষ্ফলতা অনিবার্য। এইজন্যেই তার 'মরীচিকা' গল্পটা সম্পাদকেরা মনোনীত করেননি। তাতে নায়ক যখন নায়িকাকে প্রথম বিবসনা দেখলে, তখন নায়িকার দেহের অপূর্ণতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাটা বাস্তব বিজ্ঞানের দিক থেকে হয়তো-বা নিখুঁত হ'য়ে থাকবে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের হিসাবে সেটা বাচালতা। কাজেই সে-অংশটা বর্জন না-ক'রে গল্পটাকে ছাপানো অন্যায় হ'ত। কিন্তু আবার সেটা বাদ দিলে আখ্যায়িকার সমাপ্তির কোনো তাৎপর্য হয় না। এবারেও প্রবোধের 'অহিংসা' প্রবন্ধের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। প্রবোধ যে-অহিংসার কথা তুলেছিল তার কর্ষণ ইউরোপেই প্রশস্ত ; কেন-না যে-দেশে যুগ-যুগান্তর ধ'রে অহিংসার আরাধনা ক'রে মানুষের মনে মরচে পড়েছে, সেখানে একটু-আধটু হিংসার প্রচলন হওয়া মন্দ নয়, তাতে ক'রে হয়তো-বা ভোঁতা ছুরিতে শান দেওয়ার সদভ্যাসটার

পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'তে পারে। অবশ্য এইসমস্ত ধ্যানধারণার বশবর্তী হ'য়েই যে সমালোচকেরা তার রচনাবলি প্রত্যাখ্যান করছিলেন, তা বললে মিথ্যা বলা হবে ; কিন্তু তাঁদের পত্রিকাগুলোকে সাধারণের মনোরঞ্জক ক'রে তোলার ইচ্ছাটাকে নিন্দনীয় আখ্যা দেওয়া অন্যায় হয় না কি? অন্তত প্রবোধের পক্ষে? আর হট্টমনের প্রতি যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করা যাক্-না কেন, ও-মনের ভিত্তিগুলোর উপরে ঘৃণা প্রকাশ করা মূর্খোচিত।

প্রবোধের চোখের থেকে হঠাৎ মোহের একটা পর্দা খুলে গেল। দিব্যদৃষ্টির বিদ্যুৎশিখায় সে একবার তার সমস্ত দুর্বলতাগুলো দেখতে পেলে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে শুধু তার দুর্বলতাগুলোই দেখতে পেলে, তার সামর্থ্যগুলো নয়, যেমন ক'রে নিশাক্রান্ত পথিক চপলার আলোকে পথের বিভীষিকাগুলোই শুধু দেখতে পায়। তার মনে হ'ল তার পায়ের তলার মাটি কে যেন কেটে নিয়েছে, আর সে নেমে চলেছে কোন্ অন্ধ পাতালে, কোন্ তরঙ্গহীন বিলুপ্তির সমুদ্রগর্ভে। প্রবোধ তার পিতার পুত্র। অভিনয়, নিজের সামনেও অভিনয় তার মজ্জাগত। অপরে যেখানে স্বীয় দোষের আগাছাগুলো উৎপাটন ক'রে ফলিষ্ণু তরুর মূলে জলসেচন করত, প্রবোধ সেখানে সে-তরুর আমূল উচ্ছেদকেই আগাছানাশের শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে ধার্য করলে। এই পথ অবলম্বন করায় যুক্তি-তর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন চলে, কিন্তু ওর নাটকীয়তার উপরে কটাক্ষপাত করা অসম্ভব।

আত্মমমতার অশ্রু যখন শুকিয়ে গিয়ে তার চোখের দু-পাশে কৃষ্ণরেখাপাত করেছে, প্রবোধের নিঃসাড় দেহে তখন যেন ফের প্রাণস্পন্দ জাগল। তার মনে একটা অর্ধ-লঘু অর্ধ-গম্ভীর বিশ্বাস ছিল, কর্তব্য নির্বাচনে সে নেপোলিয়ানের সমকক্ষ ; আজ তার সঙ্গে আরেকটা ধারণা সংযুক্ত হ'ল যে আত্মত্যাগে সে অদ্বিতীয়। সে চায় হয় পূর্ণতা, চরমোৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, নচেৎ কিছু নয়। মধ্যতার শ্লথ স্রোতে নিবদ্ধ হ'য়ে থাকা তার কার্য নয়। জীবন-তরুর সর্বোচ্চশাখে তার নাগাল যদি না-পৌঁছয়, সে সে-গাছের কোনো ফলই প্রার্থনা করে না। এইবারে এল তার কর্তব্য নির্বাচনের শক্তি। তার রচনা, সেগুলো সাহিত্য-উপাধি পাবার অযোগ্য, সেগুলো শত দোষে দুষ্ট ; তাতে মৌলিকতার চিহ্ন-সুদ্ধ নেই, আছে কেবল চুরি, আছে মাত্র ঋণ। অতএব ধূলি ধূলির সাথে মিশে যাক্ : সেগুলোকে সৎকার করাই শ্রেয়, যদিও সেগুলো সৎকারযোগ্য নয়, মসলাবাঁধা কাগজ হওয়ার উচিত উপাদান। কলার জন্যে এরূপ আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই বিরল, বিরল কেন নিঃসন্দেহে অনবতুল।

কিন্তু কর্তব্যের দ্রুত নির্বাচনের উপরে কর্তব্যের দ্রুত সম্পাদন নির্ভর করে না, বরং বিপরীত। কাব্যে কর্তব্যের খাতিরে পুত্র-বলি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য হ'তে পারে ; কিন্তু আমাদের আধুনিক জগতে সৌন্দর্যের খাতিরে আত্মরচনা ভস্মীভূত করতে বুকের মধ্যে দারুণ মোচড় লাগে। প্রবোধের হাত যেন অবশ হ'য়ে গিয়েছিল, এক-একটা রচনা টানা থেকে বার করতে লাগছিল যেন এক যুগ। এছাড়া বিচার করবারও ছিল অনেক, যেমন কবিতার খাতাগুলো চিতানলে যাবে কি-না? তার কবিতা সম্বন্ধে সমালোচকদের ধারণা যতই নিকৃষ্ট হোক্-না—তাঁরা তার কবিতাগুলোকে অমর্মস্পর্শী সৌন্দর্য, মিলযুক্ত গদ্য, অস্বীকৃত চৌর্য ইত্যাদি আখ্যা দিতেন—সেগুলো বিনা-ক্লেশে মাসিকের কোলে সম্মানের স্থান পেয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে

তা দিয়ে সে নিজের অতৃপ্তি, অপূর্ণতার ভীতি, সৌন্দর্য-লালসা মিটাতে পারেনি। কিন্তু... আবার কিন্তু! ফের সেই পরের মুখ-প্রেক্ষণ! পুনর্বার সেই শূন্য-মস্তক, সূত্রসার মন্তব্যাত্মক সমালোচকদের মুরুব্বিয়ানার জন্যে হাহুতাশ! মর্মান্তিক অনিশ্চয়তায় পঙ্গু হ'য়ে প্রবোধ তার খাতাপত্রের ধুলা ঝাড়তে লাগল। সৎকারের পূর্বে শুচির ব্যবস্থা শাস্ত্র-কথিত।

এমনসময় হঠাৎ প্রবোধের নিশ্চলতার মধ্যে—বহির্জগতের চাঞ্চল্য নিয়ে তার বন্ধু দীনেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। দীনেশ নব-প্রত্যাগত বেকার ব্যারিস্টার। কিন্তু অন্নাভাব তার দুর্দমনীয় জীবনীশক্তিকে খর্ব করতে পারেনি। তার চোখ-মুখ-নাক থেকে একটা চিরপিপাসিত কৌতূহলের বিদ্যুৎ যেন সর্বদা নির্গত হ'ত। তার বাক্য-প্রপাত একবার শুরু হ'লে আর থামত না, অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ-না তার শ্রোতারা নিজেদের একদম পরাস্ত, প্রধ্বংস, বিলুপ্ত না-মনে করতেন। তার নাতিগুরু দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্ঞাপন করত একটা বিপুল অস্থৈর্য, একটা প্রতুল অধৈর্য, অথবা ঠিক বলতে গেলে একটা অনিবার্য কর্মিষ্ঠতা, একটা অপাত্রে অস্থানে অর্পিত নিষ্কারণ কর্মিষ্ঠতা। একবার কে এক বন্ধু উত্ত্যক্ত হ'য়ে তার আচরণকে 'অন্তরস্পর্শী' বিশেষণ দিয়েছিলেন ; সেই থেকে সে তার আচার-ব্যবহারে 'আন্তরিকতা'র সজ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সে যেখানে আসত তার বন্ধুকুল ঝঞ্ঝার মুখে তুষের মতো উধাও হ'য়ে যেত ; কিন্তু সুখের বিষয়, এটা তার চোখে পড়ত না, কেন-না বিধাতা নিকট-দৃষ্টির সঙ্গে তাকে দিয়েছিলেন একখানা অত্যন্ত স্থূল ত্বক। এত গুণের উপরে তার আরো একটি মহৎ গুণ ছিল : কখনো সঙ্গের অভাব তার ঘটত না। সে নিজেই ছিল নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী, নিজেই ছিল নিজের শ্রেষ্ঠ পূজারী, নিজেই ছিল নিজের শ্রেষ্ঠ শ্রোতা।

নমস্কারের পরিবর্তে মুষ্ট্যাঘাত ক'রে দীনেশ তার বন্ধুদের অভিবাদন করত। প্রথামত প্রবোধের বুকে দু-চারটে সজোর ঘুসি মেরে হাস্য-বেসুর স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল :

'জীবন কিংবা সময় কিংবা নদী
কারোর লাগি রয় না নিরবধি।

আর তুমি কি-না এমন দিনটা ছড়া লেখার পাগলামিতে কাটাবে। বাবা, চিরদিন কচি খোকাটি থাকলে কি চলে? ছিঁড়ে ফেলো তোমার প্রবন্ধ আস্তাকুঁড়ে, ছুঁড়ে ফেলো তোমার পদ্য উনুনে। বেরিয়ে এসো, দাদা, বাইরে বেরিয়ে এসো, পুরুষমানুষের করবার মতন কাজ অনেক বাকি রয়েছে।'

অতটুকু শরীরের মধ্যে অত বড়ো স্বর দীনেশ কী ক'রে লুকিয়ে রাখত, এই রহস্য যেদিন উদ্‌ঘাটিত হবে, সেদিনে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের আর কোনো অবিশ্বাস থাকবে না। কিন্তু এই সমস্যার পূরণ করবার জন্যে প্রবোধ এখন ব্যস্ত ছিল না। দীনেশের ভৈরব-রবে তার চোখ একবার ব্যথাতরল হ'য়ে উঠল ; তার দেহ একটু আঘাত-আকুঞ্চিত হ'য়ে গেল, তার মুখাগ্রে একটা তীব্র প্রতিবাদ ছুটে এল ; কিন্তু তবু সে রইল নিরুত্তর। সম্ভবত সেই সহৃদয় অভিবাদনের পরে তার রুদ্ধনিঃশ্বাস এখনো ভালো ক'রে ফিরে আসেনি।

তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে দীনেশ আবার বললে : 'সত্যি বলছি, তোমাদের মতো

এক্‌লা-এক্‌লা ঘরটির ভেতর ব'সে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দিনেব পর দিন কাটানো আমার কর্ম নয়। তোমরা কিন্তু পারোও তো! বাবা, এ তো ঘর নয়। এ যেন পাড়াগেঁয়ে শ্মশান!'

প্রবোধের ধৈর্যের সীমা এবারে সে অতিক্রম করেছিল। প্রবোধ হুলে বিষ ভ'রে আস্তে-আস্তে জবাব দিলে : 'আমি তো দেখি উল্টো। এ-ঘর যেন ভেটেরাখানা। অভ্যাগতদের অষ্টপ্রহর অত্যাচারে আমার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।' প্রবোধের শান্ত স্বরে ঘনোচ্ছ্বাসের লেশ তখনো বর্তমান ছিল।

প্রবোধের শর-সন্ধানের বাহাদুরি দিতে হবে ; তার বাক্যবাণ দীনেশের অক্ষয় কবচেরও মধ্যে চিড় খুঁজে বার করেছিল। এর পূর্বে দীনেশকে আর অপ্রতিভ হ'তে দেখা যায়নি। সে তার বিখ্যাত আন্তরিক হাসি হেসে বললে : 'হাঃ, হাঃ, বেশ! বেশ! সে যাক্‌। তোমরা লেখক মানুষ, তোমাদের সঙ্গে কথায় কে পারবে! বাজে কথা বলা আমার স্বভাব নয়, আমি তোমাকে একটা সুখবর শোনাতে এসেছি। বোধহয় তুমি জানো সম্প্রতি আমি হাজার-পনেরো টাকা পেয়েছি। বাবা, আজকাল আর চালাকি নয়। আমি এখন বড়োলোক, নিজের উন্নতি চাও তো—।'

প্রবোধের মেজাজ এখনো শীতল হয়নি ; তার মনে হচ্ছিল তার হৃদয় যেন ক্ষুব্ধ দুর্বৃত্তি দিয়ে ভরা ; সে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে। আত্মার অদম্য তিক্ততা অতিকষ্টে চেপে সে উগ্র স্বরে উত্তর দিলে : 'না। কতকগুলো লোক আছে যারা নিজেদের—।'

দীনেশ দমবার পাত্র নয়, সে বাধা দিয়ে বললে : 'আগে আমার বক্তব্যটা শোনোই, তারপরে জবাব দিও। আমার পিসিমার কথা তোমায় অনেকবার বলেছি, সেই যে যিনি কাশীতে থাকতেন। তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন কি-না, তাই তাঁর সব টাকাকড়ি আমায় দিয়ে গেছেন। ঊর্ধ্বে গমন করতে হ'লে শরীর লঘু হওয়া চাই। টাকার ভার বড়ো ভার।'

দীনেশ নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে খুন হ'ল। প্রবোধের ওষ্ঠের দৃঢ়তা যে আরো দৃঢ় হ'ল তা তার চোখেও পড়ল না। সে বললে : 'কিন্তু তুমি আমার চিঠি কি পাওনি?'

প্রবোধ যখন দিন-দুয়েক পূর্বে দীনেশের নিমন্ত্রণপত্র পায়, তখন সে ঠিক করেছিল যে, ডিনারের দিনে কোনোরকমে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে এবং পরে দীনেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে অসুস্থতার ভান ক'রে তার মার্জনা প্রার্থনা করবে। আটটা থেকে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত দীনেশের অফুরন্ত উৎসাহ সহ্য করতে যে পারে তার অসাধ্য ত্রিভুবনে কিছু না-থাকলেও, তার ভাগ্য ঈর্ষার্হ নয়। কিন্তু আজকের দিনের আত্মমমতার অনবকাশে প্রবোধ সে-নিমন্ত্রণের কথা একদম বিস্মৃত হয়েছিল। সে মনে-মনে ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে মুখে বললে : 'না ভাই, আমার দুর্ভাগ্য, পাইনি। আগে যদি তোমার পদবৃদ্ধির কথা জানতুম তা হ'লে আজকের দিনটায় আর অন্য কোনো কাজের তাগিদ রাখতুম না।'

আত্মরক্ষার্থে মিথ্যা বললে নরকস্থ হ'তে হয় কি? তা-ও যদি হয়, সে-ও দীনেশের আন্তরিক অন্তরঙ্গতার থেকে শত শ্রেয়। দীনেশ তার চিরাভ্যস্ত শিষ্টতা দেখিয়ে বললে : 'দুর্ভাগ্য শুধু আমার এক্‌লার। কিন্তু সে ভালোই হয়েছে। পোস্টাপিসের গল্‌তির জন্যে তুমি আর না-বলার সময় পাচ্ছ না। যোগেশ আর হরেন যেমন করলে, আগে নেমন্তন্ন গ্রহণ ক'রে

শেষে কাজের হুড়োয় শহরের বাইরে ব'সে রইল। আমি বলি, যদি চব্বিশ ঘণ্টা কাজই করবে, তাহ'লে বেঁচে আর কী সুখ?'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু-টিন্তু শুনছি না, দাদা, উপরন্তু তারা কাজের লোক, তোমার তো আর সে বালাই নেই। তোমাদের যে অনুরোধ করলেই পায়াভারি হ'য়ে যায়। এই আমি বসলুম, তুমি কাপড় প'রে যতক্ষণ-না বেরুচ্ছ, আমি উঠছি না। দেখি তোমার কোট বড়ো না আমার কোট বড়ো।' দীনেশের স্বর মিনতি-মধুর, কিন্তু তাতে ভগ্নমনোরথ হবার ইশারামাত্র ছিল না। প্রত্যাখ্যান গ্রহণ করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ, সংশয় তার ধারণাতীত, পরেচ্ছার বিচার তার পক্ষে অসম্ভব।

অগত্যা প্রবোধকে রাজি হ'তে হ'ল। সন্তরণপটু মানুষ মাত্রেই জানেন যে জলতৃণের আবেষ্টন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের সুকোমল অথচ দুর্জয় আলিঙ্গনে গা ঢেলে দেওয়া। এইরকম সংযোজক বন্ধু-বান্ধব আছে ব'লেই বোধহয় জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এছাড়া, দীনেশের পীড়াপীড়িতে প্রবোধ যে একটু গর্ব অনুভব করেনি, এ-কথা বললে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সে বন্ধু যতই হেয় হোক্-না কেন, কারুর কাছে নিজেকে অপরিহার্য জানাতে একটা স্বপ্রতিষ্ঠা আছে।

উপরন্তু হয়তো-বা অন্তত সেই দিনটার জন্যে দীনেশের নীরস আসঙ্গে প্রবোধ একটা লঘুতা, একটা আসান অনুভব করেছিল ; কেন-না, আত্মত্যাগের সঙ্কল্পে বিলাস আছে সত্য, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙার বা স্থগিত রাখার প্রসাদটাও কিছু নগণ্য নয়। সে যে-কারণেই প্রবোধ সে-রাত্রে দীনেশের সঙ্গে একটি বিখ্যাত বিলেতি ভোজনশালাতে আহার ক'রে থাকুক্-না-কেন, চিত্রগুপ্তের খাতায় তার সেই দিনটার লিখন রক্তাক্ষরে।

তার বৈচিত্র্যহীন জীবনের সেই দিনটার ঘটনাবলির ঘনানুক্রমে সে-ভোজটার স্মৃতি প্রবোধের মনে একটু ক্ষীণ হ'য়ে এসেছিল। তার মনে ছিল শতাধিক বিজলি পাখার সমতালে ঘূর্ণন, সহস্রাধিক বৈদ্যুতিক বাতির আতপ্ত আলোক, অসংখ্য শুভ্রাচ্ছাদিত টেবিল আর অগণন লোক। তার মনে ছিল নির্বাক শুভ্রবেশী পরিবেষকদের আনাগোনা, সুস্বাদু খাদ্যের ক্রমান্বয়, কাঁচপাত্রে ছুরিকাঁটার টুন্‌টুনানি, শ্যাম্‌পেন বোতল খোলার ফট্‌ফট শব্দ। তার মনে ছিল সিগারেটের ধোঁয়া, একটা সিক্ত গরম, উচ্চ হাসির ঝল্‌কা, আলাপনের গাঢ় গুঞ্জন। তার মনে ছিল খালি টেবিলের উপর রঙ-বেরঙের সুরা, বিদেশিনীদের দ্যোতনাপূর্ণ সাজসজ্জা, অনাবৃত বক্ষের বাহুল্য, অনাবৃত পৃষ্ঠের শুভ্রতা, অনাবৃত বাহুর লীলা, অর্ধমুদিত চক্ষের নিমন্ত্রণ, বেসুরা নিগ্রো সঙ্গীত, আর নৃত্য, মত্ত নৃত্য, অলজ্জ নৃত্য, তাণ্ডব নৃত্য এবং একটা কামোদ্দীপনা, আকাশে, বাতাসে, ঘরের মধ্যে, বিলাসব্রতীদের চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে একটা কামোদ্দীপনা। সে অনুভব করেছিল যেন সে একটা গতির মধ্যে এসে পড়েছে, তার চারদিকে একটা ব্যস্ততা, একটা ত্রস্ততা, যেন এই প্রমোদ-সন্ধানীরা কার সঙ্গে ছুটে পাল্লা দিতে চায়, কার কাছে পরাজিত হবার আগে জয় করতে চায়, কী একটা শূন্যতাকে একটা অধিক শূন্যতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চায় ; তারা যেন নিজেদের ভিতরের ফাঁকির শোধ তুলতে চায় জীবনকে ফাঁকি দিয়ে। তাদের আনন্দের মধ্যে আরাম নেই, আছে অভিনয় ; রভস নেই,

আছে অবসাদ ; রসোন্মত্ততা নেই, আছে মাতলামি ; সমর্পণ নেই, আছে গ্রহণ, দস্যুতা, কার্পণ্য। আর তার চারদিকে কামোদ্দীপনা, অশান্ত প্রবৃত্তি আর উন্মত্ত আসক্তি। আর তার মনে ছিল, এই বিক্ষুব্ধ আবর্তের কোলাহল ভেদ ক'রে, ছাপিয়ে দীনেশের বক্তৃতার অনন্ত, অক্লান্ত, স্নায়ুচ্ছেদী, মর্মভেদী সুর।

দু-এক পাত্র মদিরা উদরস্থ হলেই দীনেশের মূর্ছিত দেশাত্মবোধ সচেতন হ'য়ে উঠত। কাজেই, সেদিনে যে প্রায় বোতলখানেক শ্যাম্‌পেনের উত্তেজনায় তার স্বদেশিকতাটা একটু অস্বাভাবিকরকমের জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দীনেশের দেশভক্তি ছিল সত্যই অচলা, অথবা আরো ঠিক ক'রে বলতে গেলে, ছিল স্থবিরা ; অর্থাৎ সে-প্রীতির কার্যকারিতা মোটেই ছিল না, কিন্তু তার বাক্‌পটুতা বৃদ্ধাদের মতো অফুরন্ত, অসহন। কাজেই সময়মতো সে হ'ত সেই দলভুক্ত, যে-দলের মধ্যে ঘটত বক্তার অভাব। তার এই আতুর-তারণ-ব্রত—তাকে সে-সময়ে একজন শক্তিপূজারী ক'রে তুলেছিল। শ্রোতাদের উত্তেজিত করাই যদি স্বদেশী বক্তৃতার উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে দীনেশের বাক্‌চাতুরি ধন্য, কেন-না, প্রবোধের মতো নীরব বৈষ্ণবেরও তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল।

প্রতিবেশীদের নৃত্যের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ অবকাশে প্রবোধ দীনেশকে বলেছিল : 'মিছে মাতলামি ক'রো না। এতগুলো ভদ্রলোকের মাঝখানে চিৎকার করতে তোমার যদি-না কোনো সঙ্কোচ থাকে আমার আছে। লড়া[ই]য়ের ফলাফল চোখের সামনে দেখতে পারছি, সাদা চোখে তুমিও দেখতে পাবে।'

তাতে দীনেশ দন্ত নিষ্কাশিত ক'রে জবাব দিয়েছিল : 'ভদ্রলোক! এই মদ্যপিপাসু দুশ্চরিত্র কুঠোগুলো ভদ্রলোক? ওরা ভদ্রতার কী জানবে, ওরা শুধু জানে মদের আর মেয়েমানুষের মহিমা। সাদা চামড়ার চক্‌চকানিতে তোমার মতো কাপুরুষেরা ভয় পেতে পারে, আমরা জানি সাদাকে কালো করবার সহজ উপায় হচ্ছে বারুদ।'

প্রবোধকে নিরুত্তর দেখে সে আরো উগ্র স্বরে ফের বলেছিল : 'তোমাদের অহিংসা জানতে কি আমার বাকি আছে। ও হচ্ছে দুর্বলের একটা ছুঁতো মাত্র। ভীরুর একটা আত্মপ্রবঞ্চনা।'

তাতে প্রবোধ বলেছিল : 'সেটা তোমাদের মতো সাহসীদের বরাত-জোর। আমরা যে-দিন হিংস্র হ'য়ে উঠব, সেদিন তোমাদের ধ্বংস প্রথমে।'

সৌভাগ্যের বিষয় ততক্ষণে বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছিল, নৃত্যশালা তখনই বন্ধ হ'য়ে যাবে।

তারা যখন বেরিয়ে এল, তখনো রাস্তা জনহীন হয়নি, যদিও লোকের ভিড় একটু কমেছে। খোলা হওয়ায় প্রবোধের কোপ তৎক্ষণাৎ উবে গেল ; শুধু তার মনে জেগে রইল এই ভাবনা যে, কী ক'রে সে দীনেশকে বিনা-সঙ্ঘর্ষে বাড়ি ফিরিয়ে নেবে। দীনেশের ক্ষাত্রধর্মে অমত্ত মানুষ মাত্রেরই বিচলিত হবার কথা। কিন্তু গাড়ি বা ট্যাক্সি মিলল না, কাজেই পদব্রজে গমন করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর রইল না।

রাস্তায় দু-চার কদম চলবার পরেই প্রবোধের একটা আশ্চর্য অনুভূতি জেগে উঠেছিল :

তার মনে হয়েছিল যেন তার বুদ্ধি, যেন তার জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আটপৌরে প্রবোধ, যে, দীনেশের জড়-যুক্তিতে তির্যক্ উক্তিতে একটা ঘোর বিরক্তি এমন-কি ক্রোধ বোধ করছিল ; অপরটা হচ্ছে একজন অপরিচিত, অথবা স্বপ্নে পরিচিত আদর্শ প্রবোধ, যার অক্ষমতাগুলো সব চ'লে গেছে, যার মধ্যে মামুলি প্রবোধের গুণগুলো শতগুণ বর্ধিত হ'য়ে বিরাজ করছে, যে দীনেশের বাচালতা মার্জনা করতে সমর্থ, দীনেশের শোণিত-মরীচিকায় সুরার লালিমাটুকু পৃথক ক'রে দেখে হাসতে সক্ষম, দীনেশের অপরিমিত অহমিকাকে তার অন্তঃকরণের খাতিরে আদর দিতে ইচ্ছুক।

প্রায় একশো পা চ'লে তারা এসে পড়ল চৌরঙ্গীতে। মোড় ঘুরে সদর রাস্তায় এসেই প্রবোধ দেখতে পেলে, একজন মধ্যবয়সী ইংরেজ তাদের দিকে মন্থরগমনে ট'লে আসছে। বাইরে থেকে তাকে ভদ্র ব'লেই মনে হয় : তার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ; তার মুখ পরিমার্জিত ; তার গতিবিধি সুশিক্ষিত। কিন্তু তাকে দেখবা মাত্রই প্রবোধের সেই বিশ্বব্যাপারে নির্লিপ্ত অংশটি কী এক আধিলৌকিক শক্তির দ্বারা, কী এক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করলে যেন তার নিরুদ্ধ জীবনের একটানা অনুৎকর্ষতার শ্লথ স্রোতের উপরে কোনো এক অজানা জগতের বৈচিত্র্যময় বাত্যার মতো এই শ্বেত-পুঙ্গবটি এখুনি এসে পড়বে। দৈনন্দিন প্রবোধ শিষ্টাচারের খাতিরে বাঁয়ে একটু স'রে গেল, দৈনন্দিন প্রবোধ দীনেশের হিংসাবাদের প্রতিবাদ ক'রে বললে, 'কিন্তু যা-ই বলো, অন্য জাতের মধ্যে ব্যক্তিগত মহত্ত্বের বিকাশ বেশি স্পষ্ট হ'তে পারে ; কিন্তু পরিব্যাপ্ত ঔদার্য ইংরেজদের মতো আর অন্য কোনো জাতের মধ্যে নেই।' কিন্তু সেই সম্প্রতি-জাগ্রত প্রবোধ আশু দ্বন্দ্বের জন্যে সমস্ত শরীর-মনকে প্রস্তুত করতে-করতে চলেছিল।

আগন্তুকের জন্যে প্রবোধ যতটা পথ ছেড়ে দিয়েছিল, তাতে ক'রে সাদা-কালোর সংঘর্ষ নিবারণ করা অসম্ভব, কেন-না, সাহেবটি কৃষ্ণচর্মের জন্যে মার্গচ্যুতি নিষ্প্রয়োজন ব'লে ভেবেছিলেন। উভয়ে সামনাসামনি হ'তেই প্রবোধের দক্ষিণ স্কন্ধে শ্বেতাঙ্গের বামস্কন্ধ ঘোর আঘাত করলে ; আর অমনি নিত্যকার প্রবোধের সমস্ত দিনকার সঞ্চিত বিদ্রোহ তার ডান কনুয়ে গিয়ে নিলে আশ্রয়। সাহেব ব্যথিত ধাক্কাটা অতি কষ্টে সামলে নিয়ে শুরু করলেন : 'What the....'

প্রবোধ ততক্ষণে উক্তিটাকে সম্পূর্ণ ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে : 'What the bloody hell do you mean?'

কৃষ্ণকান্তের এরূপ অভাবনীয় দুঃসাহস সাহেবের অভিজ্ঞতার অতীত। তিনি বাক্যহারা হ'য়ে বললেন : 'I... I....' তাঁর স্বরে ক্রোধের চেয়ে বিস্ময়টাই বেশি।

প্রবোধের উত্তমাংশ ধীর, শান্ত কৌতুকের স্বরে উত্তর দিলে : 'Don't be at a loss for words. You are a bumptious loafer.' এতক্ষণে সাহেব বাক্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি লোহিতাননে বললেন : 'How dare you insult me' How dare you insult me! Do you know who I am?'

প্রবোধ অবিচলিত স্বরে জবাব দিলে : 'For ought I care you might be the Governor

of Bengal. You don't suppose, you own this street; do you? If you don't want to be insulted shut up and get out of my way.'

সাহেবের মুখ দেখে প্রবোধের ভয় হ'ল বুঝি তাঁর মূর্ছা হবে। তিনি নিঃশ্বাসহারা হ'য়ে চিৎকার ক'রে বললেন : 'I... I... I'm the Chief Presidency Magistrate! I've a good mind to run you in.'

দীনেশের নেশা একদম ছুটে গিয়েছিল। সে মিনতি-মধুর সুরে সাহেবকে অনুরোধ করলে : 'But then you should not take advantage of your position, Sir.'

সাহেবের ক্ষত আত্মপ্রেমে সে যেন প্রলেপ দিয়ে দিলে। তিনি গলাটা একটু নিচু ক'রে, মুখ একটু কম লাল ক'রে বলতে শুরু করলেন : 'But....'

কিন্তু প্রবোধ তাঁকে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ সুরে ব'লে উঠল : 'That's another example of propping up skunks in high places.'

'I'm going to hand you over, I'm going to hand you over, you swine!'

সাহেব আত্মহারা, তাঁর কথাগুলি যেন সংহত বিষ।

প্রবোধ বললে : 'What's the good of empty threats. Try it and see.'

সাহেব চেঁচালেন : 'Sergeant!' 'Sergeant!!'

প্রবোধ দেখলে মোড় থেকে দু-জন সার্জেন্ট ছুটে আসছে। সে শুনলে দীনেশ বলছে, 'আমি বিনোদবাবুকে খবর দিতে যাই।' সে দেখলে দীনেশের দ্রুতপদে অন্তর্ধান, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উন্মত্ত আস্ফালন, চারদিকে জনতার জমায়েৎ। তারপর তার চোখে সমস্ত জগৎ রক্তাক্ত হ'য়ে গেল ; তার মনে হ'ল তার মাথার মধ্যে কে সহস্র জয়ঢাক বাজাচ্ছে। কিন্তু তার নির্লিপ্ত অংশটি তার জিহ্বায় কতকগুলো চোখা-চোখা, বাছা-বাছা কথা এনে দিলে— এমনতর কটূক্তি সন্ধান করতে কিছু সময় লাগে। সে স্পষ্ট, দৃঢ়, সংযত স্বরে ব'লে উঠল : 'You leperous lying lout ! You swanking sneaky swine ! You bloody son of a bitch!'

তারপর তার নিজের কার্যের উপর তার আর কোনো সংযম রইল না। তার চোখে যখন ফের দৃষ্টি ফিরে এল, সে দেখলে তার দুইপাশে দুই সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে, এবং সাহেব একটা রুমাল দিয়ে তাঁর নীলাভ নয়ন ঢাকতে চেষ্টা করছেন। ততক্ষণে প্রবোধ তার হাত-পায়ের উপর স্বীয় স্বৈরিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সে অকম্পিত কণ্ঠে সার্জেন্টদের বললে : 'আমার হাত ছেড়ে দাও, আমাকে কি তেমনিতর লোক দেখাচ্ছে যে পালাবার চেষ্টা করবে।'

সার্জেন্টরা তার আগাপাশতলা নিরীক্ষণ ক'রে, তার সান্ধ্য পরিচ্ছদের পরিপাটিতে সম্ভবত বিস্মিত হয়েছিল। তারা ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে তাকালে। সাহেব কথা না-ক'য়ে কী একটা ইশারা করলেন, এবং সার্জেন্টরা একটা ট্যাক্সি ডেকে প্রবোধকে তাতে তুলে লালবাজারাভিমুখে করলে যাত্রা।

দীনেশ সত্যিই বিনোদবাবুকে খবর দিয়েছিল। তিনি এসে জামিনের জন্য দরখাস্ত করলেন, কিন্তু জজ তা মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলেন। সে নেশার ঝোঁকে এ-কাজ করেছে, এত বড়ো

মিথ্যাটা বলতে প্রবোধ করলে অস্বীকার। কাজেই জলের মতো টাকা খরচ ক'রেও বিনোদবাবু তাঁর পুত্রকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হ'তে বাঁচাতে পারলেন না।

কিন্তু প্রবোধের একগুঁয়েমিতে তিনি কষ্ট বা তার শাস্তিতে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন বললে, মিথ্যা বলা হবে। সে-বারে বন্ধুসভায় চোখ থেকে এককণা পরিকল্পিত অশ্রু মুছে তিনি বলেছিলেন : 'তা ওকেই-বা দোষ দেব কী ক'রে? ও তো আমারই ছেলে। সত্যপ্রিয়তা আর সাহস আমাদের বংশগত দুর্বলতা।' এবং তারপরে প্রবোধের কারাদণ্ডের অবিচারের প্রতিবাদ ক'রে যখন টাউন-হল্-এ সেই বিরাট সভা হয়, তখন সে-সভার মুখবন্ধ ও উপসংহার-স্বরূপ প্রবোধের লেখা যে দুটি কবিতা পাঠ হয়, তা নির্বাচন ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। আবৃত্তির পর যখন করতালি আর কিছুতেই থামতে চাইছিল না, তখন তাঁর পুত্রের প্রতিনিধি হ'য়ে সে-সম্মান তিনিই সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন ; এবং 'পরিপ্লাবন' সভার অশান্ত জনতা-সাগরকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে গিয়ে তিনিই অশ্রুস্তব্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন।

তার পরদিন বন্ধুদের বাংলা কাগজগুলো দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন : 'আজকালকার সাহিত্যিকদের মধ্যে অতিশয়োক্তি দোষটা একটা সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এইবারকার বসন্তের পুষ্পিত সমৃদ্ধির জন্যে বিগত বসন্তের লুপ্ত শ্রী যতটা দায়ী, প্রবোধের প্রতিভায় আমার দায়িত্ব তদপেক্ষা অধিক নয়। আমার উদাহরণ, আমার দীক্ষা, আমার প্রশংসা না-পেলে প্রবোধের মনীষা-কুসুম কখনোই বিকশিত হ'ত না সত্য বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া না-হ'লে আমার কৃতিত্ব কোথায় থাকত? কলমের উত্তমতা নির্ভর করে মৌলিক তরুর উৎকর্ষতার উপরে, এর বেশি খ্যাতি আমার প্রাপ্য নয়।'

আর প্রবোধ? যখন তার বিচার হচ্ছিল, যতদিন পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট ছিল, সে অনুভব করেছিল একটা বিপুল, বিরাট অবসাদ, অত উত্তেজনার পরে যেন তার অন্তরাত্মা নিষ্প্রাণ হ'য়ে গেছে। তার বশ্য, অলস, গ্লানিময় জীবনের একটিমাত্র সিদ্ধি, একরাত্রির রোমাঞ্চন একনিমেষের নিশ্চিন্ত বিদ্রোহ তার শিরায়-শিরায়, বক্ষের শোণিতে, মস্তিষ্কের অবরুদ্ধ কক্ষে যে একটা উন্মাদনার অপূর্বতা এনে দিয়েছিল, সেটা এখন ফুরিয়ে গিয়ে, পূর্বরাত্রের মাদকতার অন্তে পরপ্রাতের পীড়িত নিশ্চলতার মতো একটা শিথিল নিষ্ফলতার তিক্ত স্বাদ তার অন্তরকে রেখেছিল মগ্ন ক'রে। কিন্তু যেমনি তার অদৃষ্টের একটা নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল অমনি তৎক্ষণাৎ তার সে-সমস্ত ভাব হ'ল অন্তর্ধান, সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে জেগে উঠল এক অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দ, দেখা দিলে আনন্দ। বন্দীজীবনের কঠোরতা, সে তো শুধু দেহের ; তাতে মুক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার নেই। ভবিষ্যৎ-চিন্তার দায় নেই। সেখানকার পরিশ্রম, সে তো শুভ ; তাতে জীবিকা অর্জনের পশুতা নেই, মানবাত্মাকে খর্ব করার প্রয়াস নেই। সে-জীবন কিঞ্চিৎ সমভাবাপন্ন বটে, কিন্তু সময় সেখানে নির্মূল্য, গণনাতীত, সময় সেখানে শ্লথমুষ্টির ফাঁক দিয়ে পালায় না। সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে উৎকোচ দিতে হয় রক্ষীদের, অন্যায়কে নয়।

যে দু-একখানা সংবাদপত্র কর্তিত কলেবরে তার করস্থ হ'ত, তাতে তার নিজের নাম দেখে, সে প্রথম-প্রথম একটু সঙ্কোচ বোধ করত, তার মনে হ'ত সে বুঝি দেশকে ফাঁকি

দিয়ে বিখ্যাত হয়েছে। সে যে ইংরাজের সাথে আত্মশক্তির পরীক্ষা করেছিল, সে তো দেশাত্মবোধের প্রেরণায় নয়, হিংসার তাড়নায় নয়, সে শুধু তার জীবনের একীভাব সমাপ্ত করতে, জীবনের খর্বতার ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মানসে, সে শুধু তার অদৃশ্য আত্মাকে আবিষ্কার করার জন্যে। দেশের লোক যদি সেটাকে ভুল বুঝে থাকে...। কিন্তু বিনোদবাবুর মাসিক আগমনে সে-সন্দেহটা ঘুচেছিল। তিনি প্রবোধকে সুচারু ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে দেশের লোক তার আত্মার, তার বংশানুক্রমিক প্রতিভারই সংবর্ধনা করতে চায়। তার কবিতার মনোরঞ্জনতাই কি এই বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়। সে-সময়ে প্রবোধ নির্বাক্ ছিল বটে, কিন্তু কারাকক্ষের নির্জন অন্ধকারে তার দুইটি নিকৃষ্ট কবিতার অত সমাদরের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে তার রজনী বিনিদ্র হ'য়ে উঠত। কিন্তু তৃতীয়বার এসে বিনোদবাবু যখন তার কবিতা পাবার জন্য সম্পাদকদের সাগ্রহ অন্তর্বিরোধের কাহিনী তাকে জানালেন, তখন তার নিরানন্দের শেষ হেতুটি অবধি বিলুপ্ত হ'ল।

তাকে নিয়ে যদি সারা দেশ জুড়ে অতটা হৈ-চৈ না-প'ড়ে যেত তাহ'লে তার নির্বিচারে বিনা-বাক্যে আজ্ঞাপালনের জোরে ও তার নিরাপত্তি নিয়মানুবর্তিতার গুণে সম্ভবত সে ছয় মাসের পূর্বেই মুক্তি পেত। কিন্তু তার গুণমুগ্ধদের আন্দোলনের অবিচ্ছিন্নতায় প্রবোধের নিরীহতা সম্বন্ধে সরকার-বাহাদুর একটু সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাহ'লেও ছয় মাস তো আর অনন্তকাল নয় ; কাজেই একদিন এক মড়ক-বিদূষিত বসন্তপ্রাতে অবরোধের স্বাধীনতার মধ্য হ'তে মুক্তির নিষ্পেষী আলিঙ্গনের ভিতরে প্রবোধকে ফিরে আসতে হ'ল।

পুনর্মিলনের শিরশ্চুম্বন দিয়ে বিনোদবাবু যে-পুত্রকে তাঁর গত-গৌরবের শূন্য পাটে বরণ করলেন, সে-পুত্র কিন্তু তাঁর পরিচিত প্রবোধ নয়। এ-প্রবোধ স্বীয় দুর্বলতার গভীরতা তো জেনেছিলই, এমন-কি সে আত্মশক্তির সীমার সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত। কিন্তু তার শিক্ষার এখনো অনেক বাকি ছিল ; স্বীয় অপূর্ণতা জানলেও, অপরের ন্যূনতার অস্তিত্ব বিষয়ে সে এখনো ছিল অত্যন্ত অজ্ঞ। সে তখনো বোঝেনি যে খ্যাতি গুণের জোরে আসে না, আসে বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে, এবং সম্মান অর্জন করার চেয়ে পরের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা নিজের মাথা পেতে নিতে পারার শক্তিটাই বেশি বাঞ্ছনীয়।

সেইজন্যেই সম্ভবত সেইদিন সায়াহ্নে তাদের বাড়িতে নব-নেতার দর্শনপ্রত্যাশী দেশভক্তবৃন্দের সমাবেশে সে উপস্থিত হ'তে সঙ্কোচ বোধ করেছিল। তারপরে যখন অন্তর্বাষ্পব্যাকুল বক্ষকে প্রকৃতিস্থ ক'রে সে শোবার ঘর থেকে নিচে নেমে এল, তখন সে ব্রহ্মলগ্ন-ভ্রষ্ট। তখন মাল্য-পরিহিত বিনোদবাবু বক্তৃতা করছিলেন। বিনোদবাবুর বক্তৃতায় যে লোকে কেন অত ঘন-ঘন করতালি দিচ্ছিল, তা বুঝে দেখবার অবকাশ প্রবোধ পায়নি ; তখন তার মনপ্রাণ ভ'রে উঠেছিল তার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতায়। সভার সমক্ষে আত্ম-অযোগ্যতা জ্ঞাপন করার জন্যে যে-সপ্রতিভতার, অলজ্জতার আবশ্যক তা প্রবোধের ছিল না। কাজেই এত লোকের সামনে পিতাপুত্রের আলিঙ্গনটা প্রবোধের কিছু কুরুচি-সম্পন্ন ব'লে লেগেছিল ; কিন্তু যে-পিতা তাকে আজ অত বড়ো অগ্নিপরীক্ষার থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁর এই সামান্য ইচ্ছার পূরণে সে প্রতিবন্ধক হয় কী ক'রে? সে সংকল্প করেছিল যে অভ্যাগতদের

যাবার সময় দ্বারে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে জনান্তিকে কথা ক'য়ে সে এই উদারচেতাদের ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু তার সে-অভিপ্রায় পূর্ণ হ'ল না। সভাভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে তার পিতা তাকে জানালেন যে একজন প্রবীণ সম্পাদক তার সহিত আলাপ করতে ইচ্ছুক। অতএব তাকে সেই বৃদ্ধের উপদেশ শুনতে যেতে হ'ল, আর বিনোদবাবু তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তার সঙ্গে অতিথিদের বিদায় করলেন।

উষা-র সম্পাদক ছিলেন একজন বিখ্যাত নেতা। বঙ্গচ্ছেদের সময় তাঁর দেশভক্তির জন্যে তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁকে 'ভারতমিত্র' উপাধি প্রদান করে ; এবং তাঁর স্বাদেশিকতার জন্যে সরকার-বাহাদুর তাঁকে আহ্বান করে তাদের নির্বিচারী আতিথেয়তায়। লোকে বলত এখনো নাকি তিনি চরমপন্থীদের গোপন অধিনায়ক।

প্রবোধের কিন্তু লোকটিকে পছন্দ হ'ল না। এমন-কি তাঁর পিঠ-চাপড়ানো অভ্যর্থনায় সে একটু বিরক্তই হয়েছিল। তিনি প্রবোধকে জানালেন যে তার মতো স্বার্থত্যাগী পুরুষের কারাকাহিনীর জন্যে *উষা* সতত উদ্‌গ্রীব।

প্রবোধ একটু বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলে : 'আমার প্রতি আপনারা যে-সম্মান দেখাচ্ছেন, তার জন্যে আমি একান্ত অনুগৃহীত কিন্তু আমি তার অযোগ্য। আমি জেলে দেশভক্তির জন্যে যাইনি, আর তা গেলেও আমি দেশভক্তিকে একটা পেশা করতে নারাজ।'

ভারতমিত্র হেসে বললেন : 'আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এতটা বিনয় বিরল। কিন্তু আমি তোমাকে তো দেশভক্তিকে পেশা করতে বলছি না। তুমি সাহিত্যিক—সাহিত্য তোমার পেশা বটে তো? তোমাকে সন্তুষ্ট করবার মতো সংস্থান *উষা*-র আছে।'

তার কথার এরূপ যে অর্থ হ'তে পারে, তাতে বিস্মিত হ'য়ে প্রবোধ উত্তর করলে : 'আপনি ভুল বুঝেছেন ; আমি টাকার কথা তুলছি না। কিন্তু সতরঞ্চ বোনা আর দড়িপাকানোর মধ্যে এমন কী রহস্য থাকতে পারে যার উদ্‌ঘাটনের জন্যে দেশের লোক ব্যস্ত হবে?'

'দেশভক্তিতে পাকা হ'লেও সাহিত্যে তুমি নেহাৎ কাঁচা দেখছি। কারাকাহিনী মানে কারাগারের ডায়েরি নয় ; বাস্তব লোকের নাম নিয়ে উপন্যাস লেখাকেই বলে কারাকাহিনী।'

'মাপ করবেন, সত্যকে আমি পূজার জিনিস মনে করি, আর দেশের-দশের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প।'

প্রবোধের কণ্ঠ ভাবালুতায় গদগদ। সম্পাদক-মহাশয় তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন, যে-হাসিকে বঙ্গভঙ্গের যুগে তাঁর ভক্তরা বলত, প্রলয়ের হাসি, ভৈরবের হাসি, রুদ্রের হাসি।

প্রবোধ তার কবিতাগুলো তাঁকে দিতে চাইলে, কিন্তু তিনি জানালেন যে গদ্য চাই, লোকে কবিতা লিখতে ভালোবাসে কিন্তু পড়তে নয়। অবশেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর প্রবোধ তাঁকে 'মুক্তির উপায়' ব'লে এক প্রবন্ধ লিখে দিতে রাজি হ'ল। সর্বদিন-ব্যাপী উৎসবে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তার বশ্যতার এই হচ্ছে একমাত্র মার্জনা।

কিন্তু সে-প্রবন্ধটা প্রবোধ তার মন-প্রাণ দিয়েই লিখেছিল। তার মনের একটা ঔদার্য ছিল যা মুক্তি পেত এইরকম প্রসঙ্গেই। এছাড়া তার চিত্তের একটা অভিনয়-প্রিয়তা, আতিশয্য-প্রীতি, নীতিগর্ভতা ছিল যার সন্তুষ্টি হ'ত ঈদৃশ শব্দচ্ছটায়। সে যাই হোক্, 'মুক্তির উপায়'

প্রবন্ধে এই ছয় মাস ধ'রে যে-সমস্ত ধারণাগুলোর সে তদন্ত করেছিল, যে-সমস্ত অনুভূতিগুলো সে নিজস্ব করেছিল. যে-প্রতীতিগুলোর একটা সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনা করেছিল, সেইসব কথা সে চেষ্টা করেছিল অবাধে বলতে। সে লিখেছিল, 'দেশের মুক্তি হিংসার অসংযমের মধ্যে দিয়ে নয়, আত্মপরিচয়ের ব্রহ্মচর্যের মধ্যে ; মানবের মুক্তি জনতার কলরোলে নয়, গিরিগুহার নিবদ্ধ নিরুদ্ধতায় ; আত্মার মুক্তি যদৃচ্ছাচারের অসীমতায় নয়, আত্মশক্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে।' সে তাতে দেখিয়েছিল স্বাদেশিকতার ক্ষুদ্রতা, জাতীয়তার ব্যর্থতা, অসহযোগের অপূর্ণতা।

অনেক আশা ক'রে প্রবোধ তার প্রবন্ধটা *উষা*-র সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করেছিল ; কিন্তু তার ফল হ'ল অভাবনীয়। সম্পাদক-মহাশয় সেটা প'ড়ে. তাঁর সেই বিখ্যাত হাসি হেসে প্রবন্ধটা প্রবোধকে ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন : 'আজকালকার বালকদের মধ্যে বাচালতা বড়োই বেড়ে যাচ্ছে। তারা আজকাল আত্মা, অহিংসা, মুক্তি ইত্যাদি তেমনি সহজে লেখে যেমনি সহজে আমরা ছেলেবেলায় লিখতুম, প্রিয়ে, প্রাণনাথ। তোমার কাছ থেকে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ চাইনি, জানতে চেয়েছিলুম সরকার তোমার উপরে কীরকম ক'রে অন্যায় অত্যাচার করেছে।'

প্রবোধ বললে : 'কিন্তু আমার উপরে তো সরকার কোনো অত্যাচার করেননি, অত্যাচার করেছে দেশের লোকে, আমার আত্মীয়েরা।'

সম্পাদক দৃঢ় স্বরে বললেন : 'তা যদি না-ক'রে থাকে দেশের জন্যে অত্যাচারের আখ্যায়িকা রচনা ক'রে আনতে হবে। তবেই হবে দেশ স্বাধীন। তা যদি করতে পারো আমার কাছে এসো, *উষা* তোমায় সাহায্য করবে, নচেৎ বিদায়।'

তিনি আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রবোধ সেখানে আর বসতে পারলে না। সে বৃদ্ধের দিকে যে-দৃষ্টি হেনে ঝড়ের মতো বেগে বাহির হ'য়ে গেল, সে-দৃষ্টির ঘৃণার শতাংশের একাংশও যদি বিষে পরিণত করা সম্ভব হ'ত, তাহ'লে সম্পাদকের মৃত্যু অনিবার্য।

উষা-আফিসের বহির্দ্বার বন্ধ করার প্রচণ্ড শব্দ যখন ভারতমিত্রের কানে এসে মিহি সুরে পৌঁছুল, তখন তিনি প্রবোধের কারামুক্তির উপর তাঁর সেই বিখ্যাত অসামান্য সম্পাদকীয়টা লিখতে মনোনিবেশ করেছেন ; তার মুখে স্মিতহাসির একটি বক্র রেখা।

আর প্রবোধ ? তাকে অভিনন্দন দেবার জন্যে সেদিন বিকালে মির্জাপুর পার্কে যে বিরাট সভার আহ্বান করা হয়েছিল, তাতে তাকে দেখা গেল না। জন-কয়েক স্বেচ্ছাসেবককে তার সন্ধানে পাঠানো হ'ল, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, বাড়িতে তাকে দেখা গেল না। তখন নেতৃবর্গের মধ্যে একটা ত্রস্ত মন্ত্রণা ব'সে গেল এবং ভারতমিত্রের পরামর্শে ধার্য হ'ল যে বিনোদবাবু তাঁর পুত্রের প্রতিনিধিস্বরূপে সেই অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। সভাস্থ লোক শুনলে প্রবোধ অসুস্থ, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির বাহির হ'তে অপারগ।

কিন্তু সেদিন থেকে প্রবোধের আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি, সে নিরুদ্দেশ।

১৪-৩১ আষাঢ় ১৩৩৩

রূপকথা

সে অনেকদিনের কথা। তখনো স্বর্গমর্ত্যের মাঝখানের সুবর্ণ সেতু তো বর্তমান ছিলই, এমন-কি অসংখ্য যাত্রীর যাতায়াতে নরকের পুষ্পিত পথটাও প্রশস্ত, পিচ্ছিল ও নিষ্কণ্টক হ'য়ে উঠেছিল। কাজেই সেকালে মানুষে স্বর্গলাভ করা বা নরকস্থ হওয়াকে দুঃসাধ্যসাধন ব'লে বিবেচনা করত না ; তারা বিস্মিত মমতার হাসি হাসত ত্রিশঙ্কুর ন-যযৌ-ন-তস্থৌ অবস্থা দেখে। এবং ভাবিকালের পূর্বস্বাদ গ্রহণ করতে পারার ক্ষমতাই যদি মহাপুরুষের বিশেষ চিহ্ন হয়, তাহ'লে ত্রিশঙ্কুর মহত্ত্ব নিঃসন্দেহ। স্থাণুতা অধুনার অমূল্য অলঙ্কার। ত্রিশঙ্কু শত সহস্র যুগ পূর্বে জ'ন্মেও ছিলেন আমাদেরই সমসাময়িক।

একদল পণ্ডিত আছেন যাঁরা সর্বদা প্রতিপন্ন করতে চান যে সে-যুগের সঙ্গে তুলনায় হার আমাদের শতাব্দীর। এই অন্ধবিশ্বাসীদের ভ্রান্তিবিনাশ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কেন-না আমাদের সময় পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, এবং তাঁদের যুক্তিতর্কের ভিত্তি শত কল্পের ধূলি-বিধ্বস্ত কতকগুলো পাঁজি-পুঁথির উপরে। সামান্য রত্নের আশায় সংস্কৃত-সদৃশ একটা বর্বর ভাষার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাবার মতো দেউলিয়া অবস্থা আমাদের হয়নি। 'গোবরের মধ্যে মাণিক' সেকালের একটা প্রবাদ মাত্র ছিল, কিন্তু আমাদের জগতে তার অস্তিত্ব ঘরে-ঘরে। মধ্যযুগাকাঙ্ক্ষী মোরিস্-প্রমুখ র‍্যাফেলাগ্রজদের কালান্তক 'সময়-যন্ত্রে'র উদ্ভাবক যদি এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ মহাশয় না-হ'য়ে কোনো নব্য-বাঙালি হতেন, তাহ'লে উপরোক্ত শ্রেণীর পণ্ডিত-মূর্খদের অমৌলিক অহঙ্কার এতদিন অক্ষুণ্ণ থাকত না। কিন্তু সে যাই হোক্, আমি লিখছি তরুণদের জন্যে ; কাজেই পুরাকাল যে সুখের ছিল না, তা শুধু বললেই চলবে. তার প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তখন ধরিত্রীর উত্তরের ও দক্ষিণের দুয়ারদুটি ছিল খোলা। ফলত দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষ, অপ্সরী-কিন্নরী, ভূত-প্রেতের আনাগোনায় ত্রিভুবন সর্বদা সরগরম থাকত। এই আধিলৌকিক জীবেরা—এদের সত্তা এখন বিজ্ঞান-সম্মত—এরা কল্পারম্ভে জাত, অতএব এদের স্বভাব ছিল কিছু বালসুলভ। এদের মধ্যে গাম্ভীর্যের এরূপ অভাব পরিলক্ষিত হ'ত যে, ঠাট্টা-তামাসায়, হাসির হররায়, নাচের ভঙ্গিমায়. গানের ঝঙ্কারে জীবনটাকে এরা একটা উৎসবের ঐকতান ক'রে তুলেছিল। এই উতরোলের সংক্রমণে মানুষ হ'য়ে পড়েছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রমোদ-পিপাসু, অলস ও অকর্মণ্য। এর মধ্যে থেকেও যে-সমস্ত অতিমানব কর্মঠতার খ্যাতি রেখে গেছেন, তাঁরা আমাদের ঈর্ষার্হ না-হ'লেও নমস্য বটে। আমরা এখন একাগ্রতার কদর বুঝেছি, শান্তির

অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি, জীবনের উদ্দেশ খুঁজে পেয়েছি, কাজেই তাদৃশ আনন্দের আবর্তে মানুষ কী ক'রে বাঁচত, তা আমাদের ধারণাতীত। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এখন ছুটেছে বিশিষ্টতার দিকে, বৈচিত্র্যের ঘূর্ণিতে আমাদের মূর্ছা হওয়াই সম্ভব।

অবশ্য আমাদের মধ্যে এখনো এমন চপলমতি লোক আছেন যাঁরা বলবেন যে সেই তমসাবৃত যুগে হাসির ঝল্‌কা আমদানি করতে পারা সহজ শক্তি নয়। কিন্তু বিদেশী ঢঙের হাসির জঘন্য নিকৃষ্টতার বিশদ ব্যাখ্যা এই জাতীয়তার যুগে অনাবশ্যক। ধরা ধরাবাসীদের জন্যে।

সেই অজ্ঞানান্ধ যুগের এক অখ্যাত দিবসে দেবসভার তিনজন নর্তকী ইন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। সে-দিনটা একজন পদবর্ধিত পুণ্যাত্মা মানবের শত লক্ষ বৎসর স্বর্গবাসেব প্রারম্ভ। অতএব ইন্দ্র একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। জীবিতাবস্থায় লোকটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ-সুদ্ধ বর্জন করেছিল, সুরার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানত না, হাসি ব'লে অভিধানে যে একটা পদ আছে তা অবধি তার অবগত ছিল না। তার পাড়াপড়শীরা বলত যে এইরকম মনোভাবের মূলে ত্যাগ ছিল না, ছিল অসামর্থ্য। লোকমতের প্রভাব শুধু মানুষের উপরেই নয়, দেবতাদের উপরেও খুব প্রবল। আর তা না-হ'লেই-বা উপায় কি? দণ্ড-পুরস্কারের ভার যাঁর হাতে, সাক্ষ্য শুনতে তিনি চির-বাধ্য, নচেৎ ন্যায়ের অবমাননা হওয়া সম্ভব। কাজেই ইন্দ্র সেই পুণ্যাত্মাটির পারিতোষিক স্থির করলেন পঞ্চ-মকার এবং সেগুলি উপভোগ করার যোগ্য শক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যদিও পুরস্কার নির্বাচনে লোকটির কোনো বক্তব্য ছিল না, যদিও সে-পুরস্কার গ্রহণ তার আজন্ম-সাধনার বিরুদ্ধে, তবুও শত লক্ষ বৎসরব্যাপী লাম্পট্যের প্রতিশ্রুতিতে সে কুণ্ঠিত হয়নি, বরং হয়েছিল হর্ষাকুল।

কিন্তু সদিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দ্র তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারলেন না। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে রুচির বৈষম্য ঘটে : স্বর্গের লাম্পট্য আর মর্ত্যের বখামি একরকম হ'তে পারে না। ধরায় গোজাতি পূজ্য, কিন্তু স্বর্গে তা আহার্য। কাজেই গোঘ্নের সংবর্ধনার্থ যে গব্য পলান্ন দেবরাজের পাকশালায় প্রস্তুত হয়েছিল, তা সেই পদোত্থিত অতিথির সম্মুখে আনতেই সে দশ হাত জিভ কেটে আসন পরিত্যাগ ক'রে ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আপনি কি আমাকে এমন পাষণ্ড ভেবেছেন যে আমি এই মহামাংস খাব। আরে ছিঃ ছিঃ। স্বর্গে এসেছি ব'লে জাত দিতে আমি রাজি নই। রাম, রাম, দুর্গা, দুর্গা, প্রভু আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ নিও না, প্রভু।' ইন্দ্র সেই তিরস্কারের কোনো প্রতিবাদ করলেন না। এতদিন আতিথেয়তা ক'রে তাঁর ধরাবাসীদের সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি ধৈর্যের মহিমা শিখেছিলেন। উপরন্তু পরিত্যক্ত আহার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে, এবং জ্বলন্ত জঠরকে প্রবোধ দিতে-দিতে আত্ম-মমতার অশ্রুতে তাঁর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে এসেছিল।

ইন্দ্র ভেবেছিলেন, ভোজটা আগন্তুকের মনোমতো না-হ'লেও, তাঁর অমৃতের নিখুঁতত্বের কাছে পুণ্যাত্মাদের অবরতাও পরাস্ত হবে। কিন্তু আশা অমরাতেও কুহকিনী। স্বর্গপ্রাপ্ত লোকটি তার প্রতিবেশীদের মধ্যে যে-পানীয়ের প্রচলন দেখেছিল তার নাম ধান্যেশ্বরী। এই সুরার ফলাফল পুণ্যময়, কেন-না ধান্যেশ্বরী প্রমাণ করে ধূলায় রচা কায়ার সঙ্গে ধূলার

অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। কিন্তু সুধার নেশা অন্য রূপের : তার উন্মাদনায় মন সপ্ত স্বর্গ অতিক্রম ক'রে অনন্ত শূন্যের খমধ্য-শিখরে গিয়ে ঠেকে। কাজেই গজমোতি নির্মিত পাত্র হ'তে দু-এক চুমুক অমিয় আস্বাদন ক'রেই লোকটি বিকৃতবদনে ইন্দ্রকে বললে, 'দাদা, আমায় কি কচি খোকা পেয়েছ যে রঙিন জল দেখিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবে। কেন আর জ্বালাও ? আসল মাল আনতে হুকুম ক'রে দাও-না।'

দেবরাজ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। 'অমৃতে'র নিন্দা এর পূর্বে এমন-কি কোনো মর্ত্যবাসীও করেনি। কিন্তু গত্যন্তর নাস্তি। আসল মাল কাকে বলে, সে-পদার্থ কোথায় পাওয়া যায়, তা তিনি জানতেন না। আবার এই অজ্ঞতা সেই অসভ্য নরের সামনেও অপ্রকাশ্য। ফলত মর্মব্যথা চাপা দিয়ে ইন্দ্র নৃত্যারম্ভের আদেশ দিলেন।

হায় রে দুরদৃষ্ট! বিধাতা সেদিনে দেবরাজেব কপালে অনেক লাঞ্ছনা লিখে রেখেছিলেন। রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, উর্বশী ইত্যাদি অনাদ্যন্ত খ্যাতি-সম্পন্না অপ্সরীদের ললিত অঙ্গবিলাসও সেই ধার্মিকের মুখ থেকে প্রশংসার বাণী নির্গত করাতে পারলে না। অতিথিটি দেবরাজের কাক্ষিতে কনুয়ের একটি খোঁচা দিয়ে, আনিমীল অপাঙ্গ হ'তে তাঁর পানে একটি তির্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, মুখের অর্ধাংশে কেমন একরকম বক্র হাসি হেসে, তীক্ষ্ণ স্বরে তাঁকে বললে, 'ভায়া, এমনি ক'রেই কি স্বর্গের অতিথি সৎকার হয় না-কি : মদের জায়গায় ঘোলাটে সরবৎ ; মুরগির জায়গায় গোমাংস ; আর নটীদের জায়গায় যত বুড়ি? ও-সব বুজরুকি রেখে এখন খাঁটি জিনিস বার করো, নয়তো আবার ধ্যানে বসব।'

ক্ষোভে-লজ্জায় অপমানে ইন্দ্রের সহস্রাক্ষির থেকে যে-অশ্রু ঝ'রে পড়ল, তাতে ক'রে নিম্নস্থা ধরণীতে এক অকালবরষার সৃষ্টি হ'ল। মানবের অভিসম্পাৎ, দেবতাদের উপহাস, অতিথির অভক্তি সহ্য করতে-করতে ইন্দ্র বোধহয় অপল্লবিত আখির অসুবিধা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন। কিন্তু উপায় কী, উপরওয়ালাদের আদেশ অবশ্যপালনীয়। কাজেই আহত অহমিকাকে সুশ্রূষা করতে-করতে তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে আগন্তুককে জানালেন যে, স্বর্গের নটীরা বিধাতার বরে চিরযৌবনা।

সে-কথা শুনে নরপুঙ্গব তো হেসেই খুন। সে বললে, 'এ্যাঁ এরা চিরযৌবনা। হাঃ-হাঃ। এদের এক-একজনের বয়স অন্তত সাতশো সাতাত্তর বছর হবে। চিরযৌবনা!! বাবা ধ্যান করেছি ব'লে কি আর আড়চোখে ছুড়িদের দেখিনি। আমার পায়ে যত যুবতী ফুলচন্দন দিয়েছে, তার দশ ভাগের এক ভাগ তোমার কাছে এলে বর্তে যেতে দাদা, বর্তে যেতে। কিন্তু তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে এই নাকে-কানে খৎ ; কোন্ শালা আর জপ-তপ করে। এই স্বর্গ। মারি মুখে ঝাড়ু, এর চেয়ে আমার নরকে যাওয়া ছিল ভালো। সেখানে অন্তত বন্ধুর অভাব হ'ত না।'

এই আদি আস্থাহারার সহিত আমাদের সহানুভূতি না-থাকলেও, অমরার প্রতি তার অনাসক্তি আমাদের দুর্বোধ্য নয়। তার চিত্তবৃত্তি যতই প্রমোদ-প্রিয় হোক্-না-কেন, লাম্পট্যে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজকেও যে-নটীদের দেখে আধুনিক অনীতিপরায়ণেরা কামোন্মত্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের মধ্যে আমরা রূপযৌবনের লেশমাত্র খুঁজে পাই না ; হয় তারা বৃদ্ধা না-

হয় লাম্পট্য-চিহ্নিতা। দেবতারা নিশ্চয়ই বিকৃতচেতা ছিলেন, নচেৎ অগণ্য বিনিদ্র রজনীর কলঙ্ক-কালিমা যে অনন্ত যৌবনকেও মলিন করতে পারে, এ-সত্যটা তাঁদের অবিদিত থাকত না।

১৮ শ্রাবণ [১৩৩৩?] [অসম্পূর্ণ]

[নামহীন গল্প ৬]

আমি মামুলি মানুষ, আমার মনের গড়ন নিতান্তই নির্বিশেষ ; বাহ্যিক প্রবর্তনায় আমার ভিতরে যে-প্রতিক্রিয়াগুলো ঘটে, সেগুলো খুব সহজ, অতিশয় স্থূল, সেগুলো বিচার করতে হ'লে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকের দিব্যদৃষ্টির দরকার হয় না। তরুণের বৈদ্যুতিক সংসর্গে আমার দৈনিক জীবনটাও কিছুকালের জন্যে পেয়েছিল অয়স্কান্তের গুণ ; তখন যত লৌহলেখনী আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার স্বভাবপূজার মধ্যে অসাধারণতার চিহ্ন দেখেছিল। বস্তুত সে-সময়ে আমি ছিলেম ঘোরতর নাগরিক, স্বভাবের সঙ্গে বিচ্ছেদটা তখন দুস্তর হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই আমার লেখার মধ্যে শোনা যেত চিরবিরহের প্রতিধ্বনি। নৈকট্য অবজ্ঞাপ্রসূ : সরকারি বাগিচার বার্ষিক স্নানের পরে বর্ষাকে যেমন ভালো লাগে, গ্রাম্য পথের আজানু কাদার মাঝে ঠিক তেমনটি লাগা শক্ত। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করব না যে আমি স্বভাববিলাসী। স্বভাবের রূপ দেখতে শিখেছিলেম শৈশবে, স্বভাবের অন্তম শান্তির সঙ্গে কৈশোরের প্রারম্ভেই পরিচয় হয়েছিল। আমার বাল্যজীবন কেটেছে মফস্বলে। সেখানে ক্রীড়া-কৌতুকের বিশেষ সুবিধা ছিল না ; সমবয়সীর সংখ্যাও ছিল অল্প। কাজেই মিতা ব'লে ভাবতেম বনস্পতিকে, পর্বত লঙ্ঘন ছাড়া খেলা ছিল না, আর যে-কথাগুলো গুরুজনদের কানে ওঠা সমীচীন মনে করতেম না, সেগুলোকে ভাসিয়ে দিতে হ'ত ঝর্নার স্রোতে।

উপরন্তু পিতৃদেব ছিলেন স্বভাববাদী। তাঁদের যুগের শ্রুতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যগ্রন্থ, হাক্‌স্‌লির রচনাবলি, স্মৃতি এবং পৌরাণিকদের শূন্য বেদী দখল করেছিলেন বাইরন শেলি কীট্‌স্‌। সেকালের বাল্মীকি টেনিসন : তাঁর কবিতা যে সভ্যতার অভিযানেরই ইতিহাস এবং ব্রাউনিংকে বেদব্যাস বললে অত্যুক্তি হবে না, কারণ তাঁর মানসপুত্র মাত্রেই মহামানব। তাঁদের ধর্ম ছিল বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল, পদ্ধতি নির্বিবাদ ব্যক্তিত্ব।

পিতৃদেব ছিলেন নিরীশ্বরবাদী : তাঁর সম্বন্ধে নাস্তিক শব্দ ব্যবহার করলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁর যুগের বিবেক কর্তাকে অস্বীকার করেছিল মাত্র, কর্তৃত্বকে নয়। তাঁরা অনেক বিবেচনার ফলে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেই দৃপ্ত পতাকার দুর্ভর চূড়া যাতে ক্ষুণ্ণ না-হয় সেইদিকেই তাঁদের সমস্ত লক্ষ্য ছিল ; এ-দিকে যে ভগবানের উৎসৃষ্ট সিংহাসন অনবধানের ফলে স্বভাবের দখলভুক্ত হচ্ছে, সে-ব্যাপারটা চোখে পড়েনি। এমনও হ'তে পারে জিনিসটা তাঁরা দেখেও দেখেননি, জেনেশুনেই স্বভাবের অনধিকার প্রবেশে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। অভ্যাসের দাবি

অগ্রাহ্য করা শক্ত : ঘোড়া ক্ষেপে গাড়ি চুরমার করে, জোত ছেঁড়ে, লাগাম ছেঁড়ে, কিন্তু শেষকালে ফিরে আসে সেই আস্তাবলে।

সে যাই হোক্, তাঁরা যে-স্বভাবকে সর্বশক্তিমান্ ক'রে তুলেছিলেন, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ব'লে ভেবেছিলেন, আমার বাল্যাবস্থা তার দাসত্ব থেকে অব্যাহতি পায়নি। এই ব্রাত্যের দল প্রব্রজ্যার নামে ত্রস্ত হ'ত বটে, কিন্তু পরিব্রাজক হওয়া ছিল তাদের আদর্শ। তারা তীর্থের ত্রিসীমানায় আসত না, কিন্তু প্রাকৃত দৃশ্যের সন্ধানে দিনে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পদচারণ করায় তাদের ক্লান্তি ছিল না ; তাদের ঘরে পুরোহিত কখনো মন্ত্রোচ্চারণ করেনি, কিন্তু সন্তানের দল সকাল-সন্ধ্যা আবৃত্তি করেছে অজ্ঞেয় কবিতা। কিন্তু পিতৃদেব নিজে ছিলেন কবি, মার্জিত সভায় প্রবেশাধিকার পাবার লোভে তিনি সাহিত্যসাধনা করেননি ; তিনি সাহিত্যের মধ্যে আত্মহারা হয়েছিলেন, সাহিত্য তাঁকে ডেকেছিল ব'লে। সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রাণ ; জীবনের প্রায় সমস্ত অভিজ্ঞতাই তিনি পেয়েছিলেন অন্যের মারফতে। সেইজন্যই বোধহয় বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করে এ-কথা তাঁর জানা ছিল না। আমি বালক হ'লেও সে-সত্যটা অবগত ছিলুম, কিন্তু তাঁকে ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করতুম না, কারণ তাঁর মুখে কবিতা আবৃত্তি শোনার পরে এক-আধ শিশি কুইনাইন-মিক্স্চার খুব বেশি কষ্টসেব্য লাগত না।

মা ছিলেন নিরক্ষর মানুষ ; তবুও তিনি সাহিত্যের খাতিরে অনেক কিছু ত্যাগ করেছিলেন, পঞ্চাশের বহু পূর্বেই বনে আসতে আপত্তি করেননি, 'কাব্যাত্মক' বিচারের খাতিরে শ্বশুরের সুদে-বাড়ানো সম্পত্তি দেনার দায়ে নিলামে চড়লে নির্বাক ছিলেন ; এমন-কি মধ্যাহ্নভোজনটা নিয়মিতভাবে মধ্যরাত্রে জোগাতেও তাঁর ত্রুটি ঘটেনি। এর জন্যে নিত্যনূতন বামুনের আমদানি করতে হ'ত, আমাদের বাড়ির নাম শুনলে ঝিয়েরা উঠত আঁৎকে, চাকর দিত বারেবারে কাজে ইস্তফা, কিন্তু মায়ের আমার [মুখ] কখনো বেজার ছিল না। এর মাঝে আবার অনেকসময়ে পাওনাদারের ঠেলাও সামলাতে হ'ত তাঁকেই। কিছুতে কখনো তাঁকে রাগতে দেখিনি। কেবল যখন একবার এক সপ্তা জ্বরের পরে পথ্য পাবার পরদিনেই দশ মাইল হাঁটা ও এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভেজার ফলে আমার নিউমনিয়া হবার উপক্রম হয়, সেইবার তিনি পিতাকে দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন যে ছাতা না-নিয়ে আর কখনো আমরা কাব্যচর্চায় বেরুব না।

কিন্তু আমাদের ছত্রবহন-ব্রত কেমন যেন অসিদ্ধ থাকত ; ছাতার আওতায় পিতৃদেবের বাক্যবল্লরীতে পত্রোদ্‌গম হ'ত না, ফুল-ফল তো দূরের কথা। তাঁর মুখে ফুটে উঠত অনটনের রেখা, তাঁর কণ্ঠে নেমে আসত আজীবন ব্যর্থতার নিরুদ্যম, তাঁর চাহনির রশ্মিস্ফুরণে চপল ধাতু যেন চোখের সামনে সীসায় পরিণত হ'ত। এমন দিনেও তিনি অভ্যাসমতো আমাকে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের বিদ্রোহবার্তা শোনাতেন, কিন্তু সেই ছায়াচ্ছন্ন মাৎসিনি ও গারিবল্‌দিকে সামান্য ষড়যন্ত্রীর মতো লাগত ; বোধ হ'ত ভের্লেনের হাঁসপাতালে মৃত্যু অকথ্য দুষ্কৃতির উপযুক্ত উপসংহার, গোগ্যাঁর মহাব্যাধির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা কিছুতেই মনে ধরত না। এটা যেন তিনিও উপলব্ধি করতেন, তাঁর উচ্ছ্বসিত আবেগের মাঝখানে হঠাৎ অসঙ্গতি এসে জুটত, অপ্রতিভ স্বরে তিনি বলতেন, 'মানুষ ছাতা জিনিসটা পেয়েছে পশুর

কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে। তাতের সময় জানোয়াররাই ছায়া খোঁজে, দিবানিদ্রায় অচৈতন্য হ'য়ে থাকে ; ঝড়-বর্ষাকে ভয় করে পাখিরা। তাদের জীবনটা দেহপ্রধান, কাজেই দেহকে অক্ষত রাখার, দেহকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা তাদের মুখ্য অনুপ্রাণনা। মানুষও যদি শারীরিক কষ্টের ভয়ে স্বভাবের আত্মীয়তা অস্বীকার করে তবে তার বুদ্ধি থাকার সার্থকতা কী? তবে তার আত্মা আছে কী করতে? আমার দেহ আছে ব'লেই আমি লজ্জিত, দেহ আছে ব'লেই নিজেকে স্বভাবের সঙ্গে এক করতে পারছি না ; এমন রৌদ্র যা[তে] তার প্রেমের দীপ্তি ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এমন বৃষ্টি যা[তে] তার চুম্বনের উদ্বেগ ব্যাহত থাকে ; দেহকে জয় না-করতে পারলে মানুষের মোক্ষ নেই।'

তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার বহু পূর্বেই আমি ছাতা বন্ধ করতেম ; কিন্তু সেটা পিতৃদেবের নজরে পড়ত না, মানুষের মোক্ষ যাঁর লক্ষ্য অমনতর নগণ্য ক্রিয়াটা তাঁর নজরে না-পড়াই স্বাভাবিক। সে-কথা ফের মনে পড়ত প্রত্যাবর্তনের পথে। হঠাৎ বিস্ময়ের সুরে পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমার ছাতাটা কেন বন্ধ করলে, অমরেশ? ছাতা সম্বন্ধে তোমার মায়ের মতামত কুসংস্কারপূর্ণ হ'লেও, সেটার প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নয় ; যে অল্পে তুষ্ট তার আবদার সর্বদা পালনীয়।' তারপর আমাকে জবাবদিহি করার অবকাশ না-দিয়েই তিনি বলতেন : 'ভুলে যেও না, অমরেশ, এটা মহাকাব্যের দিন নয় ; মহাকাব্য লেখবার মতো সরলতা আর আমাদের নেই ; আজকে অধিকর্মা দেবতারা অসূর্যম্পশ্য হ'য়ে উঠেছেন, প্যান এখন কিংবদন্তী ; স্বভাব রেল কোম্পানির বিজ্ঞাপনবাহক। তাই আমাদের আদর্শ আজকে একাগ্রতাশূন্য, পশমে বুনে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার জিনিস, সভাসমিতিতে যাবার জমকালো পোশাক মাত্র। এটা যে বেনের যুগ, দরকষাকষি ছাড়া আজ আমাদের গতি নেই।'

বলতে-বলতে তিনি হয়তো কোনো গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর চারপাশে বিরাজ করত অনাদ্যন্ত শান্তি, তাঁর পদতলে লুটাত কোনো প্রাগৈতিহাসিক পূজাবেদী, ঝোড়ো হাওয়া এসে অপক্ক কেশে তাণ্ডব জাগিয়ে দিত, শরতের ঘননীল আকাশ থাকত পটভূমিকা হ'য়ে। এইসময়ে যদি ছিন্ন মেঘের ফাঁকে পলায়িত সূর্যকিরণ এসে তাঁর মস্তক স্পর্শ করত, মনে হ'ত, সে বুঝি কোনো অতিমর্ত্যলোকের আশীর্বাদ। মনে হ'ত, তিনি বুঝি কোনো প্রাক্তন কালের ভাবিকথক, পিতৃরূপী ভগবানের সাথে বিশ্রম্ভালাপে তন্ময় আছেন। বলতে পারি না সেটা পড়ন্ত রৌদ্রের চাতুরী কি-না, কিন্তু কী একটা অপরিমেয় আয়তন যেন পিতৃদেবের নাতিখর্ব দেহযষ্টির সঙ্গে এইরকম সময়ে যোগ দিত। বোধ হ'ত তিনি বুঝি কোন্ অতীত জাতির অন্তিম সন্তান, প্রতিকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, তাঁর চক্ষের নির্নিমেষ দৃষ্টি যেন কোন্ অন্তর্হিত স্বদেশের স্মৃতিতে ভরা, তাঁর শ্মশ্রুকেশের কাঞ্চনপ্রভা, তাতে যেন অন্য যুগের নির্ভাজ ধাতুর পবিত্রতা, তাঁর মুখের অসীম বিষাদ, সে যে আসুরিক নিষ্ফলতার প্রতিবিম্ব। এমন দিনে লেওনার্দো দ্য ভিন্‌চি ও মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর ডাকে যেন পুনর্জীবিত হ'য়ে উঠত, বেটোফেনের গল্পটি শোনাত তাঁর আত্মকাহিনীর মতো, অভিন্ন আত্মা ব'লে মনে হ'ত গ্যয়টেকে। শোপেনহাউয়ার

ব্যাধিবিশেষকে দার্শনিক গ্রন্থ অঞ্জলি দিত মানুষের দৈবত্ব প্রমাণ করার জন্যে, বাকুনিন ফেরার হ'ত আদমের বংশধর ব'লে, লিঙ্কনে আর প্রমিথিয়ুসে কোনো প্রভেদ থাকত না।

কিন্তু অধরার জাদু ক্ষণস্থায়ী ছিল ; পশ্চিমের পানে পিঠ ফিরিয়ে যেই আমরা নিচে নামতেম, অমনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হ'ত সংসারের নগণ্যতা ; মনে পড়ত সেই চিরায়ু পর্বতের তুলনায় আমাদের আয়তন কীটাণুকীটের সমান, মনে পড়ত সেই বিরল বনের প্রত্যেক দেওদারটি অসংখ্য মানুষের উত্থান-পতন দেখেছে, আমাদের উত্থান-পতন দেখবে, এমন-কি আমাদের পৌত্র-প্রপৌত্রদেরও পাহাড়তলির কুঠিগুলোকে খেলাঘরের মতো লাগত, ভঙ্গুর, সঙ্কীর্ণ ; তার মধ্যে আবদ্ধ থাকা সে তো স্বভাবের উপরে আধিপত্য করা নয়, সে যে স্বভাবের কাছে হার মানা। আমরা চলতেম নিঃশব্দে, পায়ে চলার পথের খোঁজে, পিতৃদেব আগে আমি পেছুনে, নিয়মিত অঙ্গচালনার শেষে কারামুখী বন্দীদের মতো। লোকালয়ে যখন পৌঁছুতেম তখন সাঁঝের বাতি জ্ব'লে উঠত, পিতৃদেবের মুখে আবার কথা ফুটত, কিন্তু সে-কথা আর দেবদূতের কথা নয়, সে-কথা কোনো পরাস্ত বৃদ্ধের। তাঁকে দেখলে মনে হ'ত তিনি যেন কোনো অসম্পন্ন স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ, জলের স্রোতে, ঝড়ের বেগে, তাপের পীড়নে আপনার তুলাসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কী অপরিসীম ক্লান্তির ভারে তিনি ভগ্ন স্বরে বলতেন : 'জীবনকে কখনো অবজ্ঞা ক'রো না, অমরেশ, তাকে দেখতে ছোটো কিন্তু তার শক্তি ভয়ঙ্কর। সে আসে ছদ্মবেশে ; পরনে ছেঁড়া কাঁথা, হাতে তার ভিক্ষার শূন্য পাত্র, তার দাবি সনাতন। কিন্তু সে যেদিন তোমার দ্বারে ঘা দেবে, কান উঁচিয়ে থেকো, দেখো যেন চেনার ভুল না-হয়, সংবর্ধনায় ত্রুটি না-ঘটে। সেদিন সে যদি নিজেকে অপমানিত বোধ করে, তবে তোমার আর রক্ষা নেই ; আর সে ভিক্ষা চাইতে আসবে না, আসবে সদলবলে কর আদায় করতে। বাল্মীকি এই কথাটাই বোধহয় *রামায়ণ*-এর মধ্যে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, জীবন হনুমানের মতন : তাকে যদি মোতির মালা দাও তাহ'লে সে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে। অথবা যদি অবজ্ঞা করো, তাহ'লে তোমার সাধের লঙ্কা ওঠে চিতায়।'

ইতিমধ্যে পথে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে, পিতৃদেবের অঙ্গভঙ্গির দিকে তারা তাকাত বিস্মিত দৃষ্টিতে ; দলে ভারি হ'লে হাসির শব্দ কানে পৌঁছত, অশ্রদ্ধার কথা শোনাও খুব বিরল ছিল না। আমি তাঁর কথার খেই হারিয়ে ফেলতেম, মন ছুটত তাদের সমালোচনার পানে, হয়তো দুর্দম লজ্জায় আমার কর্ণমূল লাল হ'য়ে উঠত, কিন্তু পিতৃদেবের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি স্থানকালপাত্র ভুলে যেতেন, ভুলে যেতেন তাঁর আচরণ পাগলামির মতো দেখাচ্ছে, তাঁর পদক্ষেপের মাঝের ফাঁকগুলো যেন বেড়েই চলত, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যেত না। এ-রকম সময়ে আমি হতেম তাঁর কথার উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে তিনি বিভোর থাকতেন আত্মসম্ভাষণে। চেষ্টা করলে শুনতে পেতেম তিনি বলছেন : 'আমারও দিন একবার এসেছিল, কিন্তু আড়ম্বর ক'রে আসেনি ব'লে তাকে আমল দিইনি। ভেবেছিলেম আমিই আমার ভাগ্যবিধাতা ; ভেবেছিলেম জীবন যা ধ্বংস ক'রে গেল, স্বপ্ন দিয়ে তাকে ভরিয়ে নেব ; আমার স্বর্গ আমার সঙ্গে ফিরবে ; হাতের সোনার কাঠিতে পায়ের বেড়ি সোনা হবে। কিন্তু তা হয় না, হয় না, কিছুতে হয় না ; মেঘের দুর্গ নিমেষে-নিমেষে ছারখার হ'য়ে যায়, আর চারদিক

থেকে ঘিরে ধরে পাশবিক সত্যগুলো। আজ আর পালানোর উপায় নেই, জয়ের আশা নেই, হার হয়েছে আমার, পুরো হার। এমন-কি আপস করার পথ-সুদ্ধ আজ বন্ধ।'

এই সময়গুলো আমার কাছে অত্যন্ত শোকাবহ লাগত, ভুলে যেতেম তিনি আমার পিতা, ভুলে যেতেম তিনি শ্রদ্ধেয়, বিজ্ঞ ; ইচ্ছা করত এই নিঃসহায় শিশুটিকে ভোলাই, তাকে বুঝিয়ে দিই যে পালানোর কোনো দরকার নেই, জয়-পরাজয়ের কোনো কথাই উঠছে না, বুঝিয়ে দিই খড়ের গোড়ার বুদ্বুদটিকে অটুট না-রাখতে পারলেও পৌরুষ বজায় থাকে ; ইচ্ছা করত বলি : তোমার ভয় তোমার মাভৈঃ দুয়েরই উৎপত্তি কল্পনায় ; ইচ্ছা করত আশ্বাস দিই : ভয় কী তোমার, আমি আছি ; ভয় কী তোমার, আমি যে তোমায় ভালোবাসি, তোমাকে ভক্তি করি। কিন্তু জিহ্বা আমাদের সবসময়ে বাধ্য নয় ; সমস্ত কথাগুলো একসঙ্গে বেরুতে গিয়ে গলার কাছে এসে তাল পাকিয়ে যেত, আমায় পেয়ে বসত একটা কেমনতর সঙ্কোচ। এইসময়ে যেদিন দৈবাৎ আমাদের ফটকের সাদা থামদুটো অন্ধকারে ভূতের মতো হঠাৎ চোখের সামনে জেগে উঠত, আমার আত্মসঙ্কোচের বাধা ঘুচে একটিমাত্র সঙ্ক্ষিপ্ত চিৎকারে অন্তরের সমস্ত অনুকম্পা প্রকাশ পেত : ওই যে আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এতে কিন্তু পিতৃদেবের আত্মধিক্কারের ঝড় বাড়ত বৈ কমত না। তখন তিনি যে-চাহনি চেয়ে হঠাৎ চুপ করতেন, তার ভিতরে লেখা থাকত যুগ-যুগান্তরের বিসংবাদের ইতিহাস।

সৌভাগ্যক্রমে মা আমাদের ভুল বোঝাকে স্থায়ী হ'তে দিতেন না। তাঁর প্রচ্ছন্ন উৎকণ্ঠা বহুক্ষণ ধ'রে যে-প্রশ্নমালার সৃষ্টি ক'রে রাখত, তার জবাব দিতে-দিতে দুঃস্থচিন্তার অবকাশ মিলত না, ক্রমশ দৈনন্দিন জগতে স্বাধিকার ফিরে পেত। আমাদের কথার প্রসার জীবন থেকে ক'মে আসত জীবিকাতে, দৃষ্টি অতীতকে ফেলে চলত ভবিষ্যতের পানে। তারপরে যতটুকু পড়াশুনা হ'ত, সে কেবল রসাস্বাদনের জন্যে, অতিমর্ত্যের সন্ধানে নয়।

অতএব দেখা যাবে যে আত্মবর্ণনায় মামুলি শব্দ প্রয়োগ ক'রে বিনয়ের পরিচয় দিইনি, দিয়েছি সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। বৈশিষ্ট্যের জন্যে পিতৃদেব যে-দাম দিয়েছিলেন তার বহর অল্পবয়সেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেম, তাই ইতিহাসকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিইনি। কিন্তু তাই ব'লে কেউ যেন না-ভাবেন যে পিতৃদেবের জীবনটি আমার চোখে বৈকল্যবহুল। তিনি বলতেন স্বভাবকে পুনর্জীবিত করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে অসিদ্ধ থাকেনি তাঁর চেষ্টা। সংসার-পথে যেদিন যাত্রারম্ভ করি সেদিন আমার একমাত্র পাথেয় ছিল সহজতা, সহজজ্ঞান, স্বভাব সম্বন্ধে একটা অক্লিষ্ট অভিজ্ঞা। তাছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকার আমার ভাগ্যে জোটেনি, এবং যেহেতু আমার প্রকৃতি যোগীর নয় ভোগীর, যেহেতু সুখের চেয়ে স্বস্তি আমার কাছে বাঞ্ছনীয়, তাই এই নিঃসার পৈতৃক সম্পত্তিকে অবলম্বন ক'রে পেনশন নেওয়া আমার কাছে বিপজ্জনক মনে হয়নি। কিন্তু কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে, বুঝি-বা ভুল করেছি, স্বভাবের ভাণ্ডার, সে-ও হয়তো অক্ষয় নয়। সম্প্রতি আমার পরিচিত বন থেকে কার বৈদেহ আবির্ভাব যেন অন্তর্হিত হয়েছে, ঝর্নার গানে যেন কেমন ক্রন্দনের রেশ শুনছি, পার্বত্য পথগুলো যেন পিছু হাঁটতে শুরু করেছে ; আমার পদচারণ আজকাল আর স্বতঃসিদ্ধ হয় না, সে যেন কার সন্ধানে ফেরা। আজকে

অভ্যাসমতো পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে অস্তাকাশে আর অফুরন্ত সোনার খনিটি দেখতে পাইনি, লালকালো মেঘগুলোকে দেখে বোধ হ'ল সে বুঝি আমার বিলুপ্ত অতীতের চিতাবসানের ছবি। হঠাৎ যত চ'লে-যাওয়াদের নাম মনে এল, মনে হ'ল পারিপার্শ্বিক বন্যতাকে শ্রীমন্ত করেছিল তারাই। তখন থেকে বিষম খট্‌কা লেগে আছে : এ-অভাবটা কি আমার আসন্ন বার্ধক্যের লক্ষণ, কিংবা স্বভাবের বৃদ্ধিশীল নিঃস্বতার প্রমাণ ; অনুকম্পন থেমেছে, সে কি তারগুলো শিথিল হয়েছে ব'লে। নাকি সুরই নীরব? তবে জরা যে বেশ ঘনিয়ে এসেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আত্মকাহিনী লেখার আকাঙ্ক্ষা এই প্রথম।

২

তরুণের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। পিতৃদেব আর আমি নিয়মিত কাব্যচর্চায় বেরিয়েছি, সঙ্গে ছাতাও আছে, কিন্তু সে-জলপ্রপাতকে রোধ করার মতো ছাতা তখনো জন্মায়নি। কাজেই পিতৃদেবের আনন্দের আর সীমা নেই, তাঁর হৃদয় নাচছে ময়ূরের মতো, শতবর্ণের কলাপ বিস্তার ক'রে, তাঁর মুখাগ্রে নির্গত হচ্ছে কবিতার গোমুখী ধারা ; সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে বর্ষণের সম্বন্ধে যত কবিতা মানবমনে স্থান পেয়েছে, সে-সবগুলিই তিনি বোধহয় একটার পর একটা আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কথা শোনার চেষ্টা বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই ; সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে যেন সবই ডুবে গিয়েছে, তাঁর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর, আমার বৈদগ্ধ্য, এমন-কি আমাদের দিক্‌নির্ণয়ের শক্তিটুকু পর্যন্ত। মনে হচ্ছে কে ডুবজলের মধ্যে আমায় চেপে ধ'রে আছে, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, অন্তিমকাল বুঝি আসন্ন। অতএব যন্ত্রচালিতের মতো পিতৃদেবের অনুসরণ করছি, বিনা-বাক্যে, বিমর্ষ মনে।

হঠাৎ মনে হ'ল পারিপার্শ্বিক নির্বিকার ধ্বনির মধ্যে কী একটা অপরিচিত সুর শোনা যাচ্ছে। চমক ভেঙে চাইলেম, দেখলেম অদূরে কে একজন লোক পিতৃদেবকে কী জিজ্ঞাসা করছে। ভিজে-ভিজে আমার বুদ্ধি এতই মোটা হ'য়ে গিয়েছিল যে, প্রায় আধ মিনিট লাগল বুঝতে, লোকটি পথভ্রষ্ট, জনপদের সন্ধান নিচ্ছে। তখন খেয়াল হ'ল আমাদের অবস্থাও তার চেয়ে বিশেষ ভালো নয় ; আশপাশে চেয়ে দেখলে স্থানটি একেবারে অচেনা। পিতৃদেবের কাব্যের নেশা বোধহয় তখনো ছোটেনি, তাঁর জবাবের মধ্যে বিশেষ নিশ্চিততা পাওয়া গেল না। লোকটি যখন আমার দিকে ফিরে তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে, তখন মনে হ'ল তার কণ্ঠস্বরে যেন একটু বিরক্তির ঝাঁঝ। সঙ্গীটির জন্যে আমি লজ্জা অনুভব করতে লাগলেম, বললেম : 'লোকালয়ের ঠিকানা যদি জানতেম, তাহ'লে কি এই দারুণ দুর্যোগে আমাদের এখানে পেতেন?'

কথাটার মধ্যে অসত্যের যে-লেশ ছিল তা পিতৃদেবের কান এড়াতে পারলে না। তিনি বললেন : 'সে-কথা তোমার সম্বন্ধে খাটতে পারে, আমার সম্বন্ধে নয়। ভুলে যেও না, আজকে বেড়াতে আসার কোনো বাধ্যবাধকতা তোমার ছিল না ; ইচ্ছে করলেই পায়রার খোপের মধ্যে শুক্‌নো কাপড়ে থাকতে পারতে।'

আগন্তুক অবাক হ'য়ে গেল, বললে, 'তবে কি বুঝব আপনারা দু-জনে বৃষ্টিতে ভিজতে বেরিয়েছেন, সখ ক'রে?'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পিতৃদেব উত্তর দিলেন : 'সখ ক'রে! মানুষ মুক্ত প্রকৃতির ডাক সখ ক'রে শোনে না, খাঁচায় বাস করে সখ ক'রে। প্রকৃতির দান দুঃসহ ব'লে প্রত্যাখ্যান করে কাপুরুষেরা আর পশুরা। প্রকৃতিকে তারাই বেড়ার বাইরে রাখতে চায় যাদের গঠনে পোষা জানোয়ারের স্বভাবটার প্রাধান্য।'

লোকটি পিতৃদেবকে উপেক্ষা ক'রে আমার দিকে একবার তাকালে, যেন সে জনসমাজে আমাদের অবস্থিতি জানতে চায়। তার অনুসন্ধানের ফল বোধহয় আশ্বাসজনক হ'য়ে থাকবে, কারণ এবারে তার কথার মধ্যে কোনোরকমের উদ্বেগ প্রকাশ পেল না। সে হেসে বললে : 'আপনার অভিধানে জানোয়ারের মানে হয়তো ভুল ছাপা আছে। আমি যে জানোয়ার নই সে-সম্বন্ধে আপনারও নিশ্চয় কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তবুও আমার মনে হচ্ছে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা ঘরের মধ্যে করাই শোভন। চলুন এখন সেইদিকে যাই।'

তার স্বরে এমন একটা স্ফূর্তির সাড়া ছিল, এমন একটা সহৃদয়তা ফুটে উঠল যে আমি তার পক্ষগ্রহণ করলুম। বললুম : 'কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছেন, ততটা সহজ নয়। বহুক্ষণ আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেম উত্তরমুখো, এর বেশি আর কিছুই বলতে পারব না। তবু চেষ্টা করা যাক্, বেলা যে পড়ে এল।'

পিতৃদেব তখনো প্রসন্ন হননি। বললেন : 'তোমার উপরে কর্তৃত্ব করি না ব'লে ভেবো না তুমি আমার অভিভাবক-স্থানীয়। তোমাদের যেতে ইচ্ছা হয় যাও, আমি আমার নিজের পথ নিজে চিনতে পারব ব'লে আশা রাখি।'

লোকটি তৎক্ষণাৎ বললে : 'সেইজন্যেই তো আপনি আমাদের অপরিহার্য ; আমাদের যে নিজের পথ নিজে চেনার ক্ষমতা নেই।'

তারপরে পিতৃদেবকে উত্তরের অবকাশ না-দিয়েই সে আমার হাত ধ'রে এগিয়ে চলল। কিছুদুর গিয়ে পিছন ফিরে দেখলেম পিতৃদেব মন্থরপদে অনুসরণ করছেন। বুঝলেম তাঁর রাগের চেয়ে ব্যথা লেগেছে বেশি, যে-বন তাঁর অত ঐকান্তিক তার মধ্যে পথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছেন, এত বড়ো লজ্জার কথা তিনি নিজের কাছেও যেন স্বীকার করতে কুণ্ঠিত, এ-অপবাদ যে পুরোহিতকে পূজাপদ্ধতি না-জানার দুর্নাম দেওয়ার মতো। কিন্তু আগন্তুক নিঃসঙ্কোচে পিতৃদেবের স্বভাবসিদ্ধির শরণাপন্ন হ'য়ে তাঁর আহত অভিমানটিকে প্রায় নিরাময় ক'রে এনেছিল। এখনো পর্যন্ত তিনি আমাদের তফাতে রাখছিলেন, গন্তব্যনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অক্ষমতাই সম্ভবত তার কারণ হবে। সে-ব্যবধান ক্ষণস্থায়ী ; তিনি ছিলেন আমাদের দিক্‌নিরূপণের অপেক্ষায়, একবার পথ মিলুক, অমনি তাঁর সমস্ত সহৃদয়তা আমাদের পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করবে। নৌকো যখন চড়ায় ঠেকে, মাঝি তখন নির্লিপ্ত থাকতে বাধ্য, স্রোতের গতি যেখানে অবাধ, তার প্রয়োজনীয়তা সেইখানে। উপরন্তু পিতৃদেবের মনের গতি ছিল তরঙ্গমান, তাঁর ক্রোধ এবং অনুতাপ একই আবেগের উত্থান-পতন।

যা ভেবেছিলেম তাই হ'ল, দশ-বিশ কদম চলার পরেই পিতৃদেব আমাদের দলভুক্ত

হলেন, কতকগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক পরামর্শ দেবার অছিলায়। এই অভিনয় আরো কিছুক্ষণ চলল, তারপর তিনি পার্থিব সন্ধান ছেড়ে মন দিলেন পারমার্থিক সমস্যায়। আলাপ সহজেই বেশ জ'মে উঠল, এবং তর্কের কোন্ ফাঁক দিয়ে নিয়ন্তার কাজ তরুণের করগত হ'ল, সেটা কারো চোখেই পড়ল না। আমি, অন্তত, হস্তান্তর ব্যাপারটা লক্ষ করার সময় পাইনি, সমস্ত অভিনিবেশ সহকারে দেখছিলেম আমাদের নির্বিকার জীবনে নবাগত এই অভ্যাঘাতটিকে।

আশ্চর্য ছেলে বটে ; ছেলে বলছি কাবণ প্রথম পরিচয়ে তার বয়স সম্বন্ধে যে-ধারণা হয়েছিল, কাছে আসতে সে-আন্দাজ আর টিঁকল না। দেখলুম, সে সবে যৌবনে পা দিয়েছে, আমারই সমবয়সী হবে, খুব বেশি হ'লে আমার থেকে দু-তিন বছরের বড়ো। অমনি আত্মসঙ্কোচে আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। মনে পড়ল যদিও আঠারো বছর অনেকদিন পেরিয়েছি, তবুও লোকচক্ষে, এমন-কি নিজের কাছেও, আমি অতিবৃদ্ধ বালকমাত্র, কল্পনায় ক্ষিপ্র হ'লেও ব্যঞ্জনায় অপটু, আচরণে নম্র হ'লেও আদবকায়দায় অনভিজ্ঞ, বন্ধু-বিলাসী বটে কিন্তু সমাজ-ভীরু।

তরুণ কিন্তু ঠিক এর উল্টো। সে কথা কইছিল, আমার মতো শুধু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় ব'লে নয়, কথা-কওয়া একটা সামাজিক কলা ব'লে, কথার ব্যায়ামে বুদ্ধির জড়তা কাটে, তাই। আমি স্বভাবত শ্রোতা, কিন্তু তরুণের প্রকৃতি ছিল বক্তার। এইখানে সে পিতৃদেবের সমকক্ষ। তবে দু-জনের কল্পনার প্রবর্তনা ভিন্নরকমের। তাঁর আবেগ সবসময়ে উদ্বেল হ'য়ে উঠত ব'লেই তিনি কথা কইতেন। তাঁর কথাগুলি ছিল পথ ; যা অবলম্বন ক'রে তাঁর অন্তরাত্মা ভাবের গহন বন ছেড়ে বাইরে আসতে পারে। তাঁর কথার অন্তরা ছিল তাঁরই নিজের মন। সেইজন্যে প্রতিবাদে তিনি অত অধীর হ'য়ে পড়তেন, তাঁর কথার সমর্থন না-করা আর তাঁর প্রাণের চেহারার নিন্দা করা যে একই জিনিস। কিন্তু তরুণ কথা কইত সেই চিত্তবৃত্তি থেকে, যে-চিত্তবৃত্তি গণককে বাক্যব্যয় করায়। তার প্রতিপাদ্য বিষয় যেন স্বতঃসিদ্ধ, তবু সেগুলোকে বোঝাতে হচ্ছে, কারণ সাধারণের চোখে আঙুল না-দিলে তারা সত্যকে দেখতে পায় না। কাজেই বিরোধে তার আপত্তি ছিল না, বরং তাতেই ছিল তার আনন্দ, তাতে ক'রেই প্রমাণ হ'ত তার জ্ঞান কত অসামান্য। তার ধৈর্য ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ধৈর্যের মতো : যে-স্বগতোক্তি থেকে তার উক্তির বন্যা সরবরাহ হ'ত, সেটা ছিল : ক্ষমা করো, পিতা, ক্ষমা করো এদের অপরাধ, এরা যে অজ্ঞ।

স্বীকার করছি, তরুণ চরিত্রের সমস্ত জটিলতা প্রথমদিনেই হয়তো আমার নজরে পড়েনি। আঠারো বছরের স্থূলবুদ্ধি বালকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ না-হওয়াই সম্ভব। আজকে অন্তর্দৃষ্টিতে তরুণের যে-ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেটা অনেক বছরের অনেক প্রতিলিপির সমষ্টি। কিন্তু এটা হওয়া অনিবার্য : অতীত জিনিসটা অনেকগুলো রাসায়নিক সামগ্রীর যৌগিক ফলের মতো, একবার মিশে গেলে পৃথক্ করা অসাধ্য। সেইজন্যেই নৈয়ায়িকেরা সিংহাবলোকনের অভ্যাসটা গর্হিত বলেছিলেন। তবু আমার বিশ্বাস, বিশ বৎসরের তরুণ আর চল্লিশ বৎসরের তরুণ একই মানুষ এবং বয়সের সঙ্গে তার চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল মাত্র, বৃদ্ধি হয়নি।

সে যাই হোক্, সেই প্রথম পরিচয়েই তার মতের নির্বন্ধ ফুটে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তার কণ্ঠস্বরে একটা ধ্রুবতার সুর পিতৃদেব-সুদ্ধ লক্ষ করলেন, তাঁর বোধ হ'ল যে তরুণের কাছে তাঁর হালচাল অসঙ্গতিতে ভরা, বিনা-টীকায় হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সেইজন্যেই বোধহয় স্বভাববাদের অযাচিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হ'লেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : 'মানুষের অধঃপতনের গোড়ার কথা হচ্ছে স্বভাবের আদেশ লঙ্ঘন। নন্দনের ভগবান স্বভাব।'

পিছলের মধ্যে সন্তর্পণে পদস্থাপন করতে-করতে, তরুণ তাঁর মুখে তাকালে। সে-চাহনির ভিতরে যে প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটা পিতৃদেবের নজরে পড়ল না। তিনি ভাবলেন, সে চুপ ক'রে আছে তাঁর সঙ্গে একমত ব'লে। তাই উৎসাহিত কণ্ঠে শুরু করলেন : 'সেদিনকার মানুষ ছিল নিষ্পাপ, নিস্তাপ, সত্যি-সত্যিই দেবতার সঙ্গে অভেদাত্মা। সেদিন তার মাথার উপরে ধোঁয়ায় কালো চালা তৈরি হয়নি, আকাশের দিকে চাইলেই তার নীলাঞ্জনদৃষ্টি পৌঁছতো অনন্তের মর্মস্থলে, ঝড় আসত তার প্রাণে উল্লাসের দোলা দিয়ে যেতে, বৃষ্টি আসত শুষ্ক শিরায় অমৃত সেচন করতে, মৃত্যুর হিমস্পর্শ ব্যর্থ করবার জন্যে রৌদ্র রাখত তাকে আলিঙ্গনের আড়ালে। কিন্তু কুক্ষণে সে পশুর পরামর্শে কান পাতলে, কুক্ষণে ভাবলে ধূর্ততা বুঝি মনীষার নামান্তর মাত্র ; গুরুর আদর্শমতো অন্নদাতার হাত ছুবলে ভাবলে বুঝি আপনার দুর্ধর্ষ শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। সেইদিন থেকে তার স্বর্গবাস শেষ হয়েছে, সেইদিন থেকে ঘুচেছে তার অমৃতের অধিকার, সেইদিন থেকে তার বিকট মুক্তি জগদ্দল পাথর হ'য়ে চেপে আছে তার বুকের উপর। তাই আজ সহজ মুক্তি তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার মতো লাগে, তাই সে স্বভাবসেবীর নাম দিয়েছে নাস্তিক, নববর্ষার নিমন্ত্রণ মান্য করা তার বিচারে আজ পাগলামিরই রূপান্তর। গৃহস্থালির পিছনে যে দারুণ অন্যায় যে প্রচণ্ড পাপ লুকিয়ে আছে, কোনো দণ্ডধর আজ অবধি তার উপযুক্ত শাস্তি আবিষ্কার করতে পারেনি।'

পিতৃদেব নীরব হলেন, তাঁর চুপ করার মধ্যে একটা প্রত্যাশা ছিল, যেন প্রশংসার প্রতীক্ষা করছেন। তরুণের ভিতরে কিন্তু কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে লুপ্ত পথের সন্ধান করতে-করতে খুব পরিচ্ছিন্ন কণ্ঠে উত্তর দিলে : 'গৃহস্থালি সম্বন্ধে আপনার মতামত হয়তো ঠিক। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেও মনে হয় আমাদের অনেকটা দুঃখই জ'মে যাওয়ার দুঃখ, কিন্তু আপনি গৃহস্থদের যে-কারণে অপরাধী করছেন, আমার কাছে সেটা ঠিক মনে হচ্ছে না। মানুষের সার্থকতা স্বভাবকে জয় করতে পারলেই তবে। স্বভাব আমাদের শত্রু, তার শাসন একেবারে উপেক্ষা করতে পারছি না ব'লেই মনুষ্যত্বের পূর্ণিমা এখনো আসেনি।' পিতৃদেব স্তম্ভিত হলেন, আবেগ ব্যক্ত করতে তার বেশ কিছু সময় লাগল। ভাষা যখন জোগাল, তখন এত বেশি জোগাল যে একটির বেশি বাক্য তাঁর মুখে ফুটল না। 'স্বভাব', তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'স্বভাব আমাদের শত্রু? স্বভাবকে বাদ দিলে তবে আমাদের পূর্ণ পরিণতি!'

অম্লানবদনে তরুণ বললে : 'ঠিক বুঝেছেন!' তারপর পিতৃদেবের অবস্থা দেখে সে আরেকটু বিশদ ক'রে বললে : 'যে-গৃহস্থালির আপনি নিন্দা করছেন, তার প্রবর্তনা যে

স্বাভাবিক। সৃষ্টির প্রথম পর্বের অতিকায় জন্তুগুলো এই পারিবারিক প্রবৃত্তিটা ঠিকমতো উপলব্ধি করেনি ব'লেই তাদের উচ্ছেদ হয়েছে। তখন একটা এমন জীব উৎপন্ন হ'ল যে তার আয়তনের হ্রাস পূর্ণ ক'রে নিলে সংখ্যার বৃদ্ধি দিয়ে। এই আগন্তুকের নাম মানুষ। অচলায়তন পূর্বপুরুষের অপরিসীম ভ্রান্তি বাঁচিয়ে চলেছে ব'লেই সে আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে। সে টিঁকে আছে কারণ সে স্থানকালপাত্রের অনেকদিনকার বিশ্বাসী চাকর।'

পিতৃদেব বিজয়গর্বে জবাব দিলেন : 'আমি যে-মানুষের কথা বলছি তার বাপ-পিতামহ জন্তু নয়, দেবতারা তার সহোদর ভাই, নিয়তি তার সেবাদাসী। আমার মনের মানুষ স্বভাবের গোলামি করে না, সে স্বভাবের সখা। এইটাই তার মহত্ত্বের মূল কথা।'

পিতৃদেব চুপ করলেন, কিন্তু তাঁর অব্যক্তিতে অর্থগৌরবের অভাব ছিল না। মনে হ'ল তিনিই স্বভাবের মূর্ত মূর্তি। মনে হ'ল, তিনি থেমেছেন কারণ আত্মশ্লাঘা মহতের পক্ষে অশোভন। মনে হ'ল, তিনি যেন কোনো একচ্ছত্র সম্রাট, যাঁর শাসনের সনদ স্বাক্ষর করেছেন স্বয়ং ভগবান। পারিপার্শ্বিক অণুপরমাণুর সঙ্গে ব্যাক্যবিনিময় ক'রে তিনি নিজেকে খাটো করেননি, বাড়িয়ে তুলেছেন তাদের, সেটা তাঁর অনুগ্রহ। কিন্তু অসীম অনুগ্রহের কোনো মানে নেই ; উপরন্তু সামান্যজনের বোধশক্তি সামান্য হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু তাঁর বাঙ্ময় নীরবতার মর্ম, বোধ করি, তরুণের জ্ঞানগম্য হ'ল না। সে বললে : 'হ্যাঁ ঠিক কথা ; তবে স্বভাবের সম্বন্ধে মানুষের মৈত্রী, দেবযানীর প্রতি কচের ভালোবাসার মতো। পিতৃঘাতীকে প্রেমের ছল দেখিয়ে আত্মহত্যার পথে ডাকা ফন্দি হিসেবে প্রশংসনীয় হ'তে পারে কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকে—।'

ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্যে তৈরি মানুষ এরপরেও নিরুত্তর থাকে কী ক'রে? তরুণকে এতক্ষণ কথা কইতে দিয়েছিলেন, সেটাই পিতৃদেবের বাহাদুরি। তাঁর অসহ্য উষ্মা গ'র্জে উঠল, তার মধ্যে তরুণের কথার বাকি অংশটা কোথায় হারিয়ে গেল তার ঠিকানা মিলল না। ঝড়-বর্ষার ধ্বনির সঙ্গে সুরসমন্বয় ক'রে তিনি বলতে লাগলেন : 'আর কত সইবে, দেবি, তোমার ধৈর্যের কি শেষ নেই? জাগো রুদ্রাণী জাগো. ধরো তোমার সংহারমূর্তি। খুলে দাও তোমার ফণির বেণী, নাগিনীর দল আকাশে-আকাশে ছুটে যাক্। উলঙ্গ হোক্ তোমার খড়্গ, তার দীপ্তি ত্রিভুবনকে দগ্ধ ক'রুক্। ধ্বনিত হোক্ তোমার অট্টহাস, তার প্রতিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতান ধ্বংস-ভ্রংশ হ'য়ে যাক্, তোমার প্রলয়-পদক্ষেপে সসাগরা পৃথিবী কেঁপে উঠুক্। স'য়ো না, ক্ষেমংকরি, কীটের আস্ফালন আর স'য়ো না। দাও মানুষকে একনিঃশ্বাসে উজাড় ক'রে। তারই নিজের পর্বতপ্রমাণ দম্ভের নিচে করো তাকে নিষ্পেষণ। ধরিত্রীকে মানবশূন্য করো, নিষ্কণ্টক করো অতিমানবের পথ।'

পিতৃদেবের উচ্চণ্ড আবেগ থামলে পরে, তরুণ বিনীত কণ্ঠে বললে : 'আপনি মিছি-মিছি উত্তেজিত হচ্ছেন, আপনি-আমি একমত।'

কিছুক্ষণ পিতৃদেব নীরবে রইলেন, তারপর আস্তে-আস্তে তাঁর অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটল। তিনি পরমবন্ধুর মতো বললেন : 'আমি জানতুম অবশেষে আমার মতেরই জয় হবে। স্বভাবের শক্তি শুধু অর্বাচীনেরাই মানতে চায় না।'

তরুণ বললে : 'আমি স্বভাবের শক্তি অস্বীকার করিনি, শুধু বলেছি সে-শক্তিকে পদানত না-করতে পারলে মানুষের সার্থকতা নেই।' পিতৃদেব রুক্ষ কণ্ঠে বললেন : 'আবার সেই কথা।'

তরুণ তাঁকে এগুতে দিলে না, বাধা দিয়ে বললে : 'আপনি স্বভাবের যে-ছবি এঁকেছেন, সেটির প্রত্যেক রেখাটি ঠিক। স্বভাব উন্মাদিনী প্রলয়ঙ্করী, সে খেয়াল ছাড়া কোনো নিয়ম মানে না। সেইজন্যেই স্বভাবের সঙ্গে আমার বিবাদ। আমার মন চায় নির্ণয়, আমার মন চায় কারণের শৃঙ্খলা। স্বভাবসিদ্ধ ভয়-ভাবনাগুলোর মূলে কিছু নেই বুঝতে পারি, তবু এড়াতে পারি না, সেইজন্যেই জীবন এত দুঃসহ হ'য়ে ওঠে।'

তার কণ্ঠস্বরে কী একটা করুণিমার আমেজ ছিল, তার কথা যেন শুধু কথা নয়, আত্মকথা। সম্ভবত পিতৃদেব-সুদ্ধ তা লক্ষ করলেন, অন্ততপক্ষে তাঁর প্রশ্নে কোনো ঝাঁজ ছিল না ; 'স্বভাবের এই ভয়াবহ দিকটা আবার কোন্ মহাত্মা আবিষ্কার করলেন?'

তরুণ বললে : 'জগতের যত নৃতত্ত্ববিদ্। তাছাড়া প্রত্যেক সজাগ লোকের চোখে এ-জিনিসটা পড়বে।' তার কথায় আর দুর্বলতার লেশমাত্র নেই, তার কণ্ঠস্বর দৃঢ়, যেন সে যুক্তির অকাট্যতা দিয়ে স্বীকৃতির দৈন্য ঢাকতে চায়। সে বলতে লাগল : 'আপনারা স্বভাবের যে-কান্তরূপ দেখেছেন তার সৃষ্টি রুসোব লেখায়, যার স্বভাবের দৌড় ছিল সেন নদীর দ্বীপ পর্যন্ত ; সে-রূপের স্থিতি কবিতার পাতায়। তার প্রলয় কোথায় হবে ঠিক বলতে পারি না, তবে সম্ভবত ফ্যাক্টরি-চিম্‌নির মেটে ধোঁয়া তারই চিতারোহণের আদি কাণ্ড। যারা আসল স্বভাবের এলাকায় বাস করে, অর্থাৎ যারা জঙ্গলি, তারা স্বভাবকে রাক্ষসী ব'লেই জানে। তারা স্বভাবকে সকাল-সন্ধে নরবলি দেয়, দেবক গাছের গণ্ডি টেনে মৃত্যুর আগমন-নিমেষ কতক পিছিয়ে দেয় ; নিষেধের বাহুল্যে স্বভাবের দৌরাত্ম্য বাধা না-পেলেও তাদের নিজের জীবনযাত্রা যে অচল হ'য়ে পড়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তর্ক ক্রমশ জটিল হ'য়ে উঠল ; স্বভাব, সমাজ, সাহিত্য, একটার পর একটা প্রাচীন দুর্গের চারপাশে যুদ্ধ চলল। গুরুগম্ভীর শব্দের মাকু আমায় ঘিরে যে-জাল বুনলে, তার ভিতর দিয়ে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে কার সাধ্য? আমি প্রমাদ গণলেম। মনে হ'ল পিতৃদেবের মনের গতি আর তরঙ্গরেখায় চলছে না, তাঁর মনের মধ্যে বান ডেকেছে, ক্রোধের বান। তারপরে আর তাঁদের কথায় কান রইল না, আমার সমস্ত উদ্ভাবনীশক্তি ছুটল তাঁদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনার উপায় অন্বেষণে। বুঝলুম তরুণকে আমাব ভালো লেগেছে। কেন ভালো লেগেছে, বিচার করতে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে পিতৃদ্রোহের একটু আমেজ আছে। লজ্জা হ'ল, কিন্তু মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল না। যে-যুক্তিগুলো ছেলেবেলা থেকে শুনে-শুনে ক্রমশ আমার কাছে অবিকার অখণ্ডনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো সনাতন নয়, সেগুলোর দুষ্পালনীয় অনুশাসন মানা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, এত বড়ো আবিষ্কারের পরে আহ্লাদ দমন করা বোধ করি খুব সহজ নয়। উপরন্তু এই মুক্তির বাণীর প্রচারক আমারই সমসাময়িক একজন, তার বুদ্ধি-বিদ্যা-বয়স আমারই মতো অল্প। সে-উল্লাস জগতে নূতন দেবতার আগমনের উল্লাস, নির্বাসিত দেবতার শোকাবহ পতনও বড়ো কম মর্মস্পর্শী লাগল না। কাজেই আমার আপসপ্রিয় মন এদের দু-জনের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টায় অধীর হ'য়ে উঠল।

সেদিন যে সে-তর্কের শান্তিময় সমাধান ঘটেছিল তার জন্যে আমার কোনো বাহাদুরি নেই। দৈব আমার সহায় হলেন, হঠাৎ মনে হ'ল পায়ের তলায় শক্ত মাটি ঠেকছে। অন্ধকারের মধ্যে বহু কষ্টে তাকিয়ে দেখলুম, মিলেছে, বাড়ি ফেরার পথ মিলেছে, আমরা নিরাপদে বনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছি। অমনি একটা অনির্বচনীয় স্বস্তিতে আমার মন-প্রাণ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, আমি সোল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠলুম এতক্ষণে রাস্তা পাওয়া গেছে!

পিতৃদেব তখন কঠোর কণ্ঠে তরুণকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে আধুনিক জগতের উজান বেয়ে দুর্মর ঈশ্বরের সন্ধানে যাওয়ার জন্যে তাঁদের সঙ্গতিশূন্য স্বভাববাদ কোনোমতেই দায়ী নয়। আমার চিৎকারে তিনি চম্‌কে উঠলেন। তাঁর ক্রোধের উদ্যত অগ্ন্যুৎপাত তরুণকে ছেড়ে ফিরল আমার দিকে। তিনি নিরতিশয় বিরক্তির সঙ্গে আমায় বললেন : 'অমরেশ, তোমার মনের লঘুতা অসহ্য। গুরুতর আলোচনার মধ্যে তোমার মূর্খের মতো অবান্তর ব্যাঘাত ঘটানোর স্বভাবটা আমি মার্জনা করলেও, আর পাঁচজনে ক্ষমা করবে না। তখন শুনব এটা আমার শিক্ষাপদ্ধতির দোষ। তোমার দম্ভও অসাধারণ ; আমরা কি অন্ধ না অর্বাচীন যে পথ দেখলে চিনতে পারব না? কোথায়, তোমার পথ কোথায়? এরপরে কোনোদিন খাদের ধারে পা বাড়িয়ে বলবে, এই যে পথ।'

এরপরেও তাঁর তর্জন-গর্জন আর খানিকক্ষণ চলল। কিন্তু আমার তাতে দুঃখ ছিল না। আমার নির্দিষ্ট পথই তিনি অবলম্বন করেছিলেন ; শুধু তাই নয়, তাঁর চিন্তার মন্দাকিনী এখন মর্ত্যমুখী হয়েছিল, নির্গুণের সন্ধান ছেড়ে তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন তরুণের নাম-ধাম।

সেদিন আমরা বাড়ি পৌঁছলুম রাত্রি ন-টার পরে।

৩

স্মৃতি জিনিসটা বর্তমান যুগের পরমাণুর মতো। তার গতি স্বৈরবৃত্ত, তার বিধি বিশৃঙ্খল, তার বিবরণ লেখা অসম্ভব। তার ইতিহাস নেই, তার ভবিষ্যৎ গণনা করতে যাওয়া মূঢ়তা। তার সম্বন্ধে এইটুক নিশ্চিন্ত মনে বলা যেতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিশেষ কক্ষ ছিল তার একার দখলে। কিন্তু এই কক্ষের ভিতরে তার আচরণ অদ্ভুত, অভাবনীয়। আমাদের নিত্তনৈমিত্তিক পদার্থের মতো সে বিশ্রামের সময়টুকুও ঘরের কোণে কাটায় না, সমস্ত ঘরখানাকে থাকে জুড়ে। সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তেও সে নারাজ, অথচ চলার পথ মাড়িয়ে যেতেও অক্ষম। অল্পকথায়, তার চলন উত্তরণ একই ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। তার ব্যাকরণে অন্বয় নেই, আছে শুধু সমাস।

আজকে যখন তরুণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনের পানে ফিরে তাকাই তখন দৃশ্যগুলো ঝাপ্‌সা ঠেকে, বুঝতে পারি না, কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, কোন্‌টা কেন ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল। স্মৃতি-পরমাণু কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যায়, তার অলক্ষ লম্ফনে অন্ধকারের মধ্যে রশ্মিসঞ্চার হয়, বিস্তর ছোটোখাটো জিনিস চোখে ফোটে, কিন্তু সেগুলো সবই স্ব-স্ব-প্রধান। মনে পড়ে মায়ের মুখ : তাঁর দুশ্চিন্তাদীপ্ত ডাগর চোখের কোলে উৎকণ্ঠার নিবিড় কালি।

মনে পড়ে তাঁর অকালপক্ব অলকের অবাধ্যতা, ক্ষীণাঙ্গের অনমনীয় ধৈর্য, মনে পড়ে তাঁর কম্রকণ্ঠের প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ। স্মরণে আসে, আমাদের বাড়িতে অতিথি সমাগত শুনে তাঁর হাতদুটিতে কী ব্যাকুল কম্পন জেগে উঠেছিল, আমাদের দৃষ্টি ক্রমশ সেইদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে জেনে, তিনি যখন অঞ্চলের ভিতরে হাত লুকিয়েছিলেন, তখন তাঁর উদ্‌গত গণ্ডাস্থির উপরে লজ্জার ঝলকটিকে দেখিয়েছিল রোগরক্তিমার মতো। সেদিনকার রাত্রিভোজনের অস্বাভাবিক বিলম্ব মনে আসে, আহারের অনভ্যস্ত আয়োজনটাও ভুলিনি, যে অপ্রতিভ সুরে মা তাঁর অতিথি-সৎকারের অসম্পূর্ণতার জন্যে তরুণের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, তার ধ্বনি আজও আমার কানে লেগে আছে।

পিতৃদেবের পাঠাগারের দিকে ফিরে চাই, দেখি তাঁর লেখবার টেবিলের উপরে কাগজের স্তূপ প্রথামতো ছড়ানো রয়েছে, তাদের সংস্থান বর্ণছত্রের পর্যায়ক্রমে, পরম লাল থেকে শুরু ক'রে চরম বেগুনি পর্যন্ত। সেগুলো যেন আদ্যকালের আলোর পলি-পড়া পাঁজর, কোন্ বিস্মৃতপর্বের নিষ্ঠুর নিষ্ফলতার ইতিবৃত্ত লিখে রেখেছে মর্মের স্তরে-স্তরে। দেয়ালে-দেয়ালে ব[ই]য়ের সারি কড়িকাঠ অবধি উঠে গেছে। থাকে-থাকে অসঙ্গতির ছড়াছড়ি : কোথাও-বা শেক্‌স্‌পীয়র বিশপ বর্কলির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, তিন শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে এডমন্ড স্পেন্‌সরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি করছে হর্‌বর্ট স্পেন্‌সরের মুখান্বেষণ, কোথাও জন্‌সন্ আছে সুইন্‌বর্নের কাঁধের 'পরে বন্ধুভাবে ভর ক'রে, জেন্ অস্টিনের সাথে বিশ্রম্ভালাপে চসরের অণুমাত্র সঙ্কোচ নেই। এমন-কি হ্যুগো রাসিনের সঙ্গে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ। অগস্ত্যভক্ত বিন্ধ্যের মতো ডস্টয়েভ্‌স্কি টুর্‌গিনিএভের পদানত। মনে হচ্ছে পেট্রোনিয়স্ আর কার্‌দুচি বুঝি একই যুগের লোক, সর্‌ভেন্‌টিস্ হয়তো-বা ইব্‌সেনের একটা ছদ্মনাম, সফোক্লিস্-পদটা শিলারে পরিণত হয়েছে গ্রীম্-সূত্রেরই মতানুসারে। কোনো জায়গায় ছুঁৎমার্গ ভুলে কালিদাস বসেছেন ওমর খৈয়ামের পাশে; কন্‌ফিউসিয়স্ আর টলস্টয় পরস্পরের মধ্যে বোবার মতো সঙ্কেত বিনিময় করছেন ; হাইনে বৈদিক ঋষিদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়েছেন, আর্যদের আদিম ভাষায়।

আবার চাই, দেখতে পাই সেদিন ঘরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলছে ; আলোটি বহু পুরাতন, তার দাহ্যবস্তু খানিকটা ধূমবহুল কেরোসিন, তার চিম্‌নির প্রান্তে বহুদিনের ঝুল, তার ফানুসটা চিড়-খাওয়া সবুজ কাচের। মনে পড়ে, পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে কোনো চাকরের সে-ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মনে পড়ে, আমাদের সংসারে পিতৃদেবের টেবিল পরিষ্কার করার চেয়ে বেশি গুরুতর পাপ আর ছিল না। মনে পড়ে, এই অভ্যাসের প্রতিবাদ করলে তিনি বলতেন যে মাটি তাঁর মা ; মায়ের স্পর্শকে অপবিত্র ভাবার মতো অকৃতজ্ঞ অহমিকা তাঁর নেই। অমনি তাঁর কম্বু কণ্ঠ শুনতে পাই, অমনি তাঁর অতিরঞ্জনের প্রতিচ্ছায়া শূন্যদৃষ্টির উপর পড়ে, অমনি তাঁর অতিকথনের প্রতিধ্বনিতে অন্তর ভ'রে ওঠে। কিন্তু এতগুলো মুক্তোর অণুতম বীজকে গ্রথিত করেছে যে-তন্তু তার চেহারা দেখি না।

তরুণের দিকে তাকাই, কিছুই যেন লক্ষ হয় না, কতকগুলো রেখার অস্পষ্ট সমষ্টি চোখে ঠেকে মাত্র। তার কথা শুনতে চেষ্টা করি, মনে হয় একটা কীসের গুঞ্জরণ যেন কানে পৌঁছয়।

কিন্তু সেটা বিকলনের ভার সয় না। শুধু স্মরণে আসে সে-রাত্রে তার মুখেরও বিরাম ছিল না ; তর্ক আবার ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছিল, তিলার্ধ জমি হস্তান্তর হবার আগে অসংখ্য কথা প্রাণবিসর্জন দিতে কুণ্ঠা করেনি। অথচ আমাদের বৈঠক যখন ভাঙল তখন কোনো মনান্তরের চিহ্ন দেখিনি। তরুণের প্রচণ্ডতম প্রতিবাদের মধ্যেও একটা দাক্ষিণ্য ছিল, একটা সৌজন্য ছিল, একটা নির্লিপ্তির আভাস ছিল, যেটা শুনলে মনে হ'ত তার কটূক্তির উৎপত্তি তার নিজের মধ্যে নয়। সে এগুলোর বাহক মাত্র, খালি খাতিরে প'ড়ে কেবল সেবাব্রতের প্রবর্তনায় কোনো অদৃশ্য অক্ষমের সহায় হয়েছে, যার অপশব্দগুলো এই অনভ্যস্ত প্রতিনিধির সংস্পর্শে শুধু সহনীয় নয়, এমন-কি কমনীয়।

কিন্তু আর নজর চলে না, শূন্যতার সীমায় এসে থামে। তারপরে যে-তরুণকে দেখতে পাই, পিতৃদেবের প্রেতসঞ্চরিত পাঠাগারে সে খাপ খায় না। সুদূর-পরাহত ভাবুকদের পোকা-ধরা মমির গন্ধে সে যেন আধমরা হ'য়ে যায়, পরলোকের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার চোখের দীপ্তি যেন চাপা পড়ে। অথচ পরের যুগের যে পরিপাটি তরুণকে আজ প্রত্যক্ষ করি, সে-তরুণ আমার কাছে এই প্রথম রাত্রের ঝাপ্‌সা তরুণের মতো অপরিহার্য নয়। সেই দ্বিতীয় তরুণ আমার পার্শ্বচর, আমার পরামর্শদাতা, কিন্তু আমার ভগীরথ নয়। তবুও এই প্রথম তরুণের বনপর্ব বাদে আর কিছুই মনে নেই ; সে-দৃশ্যটাও মনে আছে, সম্ভবত নিতান্ত অস্বাভাবিক ব'লে, পিতৃদেবের সনাতন স্মৃতির সহায়তা পেয়েছে ব'লে। তবে এই পথচ্যুতির ছবিটা আমার মনে খুবই পরিস্ফুট। বনস্পতিদের প্রত্যেক বল্কলের প্রত্যেক দানাটি, পথের সামান্য অসমতা, পরিব্যাপ্ত কর্দমের বিভিন্ন গভীরতা, এমন-কি আশপাশের ঝরা পাতা, ভাঙা পাথর পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে মনে আছে। বাকি সব সাদা।

তবু তরুণের মৌলিক পরিচয়টা এইখানে সমাধা ক'রে নেওয়াই বোধহয় প্রশস্ত ; আমি সাবেকি আমলের মানুষ, গোড়ার কথা গোড়াতেই আমার মনে আসে। উপরন্তু এটা ইতিহাস, উপন্যাস নয়। উপন্যাসের হাওয়াখানায় অশরীরীদের বাস, তাই হয়তো সেখানে ভিত-ছাদের মধ্যে মাখামাখি থাকা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের সমাধিস্তূপকে সইতে হয় স্মৃতির মতো অতিকায় জীবের ভার, কাজেই বনেদ থেকে শুরু না-করলে সে-ইমারত নিরাপদ হয় না। সে-বনেদ হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, তার আবিষ্করণ হয়তো ঐতিহাসিকের কর্তব্য নয় প্রত্নতাত্ত্বিকের, এমন-কি মনস্তাত্ত্বিকের, কর্তব্য, কিন্তু তাহ'লেও তার অস্তিত্ব সন্দেহের অতীত, তার উপকারিতা সতত স্বীকার্য। তবে এইটুকু কৈফিয়ৎ বোধহয় দেওয়া দরকার : এই স্মৃতিমন্দিরের উপাদান নানা স্থানে নানা সময়ে সংগ্রহ করেছি।

তরুণের বাপ কালীকিঙ্কর মৈত্র সেকালের নামজাদা ব্যারিস্টার ছিলেন। ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর ওজন বোঝার যোগ্যতা আমার নেই। তবে উকিলপাড়ার উদীয়মান গ্রহ-উপগ্রহদের মুখ তাঁর নামে যে-পরিমাণে পাণ্ডু হ'য়ে আসে, তার থেকে মনে হয় অস্তাচলের আড়াল হ'লেও তাঁর প্রতাপ এখনো অস্তমিত হয়নি। আমরা তাঁকে জানতুম দেশের দশের শিরোমণি ব'লে। তার নামের ইংরেজি সংস্করণটা এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল। শুনেছি মাইটর শব্দের মানে মুকুট। বিলেতি পর্যটকেরা যখন ছয় হপ্তা ভারতভ্রমণের ফলে স্বদেশে ফিরে

আমাদের অভিব্যাপ্ত বর্বরতার বিবরণীতে ছয়শো পাতার বই ভরিয়ে ফেলত, তখন এখানকার জাতীয় পত্রিকার পরিচালকেরা সে-পরচর্চার প্রতিবাদ করত মিস্টর মাইটরের নিছক আধুনিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। কথাটা বার্তাবাহকদের বাড়াবাড়ি নয়। এক চামড়ার রঙ ছাড়া, মাইটর-সাহেবের ত্রিসীমানায় স্বদেশী অসভ্যতার কোনো চিহ্ন ছিল না। বোধহয়, ভূ-ভারতে শুধু তিনিই তাঁর এক বিখ্যাত সহকর্মীর দুর্দান্ত দুরাশা ফলবতী করেছিলেন। আলাপে-প্রলাপে বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ সম্ভবপর ; যার চিন্তার ব্যাপ্তি সার্বভৌমিক নয়, তার পক্ষে ভয়-ভাবনার কার্যটাও হয়তো কেবল রাজভাষার সাহায্যেই সম্পন্ন করা সহজ ; কিন্তু স্বপ্নকে বিদেশী ব্যাকরণের বশে আনার অভূতপূর্ব সম্মান একা তাঁর প্রাপ্য। অবশ্য, এই অসাধ্যসাধনে তাঁর অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তি তাঁকে বিশেষ মদত দিয়েছিল ; সাত বছর বাদে স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রাক্‌-বৈলাতিক শৈশব-কৈশোরের অন্তিম সাক্ষীগুলোর আর কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। এবং যেহেতু ইংরেজি আদালতের পরম পৌরপ্রথাগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার লোভনীয় ভার তাঁরই স্কন্ধে পড়েছিল, তাই তাঁর পরভাষী মানসচারীদের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পাট্টাগুলোকে তিনি মৌরুসী ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হন।

তাঁর পুরশ্চরণের একটিমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল সহধর্মিণী ক্ষণদাসুন্দরী। একটা অদৃশ্য ভিড়ের জন্যে স্থপতির উন্মুখ পরিকল্পনা যেমন অধোমুখী হ'য়ে পড়ে, তেমনি এই অন্তঃপুরচারিণীটির জন্যে মাইটর-সাহেবের উচ্চ আদর্শ যেন স্থায়ী হ'তে পারছিল না। এর থেকে যেন কেউ না-ভাবেন যে দোষ তাঁর নক্‌শার। বাড়ি যখন মাটির গর্ভে ডুবতে আরম্ভ করে, তখন বাড়ির উদ্ভাবককে দায়ী করা অন্যায়, দোষটা যে স্বয়ং বসুধার। জমির খেয়ালের জন্যে যারা ইঞ্জিনিয়রকে অপরাধী করে, তাদের সঙ্গে আমার কোনো সহানুভূতি নেই। প্রতিকূল প্রতিবেশের দাবি অগ্রাহ্য করতে পেরেছে ব'লেই-না মানুষ বড়ো ; নক্‌শা যদি জমির আবদার মেনে চলবে, তবে আর তার স্বাতন্ত্র্য রইল কোথা? তাহ'লে নক্‌শা করার সার্থকতা কী? তাহ'লে বাড়ি না-বানিয়ে গুহার ভিতর বাস করলেই হ'ত, তাতে কোনো আপদ-বালাই থাকত না। উপরন্তু জমি নির্বাচনের ভার তাঁর উপরে ছিল না ; সেটাকে তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে, একদিকে সোনার খনি, অপর পাশে এঁদোপড়া ডোবা-সুদ্ধ। অবশ্য সে-দান তিনি গ্রহণ না-করলেও পারতেন ; কিন্তু তাঁর স্বভাবটি ছিল আদর্শপরায়ণ ; তাই সোনার উপরে ঝোঁক দিয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, সময়ে ডোবাটাকে শান-বাঁধানো কেলিহ্রদে রূপান্তরিত করতে পারবেন। সেটা ঘটেনি, তার কারণ তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নয়। স্ত্রীর বিজাতীয় বিদ্যাভ্যাসের জন্যে তিনি একটি মেম নিযুক্ত ক'রে দিলেন, কিন্তু ক্ষণদাসুন্দরীর জিহ্বায় মামুলি ইংরেজি শব্দগুলোও শোনাতে লাগল দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে হ্যামলেটের স্বগতোক্তির মতো। অর্ধাঙ্গিনীর নির্লজ্জ বন্যতা ঢাকবার জন্যে প্যারিসে পরিচ্ছদের ফরমাস গেল, কিন্তু ক্ষণদাসুন্দরীর স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে সেগুলো জাদুঘরের আজব নমুনার রূপ পেলে। তাঁর হাতে সুরাপাত্র দুর্লভ চরণামৃতের ভঙ্গুর ভাণ্ড হ'য়ে উঠল, ছুরি-কাঁটা ধরলে মৌলিক খড়্গ-বল্লমের আকার।

শুধু আদর্শবাদী হ'লে এত বড়ো আশাভঙ্গের পরে মাইটর-সাহেবের জীবনযাত্রা দুর্বহ হ'য়ে উঠত, কিন্তু তাঁর মনের ব্যবহারিক দিকটা নিতান্ত অবজ্ঞেয় ছিল না। তাহ'লে

ব্যবহারজীবী হিসেবে তিনি অত প্রতিপত্তিই-বা লাভ করেছিলেন কী ক'রে? এঁদোপড়া ডোবাটা কেলিসরোবরে পরিণত হ'ল না দেখে, তিনি হার মানলেন না, সঙ্কল্প করলেন যে সেই পঙ্কের মধ্যে তিনি এমন পদ্মিনী উৎপন্ন করবেন যার সৌরভে ডোবার দুর্গন্ধ চিরদিনের মতো চাপা প'ড়ে যাবে। ক্ষণদাসুন্দরীর উপর হুকুম হ'ল যেমন ক'রে হোক্ একটি অলৌকিক কন্যারত্ন চাই। বশ্যতাই ছিল ক্ষণদাসুন্দরীর একমাত্র ধর্ম। তিনি শতবর্ষী ঠাকুরবাড়িতে অর্ধসহস্র পয়সা মানত ক'রে, একান্ন পীঠে শতাধিক পাঁঠা বলি দিয়ে, সংখ্যাতীত সদ্‌ব্রাহ্মণের আশীর্বাদের ফলে একদিন স্বপ্ন পেলেন যে স্বয়ং ভগবতী তাঁর গর্ভে অবতীর্ণ হচ্ছেন। মাইটর-সাহেবের অব্যর্থ সিদ্ধির গূঢ় রহস্য এইসময়ে আরেকবার উদ্‌ঘাটিত হ'ল। আভ্যন্তরিক প্রাণস্রোতে যখন ক্ষণদাসুন্দরীর সুচিহ্নিত কটিতটে অনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ হ'ল, মাইটর-সাহেবের প্রাথমিক অবিশ্বাস তখন আর অটল রইল না। তিনি বললেন, একটি অলোকসামান্য মেয়ে নিয়ে কথা ; তা দেবতারা যদি তাঁর কামনা পূর্ণ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তিনি তাদের বাধা দেবেন না। তিনি আরও জানালেন যে উপযুক্তের সঙ্গত অভাব যদি হাতে-হাতে পূরণ হয়, তবে আর দেবতাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করার ছিদ্র থাকে না, এমন-কি এ-ক্ষেত্রে তাদের খুশি করার চেষ্টাও খুব প্রশংসনীয় ; প্রার্থী যোগ্য ব'লেই কি সে অকৃতজ্ঞ হবে? তাছাড়া পাওনার পরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভার তো তাঁরই হাতে ; মেয়ে একবার জন্মাক্, তখন দেখা যাবে তিনি বড়ো কি ভগবতী বড়ো! স্বামীর কথা শুনে ক্ষণদাসুন্দরী শিউরে উঠেছিলেন ; তাঁর অনুচ্চ দুর্গানাম জপ মাইটর-সাহেবের কান এড়াতে পারেনি। তবু তিনি কিছু বলেননি, কেন-না তাঁর নিজেরও মনে হয়েছিল উক্তিটা একটু অবিবেচিত : দেবতাগুলো যা আড়বুঝো, তাতে কথাটাকে তলিয়ে না-দেখে একটা যা-তা করা তাদের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। তাঁদের ভয় অমূলক হয়নি, যথাসময়ে ক্ষণদাসুন্দরী যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন দেখা গেল দৈববিড়ম্বনায় কন্যা না-হ'য়ে পুত্র হয়েছে। এই পুত্রের নাম তরুণ।

একটা অবোধ স্ত্রীলোক এবং একজন অকর্মণ্য দেবতা মিলে তাঁর স্বপ্নরাজ্যে বিপ্লব বাধাবে, আর সেই ষড়যন্ত্র হাসিমুখে ক্ষমা করতে হবে? এত বড়ো স্পর্ধা অম্লানবদনে সহ্য করা পুরুষোচিত নয়। ক্ষণদাসুন্দরীর নির্বাসন হ'ল বাপের বাড়িতে এবং তাঁর সহযোগীর সম্বন্ধে মাইটর-সাহেব যে ভয়ঙ্কর দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন, সেটা ঘোষিত হবার পরে অপরাধীর আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। এমনি ক'রে কয়েক বছর কাটল। কিন্তু সে-দাগা কি সহজে ভোলা যায়? মাইটর-সাহেবের বুকের বৃদ্ধিশীল শূন্যতা, থাকে-থাকে, হা-হা ক'রে ওঠে ; অর্থ উপার্জনের সার্থকতা প্রায়ই যেন হারিয়ে যায়, শুধু চাকর আর মক্কেলের উপর কর্তৃত্ব ক'রে প্রভুত্বের ক্ষুধা বাড়ে বৈ কমে না। এর উপরে আবার সেই কাপুরুষ দেবতাটি অলক্ষ্য থেকে তাঁকে নির্যাতন করতে ছাড়ে না ; তার দুরভিসন্ধিতে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা-সুদ্ধ শুধু মুখচেনাদের দলভুক্ত হয়, ভক্তের বন্দনার মধ্যে কেমন একটু ঠাট্টার রেশ থাকে, সরকারি উপরওয়ালাদের পিঠ-চাপড়ানো প্রশংসার মধ্যে জজিয়তির প্রতিশ্রুতিটা যেন ক্রমশই ক্ষীণ হ'য়ে আসে। কিন্তু তা হবে না, কিছুতেই হবে না ; মাইটর-সাহেব শপথ

করলেন, করগত সিদ্ধিকে তিনি কিছুতেই পালাতে পথ দেবেন না, আরব্ধ কীর্তিস্তম্ভ স্বর্গ স্পর্শ করবেই করবে। অবশ্য সেই অদৃশ্য দেবতার জঘন্য শত্রুতার একটা প্রতিবিধান দরকার। একটা আধিভৌতিক শক্তির সহায়তা চাই, একটা এমনতর নূতন দেবতা চাই, যার সেবায় কুসংস্কারের দুর্নাম নেই, অথচ যার প্রভাব ওই অতিজীবিতা দেবতাকেও দমন করতে পারে।

শোনা যায়, ভক্তি থাকলে ভগবানের অভাব হয় না ; কথাটা ঠিক কি-না জানি না, তবে মাইটর-সাহেবের ভাগ্যে ভক্তি প্রগাঢ় হবার বহু পূর্বেই ভগবান দেখা দিলেন, দেশমাতৃকারূপে। ব্যাপারটা এখন কিংবদন্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হয়তো সঙ্গত নয়, কিন্তু মোটের উপরে ঘটনাটা এইরকম। একদিন কোনো এক ফৈরঙ্গ ভোজনশালায় আহার করতে গিয়ে, মাইটর-সাহেবের খাদ্যের চেয়ে পানের মাত্রাটা একটু বেড়ে যায়, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ভারতমাতা রক্ষাকালীর মূর্তি ধ'রে তাঁর সামনে আবির্ভূত হ'য়ে বলেন : কালীকিঙ্কর তোমার নামকে সার্থক করো। আদেশ পাবা মাত্র মাইটর-সাহেব উঠে দাঁড়ান ; কিন্তু তখনো ব্যাপারটা ভালো ক'রে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়নি, তাঁর গতিতে তখনো দ্বিধা ছিল ; দ্বারশেষে এই আপ্তবাক্যের অনন্ত ঝঙ্কার তাঁকে এমনি অভিভূত ক'রে ফেলে যে তিনি হঠাৎ একটা অবলম্বনের জন্যে অধীর হ'য়ে ওঠেন। পাশেই একটা স্তম্ভসদৃশ বস্তু নজরে পড়ে, কিন্তু নিবিড় পরিচয়ে প্রকাশ পায়, বস্তুত সেটি থাম নয়, থামের মতো লম্বা একটি মানুষ যার চর্ম শুভ্রবর্ণ, যার ধৈর্য নিতান্ত নগণ্য, যার মুষ্টিতে হারকুলিসের সামর্থ্য। তারপরে আর মাইটর-সাহেবের কিছুই মনে ছিল না। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখা গেল, তিনি লালবাজারের একটা অপরিষ্কার কক্ষে শায়িত, তাঁর কামিজের সাদা বক্ষস্ত্রাণে রক্তের ছিটা।

পরের দিন শ্বেতাঙ্গ বিচারক ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাইটর-সাহেব রুক্ষ কণ্ঠে সে-অর্বাচীনকে বুঝিয়ে দেন যে এত বড়ো অত্যাচার যদি হাকিমের হাসির জিনিস হ'য়ে ওঠে তাহ'লে ব্রিটিশ বিচারের উপর সমগ্র ভারত আস্থা হারাবে। ম্যাজিস্ট্রেট গরম মেজাজে এক সপ্তাহের জন্যে মোকদ্দমা মুলতুবি রেখে পুলিশকে অনুসন্ধানের হুকুম দেয়। অনুসন্ধানের ফল মাইটর-সাহেবের প্রতি অনুকূল হয়নি ; আধঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা শুনে এবং একশত টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি কোনোরকমে খালাস পান।

কিন্তু আদালতের দরজা পেরুনোর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। পাঁচ হাজার যুবক মাইটর-সাহেবের ওজস্বিনী বাণীতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর রথাশ্বের কাজ করে; পরের দিন সংবাদপত্রগুলো তাঁর কীর্তিকথায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে এবং তিনদিন বাদে টাউন হল্-এর এক মহতী প্রতিবাদ-সভায় মাইটর-সাহেব ভারতরত্ন উপাধি পান। এরপরে ভগবতীর বৈদেহ বৈরিতা আর তাঁর উন্নতি রোধ করতে পারেনি।

অনেকে ভাবে নেতৃত্বে আছে কেবল নিছক সুখ। আশপাশের লোক পুষ্পাঞ্জলির গন্ধটাই শুধু লক্ষ করে, কাঁটার আঘাত সইতে হয় যে অঞ্জলিতে অধিকারী, তাকে। মাইটর-সাহেব দেখলেন যে জনপ্রীতি পাওয়া হয়তো তেমন শক্ত নয়, কিন্তু তাকে রাখতে পারা বিষম কঠিন। নায়কের জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগের ভাগটাই বেশি। শুধু অর্থের লোভ ত্যাগ করতে তিনি রাজি ছিলেন, সভাসমিতির আবদার সর্বদা সময়োচিত না-হ'লেও, স্বদেশী

মোকদ্দমাগুলোকে একচেটে করতে পারা বড়ো কম লাভ নয়। কিন্তু অনুচরেরা এইটুকুতেই তুষ্ট থাকে না, তারা চায় তাদের অগ্রণী মানবধর্ম পরিহার করুক্‌, তারা চায় তাদের নিয়ামক ভুলে যাক্‌ যে তার দেহ ব'লে একটা উপসর্গ আছে। কিন্তু দেহ সম্মত হয় না, সম্মত হয় না নিজেকে অদৃশ্য অস্পৃশ্য ক'রে রাখতে : অবদমনে তার বিদ্রোহ বাড়ে, উপেক্ষায় সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে ওঠে, হিতবুদ্ধি শিষ্টাচরণকে ধমক দিয়ে বলে, চাই আমার নারী চাই।

নারীবিহীন জগৎ যে কীরকম ভয়াবহ হ'তে পারে, তা মাইটর-সাহেব ইতিপূর্বে কখনো অনুভব করেননি। এতদিন পর্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক না-হ'তেই তাঁর খাদ্য জুটে গেছে, এমনও ঘটেছে যে, তিনি আহারে বসেছেন ক্ষুধার তাড়নায় নয়, আহার্য শুধু সম্মুখীন ব'লে। বস্তুত সমাজে নারীর অভাব নেই, অভাব কেবল নির্জন স্থানের। কলকাতায় রাস্তার বাহুল্য সাধারণকে বিব্রত ক'রে তোলে, কিন্তু মাইটর-সাহেব অচিরে আবিষ্কার করলেন যে এত বড়ো শহরেও রাস্তার সংখ্যা অন্যায়রকমের অল্প, তার কোনোটাতেই চেনা মানুষকে এড়িয়ে চলা একেবারে অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তিনি খুব সতর্ক হলেন, কিন্তু সংশয় জয় করতে পারলেন না। একদিন এক রমণী-উন্নয়ন-সভায় প্রমাণ হ'ল তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। আলোচ্য বিষয় ছিল অবরোধ-প্রথা। মর্মস্পর্শী ভাষায় অসূর্যম্পশ্যাদের নিষ্কলঙ্ক পাণ্ডুরতার প্রশংসা ক'রে তিনি যখন আসন নিলেন, তখন একটা অকালপক্ক ছোক্‌রা তাঁর প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে উঠে বললে যে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তার ঘটেনি, কাজেই তাদের অনবগুণ্ঠিত কান্তির সম্বন্ধে মাইটর-সাহেবের ঐকান্তিক অভিজ্ঞতাটা সে মেনে নিতে প্রস্তুত। সভাপতি, অবশ্য, তাকে আর এগুতে দেননি, কিন্তু আধুনিক যুবকদের বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের বিষয়ে তাঁর প্রত্যুৎপন্ন বক্তৃতাটি সমস্ত সভাকে লজ্জায় অধোবদন করতে পারেনি। স্থানে-স্থানে সংযত হাস্যের ধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

তখন ক্ষণদাসুন্দরীকে ডাকা ছাড়া আর গতি রইল না। মাইটর-সাহেব তাকে ব'লে পাঠালেন যে স্বামীগৃহে সে নিঃসঙ্কোচে আসতে পারে, কিন্তু উপধর্ম যে-দেবতাদের আশ্রয় তাদের স্থান তাঁর বাড়িতে নেই ; তবে তিনি দমননীতির পক্ষপাতী নন, কাজেই ইষ্টদেবতা ব্যতিরেকে ক্ষণদাসুন্দরীর যদি নেহাৎ না-চলে, তাহ'লে সে কালীরূপিণী দেশমাতৃকার পূজায় আত্মনিয়োগ করুক্‌। ক্ষণদাসুন্দরী তাঁবা-তুলসীর সাক্ষাতে হীন কুসংস্কারগুলোকে বর্জন ক'রে শ্বশুরালয়ে ফিরে এলেন। পুনর্মিলনের করুণ আবেশে মাইটর-সাহেবের লক্ষ হ'ল না যে দশ বছরের তরুণের বক্রদৃষ্টিতে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। দেখলেও তিনি সে-প্রশ্নের মানে বুঝতেন কি-না সন্দেহ। জয়তিলক প'রে যারা জন্মায় তাদের আরশির প্রয়োজন হয় না ; গোল বাধে অনভ্যাসের ফোঁটা নিয়ে ; লোকে ফিরে তাকালেই মনে হয় টিপটা বুঝি স্থানচ্যুত। উপরন্তু মাইটর-সাহেব তখন চল্লিশ পেরিয়েছেন, সে-বয়সে কাছের জিনিস নজরে না-পড়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু এব থেকে বলা চলে না যে মাইটর-সাহেব পুত্রের প্রতি অবিচার করেছিলেন। তরুশ তাঁর কাছ থেকে, অন্তত গোড়ার দিকে, অসদ্ব্যবহার পায়নি, তবে তাঁর সদাচরণে কতকটা সেই মনোভাব ফুটে উঠত যেটা দেখা যায় কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপরিণতবুদ্ধি শিশু-রাজার

প্রতি পরম প্রবীণ সচিবের সৌজন্যে। অর্থাৎ তাঁর ব্যবহারে চোখ রাঙানোর চেয়ে পিঠ-চাপড়ানোর অংশটাই ছিল বেশি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অপার্শ্বদর্শী মাইটর-সাহেবের সুদ্ধ বুঝতে বাকি রইল না যে তাঁর পুত্রের স্বভাবটি অত্যন্তরকমের শীঘ্রচেতন। অন্যায় করলে তিরস্কারের জন্যে সে আপনি প্রস্তুত হ'য়ে ওঠে ; কিন্তু এইসময়ে ভর্ৎসনার পরিবর্তে যদি বিজ্ঞতার উচ্ছ্রায় থেকে তার নতমস্তকে হিতবাক্য বর্ষিত হয় তাহ'লে আর রক্ষা থাকে না। তখন আর বর্ষণ-কাঙাল অনুতাপের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না ; তার পড়ন্ত অশ্রু একটা কঠোর চাউনিতে যেন জমাট বেঁধে যায় ; তার মুখের সমস্ত বর্ণ আশ্রয় নেয় উত্তপ্ত কর্ণমূলে। তখন তার কণ্ঠে কথা সরে না, মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো কেমন একরকম আড়ষ্টভাবে দু-পাশে লম্বা ক'রে দিয়ে হিতৈষীর দিকে সে নির্নিমেষ চোখে তাকায় ; মনে হয় অত মহার্ঘ উপদেশের বর্ণমাত্র তার কানে পৌঁছচ্ছে না, অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে সে যেন একখানা অটল পাথর।

এমনসময়ে মাইটর-সাহেব আর ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন না ; তাঁর অন্তর্দাহ আগ্নেয়াদ্রির মতো ঊর্ধ্বতন সভ্যতা-শিষ্টতাকে ছারখার ক'রে উদ্বেল হ'য়ে উঠত ; ভাঙা গলায় চাকর ডেকে তিনি দিতেন অন্ধকার ঘরে তরুণকে বন্ধ করার আদেশ। তরুণ অন্ধকারে বিষম ভয় পেত, তার পিতা, হয়তো, সে-কথা জানতেন ; কিন্তু জানলেও সম্ভবত তাঁর মত বদলাত না ; তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ; এবং তাঁর নীতিপরায়ণ চোখে দৈহিক নিগ্রহ বিসদৃশ লাগত। এটা তরুণের অবিদিত ছিল না ; সেইজন্যই বোধহয় সে কোনোদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করেনি। চাকর এসে পৌঁছনোর আগেই সে চৌকাঠ পার হ'য়ে যেত। কিন্তু মাইটর-সাহেব তবু শান্তি পেতেন না ; শেষ চাওয়ার ভিতর দিয়ে সে একটা দারুণ সমস্যা জাগিয়ে রেখে যেত ; মাইটর-সাহেব বুঝতেন না তার অর্থ হাসি না কান্না, না উপেক্ষা।

স্ত্রী জগতে দু-রকমের আছে, এক দল যারা সন্তান চায় কারণ স্বামীর সত্তা দ্বিগুণ হ'লে তাকে ধরতে পারা বেশি সহজ ; অপর দল স্বামী চায় পুত্রার্থে। ক্ষণদাসুন্দরী ছিলেন প্রথম দলের। কাজেই তিনি যখন দেখলেন যে তরুণের মারফতে স্বামীকে নাগালে পাওয়া তো দূরের কথা, তার কল্যাণে মাইটর-সাহেব বরং আরও দুর্ধার্য হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর নিষ্ঠুর নৈরাশ্য তরুণকে উৎপীড়ন ক'রে কতকটা শান্তি পেয়েছিল। কিন্তু তাতে কিছু ফল হ'ল না, স্বামীও বশ মানলেন না, ছেলেও গেল আয়ত্তের বাইরে। উপরন্তু যার জন্যে এত করা সে-ও চোর বলতে ছাড়লে না। মাইটর-সাহেবের মনে কী ছিল বলা শক্ত, কিন্তু মুখে কখনো ন্যায়সঙ্গতির অভাব ঘটেনি। তিনি ক্ষণদাসুন্দরীকে জানালেন যে, ঘোড়া বিগড়োয় কচুয়ানের দোষে ; দশ বছর ধ'রে ক্ষণদাসুন্দরীর অধ্যাপনা পাবার পরেও তরুণ যে একেবারে জানোয়ার হ'য়ে ওঠেনি, সেটাই তার বাহাদুরি ; কাজেই মায়ের সাজা ছেলের ঘাড়ে পড়াতে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কথাটা ক্ষণদাসুন্দরীর মনে নিলে ; হঠাৎ তাঁর স্মরণে এল যে তরুণ অভিশপ্ত, মা ভগবতীর অপমানে কান পাতার শাস্তিস্বরূপেই তাঁর পেটের কন্যা পুত্র হ'য়ে জন্মেছিল।

ক্ষণদাসুন্দরীর মধ্যে বুদ্ধির প্রাচুর্য না-থাকলেও, সে-অভাবটা[র পূর্ণতা] সাধিত হয়েছিল অধ্যবসায়ের আতিশয্যে। তিনি স্থির করলেন গোড়ার গলদ শেষে শোধরানোর চেয়ে

কেঁচেগণ্ডূষ করায় অনেক বেশি সুফল। অতএব ভগবতীর কাছে গুপ্তচরে ঘুস নিয়ে যাতায়াত শুরু করলে। দেবীর দয়াময়ী নাম মিছে হ'ল না ; বছর ঘুরতে না-ঘুরতে ক্ষণদাসুন্দরীর একটি মেয়ে জন্মাল। কিন্তু আশাতরীর তীরে এসে ডোবার অভ্যাসটা চিরপ্রসিদ্ধ। কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার বারো ঘণ্টা বাদে তিনি ভবলীলা সংবরণ করলেন।

দেবতাদের রীতি দুরূহ। ক্ষণদাসুন্দরীকে সার্থক লগ্নে পরাহত ক'রে, তাঁদের কোন্ অভিরুচি সিদ্ধ হয়েছিল, কে বলতে পারে? হয়তো তাঁরা এর দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে নির্ভুল আখ্যা জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। কিংবা এমনও হ'তে পারে যে ক্ষণদাসুন্দরীর তিরোধানে দেবলোকের কোনোই গূঢ় অভিপ্রায় ছিল না ; তাঁরা তাকে ডাক দিয়েছিলেন শুধু কৃপাপরবশ হ'য়ে। সমস্ত ভুল সত্ত্বেও ক্ষণদাসুন্দরী আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রী ; আত্মবলিদান যদি প্রশংসনীয় হয়, তাহ'লে নিরুদ্দিষ্ট আত্মবলিদানের মর্যাদা আরো অনেক বেশি ; মেয়াদ ফুরুবার বহু পূর্বে ক্ষণদাসুন্দরীর ভববন্ধন মুক্ত ক'রে, দেবতারা অসামান্য উদারতার পরিচয় দেননি। তবু দান ছোটো হ'লেও, দাতা সর্বদাই ধন্যবাদার্হ। তাছাড়া এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, পারে পৌঁছে বিনা-মেঘে বজ্রপতন হওয়ার থেকে, পারের সাক্ষাতে নৌকাডুবি হওয়া অনেক কম শোকাবহ। সাধনা-সিদ্ধির পরে বাঁচলে ক্ষণদাসুন্দরীর ভাগ্যে তাই ঘটত।

কারণ গত দশ বছরের মধ্যে মাইটর-সাহেবের মন অদ্ভুতরকমে বদ্‌লে গিয়েছিল ; তাঁর প্রথম সন্তান-কামনার মূলে ছিল আত্মনিষ্ঠার অভাব। তিনি জানতেন, পুতুল গড়ার বিদ্যায় তিনি পারদর্শী, কিন্তু পত্নীর উপরে সে-নিপুণতা খাটেনি ; তাই আরো নরম মাটির জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলেন। তখনো তিনি বোঝেননি যে ভারতীয় রমণী নমনীয় বটে, কিন্তু তার থেকে আরও নিরাকার, আরও নিরাকৃত একটা পদার্থ আছে যার নাম ভারতবাসী। এটা জীবপঙ্ক নয়, একেবারে কারণার্ণব, পাত্রের আকারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাই এর ধর্ম। এই রোমহর্ষক আবিষ্কারের পরে, বংশবৃদ্ধিতে আস্থা হারানো স্বাভাবিক। তরুণের আগমনে সে-আস্থার প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। সন্তানলাভ মানে প্রতিষ্ঠাক্ষয়, খাল কেটে কুমির ডেকে আনা। উপরন্তু সমস্ত দেশ যাকে পিতৃস্থানীয় ব'লে স্বীকার করেছে, সন্তান নামক আত্মবিশ্লেষণ তার পক্ষে নিতান্ত অপব্যয়।

অবশ্য তরুণের দিকটা ভাবলে হয়তো তার একটি ভাই হওয়া বাঞ্ছনীয় ; প্রতিযোগিতার অভাবে মানুষের দায়িত্বজ্ঞান বাড়তে পায় না। কাজেই তরুণকে ভ্রাতা দানের চেষ্টায় মাইটর-সাহেবের অমত ছিল না। কিন্তু মেয়েকে দিয়ে কী কাজ পাওয়া যাবে? তাকে উপলক্ষ ক'রে বিদ্রোহী পুত্রের সামনে উইল আস্ফালনের মতো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি শুধু অশোভনই নয়, অসম্ভব। না, মেয়েতে তাঁর কোনো দরকার নেই। মেয়ে হওয়া মানে শুধু ভাবনা বাড়ানো, তার বিয়ের চেষ্টা, তাকে প্রসব করানোর হাঙ্গাম, এমন-কি তার বৈধব্যের ভারবাহী হওয়া। সুখে থাকতে ভূতকে কিলোনোর সুযোগ দেয় কেবল অর্বাচীনেরা।

কিন্তু দৈব বিচারের ধার ধারে না, এমন-কি অপরাধীকে দণ্ড দেবার অধিকারটুকু তার কাছে প্রত্যাশা করা পাগলামি। সে জানে শুধু কুমৎলব দিতে এবং ষড়যন্ত্র ধরা পড়লে মুখ্য অভিনেতাকে নেপথ্যে সরাতে। মাইটর-সাহেবের অভিযোগের বোঝা অসহ্য হ'য়ে উঠল।

কিন্তু করো কাছেই দরদ পাওয়া গেল না। তাঁর দারুণ দুর্দিন এসেছে দেখে তাঁর শ্বশুর-সুদ্ধ বাদ সাধলে[ন]। তিনি আদেশ পাঠিয়েছিলেন যে অনাথ শিশুদুটির ভার মাতামহ নিয়ে তাঁর দেশসেবার পথ যেন পরিষ্কার করেন। তাঁর শ্বশুর প্রস্তাবটা শুধু প্রত্যাখ্যান করলেন না, সঙ্গে-সঙ্গে একখানা চিঠি দিলেন যেটাকে ঠিক সময়োচিত বলা চলে না। সংসার এমনি নীচ, এমনি সঙ্কীর্ণ ; সেখানে শোকের মর্যাদাটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখা দুষ্কর। এবং আইনকানুনগুলো সমস্তই পক্ষপাতে ভরা : পিতা সন্তান-পালনে বাধ্য, কিন্তু মাতামহ, যে [যিনি] একটু ধৈর্যশালী হ'লে এই মিথ্যা লোকবৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনাই থাকত না, তাঁর কোনোই দায়িত্ব নেই। মাইটর-সাহেব মনে-মনে দিব্য করলেন স্বাধীন ভারতের দণ্ডবিধিতে দৌহিত্র-উৎসর্জনের শাস্তি খুব কঠোর করতে হবে।

ইতিমধ্যে তরুণকে বোর্ডিংস্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা হ'ল, এবং মেয়ের জন্যে একটি দো-আঁশলা ধাত্রী পাওয়া গেল, যার উপযোগিতা শতমুখী।

৪

পিতা-পুত্রের মনান্তরটা সনাতন হ'লেও, মৌখিক সদ্ভাব মন্দ ছিল না। অন্য কিছুর অবকাশ ঘটেনি। ক্ষণদাসুন্দরীর মৃত্যুতে মাইটর-সাহেবের নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার প্রধান অন্তরায় ঘুচেছিল ; তাঁর পসারের আর দিশপাশ ছিল না ; তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অধিকাংশই করেছিলেন মহাপ্রস্থান, এবং বাদবাকিদের কেউ-বা ছিল জননী-জঠরে ; কেউ-বা তখনো স্বর্গ থেকে ছুটি পায়নি। মিস্ অগলিভির কল্যাণে তাঁর ভাবজীবনটা চলেছিল অমরত্বের পানে, মেয়ের বয়স তখন নেহাৎ কাঁচা, ছেলের দৌরাত্ম্য সইতে হয় বছরে একবার, এক মাসের জন্যে। সময়ে-সময়ে তাঁর মনে হ'ত তিনি বুঝি ক্রমশ সন্তানবৎসল হ'য়ে উঠছেন। মণিকা সত্যই আশ্চর্য মেয়ে, তাকে কোনোরকমে উৎপাত ভাবা তো চলেই না, বরং সে পরম উপকারী। আর তার নামটি! মিস্ অগলিভিকে তারিফ না-ক'রে থাকা শক্ত। একটা সামান্য নামের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা ওই স্ত্রীলোকটি ফুটিয়ে তুলেছিল ; মণিকা নামের উপরে পূর্ব-পশ্চিমের সমান অধিকার ; ওটি আধুনিক, চক্‌চক্ করছে। তরুণের ইস্কুলটাকেও ভালো বলতে হবে ; শিশুশিক্ষার পক্ষে কড়া নিয়মের মতো অপরিহার্য উপায় আর নেই। তাছাড়া তার ইস্কুলের রিপোর্টগুলোও আশাপ্রদ, লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী, তবে খেলাধুলায় বড়োই উদাসীন। তাতে ভয় পাবার কিছুই নেই ; জীবনের গুরুগাম্ভীর্য উপলব্ধি করার জন্যে সবসময়ই উচিত সময় ; সেখানে কেউ নাবালক নয়। মোটের উপরে সে বেশ চলনসই, চেহারাখানাও জন্মদাতার পক্ষে গ্লানিকর নয়।

তরুণের তরফ থেকেও বন্দোবস্তটা রুচিবিরুদ্ধ হয়নি। একা থাকতেই সে ভালোবাসত, এবং এখানে পড়ার হিসেবে বাকি না-পড়লে, তাকে বে-আবরু করার কোনো চেষ্টাই ছিল না। সহপাঠীরা মাঝে-মাঝে খেলতে বলত বটে, কিন্তু তাদের দলে যোগ না-দিলে তারা ঠাট্টা করত মাত্র, জোর দেখাত না। খাওয়া শোওয়া আর পড়া ছাড়া সমবয়সীদের সঙ্গে মাখামাখি হওয়া ছিল সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। অবশ্য ছুটিগুলোর কথা মনে হ'লে সে ভয় পেত ; সেগুলো

উপদ্রবেরেই নামান্তর, দুষ্কর অভিনয়ের উপলক্ষ। কিন্তু মণিকার সঙ্গে প্রত্যেকবার নতুন ক'রে ভাব করার আনন্দটা বিনা-মূল্যে তো আর মিলে না! উপরন্তু মিস্ অগলিভিও মোটের মাথায় বেশ আমুদে। মাঝে-মাঝে বাবার কানে গোপন কথাগুলো একটা অলৌকিক সূত্রে গিয়ে পৌঁছত বটে, কিন্তু মিস্ অগলিভির স্কটল্যান্ডবাসী পূর্বপুরুষদের গল্পগুচ্ছের বিনিময়ে একটা-আধটা শব্দবহুল বক্তৃতা হয়তো তেমন অশ্রাব্য ছিল না। স্কটল্যান্ডবাসী মাত্রেরই গায়ের রঙ মিস্ অগলিভির মতো হলুদগোলা কি-না, এই নিরীহ প্রশ্নের উত্তরে তার বিব্রত মৌনিতা লক্ষ করার মজা যে-পরিমাণে উপাদেয় লাগত, তার তুলনায় পিতার হিতোপদেশ মোটেই দুঃসহ নয়। তরুণ অল্পবয়সেই শিখেছিল কৃপণের কপালে সুখ নেই।

কিন্তু অহিংস অসহযোগকে চিরায়ু করা শক্ত ; তার তলায়, লোকচক্ষুর অগোচরে উদ্দীপনার অগ্নিগিরি সবসময়ে ওঁৎ পেতে ব'সে আছে ; পম্পীর নিপাত একদিন-না-একদিন অনিবার্য। দুইটি প্রতিযোগী জাতির স্থগিত যুদ্ধের মতো পিতা-পুত্রের অন্তঃশীল দ্বন্দ্ব একদিন উচ্চণ্ড বেগে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল একটি নির্বিবাদী তৃতীয় ব্যক্তির দাবিদাওয়াকে হেতু ক'রে। এবং অনুপে-অনুপে যুদ্ধের মতো এ-মহাসমরও হঠাৎ একদিন থেমে গল, অকারণে, একটা সমস্যারও সমাধান হবার আগে। তরুণের বয়স তখন প্রায় কুড়ি, সে কলেজ থেকে বেরুবার উদ্যোগ করছে।

যাকে নিয়ে এই কুরুক্ষেত্রের সূত্রপাত, সেকালের ছাত্রসমাজ তাঁকে ডাকত উমেশদা ব'লে। লোকটি আজব ; তাঁর জগৎ ব্যত্যয়ে ভরা ; তাঁর বন্ধুর অভাব ছিল না, এবং তাদের প্রত্যেকেই অকৃত্রিম বন্ধু ; শত্রুর সংখ্যাকেও নগণ্য বলা শক্ত, এবং এদের মধ্যে দয়ামায়ার চিহ্ন দেখা যেত না। কিন্তু তাঁর আশপাশে কেবল পরিচিতদের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব ছিল। বোধহয় তিনি সেই ক্ষণজন্মাদের মধ্যে একজন যাদের জীবন ঘড়ির মতো ঘাত-প্রতিঘাতের সীমা থেকে সীমান্তরে অনবরত দোলা না-খেলে চলতে পারে না। তারা প্রেম চায় এবং পায় ; বিদ্বেষকে ভয় করে না এবং তাতে বঞ্চিত হয় না ; কিন্তু তিতিক্ষার অবহেলায় তারা হাঁপিয়ে ওঠে। সে যাই হোক্, এই লোকটির বিষয়ে যত আষাঢ়ে গল্প প্রচলিত ছিল, তার সবগুলো সত্য হওয়া অসম্ভব। কেউ বলত তাঁর জন্মের ঠিক নেই, আবার কারো মতে তিনি অভিজাত ; কেউ বলত অত বড়ো মূর্খের জোড়া পাওয়া দুষ্কর ; কারো চোখে তিনি পণ্ডিতদের শীর্ষস্থানীয় ; কোনো ধর্মভীরু তাঁকে সাক্ষাৎ কলি ব'লে ভাবত, আবার কারো কাছে তাঁর অন্তিম জীবন অনুকরণীয়। এই মতদ্বৈতের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক ঐকাত্ম্য সম্বন্ধে। শত্রুপক্ষের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল তিনি পুলিশের ভিক্ষাজীবী গুপ্তচর, এবং গুণগ্রাহীরা জোর গলায় ঘোষণা করত তিনি ভারতের নবজাত চরমপন্থীদের পরম পুরোহিত। সত্য কোন্‌টা বিচার করা শক্ত, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে এ দুই ক্ষেতের মধ্যবর্তী উষর জমিতে তাঁর সন্ধান ব্যর্থ।

এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সাধারণের সন্দেহভঞ্জনের তিনি কোনো চেষ্টাই করেননি। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাম ব'লেই ক্ষান্ত হতেন ; মত্ত হস্তীর সাহায্য নিয়েও তাঁর কাছ থেকে বার করা যেত না যে তিনি এক মহামহোপাধ্যায়ের কুলতিলক, যৌবনের

তাড়নায় ব্রাহ্মধর্ম ববণ করার অপরাধে ত্যাজ্য হয়েছিলেন। লোকে জানত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে তিনি ইংলণ্ডে যান, কিন্তু সেই বৃত্তি পাবার পিছনে কেমন দারুণ অধ্যবসায়, কত অভুক্ত দিন, কী দুস্তর অন্ধকার লুক্কায়িত ছিল তা দেখবার কোনো ছিদ্রই তিনি রাখেননি। কানাঘুসা শোনা যেত যে সে-ছাত্রবৃত্তি কোনো অনির্বচনীয় দুষ্কৃতির জন্যে অল্পদিনেই বন্ধ হয়। কিন্তু বহু বর্ষ বাদে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত ডাক্তার পদবীটি মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অথচ পশ্চিমে বিদ্যাভ্যাস ব্যয়সাধ্য ; সে-গুরুদক্ষিণা জোগালে কে? আর যদি পয়সাই মিলল, তবে তিনি সমস্ত অর্থকরী বিদ্যা ছেড়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিই-বা এত অনুরাগী হ'য়ে উঠলেন কেন? কিন্তু কৌতূহলের কোনো সমাধান হ'ত না ; তাঁর গভীর জীবনস্রোতে ডুবুরিদের অবগাহন জলের আবিলতা বাড়াত মাত্র।

লোকের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁর জীবন সঙ্গতির ধার ধারত না, বেশভূষায়, আলাপে-আপ্যায়নে, আচারে-ব্যবহারে, কোথাও না। সেকালের বিলেত-ফেরতদের মতো তাঁর অঙ্গে বিদেশী আবরণের উন্মুখর আড়ম্বর কোনোদিন দেখা যায়নি। কিন্তু পরিধানে নিভাঁজ স্বদেশীয়ানা পরিস্ফুট হ'লেও, তাঁর মুখে মাতৃভাষার উচ্চারণ কেউ কখনো শুনেছে ব'লে জানি না। তাঁর বাসাবাড়ির পারিপাট্য দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত তিনি নিঃস্ব, অথচ সমস্ত বাড়িখানাকে পাতিপাতি ক'রে খুঁজেও কেউ কোনোদিন একটা চাকরের সাড়া পায়নি। তাঁর দেহের পুষ্টি মুখের অপরিপূর্ণতার সঙ্গে মানাত না, তাঁর ছাত্রপ্রীতি সমাজ-বৈরাগ্যের প্রতিবাদ করত, তাঁর উক্তির সংরাগকে নিষ্ফল ক'রে দিত কণ্ঠের কবোষ্ণ কম্রতা। একটা বিজাতীয় বিশেষণের শরণ নিলে উমেশদার চরিত্র বেশ সুপ্রকট হ'য়ে ওঠে, তিনি ছিলেন উৎকেন্দ্রিক। কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা আর অনিষ্ঠা একার্থবাচক শব্দ নয়। তাই তিনি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, কিন্তু তাদের উপেক্ষাভাজন হননি। তিনি ছিলেন কুয়াসা-ঘেরা পাহাড়ের মতো ; একটা রহস্য ভেদ ক'রে তাঁকে দেখতে হ'ত। কাজেই তাঁর আকারটা হয়তো কারুর কাছে অবাস্তবরকমের বড়ো ঠেকত, কারুর লাগত অযথারকমের ছোটো ব'লে ; কিন্তু সমতল ভূমির সঙ্গে ভুল করার কোনো উপায় ছিল না।

উমেশদা মানুষটি হেঁয়ালির অবতার হ'লেও, তাঁর চেয়েও বড়ো হেঁয়ালি ছিল তাঁর কলেজ। সেই প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজ ব'লে তিনি খুব ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দেননি। অন্ততপক্ষে অন্য কলেজের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু বৈষম্যের খাতিরে। তার অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল এক,—স্বয়ং উমেশদা, এবং ছাত্রের সংখ্যা কোনোদিন দশ পেরুতে শুনিনি—পঁচিশের বেশি নেওয়া তাঁদের নিয়মেতেই বাঁধত। কিন্তু এই গুরু-শিষ্যের অভাব পূরণ হয়েছিল পারায়ণের পরিসরে। সেখানে কোনো পাঠ্যই ঐচ্ছিক ছিল না, প্রত্যেকটিই আবশ্যিক, অঙ্ক থেকে শুরু ক'রে সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত। তবু কোনো ছাত্র বিদ্রোহ করেনি, কারণ দু-এক মাস না-যেতে-যেতে তাদের শিক্ষা দীক্ষাতে পরিণত হ'ত। উমেশদা জাদু জানতেন, তাঁর গোলামি করা সৌভাগ্যসূচক হ'য়ে দাঁড়াত, তাঁর অবিচার-অত্যাচারকে লাগত সোহাগের মতো। কাজেই সে-সম্প্রদায়ে কেউ বিভীষণের অনুগমন করেনি। সেখানে স্থান

পাওয়া এমনই একটা অসামান্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার ছিল যে, সে-সঙ্ঘের সদস্যেরা কৌতূহলীদের মোটেই আমল দিত না। স্বাধিকারকে রহস্যমণ্ডিত করাই মানুষের স্বভাব।

কিন্তু তরুণ সেখানে প্রসিদ্ধির লোভে আসেনি। প্রবেশিকা পাশ করার পরে তাকে যখন আর ইস্কুলে রাখা গেল না, মাইটর-সাহেব তখন ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর ছেলে তো আর সাধারণ ছাত্রনিবাসে থেকে কলেজ করতে পারে না ; কিন্তু তাকে বাড়িতে রাখাও অসম্ভব। তড়িৎকণার মতো তার উপস্থিতিতে মাইটর-সাহেবের রসস্রোত বিভক্ত গ্যাসের আকারে উবে যায় ; অন্তরাত্মা ধাক্কার পর ধাক্কা খেতে থাকে, দর্শকের মনে জাগে নিষ্প্রয়োজন অনুসন্ধিৎসা। এইসময়ে একটা মাসিকপত্রে উমেশদার নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নাম দেখে তিনি অকূলে কূল পেলেন। লোকটা নিশ্চয়ই ভণ্ড কিন্তু তার ভণ্ডামির আওয়াজটা যথাযথ। প্রবন্ধে মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ড শব্দদুটির ছড়াছড়ি মাইটর-সাহেবের খুব পছন্দ হ'ল। বাগ্মিতায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে 'নরনারায়ণের উজ্জীবন' ইত্যাদি বাক্যগুলো সুচিন্তিত বটে ; গণকল্পনার অধিপতিত্বে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাছাড়া দক্ষিণাব মাত্রাটাও বৈশিষ্ট্যময়। ছেলের লেখাপড়ার জন্যে মাসিক দুশো টাকা খরচ করার সামর্থ্য এ-দেশে অল্প লোকের আছে। মাইটর-সাহেব নিশ্চয়ই জানলেন, ও-বিদ্যাপীঠের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু উমেশদার কলেজে ভর্তি হওয়া ব্যাপারটা সহজ ছিল না ; পুত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে মাইটর-সাহেব এ-ক্ষেত্রে কৃতকার্য হ'তে পারতেন কি-না, সন্দেহ। তাঁর দরখাস্ত প্রথমটা গ্রাহ্য হয়নি, কিন্তু তিনি জানতেন সন্তান বিধাতার বর নয়, বিধাতার দণ্ড, তাই উমেশদার ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ না-ক'রে, আবার সচেষ্ট হলেন। উপরন্তু উপায়ান্তর ছিল না। শেষে ভাবী গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎকারে তাঁর ইচ্ছা পূরল। বোঝা গেল তরুণ তার ভবিষ্যৎ গুরুর মন পেয়েছে, তার অস্থায়ী প্রজাস্বত্ব অচিরে মৌরুসী হবে।

বাড়ির বাইরে একটা অসীম শান্তি অনুভব করলেও, তরুণের মন উমেশদার কলেজে যেতে চায়নি। তখনো বড়ো কথায় তাঁর ভয় ভাঙেনি, এবং উমেশদার প্রবন্ধটিতে ছোটো কথা অল্পই ছিল। কিন্তু যেটা তাকে সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল, সেটা পিতার বিদায়কালীন বক্তৃতা। প্রসঙ্গত তাঁর ত্যাগ, তাঁর অপমানবরণ, তাঁব অর্থহানির উল্লেখ ক'রে মাইটর-সাহেব যে পৈতৃক আত্মোৎসর্গের ছবি এঁকেছিলেন, তাতে তরুণের নিষ্ঠুর হৃদয়ে অনুতাপ জাগেনি, হয়েছিল বিরক্তি-সঞ্চার। সে উষ্ম কণ্ঠে জানিয়েছিল যে এ-কলেজে যেতে তার আদৌ ইচ্ছে নেই, তাকে এখানে পাঠানো শুধু জুলুম। মাইটর-সাহেব পুত্রের ব্যবহারে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন ; জুলিয়স সিজারের চরমোক্তির মর্মান্তিক অর্থ তিনি এতদিনে হঠাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর মুখে কথা সরেনি, সজ্জিত গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রেই তাঁর শক্তির অবসান হয়েছিল।

কাজেই তরুণ উমেশদার তত্ত্বাবধানে এসেছিল একটা অব্যক্ত অভিযোগ নিয়ে ; তার মনে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে কলেজটা তার খুবই খারাপ লাগবে ; পিতার পছন্দর সঙ্গে তার পছন্দের মিল আগে আর ঘটেনি। কিন্তু দু-চারদিন যাবার পরে তাকে স্বীকার করতে

হ'ল, বিদ্যালয়ই জয়ী, এখানে এসে তার প্রাণের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য জেগেছে যার অস্তিত্বটুকুও পূর্বে সে জানত না। সেটা একটা অনির্বচনীয় উপলব্ধি, তার মধ্যে কোনো এক জায়গা যেন সার্থক হ'য়ে উঠেছে। আসল কথা, তরুণের অন্তর্জ্ঞান উমেশদার মতো একজন শিক্ষকের জন্যে অনেকদিন থেকেই পথ চেয়ে ছিল, কারণ উমেশদার তরফে তাকে বশ করার কোনো চেষ্টাই দেখা যায়নি। তাঁর কথার মধ্যে কোনো বিশেষ আত্মীয়তার ধ্বনি ছিল না, তাঁর আচরণে নির্লিপ্তি ফুটে বেরুত, তাঁর সৌজন্যে ছিল সকলের অধিকার। কিন্তু খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কাটানোর পরে এ-বিশ্বাস এড়ানো শক্ত হ'ত যে তিনি নিজেকে অতিমানব মনে করেন বটে, তবে সঙ্গে-সঙ্গে সামনের লোকটিকেও সমান অতিমানবত্ব দিয়ে থাকেন, মনে হ'ত তাঁর ব্যক্তিত্ব অত বড়ো কারণ তিনি মনুষ্যজাতির অন্যতম, এবং মনুষ্যজাতি বিরাট। তরুণ জীবনে কখনো অত শ্রদ্ধা পায়নি ; সে কোনোদিন ভাবতে পারেনি তার মতেরও মূল্য আছে, তার জানা ছিল না স্মৃতিকথনের সুরে উপদেশ দেওয়া সম্ভব।

ভর্তি হবার কিছু পরে একদিন পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তরুণ সূর্যাস্ত দেখছিল। উমেশদার সঙ্গে তার তখনকার সম্বন্ধটাকে বন্ধুত্ব বলা চলে না। তার প্রাণ তখনো অভিমানে ভারি, তার প্রতি মাইটর-সাহেবের অবিচারের স্মৃতিটা তখনো তার নিজের আচারে-ব্যবহারে একটা সঙ্কোচ জাগিয়ে রেখেছে, এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও উমেশদাকে সে এই অন্যায়ের দায় থেকে পুরো মুক্তি দিতে পারছে না। তাই সে শরতের অতিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু তার চোখে ঠাহর নেই ; তার মন চলেছে অতীতের পথে, পৈতৃক অত্যাচারের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারে। জ'ন্মে ইস্তক তাকে কেউ কখনো বুঝতে চায়নি ; জ'ন্মে ইস্তক তার নগণ্যতম কথাকে, কাজকে নিয়ে তারা যা-তা করেছে, সেগুলোকে বাঁকিয়ে তেউড়ে এমন একটা রূপ দিয়েছে যা দেখলে তার নিজের লজ্জা হয় ; বিসংবাদ কুড়তেই যেন তার জন্ম। কিন্তু সে ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না, তাদের দেখাবে যে তাকে মাড়িয়ে চলা নিরাপদ নয়। স্বানুকম্পার সদ্যোজাত সুখটি যখন খুব উপভোগ্য লাগছে, তখন তরুণের হঠাৎ মনে হ'ল সে আর এক্‌লা নেই, চম্‌কে দেখলে পাশে উমেশদা তারই মতন রেলিং ধ'রে পশ্চিমাকাশে অবাকদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সুদূর-পরাহত স্বরে তিনি বলতে লাগলেন : 'সেদিনেও আজকের মতো সারাদিন বৃষ্টির পর সন্ধেবেলার আকাশখানা জলুস হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু অত উঁচুতে তাকাবার অবকাশ পাইনি, মনে জ্বলছিল বিদ্বেষের আগুন, কানে বাজছিল বাবার শেষ তিরস্কার। বোধ হচ্ছিল জগতে আমার চেয়ে দুঃখী আর নেই, আমায় কেউ চায় না, আমায় বোঝার জন্যে এতটুকু শক্তি খরচ করতে সবাই নারাজ। হঠাৎ রাগে অন্ধ হ'য়ে গেলুম, পণ করলুম উত্তমপুরুষের প্রাধান্য প্রতিপন্ন না-হওয়া পর্যন্ত জলগ্রহণ করব না। ব্রাহ্মসমাজ কাছেই ছিল ; দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটা বেশিক্ষণ লাগেনি ; সেদিন থেকে ভদ্রাসনের চৌকাঠ মাড়াইনি। তারপর অনেক দেশে ঘুরেছি, অনেক অবস্থায় পড়েছি, অনেক লোকের ঘাত-প্রতিঘাতে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে যে, জগৎ আমায় ভুল বোঝেনি, জগতকে ভুল বুঝেছি আমি। বার-বার দেখেছি যাদের মধ্যে বোঝার কিছু নেই, ভুলবোঝার অভিযোগ করে তারাই।'

তরুণ স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল ; লোকটির কি দিব্যদৃষ্টি আছে! তারপর সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেদিন সে যত কথা বলেছিল, তত কথা সারাজীবনে সে বলেছে কি-না সন্দেহ। অথচ সে-জল্পনায় আত্মকথার কোনো দরকার পড়েনি ; নিজেকে বাদ দিয়েও তার চিন্তা বিশ্বপরিক্রমায় কোথাও পথচ্যুত হয়নি। অবশেষে সে-রাত্রে সে যখন শুতে গেল তখন তার অন্তরে একটা শান্তি ছিল যেটা অনির্বচনীয়, অভূতপূর্ব, তার মনে হয়েছিল সে বুঝি নক্ষত্রসভায় বিচরণ করছে, তার চারপাশে শূন্যতা, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি যোজনব্যাপী শূন্যতা, অথচ সে নিঃসঙ্গ নয়, একটা নিঃশর্ত সখ্যের অনাদ্যন্ত আবির্ভাবে তার অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ।

সেদিন থেকে তিন বছর ধ'রে এদের বন্ধুত্ব বেড়েই চলেছিল। যে-ভালোবাসা বাপ-মাকে না-দিতে পেরে তরুণের মনে বিষিয়ে উঠছিল, সেটার মালিক হ'তে উমেশদার বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়নি। উমেশদার দিক থেকেও সম্প্রতি একটা নূতন ক্ষুধা জেগে উঠছিল ; তাঁর বয়স তখন প্রায় সেই কোঠায় পৌঁছেছে যেখানে নিঃসঙ্গ মানুষ নিরুপায় হ'য়ে ভগবানকে আঁকড়ে ধরে। কিছুদিন থেকে তাঁর ভয় হচ্ছিল তাঁর নাস্তিবাদ বুঝি আর টিঁকবে না। এমনসময় তরুণকে পাওয়া গেল, যে-তরুণের অবস্থা তখন তাঁর বাল্যাবস্থার মতো নিরাশ্রয়, নিরাবলম্ব। সমস্ত জীবনটাকে তাঁকে নিজে খুঁজে নিতে হয়েছিল। ব্যাপারটা হয়তো পদচিহ্নহীন অজানা দেশ আবিষ্কার করার মতোই রোমহর্ষক, কিন্তু তার মধ্যে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। অসংখ্য ভয়-ভাবনা জয় ক'রে, অনন্ত বাধাবিপত্তি পার হ'য়ে যে-জিনিস আবিষ্কার করা যায়, তা মূল্যহীন হ'লেও পরিশ্রান্ত বুদ্ধির কাছে অমূল্য হ'য়ে ওঠে, উদ্যমের আতিশয্য তাকে মহার্ঘ ক'রে দেয়। কিন্তু সে-গরিমা যে অস্থায়ী। দায়ভাগে যে-সম্পত্তি পাওয়া উচিত ছিল শৈশব-কৈশোরে, প্রৌঢ়-যৌবনে তার স্বোপার্জন, সে যে নিষ্ঠুর অপচয়। তাতে শুধু মমতাই বাড়ে, নূতন বাধা স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠে, যৌবনের সিদ্ধি পেছিয়ে যায় বার্ধক্যে, হারিয়ে যায় মৃত্যুতে। না, না, তরুণের ভাগ্যে ইতিহাসের অনুলাপ চলবে না, কিছুতেই চলবে না। গোলকধাঁধায় পথান্বেষণ না-করতে হ'লে যে-গন্তব্যে তিনি আসতে পারতেন, সেখানে মানুষের বৈজয়ন্তী স্থাপিত করবে তরুণ। বিনিদ্র রাত্রে কোন্ অদৃশ্য দেবতাকে স্মরণ ক'রে উমেশদা বলেছিলেন : 'ভেরা, ভেরা, ব্যর্থ হবে না তোমার মৃত্যু। তোমার স্বপ্ন সত্য হবে, ভেরা, সত্য হবে, আমায় দিয়ে নয়, তরুণকে দিয়ে, আর তার'পরে কোটি-কোটি তরুণকে দিয়ে।'

ফলে গুরু-শিষ্যে এক নূতন শিক্ষার অকূলপাথারে ভেলা ভাসালেন যার লক্ষ্যনিরূপণ করা খুব সহজ নয়। সে-সমুদ্রের তরঙ্গ পর্বত-সমান, তার স্রোত অস্তব্যস্ত এবং তার মধ্যে নৌ-নৈপুণ্য প্রমাণ করতে হ'লে, পরীক্ষা নামক প্রণালীগুলো নির্বিঘ্নে পার হওয়া তত দরকার নয়, যত দরকার আলোকস্তম্ভের অভয়দক্ষিণা অগ্রাহ্য করা। সে-শিক্ষা রাক্ষসের উদরে প্রবেশ ক'রে সঞ্জীবনীবিদ্যা অর্জন করার মতো, আসুরিক বিপত্তির মাঝখানে প্রাণে বাঁচার শিক্ষা। তার ঝোঁক পুস্তকের উপর নয়, পুস্তক-প্রণেতার উপর।

তবে এটা মানতেই হবে যে তার আভ্যন্তরিক রূপটা যেমনই হোক্, বাইরে থেকে বেশ নয়নাভিরাম। মাইটর-সাহেব-সুদ্ধ খুসি হলেন। তিন বছরের মধ্যে তরুণের দ্রুত পরিবর্তনের প্রশংসা না-ক'রে থাকা যায় না। তার হিংস্র ভাবটা কেটে গেছে ; এখন তার সঙ্গে মেজাজ

ঠিক রেখে কথা কওয়া সম্ভব। লেখাপড়ার দিক থেকেও তার উন্নতি অসামান্য। উমেশদার কাছে শোনা গেল যে তরুণ এরই মধ্যে চার-পাঁচটা পাশ্চাত্য ভাষায় বেশ সরল গতি ক'রে নিয়েছে। সেটা হোক্ বা না-হোক্ তার উপাধি-পরীক্ষাদুটোর ফলাফল বেশ আশাপ্রদ। অবশ্য কোনো বৃত্তি তার ভাগ্যে জোটেনি ; কিন্তু তার কারণ বিদ্যার অভাব নয়, বিদ্যালয়ের অবৈধতা। সে-কথা মনে পড়লে মাইটর-সাহেব একটা বিপুল গর্ব অনুভব করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তরুণকে অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়েছিল শুধু সে মাইটর-সাহেবের পুত্র ব'লে। উমেশদার কলেজটা কলেজ ছিল কেবল নামে, কাজেই সেখান থেকে পরীক্ষার্থীর বহু সমাগম কর্তারা ইচ্ছা করতেন না। উমেশদা নিজেও এই অধিকারটুকু পাবার জন্যে আগ্রহ দেখাননি।

অবশ্য উমেশদার শিক্ষাপদ্ধতির সবটা কিছু বাঞ্ছনীয় নয়। মাঝে-মাঝে লম্বা-লম্বা প্রবাসগুলোর অর্থ করা একটু শক্ত। মাইটর-সাহেব খবর ক'রে জেনেছিলেন যে ভারতীয় জীবনের সমস্ত পর্যায়ের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা না-কি খুব আবশ্যক। এটা একেবারে অসম্বদ্ধ প্রলাপ। কিন্তু প্রতিবাদে কোনো ফল হয়নি, উমেশদা জানিয়েছিলেন তিনি তরুণের দায়িত্ব নিতে পারেন, শুধু তাঁর নিজের শর্তে ; পিতার অনধিকারচর্চা তিনি সইবেন না। লোকটার দম্ভ মাইটর-সাহেবকে পীড়া দিয়েছিল, কিন্তু পুত্রের মঙ্গলার্থে সমস্ত সহ্য করাই আদর্শ পিতার কর্তব্য ; উপরন্তু ওই-কৃচ্ছ্রসাধনের সুফল অস্বীকার করা অসম্ভব। তরুণের সঙ্গে এখন মেজাজ ঠিক রেখে কথা কওয়া চলে। বেচারা মাইটর-সাহেব! তাঁর বোঝার কোনোই উপায় ছিল না, তরুণের স্বভাব শাসনের ফলে বদলায়নি। সে শুধু শিখেছে যে নিষ্প্রয়োজন সংঘর্ষে শক্তি অপচয় করা মূর্খতা ; সময় আসুক, তখন দেখা যাবে তার চিত্তবৃত্তি কী ভয়ানক।

সময় আসতে বেশি বিলম্ব হ'ল না। একটা রাজনৈতিক মামলার উপলক্ষে মাইটর-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জানালেন যে তাঁর সম্বন্ধে সরকার কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন।

মাইটর-সাহেবের সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল, তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কীরকম?'

রাজপুরুষটি বললেন : 'গোল আপনার ছেলে তরুণকে নিয়ে। তার সম্বন্ধে সরকার নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।'

মাইটর-সাহেবের প্রত্যুৎপন্ন আর্তনাদটি ততটা কানে বাজেনি যতটা প্রাণে বাজল : 'চিরদিনই জানতুম, ওই-হতভাগার জন্যেই আমার হাতে দড়ি পড়বে।'

রাজপুরুষটি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন : 'ব্যাপারটা এখনো ততদূর পর্যন্ত গড়ায়নি, এখনো বন্ধ করার উপায় আছে। সম্প্রতি একটা খানাতল্লাসিতে ওই আপনাদের উমেশের নাম-লেখা একখানা বই পাওয়া গেছে। এরপর তার রাজদ্রোহ প্রমাণ হওয়া শুধু সময়সাপেক্ষ।'

শ্যামকান্তি ভেদ ক'রে মাইটর-সাহেবের অন্তঃস্থ শুভ্রতা যেন আভাস দিতে লাগল ; তাঁর অঙ্গের প্রান্তগুলো হিম হ'য়ে গেল, তিনি মুমূর্ষু স্বরে জবাব দিলেন : 'আমাদের উমেশ!

আমাদের উমেশ!! আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি তদন্ত ক'রে দেখুন তরুণের ও-কলেজে ভর্তি হওয়ায় আমার কী আপত্তি ছিল। লোকটার ধরনধারণ আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি, কিন্তু এ-কথা ঘুণাক্ষরে জানলে তরুণকে কেটে ফেলতুম তবু ও-মুখো হ'তে দিতুম না।'

সহানুভূতির স্মিত হাস্য হেসে রাজপুরুষ বললেন : 'সে কি আমায় বোঝাতে হবে? কিন্তু কর্তাদের মার্জি তো জানেন। তাছাড়া অত্যধিক আশকারা দেওয়াও কিছু [ভালো] নয়। রাশ একটু টেনে চলাই ভালো, সাবধানের বিনাশ নেই।'

'তা আর বলতে।' শুধু এইটুকু ব'লেই মাইটর-সাহেব নীরব হলেন, কিন্তু তাঁর অন্তঃশীল কৃতজ্ঞতা চাপা থাকেনি চোখের তারল্যে, করমর্দনের নিবিড়তায় ; পুরোগমনের বাহুল্য সুহৃদের মনোহরণ করলে।

তাই বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন : 'আপনাকে উপদেশ দেবার মতো যোগ্যতা আমার নেই, যা-বলেছি বন্ধু হিসেবেই বলেছি, অপরাধ নেবেন না।' তারপর এই বন্ধুত্বের পরিচয়স্বরূপ মাইটর-সাহেবের কাঁধে দু-হাত রেখে তিনি যোগ দিলেন : 'কাজের কথা আজ কিছুই হ'ল না। তা আপনার মতো বিজ্ঞকে আর বোঝাই-বা কী? মোদ্দা কথা, এ-মোকদ্দমার উপরে শুধু আপনার মক্কেলের দোষ-নির্দোষ নির্ভর করছে না, এত বড়ো রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করছে। সরকারের তরফ থেকে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা, সুবিচার হোক্।'

মাইটর-সাহেব কোনো জবাব দেননি, কিন্তু তাঁর অতিথি উত্তরের অপেক্ষা করলে না ; মাইটর-সাহেবের উজ্জ্বল দৃষ্টিতেই তিনি বোধহয় সুবিচারের আশা পেয়ে থাকবেন, কারণ 'আবার শীঘ্রই দেখা হবে' ব'লেই তিনি হলেন অন্তর্ধান এবং এই আত্মীয়তা-জাত সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা বহনের জন্যে মাইটর-সাহেব রইলেন একা।

কাজেই পরের দিন প্রাতে জোর তলবের ফলে তরুণ যখন পিতৃগৃহে উপস্থিত হ'ল, তখন পিতার মেজাজটা খুব মোলায়েম ছিল না। তবু এমন দিনেও তাঁর অফুরন্ত সৌজন্যে ঘাটতি পড়ল না। তাঁর জুরি-মনোমোহিনী কণ্ঠস্বর বলতে আরম্ভ করলে : 'তোমার স্বর্গগত মা যে-দিন আমাকে তোমার আবির্ভাবের খবর দিলেন সেদিন তাঁর এবং আমার আনন্দের আর সীমা ছিল না। সেদিন আমরা পরস্পরকে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা নিলুম যে মহাপুরুষ গঠনের জন্যে জগতে যত কিছু উপকরণ আছে, তোমার ভাগে তার কোনোটার অভাব আমরা ঘটতে দেব না। নিজের কথা হ'লেও গর্ব ক'রে বলছি, প্রতিজ্ঞাপালনে আমার ত্রুটি হয়নি, কেনা চাকরের মতো মুখে রক্ত তুলে খেটেছি যাতে তোমার উত্তরাধিকার অসামান্য হ'য়ে ওঠে ; এর মধ্যে আবার দেশসেবা করতে হয়েছে, হিতসাধনে উদাস থাকা চলেনি, কেন-না শুধু টাকার ব্যবস্থা ক'রেই পিতার কর্তব্যের অবসান হয় না, সন্তানের সুপরিচয়ের দায়িত্বও তাঁরই। আর আমাদের আত্মবিসর্জনের তুমি প্রতিদান দিলে কী ক'রে? অমানুষিক ব্যবহারে মা-কে অকালে যমালয়ে পাঠিয়ে এবং আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এনে!'

মাইটর-সাহেব বিরত হলেন। আগের রাত্রে শয্যাকণ্টকে শুয়ে তিনি যখন এই দৃশ্যটার পরিকল্পনা করেছিলেন তখন ঠিক এইখানে চিত্রার্পিত তরুণ ভেঙে পড়েছিল। এইখানে তার

জন্ম-জন্মান্তরে অমুক্ত অশ্রুর বান ডেকে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু ছবিখানাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করায় তার কোনো আগ্রহই দেখা গেল না। উল্টে তার ছেলেবেলার সেই সেরে-যাওয়া ব্যাধিটা আবার ফুটে উঠল ; মুখের রক্ত গিয়ে আশ্রয় নিলে কানে, জিভে নেমে এল সেই বিবশ মৌনী।

মাইটর-সাহেব তখন নিরুপায় হ'য়ে পদ্ধতি বদলালেন। তাঁর জেরাকারী কণ্ঠ প্রশ্ন করলে : 'চুপ ক'রে রইলে যে?'

যে-স্বর শত সহস্র বিদ্রোহী সাক্ষীর অন্তরের অন্তঃপুর থেকে ত্রস্ত মর্মকথাকে অনায়াসে হট্টচারিণী করেছে, তার আকর্ষণ এড়ায় এমন সাধ্য তরুণের ছিল না। সে সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলে : 'নভেলিয়ানা আমার ভালো লাগে না ব'লে।'

আশ্চর্য মাইটর-সাহেবের ধৈর্য! অন্য বাপ হ'লে ছেলেকে চাব্‌কে লাল ক'রে দিত। তিনি শুধু টেবিলের উপরে মুহুর্মুহু করাঘাত ক'রে বললেন : 'তরুণ, তরুণ, তরুণ তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ!' সেই প্রচ্ছন্ন রুদ্ররূপের আভাস পেয়ে টেবিলের সাজসজ্জাগুলো থর্‌থরিয়ে উঠল।

কিন্তু তরুণ অবিচল স্বরে বললে : 'আজ্ঞে না, কিছু ভুলিনি, আপনাকে, অন্যদের, নিজেকে, কাউকে নয়। সেইজন্যেই মিনতি করছি ওই বহ্বারম্ভে সময় নষ্ট না-ক'রে মনের কথাটা খুলে বলুন।'

করাঘাত মুষ্ট্যাঘাতে পরিণত হ'লে, টেবিলের শিহরণ ভূমিকম্প হ'য়ে দাঁড়াল, একটা দুর্মূল্য চীনেমাটির ফুলদানি মাইটর-সাহেবের অমর্যাদায় হারিকিরি করলে। তিনি গর্জন ক'রে বললেন : 'এ-যুগের ধর্মই ঔদ্ধত্য, কিন্তু তাতে আমায় টলাতে পারছ না। কাজির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে আসামী মাত্রেই পাপের পরিমাণ ঢাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি ব'লে দিচ্ছি আমার চোখে অত সহজে ধুলো দেওয়া যাবে না।'

তরুণ নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে : 'এই ভ্রান্তিবিলাসের একজন প্রধান নট না-হ'লে হয়তো প্রহসনটা খুব উপাদেয় লাগত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আপনার চোখে ধুলো দেওয়া তো দূরের কথা, আমিই আপনার ধুলো-উড়নো লম্ফঝম্পের শেষ চেয়ে আছি।'

মাইটর-সাহেব চিৎকার ক'রে উঠলেন : 'কী, যত বড়ো মুখ [নয়] তত বড়ো কথা। কিন্তু শুনে রাখো আমার ক্ষমারও সীমা আছে, আমার স্নেহও অক্ষয় নয়। লক্ষ্মীছাড়াদের সংসর্গে থেকে মেছোহাটার আচার-ব্যবহার শিক্ষার ইতি এইখানেই। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও যে আমার মতো পিতা পেয়েছ!'

মাইটর-সাহেবের অফিসঘরে দুটো দরজা ছিল, উত্তরেরটা ছিল সদরে যাবার পথ, দক্ষিণেরটা অন্দরমুখী ; তরুণ গেল বাইরের দিকে। সেই আচরণের তাৎপর্য মাইটর-সাহেবের স্তম্ভিত মনে প্রবেশ করতে কিছু সময় নিলে ; তরুণ যখন চৌকাঠ প্রায় পেরিয়েছে তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন : 'যাচ্ছ কোন্ চুলোয়?'

তরুণ অম্লানবদনে জানালে : 'আপনার হুকুম-মতো কলেজে ফিরে!'

এই এককথায় পূর্বরাত্রের সমস্ত ভয়ভাবনা একযোগে ফিরে এসে মাইটর-সাহেবের

শ্বাসরোধ ক'রে দিলে, চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বজ্রমুষ্টিতে তরুণের হাত ধ'রে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন : 'কোথায়? কোথায়? সেই ফাঁসির আসামির খপ্পরে?'

বিরক্তভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তীব্র স্বরে তরুণ জিজ্ঞাসা করলে : 'মানে?'

এই দুটো অক্ষরের মধ্যে এত শান্তি গোপন থাকতে পারে, তা মাইটর-সাহেবের জানা ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, তাঁর অঙ্গে-অঙ্গে উল্লাসের সাড়া প'ড়ে গেল, নাড়ি-ছাড়া রোগীকে ব্র্যাণ্ডি দেওয়ার সমান। তরুণ তাহ'লে কিছুই জানে না, তাই তার এত সাহস, এত আস্ফালন। দিগ্‌বিজয়ীর মতো তিনি বললেন : 'উমেশের অধ্যাপনার যে-ফল আজ দেখলুম, এরপরে তার ত্রিসীমানায় যাওয়া তোমার বারণ।'

তরুণ হাসি চাপতে পারলে না। কিন্তু তার হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। এবার তার পিতার হাসবার পালা। সে জিজ্ঞাসা করলে : 'এই অদ্ভুত মর্জির কারণ?'

খুব পরিচ্ছিন্নভাবে মাইটর-সাহেব জবাব দিলেন : 'কারণ জিজ্ঞাসা করার অধিকার যখন হবে তখন শুনতে পাবে।'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তরুণ বললে : 'আমি কলের পুতুল নই যে আপনি দম দেবেন আর চলব, বোতাম টিপবেন আর থামব।'

মাইটর-সাহেব উত্তর করলেন : 'সেই বিশ্বাস আমার ছিল ; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে হিতবুদ্ধির তো কোনো ধারই ধার না, এমন-কি হিতৈষীর পরামর্শ নিতেও তুমি নারাজ। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরার আগে।'

তরুণ বললে : 'তা হ'তে পারে, কিন্তু ভয়ের ইশারায় আপনি আমায় নিরস্ত করতে পারবেন না। আমার অনিচ্ছে সত্ত্বেও অন্যায় ক'রে কলেজে পাঠিয়েছিলেন, তখন বাধা দিতে পারিনি বয়স অল্প ছিল ব'লে, কিন্তু এই নতুন অন্যায় অত্যাচার যদি আবার সহ্য করি, তাহ'লে জীবনে আর কখনো নিজের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারব না।'

মাইটর-সাহেব আবার অধীর হ'য়ে উঠলেন : 'আমি পাঠিয়েছিলুম! হাঁ, দোষ আমারই বটে, ওই-হতভাগার কলেজে যাওয়ার অদ্ভুত আবদারে যখন কান পেতেছিলুম তখন আমি দায়ী বৈ-কি! কিন্তু সে-দুর্বলতা আর ঘটবে না, কিছুতেই ঘটবে না ; এখন বুঝবে আমিও কঠোর হ'তে পারি। আরেকটা কথা মনে রেখো : পরের অন্ন ধ্বংস ক'রে অন্যায় অত্যাচারের নালিশ শুধু বেয়াদবি নয়, প্রলাপ।'

বলার সঙ্গে-সঙ্গে মাইটর-সাহেবের মনে হ'ল কথাটা সমীচীন নয় ; কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তরুণের চিত্তফলকে খোদাই হ'য়ে গেছে। কাজেই তাঁর মেজাজটা আরো রুক্ষ হ'য়ে উঠল—এই হঠকারিতা ডেকে আনার দায় তো তরুণেরই, সে জন্মাবধি মাইটর-সাহেবের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে চলেছে। যে যেমন কর্ম করবে, তাকে ভুগতে হবে তেমনি ফল। বেশ, এখন সে বুঝে দেখুক কত ধানে কত চাল। অতএব সে যখন বললে : 'আপনার শেষ যুক্তি অখণ্ডনীয়। সামর্থ্য থাকলে আপনার ঋণ পরিশোধ করতুম, কিন্তু তা অসম্ভব, তাই ভবিষ্যতে আর আপনার হাত তোলার মধ্যে থাকব না।' তখন মাইটর-সাহেব জবাব দিলেন : 'সমস্ত দেনা সুদ-সুদ্ধ আদায় করব তবে ছাড়ব। এরই মধ্যে তোমার হয়েছে কী?

তোমাকে দরজায়-দরজায় ভিক্ষে ক'রে ফিরতে হবে ; রাস্তায়-রাস্তায় শুতে হবে, তবে তোমার সাজা হবে উপযুক্ত।'

তরুণ নিষ্কম্প্র কণ্ঠে বললে : 'স্বচ্ছন্দে! এ-বাড়িতে থাকার চেয়ে রাস্তায় রাত কাটানো শতশ্রেয়। এখন তবে বিদায় হই।'

শিকার যে পালায়! মাইটর-সাহেব তাঁর চরমাস্ত্র সন্ধান করলেন : 'রাস্তার চেয়ে আরো আরামদায়ক স্থান আছে, তার নাম জেল।'

ভদ্রোচিত কৌতূহলের নিরুষ্ণ স্বরে তরুণ জানতে চাইলে : 'কীরকম?'

মাইটর-সাহেব সদর্পে বললেন : 'সে-খবর করো পুলিসের কাছে।'

'যে আজ্ঞা', ব'লে তরুণ ঘর থেকে বেরুতে গেল। তার পিতা মরীয়া হ'য়ে উঠলেন, আর্তনাদের মতো তাঁর মুখ ফুটে প্রকাশ পেল : 'শুনে যাও, তোমার গুরুটির ফাঁসি না-হোক্ দ্বীপান্তর হওয়া শুধু সময়সাপেক্ষ, সে-মহাত্মার গুণাবলি সরকারের কাছে অবিদিত নেই।'

এবারে তাঁর বাক্যবাণ লক্ষ্য ভেদ করলে। মুহূর্ত-মধ্যে তার নির্লিপ্তি অন্তর্হিত হ'ল ; দুঃসহ উৎকণ্ঠায় সে জিজ্ঞাসা করলে : 'উমেশদার কথা বলছেন?'

বিজয়োল্লাসের আতিশয্যে প্রতিহিংসার এই অপূর্ব সুযোগ মাইটর-সাহেবের লক্ষ হ'ল না ; তিনি এই দুর্লভ লগ্নটিকে কাজে লাগাতে পারলেন না, ব'লে ফেললেন : 'সেই পাষণ্ডের কথাই বলছি। এবারে আর তার নিষ্কৃতি নেই ; দোষ যেমন-তেমন নয়, একেবারে রাজদ্রোহ। লাট-দরবারের এক বন্ধুর মুখে পাকা খবর পেয়েছি, শাস্তিটা দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেওয়া হবে।'

চোখের নিমেষে তরুণের দুঃস্থ উদ্বেগ উধাও হ'য়ে গেল। সে স্মিত হেসে বললে : 'তাই বলুন! আমি দেশসেবী নই, কাজেই রাজদ্রোহের নামে শিউরে উঠি না। তবে আসি।'

ঘটনাটার তাৎপর্য ব্যামোহ ভেদ ক'রে মাইটর-সাহেবের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করার আগেই তরুণ গেল বাড়ির বাইরে। বাপের সামনে আপেক্ষিক পরিচ্ছন্নতার ভান দেখালেও, তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল একটা অভূতপূর্ব বিক্ষোভ ; এমন রাগ আর আগে কখনো সে অনুভব করেনি ; এমন আঘাতের অস্তিত্বটুকুও সে পূর্বে জানত না। তার বিশ্বাস ছিল তার সংবেদনগুলো মোটা ; এর চেয়েও বড়ো অন্যায়ে তার মনের অনাত্ম ভাবটা কখনো ভাঙেনি। সে আশ্চর্য হ'ল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবেগের অস্বাভাবিক উচ্চণ্ডতার জন্যে মাথা হেঁট করলে। চলতে-চলতে সে নিজের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে ; মূর্খ মনকে তিরস্কার করতে-করতে, সে চেঁচিয়ে বললে : 'এর চেয়ে ছেলেমানুষী আব কী থাকতে পারে! বাবার কাছে বিচারের আশা করতে যাওয়া তো চিরদিনই পাগলামি। তাই ব'লে জগৎটা বাঁকা ঠেকবে! এই প্রতিহিংসার ইচ্ছেটা অত্যন্ত লজ্জাকর।' কিন্তু যতই চেষ্টা করুক তরুণ মন থেকে আশু বিপদের আশঙ্কাটা কিছু[তে]ই ঝেড়ে ফেলতে পারলে না। তাঁর ভয় হ'ল, মনে পড়ল যে অমঙ্গল আসে পূর্বে ছায়াপাত ক'রে ; এবং সেই ভয়ের জন্যে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে ছাড়লে না। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : 'ছিঃ-ছিঃ ; এর পরে উমেশদাকে মুখ দেখাব কী ক'রে, এমনি ক'রেই আত্মসংযম হারাতে হয়? মুহূর্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানের আকস্মিক দীপ্তিতে তার মনের প্রচ্ছন্নতম কোণগুলো অবধি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, তার বুঝতে বাকি রইল না যে বাক্যটা

অত সাঙ্ঘাতিক লেগেছে কারণ এই আঘাতের লক্ষ্য সে নয়, উমেশদা। না, না, উমেশদাকে ছাড়লে কিছুতে চলবে না : উমেশদা যে তার প্রাক্তন রাত্রির তিমিরান্তক রবি, উমেশদার অস্তগমন যে তার শেষের রাত্রির ভূমিকা।

কিন্তু কলেজে ফিরে উমেশদার সাক্ষাৎ মিলল না! তিনি মাঝে-মাঝে কাউকে কিছু না-ব'লে, কোনো ঠিকানা না-রেখে এক-একটা অজ্ঞাতবাসে নিরুদ্দেশ হতেন ; এবারে চারদিন তাঁর কোনো খবর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে তরুণের উচ্চণ্ড আবেগ ক'মে এল। তার মন পেলে ভাবজগৎ ছেড়ে বস্তুজগতে নামবার সময়। সে বুঝলে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পক্ষে তার শক্তি নিতান্ত অল্প ; একটি সহকারীর দরকার। এমন সহকারী মেলা দুষ্কর হ'ল না। তার মাতামহ জামা[ই]য়ের দর্প হরণ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন মাত্র ; দৌহিত্রের সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় তাঁর কোনোই আপত্তি অথবা দ্বিধা দেখা গেল না। কাজেই উমেশদা যখন ফিরলেন, তখন তার সঙ্কল্প দুর্ভেদ্য হ'য়ে উঠেছে, তার দুর্গে অস্ত্রের অভাব নেই, রসদের অভাব নেই, সে পিতার অবরোধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁকে ব্যাপারটার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোনো তাড়া ছিল না। মনে হ'ল তিনি শ্রান্ত, তাঁর অনুপস্থিতিতে জরুরি কাজও বেশ জ'মে উঠেছিল, তাই তরুণ তাঁকে শুধু এইটুকু জানালে যে মাইটর-সাহেবের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে তার মতান্তর ঘটেছে। সংবাদটা খুব নির্লিপ্ত স্বরে প্রদত্ত হ'লেও, উমেশদা প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে শিষ্যের মুখান্বেষণ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর নির্বাক প্রশ্নটি তরুণের শ্রুতিগোচর হয়নি ; এবং তিনিও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি, কারণ তাঁর নীতিশাস্ত্রে অহৈতুক কৌতূহলের চেয়ে গুরুতর অপরাধ ছিল না।

তরুণের নিরুদ্বিগ্ন গৃহত্যাগ মাইটর-সাহেবকে প্রথমটা করেছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; এরপরে কিছুক্ষণের জন্যে একটা রোমহর্ষণ প্রতিহিংসার খোঁজে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন যে তরুণের পিছু নিয়ে, পুলিসে খবর দিয়ে, সংবাদপত্রে উমেশদাকে অভিযুক্ত ক'রে, তাঁর অভীষ্ট সুসিদ্ধ হবে না। উপেক্ষার ভান করাই প্রকৃষ্ট পন্থা ; বিনা-টাকায় তরুণের ক-দিন চলবে ; একবার সে ভিক্ষুকের মতো তাঁর দ্বারে আসুক. তখন জগৎকে দেখানো যাবে পিতৃদ্রোহের প্রতিকার কীরকমের উপভোগ্য। কিন্তু জগৎ তাঁকে এই উদাহরণের সুযোগ দিলে না ; প্রথামতো অধর্মই হ'ল জয়ী ; মাইটর-সাহেব খবর পেলেন যে তাঁর চিরশত্রু শ্বশুর আবার বাধ সাধতে প্রস্তুত। তখন উমেশদার শরণ নেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না, কারণ ইতিমধ্যে সেই রাজকীয় বন্ধুটির সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হয়েছিল।

উমেশদার মুখে তরুণ যখন তার পিতার আগমন সংবাদটা শুনলে তখন সে কোনো দুশ্চিন্তাই অনুভব করেনি। তার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল উমেশদা তারই দলে। কাজেই তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা শোনার পরে উমেশদা যখন তাকে পিতৃগৃহে ফিরতে অনুরোধ করলেন, তখন তার মাথায় বিনা-মেঘে বজ্রপতন হ'ল। সর্বস্বান্ত মানুষের মতো চাপা গলায় তরুণ জিজ্ঞাসা করলে, 'এরপরেও আপনি তাই বলেন?'

উমেশদা বললেন : 'কীসের পরে, তরুণ?'

'আপনার সম্বন্ধে বাবা যে দারুণ অন্যায় করেছেন, তার পরেও?'

উমেশদা বললেন : 'সেইজন্যেই তোমায় ফিরে যেতে হবে। জীবন বিরোধের কারণে ভরা ; যুদ্ধবিগ্রহের উপযুক্ত উপলক্ষ না-চাইলেও ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে জোটে, অভাব শুধু উদ্যমের। তরুণ, উপদেশ দেওয়া আমার স্বভাব নয়, কিন্তু আমার একটা উপদেশ যদি সম্ভব হয় তো পালন ক'রো ; একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষকে মারতে চেও না, এমন-কি নিজের জন্যেও না।'

তরুণ তবু তার অসম্মতি জয় করতে পারেনি ; উমেশদার উক্তিতে তবু সে যুক্তির বাঁধন খুঁজে পায়নি, এবং সেইজন্যেই সে অত দিশাহারা হ'য়ে গিয়েছিল। যে-উমেশদা অকাট্য কারণ না-দেখিয়ে কোনোদিন তুচ্ছতম অনুরোধটি-সুদ্ধ করতেন না, আজকে তিনি এত বড়ো ব্যাপারে অসঙ্গত বিনতির সাহায্য নিচ্ছেন, এটাই তরুণকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছিল। তাই সে অপেক্ষাকৃত কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে : 'কিন্তু কেন? আপনি কেন এই অন্যায় অনুরোধ করছেন?'

উমেশদা হাসলেন, কিন্তু সে-হাসি একটা অসীম বিপদের ছায়ায় ম্লান। তিনি বললেন : 'ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করা আমার সাধ্যে কুলায় না, তরুণ। আমি জানি উপজ্ঞার কথা ; আমার মন বলছে তোমার-আমার ঘনিষ্ঠতা নিরাপদ নয়।'

তরুণের রাগ হ'ল। অন্যায়, উমেশদার অত্যন্ত অন্যায়। সে বললে : 'আমার বিপদ আমিও বোধহয় বুঝতে পারি, তবে আপনার কথা আপনিই ভালো বলতে পারবেন।'

উমেশদার উত্তরে বিরক্তির কোনো সাড়া ছিল না, ছিল শুধু একটা বেদনার গুঞ্জন। তিনি বললেন : 'হাঁ, তরুণ, আমার দিক থেকে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লেই তোমার বাবাকে খুশি করা দরকার মনে হচ্ছে।'

তিনি আর কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সজোরে আত্মসংবরণ করলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে, অভিমানে তরুণের চোখে জল এল। সে উমেশদার মুখে চাইতে পারলেন না। উমেশদা উঠে দাঁড়িয়ে 'তরুণ' ব'লে কী বলতে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু তরুণের মনে হ'ল তাঁর উপস্থিতি সে আর সইতে পারছে না, তিনি কাছে এলে তার অশ্রুসংযম অসাধ্য হবে। তাই তাড়াতাড়ি রুদ্ধ কণ্ঠে বললে : 'আপনার আদেশ শিরোধার্য, এখুনি বিদায় হবার ব্যবস্থা করছি।'

সে আর সেখানে দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে তার আভ্যন্তরিক কলরোল ভেদ ক'রে উমেশদার শেষ কথা ক-টা তার কানে পৌঁছল কি-না বলতে পারি না : 'আমাদের বন্ধুত্বের সমাপ্তি এখানেই নয়, তরুণ, এখানেই নয়; একদিন-না-একদিন আবার দেখা হবে। আজকের মতো বিদায়।'

৫

কলেজ থেকে বেরিয়ে তরুণ স্বপ্নচালিতের মতো গিয়ে আশ্রয় নিলে মাতামহের বাড়িতে। এই আচরণ সম্পূর্ণ নিরুদ্দিষ্ট ; সে পিতৃগৃহে না-গিয়ে মাতুলালয়ে এসেছিল, গাড়োয়ানের প্রশ্নে মাতামহের ঠিকানাটাই আগে মনে পড়েছিল ব'লে; বস্তুত সে তখন বেঁচে আছে শুধু

নামে, তার দেহে, তার মনে, তার বুদ্ধিতে কোনোখানেই কোনো চেতনা নেই। তখন তার স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি নেই ; সারা জগৎটাই তার চক্ষে তখন সমান পাংশুল, মানুষমাত্রেই দুরূহ, প্রত্যেক দিনই চলচ্ছক্তিহীন। সে তার ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সঞ্চয় সঁপে দিয়েছিল উমেশদার হাতে, এবং ডাকাতের আক্রমণে উমেশদা সে-সর্বস্ব বাঁচাবার চেষ্টা-সুদ্ধ করেননি ; শাশ্বতের প্রতীক ভেবে সে আত্মনিবেদন করেছিল শিলাময় বিগ্রহের পদে ; কিন্তু সে ভঙ্গুর দেবতার মৃন্ময় চরণ তার বিশ্বাসের ভার সইতে পারেনি, অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের দিনে ভক্তকে পিষে নিজেও হয়েছিল ধূলিসাৎ। এই মহাপ্রলয়ের মাঝখানে অনুগ্রাহীর যোগ্যতা বিচার করার সার্থকতা কী?

এইরকম জীবন্মৃত অবস্থায় তিন-চারদিন কাটানোর পরে তরুণ পিতৃগৃহে ফেরার সার্থকতা বুঝলে। এই দারুশ সঙ্কল্পের সঙ্গে তার মাতামহের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁর দিক থেকে আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটেনি। তিনি ছিলেন সাবেকিধরনের মানুষ, বিপত্নীক, অপুত্রক অথচ মমতাপ্রাণ। তাঁদের সাদাসিধে যুগ পশ্চিমের ছলাকলাকে দেখেছিল ভয়ের, সশ্রদ্ধ ভয়ের চক্ষে, এবং জামাতার উগ্র সাহেবিয়ানায় সে-ভয়টা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, শ্রদ্ধাটা এসেছিল সেই অনুপাতে ক'মে। কাজেই তিনি তরুণের নব্য হাবভাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করতেন না, হয়তো ভিতরে-ভিতরে তাকে একটু ভয়ও করতেন। কিন্তু মোটের উপরে তাঁর মন ছিল ধর্মভীরু, এবং পিতার অপরাধের জন্যে পুত্রকে দায়ী করা তাঁর ধর্মে বাধত। উপরন্তু তাঁরা আদবকায়দা শিখেছিলেন মুসলমানের কাছে। সে-সৌজন্যের মূল মন্ত্র হচ্ছে মনের কথা মনে রাখা। তাছাড়া তিনি সত্যই তরুণকে ভালোবাসতেন, তরুণই তাঁর উত্তরাধিকারী, তরুণের সঙ্গে তিনি দশ বছর এক বাড়িতে বাস করেছিলেন। অতএব তিনি বিনা-বাক্যে তরুণকে যেতে দিলেন না।

কিন্তু তরুণের পণ অটল রইল ; মাতামহের তর্ক তার বুদ্ধিতে পৌঁছল না, তাঁর লোভ দেখানোয় তার মন গলল না, তাঁর ভয় সঞ্চারের চেষ্টা তাকে নাগাল পেলে না। আবিষ্ট চিত্তে সে বললে : 'আপনি বুঝছেন না, এটা যে আমার প্রায়শ্চিত্ত। বাবা তো কিছুই অন্যায় করেননি, ভুল করেছি আমি। এরপরেও কলহ করা কাপুরুষতার চূড়ান্ত হবে। তাছাড়া মারামারিই-বা কীসের জন্যে, কার জন্যে!'

তার মাতামহ আশ্চর্য হ'য়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : 'এতেও যদি তোর বাপের অন্যায় না-হয়, তবে অন্যায় শব্দের মানে উল্টে দিতে হবে।'

তরুণের কাছে কোনো সঙ্গত উত্তর পাওয়া গেল না দেখে তিনি আবার বললেন : 'এর মাঝে মারকাটের কথাই-বা কেন উঠছে তা-ও বুঝলুম না। আমার নাতি আমার কাছে থাকবে, তার মধ্যে কলহবিবাদ হ'ল কোন্‌খানটায়?'

ম্লান হাসি হেসে তরুণ বললে : 'দাদামশাই আপনার স্নেহের ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না ব'লেই দেনা আর বাড়াতে চাই না। আরো একটা কথা আছে, প্রথম যখন আপনার সাহায্য চেয়েছিলুম তখন তাতে আমার দাবি ছিল, তখন যুদ্ধ করছিলুম একটা আদর্শের জন্যে।

এখন প্রমাণ হয়েছে আমার আদর্শ ফাঁকি। এরপরেও আপনার অন্ন ধ্বংসালে, আপনার দানেরও আর মর্যাদা থাকবে না, আমার হীনতাও পৌঁছবে অধস্তন কোঠায়।'

বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেননি ; তরুণের কথার সমস্ত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না-করলেও, এতটুকু বুঝতে তাঁর সময় লাগেনি যে এই কথাই তার শেষ কথা। কাজেই এই অদ্ভুত পাগলামির দায়িত্ব কালের স্কন্ধে চাপিয়ে তিনি তরুণকে বিদায় দিলেন।

পুত্রের প্রত্যাবর্তনে মাইটর-সাহেবের ন্যায়বুদ্ধি চরিতার্থ হ'ল ; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা অব্যক্ত ব্যর্থতা তাঁর প্রভূত পরাক্রমের মহাত্ম্যটুকু হরণ করলে। সে-বিজয় যেন যুধিষ্ঠিরের কুরুক্ষেত্রে জয়ী হওয়ার মতো, রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত, বিক্রম সন্দেহের অতীত, কিন্তু ধর্মরাজের শাসনে কাঁপবে এমন লোক কোথা? শ্মশানে তো শেয়ালেই আধিপত্য করতে পারে, সেখানে সিংহের প্রয়োজন কী? সিদ্ধি, মাইটর-সাহেব এই প্রথম বুঝলেন, সিদ্ধি নিরর্থ হ'য়ে যায়, যদি [লোকে] তার দিকে অসূয়ালুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে না-থাকে। মাইটর-সাহেব সবজান্তা হ'লেও সর্বজ্ঞ ছিলেন না, তাই তিনি বোধহয় লক্ষ করেননি যে, জয় সর্বনাশেরই নামান্তর মাত্র। সম্ভবত তাইজন্যেই তিনি মড়ার উপরে খাঁড়া চালিয়ে তুষ্ট থাকতে পারলেন না, পদানত শবের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর নিপুণতম উদ্ভাবনাগুলির দ্বারাও কোনো ফলোদয় হ'ল না ; নিশ্চেতন তরুণের কাছে লাঞ্ছনার সূক্ষ্মতম কাঁটা-সুদ্ধ হার মানলে। শেষে মাইটর-সাহেব হাত গুটোলেন, তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে পাথরের উপর নাম লিখে অমরত্বের দাবি করা ধৃষ্টতা হ'তে পারে, কিন্তু জলকে স্বাক্ষরিত করতে চায় শুধু ক্ষেপা হাওয়া। উপরন্তু তাঁর স্বভাব প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'লেও, জিঘাংসু ছিল না, চোখের বিনিময়ে চোখ পেলেই তাঁর ক্ষুধা মিটত ; লুণ্ঠিত শত্রুর বিক্ষত শরীরে অন্যের লোভ তিনি অনায়াসে সহ্য করতেন।

কিন্তু নিঃস্ব অসীম সাহসের জন্যে বিখ্যাত। তরুণেরও তখন সেই অবস্থা ; কোনো বাটপাড়ের গতিরোধ করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য তখন তার নেই। নেই, আর আগ্‌লে রাখার কিছুই যে নেই ; তবে কেন চেষ্টা, মিছে পরিশ্রম কেন। না, না, সে কাউকেই বাধা দেবে না, পথ অবারিত প'ড়ে আছে, দুর্ধর্ষ মিনারের চূর্ণশিখরে পাদপীঠ পেয়ে যারা নিজেদের মহত্তর মনে করে আসুক তারা, স্বচ্ছন্দে আসুক। শুধু তারা জেনে আসুক যে দক্ষিণাস্বরূপ তাদের ভাগে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না, কেবলই শূন্যতা, নির্বাক, নিশ্চল, অবিনশ্বর শূন্যতা। তার মনে হ'ল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সে একা, একেবারে একা, অমিতির বুকে শুধু সে আছে, আর আছে নিঃসঙ্গ অন্ধকার। অদূরে শোনা যাচ্ছে স্বয়ম্ভু কালের গর্জন, ব্যবধানের পর ব্যবধান জুটে তার সঙ্গী তারাদের রেখে এসেছে নিরুদ্দেশের পরপারে, প্রলয়-পয়োধির উপকূলে সে রয়েছে নির্বাপিত সূর্যের মতো, একলা, উন্মুখ বন্যার পথ চেয়ে।

এমনি ক'রে দিন কেটে চলল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। তরুণের বয়স অর্বাকবিংশের অনির্দিষ্ট এলেকা ছেড়ে বিংশোত্তরের খাসমহলে ভিটে পত্তন করলে।

ক্রমশ তার কালসংজ্ঞা হারিয়ে গেল, মুহূর্ত আর শতাব্দীতে ভেদ রইল না, ভেদ রইল না অতীতে আর বর্তমানে। মাঝে-মাঝে তার মনে হ'ত তার স্মৃতি, সে যেন কোন্ জাতীয় ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ ; সে-তরুণ, সে-উমেশদা, তারা যেন এক প্রাক্-পৌরাণিক যুগের অসংস্কৃত কল্পনা, যাদের আসুরিক বৈকল্য ততটা শোকাবহ নয়, যতটা পরিহসনীয়। আবার সময়ে-সময়ে প্রত্যক্ষ বস্তুগুলোকে স্বপ্নের মতো লাগত, সে ভাবত তারা বড়োজোর একটা অনাগত বিপদের অগ্রদূত, প্রহরীকে নিদ্রিত দেখে পরখ করতে এসেছে দুর্গটা ভেদ্য কি-না। এইভাবে সময়ের অলক্ষ্য গতি তাকে বি.এ., এম.এ. ও আইন পরীক্ষার মুসাফির-খানাগুলো ছাড়িয়ে একটা এমন দিশাহারা মরুর মাঝে এনে দিলে যেখানে দিক্-নির্ণয়ের চেষ্টা-সুদ্ধ ধৃষ্টতা, যেখানে অঘটন-সঙ্ঘটনের আশাপথ চেয়ে থাকাই শেষরক্ষার একমাত্র উপায়।

সুখের বিষয়, অঘটন-সঙ্ঘটন জগতে নিতান্ত বিরল নয় ; তবে আমাদের অলৌকিক-কাঙালদৃষ্টি আটপৌরে ছদ্মবেশের ভিতরে দৈনন্দিন দৈবকে হয়তো দেখেও দেখতে পায় না, এবং লক্ষ হ'লেও অবজ্ঞা করে। এ-কথা সত্য হোক্ বা না-হোক্, তরুণের সমাধিও একদিন ভাঙল এবং ভাঙল একখানা তুচ্ছ চিঠির সাহায্যে। পত্রখানা একটা নিমন্ত্রণলিপি : সুধীর রায় নামক কোনো ভদ্রলোক, তাকে অনেক দিন না-দেখার জন্যে আক্ষেপ জানিয়ে, সেই রাত্রেই আহারে আহ্বান করেছিলেন। মুখ্য পত্রখানা তরুণের শূন্য মনে কোনোরকমের ছাপ আঁকতে পারলে না ; সে সেখানাকে ফেলে দিতে যাচ্ছিল ; হঠাৎ তার নজর পড়ল অনুলেখনটার উপরে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার চমক ভাঙল।

চিঠিটার উল্টো পিঠে মেয়েলি হাতে লেখা ছিল : 'ভাই তরুণ, তোমায় বিরক্ত করতে আমার আদৌ ইচ্ছা নেই, কিন্তু তোমার কর্মঠতার সম্বন্ধে বাবার অনেক কুসংস্কার আছে ; তাঁর বিশ্বাস তুমি সচেষ্ট হ'লেই আমাদের একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে। তাঁর মতের সমর্থন করতে না-পারলেও, তুমি এলে খুসি হব, এটা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে আমার বিয়ের খবরটা পেয়েছ কি ? — মালতী।'

চিঠিখানার প্রথম ধাক্কায় তরুণের চোখ থেকে একটা পর্দা খুলে গেল, তার ভয়ার্তবুদ্ধি দেখলে যে চলেছে, সময় চলেছে, বিরাট নদীর মতো নিঃশব্দ স্রোতে দু-তটে ভাঙন বিতরণ ক'রে সময় চলেছে। কী নিষ্ফল তার অপচয়। কত অসীম তার ক্ষুধা! এবং সেই মুহূর্তেই তার বিনাশসংজ্ঞার প্রতিবাদকল্পে যেন অতীত সর্বশান্তির কেন্দ্র থেকে তার মনের উপকূলে ভেসে এল একটা হেমন্ত-সন্ধ্যার স্মৃতি, নৌকাডুবি, কাঠখড়ের মতো উতল বিষাদে

সেবারে তাদের ত্রৈমাসিক চংক্রমণে বেরিয়েছিল শুধু সে আর উমেশদা। তখন পুজোর ছুটি, সহপাঠীরা স্বজনের ডাক এড়াতে পারেনি ব'লেই সে উমেশদাকে একা পেয়েছিল। তারা সেবারে স্থির করেছিল পায়ে হেঁটে ছোটনাগপুরটা ঘুরবে। কিন্তু একদিন একটা ছোটো গ্রামে এসে উমেশদা হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। সৌভাগ্যক্রমে খবর ক'রে জানা গেল যে অনতিদূরে একটি বাঙালি অধ্যাপক সপরিবারে বাৎসরিক স্বাস্থ্যসঞ্চয়ে এসেছেন। সাক্ষাৎ পরিচয়ে প্রকাশ পেল লোকটি উমেশদার এক বাল্যবন্ধু, রুগ্ন স্ত্রী আর একমাত্র ষোড়শী মেয়ে

মালতীকে নিয়ে পুজোর অবকাশটা নিরালায় কাটাচ্ছেন। হয়তো সহপাঠীকে এতদিন পরে পেয়ে সুধীর রায় সত্যই আনন্দিত হয়েছিলেন, হয়তো নিছক দাম্পত্য জীবনটা আর তেমন সুস্বাদ লাগছিল না, কারণ যাই হোক্, উমেশদা সুস্থ হবার পরেও গুরু-শিষ্যের পর্যটনে তিনি ঘোরতর বাধা দিলেন। ফলে তরুণ আর তার গুরুকে বাকি ছুটিটা কাটাতে হ'ল সেখানেই।

এতে তরুণের বিশেষ আপত্তি ছিল না। উমেশদার অসুখের ক-দিনেই মালতীকে তার খুব ভালো লেগেছিল। মালতী মেয়েটি একটু অদ্ভুত, বাঙালি গৃহস্থের ঘরে ঠিক তার জোড়া মেলা শক্ত। তার বাপ-মা পুত্র কামনা ক'রে এই কন্যাকে পেয়েছিলেন, কাজেই সে লালিত হয়েছিল ছেলের মতো। গৃহকর্মের চেয়ে দৌড়ঝাঁপই তাকে বেশি মানাত, আজ্ঞা বহন করার থেকে আজ্ঞা দেওয়াটাই তার পক্ষে সহজ ছিল, সুকুমার লজ্জা যেন তার ধাতে সইত না। আলাপ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তরুণের অসময়োচিত গাম্ভীর্যকে উপলক্ষ ক'রে বিদ্রূপের প্রখরাস্ত্রে আগন্তুকের সঙ্কোচ সে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে, তার শরণ নেওয়া ছাড়া তরুণের আর গতি রইল না। তরুণ মুগ্ধ হ'য়ে গেল, ও-বয়সের মেয়ের সঙ্গে তার ইতিপূর্বে কখনো পরিচয় ঘটেনি, এবং ঘটলেও তাদের সঙ্গে নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে বাক্যালাপ এই তার প্রথম। তার চমৎকৃত দৃষ্টি যেন মালতীর সঙ্গে মণিকার একটা সাদৃশ্য দেখতে পেলে, মন চাইলে ও-বয়সে মণিকাও যেন অমনিতর হ'য়ে ওঠে। সেই সূচনা থেকে এদের মৈত্রী অবাধে বেড়ে চলল ; ক্রমশ তরুণ ভুলে গেল যে মালতী মেয়ে, শুধু তার মনে রইল সে তার অপরিহার্য সঙ্গী, যার বাচাল বন্ধুত্ব কৌতুকময় নূতনত্বে ভরা এবং মাঝে-মাঝে বিষম বিড়ম্বনার হেতু।

কিন্তু এই নিরুদ্বেগ অন্তরঙ্গতা একদিন হঠাৎ চুরমার হ'য়ে গেল, সে উপলব্ধি করলে মালতী নারী, পুরুষের চিরবৈরি নারী ; কী বুভুক্ষু তার নারীত্ব, কী তীব্র, কী ক্ষুব্ধ ! তার মনে হ'ল মালতীর রমণীয়তা অরণ্যপুষ্পের রমণীয়তার মতন স্বভাবদত্ত, পরাগবাহী প্রজাপতিকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে ; তার স্পৃহা, হয়তো ধারণাতীত স্পৃহা, দিগ্বিজয়ী মৃত্যুকে পরম্পরার অনন্ত শৃঙ্খলে পঙ্গু ক'রে রাখা।

সেদিন মালতীতে আর তাতে প্রথামতো সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিল। যাত্রাকালে তাদের হাসি-তামাসা চলেছিল নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু অল্প কয়েক পা চলার পরেই তাদের স্বচ্ছন্দালাপে একটা আকস্মিক, অকারণ উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল ; প্রথমটা তারা দু-জনেই এটাকে অট্টহাসিতে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কথা কেমন জমল না, হাসির আওয়াজে কী একটা কৃত্রিমতার সাড়া পাওয়া গেল, একটা বৈদেহ বিরক্তির অবচ্ছায়ে তাদের দৈনন্দিন ঠাট্টা লাগল দুঃসহ। তাদের পায়ের গতি ক্রমশ ক'মে এল, থেমে গেল, তবু লক্ষ হ'ল না। লক্ষ হ'ল না তাদের চারপাশে হেমন্তের মাঠ কাঞ্চনময় হ'য়ে উঠেছে ; লক্ষ হ'ল না পাখির দল কুলায়ে ফিরে আসছে ; লক্ষ হ'ল না গৃহস্থের পাকাগ্নি সভ্যতার বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তের শাশ্বত শূন্যতায়। তারা শুধু উপলব্ধি করলে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাকুল নিঃসঙ্গতাকে, তাদের শুধু বোধ হ'ল মাথার উপরের অনাদি আকাশ তাদের সমর্থন করছে, পায়ের তলার মাটি আছে তাদের আশায় ফুলশেজ পেতে। মালতীর নিবিড় মুষ্টি হঠাৎ তার বাহুর রক্ত চলাচল বন্ধ ক'রে দিলে ; মালতীর অবিশ্রান্ত চুম্বনের সংরাগে তরুণ নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পেলে না ;

তারপরে আত্মবলিদানের পরম চিহ্নের মতো ত্রস্ত হাতে কঞ্চুলিকার বাঁধন ছিঁড়ে মালতী তার বক্ষের কমলকলিদুটি নিবেদন করলে নরদেবতার জাগ্রত ক'রে।

কিন্তু তরুণের উন্মাদনা বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত টিঁকেনি। ফেরার পথে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলে না, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও মালতীর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারলে না, চলল যন্ত্রচালিতের মতো, মনে-মনে আত্মধিক্কারের জপমন্ত্র আবৃত্তি করতে-করতে। তার লজ্জার সংজ্ঞাটা যেন দৈহিক হ'য়ে উঠল, পরাভবের অনুভূতি বিদীর্ণ ধরণীর গর্ভে অজ্ঞাতবাস চাইলে, যে-অনুতাপের নির্বাক গর্জন সেই অতুলনীয় রাত্রির সুরসঙ্গতিকে ছারখার ক'রে দিলে, তার অস্তিত্ব সে কোনোদিন কল্পনাতেও আনতে পারেনি। মনে হ'ল সে অকৃতজ্ঞ, মনে হ'ল সে বিশ্বাসঘাতক, মনে হ'ল সে অযোগ্য, বাঁচার অযোগ্য, উমেশদার অযোগ্য, এমন-কি মালতীর অযোগ্য। অমনি মালতীর সম্বন্ধে তার অব্যক্ত অভিযোগটা ভাষা খুঁজে পেলে, এবং কণ্ঠনলীতে অগোচর অশ্রুর আস্বাদ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার শূন্য হৃদয়ে জেগে উঠল তাদের বন্ধুত্বের শোকাবহ অপঘাতের স্মৃতি।

কিন্তু বাসায় ফিরে মালতীর প্রতি তার রাগটা রইল না, অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেল। সহবাসীদের কৌতূহল নিবারণে তাকে সম্পূর্ণ অপারগ জেনে মালতীই তাদের বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করলে এবং উমেশদা তর্কের দ্বারায় প্রমাণ ক'রে দিলেন যে দৃষ্টত সে অক্লান্ত হ'লেও বস্তুত সে জীবন্মৃত। জলমগ্নের মতো এই তুচ্ছ অছিলার আশ্রয় নিয়ে তরুণ গেল শয়নকক্ষে, নিঃসাড় মনে বিচার করতে-করতে, মালতীর চোখের প্রখর দীপ্তির কতটা পরিহাস্যপ্রসূত। কিন্তু তরুণ ঘুমোতে পারলে না এবং নিচের তলায় হাসির হর্‌রা যখন থামল তখন সে শয্যা ছেড়ে উঠে বসল উমেশদার তীব্র তিরস্কারের প্রতীক্ষায়। উমেশদা ঘরে ঢুকতে তরুণের সচেতন দৃষ্টি তাঁর মুখান্বেষণ করলে, কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে আপাদমস্তকে কোথাও তিলার্ধ বিরক্তি সে খুঁজে পেলে না, সমস্তটাই যথাযথ, সমস্তটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তফাতের মধ্যে, উমেশদা তার খাটিয়ার ধারে বসলেন, তবু তাঁর গলার আওয়াজে নিত্যনৈমিত্তিকতার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তিনি বললেন : 'তরুণ, জীবনে যত দুঃখ পেয়েছি, সে-সবই আকস্মিককে সহজে নিতে পারিনি ব'লে। আমার সেই নিষ্কারণ ন্‌ত্রণার অবসান করে একটি বিদেশিনী। উমেশদা নিমেষে কতক থেমে আবার যখন কথা কইতে শুরু করলেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা কী অনির্বচনীয় পরিবর্তনের ঝঙ্কার ছিল : তার মতো বন্ধু আর জীবনে পাইনি, তরুণ। সেই আমায় শেখায় যে আমাদের দেহ লজ্জার বস্তু নয়, গৌরবের বস্তু ; মানুষের মধ্যে যদি কোথাও দৈবত্বের লেশ থাকে, তাহ'লে একখানি নিখুঁত দেহের মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে। তার মুখেই প্রথম শুনি আমাদের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ, এই নিরর্থ জিনিসের ভাষ্য করতে গিয়েই আমরা অনর্থকে ডেকে আনি। আশা করি, আমার দুর্লভ অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগবে।'

তারপরে ঘুমোনো আর শক্ত হয়নি ; এমন-কি পরের দিন মালতীকে সহজ সহচর ভাবাও সুসাধ্য লেগেছিল। তবুও একটা দুরূহ বৈরিতার সংবেদনে তাদের প্রাথমিক অন্তরঙ্গতা যদি আর না-ফিরে থাকে, তবে তার দায়িত্ব মালতীকেই বহন করতে হবে।

উমেশদা! উমেশদা! তরুণের মন উচ্ছ্বসিত উল্লাসে উপলব্ধি করলে যে, এতদিন পরে উমেশদার নাম তার জিহ্বাগ্রে আবার অনায়াসেই আসছে ; উমেশদার স্মৃতি এখন আর প্রলয়ঙ্কর নেই, শুধু একটা করুণ বেদনায় ভরা। সে বুঝলে লাভটা সামান্য নয় ; এরপরে উমেশদার বিশ্বাসঘাতকতার পরমার্থ নিরূপণ করা শুধু সময়সাপেক্ষ ; বুদ্ধির দ্বারা এখনো প্রত্যক্ষ না-করলেও, এরই মধ্যে তার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহ হয়েছে যে উমেশদার অপ্রত্যাশিত আচরণের পিছনের কথাটা রহস্যময় বটে কিন্তু গোপনীয় নয়। অমনি পাঁচ বছরের ব্যবধান লঙ্ঘন ক'রে তার মন ফিরে এল বর্তমানে ; একটা অনির্বচনীয় কৃতজ্ঞতায় তার চিত্ত উঠল উদ্ভাসিত হ'য়ে। মালতী, মালতী, যার জন্যে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে, তরুণের প্রেতমুক্তির ভাগীরথী মালতী, সে যে আজ বিপন্ন, সে যে তার সহায়প্রার্থী। তরুণ পণ করলে শুধু মালতীর ঋণ নয়, উমেশদার ঋণও সে মালতীর মারফতে শোধ করবে। ফিরে আসবে, তাদের প্রাকৃত মৈত্রী আবার ফিরে আসবে ; তার মনের নিঃশব্দ শূন্যতা ফের মালতীর উদ্দাম হাসিতে ভ'রে উঠবে ; তার নির্ভার নিরুদ্দিষ্ট জীবনের আধারবিন্দু হবে মালতী।

হঠাৎ তরুণের মনের রঙ বদ্‌লে গেল ; সন্দেহ হ'ল সে আবার ভুল করছে ; এ-মালতী, তার পরিচিত মালতী নয়, এ আরেকটি মরীচিকা যাকে অনুসরণ করলে যাত্রা শেষ হবে সেই পুরাতন শূন্যতায়, সেই তৃষ্ণাবিধুর গন্তব্যলুপ্ত শূন্যতায়। কিন্তু সে এই সন্দেহগুলোকে জমতে দিলে না ; তার কল্পনা আবার উধাও হ'ল মালতীর বিবাহরূপ দুরারোহ হিমালয়কে অতিক্রম ক'রে। না, না, সে মনকে আশ্বাস দিলে, না মালতী মোটেই বদলায়নি, তার নির্বিকার অস্তিত্বের সাক্ষী ওই-চিঠি। দু-লাইনের পত্র কিন্তু সজারুর মতো খোঁচায়-খোঁচায় সঙিন, এমন পত্র যা পেয়ে নিরুদ্বেগে ব'সে থাকার জো নেই। হোক্‌-না মালতী বিবাহিতা ; তরুণ তো তার কাছে প্রণয়প্রার্থনা করছে না যে তার স্বামীকে ভয় করবে। সে চায় তাদের সেই দাবিদাওয়াহীন সহজ সখ্যটুকু, যার সঙ্গে কোনো স্বামীর কোনো স্বত্ব কখনো সঙ্ঘাতে আসবে না ; এইধরনের সম্পর্কের পক্ষে স্বামীর বর্তমানতাই বরং বাঞ্ছনীয়, তাহ'লে উদ্‌বৃত্তের অনটনে তার বৃত্তিটা হয়তো ভিক্ষুকোচিত না-ও হ'তে পারে। কিন্তু শতচেষ্টা সত্ত্বেও সে মালতীর পঞ্চবর্ষব্যাপী নীরবতার কোনো সদুত্তর খুঁজে পেলে না। সে মনকে বোঝালে যে সে এখনো জগতে এত অপরিহার্য হয়নি যাতে তাকে খবর না-দিয়ে অন্যলোকের বিয়ে করা অসম্ভব হবে, তবু একটা নৈরাশ্যের অনুভূতি তার অন্তরে র'য়েই গেল। এবং সেটা নিয়েই সে চলল মালতীর নিমন্ত্রণরক্ষায়।

কিন্তু মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে তরুণের ভাববিলাসের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইল না। সে দেখলে মালতী বদ্‌লে গেছে, এত বদ্‌লে গেছে যে তার কথাবার্তার মধ্যে সেই পুরানো ঝাঁজটা না-থাকলে তাকে চেনাই যেত না। মালতীর চেহারার যে খুব পরিবর্তন ঘটেছে, তা নয়, কেবল তার দেহে উদ্‌ভিন্ন যৌবনের অনিশ্চিততা আর নেই, এখন সে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। কিন্তু তার সৌন্দর্যের মধ্যে একটা প্রখর প্রাচুর্য ছিল যেটা তরুণকে আঘাত করলে। তার মনে হ'ল মালতীর মধ্যে পূর্ণিমার প্রশান্ত পরিপূর্ণতা নেই, আছে কেবল খমধ্য সূর্যের

উদ্ধত বাহুল্য। পাঁচ বছর আগেকার উপমাটা আবার তার স্মরণে এল, মালতী নিরক্ষ-অরণ্যের ফুলের মতো, তার বক্ষে বিষের তীব্রতা। কিন্তু তার আকর্ষণ দুস্তর, দুর্মর, দুর্দান্ত।

এইটুকু লক্ষ করতে-করতেই তাদের নিঃসার সৌজন্যের পালাটা কেটে গেল। তরুণের প্রতিকূল সিদ্ধান্তের খবর হয়তো বিনা-বাক্যেই মালতীর কাছে পৌঁছেছিল, তাই হঠাৎ সে সুধীরবাবুর শিষ্টালাপে বাধা দিয়ে অসহিষ্ণু স্বরে আরম্ভ করলে : 'তরুণ বিরক্ত হ'য়ে উঠছে, বাবা ; এখন মিনতিটি জানিয়ে ওকে ছুটি দাও।' তার গলার আওয়াজে বোঝা গেল যে তার স্নায়বিক অবস্থাটা খুব শান্তিপ্রদ নয়।

সুধীরবাবু অপ্রতিভ সুরে বললেন : 'তরুণবাবু তো তোর মতো ধড়ফড়ে নন যে এর মধ্যে হাঁপিয়ে উঠবেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে এত বছর বাদে দেখা হ'ল, দাঁড়া, ওঁর খবর নি[ই]।' তাঁর কথার ভাব থেকে বোধ হ'ল তিনি তাঁর আসল বক্তব্যটা বলতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন।

তরুণের সদালাপ প্রস্তুত ছিল, সে বললে : 'বাবু উপাধি দিয়ে আমায় অপরাধী করছেন কেন, আমি যে আপনার পুত্রস্থানীয়। এবং সেইজন্যেই আজকে এসেছি। সম্প্রতি বাড়ি থেকে বেরুনো প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, এখানে এলুম আপনাদের পরমাত্মীয় মনে করি ব'লে।'

পিতার হ'য়ে মালতী উগ্র স্বরে জবাব দিলে : 'পাঁচ বছর গায়েব হ'য়ে যাওয়া আত্মীয়তারই চিহ্ন বটে।'

তরুণ বললে : 'নালিশটা কতকটা দু-ফলা ছুরির মতো নয় কি?'

মালতী সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর করলে : 'ফলা? আমি তো এর কোনো ফলাই দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে ওর ধারটা সমস্তই গোড়ায়, ছুঁচের মতো, কাটে কম কিন্তু পৌঁছয় অনেক দূরে।'

তরুণ জিজ্ঞাসা করলে : 'মানে?'

মালতী বললে : 'ভগবান আমায় এত বুদ্ধি দেননি যে পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রেও নিজের কিছু থাকবে। মানেটা নিজেই বোঝার চেষ্টা করো।'

তরুণ কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুধীরবাবু বাধা দিয়ে বললেন : 'এ একরকম মন্দ না, দোষ করলুম আমরা, এবং তার দায়ী হ'ল তরুণ। ভুলে যাচ্ছিস মালতী, তোর বিয়ের নিমন্ত্রণটা-সুদ্ধ ওকে পাঠাসনি।'

মালতী বললে : 'কিন্তু সেটাকে বৈশিষ্ট্যসূচক ভেবে তরুণ যেন জাঁক না-করে। কাউকেই নিমন্ত্রণ করিনি, ওকেও বাদ দিয়েছি। তাছাড়া আমার বিয়েতে ওর বা অপরের কী?'

তরুণ এ-কথার কী সঙ্গত উত্তর দেবে ভেবে ঠিক করার আগেই সুধীরদা ব'লে উঠলেন : 'সেই মনোভাবের জন্যেই তো আজকে এ-অবস্থা। যে-তরুণকে বাদ দিতে চেয়েছিলে আজকে সে ছাড়া আর গতি নেই ; একেই বলে বিধাতার মার।'

দলিত ফণিনীর মতো মালতী গ'র্জে উঠল : 'বিধাতার মার? সে-বেচারাকে এর ভিতরে টেনে আনছ কেন? আরো একটা কথা ভুলো না, তরুণের সাহায্যভিক্ষা আমি কোনোদিন করতে চাইনি। ও তো তোমাদেরই দলের লোক, ও তো পুরুষ, সমাজ তো ওদেরই ; ওর কাছে প্রতিকার চাওয়া পাগলামিরই চূড়ান্ত।'

তরুণ সত্যিই একটা দারুণ ব্যথা পেলে। সে খুব সংযত কণ্ঠে বললে : 'কথাটা হয়তো বিস্ময়কর হ'তে পারে, কিন্তু আমায় তোমার দরকারে লাগতে পারে সেই আশাতেই এখানে এসেছি ; তোমার জীবনের অনধিকারচর্চা করা আমার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নয়।'

মালতীকে জবাব দিতে না-দিয়ে সুধীরবাবু বলতে শুরু করলেন : 'মালতীর মনের অবস্থা ঠিক নেই, আমারও নেই, আমাদের কারুরই নেই। কাজেই আমাদের কথায় অপরাধ ধ'রো না, তরুণ। যত হাঙ্গাম ওই-বিয়েকে নিয়ে। বছর-কয়েক আগে—প্রায় চার বছর আগে একটা খেয়ালের মাথায় মালতী আমারই একজন পুরোনো ছাত্রকে বিয়ে করে। যে একেবারে অন্ধ নয়, সে-ই সন্দীপের সঙ্গে মালতীর বিয়েতে আপত্তি করবে, কিন্তু আমার মেয়েটি সম্ভবত আমার দোষে অসম্ভবরকমের একগুঁয়ে।'

সুধীরবাবু এরপরে কী বলবেন যেন ভেবে পেলেন না। তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে মালতী অধীর কণ্ঠে বললে : 'অবান্তর কথাগুলোই শুনলে, আসল কথাটা পাড়তে বাবার কুণ্ঠা হচ্ছে। দোষ যারই হোক্, ভুল যেই ক'রে থাকুক্, আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বনে না, ফলে দু-বছর যাবৎ বাবার কাছেই রয়েছি। এটা আমার স্বামীর অভিপ্রেত নয়, তাই তিনি আমার নামে দাম্পত্য-স্বত্বের দাবি ক'রে হাইকোর্টে এক মামলা রুজু করেছেন। বাবার বিশ্বাস প্রকাশ্য আদালতে যদি এই মামলার শুনানি হয় তাহ'লে আমার দেশজোড়া সতী নামের ক্ষতি হ'তে পারে।'

সুধীরবাবু ব্যথিত স্বরে বললেন : 'ছিঃ মালতী! তোদের এই বড়ো জিনিসকে ছোটো চোখে দেখার প্রবৃত্তিটার সঙ্গে আমার কোনো সহানুভূতি নেই। সে যাই হোক্, রাগের মাথায় আসল কথাটাই যে বাদ দিলি।'

মালতী হেসে উত্তর দিলে : 'মোটেই রাগের বশে ভুলিনি, যতক্ষণ সম্ভব চেপে রেখেছি যাতে তরুণের আগ্রহ পুরোমাত্রায় প্রখর হ'য়ে ওঠে।'

তরুণ দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল মালতী সম্বন্ধে তার মনে একটা সকরুণ দরদ ছাড়া আর কোনো ভাবই নেই। সে আশ্বস্ত হ'ল, আপনার অজ্ঞাতসারে সে যদি মালতীকে ভালোবাসত, তাহ'লে সেই অন্তঃশীল ভালোবাসা উদ্বেল হ'য়ে ওঠার এই উপযুক্ত সময়, কিন্তু তার মনে যে-অনুকম্পাটা জেগেছিল তাতে মালতীর কোনো বিশেষ অধিকার নেই, মালতী না-হ'য়ে অন্য কেউ বিপন্ন হ'লে তার সাহায্যেও সে হয়তো এগুতো সমান উদ্যমে। সে নিশ্চয় হ'ল মালতীর সঙ্গে একটা গ্রন্থিল সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়তে তার মন মোটেই ইচ্ছুক নয় ; কী বলবে ভেবে পেলে না ; তাই সে ঠাট্টার স্বরে জবাব দিলে: 'আমি কিন্তু এই অপেক্ষাটাকে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের উপযুক্ত পুরস্কার ব'লে বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছি।'

কিন্তু তার নির্লিপ্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, একটা আসন্ন সঙ্ঘাতের ছায়া তার পুনঃপ্রাপ্ত স্ফূর্তিকে মলিন ক'রে দিলে, কারণ সুধীরবাবু তাকে জানালেন যে তাঁর জামা[ই]য়ের তরফের প্রধান ব্যারিস্টার মাইটর-সাহেব। এবং তিনি তরুণকে ডেকেছেন, তার পিতাকে ধ'রে এই ক্লান্তিকর ব্যাপারটাকে আপসে মেটানোর শেষ আশায়।

তিনি বললেন : 'ব্যাপারটা আমার সাধ্যের বাইরে চ'লে গেছে, তরুণ। চেষ্টার কোনো ত্রুটি

করিনি, কিন্তু মালতী, সন্দীপ দু-জনেই পণ করেছে প্রাণ যায় তবু কেঁট বজায় থাকবে। এ-বিষয়ে আমার কোনো ভাবালু ধারণা নেই, কিন্তু সারাজীবন লোকের কাছে একটা শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছি, স-য়ে চড়ার আগের ক-টা দিনে তাদের বাঁকা চাওয়াটা অভ্যাস করা শক্ত হবে।'

তাঁর স্বরে একটা এমন হতাশের ঝঙ্কার ছিল যে তরুণ সজাগদৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চাইলে, এবং দেখে চম্‌কে উঠল, সময়ের রথচক্র কী নির্মম, কী কুলিশকঠোর। তার মনে হ'ল তার সম্মুখীন ভদ্রলোকটি সুধীরবাবু নয়, সুধীরবাবুর শব, তাঁর দৃষ্টি শবের মতোই শূন্যতাময়, তাঁর কণ্ঠস্বর যেন মৃত্যুর অপর পার থেকে আসছে, তাঁর দেহের নিশ্চলতা সে যেন মরণসংহতি। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে সে অনুভব করলে, মালতী একা, নিতান্ত একা, মালতীর চারপাশে শ্মশানের প্রেতসঞ্চরিত নিঃসঙ্গতা বিরাজ করছে। হঠাৎ সেই বিপন্ন অন্ধকার উদ্দীপ্ত বিদ্যুতে ঝল্‌সে গেল ; তরুণের চমৎকৃত অন্তরে জ্ঞানসঞ্চার হ'ল, মালতীকে বাঁচাতে পারে শুধু সে।

বাড়ি ফেরার পথে তরুণের উত্তেজনা অনেকটা ক'মে এল। মাইটর-সাহেব সন্নিপাতে আসার আগেই তার দিব্যজ্ঞান বুঝলে সে-দিকে কোনোই সুবিধা হবে না ; কিন্তু তার সঙ্কল্প তবু অটল রইল। সে সিধে বাড়ি এল না, দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এল। বৃদ্ধ তখন নিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তরুণ সটান তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে তাঁকে জানালে যে অবিলম্বেই সে তাঁর অতিথি হ'তে পারে। তিনি সন্ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন . 'আবার কী বাধালি ?'

তরুণ সৌম্য স্বরে জবাব দিলে : 'এখনো কিছু না, কিন্তু মন বলছে একটা কুরুক্ষেত্র অবশ্যম্ভাবী।'

মাতামহের কৌতূহল সে এর বেশি চরিতার্থ করতে রাজি হ'ল না। শুধু বললে : 'কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

বৃদ্ধ বললেন : 'রেখে দে, বাপু, তোর উদ্দেশ্য ! আমি তোকে ভালোবাসি, সে কি তোর উদ্দেশ্যগুলোর জন্যে ?'

কথাগুলো কিন্তু তরুণের কানে গেল না, কারণ ততক্ষণে সে হয়েছিল উধাও। বৃদ্ধ দৌহিত্রের আচরণে স্তম্ভিত হ'য়ে, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলেন, এবং তারপরে বিছানায় ঢুকলেন, কিন্তু তরুণের মানসিক সুস্থতার বিষয়ে ভাবতে-ভাবতে তাঁর অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হ'ল না।

সে-রাত্রে একটা প্রচ্ছন্ন শক্তির সঞ্চরণে তরুণেরও ঘুম এল না। একটা নিগূঢ় উল্লাসের উদ্বেগে সে অধীর হ'য়ে উঠল। সে বললে, এবারে আর আমার পক্ষে কোনো দুর্বলতা নেই. এবারে আমার ঝগড়া একটা আদর্শের জন্যে, একটা কর্তব্যের খাতিরে। তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র রইল না যে সে মালতীকে ভালোবাসে না, মালতী একটা উপলক্ষ্য মাত্র, মালতী সেই অঘটন-সঙ্ঘটন, যার আশাপথ চেয়ে তার উদাস আত্মনিষ্ঠা এই চার বছর কাটিয়েছে। কিন্তু এসেছে, সময় এসেছে, এবারে তার জীবনের ধারা সঙ্গত সিদ্ধিতে পৌঁছবেই পৌঁছবে।

বেচারা তরুণ ! নবজাগরণের উন্মাদনায় তার ভাবার সময় ছিল না, এই সঙ্গত সিদ্ধিটা কী।

৬

পরের দিন পিতা-পুত্র-সংবাদে আশাতিরিক্ত কিছু ঘটল না। তরুণের অনধিকারচর্চায় অধীর হ'য়ে মাইটর-সাহেব বললেন : 'আমার একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে যে আইন-আদালত সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি কিছু বেশি বুঝি ; সে-ধারণাটা যতদিন না-ঘুচছে ততদিন—।'

তরুণও উত্তেজিত স্বরে তাঁকে বাধা দিয়ে জানালে, পিতাকে আইন শেখাবার হাস্যকর চেষ্টায় সে আসেনি। তার বক্তব্য হচ্ছে যে আইন যাই বলুক্, আইনের উপরকার আইনে পরাঙ্মুখ স্ত্রীলোকের কাছে পৌরুষের দাবি মহাপাতক।

মাইটর-সাহেব চম্‌কে উঠলেন ; তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, কোনোরকমের আভাস না-দিয়ে, তরুণ হঠাৎ তাঁর দৃঢ়মুষ্টির ভিতর থেকে পিছ্‌লে চ'লে গেছে। তাঁর প্রাণ বিফলতায় ভ'রে উঠল এবং সেই বিফলতাকে ঢাকবার চেষ্টায় তিনি রূঢ় কণ্ঠে বললেন : 'হাঁ আমার মতিভ্রম হয়েছে, তাইজন্যে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনে প্রশ্রয় দিতে পারি, কিন্তু ছেলের জন্যে উপপত্নী জুটিয়ে দিতে পারি না, ওই আইনের উপরকার আইনের খাতিরেও না।'

'মানে?'

'মানে আর নেকামিতে দরকার নেই। যাও, এখান থেকে, ইতর ভাব ইতর ভাষা বাদ দিয়ে যখন কথা কইতে শিখবে তখন আবার আবদার করতে এসো।'

নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন স্বরে তরুণ জবাব দিলে : 'আমি আপনার কাছে আবদার করতে আসিনি, শুধু জানাতে এসেছি যে এরপরে আপনার-আমার একত্রে থাকা অসম্ভব।'

মাইটর-সাহেবের গলার আওয়াজে ঘর কেঁপে উঠল ; তিনি বললেন : 'আগেও আরেকবার ও-কথা শুনেছিলুম, কিন্তু কুকুরের মতো পা-চাটতে আসার দৃশ্যটাও ভুলিনি।'

তরুণ জবাব দিলে : 'সেই হীনতার জন্যেই জীবন আজকে বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এবারে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, ফিরব না পণ ক'রেই যাচ্ছি।'

মাইটর-সাহেবের তীব্র চিৎকার বহির্মুখ তরুণকে অনুসরণ করলে : 'কিন্তু ভুলো না, এই পরস্ত্রী-গমনের সাজা জেলের ভিতরে—।'

রাস্তায় এসে তরুণ দেখলে সে কাঁপছে, অথচ এই কম্পনের কারণ নির্দেশে অক্ষম হ'ল। সে নিজের মনের অলিগলি খুঁজে দেখলে, কিন্তু রাগের লেশমাত্র পেলে না, অনুভব করলে তার প্রাণ একটা অপূর্ব লঘুতার সংজ্ঞায় উল্লসিত, তার অঙ্গে-অঙ্গে শৃঙ্খলমুক্তির রোমাঞ্চন, তার কানের বহুবর্ষব্যাপী নিস্তব্ধ শূন্যতা ঘটনাস্রোতের শ্রাবণবন্যায় মুখরিত। সে আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু এত বড়ো পণ্ডশ্রমের পরেও মনের কোণে লজ্জার চিহ্ন দেখতে পেলে না, পেলে শুধু একটা বিপুল, একটা অনুপম সিদ্ধি। ইচ্ছা হ'ল সে পথে-পথে মুক্ত কণ্ঠে প্রচার ক'রে ফেরে—'জয় হয়েছে, জয় হয়েছে, আমি ধন্য।' কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতিগুলোকে পরাস্ত ক'রে একটা বাসনা ক্রমশ একচ্ছত্ররূপে দেখা দিলে। সে-বাসনা অবিলম্বে মালতীকে দেখার বাসনা, মালতীকে তার বিজয়-বারতা জানাবার বাসনা, মালতীর সঙ্গে এই অমিত গৌরবটা সমান ভাগ ক'রে নেবার বাসনা। তার মনে হ'ল মালতীকে সেই

মুহূর্তে না-দেখতে পেলে তার জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠবে ; মনে হ'ল এতদিন মালতীর অভাব ছিল ব'লে তার মানবতার পরাকাষ্ঠা ঘটেনি। পথে যেতে-যেতে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : 'হাঁ, মালতী যোগ্য, আমার জীবনের আধার হবার সম্পূর্ণ যোগ্য।'

কিন্তু তরুণের ভাবস্রোত বেশিক্ষণ অনাবিল রইল না ; সুধীরবাবুর ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তার বিমানবিহারী মন চকিতের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ল সংসারের রুক্ষ ধূলায়। সে এই প্রথম উপলব্ধি করলে যে তার জাগরূক মুক্তির আত্মম্ভরী ক্ষুধা মালতীকে উদরস্থ ক'রে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি। অমনি তার মনে হ'ল সে অত্যন্ত অভাজন, মালতীর ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি, তাকে বলি দিয়েছে, অনায়াসে, অবহেলায় বলি দিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রাণ লজ্জায় অসুস্থ হ'য়ে উঠল ; সে মনে-মনে বললে : 'আমিই-না একদিন উমেশদার আচরণের নাম দিয়েছিলুম বিশ্বাসঘাতকতা! মানুষের স্পর্ধা আর কত দূরে এগুতে পারে?' এবং তার কণ্ঠস্বর এল রুদ্ধ হ'য়ে, সে এর বেশি কিছুই বলতে পারলে না যে তাকে মধ্যস্থ করতে গিয়ে মোকদ্দমা মিটমাটের শেষ সম্ভাবনাটুকুও তাঁরা জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

মালতীর স্থৈর্য তরুণকে অবাক ক'রে দিলে। মালতীর মুখে, মালতীর আচরণে, মালতীর আলাপে পূর্বরাত্রের তীব্রতা, পূর্বরাত্রের উত্তেজনা, পূর্বরাত্রের নিরুপায় হিংস্রতার ছায়ামাত্র আর ছিল না। তরুণের সন্দেহ হ'ল, আগের দিন মালতীর মধ্যে সে যে-সন্তাপের পরিচয় পেয়েছিল, সেটা বুঝি তারই আপনার সন্তাপের প্রতিবিম্ব। এ-মালতী তো সেই প্রাকৃত মালতী যার মধ্যে আছে কেবল প্রশান্তি আর উচ্ছল মিতালি। এবং সেই মুহূর্তে তরুণ বুঝলে তার আন্তরিক কম্পনের কারণ কী ; সে ভয় পেয়েছে, গোপনে-গোপনে নিজের অজ্ঞাতসারে ভয় পেয়েছে যে মামলা মেটা অসম্ভব জেনে মালতী তাকে বিদায় দেবে, মালতীর কাছে আর কোনো প্রয়োজনীয়তাই তার থাকবে না। সে জীবনে কখনো এত ভয় পায়নি।

কিন্তু মালতী তার ভয়কে স্থায়ী হ'তে দিলে না ; মালতীর বৈদেহ বাহু তাকে যেন বুকে টেনে নিলে, তাকে আশ্বস্ত করলে, তাকে ভোলালে, তার নির্ভর হ'ল ; পূর্বের আরেকবারকার মতো এই নির্বাক সঙ্কটের কুলগ্নটা সে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল মালতীর বাক্‌চাতুরীতে। মালতীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তরুণের মন পুলকিত হ'য়ে উঠল। ইচ্ছা করল তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ইচ্ছা করল তাকে কাছে টেনে আনে, ইচ্ছা করল কাঁদে, ইচ্ছা করল হাসে। এ-রকমের ভাববিপর্যয়ে সে আর কখনো পড়েনি ; সে কোনো সঙ্গত কথা খুঁজে পেলে না, হঠাৎ ব'লে উঠল : 'মালতী, তুমি সত্যিই অসাধারণ, শুধু অসাধারণ নও, অলৌকিক।'

তার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজনা ছিল, একটা উৎসাহ, একটা আন্তরিকতা ছিল, যেটা মালতীর মর্মে পৌঁছল। সে খুব সহজ সুরে বললে বটে, 'এই আপাত-সত্যটা আবিষ্কার করতে তোমার যদি এতদিন লেগে থাকে তাহ'লে সূক্ষ্মবুদ্ধির জন্যে তোমার তারিফ করা চলে না।'—তবু চোখ থেকে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির আলোটা সে ঢাকতে পারলে না।

তরুণের মনের মধুচক্র উঠল গুন্‌গুনিয়ে, কথা এসে তার মুখাগ্রে জুটল ঝাঁকে-ঝাঁকে, এবং সে আলাপের উপক্রম করলে। কিন্তু মালতীর নামটুকু নেবারও ত্বরা সইল না, হঠাৎ মাইটর-সাহেবের বিদায়বাণীর স্মৃতি বিষের মতো তার প্রাণকে জর্জরিত ক'রে তুললে, তার কথাগুলো

যেমন আকস্মাৎ জেগে উঠেছিল, ম'রেও গেল তেমনি অকস্মাৎ। আবার তার ভয় হ'ল, প্রচণ্ড ভয়, কিন্তু এবারে আর মালতীকে নয়, মালতীর সঙ্গে বিচ্ছেদকে নয়, নিজেকে, নিজের প্রবৃত্তিগুলোকে, মালতীর আসঙ্গকে। সে স্বগত বললে : 'তাহ'লে এই আমার চাল, বিপন্ন মালতীর সহায় হাওয়া, সেটা কেবল উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হচ্ছে মালতীর নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করা। বাবা ঠিকই বলেছেন, আমি সমাজের শত্রু!' তার ইচ্ছা হ'ল সেখান থেকে সেই নিমেষেই পালায়, কিন্তু সেটা যে কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা হবে। তাই সে গম্ভীর গলায় বললে : 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, মালতী, সূক্ষ্মবুদ্ধির উপরে আমার কোনোদিন কোনো লোভ নেই, তবে স্থূলবুদ্ধি আছে ব'লে কিছু গর্ব অনুভব করি। সেই স্থূলবুদ্ধি বলছে আজকের আলোচ্য বিষয় আমি না-হ'য়ে তুমি হওয়া উচিত ; বিপদ যে তোমার।'

তরুণের ভিতরকার পরিবর্তনের খবর মালতীর অজ্ঞাত রইল না ; অমনি চোখের নিমেষে তার বিকীর্ণ দাক্ষিণ্য হ'ল সঙ্কুচিত, তার স্বরে ফিরে এল পূর্বরাত্রের নিবিড় নিষ্ঠুরতা, সে অত্যন্ত অধীরভাবে বললে : 'বিপদ ? বিপদ কীসের ? আর যদিই-বা বিপদ থাকে, তাহ'লে সে-বিপদ থেকে বাঁচাবে তুমি? তুমি ?'

এই ক্ষুদ্র তুমি শব্দের ভিতরে যে এতটা অবজ্ঞা স্থান পেতে পারে তা তরুণের জানা ছিল না ; তার মনে হ'ল সে ক্ষ'য়ে যাচ্ছে, ক্রমশই ক্ষ'য়ে যাচ্ছে, মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যেতে আর দেরি নেই, অবিলম্বে একটা যা-হোক্ কিছু না-বলতে পারলে জগতে আর তার অস্তিত্ব থাকবে না। সে দুর্বল কণ্ঠে ব'লে উঠল : 'তোমায় বাঁচাবার শক্তি বা প্রবৃত্তি কোনোটাই যখন আমার নেই তখন তোমার অবজ্ঞা নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য। কিন্তু তবুও হয়তো তোমার কাজে লাগতে পারি, নিজে মদৎ না-দিতে পারলেও, মদৎ দিতে পারে এমন লোকের সন্ধান হয়তো আমায় দিয়ে হবে।'

মালতী হেসে উঠল, কিন্তু সে-হাসির আওয়াজ কঠোর, নিরানন্দ, অসুস্থ। তীক্ষ্ণ স্বরে সে বললে : 'তোমার উদারতায় আমি ধন্য, কিন্তু না-চাইতেই মহামূল্য দান অপচয় ক'রো না।'

সুধীরবাবু এতক্ষণ হতবুদ্ধির মতো শূন্যের পানে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলেন, তাঁরও সমাধি ভাঙল মালতীর নির্দয়তায়। তরুণ কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুধীরবাবু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন : 'ও পাগল হ'য়ে গেছে তরুণ, কী বলছে, কী করছে, তার জন্যে দায়ী নয়। কিন্তু ওর ইচ্ছে [থাক্] বা না-থাক্ ওকে রক্ষা করতেই হবে, ওকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আমার সেই কর্তব্য আমি তোমার হাতে সমর্পণ করছি।'

তারপর তাঁর গলার আওয়াজ যেন আবার সমাধিমগ্ন হ'য়ে এল ; হয়তো তিনি বললেন, 'এ-বিপদকে বুক পেতে নেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই, সময়েও বোধহয় কুলুবে না', কিন্তু এ-সম্বন্ধে তরুণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারলে না, কারণ মালতী উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে শুরু করেছিল : 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, বাবা, আমি তোমার অস্থাবর সম্পত্তি নই যে খুসিমতো হস্তান্তর করবে। তরুণের অভিভাবকত্ব স্বীকার করার আগে আমি শ্বশুরবাড়িতে যাব, সে-ও শ্রেয়।'

কথাগুলোকে তরুণ বিষাক্ত ছুরির মতো মর্মে-মর্মে অনুভব করলে। কিন্তু তাকে যেটা পীড়া

দিলে সেটা মালতীর নিষ্ঠুর উপেক্ষা নয়, সেটা মালতীর স্বামীগৃহে ফেরার মানসিক ছবি। সে যেন দেখতে পেলে মালতীর অশরীরী স্বামীর চোখে জ্বলছে বাসনার দাবাগ্নি, মালতীর স্বামীর হাতে কামনার ক্ষিপ্র কৌতূহল, মালতীর স্বামীর প্রাণে কাপালিকের আদিম ক্ষুধা। সে মালতীকেও দেখলে, তার বিবশ তনু কাঁপছে বলির মতো ; কী কমনীয় তার কুন্দ-কান্তি, কী নিটোল তার বক্ষের মহিমা, কী নির্মম তার বলিদান। অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরুণের কপাল বেদনায় কুঞ্চিত হ'য়ে গেল, তার চক্ষু হ'ল মুদ্রিত, সে মুক্ত হস্তদুখানা উঁচিয়ে মাথা নিচু করলে—যেন একটা অসহ্য আঘাতের বেগ কতকটা নিবারণ করতে চায়। সে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বললে : 'না, না, ওইটে নয়, ওইটে নয়, ওইটে বাদ দিয়ে আর যা-খুসি করো।'

মনে হ'ল কথাগুলো যেন তার চিন্তার মর্মরধ্বনি, অপরের কর্ণগোচর হওয়া উচিত নয়, এতই সেগুলো অন্তম, এতই যন্ত্রণাময়। কিন্তু তার ভিতরকার মর্মান্তিক মিনতিটুকু মালতী হয়তো বিনা-বাক্যেই হৃদয়ঙ্গম করলে, কারণ হঠাৎ তার কথার ধারা বদ্‌লে গেল, মনের আগুনে যেন ছাই চাপা পড়ল, তার উত্তরের মধ্যে নেমে এল একটা অসীম শ্রান্তি। সে শান্ত স্বরে বললে : 'কিন্তু তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? আমার ফাঁসিও হবে না, জেলেও যেতে হবে না। আর অন্তত যতদিন বাবা আছেন ততদিন আমায় পথে বসায় কার সাধ্য।'

কথাগুলো তরুণের সঙ্গত ব'লে বোধ হ'ল, সে জবাব দেওয়ার কিছু পেল না। কিন্তু সুধীরবাবুর আবার চমক ভাঙল, তিনি ব্যাকুল স্বরে বললেন : 'কিন্তু, মালতী, আমি আর ক-দিন? তারপর? তারপর?'

মালতীর চোখে আবার একটা অধীরতার আভাস পাওয়া গেল, সে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুধীর[বাবু] উত্তেজিতভাবে তাকে বাধা দিলেন : 'তুই কি ভাবিস জেল বাঁচলেই তোর জিৎ? আর দুর্নামটা? মালতী, মালতী, বয়স অল্প আছে তাই বুঝতে পারছিস না, একঘরে আপনার জেল আপনি সঙ্গে নিয়ে ফেরে।'

অস্থিরতা চাপতে না-পেরে মালতী ব'লে উঠল, 'দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে অত উতল হ'য়ে উঠছ কেন? কীসের দুর্নাম? কার দুর্নাম? আমার না আমার স্বামীর? মামলা তো আর একতরফা হবে না। আমারও মুখ আছে!'

সুধীরবাবু আঁৎকে উঠলেন ; জিজ্ঞাসা করলেন : 'কী পাগলের মতো বকছিস, মালতী! ঘরের কথা হাটের মাঝে বলবি কী ক'রে?'

'দেখতেই পাবে কী ক'রে বলব। শুধু আশা করি, সতীর দল সেই অসামান্য সোহাগের সরস কাহিনীটি শুনে হিংসায় পাতিব্রত্য ভুলে যাবে না।'

সুধীরবাবু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বললেন : 'কী বলছিস, মালতী, কী বলছিস, একটু স্থির হ'য়ে কথা ক'। সে কিছুতেই হ'তে পারে না, কিছুতেই না, আমার প্রাণ থাকতে নয়।'

কিন্তু কথাগুলো বোধহয় মালতীর কানে গেল না, অন্তত সে চুপ ক'রে ব'সে রইল, নির্বাক চোখের মধ্যে একটা নিষ্পলক কঠোরতার দীপ্তি ভ'রে। তখন নিরুপায় হ'য়ে সুধীরবাবু তরুণের সাহায্য চাইলেন ; কিন্তু তরুণকে দিয়ে কোনোই সুবিধা হ'ল না। সে বেচারা তখন নিজেই নিরাশ্রয়, তার অন্তর্দৃষ্টি তখন কতকগুলো অদ্ভুত বিভীষিকার বিবর্তনে দিশাহারা।

সে-ছবিগুলোর মধ্যে একটা দৃশ্য কেবলই ঘুরে আসছিল, ঘুরে আসছিল প্রত্যেকবার স্পষ্টতর হ'য়ে। ক্রমশ সেটা অন্যসমস্ত চিত্রকে ঢেকে দিলে, তরুণের সমস্ত ভাবজগৎকে দখল ক'রে নিলে। অসহ্য তার যন্ত্রণা, অসহ্য। তরুণ দেখলে একটা অতিকায় বৃষ উন্মত্ত বেগে মালতীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তার দেহে মদস্রাব, তার গতি ধ্বংসময়, তার লালসা অমানুষিক ; তার পিঠের 'পরে মালতী বন্দিনী হ'য়ে আছে, মালতীর প্রাণ কণ্ঠাগত, মালতীর শতচ্ছিন্ন বসন উড়ছে ঝড়ের হাওয়ায়, মালতী চলেছে, অতিক্রান্ত পথে বিক্ষত শরীরের রক্তরেখা এঁকে, কোন্ নিরুদ্দেশের পানে চলেছে, কে জানে!

তরুণ হঠাৎ বাস্তব জগতে ফিরে এল মালতীর অঙ্গস্পর্শের ফলে। সে দেখলে মালতী কাঁদছে, এবং সে আছে মালতীর চেয়ারের পাশে হেঁট হ'য়ে, তাকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টায়। সে মালতীর কাছে এসে কেন দাঁড়িয়েছে, কখন দাঁড়িয়েছে, কিছুই সে লক্ষ করলে না, জানতে পারলে না, মালতীর ক্রন্দনের কারণ কী। সে মালতীকে আর কখনো কাঁদতে দেখেনি, মালতী কাঁদতে পারে এ-খবরটাও ছিল তার ধারণাতীত। কাজেই একটা বিষম সঙ্কোচ তাকে হতবুদ্ধি ক'রে দিলে, মালতীর কম্পিত স্কন্ধে হাত বুলানো ছাড়া অন্য-কিছু করা তার সামর্থ্যে কুলাল না। কিন্তু তাতেই যেন বাঞ্ছিত ফল ফলল ; ক্রমশ মালতী আপনার উপরে প্রভুত্ব ফিরে পেলে ; তার অশ্রুর উৎস গেল ফুরিয়ে, তার কৃতজ্ঞ চাহনি করলে তরুণের মুখান্বেষণ এবং সঙ্গে-সঙ্গে তরুণের মনে হ'ল, সুধীরবাবু যেন বিস্মিত হ'য়ে তাদের পানে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু তার আচরণ সুধীরবাবুর কাছে সত্যই রহস্যময় লাগল কি-না, সেটা নিশ্চয় করার অবকাশ তরুণের ভাগ্যে জুটল না, কারণ তিনি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে, মরীয়ার মতো ব'লে উঠলেন : 'তুই অত ব্যাকুল হ'সনি, মা। তোর বাসনাই পূর্ণ হবে, আমরা শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমা চালাব। আমি এখুনি চললুম উকিলবাড়ি।' তারপর তরুণের দিকে চেয়ে 'তরুণ, মালতীকে প্রকৃতিস্থ করার ভার তোমার উপর রইল, আমি ফেরার আগে যেন পালিও না'—এই কথা কম্পিত কণ্ঠে ব'লে তিনি হলেন উধাও।

সেইদিন থেকে তরুণের জীবন-নাটকে একটা প্রক্ষিপ্ত অঙ্কের শুরু হ'ল যার মধ্যে নেপথ্য পেলে দৃশ্যের উপরে প্রাধান্য, স্বগতোক্তি উঠল কথোপকথনকে ছাপিয়ে, উদ্যোগ নিলে ঘটনার স্থান। সে-রঙ্গমঞ্চের স্বপ্নময় পাত্রপাত্রী যমক তারার মতো পরস্পরের অনুধাবনে অনেক শক্তি ক্ষয় করলে, অনেকের মনে বিস্ময় জাগালে, অথচ ব্যবধান লঙ্ঘনে হ'ল অক্ষম। বহু বিবেচনার পরেও তরুণ ঠিক পেলে না, মালতী তার শত্রু না মিত্র, মালতী তাকে চায় না প্রত্যাখ্যান করে, সে মালতীর পিছনে ছোটে না মালতীই তার অনুগামী। কিন্তু সে যাই হোক্, তরুণ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলে না যে মালতীর বিপ্রকৃষ্ট প্রভাবে তার জীবনের ধারা বদ্‌লে গিয়েছে। তার নির্বিকার দিনগুলোতে নিষ্কারণ বৈচিত্র্যের উপলব্ধি জেগে উঠল ; তার অন্তরাত্মা ঘোষণা করলে বিশুদ্ধ চৈতন্যের উজ্জীবন ; তার নিঃসাড় দেহ হঠাৎ চিৎকার ক'রে জানালে, আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে আছি ; একটা আসন্ন পরিপূর্ণতার প্রত্যাশায় দৈনন্দিন দীনতার অস্তিত্ব-সুদ্ধ তার মনে রইল না।

এটা তার ভিতরকার কথা, তরুণের বাহ্যিক পরিবর্তনটাও কিছু কম বিস্ময়কর হ'ল না।

এতদিন সে ভেবেছিল জীবন বুরুজের মতো, যার উৎকর্ষ উচ্ছ্রায়ে, বাইরের দেয়ালের কারুকার্যে নয়। সে স্থির করেছিল, সূর্যের উপরে নিষ্পলক দৃষ্টি ন্যস্ত ক'রে ওঠা, কেবলই উঁচুতে ওঠা হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। কিন্তু সূর্যের দিকে চেয়ে থাকলে অন্ধতা অনিবার্য, সেইজন্যই বোধহয় যে-জিনিসগুলো শুধু চোখে পড়ে, অনুভূতি অথবা বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, তাদের সন্ধান তরুণের কাছে ছিল না। তরুণের এ-অভ্যাসটা উমেশদার নজর এড়ায়নি। তিনি একবার তাকে বলেছিলেন : 'তরুণ, একসময়ে এক ইংরেজের কাছে শুনেছিলুম যে আমাদের জাতের যে-দোষটা তাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের কলার প'রে কলারের পিছনকার বোতামটা আঁটতে ভুলে যাওয়ার রোগ। তার কথাগুলো আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে, এবং তারপর থেকে বার-বার দেখেছি যে পথের দুঃখ পাহাড়ের জন্যে বাড়ে না, তাকে বাঁচিয়ে চলা যায়, গোল বাধায় ওই ছোটো কাঁটাগুলো।' কিন্তু তরুণ জিনিসটাকে স্বীকার করতে চায়নি, সে জানিয়েছিল যে কাঁটাবনে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু মুক্ত দৃষ্টির প্রতিবন্ধক দাম্ভিক পাহাড়গুলোকে তার অসহ্য লাগে। তারপরে গুরু-শিষ্য পর্বত লঙ্ঘনের শ্রেষ্ঠ উপায়ের খোঁজে বিভোর হ'য়ে পড়েছিল, এবং সামান্যের প্রতি তরুণের অগাধ অবজ্ঞা আর কখনো আলোচিত হয়নি। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়তে লাগল, তরুণ ততই উপলব্ধি করলে যে ছিন্ন সজ্জায় মালতীর বন্ধুদের সামনে এসে সে মালতীকেই অপমানিত করছে, এবং একদিন রাস্তায় চলতে-চলতে মালতী যখন তার জামার আস্তিনের উপেক্ষিত ধুলা ঝাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল, তখন তরুণ আর তার উচ্চণ্ড লজ্জার প্রত্যক্ষ রক্তিমা ঢাকতে পারলে না। এবং তারপরে তার সুবেশ দেখে মালতী যেদিন ব'লে উঠল : 'বাঃ তরুণ, তুমি যে এত সুন্দর তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি', সেদিনেও তরুণ লাল হ'য়ে গেল, কিন্তু এবারে আর লজ্জায় নয়, গৌরবে ; তার মনে হ'ল সে জীবনে এত বড়ো সম্মান পায়নি, মালতী যেন তাকে ইন্দ্রত্বে বরণ ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু তার আনন্দ নির্ভাজ রইল না ; সঙ্গে-সঙ্গে একটা হাল্‌কা বিষাদের ছায়া তাকে মলিন ক'রে দিলে ; তার মনে পড়ল যে মালতীর প্রশংসা সে পেয়েছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ধুলোঝাড়ার কল্যাণে মালতীর করস্পর্শ উপভোগ করার সৌভাগ্য তার হয়তো আর ঘটবে না।

সাহিত্যেও তরুণের রসগ্রহণের ক্ষমতা মালতীর সাহায্যে বেড়ে উঠল। একদিন কথা প্রসঙ্গে তরুণ ব্রাউনিঙের নাম করলে পরে মালতী বলেছিল : 'তোমার রুচিতে তোমার জন্মতারিখ প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হরফে লেখা রয়েছে। এটা বোঝো-না কেন যে কবিতা আর নীতিকথা বিভিন্ন জগতের বাসিন্দা, বিভিন্ন জাতির জীব? ওদের সঙ্গমে যে-সন্তান জন্মায় সে সৃষ্টিছাড়া। উঃ, ব্রাউনিঙের দম্ভ আমার অসহ্য লাগে, অসহ্য লাগে হিতোপদেশ। তার বাগাড়ম্বর কোনোদিন ভেদ করতে চেষ্টা করেছ কি, তরুণ? যদি ক'রে থাকো তাহ'লে নিশ্চয়ই দেখেছ যে তার ধর্ম আর বিড়ালতপস্বীর ধর্ম একইধরনের। ওই যে উদারতার ভান, ওই যে পাপিষ্ঠদের পক্ষপাত, ও সবই ভেক, সবই ভেল্‌কি। যারা শুঁড়িখানার সামনে দিয়ে যেতে হ'লে মনে-মনে মহাপাতকের আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে, মেয়েমানুষের আঁচলের হাওয়ায় যারা অসমসাহসের শিহরণ খুঁজে পায়, ও-ছদ্মবেশ তাদেরই ভোলাতে পারে। কিন্তু

ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির গুণকীর্তন এবং সংসারের অনবদ্যতা যার মুখে একযোগে আসে, তার কথাগুলো আমার কাছে অন্তত অশ্লীল ব'লে বাজে।'

সাধারণত নিরপেক্ষ কলার নামে তরুণ অধীর হ'য়ে উঠত, কিন্তু মালতীর মতটা সেই সূত্রেরই রূপান্তর হ'লেও, সে প্রতিবাদ করলে না। সে মালতীকে এটাও বোঝাতে চাইলে না যে ব্রাউনিঙ-কাব্যের দার্শনিক ভিত্তি একটা প্রক্ষিপ্ত খণ্ডকবিতার উপরে নির্ভর করে না ; এবং তাও যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহ'লেও ভুললে চলবে না যে সংসারকে নির্দোষ ব'লে ভাবার অনেকদিন বাদে ব্রাউনিঙ ওই ভ্রষ্ট যাজকটির ওকালতি করেছিল। সে এ-সব কিছুই বললে না, হয়তো এগুলো তার স্মরণেও এল ; সে শুধু তন্ময় হ'য়ে মালতীর প্রখর প্রতিভার পানে তাকিয়ে রইল। মালতীর সামনে ব'সে-ব'সে তার মনে হ'ল যে বোদলেয়ারের বর্ষিয়সী বারবণিতারা বাস্তবিকপক্ষে হয়তো নিষ্পেষিত নারেঙ্গির মতো নিঃসার না-ও হ'তে পারে ; সায়োনারা হয়তো আসলে একটি যক্ষারোগীর অনধিগম্য পরিচারিকা মাত্র নয়, অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের বুদ্বুদগুলোর ভিতরে হয়তো ব্রহ্মাণ্ড সত্যই মুকুরিত। কিন্তু মাতামহের বাড়ির নিভৃত কক্ষে তার এ-বিশ্বাসগুলো কেমন যেন টিঁকত না, পেটারকে শুধু শব্দবহুল ব'লেই লাগত ; আনাতোল ফ্রাঁসের উপাধ্যায়গুলি একটা সংরক্ষিত পুরাকালের মৃদু গন্ধ রেখে কর্পূরের মতো উবে যেত, মেটারলিঙ্কের জাদুতে তার চোখে ছাইত ধূমল কুহেলি। অল্পক্ষণেই মালতীর দেবতাদের তনুবায় আসঙ্গে তরুণের প্রাণ এমনি হাঁপিয়ে উঠত যে স্মলেট-ফিল্‌ডিঙের নিরেট চরণে শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না ; জীবনের লুপ্ত সূত্রগুলোকে খুঁজতে হ'ত বোভারি-পত্নীর গ্রাম্যতায়, অশরীরীদের অমৃতস্পৃহার চেয়ে শ্রেয়স্কর মনে হ'ত জোলার অবস্কর-প্রীতিকে।

কিন্তু পরের দিন মালতীর সামনে পোপ-ড্রাইডেন-উইচার্‌লি-কন্‌গ্রিভকে লাগত আদ্যিকালের বদ্যিবুড়িদের মতো, মিল্‌টনের অশনি-নির্ঘোষকে থিয়েটারি বজ্রের মতো কর্কশ মনে হ'ত, সমস্ত ইংরেজি সাহিত্য যেন অপাঠ্য হ'য়ে উঠত রিচার্ডসনের কল্যাণে। তখন অতীত থাকত পঞ্চভূতের সঙ্গে এক হ'য়ে, অব্যক্তির অন্তরাল থেকে ভবিষ্যৎ মুখ বাড়াতে সাহস পেত না, অনুভূত হ'ত কেবল মালতী আর বর্তমান, একজন বরদা মালতী এবং একটি ভবিতব্য-ভারাতুর বর্তমান। এ-সময়ে মালতী যদি হার্ডি-মেরিডিথের নাম নিত, তাহ'লে তরুণ অস্বীকার করতে পারত না যে তারা ইস্‌কিলাস্‌-এরিস্টোফেনিসের চেয়ে বড়ো ; সুইনবার্নকে ডনের উপরে আসন দিতে তার কুণ্ঠা থাকত না ; এমন-কি প্রাক্‌-রেফেলিয়দের সে অবাধে মেনে নিতে দ্বিধা করত না। তরুণের বিচারবুদ্ধি মালতীর সংস্পর্শে বস্তুত হারিয়ে যেত না, মালতীর কম্প্র কণ্ঠের কাকলিতে ঘুমিয়ে পড়ত মাত্র। তরুণ তাকে জাগাবার কোনো প্রয়াস পেত না ; বুদ্ধিকে স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে দিয়ে সে কিছুদিনের জন্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত কেবল তার হৃদয়ের সাহায্যে। ফলে তার মনে হ'ত জীবনটা সুখাবহ হ'য়ে উঠেছে, অত্যন্ত সুখাবহ : দিনগুলো আজকাল আর স্থাবর হ'য়ে থাকে না, এত ভীমবেগে ছোটে যে ভয় হয়, বুঝি-বা তারা কিছু চুরি ক'রে পালাচ্ছে ; মুহূর্তগুলো আর নির্বিশেষ যন্ত্রণার অনন্ত আবেশে ভেদাতীত নয়, এখন সেগুলো শতবরণের ভাবে উচ্ছ্বাসে চিত্রল ; এমন-কি তার

নিষ্ক্রিয় নিঃসঙ্গতা-সুদ্ধ সম্ভাব্যের সংসর্গে উতল হ'য়ে উঠেছে। যেটা তার সবচেয়ে উপভোগ্য লাগত সেটা এই ঘটনা-বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা। তার বোধ হ'ত, তার ভিতরে, তাকে ঘিরে সঙ্ঘটনের স্রোত ব'য়ে চলেছে ; সে এগুচ্ছে, ক্রমশই স্বর্গের দিকে এগুচ্ছে, খুলল ব'লে স্বর্গের দ্বার, আসন্ন তার অমরতা। অনাগত অলৌকিকের প্রত্যাশায় সে তার অন্তরের সমস্ত পথ উদ্ঘাটিত ক'রে ব'সে রইল।

কিন্তু খুলি-খুলি ক'রেও স্বর্গের সুবর্ণ সিংহদ্বার সত্যিকারের খুলল না ; অনাগত অতিথিটি বারংবার আসার খবর পাঠালে, কিন্তু শেষকালে এসে পৌঁছতে পারলে না ; তরুণ-মালতীর মধ্যবর্তী ব্যবধানটার দু-পাশে উপাদান স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠল, কিন্তু সেতুবন্ধের ব্যাপারটা তেমনতর এগুল না। অতল পাতালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মালতীর পানে সে হাত বাড়িয়ে দিলে, ফলে মালতীকে নাগালে পেলে না, কেবল ঘূর্ণিবেগের তাড়নে ভাবলে সারা ত্রিভুবনের বুঝি তুলাসাম্য হারিয়ে গেছে। সে ভয় পেলে, শপথ করলে যে অলস বুদ্ধিকে পিছনে ফেলে সে আর কখনো নিঃসহায় অবস্থায় এইরকমের দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হবে না। কিন্তু ঠিক এইসময়ে বিধাতা হঠাৎ খেয়ালি হ'য়ে উঠলেন, তাঁর চরণস্পর্শে ঘটনার নাগরদোলা ভীমবেগে ঘুরে গেল, এবং দিশাহারা তরুণ স্থির করতে পারলে [না] সে কোথায় ছিট্‌কে এসে পড়ল।

আবর্তনের আতিশয্য যদি তরুণকে অন্ধ না-ক'রে দিত, তাহ'লে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত যে সে এসে পড়ছে মালতীর পদপ্রান্তে, দেখতে পেত যে অলক্ষ্যে সে মাঝখানের ব্যবধিটা পেরিয়ে এসেছে, দেখতে পেত বিধাতা তার প্রতি অত্যন্ত সদয়, মালতী তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে প্রসারিত ভুজে। কিন্তু তার নিজের কথা ভাববার সময় ছিল না। মোকদ্দমা রুজু হবার দিন থেকেই সুধীরবাবু বিছানা নিয়েছিলেন, শুনানি যতই ঘনিয়ে এল, তাঁর চলচ্ছক্তিও গেল সেই পরিমাণে ক'মে, অবশেষে মামলা শুরু হবার দশদিন আগে হৃদ্‌রোগের দৌলতে অপমানের উদ্যত কবল থেকে তিনি পেলেন রেহাই। তাঁর আত্মীয়েরা ইতিপূর্বেই তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে তুলেছিল ; কাজেই কোনোরকমের স্পষ্ট আশ্বাস না-পেলেও তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করলেন এই ভরসায় যে মালতীর তত্ত্বাবধানে তরুণ পশ্চাদ্‌পদ হবে না।

ডাক্তার যেদিন জানালে যে সুধীরবাবুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেদিন তরুণের অভিমান রাখার জায়গা রইল না। জগৎখানা হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে এল, সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না অদৃষ্টের এই অত্যাচার সে কীসের জন্যে অর্জন করেছে। সার্থকতার আসন্ন লগ্নে বারে-বারেই কি সে প্রাপ্যটুকুতে বঞ্চিত হবে? প্রাণপাত ক'রে বাড়ি সাজিয়ে সে কি প্রত্যেকবার থাকবে প্রতীক্ষায় ব'সে, তবু আসার বেলা ফুরিয়ে যাবে, আমন্ত্রিতদের দেখা মিলবে না? এবারেও সে যত্নে ত্রুটি করেনি। তার মনে পড়ল কী দুঃসাধ্য পরিশ্রমে সে সন্দীপ চাটুজ্যের কদাচারের সাক্ষী সংগ্রহ করেছে, মালতীর বিবাহিত জীবনের অন্তরতম কাহিনী শোনা তার পক্ষে কী যন্ত্রণাময়। মালতীকে তার সহায়তা গ্রহণে সম্মত করা, একজন মানুষের পক্ষে সেইটাই যথেষ্ট কাজ। উপরন্তু তার মাতামহ আবার বেঁকে বসেছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রকে নতজানু করার চেষ্টায় মাইটর-সাহেবকে উদাসীন দেখা যায়নি। যথাসময়ে তাঁর চর এসে তরুণের মাতামহকে জানিয়েছিল যে তরুণ মাতামহের আশ্রয় নিয়েছে, কারণ পিতৃগৃহে

থেকে ভ্রষ্টাদের সঙ্গে মাতামাতি ক'রে বেড়ানোর সুবিধা হয় না। উত্তরে বৃদ্ধ বলেছিলেন বটে যে তাঁর বয়স হ'লেও তিনি অন্ধ হননি, দৌহিত্রের গতিবিধির উপর নজর রাখবার মতো চোখের জোর তাঁর আছে; এবং তরুণ তার বাপের পাপসঙ্গ পরিহার ক'রে নিজের বিবেকের পরিচয় দিয়েছে ; তবু স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদে স্ত্রীর পক্ষ নেওয়া ধর্মসঙ্গত কি-না, এই তর্কের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন স্নেহের স্রোত দ্বিখণ্ডিত হবার উপক্রম করছিল। এইসময়ে মালতী যদি দৈবাৎ আবির্ভূত হ'য়ে সহজ সখ্যের দ্বারায় বৃদ্ধের মনে পক্ষপাত জাগিয়ে না-দিত, তাহ'লে শুধু সেকালের জন্যে আক্ষেপ ক'রে তিনি তরুণের যথেচ্ছাচারে রাজি হতেন কি-না সন্দেহ।

এ-সঙ্কটটা কোনোরকমে পেরুবার পরেই তরুণের নিজের কর্তব্যবুদ্ধি আবার গোল বাধালে। মোকদ্দমার তদারক করতে গিয়ে, তরুণ একদিন উকিলবাড়ি থেকে শুনে এল যে সন্দীপের তরফ থেকে তার এবং মালতীর মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। যেহেতু তার নিজের মনটা একেবারে দ্বিধাশূন্য ছিল না, তাই বাড়ি ফিরেই সে মালতীর কাছে চাইলে অব্যাহতি। কিন্তু তার অনুরোধের তাৎপর্য মালতীর বোধগম্য হ'ল না ; মালতী ব'লে বসল যে তরুণ পালাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে কারণ মালতীর আসঙ্গে দুর্নাম অনিবার্য। এর চেয়েও রূঢ়তর কথা সে মালতীর কাছে শুনেছিল, কিন্তু সেদিনে সে হঠাৎ রাগে আত্মহারা হ'য়ে গেল। সে আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না, মালতীর প্রতিবাদ করলে না, মালতীকে বক্তব্য শেষ করার সময় দিলে না, চোখের নিমেষে উধাও হ'ল। মালতীদের চৌকাঠ পেরুনোর বেলা সে যে-পণ করেছিল, সে-পণ কিন্তু বজায় রইল না ; সুধীরবাবুর স্বাক্ষরিত একখানা মর্মান্তিক চিঠি নিয়ে স্বয়ং মালতীই এল তার খোঁজে। তারপরে আবার আসরে নামা ছাড়া আর উপায় রইল না। কিন্তু সুধীরবাবুর সঙ্গে কথা কইবার পরে তরুণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারলে না, এই দ্বিতীয়বার তাকে ডাকা সত্যি-সত্যিই সুধীরবাবুর অভিপ্রেত কি-না। তার বোধ হ'ল, সন্দীপ চাটুজ্যে যে-ব্যাপারটাকে প্রকট করার চেষ্টায় আছে, সুধীরবাবু চাইছেন সেইটাকে লুকিয়ে রাখতে, এমন-কি তাঁর নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু এইধরনের কাল্পনিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময় ছিল না ; মোকদ্দমার দিন দুর্দম বেগে এগিয়ে আসতে লাগল, এবং অ্যাটর্নি-কৌন্‌সুলির বাড়িতে অনবরত ছুটোছুটির পরে তরুণের সামান্য অবসরটুকু কাটত নিঃশ্বাস নিয়ে। তারপর জয়ের পথ যখন ক্রমশ সরল হ'য়ে এল, উপসর্গগুলো গেল দূরে, ঠিক সেই সময়টিতেই সুধীরবাবুর ডাক পড়ল অন্যলোকে।

অভিমানে তরুণের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। কেন, শুধু তার অদৃষ্টেই এই সঙ্গত শুদ্ধির সুযোগটুকু মিলবে না কেন? সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না যে সুধীরবাবু যদি আরেকটু দীর্ঘায়ু হ'য়ে মালতীর শেষরক্ষা এবং তার নিজের দুর্নামভঞ্জন দেখে যেতেন তাহ'লে বিধাতার ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় কোথায় দোষ ঘটত। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মালতী তাকে স্বানুকম্পার সহজ পথে নামতে দিলে না।

সুধীরবাবুর মৃত্যুর পরদিন তরুণের মাতামহ মালতীর সঙ্গে দেখা করতে এসে দু-চার কথার পরে যখন হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে অভিভাবকহীন অবস্থায় মালতীর থাকা হ'তে

পারে না, সে তাঁর বাড়িতে চলুক, তখন তরুণের প্রাণ একটা অনাম আশঙ্কায় ভ'রে গেল। মালতী জবাব দেবার আগেই সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল : 'সে হ'তেই পারে না, তাহ'লে এইখানেই যে মোকদ্দমার দফা শেষ।'

কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরুতে-না-বেরুতে তরুণের মনে হ'ল সে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে। তার ভূমিলগ্ন দৃষ্টির শিকড় যেন পাতালের তলায় গিয়ে পৌঁছল, তার মূলচ্ছেদ করে কার সাধ্য। সেইজন্যেই তার খেয়াল হ'ল না যে মালতীর উদাস চোখে একটা আকস্মিক অবধানের আভাস মিলল, মালতীর শোকস্তব্ধ মুখে একটা নিরানন্দ হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বর্ধিষ্ণু নীরবতাকে চূর্ণ ক'রে মালতী ব'লে উঠল : 'র'ক্ষে করো তরুণ, বারে-বারে ওই মামলা উঁচিয়ে আমায় শাসিও না।' তারপর তরুণের মাতামহের পানে চেয়ে অসম্ভবরকমের কৃতজ্ঞ স্বরে সে জানালে : 'দাদামশাই, আপনার সত্যি-সত্যিই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে। এ-বাড়িতে আর একদণ্ড থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি না-বললে আমাকে নিজেই আপনার আশ্রয়ভিক্ষা করতে হ'ত।'

বাষ্পাকুল কণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন : 'সেইটাই তো স্বাভাবিক, তা না-হ'লে তোমাকে অমানুষ ব'লে ভাবতে হ'ত। আমার নাতিটির কথা ধ'রো না ; ও কী বলে, কী করে, সে ওই জানে।'

কিন্তু তরুণের এই শিষ্টালাপে যোগ দেবার অবসর ছিল না। একটা উদ্যত সর্বনাশের সন্নিপাতে তার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তার উপজ্ঞার অন্ধকারে একটা অবেদ্য আনন্দও যেন জাগরণের উপক্রম করলে। কিন্তু মৌন কল্পনার অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে সে প্রশ্রয় দিলে না, সাধ্যমতো সংযত স্বরে বললে : 'মালতী, আইন-আদালতের সঙ্গে ছেলেমানুষী চলে না। ভুলে যেও না এখন যদি মোকদ্দমায় হারো তাহ'লে একেবারে সর্বস্বান্ত হবে। এতদিন জেতা ছিল জেদের কথা, এখন হারা মানে পথে দাঁড়ানো।'

মালতী ব'লে উঠল : 'ক্ষমা দাও, তরুণ, ক্ষমা দাও। সত্যিই কি আমি কচি খুকি? অতটুকু বুদ্ধি আমারও হয়তো আছে। এতদিন মালতীকে দেখে এখনো বুঝতে পারলে না যে মালতীর উপাদানে ভয়ের অংশটা খুব বেশি নেই?'

মালতীর কথার আওয়াজে একটা বিধুর বিনতি ছিল, একটা নিরাবরণ আত্মদানের, একটা নিরাবলম্ব নিবেদনের সাড়া ছিল। তরুণ সেটা লক্ষ করলে কি-না বলা শক্ত ; কিন্তু তার হেতু সম্বন্ধে ভ্রান্ত হ'লেও, তরুণের মাতামহ সে-সুরটা শুনতে পেলেন। তাই তরুণের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে তিনি ব্রিবতভাবে বললেন : 'রেখে দে বাপু, তোর আইনকানুন। এই হতভাগা দেশে, আমার মতে, আইনের একটু বেশি বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলে যে-আইনে বাধে সে-আইনের জাহান্নমে যাওয়াই ভালো। ভারি আইন দেখাতে এসেছিস। বেশ তো হোক্-না মালতীর হার, ওকে পথে কে দাঁড় করায় একবার দেখা যাবে!'

এবং এমন সুযোগটা না-ছাড়তে পেরে মালতী বৃদ্ধকে বললে : 'কিন্তু দাদামশাই, আমার হারের কোনো সম্ভাবনাই নেই। বেশ তো, তরুণ আমাদের বুঝিয়ে দিক্-না, আপনার বাড়িতে

গেলে জিতের আশায় জলাঞ্জলি কেন দিতে হবে? আসল কথা হচ্ছে, তরুণ ভয় পাচ্ছে যে আপনাকে স্নেহের ফাঁদে ফেলে ওর প্রাপ্য বিষয়টা আমি লিখিয়ে নেব।'

বৃদ্ধ খুব হাসলেন, কিন্তু বচনাতীত অভিযোগে তরুণের বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল। তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে মালতী তার কথার গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে। সে জবাব দিতে পারবে না, কোনোমতেই পারবে না, সেটা জেনেই মালতী তাকে আত্মস্খালনের আহ্বান করছে, এইটাই তরুণকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিলে। কিন্তু তার প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না ; নালিশ আনার ফাঁক ছিল না, কাজেই মালতীর কৃত্রিম ঠাট্টাকে খাঁটি ব'লে মেনে নিতে হ'ল ; এবং সেইদিন সন্ধ্যায় মালতী এসে তাদের বাড়িতে আতিথেয়তা স্বীকার করলে। তরুণের উপরেই তাকে আনার ভার ছিল। সমস্ত দিন নীরবতার পরে তার নূতন আশ্রয়ের ফটক পার হ'তে-হ'তে মালতী হঠাৎ সহগামী তরুণকে বললে : 'তরুণ, ছেড়ে দাও মামলার ভাবনা ; ভুলে যাও হারজিতের কথা ; যা-হবার হবে। মোকদ্দমার ফলাফলে তোমারই-বা কী আর আমারই-বা কী? এতদিন তোমাতে-আমাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছি, সেটাই যথেষ্ট!' তরুণ অবাক হ'য়ে তাকালে, কিন্তু তার মুখভাবের কোনো কিনারা পেলে না। মালতীর চোখের কোণে একটু হাসি যেন অনুমিতির মতো ফুটে আছে ; ফলে তরুণ একবার ভাবলে যে সে ঠাট্টা করছে ; কিন্তু এই বিশ্বাসের প্রতিবাদস্বরূপ মালতীর ওষ্ঠাধরের গম্ভীর রেখায় তার দৃষ্টি থামল। তরুণ এ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করলে না, বিনা-প্রমাণে ধ'রে নিলে মালতীর উক্তিটা একটা অসময়োচিত পরিহাস ; মালতীর তরফ থেকেও ব্যাখ্যার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

আসল কথা তরুণের আশুক্রান্ত স্নায়ুচক্র তখন ভেঙে পড়ার উদ্যোগ করছে। তখন থেকে মালতী ও তার মাঝে যে-বিসম্বাদটা তীব্র বেগে বেড়ে উঠল, তার অনেকটারই হয়তো এই কৈফিয়ৎ, কিন্তু সবটার নয়। বাকিটা অস্বাভাবিকরকমের অবদমনের পরিণাম। মালতীর আগমনে সে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করলে, তার মনের প্রত্যেক তন্তু সেই আনন্দে বেজে উঠল, তার অঙ্গে-অঙ্গে শিহরণ জাগালে সেই আনন্দেরই অনুরণন ; তবু তরুণ নিজের কাছেও এ-সত্যটা স্বীকার করলে না। কিন্তু এই অস্বীকৃতির জন্যে তার যতটা শক্তি ব্যয় হ'ল, তারপরে মালতীর হাবভাব, মালতীর বিরল কথার অন্তম অর্থ, মালতীর মনের শোচনীয় ভঙ্গুরতা, এ[র] কোনোটা বোঝার মতো সামর্থ্য বা উদ্যম তার রইল না। কাজেই সে দেখতে পেলে না যে মালতীর অতল চোখের নিত্য-স্বচ্ছতা একটা প্রচ্ছন্ন মন্থনের ফলে হঠাৎ আবিল হ'য়ে উঠেছে ; মালতীর নিখুঁত মুখের উপরে বিনিদ্র রজনীর দুর্ভর পরম্পরা চরণচিহ্ন রেখে গেছে ; মালতীর মাথা একটা বিপুল পরাভূতির সংজ্ঞায় যেন বিনত ; মালতীর শরীরের অক্ষম নিবদ্ধতা যেন দুর্বার শাসনের প্রতীক্ষারত।

এদিকে মোকদ্দমার দিন এল, গেল ; মালতী তার সদ্য-শোকের আড়ালে দাঁড়িয়ে সময় চাইলে। তবু তরুণের চৈতন্য হ'ল না, তবু সে এই অস্বাভাবিক স্তব্ধতার মধ্যে আসন্ন ঝড়ের ইশারা দেখতে পেলে না, শুধু মালতীকে বোঝাতে চেষ্টা করলে যে শত্রুর কাছে সময় ভিক্ষা

করা দুর্বলতার নামান্তর মাত্র। মালতী তার যুক্তি মানলে বটে কিন্তু মত বদ্‌লালে না, এবং স্ত্রীজাতির কোমলতার প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে তরুণ গেল তার আদেশপালনে।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন কাটতে লাগল ; মামলা আবার সন্নিকটে এল ; তবু তরুণের খেয়াল হ'ল না যে মালতীর ভিতরে একটা বিশেষ কিছু ওলট্‌পালট্‌ ঘটছে। কিন্তু তরুণের এই অন্ধতা অমার্জনীয়। মালতীর দিক থেকে আভাস-ইঙ্গিতের অভাব ছিল না। যে-মালতী এতটুকুর জন্যেও কারুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে নারাজ, সে কথায়-কথায় তার এবং অপরের শরণ নিচ্ছে, এত বড়ো পরিবর্তনটাও যদি তরুণকে এড়িয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে অপরাধ কেবল তরুণেরই। এবং এই অপরাধের শাস্তি যেদিন তাকে নিতে হ'ল, সেদিন অপ্রত্যাশিত ব'লেই সেটাকে লাগল অত নির্মম।

মামলা ওঠার তখন মাত্র সাতদিন বাকি, যখন তরুণ একদিন উকিলবাড়ি থেকে ফিরে মালতীর ঘরে সটান গিয়ে হাজির হ'ল। ক-দিন থেকে মালতীর শরীরটা খুব ভালো চলছিল না, তাই সে সেদিনে আর তরুণের সঙ্গে যায়নি। তরুণের নিজের দেহও অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল, কিন্তু তার জিরুবার ত্বর সইল না। তার সেদিনকার খবরটা বিশেষ আশাপ্রদ : সন্দীপ চাটুজ্যের একটা অতি বড়ো অন্যায়ের সাক্ষী ছিল একজন চাকর, কিন্তু এতদিন তার কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায়নি। সেদিন হঠাৎ তার পাত্তা মিলল। ফলে মালতীর পক্ষের উকিলেরা নিশ্চয় ক'রে জানালেন যে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মালতীর মধ্যে কোনোরকমেরই উত্তেজনা দেখা গেল না ; সে শ্রান্ত স্বরে তরুণকে থামতে বললে। অথচ তরুণ যখন ক্ষুব্ধ মনে অন্যত্র যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, তখন মালতী তাকে ছুটি দিলে না, বললে : 'কথা আছে, ব'সো।' তরুণ বসতে গেল খাটের সামনে একটা চেয়ারে, কিন্তু মালতীর তাতে মনঃপূত হ'ল না। খাটের পাশটাকে খালি ক'রে মালতী ডাকলে : 'ওখানে নয়, এইখানে।' তরুণ এল, প্রফুল্ল চিত্তেই এল। মালতীর এই সামান্য অনুরোধটার মধ্যে এমন একটা অমায়িকতার সাড়া ছিল যে, তরুণ অনতিপূর্বের বিরক্তিটাকে না-ভুলে থাকতে পারলে না ; এমন-কি তার বোধ হ'ল এই দ্বিতীয়বার আলাপ হবার পরে মালতীর কাছে সে এত অন্তরঙ্গতা মুহূর্তের জন্যেও পায়নি, এ যেন সেই পাঁচ বছর আগেকার মালতী। কিন্তু বলার মত্যে কোনো কথাই সে খুঁজে পেলে না। তার সমস্ত চিন্তা তখন মামলার ভাবনায় পরিপূর্ণ, ওই-বিষয়ে বক্তব্যেরও অভাব ছিল না, কিন্তু মালতী সে-প্রসঙ্গের উত্থাপনে আপত্তি করলে, কাজেই তরুণ রইল নীরবে।

ক্রমশঃ তাদের মধ্যবর্তী মৌন যেন অনুচ্চারিত মর্মকথার ভারে দুঃসহ হ'য়ে উঠল, মনে হ'ল একটা অদৃশ্য নাটক তার অব্যর্থ নিষ্ঠার দিকে অবাধ বেগে ছুটে চলেছে, মনে হ'ল সৃষ্টির চরম রহস্য উদ্‌ঘাটিত-প্রায়, কিন্তু মুহূর্তমাত্র বিলম্বও যেন অসহ্য। মালতীর ধৈর্যই প্রথমে ভেঙে গেল ; সে হঠাৎ, অকারণে আরম্ভ করলে তার আত্মকাহিনী। সে বললে তার পিতা-মাতার কথা, তার শৈশবের আশা-নিরাশার ইতিহাস, তার রূপকথার রাজপুত্রের আখ্যায়িকা। সে তার চিররুগ্ন মায়ের কথা পাড়লে ; তার চিরপিপাসিত পিতার কথা ছিপিয়ে রাখলে না ; তার পুরুষোচিত শিক্ষা-দীক্ষার বর্ণনা করলে ; ফুটিয়ে তুললে তার কৈশোরিক নিঃসঙ্গতার

ছবি। তারপর মালতী চুপ করল ; কিন্তু তরুণকে নিরুত্তর দেখে, অল্পক্ষণ পরেই সে আবার বলতে লাগল ; এবং তরুণ দেখলে, নবযৌবনা মালতীর চোখ মৃত্যুঞ্জয় জীবনের আদিম আবেগে আচঞ্চল হ'য়ে উঠছে, মালতীর মনে স্বপ্নের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বাসনা, মালতী আর তার স্বজনের স্নেহে তুষ্ট নয়, অচিনের আলিঙ্গনের জন্যে তার জাগরতনু উন্মুখ। মালতীর চারণ-স্মৃতি পুরাণের কুয়াশাচ্ছন্ন রাজ্য ছেড়ে হঠাৎ উপনীত হ'ল ইতিবৃত্তের প্রত্যক্ষ দেশে, এবং মালতীকে অনুসরণ ক'রে তরুণ আবার একটা মাস কাটাল ছোটনাগপুরের সেই প্রাক্তন গ্রামে। জ্যোতির্লোকের সনাতন সঙ্গীত তার কানে আবার বেজে উঠল, তার চোখের সামনে আবার ফুটে উঠল গ্রহনক্ষত্রের শাশ্বত নর্তন ; তার আয়তি বেড়ে উঠতে লাগল, ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগল ; অভ্রভেদ ক'রে ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম ক'রে অবশেষে তাকে পৌঁছে দিলে স্রষ্টার সমকক্ষতায়। কিন্তু মালতী তাকে এই পরমলোকে বেশিক্ষণ বিচরণ করতে দিলে না ; চোখের নিমেষে তরুণ নেপথ্যে অন্তর্হিত হ'ল এবং মালতীর জীবনমঞ্চে বিরাজ করলে শূন্যতা, অনন্ত অরুন্তুদ শূন্যতা। তারপর তরুণ দেখলে একটা অসীম মরুর কেন্দ্রে মালতী প'ড়ে আছে ; হঠাৎ দিগন্তের পারে একটা কালো বিন্দু লক্ষ হ'ল ; সেটা কাছে এগিয়ে এল, সন্দীপ চাটুজ্যের আকার ধারণ করলে, নিশ্চেতন মালতীকে লোলুপ ক'রে তুলে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে সূচীভেদ্য অন্ধকারে বিশ্বখানা অবলুপ্ত হ'য়ে গেল, সঙ্ঘাতের পর সঙ্ঘাত অন্তরীক্ষকে চুরমার ক'রে দিলে এবং তরুণের বোধ হ'ল সে পড়ছে, তলের থেকে অতলের ভিতরে পড়ছে, সে পড়ছে পাতালের অশেষ রন্ধ্র বেয়ে, মৃত্যুর অতীত অকূলের মধ্যে পড়ছে।

তরুণের মন চাইলে ত্রাহি-ত্রাহি ক'রে চেঁচিয়ে উঠতে, কিন্তু ভয় তার গলা চেপে ধরলে, সে-আর্তনাদের একটি শব্দও তার জিহ্বা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে না। তরুণের দেহ ঘোষণা করলে, মালতী সন্নিকট. কিন্তু ভয় তার অঙ্গে-অঙ্গে তুহিন-জড়তা বিছিয়ে দিলে, কনিষ্ঠাটি নেড়ে মালতীর দৃষ্টি-আকর্ষণের শক্তিটুকুও তার রইল না। অন্য সমস্ত অনুভূতি তরুণকে ছেড়ে গেল, কেবল অন্তর্জ্ঞানের অলক্ষ্য ছিদ্র দিয়ে তার শূন্য সংজ্ঞার মধ্যে ধেয়ে এল, অবিরল, অবিচ্ছিন্ন গতিতে ধেয়ে এল, একটা ভয়, একটা অদ্ভুত, অভাবনীয় ভয়। তরুণের মনে হ'ল তার পতনে বেগ জ'মে উঠছে, সমস্ত বাধা অন্তর্হিত, তার এবং নাস্তির মধ্যে আর কোনো আড়াল নেই, অনিবার্য তার বিলুপ্তি, অনিবার্য। তার বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠল, ভয় তাকে মরীয়া ক'রে দিলে এবং একটা অমানুষিক প্রয়াসের ফলে সে চোখ খুললে। কিন্তু পরিত্রাণের সুলগ্ন এতক্ষণে অতীত হয়েছিল, সে দেখলে মালতী এখন দূরতম নীহারিকার চেয়েও দূরে ; তার দেহে চলচ্ছক্তি ফিরে এসেছে বটে, তবু সে-শক্তি প্রয়োগের কোনো সার্থকতাই আর নেই। এবং যেহেতু ক্রোধ সাধারণত আসে ভয়ের ছায়ার মতো, তাই একটা অন্ধ উন্মত্ত আক্রোশ তরুণের প্রাণে বহ্ন্যুদ্‌গারণ ক'রে উঠল। সেটা একটা নিরুদ্দিষ্ট আক্রোশ, অথবা তার লক্ষ্য কোনো অনামিক বিধাতা ; অন্ততপক্ষে মালতীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু আসল অত্যাচার সন্ধান করার সুযোগ ঘটল না, মালতীকে সামনে দেখা গেল, কাজেই সেই মারাত্মক কোপের প্রহার পড়ল মালতীর ভাগে।

এ-সমস্ত ব্যাপার ঘ'টে গেল চোখের নিমেষে ; এবং মালতীর কথা শেষ হবার হয়তো কিছু আগেই, অসম্ভবরকমের রূঢ় স্বরে তরুণ ব'লে উঠল : 'কিন্তু এই গতজন্মের উপন্যাসটার আজকে কী সার্থকতা তা বুঝতে পারলুম না, মালতী। তোমার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল নেই, ওটা আদালতেই প্রকাশ ক'রো।'

মালতী জবাব দিলে না ; তার মুখ হ'য়ে গেল সাদা, তার চক্ষুদুটি হ'ল অভিব্যক্তিশূন্য, তার লুণ্ঠিত দেহে নেমে এল নিস্পন্দতা, মৃত্যুর কঠিন নিস্পন্দতা। মনে হ'ল, সেই চিত্রার্পিত কক্ষে নীরবতা শ্রুতিগম্য হ'য়ে উঠেছে ; সেই মৌনের মর্মে শুধু যেন শোনা যাচ্ছে দুটি নিরাশ্রয় হৃদয়ের অন্তিম আন্দোলন। কতক্ষণ এ-রকমের চলল বলা অসম্ভব ; সাধারণ ঘড়িতে মাপলে বিরামটাকে হয়তো তুচ্ছ লাগবে, কিন্তু সেই স্তব্ধতার দুই প্রান্তের দুটি প্রাণীর মধ্যে দিয়ে শত যুগ-যুগান্ত চ'লে গেল নিঃশব্দ চরণে। এবং তারা যখন পুনরায় আলাপ শুরু করলে তখন দু-জনেরই মনে হ'ল, তারা কেবল শ্মশানবন্ধু — শবদাহ শেষ ক'রে শূন্য ঘরে ফিরছে অন্ত্যেষ্টি সমাপনার্থে।

হঠাৎ উত্তপ্ত রক্তের দুর্দান্ত ঝলকে মালতীর সর্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেল, এবং অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সে-ই প্রথম কথা কইলে : 'সার্থকতা? এখন আর ওর কোনোই সার্থকতা নেই। কিন্তু জলে ডোবার সময়ে গতজীবনের স্মৃতি মনের উপরে ভেসে ওঠে, শুনেছ তো? একটু আগে আমারও সেই দশা হয়েছিল। কিন্তু এখন তোমার কৃপায় সে-বিপদটা কেটে গেছে, শক্ত মাটিতে ফের পা দিয়েছি, এখন আর ওর কোনোই সার্থকতা নেই।'

তরুণের মনে হ'ল কথাগুলোর আসল তাৎপর্য যেন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, তাই সে বললে : 'দোহাই তোমায়, হেঁয়ালি বাদ দিয়ে কথা বলো ; ও-জিনিসটাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ভয় করি।'

মালতী হাসলে, একটা নিরানন্দ নিরালোক হাসি হাসলে ; তারপরে বললে : 'হেঁয়ালিকে আমিও কিছু কম ভয় করি না, তরুণ ; কিন্তু ছেলেবেলাকার কুশিক্ষার ফলে হয়তো অলঙ্কার বাদ দিয়ে কথা কওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে আমার কথাগুলো অস্পষ্ট হ'লেও আমার কাজে প্রাঞ্জলতার অভাব দেখবে না এবং এই প্রাঞ্জলতার প্রথম পর্বস্বরূপ কাল সকালেই মালতী আবার সতীকুলশিরোমণির মতন বিরহী স্বামীর অঙ্কগত হবে।'

তরুণের বোধ হ'ল তার ভিতরে কী একটা দুখানা হ'য়ে যাচ্ছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে বিশেষ বেদনা অনুভব করলে না। তার মনে পড়ল যে হাঙরের দাঁতের মতো ধারালো হাতিয়ারে অঙ্গচ্ছেদ করলে আহত ব্যক্তি আঘাত পায় না। তার আত্মার একটা ছিন্নাংশ এই করুণাময় আকস্মিকতার জন্যে মালতীকে ধন্যবাদ জানাতে চাইলে, কিন্তু যে-অংশটা প্রথমে ভাষা খুঁজে পেলে সেটা প্রতিহিংসাপরায়ণ অংশ। ফলে তরুণের অর্ধেক মনের ঘোরতর ধিক্কার শুনতে-শুনতে অপরার্ধ ব'লে বসল : 'সঙ্কল্পটা সুবিবেচিত বটে, মালতী। মোকদ্দমার পরিণাম মানুষের প্রাণের মতোই অনিশ্চিত। কে বলতে পারে সুনামের সঙ্গে-সঙ্গে যথাসর্বস্বও খুয়োবে কি-না। তখন পথে-পথে ভিক্ষাজীবী হ'য়ে ফেরার চেয়ে, আজকে স্বামীর ঘরে রূপজীবী হ'য়ে থাকা, ঢের বেশি ভালো।'

মনে হ'ল তরুণের বাণ লক্ষ্যভেদ করলে ; মুহূর্তের জন্যে মালতীর নিটোল কপালে গোটাকয়েক রেখা ফুটে উঠল ; কিন্তু তরুণের শরসন্ধানের পিছনে হয়তো তেমন জোর ছিল না, কেন-না অনতিবিলম্বে মালতী বললে : 'নিদানশাস্ত্রে তোমার এ-রকমের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে তা তো আগে প্রকাশ করোনি, তরুণ। কিন্তু প্রাঞ্জলতার খাতিরে কারণটাকে আরো একটু স্পষ্ট করলে ভালো হয় : ভিক্ষাব্রতের চেয়ে পতিব্রত চিরদিনই শ্রেয়, বিশেষ ক'রে ভিখারী-বিদায়ের ভার যখন তোমার তাঁবে।'

৭

যতটা লিখেছি প'ড়ে দেখলুম, কিন্তু খুশি হ'তে পারছি না। মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা লেগে আছে, যা-বলেছি, ঐতিহাসিক বিচারে সবটা হয়তো সত্য নয়। কিন্তু সত্য জিনিসটা ধূপছায়া রেশমের মতো, দর্শকের অবস্থিতি হিসেবে তার রঙের তারতম্য ঘটে। এ-প্রসঙ্গে মুখ্য সাক্ষীদুটিকে প্রশ্ন করতে ছাড়িনি, কিন্তু তাদের জবানবন্দি মূল স্থানগুলোতে-সুদ্ধ গরমিল থেকে গেছে। অগত্যা ঘটনাটার একটা মন-গড়া ব্যাখ্যা স্থির করতে হয়েছে। ফলে বিবরণীর মধ্যে কারণশৃঙ্খলা হয়তো না-ও মিলতে পারে, কিন্তু টীকাটা পাত্রপাত্রীর চারিত্র্যের দিক থেকে অসঙ্গত হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। একটা কথা ভুললে চলবে না, মানুষের যে-আচরণগুলো পরিণামে অর্থবহুল হ'য়ে ওঠে, তাদের সঙ্গে কাকতালীয় ন্যায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। গতির প্রথম কথা হচ্ছে একটা প্রবর্তনা, একটা অহৈতুক, অন্ধ প্রবর্তনা ; সেই নিশ্চেষ্ট গতি যখন সঙ্কটের সঙ্ঘাতে থামে, তখন আমাদের জড়বুদ্ধি চম্‌কে উঠে আত্মনিয়োগ করে কারণসন্ধানে ; এবং এই 'কেন'-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি দেখে বিজ্ঞানে আর কুলোচ্ছে না, তখন তাকে শরণ নিতে হয় কলার, যার কারবার কল্পনাকে নিয়ে।

এ-বিষয়ে তরুণের সামনে অনেকবার অনেক তর্ক তুলেছি, কিন্তু কখনো তার সমর্থন পাইনি। সে বলত, যে-জিনিসের ভবিষ্যৎ নেই, তা বস্তুত অস্তিত্বহীন। যদি জিজ্ঞাসা করা যেত বস্তু অর্থে সে কী বোঝে, তাহ'লে বিনা-দ্বিধায় তরুণ জবাব দিত যে বস্তু তা-ই মানুষের মন যাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে, যার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান মানুষের বুদ্ধির কাছে এতটুকু আত্মগোপনে অপারগ। এ-মতটাকে অক্ষত রাখা শক্ত ছিল, কিন্তু তরুণকে কখনো সঙ্কুচিত হ'তে দেখিনি ; এবং ভূতবিদ্যার অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রের আবিষ্কারগুলোর কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে, সে বলত যে বৈজ্ঞানিক সত্য আর লৌকিক সত্য একই জিনিস ; বিজ্ঞান কখনো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না ; কিন্তু মানুষের মন মানে একজন মানুষের মন নয়, সমস্ত মনুষ্যজাতির মন, এবং এই মহামন প্রগতিপরায়ণ ও বৃদ্ধিশীল ; এই পুরশ্চরণ এবং স্বর্গারোহণের নামই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এবং এই উদ্ভট মতের উদাহরণস্বরূপ সে পাড়ত অমিতির মাঝে তখনকার বৈজ্ঞানিকদের দিশাহারা দুরবস্থার কথা। সে বলত মানুষ তার নিজের মনের সীমা দেখতে পাচ্ছে, অতএব অমিতির আয়ু আর বেশিদিন নয়, ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ টীকাকারেরা অমিত শূন্যের মতো একটা অবাধ্য জিনিসের দরকার বোধ করবে না। আমরা জড়বাদীরা কিন্তু তার যুক্তিতে তুষ্ট থাকতে পারতুম না, জিজ্ঞাসা করতুম, মানুষের

মনকে বাদ দিলে যদি ব্রহ্মাণ্ড বাদ প'ড়ে যায়, তাহ'লে মনুষ্যের সম্পূর্ণ তিরোধানের পরেও প্রলয় সম্ভবপর হবে কী ক'রে? সে তাতে হঠত না, বলত, মানুষের অনুমিতি যেখানে এসে থেমে যায় প্রলয় ঘটে সেইখানে, তার ওদিকে আর বুদ্ধির সিদ্ধান্ত টিঁকে না, তাই তারপরে নাস্তি রাজ্যবিস্তার ক'রে ব'সে আছে।

এইধরনের তর্ক যদি পিতৃদেবের সামনে উঠত, তাহ'লে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি ধৈর্য হারিয়ে, উগ্র স্বরে তরুণকে জিজ্ঞাসা করতেন—কখনো লেখবার চেষ্টা করেছ কি, তরুণ? যদি ক'রে থাকো তাহ'লে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে যে ব্রহ্মাণ্ড তো অনেক বড়ো কথা, আমাদের বুদ্ধি এই সামান্য পৃথিবীটাকেই পরিক্রমণ করতে পারে না। সন্দেহ হচ্ছে? চলো তোমায় নিয়ে যাই ওই সামনের পাহাড়ের চূড়োয়। ওর 'পরে দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা বাদে যে-সূর্যাস্তের রঙ আশ্বিনের আকাশে দেখতে পাবে, তার উন্মাদনা যদি যুক্তির সাহায্যে বুঝতে পারো, তবে স্বীকার করব সমস্ত স্বভাবখানাই মানুষের বুদ্ধির কারচুপি, তখন স্বীকার করব এই পৃথিবীই ব্রহ্মাণ্ডের ধূর।

যদি কোনো কারণে পিতৃদেবের আহ্বান অগ্রাহ্য হ'ত, তাহ'লে তরুণের জয় অনিবার্য ছিল। সে বলত তার মতো অ-কবিরাই অনির্বচনীয়তার আওতায় আশ্রয় নেয়; তাদের মন অলস, বুদ্ধি দুর্বল, তাই বচনাতীতের আবছা আলোর আনুকূল্যে তারা তাদের অক্ষমতার গ্লানি লুকোতে চেষ্টা করে; কিন্তু যারা সত্যিকারের রূপকার, যারা পরিশ্রমে ভয় পায় না, অব্যক্তির অন্ধকূপ থেকে অভিব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে তারা যায় স্রষ্টার সঙ্গে দ্বৈরথযুদ্ধে।

এরপরে তর্কে আর পিতৃদেবের প্রবৃত্তি থাকত না। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কবির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করাই পিতৃদেবের উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই তরুণ যখন কুতর্কের দ্বারায় সেই মহান্ সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছত, তখন তার যুক্তির দোষ ধরতে পিতৃদেব আর উৎসাহ দেখাতেন না। অবশ্য, এই প্রক্রিয়ার ফলে তাঁর অপর আদর্শ, স্বভাব, হয়তো কিছু পরিমাণে ম্লান হ'য়ে পড়ত; কিন্তু পিতৃদেব অনেক ঠেকে ক্রমশ শিখতে আরম্ভ করেছিলেন যে জীবনে দু-কূল রাখা কিছুতেই সম্ভবপর নয়; এবং কাব্যের খাতিরে তাঁর আত্মবলিদানগুলো ভাবলে পরে, আর জিজ্ঞাসা করার কোনোই দরকার হ'ত না, স্বভাব এবং কবির মধ্যে ঝগড়ায় তাঁর পক্ষপাত কোন্ দিকে নুইবে।

কিন্তু যদি পিতৃদেবের নিমন্ত্রণে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তুম, তাহ'লে তরুণের হারই ছিল অবশ্যম্ভাবী। ক্ষয়শীল জনপদখানাকে ছেড়ে আমরা যতই ঊর্ধ্বে উঠতুম, তরুণের জটিল যুক্তি ততই আসত পাৎলা হ'য়ে; এবং পরিশেষে যখন অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে দৈর্ঘে আমাদের আর বিন্দু-বিসর্গের তফাৎ থাকত না, তখন তরুণের চিন্তাস্রোত যেন অন্তঃশীল হ'য়ে যেত, মাঝে-মাঝে তার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠত বটে, কিন্তু কোনো বাক্য কানে পৌঁছত না। ক্রমশ পরিব্যাপ্ত নীরবতাকে শান্ত শিব সুন্দর যেন সার্থক ক'রে তুলত, মনে হ'ত নীড়ান্বেষী পাখির সবিরাম ডাক যেন অধরার উদ্দেশে গায়ত্রী উচ্চারণ করছে; সান্ধ্য সমীরণে একটা কার অবেদ্য আহ্বান প্রচারিত হ'ত, যেটা উপলব্ধি করার পরে মানুষের বুদ্ধিকে লাগত অপোগণ্ডের বাচালতার মতো। ওই পলাতক সূর্য, ওই দিগন্তব্যাপ্ত প্রান্তর, এই স্তব্ধ পাহাড়,

এদের জন্ম মনুষ্যজাতির কোটি-কোটি বৎসর পূর্বে ; মনুষ্যজাতির সর্বশেষ স্মৃতিটুকু অবলুপ্ত হবার কোটি-কোটি বৎসর পরেও এরা নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকবে, এদের সামনে মানুষের বুদ্ধি আস্ফালন করবে কোন্ সাহসে? ক্রমশ তরুণের মাথা একটা অনন্ত অক্ষমতার ভারে যেন ধরিত্রীর পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ত, এবং অন্তর্হিত সূর্যের অন্তিম রশ্মি যখন তার নতমুখে রক্তিমা লেপে দিত, তখন বোধ হ'ত, আত্মধিক্কারের দুর্দম তাড়নে সে যেন কোন্ নামহীন দেবতার কাছে ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা চাইছে।

কিন্তু এইরকম জাদু বেশিক্ষণ টিঁকত না, শরতের বেগবান্ অন্ধকার শাশ্বতের প্রতীকগুলোকে ঘেরাটোপে ঢেকে দিত এবং সদ্যোত্থিতের মতো তরুণ ব'লে উঠত, 'না, না, কারো মোহই আমি মানব না, বুদ্ধি দিয়ে যে-রূপকে ধরতে পারা যায় না, কাজ নেই আমার সে-রূপে, সে-রূপ ব্যথায় ভরা, তার মধ্যে আনন্দ নেই।'

তারপরে নীরবে আমরা বাড়ি ফেবায় প্রবৃত্ত হতুম। মধ্যপথে পিতৃদেব যদি বলতেন, 'কিন্তু, তরুণ, বুদ্ধি দিয়ে স্বভাবকে পাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য মানব-জীবনকেই যে ন্যায়ের বিধান মানানো যায় না।' তাহ'লে অস্বাভাবিকরকমের হিংস্র স্বরে তরুণ জবাব দিত, 'বেঁচে থাকা সেইজন্যেই তো এত দুঃসাধ্য।'

কিন্তু আমার খামখেয়ালি স্মৃতি কাহিনীর অবাধগতিতে বিঘ্ন আনছে মাত্র। পঞ্জিকার হিসেবে উপরোক্ত তর্কের স্থান অনেক পরে। দিন গণনা করলে দেখা যাবে তরুণের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের এখনো মা-তিনেক বাকি, সে এখনো কলকাতায়, উধাও মালতীর অনুসন্ধানে আত্মহারা। কারণ, মালতী তার কথার অন্যথা করেনি ; পরের দিন ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীগৃহে ফিরেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তরুণ নিঃসন্দেহ বুঝলে যে মালতী চ'লে যাবে, তবু সে তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলে না। এমন-কি পরের দিন প্রত্যুষে বাড়ির মধ্যে একটা অনভ্যস্ত আন্দোলনের ফলে যখন তরুণের শ্রান্ত নিদ্রা ভাঙল, তখনো বিছানা ছেড়ে মালতীকে বাধা দেবার মতো শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারলে না। পঙ্গুবৎ শয্যায় শুয়ে সে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে অনুভব করলে যে, তরুণ নামক একটি প্রাণীর একটা কী ভীষণ সর্বনাশ ঘটছে ; কিন্তু তাতে আর তরুণেতে যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, এ-কথা মুহূর্তের জন্যেও তার মনে উদয় হ'ল না। স্পর্শহর ঔষধের সাহায্যে সচেতন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করলে যেমন অবস্থা হয়, তরুণের অবস্থা তখন সেইরকমের ; অথবা তার অবস্থাকে পূর্ণ মত্ততার পূর্বাবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে : তার মন তখন বৈদেহ, কাজেই দেহের আচরণের জন্যে সে নিজেকে অপদস্থ মনে করতে অপারগ এবং অনিচ্ছুক।

তারপরে, মালতীর গাড়ির আওয়াজ যখন প্রভাতিক স্তব্ধতার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তখন তরুণ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলে যে তার অন্তরের অন্তঃপুর মরণের নিশ্চল ছায়ায় বিভীষিকাময় হ'য়ে উঠেছে, সে-রিক্তপুরী বিধবার মত্ত হাহাকারে মুখরিত, গলিত শবের পূতিগন্ধে বিষাক্ত ;[...।]

[অসম্পূর্ণ]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

গ ল্প সং গ্র হ

অনুবাদ গল্প

রূপকথা

আমার ব্রহ্ম-বিতর্কের খাতা যখন ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে চলল, তখন তার যে-শোভা দেখেছিলুম, তা খুবই বিরল। সেটা ডুবল প্রথমে একখানা কালো শ্লেটের মতো ; কিন্তু অবিলম্বেই তার পাতাগুলো খুলে গেল—হাল্‌কা সবুজ পাতা, কেঁপে-কেঁপে নীলে বদ্‌লে যাচ্ছে। থেকে-থেকে কেতাবখানা হারায়, থেকে-থেকে তার প্রসারে অসীমের জাদু লাগে, আবার মাঝে-মাঝে তাকে বই ব'লেই চিনি, কিন্তু বিরাট বই, সমস্ত জ্ঞান-নির্ঘণ্টের চেয়েও বিপুলায়তন। নিচে পৌঁছতে তার কুহক যেন আরো বাড়ল, এবং একমুঠো বালি তার অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তাকে চোখের আড়াল করলে। কিন্তু কিছু পরেই পুঁথিটা আবার নজরে এল,—সাধারণ খোলা পুঁথি চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, কেবল তার পাতাগুলো কার অদৃশ্য অঙ্গুলিস্পর্শে মৃদুসঞ্চালিত।

পিসিমা বললেন, 'আসলে আক্ষেপের কথা এই যে তুমি কোনোমতেই ঘরে ব'সে কাজ সারবে না। তাহ'লে ঝাড়া হাত-পায়ে আমোদ করাও হ'ত, এমন দুর্ঘটনাও কিছুতেই ঘটতে পারত না।'

পাদ্‌রি সাহেব ইনিয়ে-বিনিয়ে আবৃত্তি করলেন, 'কিছুই তাহার অধিকার নাহি রবে, অরূপরতনে সবই পরিণত হবে' ; এবং চমক ভেঙে তাঁর ভগ্নী যোগ দিলেন, 'ও কী! খাতাখানা যে জলে পড়ল!' আর মাঝিরা? তাদের একজন হেসে ফেললে, এবং অন্যজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ছাড়তে লাগল।

কর্নেল সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ! লোকটা পাগল নাকি?'

পিসিমা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে কৃতজ্ঞতা জানাও, অর্থাৎ বলো যে অতটা দয়ার আজ প্রয়োজন নেই ; হয়তো ভবিষ্যতে—।'

আমি অনুযোগের স্বরে জবাব দিলুম, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমার যে খাতাখানা ফেরৎ চাই। ওটা আমার ফেলোশিপ পরীক্ষার নোট। ভবিষ্যতে কি আর ওর কিছু বাকি থাকবে?'

কে এক ভদ্রমহিলা ছাতার আড়াল থেকে প্রস্তাব করলেন, 'আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। এই স্বভাবশিশুটি বরং জলে নেমে বই উদ্ধার করুক, আর আমরা ইতিমধ্যে অন্য গুহাটা দেখে আসি। এই পাহাড়টায় কিংবা ভিতরে ওই পাথরের ফলকে ওকে নামিয়ে দেওয়া যাক্, আমরা ফিরতে-ফিরতে ও কাজ গুছিয়ে রাখবে।'

যুক্তিটা ভালোই লাগল, এবং আমি তার সংস্কার করলুম এই ব'লে যে আমাকেও ছেড়ে

নৌকার ভার কমবে। ফলে আমরা দু-জনেই ছোটো গহ্বরটার বাইরে একখানা প্রকাণ্ড রৌদ্রোজ্জ্বল পাথরে স্থান পেলুম। আশ্চর্য সে-পাথরখানা, যেন গুহাভ্যন্তরীণ বর্ণসঙ্গীতের প্রহরী ; আরো অনির্বচনীয় ভিতরকার বর্ণবিন্যাস যাকে শব্দাভাবে নীলই বলতে হয়, যদিও সে-নীল নির্মলতারই নির্যাস। সে-রকম নির্মলতা হয়তো গৃহস্থের পরিমার্জিত ভদ্রাসনেই জন্মায়, কিন্তু তার পরিণতি পারমার্থিক পরাকাষ্ঠায়, সাত সমুদ্রকে একত্র করলে, তবে তেমন ভাস্বর নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ মেলে। কাপ্রির নীল গুহার নীল জল পরিমাণে অনেক বেশি বটে, কিন্তু রঙে আরো গাঢ় নয়। সে সাধারণ রঙে, সে সামান্য সত্তায় ভূমধ্যসাগরের সকল গুহাই উত্তরাধিকারী ; যেখানেই সূর্যের আলো পৌঁছয় আর সমুদ্রের স্রোত বয়, সেখানেই সেই নির্বিশেষ নীলের পর্যাপ্তি।

সে যাই হোক্, নৌকো চ'লে যেতেই বুঝলুম যে একখানা ঢালু পাথরের ধারে একজন অপরিচিত সিসিলিয়ানের হাতে নিজেকে অসহায় অবস্থায় সঁপে দিয়ে অত্যন্ত বোকামি করেছি। কারণ আমার সঙ্গী যেন মুহূর্ত-মধ্যে অতিজীবন্ত হ'য়ে উঠল, এবং আমার হাত ধ'রে টানতে-টানতে দ্রুত স্বরে বললে, 'গুহার শেষে যান দিকি, একটি চমৎকার দৃশ্য দেখবেন।'

তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হ'য়ে, একপ্রস্থ জ্বলন্ত জল ডিঙিয়ে, পাহাড় ছেড়ে পাড়ের উপর লাফ দিলুম। তারপর আলো থেকে সরিয়ে এনে সে আমাকে ছায়ার মধ্যে যেখানে দাঁড় করালে তার প্রত্যন্তে এক ফালি বালির চড়া গুঁড়ো পান্নার মতো উঁকি পাড়ছিল। সেখানে আমায় তার কাপড়চোপড়ের জিম্মেয় রেখে সে ত্রস্ত পদে আবার গুহামুখের পাথরটায় ফিরে গেল, এবং সূর্যালোকে নিমেষকাল নগ্নদেহে দাঁড়িয়ে, নিচে চেয়ে একবার দেখে নিলে পুঁথিখানা কোথায় প'ড়ে আছে ; তারপর কপালে ক্রুসচিহ্ন এঁকে, ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলে।

বইখানা বিস্ময়কর ঠেকেছিল, মানুষটিকে লাগল বর্ণনার অতীত। মনে হ'ল সমুদ্রগর্ভে সে বুঝি এক সচেতন রজতপ্রতিমা, নীল আর সবুজের পুলক যার সর্বাঙ্গে জীবনসঞ্চার করেছে। কিন্তু সেই অসীম আনন্দের ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, প্রাণময় পুরুষটিই যে মুহূর্ত-মধ্যে আমার ব্রহ্ম-বিতর্কের খাতাখানা দাঁতে ধ'রে রৌদ্রদগ্ধ সজল শরীরে অতল থেকে উঠে আসবে এমন সম্ভাবনাও সে-সময়ে আমার মনে জাগেনি।

এইরকম ডুবুরিরা সাধারণত দক্ষিণার প্রত্যাশী। আমি যাই দিই-না-কেন, সে নিশ্চয়ই তার বেশি চাইবে ; অথচ সেই সুন্দর, যদিও জনশূন্য, স্থানে তর্ক করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। কাজেই সে যখন আলাপ জমাবার স্বরে বললে, 'এমনতর জায়গায় অপ্সরী সন্দর্শনও সম্ভব', তখন আমি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলুম।

সে যে পরিবেষ্টনের সঙ্গে এমনভাবে নিজের সুর মিলিয়ে নিয়েছে, তাতে তার উপরে খুশি না-হ'য়ে পারলুম না। সঙ্গীরা যে-মায়ালোকে আমাদের ছেড়ে গিয়েছিল, সেখানে বস্তু-নামক আষ্টপ্রহরিক উৎপাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সমুদ্র সে নিভৃত জগতের ভিত্তি, তার প্রাকার ও পটল সমুদ্র-প্রতিবিম্বিত বেপমান শিলারাশি। সেখানে এক কবিকল্পনা ভিন্ন অন্য সমস্তই দুর্বিষহ। সুতরাং আমিও তার খেয়ালের প্রতিধ্বনি ক'রে বললুম, 'এখানে অপ্সরী সন্দর্শন

শুধু সম্ভব নয়, সহজও বটে।'

কাপড় পরতে-পরতে বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাইতে লাগল। বালির উপরে ব'সে আমি ব্যাপৃত হলুম আমার চট্‌চটে খাতাখানার পাতা ছাড়াতে।

অবশেষে সে আবার বললে, 'তাহ'লে গতবছর যে-বইটা বেরিয়েছিল, তা আপনিও হয়তো পড়েছেন। কে জানত, এ-দেশের অপ্সরী বিদেশীদেরও টানে!'

(পরে কেতাবখানা আমি পড়েছি। তরুণীটির ছবি ও গানের কথাগুলি থাকা সত্ত্বেও, সে-বিবরণ স্বভাবতই অসম্পূর্ণ।)

'তিনি এই নীল জল থেকেই ওঠেন, নয় কি? তারপর গুহামুখের পাথরে ব'সে চুল আঁচড়ান', এই ব'লে আমি গল্পের প্রস্তাবনা করলুম।

তার হঠাৎ-গাম্ভীর্যে আমার ঔৎসুক্য জেগেছিল ; ইচ্ছা হ'ল ফুস্‌লিয়ে তার মনের খবর বের করি, কারণ তার শেষ কথাগুলোর মধ্যে একটা বিদ্রূপের ইঙ্গিত ছিল, যার রহস্য আমি ঠিক বুঝলুম না।

সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তাঁকে কখনো দেখেছেন?'

'লাখোবার।'

'আমি, একবারও নয়।'

'কিন্তু তুমি তো তাঁর গান শুনেছ?'

সে কোট প'রে অধীর স্বরে বললে, 'জলের নিচেই গাইবেন? কে পারে? কখনো-কখনো গাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তার ফলে মস্ত-মস্ত বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।'

'পাহাড়ের উপরে চ'ড়ে বসলেই হয়।'

সে একেবারে চ'টে জবাব দিলে, 'কী ক'রে? পাদ্‌রিরা হাওয়াকে জাদু করেছে, তাঁর নিঃশ্বাস নেওয়া বারণ ; পাথরগুলোর শুদ্ধি হয়েছে, ওতে বসা নিষেধ। মানুষ কেবল সমুদ্রকে মন্ত্রপূত করতে পারে না, কারণ তার কোথাও শেষ নেই। তাই সমুদ্রেই তাঁর বাস।'

আমার উত্তর জোগাল না।

ফলে তার মুখের ভাব একটু নরম হ'ল। সে আমার দিকে এমন ক'রে চাইলে যেন তার মনে কী একটা লুকিয়ে আছে। তারপর গুহামুখের পাথরটার উপরে গিয়ে সে কিছুক্ষণ বাইরের অসীম নীলের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, এবং খানিক বাদে ভিতরের প্রদোষান্ধকারে ফিরে এসে হঠাৎ ব'লে উঠল, 'সাধারণত সৎলোকেই তাঁকে দেখতে পায়।'

আমি কোনো মন্তব্য করলুম না। তখন নীরবতা ভেদ ক'রে সে আবার বলতে লাগল, 'এই নিয়মটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত, পাদ্‌রিরাও এর মানে বোঝে না ; কেন-না অপ্সরী নিজে নেহাৎই মন্দ। যারা রীতিমতো ব্রত-উপবাস করে, শুভদিনে গির্জেয় যায়, বিপদ শুধু তাদেরই নয়, এমন-কি যারা আটপৌরে ভালোমানুষ, নিতান্ত গোবেচারা, আশঙ্কা বেশি তাদেরই। গত দু-পুরুষের মধ্যে গ্রামের কেউই তাঁকে দেখেনি, না-দেখাই স্বাভাবিক, কারণ জলে নামার আগে আমরা সকলেই কপালে ক্রুসচিহ্ন আঁকি। কিন্তু অত সাবধান হওয়ার দরকার নেই। জুসেপের বেলায় তো আমরা কেউ কখনো স্বপ্নেও ভয় পাইনি। অবশ্য আমরা প্রত্যেকেই

তাকে পছন্দ করতুম, আর আমাদের অনেককেই তারও লাগত ভালো। কিন্তু ভালোবাসা কখনোই ভালো হওয়ার সমান নয়।'

জুসেপে কে, জিজ্ঞাসা করলুম।

'সে অনেক দিনের কথা—আমার বয়স তখন সতেরো আর দাদা কুড়ি পেরিয়ে আমার চেয়ে আরো বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। সেইবারেই বিদেশীরা এ-অঞ্চলে প্রথম আসতে শুরু ক'রে আমাদের গ্রামের ভোল ফিরিয়ে দেয়। এই উন্নতি আর অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে আমরা প্রধানত এক ঘরোয়ানা ইংরেজ মহিলার কাছেই ঋণী। তিনি আমাদের বিষয়ে বই লিখেই থামেননি, আমাদের সংস্কার-সমিতির গোড়াপত্তনও তাঁরই চেষ্টার ফল।'

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, 'এ-গুহার মধ্যে সে-ভদ্রমহিলার কথা পেড়ে কাজ নেই।'

'সেদিন তাঁকে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আমরা গুহা দেখাতে যাচ্ছিলুম। নৌকো যখন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছে, তখন সকলকে চমকে দেবার ইচ্ছে, আর-পাঁচজনের মতো, আমিও খালি হাতে একটা ছোটো কাঁকড়া ধ'রে, তার দাঁড়া উপড়ে, তাঁদের সামনে ধরলুম। ফলে মেয়েরা সবাই কাৎরাতে লাগল, কিন্তু ভদ্রলোকটি খুশি হ'য়ে আমায় বক্‌শিস্ দিতে চাইলেন। আমি তখনো পাকিনি, তাই তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিলুম এই ব'লে যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, সেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! আমার পিছনে ব'সে দাঁড় টানছিল জুসেপে; এই ব্যবহারে চ'টে গিয়ে, সে এত জোরে আমাকে এক চড় কষিয়ে দিলে যে দাঁতে ঠোঁট কেটে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল। আমিও তাকে ঘুরিয়ে মারবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত চট্‌পটে, আমি ফিরতে না-ফিরতেই আমার বগলে সে এমন এক লাথি চালালে যে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকো টানাও আমার সাধ্যে কুলোল না। এই ব্যাপারে মেয়েমহলে মহাচেঁচামেচি শুরু হ'ল। পরে শুনেছি, দাদার অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে আমাকে ওয়েটারের কাজ শেখানোর জল্পনা-কল্পনাতেও তাঁরা তখুনি মেতেছিলেন। ভাগ্যিস, সেটা আর কোনোদিন ঘ'টে ওঠেনি।

'আমরা যখন গুহায় পৌঁছলুম—এটা নয়, একটা আরো বড়ো গুহায়—তখন ভদ্রলোকটির হঠাৎ শখ হ'ল যে আমাদের মধ্যে একজন কেউ জলে ডুবে টাকা কুড়োই। মেয়েমাত্রেই মাঝে-মাঝে লজ্জার মাথা খায়, তাই এ-ক্ষেত্রেও তাঁরা আপত্তি তুললেন না। কিন্তু জুসেপে আবিষ্কার করেছিল যে আমাদের জলে নামতে দেখলে বিদেশীরা বিশেষ আমোদ পায়; কাজেই রুপো ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে সে ডুব দিতে রাজি হ'ল না। ফলে ভদ্রলোকটি একটা ডবল লিরা ছুঁড়ে ফেললেন।'

'ঝাঁপাবার ঠিক আগে আমার কালশিরা-পড়া গালে হাত দিয়ে অসহায়ভাবে কাঁদতে দেখে, দাদা হেসে বললে, 'যাক্, এবারে অন্তত আর অপ্সরীর নজরে আসব না।' তারপর কপালে ক্রুসচিহ্ন না-এঁকেই, সে জলে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেইবারেই সে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে।'

গল্প অসমাপ্ত রেখে, সে আমার দেওয়া সিগারেট নিলে। আমি গুহামুখের পাথরটার পানে তাকিয়ে দেখলুম, সেই মায়ামুগ্ধ জল থেকে ক্রমান্বয়ে বড়ো-বড়ো বুদ্বুদ ফুটে উঠে প্রবেশপথের দু-পাশকে আলোর ঝলকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

অবশেষে পদপ্রান্তের ছোটো ঢেউগুলোর উপরে সিগারেটের গরম ছাই ঝেড়ে, সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'দাদা টাকা না-নিয়েই ফিরে এলে। আমরা তাকে কোনোক্রমে টেনে নৌকোয় তুললুম। সে ফুলে এমনি প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছিল যে মনে হ'তে লাগল, সে যেন এক্‌লাই নৌকোখানা জুড়ে রয়েছে, এত ভিজে গিয়েছিল যে আমরা তাকে কাপড় পরাতে পারলুম না। এত ভিজে মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আমি আর সেই ভদ্রলোকটিই নৌকো নিয়ে এলুম, জুসেপেকে চটে মুড়ে কোণে হেলান দিয়ে বসালুম।'

আমি ভাবলুম, জুসেপের প্রাণহানিই হয়তো গল্পের মর্ম ; তাই আস্তে-আস্তে বললুম, 'আহা, বেচারা তাহ'লে ডুবে মারা গেল।'

সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে, 'নিশ্চয়ই না। এই-না বললুম, সে অপ্সরী দেখেছিল।'

আমায় আবার চুপ করতে হ'ল।

'দাদা বিছানা নিলে, যদিও তার শরীরে রোগের নামগন্ধ ছিল না। ডাক্তার এল, টাকা নিয়ে চ'লে গেল ; পুরুত এল, শান্তিজল ছিটিয়ে পালাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না ; সে যেমন প্রকাণ্ড, ঠিক তেমনটিই র'য়ে গেল। কী প্রকাণ্ড—যেন খানিকটা সমুদ্দুর! সান্ বিয়াজোর বুড়ো আঙুলের হাড় দাদাকে ছোঁয়ানো হ'ল, ফলে হাড় শুকোল না সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

আমি সাহস ক'রে শুধালুম, 'ফুলে তার চেহারা কীরকম হয়েছিল?'

'অপ্সরী দেখলে যেমন হয়। আপনি না তাঁকে "লাখোবার" দেখেছেন? তবে আবার জিগ্‌গেস করছেন কেন? ওঃ, কী দারুণ তার বিষণ্ণতা যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য সে ভেদ করেছে! জীবন্ত সকল কিছুর সংসর্গেই তার শোক উথ্‌লে উঠত, কারণ সে জানত যে শেষে সবাই মরবে। ঘুম ছাড়া আর কিছুতেই তার আগ্রহ ছিল না।'

আমি ভিজে খাতাখানায় মুখ গুঁজে রইলুম।

'দাদা কাজকর্মে ইস্তফা দিলে, সে খেতে ভুলে যেত, গায়ে কাপড় আছে কি-না তার মনে থাকত না। সব ভার এসে চাপল আমার ঘাড়ে, বোনকে চাকরি নিতে হ'ল। আমরা দাদাকে ভিখিরি সাজাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার সবল শরীর দেখে কারো দয়া জাগল না। তাকে হাবা ব'লে চালানোও অসাধ্য হ'ল, কারণ তার চোখে উপযুক্ত চাউনির অভাব ছিল। কাজেই দাদা শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকের মুখে তাকিয়ে থাকত, আর সে যতই চাইত, ততই তার কষ্ট বাড়ত। কারো ছেলে জন্মালে, সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকত, কেউ বিয়ে করলে, তার অবস্থা এমনি ভয়ঙ্কর হ'ত যে তাকে গির্জের বাইরে দেখে নবদম্পতিরা উঠত শিউরে। কে ভেবেছিল, সে আবার নিজেই বিয়ে করবে! আমি, আমিই সে-কাণ্ড বাধাই, আমিই একদিন তাকে খবরের কাগজ থেকে প'ড়ে শোনাই যে রাগুসার একটি মেয়ে সমুদ্রে নাইবার ফলে পাগল হ'য়ে গেছে। খবর পেয়েই জুসেপে বিছানা ছেড়ে উঠল, এক হপ্তা বাদে আবার যখন বাড়ি ফিরল, তখন তার সঙ্গে সেই মেয়েটি।

'সে নিজে আমায় কিছু বলেনি ; কিন্তু শুনেছি, দাদা সিধে গিয়ে মেয়েটির বাড়ি চড়াও হয় ; তারপর তার ঘরের দরজা ভেঙে তাকে লুটে আনে। মেয়েটির বাপ ছিল ধনী

খনিওয়ালা, কাজেই আমাদের সঙ্কট আপনি কল্পনা ক'রে নিতে পারবেন। এক ধূর্ত উকিলকে সঙ্গে নিয়ে, মেয়ের বাপ এসে হাজির হ'ল ; কিন্তু আমার মতো তাদের জারিজুরিও খাটল না। তারা বচসা করলে, ভয় দেখালে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও ফিরতে হ'ল খালি হাতে ; আমাদের কিছুই লোকসান,—অর্থাৎ অর্থদণ্ড, গেল না। আমরা জুসেপে আর মারিয়াকে গির্জেয় নিয়ে গিয়ে, তাদের বিয়ে দিয়ে আনলুম। হ্যাঁ! বিয়ে বটে! এমন বিয়ে যে তারপরে পাদ্‌রি সাহেব-সুদ্ধ একটা রসিকতা করলেন না, আর রাস্তায় বেরুতেই ছেলেরা ঢিল ছুঁড়তে লাগল। ... আমার মনে হয়, বৌদিকে সুখী করতে পারলে আমার মরতেও আক্ষেপ থাকত না ; কিন্তু সচরাচর যেমন দেখা যায়, এখানেও কারো কর্তাত্বি খাটল না।'

'তাহ'লে বেচারাদের ঘরকরনা সুখের হয়নি?'

'তারা দু-জনেই দু-জনকে খুব ভালোবাসত, কিন্তু ভালোবাসাই সুখ নয়। ভালোবাসা সব মানুষের কপালেই জোটে, তার কোনো দামই নেই। বরং এক বেকারের জায়গায় দু-জন আসাতে আমার খাটুনি বাড়ল! কারণ বৌদিও ছিল হুবহু দাদার মতো—তাদের মধ্যে কে কখন কথা কইছে, তা সুদ্ধ বোঝা যেত না। আমি বাধ্য হ'য়ে নিজেদের নৌকো বেচে, আজকের ওই-রাঘববোয়ালের তাঁবে চাকরি নিলুম। ক্রমশ আমরা সারা গ্রামের চক্ষুশূল হ'য়ে উঠলুম। প্রথমটা ছেলেদের বিদ্বেষ জাগল—যত হাঙ্গামের গোড়া ওইখানে—তারপর মেয়েদের, সব শেষে যোগ দিলে পুরুষেরা। কারণ যত অনর্থের মূল ছিল—দেখবেন, শেষকালে যেন বিশ্বাসঘাতক হবেন না!'

আমি পণবদ্ধ হ'তেই, সে স্কুলপালানো বেসহবত ছেলের মতো মুখ ছুটিয়ে দিলে, যাজকদের গাল পেড়ে বলতে লাগল, তাদের জন্যেই তার সারা জীবন অধঃপাতে গেছে। শেষে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এমনি ক'রে আজন্মকাল আমরা শুধু ঠ'কেই আসছি', এবং তার উত্তেজিত পদাঘাতে বালি উড়ে, গুহামধ্যের নীল তরঙ্গভঙ্গকে চোখের আড়াল করলে।

আমিও কেমন বিচলিত হ'য়ে পড়লুম, অনুভব করলুম যে শত অসম্ভাব্যতা ও কুসংস্কার সত্ত্বেও জুসেপের গল্প যথার্থ, এতদিন সংসার সম্বন্ধে যত কথা শুনেছিলুম, সে-সমস্তের চেয়ে নিগূঢ়তরভাবে যথার্থ। জানি না কেন, হঠাৎ আমার মনে জাগল পরোপকারের আকাঙ্ক্ষা, যেমন দুর্দাম, তেমনি নিষ্ফল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে ঘোর কাটল অচিরেই।

'বৌদির সন্তানসম্ভাবনাই হ'ল সোনায় সোহাগা। লোকে বলতে শুরু করলে, "তোমার সোনারচাঁদ ভাইপোটি কবে জন্মাচ্ছে? এ-রকম বাপ-মায়ের সন্তান নিশ্চয়ই খুব হাসিখুশি, নিশ্চয়ই খুব টুক্‌টুকে হবে।" আমি কোনো মুখভঙ্গি না-ক'রেই জবাব দিতুম, "সেটা হওয়াই খুব সম্ভব। দুখের চূড়াই সুখের গোড়া" — ওটা আমাদের একটা প্রবাদ। কিন্তু আমার উত্তরে তাদের ভয় বাড়ত বই কমত না ; তারা গিয়ে নালিশ জুড়ত পাদ্‌রিদের কাছে, তখন পাদ্‌রিরাও আবার প্রমাদ গণতেন। এমনি ক'রে ক্রমশ একটা গুজব কানাঘুষোয় রটতে লাগল যে সেই ছেলেটাই স্বয়ং কল্কি। একেবারে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। ভয় নেই, বেচারা ভূমিষ্ঠই হয়নি।

'হঠাৎ একদিন এক বুড়ি ডাইনি ভবিষ্যদ্‌বাণী শুরু করলে, কেউ তাকে বাধা দিলে না।

সে বলতে লাগল যে দাদা-বৌদিকে পেয়েছে বোবা ভূতে, তাদের দ্বারা খুব বেশি অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। কিন্তু ছেলেটা মুখে ওলোপ [কুলুপ] দিয়ে থাকবে না ; সে হেসে-হেসেই দেবে সকলকে বিগড়ে। তারপর একদিন যখন সমুদ্র সেঁচে সে অপ্সরীকে ডাঙায় তুলে আনবে, তখন মানুষের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচবে একসঙ্গে। অপ্সরী একবার গান ধরলে, কে আটকাবে দ্বাদশ সূর্যের উদয় ? তখন পোপ যাবেন মারা. মন্‌জিবেলোতে জ্বলবে আগুন, পুড়ে ছাই হবে সান্তা আগাতার ওড়না। তখন অপ্সরীকে বিয়ে ক'রে সে পৃথিবীতে পাতবে তাদের অবিনশ্বর যৌথ রাজ্য। '

'সারা গ্রামে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল ; তখন যাত্রীর মরশুম, কাজেই হোটেলওয়ালারা ভয় পেলে। তারা একজোটে সাব্যস্ত করলে যে ছেলে না-হওয়া পর্যন্ত দাদা-বৌদিকে বাইরে-বাইরে কাটাতে হবে, খরচের টাকা উঠল তাদেরই চাঁদায়। যাত্রার আগের রাত্রে পূর্ণিমার আকাশ পুবে হাওয়ায় নির্মল হ'য়ে গেল, আর রূপালি মেঘের মতো সমুদ্রের ঢেউ উথলে উঠতে লাগল পাহাড়ের ধারে-ধারে। সে-দৃশ্য চিরদিনই অপরূপ সুন্দর ; তাই মারিয়া বললে, সেটা আরেকবার না-দেখে সে কিছুতেই যাবে না।

'আমি বললুম, "কাজ নেই, একটু আগে একজন কার সঙ্গে পাদ্‌রি সাহেবকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছি। তাছাড়া হোটেলওয়ালারা চায় না যে লোকে তোমায় দেখে, তাদেরও চটালে আমাদের অনাহারেই মরতে হবে।"

'বৌদি বললে, "আমি যাবই। সমুদ্রে ঝড় এসেছে, এমন রাত আর হয়তো কপালে জুট্‌বে না।"

'জুসেপে বললে, "না, যেও না, ও ঠিকই বলছে। তবে যদি একান্তই যাও, তাহ'লে আমাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলো।"

'কিন্তু বৌদি জবাব দিলে, "আমি একলা যেতে চাই।" গেলও একলাই।

'তাদের যৎসামান্য মালপত্র আমি একখানা ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধতে বসলুম। কিন্তু অল্পক্ষণেই তাদের হারাবার আশঙ্কায় আমার মেজাজ এমনি খারাপ হ'য়ে উঠল যে আমি কাজ ফেলে, দাদার পাশ ঘেঁষে না-ব'সে পারলুম না। ক্রমশ আমার হাত দাদার কাঁধে তুলে দিলুম, আর সে-ও আমায় ধরলে তার হাতে ঘিরে। এক বৎসর যাবৎ এতখানি ভালোবাসা সে আমাকে একবারও দেখায়নি ; কাজেই আস্তে-আস্তে আমাদের মন থেকে সময়ের হিসেব মুছে গেল।

'হঠাৎ আপনা থেকে দরজাটা খুলে গিয়ে ঘরের মধ্যে একত্রে ঢুকল জ্যোৎস্না আর হাওয়া, আর সেইসঙ্গে ছোটো ছেলের গলায় বাইরে থেকে কে একজন হেসে বললে, "পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে দিয়েছে তাকে সমুদ্রে ফেলে।"

'যে-দেরাজে আমার ছোরা-ছুরি থাকত, চট্ ক'রে উঠে আমি তার সামনে দাঁড়ালাম।

'জুসেপে, এত লোক থাকতে স্বয়ং জুসেপে, বললে, "বোস শীগ্‌গির। ও তো মারা গেছেই, তাই ব'লে কি অন্যদেরও প্রাণদণ্ড হবে?"

'আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "লোকটা কে, আমি আন্দাজ করতে পারছি, তাকে খুন করবই।"

'আমি প্রায় ঘর থেকে বেরিয়েছি, এমন সময় দাদা ল্যাং মেরে আমায় ফেলে, আমার বুকে হাঁটু চেপে বসল ; তারপর আমার হাত ধ'রে কব্‌জিদুটোকে দিলে মুচ্‌ড়ে—একে-একে, প্রথমে ডান, তারপরে বাঁ। জুসেপে ছাড়া আর কারো মাথায় এই মৎলব আসত না। আমার কী ভয়ানক লেগেছিল, তা আপনি ভাবতে পারবেন না, আমি জ্ঞান হারালুম। যখন চৈতন্য ফিরল, তখন দাদা উধাও হয়েছে ; তাকে আর দেখতে পাইনি।'

কিন্তু জুসেপেকে আমার আর সইছিল না।

সে আবার বললে, 'বললুম তো দাদা মোটেই ভালোমানুষ ছিল না। সেইজন্যেই কেউ কখনো কল্পনাও করেনি যে অপ্সরী সন্দর্শন ঘটবে তারই বরাতে।'

'কী ক'রে জানলে যে জুসেপে তাঁর দেখা পেয়েছিল?'

'কারণ তাঁকে "লাখোবার" দেখেনি, মাত্র একটিবার প্রত্যক্ষ করেছিল।'

'কিন্তু সে যদি এতই মন্দ, তবে তাকে ভালোবাস কেন?'

লোকটি এইবার প্রথম হাসলে, সেই হাসি ছাড়া তার কাছে আর অন্য জবাব পেলুম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে কি এইখানেই গল্পের শেষ?'

'বৌদিকে যে খুন করেছিল, তাকে আমি মারতে পারিনি ; আমার কব্‌জি সারবার আগেই সে আমেরিকা পালাল ; তাছাড়া যাজকহত্যা নিষিদ্ধ। আর জুসেপে? সে-ও সারা জগৎ ঘুরে বেড়াল, যার ভাগ্যে অপ্সরী সন্দর্শন ঘটেছে, এমন একজন পুরুষ বা মেয়ের খোঁজে। অবশ্য, সেইরকম কোনো মেয়েকেই সে বেশি চেয়েছিল ; কারণ তাহ'লে হয়তো তখন সেই ছেলের জন্ম সম্ভবপর হ'ত। কিন্তু দাদার আশা মেটেনি। শেষকালে সে লিভারপুলে,—পাড়াটা কি নেহাৎ আজগুবি শোনাচ্ছে?—এসে কাশির সঙ্গে রক্ত তুলতে-তুলতে মারা গেল।

'আমি মনে করি না, আজ এমন মানুষ জীবিত আছে যে সত্যিই অপ্সরীকে দেখেছে। একপুরুষে একাধিক লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বড়ো একটা ঘটেনি। অন্ততঃপক্ষে আমার জীবদ্দশায় এমন এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ নিশ্চয়ই জুটবে না, যারা সেই কুমারসম্ভবের উপলক্ষ হবে। সমুদ্র থেকে অপ্সরীকে ডেকে এনে পৃথিবীর মৌন বিনাশ করবে যে জগত্রাতা, তাকে দেখা আমার অদৃষ্টে নেই।'

আমি চম্‌কে উঠলুম। 'জগত্রাতা? ভবিষ্যদ্‌বাণীর শেষে কি ও-কথাও ছিল?'

সে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, এবং অজস্র প্রতিবিম্বের নীলাভ সবুজ রং ভেদ ক'রে আমি দেখলুম তার মুখে উত্তেজনার লালিমা লেগেছে। শুনলুম, সে বলছে, 'মৌন জনশূন্যতারও নিশ্চয়ই শেষ আছে। এ-অত্যাচার একশো বছর টিঁকতে পারে, হাজার বছর চলতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের আয়ু আরো দীর্ঘ ; সেই চিরস্থায়ী জলে যাঁর বাস, তাঁর গানকে চিররুদ্ধ করে, এমন শক্তি মানুষের নেই।' আমি তাকে আরো অনেক কথা শুধাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সারা গুহাটা অন্ধকার ক'রে আমাদের প্রত্যাগত নৌকা সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে ঢুকে পড়ল।

[E. M. Forster প্রণীত 'The Story of the Siren' নামক ইংরেজি গল্পের অনুবাদ।]

ভালোবাসা

জাহাজঘাট থেকে যে-রাস্তাগুলো খাড়া শহরের মুখে চ'লে গেছে, তাদের একটার মাঝ-বরাবর ৪৭ নম্বর বাড়িখানা নদী থেকে আসতে ডানহাতে পড়ে। এই পাট্‌কিলে রঙের সরু ইমারতটা এতই নগণ্য যে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তাকে চেনাই দায়। তার নিচের তলায় একটা ছোটো দোকানঘর, সেখানে রবারের বর্ষাতি জুতো আর কডলিভার অয়েল কেনা যায়। তারপর দেউড়ি পেরোলে একটা উঠান যেথায় পাড়ার উঞ্ছ বিড়ালগুলো শিকার খোঁজে। উঠানের ওদিকে জীর্ণ কাঠের অপ্রশস্ত সিঁড়িটা দারিদ্র্যের অকথ্য দুর্গন্ধে ভেপ্‌সে উঠেছে। দোতলার বাঁহাতে এক ছুতোরের বাস আর ডানহাতে এক ধাত্রীর, তেতলার একপাশে একজন মুচির আশ্রয় এবং অন্যধারে যে-মহিলাটি থাকেন, সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনলেই তাঁকে গানে পায়। চৌতলার বাঁদিকটা খালি, কিন্তু ডানদিকে মিস্তার্নিকেল পদবীধারী এক ভদ্রলোকের বাসা, যার নিজ নাম টোবিয়স্‌। এই লোকটির প্রসঙ্গে একটা আজব গল্প প্রচলিত আছে। সেটা বলা দরকার, কারণ তা শুধু সমস্যামূলক নয়, অভাবনীয়-রকমের লজ্জাকরও বটে।

মিস্তার্নিকেল-এর বহির্ভাগ যথার্থই অবিস্মরণীয়, যেমন বিসদৃশ, তেমনি হাস্যকর। তাকে যখন বেড়াতে দেখা যায়, তখন তার আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা থাকে, এবং একটা কালো বেতের উপরে সেই লম্বা রোগা দেহটার সমস্ত ভার চাপিয়ে সে আপন মনে এগিয়ে চলে। তার সাবেকিধরনের টুপিটা ঠিক একটা ঘণ্টার মতো, বেজায় উঁচু আর বিষম এবড়ো-খেবড়ো ; তার কোটের ঝুল যদিও হাঁটু পর্যন্ত, তবু গায়ে সেটা নেহাৎ আঁটো-সাঁটো আর বয়সের গুণে দারুণ চক্‌চকে ; এবং তার পাজামা-জোড়া কদর্যতায় এই কোটেরই সমকক্ষ বটে, কিন্তু লম্বায় এতই খাটো যে তাতে তালি-লাগানো বুট-দুপাটিও চাপা পড়ে না। তাহ'লেও এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে এই অদ্ভুত বেশভূষার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত যত্নবান্‌। নিচু কলারের ভাঁজে গজিয়ে উঠে তার লম্বা গলা আরো লম্বা দেখায়, শাদা চুলগুলোকে সন্তর্পণে আঁচড়ে সে কপালের উপরে তুলে রাখে, এবং তার তাল গাছ্‌-প্রমাণ টুপির কিনারা থেকে যে-মুখখানা উঁকি মারে, তা ফ্যাকাসে আর টোল-খাওয়া হ'লেও তাতে মসৃণ ক্ষৌরকার্যের অভাব নেই। তার ফোলা-ফোলা চোখদুটো মাটি ছেড়ে বড়ো একটা উপরে তাকায় না, একজোড়া গভীর খাত তার নাক বেয়ে ঢালু ঠোঁটের দু-কোণে মেশে, এবং এর ফলে তার বিরস মুখের অটুট বিষাদ বাড়ে বৈ কমে না।

মিস্ডার্নিকেল কদাচিৎ বাড়ির বার হয়, এবং এর একটা কারণও আছে। সে রাস্তায় পা দিলেই একপাল ছেলে তার পেছু নেয়, এবং হাসতে-হাসতে, ছড়া কাটতে-কাটতে, এমন-কি তার জামার পাড় টানতে-টানতে অনেক দূর পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে। এইসময়ে আশপাশের দরজা-জানলাগুলোতে বয়স্থ দর্শকেরাও যেকালে ভিড় জমায়, তখন এ-দৃশ্য তাদের নিশ্চয়ই উপভোগ্য ঠেকে। সে নিজে কিন্তু কোনোদিনই আত্মরক্ষায় উৎসাহ দেখায় না, লাজুক চোখে চারপাশে চাইতে-চাইতে, কাঁধ উঁচিয়ে, মাথা বাড়িয়ে, কেবলই হন্‌হনিয়ে হাঁটে, হঠাৎ যেন বিনা-ছাতায় বৃষ্টির মধ্যে পড়েছে; এবং লোকে যদিও তার সাক্ষাতেই হাসে, তবু একে, ওকে, তাকে সদরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সে সর্বদা বিনম্র সৌজন্যে তাদের অভিবাদন জানায়। তারপর ছেলেরা যখন পিছিয়ে যায়, এবং সে পৌঁছয় এমন কোনো অজানা পল্লিতে যেখানে দু-একজনের বেশি তার দিকে ফিরে তাকায় না, তখনও তাদের আচার-ব্যবহার বিশেষ বদলায় না, তখনও সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চেয়ে খেদানো কুকুরের মতো উর্ধ্বশ্বাসেই চলে, তখনও মনে হয় হাজার জোড়া চোখের বিদ্রূপ তারই উপরে ন্যস্ত। সেইসময়ে তার দ্বিধাদুর্বল চোখে নজর করলে বোঝা যায় যে মানুষের সঙ্গে অচপল দৃষ্টি-বিনিময়ে সে অক্ষম, এমন-কি শান্ত, সুস্থ অবস্থায় জড়বস্তুর পর্যবেক্ষণও তার অসাধ্য। অনুমানটা যদিও আজগুবি শোনায়, তবু তার সমস্ত হাবভাবে কেবল এই কথাই ফুটে ওঠে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের মানবোচিত উৎকর্ষে সে বঞ্চিত, সাধারণ মানুষ যে-চোখে জগৎপ্রপঞ্চ দেখে, তা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সম্ভবত সে নিজে মানে যে প্রত্যক্ষমাত্রেই তার অগ্রগণ্য, এবং এইজন্যে তার আতুর দৃষ্টি জীব ও জড়ের মুখে আত্মগ্লানির কারণ সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত।

এই চিরনিঃসঙ্গ ও অদ্বিতীয় দুঃখী মানুষটি কোন্ ঘটনাচক্রে চালিত? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ তাকে মোটেই মানায় না, এবং থেকে-থেকে সে এমন সাবধানে নিজের দাড়িতে হাত বুলোয় যে মনে হয় যাদের মধ্যে তার বসতি আপনাকে তাদের দলভুক্ত ব'লে চালাতে সে কোনোমতেই রাজি নয়। ভগবানই জানেন অদৃষ্টের কোনো খামোখা খেয়ালে সে বিড়ম্বিত কি-না। তাকে দেখলে লাগে যেন জীবন অবজ্ঞার হাসি হেসে তার গালে এক বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়েছে! কিন্তু এ-ও হ'তে পারে যে কোনো দৈবদুর্বিপাকই সে আজ পর্যন্ত পোহায়নি, সর্বনাশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার যোগ্যতাই তার নেই। তার শোকাবহ অপকর্ষ আর হতবুদ্ধি আকার-প্রকার এই ক্লেশকর বিশ্বাসেরই অনুকূল যে বীর্য, বিবেচনা, মেরুদণ্ড ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সম্বলগুলো থেকে প্রকৃতি তাকে তফাতে রেখেছে ব'লেই সে আজ উদ্‌গ্রীব জীবনযাত্রায় অশক্ত।

কালো ছড়ির পোষকতায় নিয়মিত নগরপরিক্রমা শেষ ক'রে সে যখন সেই ঢালু রাস্তা বেয়ে বাড়ি ফেরে, তখন ছেলের দল আবার ঠাট্টা-তামাসা দিয়েই তার সংবর্ধনা সারে। কিন্তু মিস্ডার্নিকেল সে-উপদ্রব গায়ে মাখে না, সিঁড়ির ভেপ্‌সা গন্ধ পেরিয়ে যথাসত্বর নিজের ঘরে ঢোকে। ঘরখানায় আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, দারিদ্র্যের চিহ্ন তার সর্বত্র; কেবল পিতলের হাতলওয়ালা সেকেলে দেরাজটাই নিঁখুত আর দামি। তার একপাশে একটা জানলা আছে

বটে, কিন্তু সেটার দৌড় সামনের বাড়ির উঁচু দেওয়াল পর্যন্ত, বাতায়নিকের কৌতূহল সেখানেই মাথা ঠুকে মরে। তাহ'লেও সেই জানলাতে মাটি-ভর্তি একটি ফুলের টব বসানো থাকে, এবং তাতে যদিও কিছুই জন্মায় না, তবুও টোবিয়স্ মাঝে-মাঝে তার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়, তন্ময়ভাবে তার দিকে তাকায়, তার ভিতরকার বাঁঝা মাটি শুঁকে বিশেষ আরাম পায়। এই ঘরের সংলগ্ন অন্ধকার কুঠরিখানায় মিস্তার্নিকেল ঘুমোয়। ঘরে গিয়েই সে তার টুপি আর ছড়ি দেরাজের উপরে রাখে, তারপর ধূলিগন্ধী সোফার সবুজ ঘেরাটোপের উপরে ব'সে গালে হাত দেয় আর ভুরু কপালে তুলে মেঝের দিকে চোখ নামায়। তখন মনে হয় এছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কিছুই তার করণীয় নেই।

মিস্তার্নিকেল-এর চারিত্র্যবিচার অত্যন্ত শক্ত। নিম্নোক্ত ঘটনার পক্ষপাত আপাতত তারই দিকে। একদিন এই অসামান্য মানুষটি যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমবেত বালক-বালিকার হাসি-টিট্‌কিরি কুড়োতে-কুড়োতে দু-দশ কদম চলেছে, অমনি একটি দশ বছরের ছেলে আরেকজনের পায়ের ঠোক্করে এমন জোরে আছাড় খেলে যে তার কাটা নাক আর ফাটা কপালের রক্ত সহজে থামতে চাইলে না, এবং বেচারা উঠতে না-পেরে শুয়ে-শুয়েই কান্না জুড়লে। তাই শুনে টোবিয়স্ ফিরে দাঁড়াল, এবং ছেলেটিকে ভূপতিত দেখে ত্রস্তপদে এগিয়ে এসে, তার উপরে ঝুঁকে প'ড়ে কাঁপা গলায় গুন্‌গুনিয়ে দরদ জানাতে শুরু করলে।

সে বলতে লাগল : 'আহা, বাছারে আমার! লেগেছে বুঝি? রক্ত পড়িয়েছ! সর্বনাশ, রক্তে যে কপাল ভেসে গেল! তোমায় ওইরকম প'ড়ে থাকতে দেখে প্রাণে যে কেমন বাজছে, কী বলব! ওর কি লাগে না, না কি? বেচারা শুধু-শুধুই কাঁদছে? সত্যি, আমার কষ্ট হচ্ছে। দোষ তোমার নিজেরই। তা হোক্‌গে, আমার রুমালেই, এসো, তোমার কপাল বাঁধি। এই তো হ'য়ে গেল। এইবার দেখি একবার কত বড়ো জোয়ান, দাঁড়াও উঠে পায়ের উপর!'

এই কথাগুলো বলতে-বলতে সে রুমালখানা ছেলেটির মাথায় জড়ালে, এবং তারপর তাকে সযত্নে তুলে দাঁড় করিয়ে নিজের গন্তব্যে চ'লে গেল। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার ভাবভঙ্গিতে কেমন একটা অপূর্ব পরিবর্তন ঘটল ; সে হাঁটতে লাগল ঋজু দেহে, দৃঢ় পদক্ষেপে, আবক্ষ নিঃশ্বাসে পরিচ্ছদ পরিস্ফীত ক'রে। সহসা তার চোখদুটো বড়ো আর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, হঠাৎ সে মনুষ্য-সংসার আর জড়-বিশ্বের দিকে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাইতে পারলে, এবং সেইসঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে ফুটল অনভ্যস্ত আনন্দের অস্পষ্ট অস্বস্তি!

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরে পাড়া-পড়শীর উৎফুল্ল ব্যঙ্গকৌতুকে কিছুকাল একটু মন্দা পড়ল। কিন্তু দু-চারদিন যেতে-না-যেতে তার রোমাঞ্চকর কীর্তির কথা প্রায় সকলেই ভুলতে বসল. এবং আবার অসংখ্য কণ্ঠের সুস্থ, সবল ও নিষ্ঠুর চিৎকার এই অনিশ্চিত, আবর্জিত মানুষটির পশ্চাদ্ধাবনে ঠিক আগের মতোই মেতে উঠল।

একদিন বেলা এগারোটার সময়ে মিস্তার্নিকেল বাসা থেকে বেরিয়ে সারা শহর ছাড়িয়ে লের্হেন্‌বের্গ নামক দিগন্তবিস্তীর্ণ পাহাড়ের দিকে চলল। এইটা ছিল স্থানীয় শৌখিন লোকেদের সান্ধ্য-ভ্রমণের জায়গা। কিন্তু তখন বসন্তকাল, অর্থাৎ ঋতুটা বেশ উপভোগ্য ;

এবং সেদিন সাতসকালেই সে-অঞ্চলে লেগেছিল রথী পদাতিকের ভিড়। হয়তো সেইজন্যেই রাস্তার ধারে সারবন্দী গাছের নিচে একপাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক যাত্রীদের শুনিয়ে-শুনিয়ে একটা শিকারী কুকুরের বাচ্চা বিক্রির ইচ্ছা প্রকাশে হয়েছিল ব্যস্ত। কুকুরটা ছিল ছোটো, বয়স খুব জোর মাস-চারেক, তার পেশীবহুল গায়ের রং হল্‌দে, একটা চোখে গোলমতন কালো দাগ, একটা কান কৃষ্ণবর্ণ।

দশ কদম দূর থেকে এই জীবদুটি টোবিয়স্‌-এর নজরে আসতেই সে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল ; এবং দাড়িতে বার-কতক হাত বুলিয়ে মানুষটির হাত-পা নাড়া আর কুকুর-ছানাটার সজাগ ল্যাজ দোলানো চিন্তাকুল চোখে দেখে নিলে। তারপর সে আবার চলতে শুরু করলে ; কিন্তু দু-পা এগিয়েই মুখের উপর ছড়ির বাঁট চাপতে-চাপতে, যে-গাছটায় কুকুরওয়ালা ঠেস দিয়েছিল, সেটাকে তিনবার ঘুরে, তার কাছে এসে থামল, এবং নিচু গলায় তাড়াতাড়ি শুধোলে : 'কত দাম?'

মানুষটি জবাব দিলে : 'দশ মার্ক।'

টোবিয়স্‌ কিছুক্ষণ নীরব রইল তারপর সন্দেহের সুরে আবৃত্তি করলে : 'দশ মার্ক?'

লোকটি বললে : 'হ্যাঁ।'

তখন টোবিয়স্‌ তার পকেট হাতড়ে একটা কালো চামড়ার থলি বার করলে, এবং তার থেকে একখানা পাঁচ মার্কের, একখানা তিন মার্কের আর একখানা দু-মার্কের নোট নিয়ে টাকাটা বিদ্যুৎবেগে কুকুরওয়ালার হাতে গুঁজে দিলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই বেচা-কেনার ব্যাপার জন-কয়েকের নজরে আসাতে তারা হাসি জুড়েছিল। মিন্ডার্নিকেল একবার সন্ত্রস্ত চোখে তাদের দিকে তাকালে, তারপর জন্তুটার চেঁচামেচি, ছট্‌ফটানি না-মেনে, তাকে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে বাড়ি ফিরল। কুকুরটা সমস্ত পথ নূতন প্রভুর সঙ্গে লড়লে, মাটিতে পা গেড়ে-গেড়ে প্রতিপদে প্রতিবন্ধক জোটালে, বারংবার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে অপরিচিতের মুখাবলোকন করলে। কিন্তু সে-জিজ্ঞাসায় মিন্ডার্নিকেল-এর মৌন কাটল না, প্রাণপণ বলে চেন টানতে-টানতে সম্পত্তি-সমেত সে নিরাপদে সারা শহর পেরোল।

টোবিয়স্‌ আর তার কুকুরছানাটা দৃষ্টিগোচরে আসতেই রাস্তার ছেলের দলে একটা বিরাট কলরবের সূত্রপাত হ'ল। কিন্তু টোবিয়স্‌ তাতে দমল না ; কুকুরটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধ'রে, তাকে মাথার আড়ালে লুকিয়ে, হাসি, ঠাট্টা, কাপড় টানাটানির মধ্যে দিয়ে সে তীরবেগে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। সেখানে ঢুকে টোবিয়স্‌ কুকুরটাকে নামালে ; কিন্তু তাতেও তার ঘ্যানঘ্যানানি থামল না। তখন প্রসাদ বিতরণের ভাব দেখিয়ে, তার পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে মুরুব্বির মতো সে বললে : 'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! জানোয়ার ব'লেই কি ও-রকম ভয় পেতে হয়? অতখানি সমীহার কোনো দরকার নেই।'

তারপরে টোবিয়স্‌ দেরাজের টানা থেকে একথালা রান্না মাংস আর আলু বার ক'রে খানিকটা তাকে দিলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কান্না থেমে গেল, এবং ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে, ঠোঁট চাটতে-চাটতে সে অবিলম্বে আহারে মাতল।

খাওয়া শেষ হতেই টোবিয়স্‌ বললে : 'তোর নাম দিলুম ইসাও। বুঝলি! ইসাও। এই

সহজ শব্দটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবি।' তারপর সামনে মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে হাঁকলে : 'ইসাও!'

কুকুরটা নিশ্চয়ই ভাবলে তার ভাগ্যে আরো খাবার জুটবে ; তাই ডাকতেই সে কাছে এল। তখন টোবিয়স্ তার পাঁজরা চাপড়ে বাহবা দিয়ে বললে : 'সাবাস্! সাবাস্! এই তো চাই, বন্ধু! গুণ না-গাইয়ে ছাড়বিনে, দেখছি!'

তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে, মাটির দিকে দেখিয়ে সে আবার হুকুম দিলে : 'ইসাও!'

এতক্ষণে জানোয়ারটার মেজাজ বেশ খুশি হ'য়ে উঠেছিল, তাই এবারেও সে এক লাফে কাছে এসে মুনিবের পা চাটতে লাগল।

অন্ততঃপক্ষে বারো কী চোদ্দ বার এই খেলা খেলেও টোবিয়স্-এর সাধ মিটল না ; আদেশজ্ঞাপনে ও বশ্যতাপ্রতিগ্রহে সে প্রত্যেক ক্ষেপে সমান আমোদ পেলে। শেষকালে কুকুরটারই অবসাদ জাগল, দেখে বোধ হ'ল সে একটু জিরোতে চায়। খাবার হজমের প্রয়োজনই তাকে উপস্থিত ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আর পাঁচটা শিকারী কুকুরের মতো সুশ্রী পা-জোড়াকে সামনে এলিয়ে দিয়ে সে হঠাৎ সেয়ানা ঢঙে মেজের উপরে ব'সে পড়ল।

টোবিয়স্ ডাকলে : 'ইসাও! আরেকবার!'

কিন্তু ইসাও মাথা ফিরিয়ে নিলে। নড়বার কোনো লক্ষণই দেখালে না।

চড়া গলায় টোবিয়স্ চেঁচালে : 'ইসাও! ও-সব চালাকি চলবে না, থ'কে গেলেও আসতে হবে।'

কিন্তু তাতেও ইসাও উঠল না, থাবার উপরে মাথা রাখলে মাত্র।

এবারে অবরুদ্ধ বিভীষিকায় টোবিয়স্-এর কণ্ঠস্বর বিকট হ'য়ে উঠল ; সে বললে : 'ভালো চাস তো কথা শোন, নচেৎ বুঝবি আমায় চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

কিন্তু উত্তরে কুকুরটা শুধু একটু ল্যাজ নাড়লে। তখন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড প্রকোপের অপরিসীম অসঙ্গতি মিন্ডার্নিকেল-কে ছেয়ে ফেললে ; এবং তার ঘাড় ধ'রে শূন্যে তুলে সে সেই কালো ছড়ির বাড়ি আর্ত জন্তুটার উপর আঘাত-বৃষ্টি শুরু করলে। ভীষণ রাগে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে সে সাপের মতো ফুলে-ফুলে গর্জাতে লাগল : 'আমায় অমান্য? এত বড়ো সাহস যে আমায় অমান্য?'

বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাতের ছড়িগাছা টান মেরে ফেলে দিয়ে টোবিয়স্ কাঁদুনে কুকুরটাকে নামিয়ে রাখলে, এবং পিছন দিকে দু-হাত জুড়ে, হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিন্তু ক্রমশ তার পদচারণের বেগ কমল, অবজ্ঞার ভ্রূকুটি সরল হ'য়ে এল, এবং চিৎপাৎ কুকুরটার পা-নাড়ার কাকুতি দেখে সে শেষ পর্যন্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ন্তী হারিয়ে ফিরলে পরে নেপোলিয়ন যেমন কঠোর কণ্ঠে তাঁর সৈন্যদলের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতেন, সেইরকম হিম গলায়, জমাট চোখে সে-ও ইসাওকে শুধোলে : 'জিজ্ঞাসা করতে পারি কী আচরণটা কেমন হ'ল?'

কিন্তু কুকুরটা এইটুকু অনুগ্রহকে দাদন ভেবে ইতিমধ্যেই বেশ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল। কাজেই সে গুড়ি মেরে আরো কাছে স'রে গেল, এবং মালিকের পায়ে প'ড়ে নিঃশব্দ অনুনয়ে একজোড়া চক্‌চকে চোখ তার মুখের পানে তুলে ধরলে।

টোবিয়স্‌ তাতেও তেমন নরম হ'ল না ; নীরব উপেক্ষায় আরো কিছুকাল সেই দর্পচূর্ণ জন্তুটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আস্তে-আস্তে পদানত পশুদেহের উত্তাপ তার মন গলালে ; এবং অবশেষে ইসাও-কে কোলে টেনে নিয়ে সে ব'লে উঠল : 'বেশ! শুধু এইবারটা মাপ করলুম।'

তারপর কুকুরটা আদর কাড়িয়ে তার মুখ চাটতে আরম্ভ করতেই তার উষ্মা বিষণ্ণ করুণায় বদ্‌লে গেল ; এবং মর্মান্তিক স্নেহে সে তাকে বুকে চেপে ধরলে। তার চোখদুটো জলে ভ'রে উঠল, এবং বারবার কথার খেই হারিয়ে ফেলে সে চাপা গলায় কেবলই বলতে লাগল : 'বুঝিসনে কেন তুই আমার একমাত্র—আমার একমাত্র—' অতঃপর সে অতিসন্তর্পণে ইসাও-কে সোফায় নামিয়ে রাখলে, নিজে তার পাশে বসল, এবং গালে হাত দিয়ে শান্তি-ভরা কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

এরপর থেকে টোবিয়স্‌-এর বহির্গমন আগের চেয়ে আরো বিরল হ'ল। কেন-না ইসাও-এর সঙ্গে সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না। কিন্তু এখন থেকে তার সমস্ত মনোযোগ সে অর্পণ করলে ওই-কুকুরটাকেই। অন্য সব কাজে জলাঞ্জলি দিয়ে সকাল থেকে বিকেল অবধি সারা সময়টা সে কাটাতে লাগল ইসাও-এর সেবা-শুশ্রূষায়। তার চোখ মুছিয়ে এবং খাবার জুগিয়ে, তাকে ব'কে ধম্‌কে এবং হুকুম খাটিয়ে, খাঁটি মানুষী রীতিতে তার সঙ্গে প্রাণের কথা ক'য়ে সে একেবারে কুণো হ'য়ে উঠল। অবশ্য তাহ'লেও প্রত্যহ মালিকের সন্তোষবিধান করা ইসাও-এর সাধ্যে কুলোত না ; কারণ খোলা হাওয়া আর যথেষ্ট মেহেনতের অভাবে ঝিমোতে-ঝিমোতে জড়ানো চোখে মাঝে-মাঝে তার মুখে তাকানো ছাড়া তার মন পাওয়ার আর কোনো উপায়ই ছিল না। তাই যেদিন একেবারে মুস্‌ড়ে প'ড়ে ইসাও তার পাশে গিয়ে শুত, শুধু তখনই টোবিয়স্‌-এর আত্মপ্রসাদ আর আঁটা যেত না ; সেইদিনই সৌম্য মূর্তিতে সে সোফায় ব'সে আস্তে-আস্তে ইসাও-এর গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে অনুকম্পার সুরে বলত : 'আমার দিকে অমন অভিভূত দৃষ্টিতে কী দেখছ, বন্ধু? পৃথিবীটা যে কত শোচনীয় জায়গা, তা এই কাঁচা বয়সেই তুমিও ধ'রে ফেললে, নাকি?'

কিন্তু জন্তুটা যখন খেলার নেশায় অন্ধ হ্য়ে, শিকারের প্রবর্তনায় সহবৎ হারিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াত, পুরানো চটি নিয়ে হেঁচড়া-হেঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি করত, লাফিয়ে-লাফিয়ে কৌচ-কেদারা ধামসাত, অথবা আনন্দের আতিশয্যে মাটিতে গড়াগড়ি দিত, তখন দূর থেকে এইসমস্ত কার্যকলাপ দেখে টোবিয়স্‌-এর বুদ্ধি যেত গুলিয়ে। তার চোখে জাগত সংশয় আর অসম্মতি, এবং তার মুখে ফুটত বিরক্তির ম্লান হাসি, অমঙ্গলের সূচনায় ভারাতুর। শেষ পর্যন্ত সে আর ধৈর্য ধরতে পারত না, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলত : 'বাঁদরামি থামা, অমন দৌরাত্ম্যের কিছুমাত্র কারণ নেই।'

একদিন এমনও ঘটল যে ইসাও হঠাৎ ঘর থেকে পালিয়ে, এক নিঃশ্বাসে সিঁড়ি ভেঙে, সটান রাস্তায় গিয়ে হাজির হ'ল, এবং সেখানে বিড়াল তাড়িয়ে, ময়লায় মুখ দিয়ে, ছেলেদের সঙ্গে খেলা জুড়ে, নিজেকে একেবারে ভুলতে বসল। তারপর টোবিয়স্ যখন দুঃখে, কষ্টে, অপমানে মুখ বাঁকিয়ে রঙ্গমঞ্চে নামল, এবং রাস্তার অর্ধেক লোক সমস্বরে হেসে আর হাততালি বাজিয়ে তার অভ্যর্থনা করলে, তখন সেই শোচনীয় ব্যাপারের ষোলোকলাই পূরল—লাফাতে-লাফাতে কুকুরটা তার মুনিবের নাগাল এড়ালে। সেদিন ইসাও-কে অনেকক্ষণ ধ'রে প্রাণ খুলে মেরেও টোবিয়স্ তার সমস্ত ঝাল ঝাড়তে পারলে না।

কুকুরটা তার আয়ত্তে আসার কয়েক হপ্তা বাদে টোবিয়স্ একদিন দেরাজ থেকে একখানা পাঁউরুটি বার ক'রে, ইসাও খাবে ব'লে সেটাকে ছোটো-ছোটো ফালিতে কেটে, টুক্‌রোগুলো মাটিতে ছড়াতে লাগল। কিন্তু হাড়ের বাঁটওয়ালা যে প্রকাণ্ড ছুরিটার সাহায্যে সে সচরাচর এইরকমের কাজ সারত, তার নিপুণ ব্যবহার কোনোদিনই টোবিয়স্-এর অভ্যাস হয়নি। তাই ক্ষুধার তাড়ায় বিবেচনা হারিয়ে ধড়ফড়ে কুকুরটা যেই একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠল, অমনি তার ডান কাঁধে ছুরির ফলাটা গেল ব'সে, এবং মেঝেতে লুটোতে-লুটোতে ইসাও রক্ত ছুটিয়ে দিলে।

ভয়ে সিঁটিয়ে টোবিয়স্ সব ছেড়ে আহত জন্তুটার উপরে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে তার হাব-ভাবে একটা হঠাৎ পরিবর্তন দেখা গেল, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আভাসে-ইঙ্গিতে তার মুখ-চোখ ভাস্বর হ'য়ে উঠল, এবং কাতর কুকুরছানাটাকে সাবধানে সোফায় শুইয়ে সে কী অভিনিবেশের সঙ্গে তার পরিচর্যা শুরু করলে, তা অনির্বচনীয়। এক পা না-ন'ড়ে সে সারাবেলা কাটাতে লাগল ইসাও-এর শয্যাপার্শ্বে। রাত্রির পর রাত্রি ইসাও তারই বিছানায় স্থান পেলে। অশেষ উদ্বেগে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, ঘা ধুইয়ে আর ব্যান্ডেজ বেঁধে, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আর দরদ জানিয়ে মিস্তার্নিকেল-এর দিনগুলো ছুটে চলল অক্ষয় আনন্দে।

সে থেকে-থেকে তাকে শুধোত : 'বড্ড লাগছে? আহা, বেচারা আমার! জানি, কী ভয়ানক তোর কষ্ট। কিন্তু পরোয়া নেই, বাঁচা মানেই ভোগা।' এই কথা বলার সময়ে টোবিয়স্-এর মুখে ফুটত একটা শান্ত বিষাদের ছবি, কিন্তু তাতে সন্তোষের ছাপও থাকত সুস্পষ্ট।

কিন্তু ইসাও-এর রোগ-মুক্তি ও শক্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে-সঙ্গে টোবিয়স্-এর চালচলনে আবার অধীরতা ও অতৃপ্তি দেখা দিলে। ক্রমশ তার বিশ্বাস হ'ল যে বর্তমান অবস্থায় দুশ্চিন্তা অনুচিত, মুখের কথায় কিংবা পিঠ চাপ্‌ড়ে সহানুভূতি জানালেই সে এবার তার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু ইসাও-এর স্বাস্থ্য ছিল উৎকৃষ্ট, তাই বিনা-যত্নেও তার ঘা সেরে এল, এবং অবিলম্বেই সে আবার ঘরের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু করলে। একদিন এক বাটি দুধ-রুটি খাবার পর তার শরীরে আর কোনো দোষ রইল না ; এবং এক লাফে সোফায় চ'ড়ে, উল্লসিত কোলাহলে ঘরদুটো মাতিয়ে তুলে, একটা আলুকে এ-দিকে ও-দিকে খেদিয়ে, নিছক স্ফূর্তিতে ও সাবেকি অসংযমে সে অনবরত ডিগবাজি খেতে লাগল।

টোবিয়স্ তখন ফুলের টবটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ইসাও-এর কাণ্ডকারখানা দেখে সে জানলাতেই থম্‌কে রইল, বিস্ময়ের ব্যাকুলতা তার অপ্রতিভ চেহারাখানাকে সামনের সাদা দেওয়ালের ভূমিকায় যেন কালির আঁচড়ে চিত্রার্পিত ক'রে দিলে। শুধু মাঝে-মাঝে ছেঁড়া-আস্তিন-ঘেরা একখানা রোগা চিম্‌সে হাতে সে কলের পুতুলের মতো তার তুলে-আঁচড়ানো চুলগুলো ঘাঁটতে লাগল ; এবং মনস্তাপে তার বিবর্ণ মুখখানা বিকৃত হ'য়ে গেলেও, তার চোখের কোণে জমতে থাকল হিংসা, কুটিলতা আর অনিষ্ট। কিন্তু হঠাৎ সে নিজেকে বশে আনলে, এবং ধীরে-ধীরে ইসাও-এর কাছে এগিয়ে, তাকে কোলে নিতে-নিতে মর্মান্তিক স্বরে বলতে আরম্ভ করলে : 'আহা, বেচারা আমার —' ; কিন্তু ইসাও তখন আমোদে এমনি মেতে উঠেছিল যে এ-রকম ব্যবহার সে আর নিরীহভাবে সইতে পারলে না। যে-হাত তাকে চাপড়াতে যাচ্ছিল, তার উপরে সে খেলাচ্ছলে দাঁত বসালে; যে-বাহু তাকে আটকে রেখেছিল, তার থেকে সে পিছলে বেরিয়ে পড়ল ; তারপর এক লাফে মেঝেতে নেমে, দুরন্ত আহ্লাদে ডাকতে-ডাকতে সে পাশ কাটিয়ে পালাতে চাইলে।

এরপরে যা ঘটল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, সে-ঘটনা এতই জঘন্য যে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতেও আমি অনিচ্ছুক। টোবিয়স্ মিন্ডার্নিকেল খানিকক্ষণ ধ'রে সামনে হেলে, হাতদুটোকে দু-পাশে ঝুলিয়ে, দাঁড়িয়ে রইল। তার চাপা ঠোঁট আল্‌গা হ'ল না, চোখের কোটরে তারাদুটো থেকে-থেকে কেমন একরকম অতিপ্রাকৃতধরনে কাঁপতে লাগল। তারপর হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে সে জন্তুটাকে জড়িয়ে ধরলে, কী একটা লম্বা চক্‌চকে জিনিস তার হাতের মধ্যে ঝক্‌মকিয়ে উঠল, এবং চোখের নিমেষে কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত হাঁ হ'য়ে গিয়ে ইসাও জমি নিলে। কুকুরটার মুখে একবার একটা শব্দ বেরোল না, যে-পাশে পড়েছিল সেই পাশে শুয়েই সে হাঁপাতে-হাঁপাতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলে।

পরমুহূর্তে তাকে সোফায় শুইয়ে টোবিয়স্ হাঁটু-গেড়ে তার সামনে বসল, এবং ক্ষতের উপরে একখানা ন্যাকড়া চাপতে-চাপতে বাধো-বাধো স্বরে বলতে লাগল : 'আহা, বেচারা আমার! বাছা রে! *জীবনটাই* শোচনীয়, আমাদের দু-জনের কপালেই ভোগের অন্ত নেই! লাগছে? হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছি বড্ড লাগছে—ওঃ কী ভয়ানক কষ্টকর তোর ওই চুপ ক'রে শুয়ে থাকা। কিন্তু আমি পাশেই রয়েছি। আমিই তোর যন্ত্রণা ঘোচাব। আমার সেরা রুমাল দিয়ে—।'

কিন্তু ততক্ষণে ইসাও-এর গলা ঘড়ঘড়াতে শুরু করেছিল। সে জিজ্ঞাসু চোখে তার প্রভুর দিকে একবার তাকালে মাত্র, কিন্তু তার আতুর দৃষ্টিতে অবগতির আলো জ্বলল না। পলকের মধ্যে সে নিরপরাধ নয়নের নির্বাক্ অভিযোগও নিবল—তারপর একবার পাশমোড়া দিয়েই সে তার ভবলীলায় পূর্ণচ্ছেদ টানলে।

টোবিয়স্ নড়ল না, ইসাও-এর গায়ের উপরে মাথা রেখে বুক-ফাটা কান্না জুড়লে।

[Thomas Mann-এর 'Tobias Mindernickel' নামক গল্পের অনুবাদ।]

বসন্ত-বন্যা

'হর্ষ-পাগল বর্ষ সকল,
দিবস প্রমোদে ভরা,
তারা বসন্ত-বন্যার মতো
উধাও হয়েছে ত্বরা।'
—একটি প্রাচীন গাথা হ'তে।

তার পাঠাগারে সে ফিরে গিয়েছিল রাত্রি দুটার সময়ে। বাতিগুলো জ্বালা হ'লে পরে, সে তার চাকরকে বিদায় দিয়েছিল, এবং অগ্নিসেবনস্থলীর কাছে একখানা নিচু চেয়ারে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে মুখ লুকিয়েছিল দু-হাতের মধ্যে।

দেহের ও মনের এরূপ শ্রান্তি সে আর কখনো অনুভব করেনি। সমস্ত সন্ধ্যাটা সে অতিবাহিত করেছিল কতকগুলি ললিতা রমণী ও পরিমার্জিত পুরুষের সঙ্গে ; তাদের মধ্যে কোনো-কোনো নারী সুন্দরী, প্রায় সমস্ত পুরুষই বুদ্ধি বা মনীষার দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ; সে নিজেও আলাপ করেছিল সিদ্ধির সহিত, এমন-কি প্রতিভার সঙ্গে ...। কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও প্রাচীন রোমান-কথিত সেই taedium vitae, সেই 'জীবনে জুগুপ্সা' এমন অনিবার্য, এমন নিঃশ্বাসহারী শক্তিতে ইতিপূর্বে আর কখনো তাকে অভিভূত করেনি। তার বয়স যদি থাকত আরেকটু অল্প, তাহ'লে দুঃখে, ক্লান্তিতে, উৎকোপনে সে সম্ভবত কাঁদত : একটা দংষ্ট্রশীলা জ্বালাময়ী তিক্ততা, একটা জম্বু-সদৃশ তিক্ততা তার সমস্ত আত্মাকে মগ্ন করেছিল। কেমন একরকমের একটা আশ্লেষী বিদ্বেষ, ঘৃণার একটা গুরুভার হেমন্তের আঁধার রাত্রির মতো তাকে চারদিক হ'তে নিরুদ্ধ করেছিল, এবং এই তামসের থেকে কী ক'রে মুক্তি পাওয়া যাবে সে বুঝতে পারছিল না। নিদ্রার উপর নির্ভর করা বৃথা ; সে জানত সে ঘুমাতে পারবে না।

সে চিন্তায় নিবিষ্ট হ'ল ... ধীরে-ধীরে, নিরুৎসাহে, সরোষে। বিশ্বজনীন সমস্ত সামগ্রীর ব্যর্থতা, অপ্রয়োজনীয়তা, অবর অলীকতার কথা সে ভাবলে। তার মানসচক্ষুর সম্মুখ দিয়ে মানবজীবনের সমস্ত গ্রামগুলি ক্রমান্বয়ে চ'লে গেল (সম্প্রতি সে নিজে উপনীত হয়েছিল বাহান্নর কোষ্ঠে), কিন্তু একটাও তার চোখে প্রীতিকর হ'তে পারলে না। সর্বত্রই সেই একইভাবে ঝাঁঝরির মধ্যে অবিরাম বারিপাত ; বায়ুর উপরে নিরবধি আঘাত, সর্বত্রই সেই একই আত্মবঞ্চনা—অর্ধেক সরল বিশ্বাসে, অর্ধেক সজ্ঞানে শিশুকে ক্রন্দন হ'তে নিরস্ত

করবার জন্যে তাকে একটা যা-তা খেলনা দেওয়া। আর তারপরে হঠাৎ মাথার উপরে তুষারের মতন বার্ধক্য এসে পড়ে, এবং তার সাথে আসে সেই চির-বর্ধিষ্ণু চির-দংশনময়, চির-গ্রাসকারী মরণভীতি ... এবং সেই পাতালে নিমজ্জন! জীবন যদি শেষ অবধি এমনি ক'রেই চলে তাহ'লে সেটাই সৌভাগ্য। হয়তো-বা সমাপ্তির পূর্বেই, লোহার উপরে কলঙ্কের মতো, আসে যন্ত্রণা, পঙ্গুতা ... কবিরা তাকে যেমন ক'রে চিত্রিত করে, জীবন-সমুদ্রকে তেমনতর বাত্যাহত তরঙ্গায়িত ক'রে সে অঙ্কন করত না ; না, সেই সিন্ধুকে সে ভাবত একখণ্ড ছোদহীন, মসৃণ সমতল ব'লে, নিষ্প্রবাহ এবং আঁধারতম গাম্ভীর্য পর্যন্ত স্বচ্ছ। সে নিজে ব'সে আছে একখানি ক্ষুদ্র দোদুল্যমান নৌকার ভিতরে, এবং তার নিচে সেই তমিস্র, সপঙ্ক তলদেশে অতিকায় মৎস্যের মতো বীভৎস রাক্ষসগুলোর আকৃতি সে নির্ণয় করতে পারছে মাত্র ; জীবনের যত বিপত্তি, রোগ, তাপ, উন্মত্ততা, দারিদ্র্য, অন্ধতা ... সে অবাক নয়নে চেয়ে আছে, সহসা দেখো-দেখো, সেই রাক্ষসগুলোর মধ্যে একটা নিজেকে সেই অন্ধকারের থেকে বিচ্ছিন্ন করলে, উচ্চ হ'তে উচ্চে উঠতে লাগল, ক্রমশ বেশি স্পষ্ট, জঘন্যরূপে স্পষ্ট হ'তে লাগল। ... আরেক মুহূর্ত, এবং তারপরে যে-নৌকা তাকে বহন করছে, সেটা উল্টে যাবে! কিন্তু দেখো-দেখো, রাক্ষসটা আবার অস্পষ্ট হ'তে আরম্ভ হয়েছে, সে হ'টে যাচ্ছে, তলে ডুবে যাচ্ছে এবং সেথায় শুয়ে সেই কর্দমে অতি ধীরে অঙ্গ সঞ্চালন করছে ... কিন্তু সেই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত দিন যে আসবেই, এবং সে তরণীখানাকে উল্টে দেবেই দেবে।

সে তার মাথাটা নাড়লে, তার নিচু চেয়ারখানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ঘরের এ-পাশ থেকে ও-পাশে বার-দুই পায়চারি করলে, লেখবার টেবিলটার পাশে এসে বসল, এবং একটার-পর-একটা টানা খুলতে-খুলতে তার কাগজপত্রে পুরানো চিঠিগুলো—তার অধিকাংশই নারীদের কাছ থেকে পাওয়া—হাঁটকাতে শুরু করলে। সে কেন যে এমন করছিল, তা সে বলতে পারত না ; সে কোনো কিছুর সন্ধান করছিল না—কোনোরকমের বাহ্যিক কার্যের সাহায্যে পীড়াপ্রদ চিন্তার থেকে সে চাইছিল মুক্তি। লক্ষ্যহীনভাবে কতিপয় চিঠি খুলে (তাদের একটার মধ্যে ছিল এক টুক্‌রো বিবর্ণ ফিতায় বাঁধা একটা শুষ্ক ফুল) সে শুধু তার স্কন্ধ উত্তোলন করলে, এবং অগ্নিকুণ্ডের পানে একবার অপাঙ্গ-দর্শন ক'রে সম্ভবত এই নিষ্প্রয়োজন জঞ্জাল ভস্মীভূত করবার ধারণার বশবর্তী হ'য়ে সে সেগুলোকে একধারে ছুঁড়ে ফেললে। তাড়াতাড়ি একটার-পর-একটা টানায় তার হস্তদ্বয় পুরতে-পুরতে সে তার চোখদুটি সহসা বিস্ফারিত করলে, এবং পুরানো ঢঙে তৈয়ারি একটি ক্ষুদ্র অষ্টকোণ বাক্স ধীরে-ধীরে বাহির ক'রে, সে আস্তে-আস্তে তার ঢাকাটা তুললে। সেই বাক্সটির ভিতরে, দুই থাক তুলার নিচে ছিল একটি সময়-পীত বৈক্রান্তমণির ক্রুস।

কয়েক মুহূর্ত সে এই ক্রুসটির প্রতি চিত্তবৈকল্যের সহিত চেয়ে রইল—সহসা সে অস্ফুট নাদ ক'রে উঠল ... তার আননের উপর ফুটে উঠেছিল পরিতাপ ও হর্ষের মধ্যে একটা কিছু ব্যঞ্জনা। এখনো তেমনি অথচ সময়ের গমনে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, বহুদিন না-দেখা, একদা-অতি-প্রিয় কেউ যদি অকস্মাৎ চোখের সামনে আবির্ভূত হয়, তাহ'লে সেই সাক্ষাতে মানুষের মুখে এইরকমের ভাব প্রকাশ পায়।

সে উঠে দাঁড়াল, এবং অগ্নিসেবনস্থলীতে ফিরে গিয়ে সে আবার সেই আরাম-চেয়ারে উপবেশন করলে এবং পুনর্বার হস্তে মুখ ঢাকলে ... 'আজকেই কেন? ঠিক আজই কেন?' সে ভাবছিল এই কথা, বহুদিন অতীত অনেক জিনিসই সে মনে করলে।

সে যা-স্মরণ করেছিল তা হচ্ছে এই ...।

কিন্তু প্রথমে তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার উপাধি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডিমিট্রি পাভ্‌লোভিচ্‌ সানিন নামে সে আহূত হ'ত। তার যা মনে পড়েছিল তা পরে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

১

সেটা ১৮৪০ সনের গ্রীষ্মকাল। সানিন তখন বাইশের কোঠায় এবং ইতালির থেকে রুসিয়ায় ফিরবার পথে সে ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থান করছিল। সে ছিল সামান্য সম্পত্তির মানুষ, কিন্তু স্বাধীন, প্রায় পারিবারিক বন্ধনবর্জিত। এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে সে কয়েক হাজার রুব্‌ল্‌ প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং চাকুরিতে প্রবেশ করার পূর্বে, অন্তিমে সরকারি জোয়াল কাঁধে পরিধান করবার আগে সে এই টাকাটা বিদেশে ব্যয় করবে ব'লে সঙ্কল্প করেছিল।

চাকুরি ব্যতীত তার পক্ষে একটা নিঃসন্দেহ জীবিকা অর্জন করা অসম্ভব। সানিন এমন সুচারুরূপে এই অভিপ্রায়টি সম্পাদন করেছিল যে ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছানোর দিনে ঠিক পিটার্সবার্গে ফেরার মতো অর্থ মাত্র ছিল তার অবশিষ্ট। ১৮৪০ সনে অল্প রেলপথই ছিল বর্তমান ; পরিব্রাজকেরা ডাকগাড়িতে ক'রে সফর করতেন। সানিন 'bei wagon' গাড়িতে একটি স্থান জোগাড় করেছিল, কিন্তু রাত্রি এগারোটার পূর্বে যাত্রা করবে না। তার পূর্বে অনেকটা সময় নিঃশেষ করার আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে আকাশের অবস্থা ছিল অতি সুন্দর ; এবং সানিন তখনকার দিনের এক বিখ্যাত হোটেলে, 'শুভ্র মরাল'-এ, মধ্যাহ্নভোজন সেরে শহরটায় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে যাত্রা করলে। সে ডানেকার অঙ্কিত 'আড্রিয়ান' দেখতে গেল ; সেটা তার তেমন ভালো লাগল না। সে গ্যেটের বাড়ি দর্শন করলে ; তাঁর রচনার মধ্যে সে কিন্তু কেবল *Werther* উপন্যাসখানি পড়েছিল, এবং তা-ও আবার এক ফরাসি তর্জমায়। সে সেন নদীর উপকূলে বেড়ালে এবং সুনিয়ন্ত্রিত পর্যটকের মতন বিরক্তি অনুভব করলে ; অবশেষে সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রান্ত হ'য়ে ধূলি-ধূসর জুতা-সুদ্ধ সে উপস্থিত হ'ল ফ্রাঙ্কফুর্টের এক অতি অদ্রষ্টব্য রাস্তায়। সে-রাস্তাটি বহু-বহুদিন পর্যন্ত না-ভুলতে পারাই তার ভাগ্যলিখন। সে-রাস্তার অল্প কয়েকটা বাড়ির মধ্যে একটার উপরে সে একটা নামপট্ট (/সাইনবোর্ড) দেখলে ; তার উপরে ঘোষিত ছিল : 'জিয়োভানি রোসেলি ইতালীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। সানিন এক গ্লাস লেমোনেডের জন্যে তাতে প্রবেশ করলে ; দোকানটিতে আড়ম্বরহীন পণ্যফলকের পশ্চাতে কাচের দ্বারযুক্ত আলমারির থাকে ঔষধালয়ের স্মৃতি-উদ্দীপক সোনালি লেপপত্র-মারা কতক- গুলো বোতল এবং প্রায় সমসংখ্যক বিস্কুট, চকোলেট-কেক ও মিষ্টান্নের কাচভাণ্ড দাঁড় করানো ছিল—সেঘরটিতে কিন্তু জনপ্রাণী ছিল না ; জানলার কাছে রক্ষিত একখানা উঁচু বাঁশের চেয়ারে তার থাবা শানাতে-শানাতে কেবল

একটা বিড়াল মিটি-মিটি চেয়ে মিউ-মিউ করছিল, এবং মেঝের উপরে একটা উল্টানো কোঁদা কাঠের চুপড়ির পাশে ভূলুণ্ঠিত একতাল লাল পশম সান্ধ্যকিরণে সৃষ্টি করেছিল এক টুক্‌রো উজ্জ্বল বর্ণ। পাশের ঘর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সানিন মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে, দ্বারের ঘণ্টাটাকে সর্বোচ্চ সুরে বাজাতে-বাজাতে উন্নত ডাকলে, 'এখানে কি কেউ নেই?' সেই ক্ষণেই ভিতরের ঘরের দ্বারটা উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেল এবং বিস্ময়ে সানিনের বাক্য হ'ল হৃত।

২

ঊনবিংশ বর্ষীয়া একটি যুবতী উদ্দাম বেগে দোকানের মধ্যে ছুটে এল, তার অনাবৃত পৃষ্ঠের 'পরে তার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কুন্তল বিশৃঙ্খলায় দোদুল্যমান, তার নিরাবরণ বাহুদ্বয় সম্মুখভাগে প্রসারিত। সে সানিনকে দেখে, তার কাছে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে এল, তাকে হাতে ধরলে, এবং 'শীঘ্র, শীঘ্র, এ-দিকে, ওকে বাঁচান'—হাঁপাতে-হাঁপাতে এই বলতে-বলতে, তাকে পিছু-পিছু টেনে নিয়ে চলল। আজ্ঞাপালনে অনিচ্ছাবশত নয়, শুধু বিস্ময়ের আতিশয্যের জন্যে সানিন তখুনি মেয়েটির অনুসরণ করলে না। সে যেন সেই স্থানে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল ; জীবনে আর কখনো সে এমন সুন্দরী (প্রাণী) দেখেনি। মেয়েটি তার পানে ফিরলে, এবং তার কণ্ঠস্বরে, তার চক্ষুর্দ্বয়ে, তার দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির ভঙ্গিতে—সেটি একটা আকস্মিক অঙ্গচালনায় তার পাণ্ডু কপোল পর্যন্ত উত্তোলিত—এমনতর হতাশের সঙ্গে, 'আসুন, আসুন', এই কথা সে উচ্চারণ করলে যে সানিন তার পশ্চাদ্ধাবন করলে সেই মুক্ত দ্বারের দিকে।

যে-কক্ষটিতে সেই মেয়েটির পাছে-পাছে সে ছুটে এল, সেখানে একখানা পুরানো ফ্যাশানের বালামচির সোফায় চোদ্দ বছরের একটি বালক শুয়েছিল ; তার সমস্ত মুখমণ্ডল শুভ্র মোম বা পুরাতন মর্মরের মতো পীতাভ শুভ্র। মেয়েটির সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য, স্পষ্টতই তার ভাই। তার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত, তার ঘনকৃষ্ণ কেশের থেকে একখণ্ড ছায়া এসে পড়েছিল তার প্রস্তরবৎ কপালের ও তার পেলব, নিস্পন্দ ভ্রূর উপরে ; নীলাভ ওষ্ঠের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার নিবদ্ধ দন্ত। মনে হচ্ছিল সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে না ; একটি বাহু ভূমির দিকে ঝুলছিল, অপরটি সে ন্যস্ত করেছিল শিয়রে। বালকটি সুসজ্জিত, এবং তার পোশাকে জোরে বোতাম-আঁটা ; একটা কষা গলাবন্ধ তার গলদেশে পাকানো।

আর্তনাদ ক'রে মেয়েটি তার দিকে ছুটে গেল। সে করুণ স্বরে বললে, 'ম'রে গেছে! ম'রে গেছে! এই তো এইখানে ব'সে আমার সঙ্গে কথা কইছিল,—আর হঠাৎ উল্টে প'ড়ে শক্ত হ'য়ে গেল। ... হা ভগবান! ওর জন্যে কি কিছুই করা যাবে না? মা-ও এখানে নেই!' সহসা ইতালীয় ভাষায় সে বলতে লাগল : 'পাণ্টালিয়ন! পাণ্টালিয়ন! ডাক্তার! ডাক্তার আনতে গিয়েছিলে?'

দরজা হ'তে একটি ভাঙা গলা বললে : 'না আমি যাইনি, লুইস্‌কে পাঠিয়েছি।' এবং কালো বোতাম-লাগানো ফিকে বেগুনি রঙের এক লম্বা কোট, উঁচু কলার, ন্যাপ্‌কিনের খাটো

পাজামা ও নীল পশমি মোজা-পরা এক প্রগতজানু বৃদ্ধ খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘরের ভিতরে এল। তার অণুতম ক্ষুদ্র মুখখানি এক পুঞ্জ ধূসর কেশের মধ্যে বাস্তবিকই বিলুপ্ত। অপরিচ্ছন্ন গুচ্ছে চারদিকে উঠে প'ড়ে, সেই কেশদাম বৃদ্ধটিকে কিরীটী কুক্কুটের সঙ্গে একটা সারূপ্য দিয়েছিল — এই সাদৃশ্য খুব বেশি বিস্ময়কর হয়েছিল, যেহেতু সেই ঘন ধূসর পুঞ্জের মধ্যে একটি চঞ্চু-সমান নাসা ও দুইটি সুগোল পীত আঁখি ছাড়া অন্য কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না।

ফিতার গ্রন্থি বাঁধা উচ্চ বিনামা-পরিহিত তার বাতে পঙ্গু সমতল চরণ কষ্টে টানতে-টানতে বৃদ্ধটি বললে, 'লুইস্ ছুটে যাবে, আমি তো ছুটতে পারি না। আমি জল এনেছি।'

তার গ্রন্থিবহুল শুষ্ক হস্তে সে একটা লম্বা বোতলের গলা চেপে ধরেছিল।

মেয়েটি কেঁদে উঠল, 'কিন্তু ইতিমধ্যে যে এমিল ম'রে যাবে।' এবং তারপরে সানিনের দিকে তার হাত বাড়িয়ে সে বললে, 'মশাই, ওর জন্যে আপনি কি কিছু করতে পারবেন না?'

পাণ্ডালিয়ন নামধেয় বৃদ্ধটি বললে, 'ওঁর খানিকটা রক্ত বার ক'রে নেওয়া উচিত — এটা সন্ন্যাসের তড়কা।'

যদিও ভেষজ সম্বন্ধে সানিনের এতটুকুও ধারণা ছিল না, তবুও সে একটা জিনিস নিশ্চয় জানত যে, চোদ্দ বছরের ছেলেদের সন্ন্যাস-মূর্ছা ঘটে না।

সে পাণ্ডালিয়নের দিকে ফিরে বললে, 'এটা সংজ্ঞালোপ, মূর্ছা নয়। বুরুস আছে?'

বৃদ্ধ মুখ উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'অ্যাঁ?'

'বুরুস, বুরুস', সানিন জর্মান ও ফরাসিতে পুনরাবৃত্তি করলে। যেন কাপড় ঝাড়তে চায় এই ভাব দেখিয়ে সে আবার বললে, 'বুরুস'।

অবশেষে বৃদ্ধ তাকে বুঝলে।

'আ—বুরুস! Spazzille! নিশ্চয়ই আছে!'

'এখানে নিয়ে এসো ; ওর কোট খুলে ওকে মালিস ক'রে দেখতে হবে।'

'বেশ...বেশ...Beuone! ওঁর মাথায় জল ছিটানো উচিত নয় কি?'

'না...পরে ; এখন যত শীঘ্র পারো বুরুস আনো।'

পাণ্ডালিয়ন বোতলটা মাটিতে রাখলে, ছুটে বেরিয়ে গেল এবং তখুনি দুখানা বুরুস, একটা চুল আঁচড়ানোর আরেকটা কাপড় ঝাড়ার, নিয়ে ফিরে এল। একটা কুঞ্চিত-কেশ পুড়ল্ কুকুর তাকে অনুসরণ ক'রে ভিতরে এল, এবং সজোরে লাঙ্গুল সঞ্চালন করতে-করতে সেই বৃদ্ধের, বালিকার, এমন-কি সানিনের দিকে সুদ্ধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে যেন সে জানতে চায় এই সমস্ত গণ্ডগোলের অর্থ কী।

সানিন তাড়াতাড়ি বালকটির কোট খুলে ফেললে, তার কলারের বোতাম মোচন করলে, এবং তার কামিজের আস্তিন গুটিয়ে দিলে, এবং একখানা বুরুস নিয়ে নিজেকে সশস্ত্র ক'রে সে তার বক্ষ ও বাহুদ্বয় সবলে ঘষতে করলে শুরু। পাণ্ডালিয়নও সমান উদ্যমে অন্য বুরুসটা দিয়ে—সেই মাথা আঁচড়ানোর বুরুসটা—ঝাড়তে লাগল তার জুতা ও তার পাজামা। মেয়েটি সোফাটার পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়ল, এবং দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধ'রে তার অনিমেষ নয়ন নিবিষ্ট ক'রে রইল তার ভ্রাতার পানে।

সানিন ঘষতে লাগল, এবং থেকে-থেকে মেয়েটিকে চুপি-চুপি দেখে নিতে লাগল। হায়! হায়! কী সুন্দরী!

৩

তার নাসা ঈষৎ দীর্ঘ কিন্তু সুদর্শন, খগসদৃশ ; তার ওষ্ঠ হাল্‌কা পাতলা রোমে ছায়াচ্ছন্ন ; কিন্তু তার মুখের বর্ণ মসৃণ, সমতাপন্ন, হস্তীদন্ত বা অতি পাণ্ডুর শুভ্র চন্দনরুদ্র মতো, পিত্তি প্রাসাদে রক্ষিত এলোরিওর আঁকা জুডিথের মতো তার চিকুরের সেই তরঙ্গায়িত দীপ্তি ; আর সর্বোপরি তার চোখ, ঘনধূসর, কৃষ্ণ-রেখা-নিবদ্ধ তারকাযুত তার চোখ, এখনো, যখন ভয় ও সন্তাপ সে দুটিকে নিষ্প্রভ করেছে, এখনো সুরুচির, জয়শ্রীমণ্ডিত তার চোখ ... যে আশ্চর্য দেশ থেকে সে সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করেছে সে-দেশকে স্মরণ না-ক'রে সানিন থাকতে পারলে না। ... কিন্তু ইতালিতেও তার মতো কোনো কিছুর সে সাক্ষাৎ পায়নি! মেয়েটি অদ্রুত অসম নিঃশ্বাস টানছিল ; মনে হচ্ছিল প্রতি উচ্ছ্বাসের মধ্যে তার ভাই নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ ক'রে কি-না দেখবার জন্যে সে প্রতীক্ষা করছে।

সানিন তাকে এখনো ঘষছিল, কিন্তু সে শুধু সে-মেয়েটিকেই পরিদর্শন করছিল না। পাণ্ডালিয়নের মৌলিক চেহারাও তার অভিনিবেশ আকর্ষণ করছিল। বৃদ্ধটি একদম ব্যয়িত হ'য়ে গিয়েছিল, এবং হাঁপাচ্ছিল ; বুরুসের প্রত্যেক সঞ্চালনে সে উঠছিল নেচে এবং সশব্দে আর্তনাদ ক'রে, আর তার বিশাল কেশগুচ্ছগুলো ঘাসে ভিজে স্রোতবিচ্ছিন্ন কোনো সবল লতার মূলের মতো সভারে দুলছিল এ-পাশ থেকে ও-পাশে।

সানিন তাকে সবে বলছিল, 'এর জুতাগুলোও অন্তত খুললে ভালো হ'ত।'

কুকুরটা সম্ভবত এইসমস্ত ব্যাপারের অসাধারণতায় উত্তেজিত হ'য়ে হঠাৎ সামনের পায়ের উপর ভর দিয়ে নিচু হ'য়ে চিৎকার আরম্ভ করলে।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধ তাকে বললে, 'টার্টাগ্লিয়া, ওরে ঘৃণ্য কুকুর!' কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেয়েটির মুখ আশ্চর্যরকমের বদ্‌লে গেল। তার ভ্রূ ঊর্ধ্বে উঠল, তার চক্ষু বিস্ফারিত হ'ল এবং আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

সানিন ফিরে চাইলে ... কিশোরের মুখের উপরে একটি অরুণিমা পরিব্যাপ্ত ; তার আঁখিপল্লব হ'ল কম্পিত, তার নাসাগ্র সঙ্কুচিত। সে তার এখনো নিবদ্ধ দন্তের মধ্য দিয়ে শ্বাস টানলে, দীর্ঘশ্বাস ফেললে ...।

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'এমিল! এমিল আমার!'

আস্তে-আস্তে বিশাল চক্ষুদুটি উন্মুক্ত হ'ল। সে-দুটি তখনো হতবুদ্ধিতার ছায়াম্লান। কিন্তু এর মধ্যেই স্মিত হাস্য করছে ; সেই স্মিত হাসিই তার বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে ইতস্তত করছিল। তারপরে ভূমি-ন্যস্ত হাতখানাকে নেড়ে বুকের উপরে রাখলে।

মেয়েটি আবার বললে, 'এমিলিও' এবং উঠে দাঁড়াল। তার মুখের ব্যঞ্জনা এমন অশিথিল যে মনে হচ্ছিল যে পলকের মধ্যেই হয় সে ভেঙে পড়বে নচেৎ হাসিতে ফেটে যাবে।

বাহির হ'তে শোনা গেল, 'এমিল, কী হয়েছে, এমিল', এবং একজন পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ

পরিহিতা, রৌপ্যকেশিনী, শ্যামা রমণী ত্রস্তপদে গৃহমধ্যে এলেন। তাঁর পিছু-পিছু এলেন একজন মধ্যবয়সী লোক ; তাঁদের কাঁধের ঊর্ধ্বে একটি পরিচারিকার মাথা দেখা যাচ্ছিল।

মেয়েটি তাঁদের দিকে ছুটে গেল। হৃদয়াবেগে আগন্তুক রমণীকে আলিঙ্গন ক'রে সে উচ্চ কণ্ঠে বললে, 'ও বেঁচে গেছে মা, ও বেঁচে আছে।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু হয়েছে কী? আমি ফিরে আসছি, আর হঠাৎ ডাক্তার ও লুইসের সঙ্গে দেখা ...।'

মেয়েটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে কী হয়েছিল, এবং ইতিমধ্যে ডাক্তার রোগীর কাছে এগিয়ে গেলেন। রোগীটি ক্রমশই প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আসছিল আর তখনো হাসছিল : মনে হচ্ছিল যে-বিক্ষোভ সে ঘটিয়েছে তার জন্যে সে লজ্জা অনুভব করতে শুরু করেছে।

ডাক্তার বললেন, 'দেখছি।'

'আপনারা বুরুসের সাহায্যে মালিস দিয়েছিলেন, খুব ভালো করেছেন ... প্রেরণাটা অতি উত্তম ... এখন দেখি আর কী উপায় ...।'

তিনি যুবকের নাড়ি দেখলেন। 'হুম্! তোমার জিভ দেখাও!'

রমণীটি ভাবনা সহকারে তার উপরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সে তখন আরো অমায়িক হাসি হেসে তাঁর দিকে চোখ তুললে, এবং লজ্জায় একটু লাল হ'য়ে গেল।

সানিনের জ্ঞান হ'ল যে সে আর আবশ্যকীয় নয় ; সে দোকানে গেল। কিন্তু সদর দরজার হাতল স্পর্শ করতে পারার সময় পাবার পূর্বেই সে-মেয়েটি আবার তার সম্মুখবর্তিনী হ'ল ; সে তাকে থামালে।

অনুভূতিপূর্ণ নেত্রে তার পানে চেয়ে সে বলতে শুরু করলে, 'আপনি যাচ্ছেন আমি আপনাকে ধ'রে রাখব না, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করা চাই-ই চাই ; আপনার কাছে আমরা এত ঋণী — আপনি সম্ভবত আমার ভাইয়ের জীবন রক্ষা করেছেন, আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, — মা চান। আপনি কে তা আমাদের বলতে হবে, আমাদের আনন্দে আপনার যোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য!'

সানিন ইতস্তত ক'রে উত্তর দিলে, 'কিন্তু আমি আজই বার্লিনে যাচ্ছি ...।'

মেয়েটি সাগ্রহে বললে, 'ঠিক সময় পাবেন। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে একটু চকোলেট খেয়ে যাবেন অঙ্গীকার করছেন? ওর কাছে আমায় ফিরে যেতে হচ্ছে! আসবেন তো?'

সানিন কী করবে?

সে জবাব দিলে, 'হাঁ, আসব।'

সুন্দরী তার হাতখানাকে চাপলে, ব্যস্ততা সহকারে অন্তর্ধান হ'য়ে গেল, এবং সানিন দেখলে সে রাস্তায় এসে পড়েছে।

[নামহীন অনুবাদ গল্প ১]

সে বলতে লাগল :

আমার জন্ম হয় বাজতাঁ উপত্যকায় এলিজন্দো গ্রামে। আমার নাম ডন জোসে লিজারাবেঙ্গোয়া। আমার নাম শোনবামাত্র আমাকে বাস্‌ক্‌দেশীয় আর নিষ্ঠাবান্ খ্রিস্টান ব'লে চেনবার মতো দখল আপনার স্পেনীয় ভাষায় জন্মেছে। আমি যে আমার নামের পূর্বে 'ডন' শব্দের প্রয়োগ করি, তার কারণ ও-পদবীতে আমার উত্তরাধিকার আছে। এটা যদি এলিজন্দো হ'ত, তাহ'লে চর্মপটে লেখা আমার বংশকারিকা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারতুম। সকলের ইচ্ছা ছিল, আমি যাজকতা করি ; সেইজন্যে অভিভাবকেরা আমার লেখাপড়ার প্রতি নজর করলেন, কিন্তু অধ্যয়নের থেকে লাভ করেছি সামান্যই। টেনিস খেলা ছিল আমার প্রাণ, আর তার কৃপায় হয়েছি সর্বস্বান্ত। আমরা, নাভারিয়রা যখন টেনিস খেলি, তখন সমস্ত ভুলে যাই। একদিন আমি জিতেছি, দেখি আলতার একটি ছোক্‌রা গায়ে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধালে ; আমরা লগুড় ধরলুম, এবং তাতে প্রাধান্য থাকল আমারই। সেই জয়গৌরবের ফলেই আমি দেশত্যাগী। একদল অশ্বারোহী সৈনিকের পাল্লায় প'ড়ে আমি নিলুম আলমাঞ্জা পল্টনের তুরঙ্গ-বিভাগে চাকরি। আমাদের পাহাড়ের লোকেরা যুদ্ধবৃত্তিতে অচিরেই পারদর্শী হয়। অল্পদিনেই আমি নায়কের পদে উন্নত হলুম, এবং আমায় একটা থানার অধ্যক্ষ করবেন ব'লে কর্তৃপক্ষেরা প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনসময়ে আমার সর্বনাশের জন্যে সেভিলে তামাকের কারখানায় পাহারার ভার পড়ল আমার উপরে। আপনি যদি সেভিলে গিয়ে থাকেন তাহ'লে নগর-প্রাকারের বাইরে, গুয়াদেল কুইভারের কাছে সেই প্রকাণ্ড ইমারৎখানি দেখে থাকবেন। মনে হচ্ছে, সেই সিংদরজা আর তার সন্নিকটে সেই সান্ত্রিদের ফাঁড়িটা আজও যেন চোখের সামনে। কর্তব্যকর্মের সময়ে স্পেনীয়রা হয় মাতে তাস খেলায় নয় বাঁচে ঘুমিয়ে , কিন্তু আমি সরল নাভারিয়দের মতো সর্বদা আত্মনিয়োগের চেষ্টা করতুম। একদিন আমার সঙিনটা ঝোলানোর জন্যে একটা পিতলের শিকলি গড়ায় রত ছিলুম, এমনসময় আমার সঙ্গীরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : ওই ঘণ্টা বাজছে, ছুঁড়িদের কাজে ফেরার সময় হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে সেই কারখানায় অন্তত চার-পাঁচশো স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকে। যে প্রকাণ্ড কামরায় তারা চুরুট পাকায় সেখানে পুলিসের কর্তার বিনা-অনুমতিতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, কারণ যখন গরম বাড়ে তখন এই রমণীরা, বিশেষত যুবতীরা, সেখানে বিরাজ করে বিবশ স্বচ্ছন্দে। যে-সময়ে শ্রমিকরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফেরে তখন তাদের শোভাযাত্রা দেখবার জন্য

সেখানে যুবার দল এসে জমে এবং উভয়পক্ষে খুব রং-তামাসার আদানপ্রদান চলে। এঁদের মধ্যে এমন মহিলা অতি অল্পই আছেন যাঁরা একখানা রেশমি ওড়নার প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এ-ধরনের মাছ ধরায় যাদের সখ, তাদের শিকার গাঁথার জন্যে একটু ঘাড় নোয়াতে হয় মাত্র। অন্যেরা যখন হাঁ ক'রে তাকাতে লাগল, আমি তখন দরজার কাছে আমার সেই বেঞ্চিখানিতে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তখনো আমি কিশোর ; সর্বদা দেশের কথাই ভাবতুম, এবং আমার ধারণা ছিল যে নীল ঘাঘ্‌রা আর আস্কন্ধ বেণী[১] ব্যতিরেকে সুন্দরী হয় না। তাছাড়া আন্দালুসীদের আমি ভয় করতুম ; তখনো তাদের সেই অষ্টপ্রহরব্যাপী গাম্ভীর্যহীন মশকরার আদবকায়দা আমার গায়ে সয়নি। কাজেই আমি তখন আমার শিকলিটায় মুখ গুঁজড়ে ছিলুম, এমনসময় শুনলুম নাগরিকরা বলাবলি করছে, ওই জিপ্‌সিনী আসছে! আমি চোখ তুললুম, এবং তাকে দেখলুম। সেদিন শুক্রবার, সেটাকে কখনো ভুলব না। চোখে পড়ল আপনার পরিচিত কারমেনকে। তারই বাড়িতে মাস-কয়েক আগে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ।

তার নাতি-প্রস্থ ঘাঘ্‌রার নিচে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল শাদা রেশমের একজোড়া শতচ্ছিদ্র মোজা আর বহ্নিবরণ ফিতে দিয়ে বাঁধা লাল-চামড়ার দু-পাটি চমৎকার জুতা। সে এমনভাবে ওড়নাখানিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে তার কাঁধ আর তার সেমিজে আটকানো প্রকাণ্ড জুঁইয়ের তোড়াটা বেশ প্রত্যক্ষ হয়। তার মুখের কোণেও ছিল একটি জুঁই ফুল এবং কর্দোভার অশ্বশালার কোনো তুরঙ্গীর মতো শ্রোণিসঞ্চালনে সে হচ্ছিল আগুয়ান। আমার দেশে কোনো নারীকে এমন বেশে দেখলে লোকে ইষ্টনাম নেবার পথ পেত না। সেভিলে তার সাজসজ্জাকে উপলক্ষ ক'রে প্রত্যেকেই তাকে অন্তত গোটাকয়েক নাগরশোভন স্তোকোক্তি শোনালে। আর সে-ও কটাক্ষ চাহনিতে, কোমরে হাত রেখে মজ্জাগত স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে খাঁটি জিপ্‌সির মতো অসঙ্কোচে উত্তর দিলে প্রত্যেককেই। প্রথমটা তাকে আমার পছন্দ হয়নি, কাজেই আমি আবার আমার কাজে নিবিষ্ট হলুম। কিন্তু নারীকে বা বিড়ালকে যখন ডাকা যায় তখন তারা আসে না, আসে যখন তারা অনাহূত ; এই নিয়ম মোতাবেকে সে-ও আমার সামনে থেমে আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলে। আন্দালুসী কায়দায় সে বললে : মিতে, আমার সিন্দুকের চাবি রাখবার জন্যে তোমার শিকলিটা আমায় দেবে কি?

আমি জবাব দিলুম : এটা আমার সঙিন ঝোলাবার জন্যে।

সে হেসে চেঁচিয়ে উঠল : তোমার সঙিন! মশায়ের যখন ডাঙোশের দরকার হয়, উনি তখন লেস্‌ বানান! উপস্থিত সকলে হাসতে আরম্ভ করলে, এবং আমার বোধ হ'ল আমি লজ্জায় রক্তবর্ণ ; জবাব দেবার কিছু খুঁজে পেলুম না। সে আবার ধরলে : বেশ, প্রাণেশ্বর, একখানা ওড়নার জন্যে আমায় সাত হাত কালো লেস্‌ তৈরি ক'রে দাও না, ও গো আমার প্রাণের সঙিনকার। -- এবং সে তার মুখ থেকে সেই জুঁই ফুলটা নিয়ে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের একটা কেমনতর ভঙ্গি ক'রে, সেটাকে আমার দুটো চোখের ঠিক মাঝখানে ছুঁড়ে মারলে। তার ফলে

১. নাভার ও বাস্‌ক্‌ প্রদেশের কৃষকরমণীদের আটপৌরে পোশাক।

আমার মনে হ'ল যেন একটা গুলি এসে আমায় বিঁধল। কোথাও লুকানোর স্থান পেলুম না, কাঠের মতো নিশ্চল হ'য়ে রইলুম। সে যখন কারখানায় প্রবেশ করলে, তখন নজরে পড়ল যে তার জুঁইফুলটা আমার পদদ্বয়ের মধ্যে নিপতিত; জানি না আমার কী হ'ল, কিন্তু সেটাকে আমার সঙ্গীদের অলক্ষ্যে সংগ্রহ ক'রে রাখলুম আমার জামার ভিতরে। প্রথম বোকামি!

দু-তিন ঘণ্টা বাদেও আমি তাকে ভাবছিলুম, এমনসময় আমাদের থানায় বিচলিত বদনে একজন কুলি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে উপস্থিত। সে আমাদের জানালে যে সেই চুরুটের কামরায় একজন স্ত্রীলোক হ'ত হয়েছে, সেখানে চৌকিদার পাঠানো অত্যাবশ্যক। সেখানে দু-জন লোক নিয়ে যাবার জন্যে নায়েক আমায় আদেশ করলেন। আমি আমার লোক নিয়ে চললুম। কল্পনা ক'রে দেখুন মশাই, যে, প্রবেশ ক'রেই আমি সবপ্রথম দেখতে পেলুম, সেমিজ-পরা, অথবা যদি তার চেয়েও আরো কিছু কম-পরা সম্ভবপর হয়, তিনশো রমণী একসঙ্গে কেঁদে, কঁকিয়ে, হাত-পা নেড়ে যে-কোলাহলের সৃষ্টি করেছে তার ভিতরে ভগবানের বজ্রগর্জন শুনতে পাওয়াও অসাধ্য। একপাশে হাত-পা খিঁচিয়ে একটি মেয়ে চিৎ হ'য়ে পড়ে; তার দেহ রক্তে ঢাকা; কে সবেমাত্র তার মুখের উপরে ছুরির দুটো ঘায়ে একটা ঢেরা এঁকে দিয়েছে; দলের শ্রেষ্ঠ রমণীরা তার শুশ্রূষায় রত। উল্টোদিকে দেখলুম, কারমেনকে পাঁচ-ছ-জন সহকর্মী ধ'রে রেখেছে। আহত রমণীটি চিৎকার করছে: একরার কর্! একরার কর্! ম'রে গেলুম! কারমেন নির্বাক, নিবদ্ধ-দন্ত, বহুরূপীর মতো বিক্ষুব্ধ-চক্ষু। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: হয়েছে কী? ঘটনাটা জানবার জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল, কেন-না সমস্ত শ্রমিক একজোটে করলে বাক্যারম্ভ। প্রকাশ পেল, আহতা রমণীটি নাকি ত্রিয়ানার হাটে একটা গাধা কেনার মতো টাকা সঙ্গে আছে ব'লে জাঁক দেখায়। কারমেনের জিহ্বাটা একটু খর; সে বলে: আরে থাম্! তাহ'লে একটা ঝ্যাটার দাম তোর সঙ্গে নেই? অপরটি সম্ভবত নিজের বড়াই অমূলক জেনে, সেই ভর্ৎসনায় জখম হ'য়ে উত্তর দেয় যে ঝ্যাটার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, কেন-না বাস্তুছাড়া ডাইনি হওয়ার সৌভাগ্যে সে বঞ্চিত, কিন্তু দারোগা-মশাই যখন মাথা মুড়ানোর জন্যে মাদ্‌মোয়াসেল কারমেনসিতাকে দু-জন সান্ত্রীর আগে-আগে হাওয়া খেতে পাঠাবেন, তখন তার গাধার সঙ্গে কারমেন-মহাশয়ার আলাপ হবে অবিলম্বেই। কারমেন বলে: বেশ তো আয় না, আমি তোর গালেই ক্ষৌরি হওয়ার ঘাট বানিয়ে দিচ্ছি; ওর উপরে আমি সতরঞ্চের ছক[১] কেটে দেব। এই নচ্ছারনী! এই কথা ব'লে সে যে-ছুরি দিয়ে চুরুটের গোড়া কাটত, তারই সাহায্যে তার মুখের উপরে সেন্ট আঁদ্রের[২] ক্রুস আঁকতে শুরু করে।

ব্যাপারটা প্রাঞ্জল; আমি কারমেনের হাত ধ'রে সবিনয়ে বললুম: ভগ্নি, আমার সঙ্গে আসুন! তার চাহনি দেখে মনে হ'ল যেন সে আমায় চিনেছে; কিন্তু বশ্যতার স্বরে বললে: চলুন। আমার ওড়নাটা কোথায়?—সেখানাকে সে এমনভাবে মাথার উপরে চাপালে যাতে

১. স্পেনে সতরঞ্চের ছকে সাধারণত লাল-কালো ঘর কাটা থাকে।
২. সেন্ট আঁদ্রে নরসুন্দরের উপাস্য দেবতা।

তার একটিমাত্র আয়তচক্ষু ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট না-হয়। তারপরে নিরীহ ভেড়ার মতো আমার লোকদুটির করলে অনুগমন। থানায় পৌঁছতে আমাদের নায়েক বললেন যে ঘটনাটি বড়ো গুরুতর, কাজেই তাকে গারদে পাঠানো দরকার। তাকে নিয়ে যাবার ভারও পড়ল আমার উপরে। আমি তাকে দু-জন প্রহরীর মাঝে স্থাপন করলুম। এবং দলপতির সামরিক কর্তব্য-মতো নিজে চললুম তাদের পিছনে-পিছনে। আমরা সহরের রাস্তা ধরলুম। প্রথমটা জিপ্‌সিনী চুপ ক'রে রইল। কিন্তু ভুজঙ্গ-পথে আসতেই,—সেটাকে আপনি জানেন, কুটিলতার বাহুল্যের বিচার করলে নামটি তার অবশ্য প্রাপ্য, — ভুজঙ্গ-পথে আসতেই, তার মিনতি-মাখা মুখখানি আমায় দেখানোর উদ্দেশ্যে ওড়নাখানাকে—কাঁধের উপরে নেমে আসতে দিয়ে এবং আমার দিকে সাধ্যমতো ঘুরে সে তার আত্মসিদ্ধির গোড়াপত্তন করলে এই ব'লে :

— সর্দার-মশাই, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

আমি যতদূর সম্ভব কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলুম : গারদে, বাছা। আমার মতে প্রত্যেক সৎ যোদ্ধারই বন্দীর সঙ্গে, বিশেষত কোনো নারীর সঙ্গে এইভাবে আলাপ করা উচিত।

— হায়, হায়! আমার কী হবে? সর্দার-মহাশয়, আমার উপরে কৃপা করুন। আপনি যে অত্যন্ত তরুণ, অত্যন্ত সহৃদয়! ... তারপরে আরো নিচু গলায় সে আবার বললে : আমায় পালাতে দিন, আমি আপনাকে এক টুক্‌রো 'বার-লাচি' দেব। তা দিয়ে আপনি সমস্ত মেয়ের ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পারবেন।

মহাশয়, 'বার-লাচি' হচ্ছে চুম্বক পাথর। বেদেরা দাবি করে যে তার সঠিক ব্যবহার জানলে, তার সাহায্যে খুশিমতো জাদু করা সম্ভব। এক গেলাস শ্বেত-সুরার মধ্যে একবার সেটা একটু ঘ'ষে কোনো রমণীকে খাইয়ে দিন। সে আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আমি কিন্তু সাধ্যমতো গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিলুম : আমরা এখানে বাজে বকতে আসিনি ; গারদে যেতেই হবে। এই হচ্ছে হুকুম, এর থেকে আর কোনো প্রতিকার নেই।

আমাদের, বাস্‌ক্‌দেশের লোকেদের একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতি আছে ; ফলে আমাদের চিনে নেওয়া স্পেনীয়দের আয়াসসাধ্য নয় ; এর প্রতিপক্ষে, এদের মধ্যে এমন একটি মানুষ নেই যে আমাদের ভাষায় 'হাঁ, মশাই', এই কথাটুকু বলতে শিখেছে। কাজেই, আমি যে পাড়াগাঁ থেকে আসছি, তা আন্দাজ করতে কারমেনের কষ্ট হয়নি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে জিপ্‌সিদের চাল নেই চুলো নেই, তারা ভবঘুরে ; অতএব সমস্ত ভাষাতেই তাদের দখল, পর্তুগালে, ফ্রান্সে, বিস্‌কে অঞ্চলে, কাতালোনিয়াতে সর্বত্রই তাদের অধিকাংশের স্বচ্ছন্দ বিহার ; এমন-কি ইংরেজ ও মুরের সঙ্গেও তারা বিশ্রম্ভালাপ করতে সমর্থ। বাস্‌ক্‌ ভাষা কারমেন ভালো ক'রেই জানত। সে হঠাৎ সেই ভাষায় ব'লে উঠল : ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি কি আমার স্বদেশী?

মহাশয়, আমাদের ভাষা এত সুন্দর যে, যখন তা পরদেশে শুনি, তখন আমরা চমকে উঠি ...। (দস্যুটি অনুচ্চ স্বরে বললে : ইচ্ছা ছিল, আমার চরমোক্তি শুনে আমার পাপমোচন

করার জন্যে যেন একজন স্বদেশী পাদ্‌রিকে আনা হয়।) খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে আবার তার জীবনকাহিনী বলতে লাগল :

নিজের জবানি শুনে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে আমি বাস্‌ক্‌ ভাষায় উত্তর দিলুম : আমি এলিজন্দোর লোক।

সে বললে : আর আমি এচালারের। এ-জেলাটি আমাদের বাড়ি থেকে মোটে চার ঘণ্টার পথ। — আমায় সেভিলে নিয়ে আসে একদল বেদেতে। নাভারে আমার মায়ের কাছে ফিরে যাবার মতো সংস্থান সংগ্রহের জন্যেই আমি কারখানায় কাজ করতুম। আহা আমি আর একটা গোটা-কুড়িক আপেলগাছ-ওয়ালা একটি ছোটো বাগান ব্যতীত তাঁর যে আর কোনো সম্বল নেই। ওঃ। এখন যদি আমার সেই ধবলগিরি-ঘেরা দেশে থাকতুম? এই বাটপাড়ের দেশের, এই পচা-নারেঙ্গি বিক্রেতার দেশের লোক নই ব'লেই আমার যত লাঞ্ছনা ; আর ওই-সর্বনাশীরা যে আমার বিরুদ্ধে দল বেঁধেছে তার কারণ আমি ওদের বলি যে, ওদের সেভিলের ছুরিধার সমস্ত গুণ্ডারা একত্র হ'য়েও—আমাদের দেশের টুপি-পরা লাঠিয়াল একা-ছোক্‌রাকেও ভয় পাওয়াতে পারবে না। বন্ধু, সখা, তুমি কি স্বদেশীর জন্যে কিছুই করবে না?

সে মিথ্যা বলছিল, মহাশয়, সে আজীবন মিথ্যা বলেছে। সে-মেয়েটি কখনো একটা সত্য কথা কয়েছে কি-না জানি না ; কিন্তু সে যখন ব'লে যাচ্ছিল, আমি তাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি। আমার এই মনোভাবটা তখন আমার কর্তব্যবুদ্ধির থেকে ঢের বেশি বলবান। সে বাস্‌ক্‌ ভাষাকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিলে, কিন্তু আমি ভাবলুম সে বুঝি নাভারি ; কেবল তার চোখ, মুখ ও কান্তি থেকে প্রকাশ পেতে লাগল যে সে একজন জিপ্‌সি। আমি তখন উন্মাদ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। আমি ভাবছিলুম যে কোনো স্পেনীয় যদি আমার দেশের নিন্দা করা সমীচীন ব'লে ভাবে, তাহ'লে কারমেন যেমন ক'রে তার সাথীর মুখ ফেড়ে দিয়েছিল, আমিও তেমনি ক'রে সেই স্পেনীয়ের মুখ ছিন্নভিন্ন ক'রে দিই। সঙ্ক্ষেপে আমি তখন মাতাল ; প্রলাপ বকতে শুরু করেছি ; যে-কোনো অসাধ্যসাধনের জন্যে আমি তখন প্রায় প্রস্তুত।

বাস্‌ক্‌ ভাষায় সে ফের বলতে লাগল : আমি যদি তোমায় ঠেলে দিই, বন্ধু, আর তুমি প'ড়ে যাও, তাহ'লে ও-দুটো কাতালোনি অনিচ্ছ-সৈনিকের সাধ্য কী আমায় ধরে...। ধর্ম সাক্ষী ক'রে বলছি আমি হুকুম-টুকুম সব ভুলে গেলুম। জবাব দিলুম : বেশ, সখি, চেষ্টা ক'রে দেখো। ভগবান তোমার সহায় হোন!

সে-সময়ে আমরা একটা সরু গলির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেভিলে এমন গলির ছড়াছড়ি। কারমেন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার বুকে এক ঘুসি মারলে। আমি ইচ্ছা ক'রে উল্টে পড়লুম পিছনদিকে। এক লাফে সে আমায় ডিঙিয়ে গেল, এবং একজোড়া পা নিষ্কাশিত ক'রে, লাগল ছুটতে।...কথায় আছে, বাস্‌ক্‌ দেশের পা ; তার দুটি আবার বাস্‌কীয় পায়ের মধ্যেও সমকক্ষহীন... যেমনি দ্রুত, তেমনি সুগোল। আর আমি? আমি মুহূর্ত-মধ্যে উঠে পড়লুম ; কিন্তু আমার বল্লমটা দিয়ে এমন ক'রে রাস্তা আট্‌কে দিলুম যে তাকে অনুধাবন করার প্রথম প্রয়াসেই আমার সঙ্গীরা হ'ল ব্যাহত। তারপরে তাদের পিছনে নিয়ে আমি

নিজেই করলুম ছুটতে শুরু। কিন্তু তাকে ধরা! আমাদের অশ্বতাড়নি, অসি, বল্লমের কৃপায় সে-আশঙ্কা-সুদ্ধ বিলুপ্ত। উপরন্তু সে-পাড়ার ঠান্‌দিদিরাই সকলে তার পলায়নের অনুকূল ; তারা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি ক'রে শেষে দেখিয়ে দিলে একটা ভুল পথ। অনেকক্ষণ ইতস্তত দৌড়াদৌড়ির পরে কারাধ্যক্ষের রসিদ ব্যতীতই আমরা থানায় ফিরে যেতে হলুম বাধ্য।

সাজা এড়াবার জন্যে আমার সহচরেরা বললে যে কারমেন আমার সঙ্গে বাস্‌ক্ জবানীতে কথা বলেছে; তাছাড়া তার মতন একজন তরুণীর ঘুসি খেয়ে আমার সমান একটি জোয়ানের অত সহজ ভূপতনটাও যেন কেমন স্বভাব-বিরুদ্ধ। সব জিনিসটাই যেন একটা সন্দেহে আব্‌ছা ঢাকা অথবা ঠিক বলতে গেলে, সবটাই অত্যন্ত প্রাঞ্জল। পাহারা থেকে ফিরলে পরে আমার পদসঙ্কোচ ঘটল, এবং একমাসের জন্যে আমি হলুম কারারুদ্ধ। চাক্‌রিতে প্রবেশের দিন থেকে এই আমার প্রথম দণ্ড। এতদিন ধ'রে যে নায়ক-মুদ্রাকে আমি আমার মুঠোর ভিতরে ব'লে ভেবেছিলুম, আজ তার থেকে তবে চিরবিদায়!

আমার কারাবাসের প্রথম দিনগুলো কাটল দারুণ বিষাদের মধ্যে। সৈনিক হবার সময়ে আমি মনে করেছিলুম যে, একদিন সেনাধ্যক্ষ হ'তে পারব। আমার দু-জন স্বদেশবাসী, লঙ্গা ও মিনা আজকে উন্নতির চরম শিখরে ; সাপালাঙ্গারাও মিনার মতো একজন কাফ্রি, সে আজ ফেরার হ'য়ে আপনার দেশের আশ্রিত, কিন্তু সে-ও একদিন সেনাপতি ছিল ; তার আমারই মতো হাড়হাভাতে ভাইটির সঙ্গে এমন বিশ-ত্রিশবার টেনিস খেলেছি। এইসময়ে আমি প্রায়ই মনে-মনে বলতুম : বিনা-দণ্ডে তুমি যতদিন কাজ করেছিলে, সে-সমস্ত কালটাই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। আজ তুই কলঙ্কগ্রস্ত ; কর্তাদের মন আবার ফিরিয়ে পেতে হ'লে, খাটতে হবে, নূতন বেলার চেয়ে দশ গুণ বেশি খাটতে হবে! আমি নিজের সাজার ব্যবস্থা করলুম কেন? একটা আঁটকুড়ি বেদেনির জন্যে ; আর আজ এই শহরের কোনো-না-কোনো কোণে সে চৌর্যরত আর আমি তারই বিদ্রূপে বিড়ম্বিত। কিন্তু তাহ'লেও তাকে ভাবা বন্ধ করতে পারলুম না। আপনার বললে বিশ্বাস হবে না, পালানোর সময় যে শতচ্ছিদ্র রেশমি মোজাজোড়া সে আমায় প্রত্যক্ষ করিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো তখন অহোরাত্রই আমার চোখের সামনে ভাসমান। আমি কারাগারের গরাদের ভিতর দিয়ে রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকতুম, কিন্তু যত রমণী যাতায়াত করত, তাদের মধ্যে একটিরও মূল্য, আমার চোখে, সেই সর্বনাশীর সমান নয়। আর তারপরে যে জুঁইফুল ছুঁড়ে সে আমায় মেরেছিল এবং যেটা শুষ্ক ব'লেও সৌগন্ধহীন হয়নি, সেই ফুলটি নিয়ে আমি শুঁকতে থাকতুম। ... জগতে যদি ডাইনি থাকে, তাহ'লে সেই মেয়েটি তাদের মধ্যে অন্যতম।

একদিন জেল-দারোগা এসে, আমায় একখানা আল্‌কালার রুটি[১] দিয়ে বললে : দেখো,

১. আল্‌কালা সেভিলের তিন ক্রোশ দূরের একটি নগর। সেখানে অতি উপাদেয় ছোটো-ছোটো রুটি তৈয়ারি হয়। সেখানকার লোকেরা বড়াই করেন যে আল্‌কালার জলই এই উৎকর্ষতার [য] বিধায়ক। প্রত্যহ বহু পরিমাণে এই রুটি সেভিলে আমদানি করা হয়।

তোমার ভগ্নী কী পাঠিয়েছেন! আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হ'য়ে রুটিখানা নিলুম, কারণ সেভিলে আমার কোনো কুটুম্বই ছিল না। আমি রুটিটা দেখতে-দেখতে ভাবলুম, একটা কিছু হ'য়ে থাকাই সম্ভব ; কিন্তু সেখানা এতই রুচিপ্রদ, তার এমনই সৌগন্ধ যে সেটা কোথা থেকে আসছে, তার কোথায় গন্তব্য, এ-সমস্ত জানার জন্যে উদ্বিগ্ন না-হ'য়ে আমি রুটিটা খাওয়াই করলুম ধার্য। সেটা কাটতে-কাটতে একটা কী শক্ত পদার্থে আমার ছুরিখানা ধাক্কা পেলে। ভালো ক'রে চেয়ে দেখলুম যে রুটিখানা সেঁকবার আগে ময়দার মধ্যে একটা ইংরেজি উকো কে সাঁদ করিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া তার ভিতরে একটা সোনার ও দুটো রূপার মুদ্রা। আর কোনো সন্দেহ রইল না, সেটা কারমেনেরই উপহার। তার জাতির লোকের কাছে স্বাধীনতাই সর্বস্ব। এবং এক দিবস কারাবাসের থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে তারা একটা শহরে আগুন লাগিয়ে দিতেও সমর্থ। উপরন্তু সে যে বড়ো পরিহাসপ্রিয়, এই রুটিটা কি প্রহরীদের প্রতি একটা অবজ্ঞার নিদর্শন নয়? এক ঘণ্টার মধ্যে স্থূলতম গরাদটিও সেই উকোর সাহায্যে করাত-কাটা হ'য়ে গেল ; এবং সেই টাকা দুটোর কৃপায় পুরানো কাপড়ের প্রথম দোকানে আমি আমার কয়েদি উর্দিটা বদ্‌লে নিলুম একটা সাধুশোভন পোশাকের সঙ্গে। যে-ব্যক্তি আমাদের পাহাড় থেকে অসংখ্যবার ঈগলের বাসা পেড়েছে তার পক্ষে ত্রিশ ফুটেরও কম উঁচু জানলা বেয়ে রাস্তায় নামা যে ক্লেশকর নয়, আপনার এ-বিশ্বাস খুবই সঙ্গত, কিন্তু পালানোর আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার সৈনিকোচিত মর্যাদাজ্ঞান তখনো অক্ষুণ্ণ, কাজেই মনে হয়েছিল, এমন ক'রে উধাও হওয়াটা অত্যন্ত গর্হিত। শুধু অবিস্মরণের নিদর্শনটা আমার পরান স্পর্শ করলে মাত্র। কারাবাসের সময়ে বহির্জগতের কোনো বন্ধু আমাদের মঙ্গলচিন্তা করছেন, এই প্রত্যয়টা অতি প্রীতিকর। সেই স্বর্ণমুদ্রাটার জন্যে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম বটে, ইচ্ছা করছিল সেটা ফিরিয়ে দিই ; কিন্তু আমার উত্তমর্ণকে মিলবে কোথায়? মনে হ'ল না সেটা সহজ।

সেই পাতিত্যানুষ্ঠানের পরে, মনে হয়েছিল, লাঞ্ছনার চরম সীমায় পৌঁছেছি ; কিন্তু তখনো আমার আরেকটা দারুণ অপমান গলাধঃকরণ করতে বাকি : সেটা পূর্ণ হ'ল, যখন কারামুক্তির পরে সামান্য সিপাইয়ের মতো আমারও উপরে পড়ল দ্বারপালনের ভার। এমন ক্ষেত্রে একজন সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ যে কী অনুভব করে, তা আপনার কল্পনারও অতীত। মনে হ'ল এর চেয়ে বন্দুকের গুলিতে প্রাণদণ্ডও শতশ্রেয়। সে-যাত্রাটা অন্তত নিঃসঙ্গ, নিজেরই পল্টনের পুরোভাগে ; সে-অনুভূতি নিতান্ত আস্পর্ধাহীন নয় ; তখন জগৎ আমাদের দিকে হাঁ-ক'রে তাকিয়ে থাকে।

আমি হলুম আমাদের প্রধান সেনাপতির ফটকে দারোয়ানরূপে নিযুক্ত। তিনি একজন অলসবুদ্ধি, প্রমোদপ্রিয়, অবস্থাপন্ন যুবক। তাঁর বাড়িতে সমস্ত তরুণ সেনানায়কদের সমাবেশ হ'ত, নাগরিকদের দল, এমন-কি রমণীরা—যাঁদের চল্‌তি কথায় নটী বলে, তারা সুদ্ধ বাদ যেতেন না। আমার কিন্তু মনে হ'ত বুঝি সারা শহরকে সেই দ্বারে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, শুধু আমাকে দেখবার জন্যে। একদিন দরজায় একখানা গাড়ি এসে উপস্থিত হ'ল, তার কোচ-বাক্সে আমাদের প্রধান সেনাপতির বরকন্দাজ ব'সে। কাকে নামতে দেখছি? এ যে জিপ্‌সিনী।

সেদিনে সে একটি পূজাবেদীর মতো অলঙ্কারমণ্ডিত, বসনে-ভূষণে ঢাকা, আগাপাশতলা সোনা আর রেশমি ফিতে দিয়ে মোড়া। তার পোশাকে সল্‌মা-চুম্‌কি, তার জুতায় সল্‌মা-চুম্‌কি, ফুলের, লেসের ছড়াছড়ি। তার হাতে একটা বাস্‌ক্‌দেশী মাদল, সঙ্গে দু-জন অপর জিপসিনী, একজন তরুণী, একজন বৃদ্ধা। এদের পরিচালনার জন্যে সঙ্গে সর্বদাই একজন বুড়ি থাকে ; আর থাকে একজন বুড়ো জিপ্‌সি, নাচের সময় সারেঙ্গ বাজানোর জন্যে। আপনার বোধহয় জানা আছে যে মার্জিত সমাজের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে, তাদের সেই নিজস্ব 'রোমালি' নৃত্য দেখানোর জন্যে, অনেকসময় অপর কিছু করার জন্যেও, জিপ্‌সিনীদের প্রায়ই আহ্বান করা হয়।

কারমেন আমাকে চিনলে, আমরা দৃষ্টি-বিনিময় করলুম। ব্যাপারটা খুবই সামান্য কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি স্বগত বললুম : ধরণী দ্বিধা হও। বললে : নমস্কার, নায়েক-বন্ধু, তুমি শেষে আনাড়ি সিপাইয়ের মতো দারোয়ানি করছ? জবাব দেওয়ার কোনো কথা খুঁজে পাওয়ার আগেই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

উঠানের মধ্যে জমেছিলেন নগরের সব বড়োলোক। সেই বিপুল জনতা সত্ত্বেও তার ভিতরে কী হচ্ছিল, তা আমি আমার নিকটস্থ গরাদের[১] ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম। শুনতে পেলুম খঞ্জনির আওয়াজ, মাদলের বাদ্য, হাসির উৎস, করতালের ধ্বনি ; মাঝে-মাঝে যখন সে মাদল হাতে ক'রে লাফিয়ে উঠছিল তখন তার মাথাও আমার নজরে আসতে লাগল। তারপরে আবার সেনানায়কদের তাকে এমন সমস্ত কথা বলতে শুনলুম যে লজ্জায় আমার মুখ লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু সে কী জবাব দিলে তা আমার অবিদিত।

মনে হয় সেইদিন থেকেই আমি তাকে সত্যকারের ভালোবেসে ফেললুম ; কারণ, অন্তত তিন-চারবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে একবার আগুনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেই সমস্ত চাটুতৎপর নবকার্তিকদের উদরে আমার অসিটা আমূল প্রবেশ করিয়ে দিই। আমার যন্ত্রণা চলল একটি পুরা ঘণ্টা ধ'রে ; তারপর জিপ্‌সিরা বেরিয়ে এল। এবং গাড়িখানা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় কারমেন আমার দিকে আপনার পরিচিত সেই চাহনিটি একবার নিক্ষেপ ক'রে চুপি-চুপি বললে : বন্ধু, মুখ বদ্‌লানোর ইচ্ছে হ'লে ত্রিয়ানাতে লিলা পাস্তিয়ার দোকানে এসো। তারপর মেষ- শিশুর মতো লঘু-লম্ফে সে গাড়িতে চড়ল, চালক খচ্চরদুটোকে কশাঘাত করলে, এবং সেই হাস্যমুখর দলটি যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল, জানি না।

আপনি যদি অনুমান করেন যে আমার পাহারার পালা শেষ হ'তেই আমি ত্রিয়ানায় ছুটলুম, তাহ'লে তা ভুল হবে না ; কিন্তু যাবার আগে কুচকাওয়াজের [.?.] চাঁচতুম, ছুলতুম, চল

১. সেভিলের প্রত্যেক বাড়ির প্রায় একটি ক'রে রোয়াক-ঘেরা আভ্যন্তরিক আঙন আছে। গ্রীষ্মে সেখানে বসা-শোওয়া চলে। এই উঠানটি দিনের বেলা একটা পালে ঢাকা থাকে, রাত্রে সেখানা খুলে ফেলা হয়। বাড়িগুলির সদর দরজা প্রায় সব সময়েই থাকে খোলা, শুধু উঠানে যাবাব দালানটি একটি ঢালাই-করা লোহার চমৎকার কাজ-করা দরজা দিয়ে বন্ধ।

বাগাতুম, আজও তেমনি করলুম। সে লিলা পাস্তিয়ার বাড়িতে ছিল বটে। লিলা পাস্তিয়া একজন বৃদ্ধ ফুলুরি-বিক্রেতা, জাতে বেদে, বর্ণে মুরের মতো কালো। তার দোকানে মাছের ফুলুরি খাবার মানসে দলে-দলে নাগরিক এসে জুটত, এবং কারমেন তার বাড়িতে বাসা বাঁধার পর থেকেই, তার খরিদ্দারের অত বৃদ্ধি হয়েছিল ব'লে আমার বিশ্বাস।

আমায় দেখবামাত্র কারমেন বললে : আজকের দিনে আর কাজ করছি না। কালকের সমস্ত দিনটা তো প'ড়ে আছে! চলো, বন্ধু, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

সে ওড়না দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলে, এবং কোথায় যাচ্ছি না-জেনেই আমরা হলুম রাস্তায় হাজির।

আমি বললুম : মাদ্‌মোয়াসেল, আমার ধারণা যে জেলে থাকার সময় আমায় যে-উপহারটা পাঠানো হয়েছিল, তার জন্যে ধন্যবাদ আপনাকেই দেয়। রুটিখানা আমি খেয়ে ফেলেছি ; উকোটা বর্শা শানানোর কাজে লাগবে, সেটাকে, আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে, আমি যত্নে রেখে দিয়েছি, কিন্তু সে-টাকা এই নিন।

চেঁচিয়ে হেসে উঠে সে বললে : থামো! থামো! টাকাটা খরচ ক'রে ফেলোনি। তা বেশ, ভালোই তো। কেন-না রেস্তোর আমার সনাতন অভাব ; তা আর কী হয়েছে? 'যে-কুকুরের আছে পা, না-খেয়ে সে মরবে না।' চলো, খেয়ে ওড়ানো যাক্! তুমি আমায় একটা ভোজ দাও।

আমরা সেভিলের রাস্তা ধরলুম। ভুজঙ্গ-পথের প্রবেশস্থলে সে গোটা-বারো কমলালেবু কিনে আমার রুমালে রাখতে দিলে। আরেকটু দূরে সে একখানা রুটি, কিছু কাবাব, এক বোতল মাঞ্জালিনা মদও খরিদ করলে ; তারপরে এক মিঠাইওয়ালার দোকানে ঢুকল। সেখানে আমার দেওয়া সেই মোহরটি, পকেটস্থ আরেকটি স্বর্ণখণ্ড এবং তার সঙ্গে গোটাকয়েক রৌপ্যমুদ্রা পণ্যফলকের উপর ফেলে, সে আমার কাছে যা- পয়সাকড়ি ছিল চেয়ে নিলে। আমার কাছে ছিল একটি টাকা আর আনা-কতক পয়সা মাত্র। এই নাতিবহু সঙ্গতির জন্যে কুণ্ঠিত হ'য়ে আমি সেগুলো তাকে ধ'রে দিলুম। মনে হ'ল যেন সমস্ত দোকানটাকে সঙ্গে নিতে পারলেই সে খুশি। যতক্ষণ টাকা রইল ততক্ষণ চিনিতে পাক-করা ডিমের কুসুম, দমদম মিছরি, ফলের মোরব্বা ইত্যাদি সেখানে যত-কিছু ভালো ও মহার্ঘ বস্তু ছিল সমস্তই সে নিতে লাগল। সেগুলোকে কাগজের ঠোঙায় ভরা ও সে-বোঝাটা বওয়ার ভার পড়ল আমারই ঘাড়ে। কান্দিলেজো রাস্তার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। সেই যে যেখানে ধর্মরাজ ডন পেদ্রোর[১] একটি প্রতিকৃতি আছে। সে-রাস্তাটা আমার মনে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। সেখানে আমরা একটা পুরাতন বাড়ির সম্মুখে নামলুম। সে ফটকে প্রবেশ ক'রে একতলায় করাঘাত করলে। একটি জিপ্‌সিনী, যেন মূর্তিমতী শয়তান-সেবিকা,

১. রাজা ডন পেদ্রোকে আমরা নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়েছি বটে, কিন্তু ধর্মপ্রাণা রানী ইসাবেলা তাঁকে সর্বদা ধর্মরাজ ব'লে ডাকতেন। খলিফ হারুন-আল রসিদের মতো ডন পেদ্রোও প্রতি সন্ধ্যায় সেভিলের পথে বেরুতেন অজানার অভিসারে। একদিন রাত্রে একটি বিজন রাস্তায় তিনি প্রিয়া-কীর্তনরত একজন লোকের সঙ্গে বিবাদ ঘটিয়ে বসেন ; ক্রমে হাতাহাতি আরম্ভ হয়, এবং রাজা সেই প্রেমিকটিকে করেন হত্যা। [ক্রমশ]

আমাদের জন্যে দ্বারমোচন করতে এল। কারমেন তাকে রোমানি ভাষায় কী বললে। বৃদ্ধা প্রথমটা আপত্তি করতে লাগল। তাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে কারমেন তাকে দিলে দুটো নারেঙ্গি, একমুঠো মিঠাই এবং সেই মদিরার আস্বাদন গ্রহণের অনুমতি। তারপরে সে নিজের ওড়নাখানি তার স্কন্ধে চাপিয়ে তাকে চৌকাঠ পার ক'রে দিয়ে এল এবং কাঠের খিল লাগিয়ে দরজাটা করলে বন্ধ। আমরা দু-জনে একা হওয়ামাত্রই সে পাগলের মতো হেসে-নেচে গান ধরলে : তুমি আমার প্রাণের পতি আমি তোমার ঠাকুরানী। আর আমি, আমি ঘরের মধ্যিখানে, তার ক্রীত সামগ্রীর বোঝার ভারে সারা, সেগুলোকে নামিয়ে রাখার স্থানের অন্বেষণে দিশাহারা। সে সেগুলোকে মাটির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে, আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে, আমায় বললে — ধার শোধ করছি, ধার শোধ করছি! 'কালে'দের[১] এই হচ্ছে নিয়ম! ওগো মশাই! সেই দিনটা! সেই দিনটা : সেটার কথা যখন ভাবি, তখন পরের দিনের কথা একেবারেই ভুলে যাই।

দস্যু মুহূর্তের জন্যে মৌন হ'লে, তারপর চুরুটটা পুনর্বার ধরিয়ে আবার আরম্ভ করলে :

পানাহারে ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে সেদিনটা আমরা একত্রে কাটালুম। শিশুসুলভ লোলুপতার সঙ্গে মিষ্টান্ন ধ্বংস করার পরে, সে অবশিষ্ট মিঠাইগুলো মুঠো-মুঠো নিয়ে বৃদ্ধার জলের কলসির মধ্যে পুরে দিতে-দিতে বললে : এটা হচ্ছে বেটীর শরবত বানাবার জন্যে। দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ডিমের বরফগুলো গুঁড়ো করতে-করতে বললে : এটা হচ্ছে মাছিগুলো যাতে আমাদের জ্বালাতন না-করে সেই জন্যে।... এমন কোনো নষ্টামি, এমন

তরবারির শব্দ শুনে একটি বৃদ্ধা রমণী জানলায় এসে হাজির হন এবং কর-ধৃত 'কান্দিলেজো' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রদীপে দৃশ্যটিকে আলোকিত ক'রে তোলেন। জানা আবশ্যক যে রাজা ডন পেদ্রো সাধারণত ক্ষিপ্র ও সবল হ'লেও, তার অঙ্গে পরিলক্ষিত হ'ত একটা অদ্ভুত বিকার। চলার সময়ে তাঁর হাঁটুতে একটা মট্‌মটানি শব্দ শোনা যেত। সেই মট্‌মটানি শুনার পরে বৃদ্ধার আর তাঁকে চিনতে কোনো কষ্ট হ'ল না। পরের দিন নগরপাল রাজার কাছে তাঁর নিবেদন জানাতে এলেন। 'মহারাজ, কাল রাত্রে অমুক রাস্তায় একটা দ্বৈরথ-সমর ঘটেছে। তাদের মধ্যে একজন যোদ্ধা নিহত। — হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েছ কি? — হাঁ, মহারাজা। — সে এখনো দণ্ডিত হয়নি কেন? — মহারাজ, আপনার আদেশের শুধু অপেক্ষা। — নীতির পালন করো।' এখন রাজা সবেমাত্র এই মর্মে এক অনুশাসন প্রচার করেছিলেন যে দ্বৈরথযোদ্ধাদের শিরশ্ছেদ হবে এবং সেই মুণ্ড প্রদর্শিত থাকবে যুদ্ধের স্থানটিতে। নগরপাল আত্মকর্তব্য সাধলেন বিনা-কুণ্ঠায়। তিনি রাজার একটি প্রতিমূর্তির মাথা কাটিয়ে সেটিকে ঘটনাস্থলে রাস্তার মাঝে একটি কুলুঙ্গিতে স্থাপনা করলেন। এটি রাজার নিজের ও সেভিলবাসীদের সকলের খুব মনোমতো হ'ল। সেই নৈশ ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী বৃদ্ধাটির প্রদীপের থেকে রাস্তাটির হ'ল নামকরণ। সাধারণ জনশ্রুতি হচ্ছে এইরূপ। জুনিগা কিন্তু ইতিহাসটির বর্ণনা করেছেন একটু অন্যরকমে ('আনালস-সেভিলা', দ্বিতীয় খণ্ড. ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। সে যাই হোক্, সেভিলে এখনো কান্দিলজো নামে একটি রাস্তা এবং সেই রাস্তায় ডন পেদ্রোর তথাকথিত একটি প্রস্তরের প্রতিমূর্তি আজও বর্তমান। দুঃখের বিষয় উক্ত মূর্তিটি আধুনিক। পুরাতনটি সপ্তদশ শতাব্দীতে এমনই সময়জীর্ণ হ'য়ে পড়েছিল যে তখনকার ম্যুনিসিপালিটি তার স্থানে আরেকটির প্রতিষ্ঠা করেন। আজ যে-মূর্তিটি দেখা যায় সেটি এই শেষোক্তটি।

১ 'কালে'র যথার্থ মানে কালো। জিপ্‌সিরা স্বভাষায় নিজেদের এই নাম দিয়ে থাকে।

কোনো পাগলামি নেই যা সে করলে না। আমি তাকে জানালুম যে তার নাচ দেখতে আমার ইচ্ছা ; কিন্তু করতাল পাওয়া যায় কোথায়? বৃদ্ধার সবেধন নীলমণি সান্‌কিখানি হঠাৎ উঠিয়ে নিয়ে সে সেটাকে দুখানা ক'রে ফেললে ; এবং তারপরে সেই চিনেমাটির টুক্‌রোগুলোকে তালে-তালে ঠুকে সে এমনতর রোমালি নাচ ধরলে যেন আসল আবলুসের অথবা হাতির দাঁতের করতালই তার মুঠোর মধ্যে। আপনাকে যথার্থ বলছি, সেই মেয়ের কাছে থেকে জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া অসম্ভব। সন্ধ্যা হ'য়ে এল ; সেনাবাসে ফেরার আজ্ঞা ভেরি-নিনাদে ঘোষিত হ'ল।

আমি বললুম, নামডাকের সময়ে হাজির হ'তে হ'লে এইবেলা থানায় ফেরা দরকার।

দারুণ অবজ্ঞার স্বরে সে বললে : সামান্য একটা ঢাকের আওয়াজ শুনে অমন কাঁপছ কেন? তুমি কারো কেনা চাকর নাকি? পোশাকে আর প্রবৃত্তিতে তুমি দেখছি সত্যকারের একটি কেনারি।[1] যাও, তোমার সাহসও দেখছি চড়ুই পাখির মতো। পূর্ব হ'তেই কারাদণ্ডের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আমি নিশিযাপন করলুম তার সঙ্গে। পরদিন প্রাতে বিদায়ের বাণী প্রথম সেই বললে : শোনো, জোসেতো, তোমার পাওনা মিটেছে কি? আমাদের আইন অনুসারে তোমার কাছে আমারও কোনো ধার ছিল না, কেন-না তুমি আমার স্বদেশবাসী ; কিন্তু তোমায় দেখতে বড়ো সুন্দর, তাই তোমায় আমার বড়ো ভালো লেগেছিল। এখন আমাদের সব শোধবোধ হ'য়ে গেল। বিদায়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তার সঙ্গে পুনর্বার কবে দেখা হবে।

সে হেসে জবাব দিলে : তুমি যখন সাবালক হ'য়ে উঠবে। তারপরে আরেকটু গম্ভীর স্বরে সে বলতে লাগল : কী জানো, বাছা, তোমায় একটু-একটু ভালোবাসি ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সে-ভালোবাসার দৌড় সামান্যই। বাঘ আর গোরুর গৃহস্থালির স্থিতি বেশি দিনের হ'তে পারে না। হয়তো যদি তুমি জিপ্‌সি ধর্ম গ্রহণ করো, তাহ'লে তোমার স্ত্রী হ'তে আমার বাসনা হ'তে পারে। কিন্তু এ-সমস্ত কথা কেবল পাগলামি মাত্র; এটা হওয়া অসম্ভব। বাঃ! বন্ধু, বিশ্বাস করো, এ-যাত্রা তুমি অতি অল্পেই রেহাই পেয়ে গেলে। তুমি সংস্পর্শে এসেছিলে শয়তানের, হাঁ, শয়তানের ; তার রঙ সবসময়ে কালো নয় ; তাছাড়া সে তোমার ঘাড়ও মট্‌কায়নি। আমার পোশাক পশমের বটে, কিন্তু আমি ভেড়া নই। যাও গিয়ে তোমার ইষ্টদেবতার আরতির ব্যবস্থা করোগে ; তোমায় এমনতর সঙ্কটের থেকে বাঁচানোর জন্যে তাঁর এ-পূজা অবশ্য প্রাপ্য। পালাও, আবার বলছি বিদায়। কারমের্ন্‌সিতাকে আর ভেবো না, তাহ'লে সে শেষে সেই কাষ্ঠচরণ বিধবাটির[2] সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

এইভাবে কথা বলতে-বলতে সে দ্বারের অর্গলমোচন করলে এবং রাস্তায় বেরুতে-না-বেরুতেই ওড়নাতে গা ঢাকা দিয়ে আমার দিকে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে হ'ল অন্তর্ধান।

সে সত্যই বলেছিল। তাকে আর না-ভাবাই হ'ত বিচক্ষণতা ; কিন্তু কান্দিলেজো-রাস্তার

১. স্পেনীয় ঘোড়সওয়ারদের পরিচ্ছদ কেনারি পাখির মতো পীতবর্ণের।

২. ফাঁসিকাঠে উদ্‌বদ্ধ ব্যক্তির বিধবা-বিশেষ।

সেইদিন থেকে অন্য সমস্ত চিন্তা আমার সাধ্যাতীত হ'য়ে দাঁড়াল। সেদিনটা সমস্তক্ষণ আমি ঘুরে বেড়ালুম তার সাক্ষাতের প্রত্যাশায়। তার সন্ধান করলুম সেই বৃদ্ধার আর সেই ফুলুরি-বিক্রেতার কাছে। তারা বললে সে তখন লালোরোর অভিমুখে। জিপ্‌সিরা পর্তুগালকে এই নামে অভিহিত ক'রে থাকে। সম্ভবত তারা এ-কথা বলছিল কারমেনের উপদেশ-অনুসারে। কিন্তু তারা যে মিথ্যা বলছে তা বোঝবার সবুর আমার সইল না। কান্দিলেজো-রাস্তার সেই অপূর্ব দিনটির কয়েক সপ্তাহ পরে নগরের একটা তোরণে আমি ছিলুম পাহারায় নিযুক্ত। সেই দ্বারের অনতিদূরে নগর-প্রাকারের গাত্রে একটা ছিদ্র ছিল ; দিনের বেলা সেখানে মেরামতি কার্য এবং রাত্রে শুল্কচোরদের নিবারণ করবার জন্যে সেখানে একজন রক্ষী স্থাপিত হ'ত। সেদিনে আমাদের থানার আশে-পাশে লিলা পাস্তিয়াকে যাতায়াত ও আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে দেখলুম ; সে ছিল বিশ্ববিখ্যাত, এবং তার মৎস্য ও ফুলুরি আরো অধিক পরিচিত। সে আমার কাছ ঘেঁষে এসে কারমেনের কোনো খবর জানি কি-না জিজ্ঞাসা করলে।

আমি বললুম : কই, না।

—বেশ, বেশ, ভায়া শীঘ্রই পাবে।

তার সে-কথা ভুল নয়। সেদিন রাত্রে সেই ছিদ্রটা রক্ষার ভার পড়ল আমার উপরে। আমাদের নায়েক [পরিদর্শন] সেরে যাবামাত্রই আমার দিকে একটি রমণীকে আসতে দেখলুম। আমার হৃদয় বললে, সে কারমেন। কিন্তু তাহ'লেও আমি চেঁচিয়ে বললুম : ভাগো! এখান দিয়ে চলা বারণ!

সে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ ক'রে বললে : বদমাইসি করছ কেন?

—কে? কারমেন তুমি এখানে?

—ওগো হাঁ গো বন্ধু। অল্প কথার মার নেই। কিছু লাভ করতে চাও? কয়েকজন লোক আসছে মাল নিয়ে ; তাদের আসতে দাও!

আমি উত্তরে বললুম : না, তাদের বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য। আমার হুকুম এইরকম।

—হুকুম! হুকুম! কই সে-কথা কান্দিলেজো-রাস্তায় তো মনে ছিল না।

শুধু সেই স্মৃতিমাত্রে বিচলিত হ'য়ে আমি জবাব দিলুম : আঃ! হুকুম ভোলবার মূল্যটা যে তখন মোটারকমের ছিল ; বাটপাড়েদের টাকায় কিন্তু আমার লোভ নেই।

— আচ্ছা শোনো, বেশ তুমি যদি টাকা না-চাও, বুড়ি ডোরেতের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতে চাও কি?

সংযমের চেষ্টায় প্রায় রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে আমি বললুম : না, আমার দ্বারা তা হবে না।

—বস্তুত আচ্ছা, তুমি যদি এত শক্ত হও, আমিও জানি কাকে অনুরোধ জানাতে হবে। আমি তোমার নায়েককে ডোরেতের বাড়িতে আসতে নিমন্ত্রণ করব। তার চেহারা বেশ ভালো ছেলের মতো : তাহ'লেই সে এখানে এমন একজন প্রহরী খাড়া করবে যে তার দ্রষ্টব্যের প্রতি অন্ধ হ'য়ে থাকবে। বিদায়, কেনারি। যেদিনে তোমার ফাঁসির হুকুম হবে সেদিনে আসবে আমার হাসির পালা।

আমি এত দুর্বল হ'য়ে পড়লুম যে তাকে পুনরাহ্বান করতে হ'ল। কথা দিলুম, যদি আমার বাঞ্ছিত সেই একটিমাত্র পুরস্কার মেলে তাহ'লে দরকাব হয়তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পথ ছেড়ে দেব। সে-ও তৎক্ষণাৎ দিব্য করলে যে পরদিবসে তার কড়ার সে রাখবে ; এই ব'লে সে তার সমীপস্থ বন্ধুদের সুখবর দিতে ছুটল। পাস্তিয়াকে নিয়ে পাঁচজন, সকলেই ইংরেজি পণ্যে ভারাতুর। কারমেন চারদিকে নজর রাখতে লাগল। ঠিক হ'ল চৌকিদার দৃষ্টিগোচর হবামাত্রই করতালের সাহায্যে সে সকলকে সাবধান ক'রে দেবে ; কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'ল না। শুল্কচোরদের কাজ সমাধা হ'ল মুহূর্ত-মধ্যেই।

পরের দিন কান্দিলেজো-রাস্তায় গেলুম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে কারমেন এল অতিশয় রুক্ষ মেজাজে। সে বললে : যাদের পীড়াপীড়ি করতে হয়, এমন লোক আমার চোখের বালাই। প্রথমবারে তার থেকে কিছু লাভ হবে কি-না না-জেনেই তুমি আমার পরম উপকার করেছিলে, গতকাল তুমি আমার সঙ্গে দরদস্তুর করেছ। কী করতে এলুম জানি না, কেন-না তোমাকে আর আমি ভালোবাসি না। শোনো, এখান থেকে স'রে পড়ো, তোমার মজুরি হিসেবে এই নাও একখান মোহর। --আরেকটু হ'লেই সে-স্বর্ণমুদ্রাখানা তার মুখে ছুঁড়ে মেরেছিলুম আর কী। এবং তাকে প্রহার দেওয়ার স্পৃহাটাকে দমন করতে হ'ল অসীম আত্মসংযম প্রয়োগে। ঘণ্টাখানেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে আমি অগ্নিমূর্তি হ'য়ে বেরিয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ ধ'রে পাগলের মতো শহরের হেথা-সেথা ঘুরে বেড়ালুম ; অবশেষে একটা গির্জায় ঢুকে, অন্ধকারতম কোণে সমাবিষ্ট হ'য়ে করতে লাগলুম অশ্রুমোচন। হঠাৎ কানে একজনের কণ্ঠস্বর বাজল : সিপাহির চোখের জল ! ও দিয়ে আমি একটা প্রেমাহরণী দাওয়াই বানাব।—চোখ তুলে দেখলুম আমার সামনে কারমেন। — কীরকম, বন্ধু, এখনো আমার উপরে খাপ্পা হ'য়ে আছ নাকি? যতই চেষ্টা করি-না-কেন, তোমায় না-ভালোবেসে আমি থাকতে পারছি না, কেন-না তুমি চ'লে আসার পর থেকে আমার যেন কী রোগে ধরেছে। দেখো, এখন কান্দিলেজো-রাস্তায় আসবার জন্যে অনুরোধ করছি আমিই।—তখন আমরা করলুম শান্তিস্থাপনা ; কিন্তু কারমেনের চিত্তবৃত্তি ছিল আমাদের দেশের আকাশ-বাতাসের মতো। আমাদের পাহাড়ে ঝড় তখনই অতি কাছে ঘেঁষে আসে সূর্যের তেজ যখন প্রখরতম। সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আরেকবার তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে সেই বুড়ি ডোরোতের বাড়িতে, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। ডোরোতে আমায় খুব মিষ্টি ক'রে জানিয়ে দিলে যে গোপনীয় কাজের খাতিরে সে লালোরো-গতা।

পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিলুম, উপরোক্তধরনের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ; তাই কারমেনের যত জায়গায় থাকা সম্ভব ব'লে জানতুম, সে-সমস্ত স্থানে তার অনুসন্ধান ও কান্দিলেজো-রাস্তায় দিনের মধ্যে বিশবার আনাগোনা করলুম আরম্ভ। একদিন সন্ধ্যায় ডোরোতের বাড়িতে ব'সে একটুক্ষণ পরে-পরে তাকে এক গেলাস ক'রে এনিসিডের আরক খাইয়ে-খাইয়ে আমি তাকে প্রায় আয়ত্তাধীন [য] ক'রে ফেলেছি এমনসময় একজন যুবক কর্তৃক অনুসৃত হ'য়ে কারমেন সেখানে প্রবেশ করলে। যুবকটি আমাদের একজন সেনাধ্যক্ষ। কারমেন আমায় দেখেই বাস্‌ক্ ভাষায় বললে : শীঘ্র পিট্টান দাও।

আমি কিন্তু হতভম্ব হ'য়ে র'য়ে গেলুম, আমার অন্তরে আগুন জ্বলছিল। সেনাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে কী হচ্ছে? এখুনি এখান থেকে বেরোও! — আমি চলচ্ছক্তিবিহীন, পঙ্গুর মতো। সেনাপতি আমায় না-নড়তে ও তাঁর সম্মানে টুপি-সুদ্ধ না-খুলতে দেখে অগ্নিশর্মা হ'য়ে আমায় ঘাড়ে ধ'রে নাড়া দিতে লাগলেন। জানি-না তাঁকে কী বললুম। তিনি খুললেন তরবারি, আমিও করলুম অসিনিষ্কাশন। বৃদ্ধা আমার হাত ধ'রে ফেললে, এবং সেনাধ্যক্ষ আমার কপালে করলেন খড়্গাঘাত। তার চিহ্ন আজও আমি বইছি। আমি পিছিয়ে এসে কনুয়ের এক ঝাঁকুনিতে বৃদ্ধাকে চিৎপাৎ ক'রে ফেলে দিলুম ; তারপর সেনাধ্যক্ষকে আমার অনুসরণ করতে দেখে তার বুকের দিকে তলোয়ার উঠালুম ; সে আপনা হ'তেই হ'ল অসিবিদ্ধ। কারমেন তখন আলোটা নিবিয়ে দিলে, এবং স্বীয় ভাষায় বৃদ্ধাকে বললে পালাতে। রাস্তায় এসে আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমি নিজেও দৌড়তে আরম্ভ করলুম অনির্দেশে। মনে হ'ল কে আমার পিছু নিয়েছে। যখন বোধশক্তি ফিরে পেলুম দেখলুম কারমেন আমার সঙ্গ ছাড়েনি। সে আমায় বললে : ওরে উজবুক্, তুই কি ফ্যাসাদ ছাড়া আর কিছুই করতে জানিস না। ভালো, ভালো, আমি তো বলেইছিলুম যে আমা হ'তে তোমার অনিষ্টই আসবে। যাক্ সে-কথা, সকল রোগেরই প্রতিকার আছে, বিশেষ ক'রে আমার মতো এমন জাদুকরীকে পরানসখীরূপে পেলে। এই রুমালখানা মাথায় বেঁধে শুরু করো, আর তোমার ওই পেটিটা আমায় ফেলে দাও। আমার জন্যে এই গলিতে অপেক্ষা করো। দু-মিনিটে ফিরে আসছি। সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল এবং অচিরেই আমার জন্যে একখানা ডোরাকাটা আঙরাখা নিয়ে এল। জানি-না সেখানা সে কোথা থেকে খুঁজে আনলে। সে আমায় উর্দি ছাড়িয়ে, কামিজের উপরে সেই আঙরাখাটা জড়িয়ে দিলে। এইরকমের পোশাকের গুণে, যে-রুমালখানা দিয়ে সে আমার মাথার ক্ষতটা বেঁধে দিয়েছিল তার কৃপায়, সেভিলে ফলমূল বিক্রয়ের জন্যে যে অসংখ্য কৃষক আসে আমায় দেখতে লাগল তাদের একজনের মতো। তারপরে একটা ছোট্ট গলির শেষে যে-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সে আমায় হাজির করলে সেটার চেহারা ডোরোতের বাড়িরই মতন। সে আরেকজন জিপ্‌সিনী আমার ক্ষত ধুইয়ে, সেটাকে বৈদ্যরাজের চেয়েও বেশি নিপুণতার সঙ্গে বাঁধলে ; আমায় একটা কী অজানা জিনিস পান করালে ; অবশেষে আমায় একখানা গদির উপরে শোয়ানো হ'ল এবং আমি ঘুমিয়ে প'ড়লুম।

রমণীদুটি সম্ভবত আমার পানীয়তে এমন কোনো একটা সুপ্তিপ্রদ ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল যার মহিমা শুধু এদের আয়ত্তাধীন [য], কেন-না পরদিবসে আমার ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। আমার মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটু জ্বরও অনুভব করলুম। পূর্বরাত্রে যে ভয়ঙ্কর নাটকে আমায় ভূমিকা নিতে হয়েছিল, তার স্মৃতি মনে আনতে কিছু সময় হ'ল আবশ্যক। আমার ক্ষত ধুইয়ে দেবার পরে কারমেন ও তার সহচরী আমার শয্যার কাছে উবু হ'য়ে ব'সে তার দুর্বোধ্য জবানিতে কীসব বলা-কওয়া করতে লাগল ; মনে হ'ল প্রসঙ্গটা আমারই স্বাস্থ্য। তারপরে তারা দু-জনেই আমায় আশ্বাস দিলে যে আমি অনতিবিলম্বেই সুস্থ হব। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব আমার সেভিল পরিত্যাগ করা প্রয়োজন ; কেন-না সেখানে যদি আমি ধরা পড়ি তাহ'লে বন্দুকের গুলিতে প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। —

কারমেন আমায় বললে : বৎস, কিছু একটা তো তোমায় করতেই হবে ; আর যখন রাজার কাছ থেকে ভাত-ডাল পাচ্ছ না, তখন জীবিকার্জনের উপায় দেখা দরকার। গাঁটকাটা হবার মতো কারসাজি তোমার নেই ; কিন্তু তুমি চট্‌পটে ও জোরালো আছ ; যদি বুকের পাটা থাকে সমুদ্রের ধারে পালিয়ে নিজেকে শুল্কচোর ক'রে তোলো। তোমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাব ব'লে কি আমি শপথ করিনি? সেটা কিন্তু বন্দুকে মরার থেকে অনেক শ্রেয়। উপরন্তু এ-নেশা যদি একবার ধরাতে পার, তাহ'লে তোমার জীবন কাটবে রাজার হালে, অবশ্য যতদিন পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক ও কূলরক্ষীরা তোমার টুঁটি না-চেপে ধরে।

এই মনোরম উপায়ে সে-সর্বনাশী তার নির্বাচিত এই নূতন পেশাটা আমায় ঠাহর করালে। অবশ্য সত্য বলতে গেলে নিজের উপরে যখন মৃত্যুদণ্ড টেনে এনেছিলুম, তখন এই একটিমাত্র রাহাই আমার ছিল খোলা। আপনাকে বলতে কী, মহাশয়, আমায় রাজি করাতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আমার মনে হ'ল, এই সঙ্কটময় বিদ্রোহী জীবনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার মিলন নিবিড়তর হ'য়ে উঠবে। আশা হ'ল অতঃপর আমার প্রতি তার ভালোবাসা অটল। জন-কতক শুল্কচোরের কথা প্রায়ই শুনতুম যারা তেজি ঘোড়ায় চ'ড়ে, হাতে বন্দুক নিয়ে জিনের পিছনে প্রণয়িনীকে বসিয়ে, আন্দালুসিয়া তোলপাড় ক'রে বেড়াত। আমি এরই মধ্যে মানসচক্ষে দেখতে লাগলুম যে, আমিও জিপ্‌সি সুন্দরীকে পাছে বসিয়ে পর্বতকন্দরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি। যখন তাকে সে-কথা বললুম, হাসিতে তার পেট ফাটতে লাগল। সে বললে যে মুক্তাকাশের নিচে চুলির চারদিকে রাত-কাটানোর মতো চমৎকার আর কিছুই নেই। বিশেষত যখন প্রত্যেক বঁধু তার সখীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের চক্রাকৃতি, চাঁদোয়া-ছাওয়া ছোট্ট তাঁবুতে প্রবেশ করে বিশ্রম্ভালাপের জন্যে!

আমি বললুম : যদি কখনো পাহাড়-পর্বতে বনবাসে যাই, তাহ'লে যাব তোমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তবে! আমার থেকে ভাগ বসাতে সেখানে তো আর কোনো সেনাপতি আসবে না!

সে জবাব দিলে : ওঃ! তুমি তাহ'লে হিংসুটে। তাতে লোকসান তোমার নিজের। এমনতর বাঁদরামি করছ কেন? দেখছ-না কি আমি তোমায় ভালোবাসি, কারণ তোমার কাছ থেকে কখনো টাকা চাইনি।

সে যখন এইধরনের কথা কইত আমার ইচ্ছা হ'ত, তাকে গলা টিপে খুন করি।

সঙ্ক্ষেপে বলছি, কারমেন আমার জন্যে একটা নাগরিক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করলে ; সেটার সাহায্যে আমি বিনা-বিপত্তিতে সেভিল থেকে বেরিয়ে এলুম। পাস্তিয়ার কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে আমি গেলুম জেরেসে এক এনিসিডওয়ালার দোকানে। সেখানে যত শুল্কচোর এসে জুটত। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল ; তাদের দলপতি দানকের আমায় দলে নিলে। আমরা গোস্যাঁ যাত্রা করলুম। সেখানে কারমেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ; তার সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাদের অভিযানে সে করত চরের কাজ। তার চেয়ে ভালো চর কখনো কোথাও পাওয়া দুষ্কর। একজন পোতাধ্যক্ষের সঙ্গে আমাদের আদমানি-করা ইংরেজি পণ্যসামগ্রী বহনের বন্দোবস্ত ইতিমধ্যে পাকা ক'রে সে ফিরছিল জিব্রল্‌টার

থেকে। আমরা সেইসমস্ত জিনিসের প্রত্যাশায় ইস্তিপোনার নিকটে গেলুম, তারপরে তার কতকটা পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, বাকি মালের বোঝায় সারা হ'য়ে আমরা রন্দায় ফিরলুম। কারমেন করেছিল আমাদের অগ্রগমন। নগর প্রবেশের পক্ষে কোন্ মুহূর্ত প্রশস্ত তা আমাদের জানালে সে-ই। এই প্রথম সফর ও তারপরের আরো কয়েকটা বড়ো সুখের ব'লে মনে হয়েছিল। শুল্কচোরের জীবন সৈনিকের জীবন অপেক্ষা ভালোই লাগছিল ; কারমেনকে অনেক উপহার দিতে লাগলুম। আমার হাতে তখন অর্থ ও প্রণয়িনী দুই-ই বর্তমান। আমার কোনোরূপ অনুতাপ হয়নি ; জিপ্‌সিরা ঠিকই বলে : সখের দলে যাতনা নেই। সর্বত্রই আমরা সমাদৃত হ'তে লাগলুম ; আমার সহচরেরা আমার সঙ্গে ব্যবহার করছিল ভালোই, এমন-কি আমায় সম্মান প্রদর্শন করছিল। তার কারণ আমার হাতে একজন মানুষ নিহত এবং তাদের মধ্যে এমন কোনো লোক ছিল না, যার বিবেক ঈদৃশ কৃতিত্বগ্রস্ত। কিন্তু আমার নূতন জীবনে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী লেগেছিল কারমেনের অবিরল নৈকট্য। সে আমার প্রতি অভূতপূর্ব অনুরাগ প্রকাশ করছিল ; কিন্তু তাহ'লেও আমার সঙ্গীদের সম্মুখে সে আমার প্রণয়িনী ব'লে আত্মপ্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ; এমন-কি সে নানারকম সাক্ষ্য করিয়ে আমাকে দিয়ে দিব্য করালে যে আমি এ-কথা কখনো ব্যক্ত করব না। সে-প্রাণীটির সামনে আমার এমন একটা দুর্বলতা আসত যে তার সমস্ত আবদারকে আমি আজ্ঞা ব'লে মেনে নিতুম। উপরন্তু সাধ্বীশোভন সংযমের পরিচয় তার মধ্যে দেখলুম এই প্রথম। আমার বিশ্বাস হ'ল যে তার পুরাতন খেয়ালগুলো সে সত্যিই শুধরেছে। তখন আমার বুদ্ধি ছিল এমনি কাঁচা।

[নামহীন অনুবাদ গল্প ২]

ধরার সুবাস? সে তো আর আগের মতো নেই। নির্ভুল হ'তে গেলে বলতে হয়, এই মহাপরিবর্তনটা ঘটে ১৯০৩ সালের ভিতরে।

কোনো-কোনো বন্ধুর সমক্ষে এই প্রসঙ্গটা মাঝে-মাঝে উত্থাপন করার দুর্বলতা আমার আছে। তাঁরা সকলেই শিক্ষিত ও অনুভবপ্রবণ, মদিরার বা চুরুটের সুযোগ্য বিচারক। তাঁরা বলেন, 'পৃথিবীর গন্ধটা নিঃসন্দেহ ... কিন্তু ভেবে দেখ দিকি মোটর গাড়ি আর কারবার-কারখানা ...।'

মোটর ও কলকারখানার সঙ্গে এ-বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ফেরতে-মিলঁ-তে বাস করি। এটি একটি কৃষিপ্রধান ছোটো শহর। কারবার-কারখানা এখনো একে বেশি শ্রীভ্রষ্ট করেনি। ধরার সৌরভ, তা এখানেও, অন্যত্রের মতোই, পাওয়া যায়।

বসন্তে যখন আমাকে কোনো অধিত্যকার রাস্তা অতিক্রম করতে হয়, তখন সেখানকার নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতার আস্বাদ গ্রহণের জন্যে কোনো চৌমাথায় গাড়ি থামাতে আমি ভালোবাসি। মুহূর্তের তরে মেঘমুক্ত সূর্য ক্ষেতগুলোর উপরে তার উষ্ণ জিহ্বা বাড়িয়ে দেয়, এবং অচিরেই প্রত্যেক তৃণফলক করে পরিমল বিতরণ। অপর সময়ে হেমন্তে আমায় যখন কোনো বনাচ্ছাদিত জিলা পার হ'তে হয় তখন আমার মনে হয় যেন কোনো পোকায়-খাওয়া প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতার ভিতরে আমি কীটের মতো চলেছি। আবার অন্যসময়ে রন্ধনরত কৃষকদের বাড়িতে আমি ঢুকে যাই, অথবা কোনো রাখালকে শুকনো লতা পোড়াতে দেখি, অথবা ভোরবেলায় মাছ ধরার জন্যে গিয়ে বসি কোনো উদ্ভিদকুঞ্জে। আমার স্মৃতির মধ্যে সংমিশ্রিত এই যে-সমস্ত গন্ধ একেই আমি বলি ধরার সৌরভ। আমরা ভাবি, ওটা বুঝি চিরন্তন, অবিকার : সেটা আমাদের ভ্রান্তি।

আমি বলছি না যে, ১৯০৩ সাল থেকে পৃথিবী তার সৌরভ হারিয়ে ফেলেছে। আমি শুধু বলছি যে মাটি সে-সুবাসটা বদ্‌লে নিয়েছে, যেমন ক'রে চঞ্চলা রূপসীরা একটা পুষ্পসার পরিহার করে অন্য একটার পরখ ক'রে দেখবার জন্যে।

কিন্তু তাহ'লেও সেই অতীতে সৌগন্ধটা লুপ্ত হয়নি। বরং বলা যেতে পারে তার হয়েছে নির্বাসন। সে মাঝে-মাঝে ফিরে আসে কিন্তু তা গোপনে-গোপনে, তাকে ধরা যায় না ; সে আমার সমস্ত জীবনে বিচরণ ক'রে বেড়ায় তেমনি ক'রে যেমনভাবে কোনো-কোনো বেদনা পঞ্জর ভেদ ক'রে চ'লে যায় তাদের যন্ত্রণার সংজ্ঞা আমাদের জ্ঞানগোচর হবার আগেই।

কাল আমি ছিলুম আমার উর্ক্ নদীর ধারের বাগানে। বেড়ার উপর দিয়ে আমার প্রতিবেশিনী আমায় ডাকলে, রেসেজিয়ে মশাই, আমার আইরিস্‌গুলো শুঁকে দেখুন-না। আমি ফুল শুঁকতে গেলুম। আমি যেমন সে-গুচ্ছে আমার নাক ঠেকিয়েছি অমনি সে-মহিলাটি আমায় বললেন, আপনার হয়েছে কী? শরীর কি ভালো নেই? আমি উত্তর দিলুম, খুব ভালো আছে। সে আশ্চর্য ঘটনাটা তাঁকে বুঝানোর আমাব সাধ্য কোথা? এক মুহূর্তের জন্যে আইরিস্‌গুলোর ঘ্রাণ সেই অতীত ঘ্রাণের মতো লাগল। সেটা রইল পলকমাত্র। তারপর তারা ভালোয়-ভালোয় তাদের স্বাভাবিক গন্ধ, অর্থাৎ ১৯২৪ সনের গন্ধ, বিংশ শতাব্দীর গন্ধ পুনঃগ্রহণ করলে।

আমি জোর ক'রে বলছি, এমন-কি প্যারিসে অবধি— সেখানে আমায় প্রায়ই যেতে হয়— সেখানেও বস্তুর থেকে তাদের পুরানো গন্ধ সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়নি। মাঝে-মাঝে তা কোনো দোকানের থেকে পালিয়ে হঠাৎ এসে আমার মুখের উপরে যেন ধাক্কা মারে। আমি অমনি থেমে যাই আমার নাসারন্ধ্র উদ্‌ঘাট ক'রে দিই। তখনি সব শেষ। জগৎ যেমন ছিল আবার তেমনি হ'য়ে যায়, ততোধিক কিছু নয়। কখনো-কখনো পোস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আমি কোনো বইয়ের পাতা উল্টোই আর অমনি দুটো পঙ্‌ক্তির মাঝ থেকে একটা ক্ষীণ সুবাস ভেসে আসে যেটা ঠিক পৃথিবীর সেই অতীত সৌরভ। আমি সে-বইখানা কিনি, সেটাকে বাড়ি নিয়ে যাই, তার ঘ্রাণ নিই। বৃথা : তাতে পাওয়া যায় শুধু একটা পুরানো দোকানের গন্ধ মাত্র!

আমি এমন কিছু অসঙ্গতরকমের মূঢ় নই, এবং মরীচিকার পশ্চাদ্‌গমনে জীবন ক্ষয় করি না। জগৎ যেমনটি আছে, তাকে আমি তেমনি ক'রেই ভালোবাসি ; কিন্তু সেই প্রাচীন সৌরভের জন্যে আমার আফশোস হয়। এর থেকে এই কথাই প্রমাণ হচ্ছে না কি যে অন্তর এখনো জরাগ্রস্ত হয়নি?

২

কিন্তু আমি যে-সময়ে ১৯০২-১৯০৩ সনের শীতের বর্ণনার্থে নিজেকে প্রস্তুত করছি, তখন সেই ফুলের উচ্ছ্বাস, সেই উদ্ভিদ্‌কুঞ্জ, সেই শুকনো ঘাসের আগুন, সেই হেমন্তের বনানী, তারা এখানে আসছে কীসের জন্যে? সেই প্রাচীন শীতের থেকে কম গ্রাম্যভাবাপন্ন, কম স্মৃতি-সঞ্চিত অন্য কিছু পাওয়া দুষ্কর।

কল্পনায় যখন আমি আবার সেদিকে চাই, তখন সর্বাগ্রে আমার সামনে আসে সিরিল বঁবার-এর মুখখানি। এই লোকটিকে আমি প্রথম দেখি ফের-আ-মুলেঁ-রাস্তার একটা ছোটো সান-বাঁধানো উঠানে। সে যে আমার মনের মধ্যে কোনো সদ্‌ধারণা জাগরূক করতে পেরেছিল, তা আমি বলতে অক্ষম।

প্রত্যেক হাতে সে চুলে ঝুলিয়ে ধরেছিল একটি নরমুণ্ড, গলার মাঝখানে পরিষ্কার ক'রে কাটা। তার হাতের আঙুলগুলো অদৃশ্য হয়েছিল সেই মুণ্ডদুটোর অপরিচ্ছন্ন কেশদামে ;

তার মধ্যে একটার চুল লম্বা ও পাকা। একটা নিচু দরজাকে সে হাঁটু দিয়ে ঠেলছিল, এবং, যেহেতু উত্তর পেতে হচ্ছিল দেরি, সে একটা মুগুরের ব্যবহার করছিল ধাক্কা দেওয়ার জন্যে।

সাহসে আমি একেবারে নিবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম : সে-সাহসটা নূতন, ঈষৎ উদ্ধত, কেন-না সিরিলকে দেখে আমার চিত্ত গিয়েছিল চ'টে। সে আমাকে নিরীক্ষণ করলে, চোখ মিট্-মিট্ ক'রে অবগতি জ্ঞাপন করলে, একমুহূর্তের জন্যে অন্তর্হিত হ'ল, এবং ফিরে এসে অর্ধমুক্ত দ্বারে দাঁড়াল।

তার ধরনটা কাফ্রিদের মতো : কোঁকড়ানো চুল, মোটা ঠোঁট, চওড়া নাক। এছাড়া তার চামড়া ছিল খুব সাদা, একটা চুনের, অস্বাস্থ্যের শুভ্রতা। তার মুখের একেবারে সামনেই বসন্ত যেন একটা পট্‌কা ফাটিয়েছিল। এই চেহারার সঙ্গে যোগ ক'রে নাও নাকি কথা আর প্যারিসের বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি। সেটাতে আমার কান অভ্যস্ত ছিল না, এবং এখন তা শুনলে আমার মন বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

মোটা কাপড়ের বেশাচ্ছাদনে হাত মুছতে-মুছতে সে দ্বিতীয়বার চোখ মিট্-মিট্ করলে।

সে বললে, 'তাহ'লে আপনিই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। বেশ, আমিই বঁবার বটে। এর উচ্চারণ হয় বঁবারের[?] মতো। কিন্তু আপনি যখন আমাকে চাইবেন, তখন সিরিলের খোঁজ করা দরকার। এখানে আমায় সকলে শুধু সিরিল ব'লেই জানে।'

সে আমার জন্যে একখানা খবরের কাগজের একটা বেশ মোটা বান্ডিল আনতে গেল, আমি যে-টাকা তাকে দিলুম তা গুন্‌লে, তার কানের পেছন থেকে একটা পুরানো সিগারেটের শেষাংশটুকু বার করলে এবং পুনর্বার একটা বিকট উদ্যমের সঙ্গে তার ডান চোখ বন্ধ করলে।

কোনো-কোনো বিশ্বাসী চাকর আছে যারা গোপনে থেকে মন্ত্রীকে, এমন-কি সময়ে-সময়ে রাজ্যকে অবধি চালায় ; সেই ভৃত্যদের মতো অবিচল দম্ভ-ভরে সে আবার বললে : 'এখানে কেবল আমিই সমস্ত কিছু চালাই। শুধু সিরিলকে খুঁজবেন। আর তারপর বাড়ির 'ক' চিহ্নিত অংশে থাকতে চেষ্টা করবেন যাতে ক'রে আপনাকে চোখে-চোখে রাখতে পারি।'

সে আমার দিকে দুটো সিক্ত, লোলচর্ম অঙ্গুলি বাড়িয়ে দিলে। আমি অকুতোভয়ে সে দুটো মর্দন করলুম।

এক মিনিট পরে বান্ডিল কোলে ক'রে আমি বাইরে এলুম। বৃষ্টি পড়ছিল। তাসত্ত্বেও আমি পদব্রজে বাড়ি ফেরা সঙ্কল্প করলুম। চলা আমি চিরদিনই ভালোবেসেছি। উপরন্তু আমি তখন একটা বিপুল উল্লাস অনুভব করছিলুম, আমার বোধ হ'ল ব্যায়াম প্রয়োজন। নারীদের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ ও সুবিধামতো স্থিরদৃষ্টে তাদের অবলোকন করার কল্পনা আমার বড়োই ভালো লাগছিল। এতদিনে আমি আমার আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব ধার্য করেছিলুম, এবং সেটার পরীক্ষা হবার পূর্বেই অবিবেচিত খরচে সেই হিসাবের সাম্যকে দায়গ্রস্ত করা আমার ইচ্ছা ছিল না।

আমার পড়ার ও বাসার খরচপত্র দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্যে আমার বাকি থাকত মাসিক ষাট ফ্রাঁক। এই টাকার সাহায্যে সমস্ত সঙ্কটের থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারব

ব'লে আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এবং পিতার কাছ থেকে প্রত্যেক ছুটিতে বস্ত্রাচ্ছাদনের জন্যে কিছু-কিছু অনুপূরক আদায় করার প্রত্যাশা আমি পরিহার করিনি।

প্যারিস শহরকে আমি ভালো ক'রে চিনতুম না। এবং আমার ভ্রমণমার্গ আগে থেকে নির্ধারিত ক'রে রাখা আবশ্যক হ'ত। মঁজ-রাস্তা অনুসরণ ক'রে সরকারি বাগান অবধি যাওয়া, তারপর অন্য একটা রাস্তা ধরা, যার নাম এখন আর আমি মনে করতে পারছি না। সেটা আমাদের স্যাঁ-জাক্-রাস্তা ভেদ ক'রে চ'লে গিয়েছিল। এই শেষোক্ত পথ দিয়ে একদম আমার বাড়ির দরজা অবধি ফিরে আসা।

'আমার বাড়ি' এই কথাটা বলতে আমি যে একটা পরম আনন্দ পেতুম, তা কাল অচিরে ক্ষয় করেছে।

এই বিখ্যাত 'আমার বাড়ি' অবস্থিত ছিল রু স্যাঁ-জাকের সঙ্কীর্ণ অংশের একখানা পুরাতন অট্টালিকার ছ-তালায়। কেবলমাত্র একখানি ঘর। তার আসবাবগুলো আমার নিজেরই ছিল। পিতা আমায় বলেছিলেন : তোর কী দরকার? একখানা খাট, একটা দেরাজ, একখানা টেবিল, তিনখানা চেয়ার। সঙ্গে নিয়ে যা। তোর যা ইচ্ছা নে। সাজানো বাসা আমারও যেমন বিশ্রী লাগত, তোরও তেমনি লাগবে। আর তাছাড়া এ-ব্যয়সঙ্কোচটা যুক্তিসঙ্গত।'

আমার পিতার বিষয়ে নিশ্চয়ই আমায় কিছু বলতে হবে। সেটা এখন করাই বাঞ্ছনীয়, কেন-না এই ইতিহাসের মধ্যে আমি তাঁকে টেনে আনিনি। শুধু দুটো কথা : আমি যখন প্যারিসে অবস্থান শুরু করলুম, তখন আমার পিতা প্রায় দশ বছর যাবৎ বিপত্নীক। দশ আর আট : আঠারো এইটাই একেবারে ঠিক, কেন-না বোর্ডিং-এ ঢোকবার অল্পদিন পূর্বেই আমি মাতৃহারা হই। তাঁর দুটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও,—আমার একজন ভগ্নী আছে—আমার পিতা হঠাৎ বৃদ্ধ কুমারদের মতো খামখেয়ালি হ'য়ে উঠলেন। ফেরতে-মিলঁ-তে, সেই ক্ষুদ্র শহরটিতে যেখানে আমরা আবহমানকাল বাস ক'রে আসছি— সেখানে ডাক্তার হিসাবে পিতা সম্মানার্হ ছিলেন। কিন্তু আশুক্রোধী ও চিররুগ্ন হ'য়ে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের মনোনয়নে এবং সংসারের ব্যায়সঙ্কুলানে প্রায় অপারগ হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেই দীর্ঘশ্বাস! তাঁর সেই স্কন্ধোত্তোলন! তাঁর সেই বিদ্রোহী উদরের উপরে প্রভুত্ব স্থাপনের অবিরাম চেষ্টা! তাঁর সেই রোমশ অঙ্গুলিগ্রন্থি মটকানোর পদ্ধতি... না! সে-সব কথা বলব আরো পরে।

অতএব আমি বাড়ি থেকে কিছু অপরিহার্য আসবাব এনেছিলুম। তাদের কোনোটাই উল্লেখের যোগ্য হ'ত না, যদি-না তাদের মধ্যে সেই নৌকার আকারে নির্মিত, Empire-এর কায়দায় কোঁদা পুরানো খাটখানা থাকত। তার ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা হচ্ছে এই যে এই খাটে আমার জন্ম হয় ; উপরন্তু বৃদ্ধা আল্‌ফঁসিন্‌কে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহ'লে এই খাটেই আমার মায়ের মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে আমার পিতার বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আর কিছুই বলবার নেই। হয়তো তিনি ব'লে থাকতে পারেন : আমার পীড়ার সন্ধিসময়ে এই খাটেতেই আমি কী যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আর কিছু বলার নেই। এইবারে আমার গল্পে ফিরে আসা যাক্।

আমার বান্ডিলটাকে বৃষ্টির থেকে বাঁচাতে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছিলুম। তাহ'লেও

তার কাগজ গিয়েছিল ভিজে, এবং টেবিলের উপরে রাখতেই সেটা গেল ফেঁসে। তার থেকে একরাশ হাড় ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ল ; অনেকগুলো মেঝের উপরে গড়িয়ে গেল। আমি সেই বান্ডিলটা ছিঁড়ে ফেলা শেষ ক'রে, তার ভিতরকার পদার্থ দিয়ে একটা স্তূপ তৈরি করলুম। সেই সিরিল নামীয় লোকটি বলেছিল, 'un demi-niec' বাস্তবিকই সেগুলো আধখানা নর-কঙ্কালের অসংলগ্ন টুকরো। মাথাটা সম্পূর্ণ ছিল, তাতে অনেকগুলো দাঁত।

মুণ্ডটাকে আমি বসালুম একখানা খোলা বইয়ের উপরে ; তাতে ক'রে যে-ছবিখানা ফুটে উঠল তা আমার চোখে উচ্চ দার্শনিকধরনের লাগল। অন্য অস্থিগুলোকে একটু নাড়াচাড়ার পরে আমি সাজালুম তাদের আকার ও আয়তন অনুসারে। তাদের স্পর্শ সাবানের মতো এবং গন্ধ মোমবাতির।

রাত্রি হ'য়ে আসছিল। আমি আমার পাইপটা ভ'রে সেটা ধরালুম। রাত্রি-ভোজনের সময় পর্যন্ত মৃত্যুর ধ্যান করব ব'লে আমি সঙ্কল্প করলুম। কিন্তু কয়েক মিনিটের শেষেই হাওয়া খাওয়ার, মেয়েদের ও আলো দেখার একটা অত্যন্ত জরুরি দরকার উপলব্ধি করলুম। আমার বেরুনোর কোনোই প্রতিবন্ধক ছিল না। আমি কি স্বাধীন পুরুষ নই ? মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করার জন্যে আমি কি সহস্রটা অন্য সুযোগ পাব না?

পাইপটাকে ঝেড়ে আমি অন্ধকার হওয়া অবধি বুলভার-স্যাঁ-মিশেল-এর তরুবীথির তলায় পদচারণ করতে গেলুম।

অনুবর্তী রাত্রিটা প্যারিসে আমার দ্বিতীয় রাত্রি। সেটা আমি কাটালুম আমার সেই নৌকাকৃতি খাটে। তার চাদরগুলোর থেকে তখনো বেরুচ্ছিল গ্রাম্য মসলার ঘ্রাণ। শহরের কুয়াশাকটু ও ধোঁয়াটে গন্ধের থেকে এই গন্ধটার গুণ সেদিনে আমার কাছে অনেক অল্প লেগেছিল ; যে উগ্র উচ্ছ্বাসের প্রথম উন্মাদনা আমি অনুভব করছিলুম এবং যেটাকে আমার সত্য-সত্যই স্বাধীনতার সৌরভ ব'লে মনে হচ্ছিল, তার তুলনায় সেই গ্রাম্য গন্ধটির প্রভাব আমার উপরে সেদিন অনেক কম।

এখনো আমাকে আমার জীবনযাত্রার নক্‌শাটার অবিরাম পর্যালোচনা ও পরিসমাপ্তি করতে হবে, এই চিন্তায় আমি নিদ্রায় কৃতকার্য হলুম না। সর্বপ্রথমে অপর্যাপ্ত পরিশ্রম. প্রোজ্জ্বল ও বিজয়মণ্ডিত পরিশ্রম : কতকগুলো শুধু আমার জ্ঞাত কিন্তু অখণ্ডনীয় লক্ষণের দ্বারা আমি বুঝেছিলুম যে একজন প্রধান পণ্ডিত এবং, কম সঙ্কীর্ণ উপায়ে, একজন মহাপুরুষ হবার জন্যে আমি নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় দফা. সান্দ্র, প্রগাঢ়, অনলস জীবন : প্রচণ্ড প্রণয়, প্রমত্ত অনুরাগ ; প্রতিভা উদ্দীপ্ত হৃদয় ভালোবাসে। তৃতীয় দফা সেইরকমের নিবিড় মরমী সখ্যের যোগ্য হওয়া ও অনুশীলন করা, যাতে বীরেরা ও স্পানিয়াল কুকুরেরা... চতুর্থ দফা ... কিন্তু তাহ'লেও সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তিমান দেহের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী ... স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম ...।

এতদিনে আমি মাত্র তিনটি রমণীর পরিচয় পেয়েছিলুম। কেউ-কেউ হয়তো বলতে চাইবেন 'উপভোগ করেছিলুম'। আমি অকপটভাবে স্বীকার করছি যে এই তিনটি রমণীর সম্বন্ধে ওই

শব্দের ব্যবহার আমার কাছে একটু অশিষ্ট ব'লে লাগে। তিনটি! অতএব গমনটা সহজ হবে : ক্লোতিল্‌দ্‌, যে বাজারের উপরে থাকত, এর বশীকরণের গর্ব আমি কখনো করি না'; রিমের ক্লেমাঁস্‌, এবং পরিশেষে আমার বি.এ. উপাধির সেই মেয়েটি। তার উল্লেখ আমি এমনি ক'রেই করি, কেন-না তার নাম আমি কখনো শিখিনি।

কেবল তরুণীতে ও রূপজীবীতে ছিল আমার রুচি। এর অর্থ কি যে আমি শৃঙ্গারের অনন্ত সঙ্গতির বিষয়ে অজ্ঞ? সম্ভবত, এমন-কি অবশ্যই তাই। কিন্তু এই প্রবৃত্তির কতকগুলি সুনিশ্চিত ও স্থিরীকৃত কারণ ছিল। আমার মনে হ'ত, প্রেমের অভিমুখে. পবিত্রাবস্থায়, — অথবা যদি আপনাদের বরণীয় ব'লে মনে হয় তাহ'লে, অনিযুক্ত ও অব্যাপৃত অবস্থায় থাকে একমাত্র তরুণীরা আর রূপজীবীরা।

অন্য রমণীরা চিন্তার এমন একটা কুহেলিতে আচ্ছন্ন থাকত যে আমি সেটাকে ব্যর্থ বা হাস্যাস্পদ ব'লে না-দেখলেও, সম্পূর্ণ আত্মদানের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ ভাবতুম। অপর মেয়েরা আমার জ্ঞাতি মারিয়ান্‌-এর মতো একেবারে যেন ব্যবসায়ী লোক। মারিয়ান্‌ রেসেগিয়ে আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বেশি বড়ো, এটা আমার কাছে সে-সময় বিপুল মনে হ'ত। তার গলাটি ছিল এত সুষ্ঠু যে সে-গলার শুধু চিন্তাটুকু আমার হৃদয়ে স্পন্দন, আমার নিদ্রায় ব্যাঘাত আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এমনতর গ্রীবাসম্পন্ন হ'য়েও সে শ্রমিক ও ভৃত্যদের একটি প্রকাণ্ড জনতাকে সুদক্ষ পরিচালনা করত ; সে আজ্ঞা দিত, কর্মচারীদের নিযুক্ত, ভর্ৎসনা ও বরতরফ করত ; গণিত ছিল তার প্রাণ। স্বপ্নে যখন আমি তাকে আলিঙ্গন করতুম, তখন তাকে আমার বলবার বাসনা হ'ত : 'তোমার স্তনদুটি সমস্ত রাত্রির জন্যে আমার কাছে রেখে তুমি তোমার অফিসে ফিরে যাও। তোমায় আমার ভয় করে।'

অন্য রমণীরা আবার ক্ষীণাঙ্গী তরুণী ভিদাল্‌-এর মতো বালকদের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছে। তাদের নাসার পাশে, তাদের কপালের উপরে একটা অসাময়িক অবসাদ রেখা এঁকে দেয়। মাদাম ভিদালের কমনীয় মুখখানির অর্ধমোচন হ'ত শুধু ঘুংরিকাশি অথবা অষ্টম শ্রেণীর বিষয়ে কিছু বলবার জন্যে।

কেউ-কেউ হয়তো একটু অন্যায়রকমের ব্যস্ত থাকে রন্ধনব্যাপারে, কেউ-কেউ আসবাব অন্বেষণে, কেউ-কেউ সংসার নিয়ে অনেকে এমন আশুবিচলিতা ও শোকপরায়ণা হয় যে তাদের নিভৃত মুহূর্তগুলি কাটে অশ্রুমোচনে। কোনো-কোনো কুমারী, যাদের মূর্তি আমি বুকে ক'রে বেড়িয়েছি, যাদের বিবাহ আমি বিনা-হিংসায় দেখতে পারিনি, তারা আবার এক মাস হ'তে অন্য মাসের মধ্যে আমার পক্ষে অপরিচিতা হ'য়ে গেছে। এমন-কি আনন্দের দিনেও, রভসের উন্মত্ত মুহূর্তেও আমি তাদের গম্ভীর আননে কাঁদতে দেখেছি। তারা নিজেদের প্রতি অবহেলা করত ; তারা অচিরেই স্থূলদেহা হ'য়ে যেত। তারা তাদের আলাপনের মধ্যে অসংখ্য সম্বন্ধবাচক বিশেষণের প্রয়োগ করত : তারা বলত না শুধু 'বাড়ি', 'প্রাতরাশ', তারা বলত 'আমার বাড়ি', 'আমার প্রাতরাশ', এবং যদিও 'আমার বাড়ি' এই কথাটা বললে আমার বিশেষ রসসম্ভোগ হ'ত, তবুও তারা ওরূপ করলে আমার মেজাজ যেত খারাপ হ'য়ে। তারা ছিল কোনো পদচ্যুতা, ধাবনালয়ে নির্বাসিতা রাজকুমারীদের অনুরূপ। মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবা

[হওয়া]মাত্র তারা সর্বত্র তাকে অভিবাদন ক'রে তার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা প্রচার ক'রে দিত, আমার মতো অপরিপক্কের সঙ্গে এমনি আচরণ করত যেন আমি পরিণত বয়সী, এবং অণুমাত্র গূঢ়তা সহ্য করতে পারত না।

আমার স্বপ্নের থেকে জবাবদিহির সময় না-দিয়েই আমি তাদের তাড়াতুম। এই লোকসানের জন্যে তারা খেসারত আদায় করত তরুণীদের দল থেকে, এবং ও-দলটি এমন ক'রে বরাবর হ'ত নিঃস্ব।

পক্ষান্তরে তরুণীদের মধ্যে যেটাতে আমি মুগ্ধ হতুম সেটা হচ্ছে প্রেমে তাঁদের অবাধ আত্মদান। আমার মনে হ'ত যে তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সংযমশীলাও যেন, শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আশ্লেষে নিজেকে একেবারে নিবেদন ক'রে দিত। তাদের ভিতরের সমস্ত কিছুই বাসনা ও বাসনার অভিনন্দন : সেই লজ্জারাগ, সেই স্মিত হাসি, সেই ভীরু বিবসারম্ভ, সেই ঊরু প্রপীড়নের পদ্ধতি। সেই আগুল্‌ফ বস্ত্রাঞ্চল টেনে দেওয়ার ভঙ্গিমা, শ্রোণির অলীক-গুরুত্ব-জ্ঞাপক সেই আনত নীবি, সেই কল্পিত কুচোন্নত কাঁচলি। শোকে অথবা পরিশ্রমে যারা অকালেই বিষাদাভিভূত হয়েছে, তারা সুদ্ধ, আমি নিজের অভিজ্ঞতার থেকে জানতুম যে এমন-কি তারাও শুধু মূর্তিমতী প্রণয়, এবং প্রণয়ের নিমন্ত্রণ। প্রতীক্ষা ও প্রতিশ্রুতি। আমি তাদের সকলকেই ভালোবাসতুম : এ-কে তার স্ফূর্তির জন্য, ও-কে তার অনভ্যস্ত দৃপ্তির জন্যে, কাউকে-বা তার কামাতুর অবসাদের জন্যে, অপরকে-বা তার সরলতার জন্যে। নারীদের মধ্যে অনলীক নারী বিবেচনা ক'রে আমি তাদের ভালোবাসতুম। আজকেও অবধি ... কিন্তু এই আজকের দিনের কথা বিস্মৃত হব ব'লে কি আমি প্রতিজ্ঞা করিনি?

আর সেই অন্যদের সম্বন্ধে, সেই ব্যবসায়িনীদের সম্বন্ধে, সেই জীবিকান্বেষিণী রমণীদের সম্বন্ধে এখানে বেশি বিবৃত ক'রে কিছু বলা অনাবশ্যক।

৪

প্রায় মাঝরাতে আমার প্রতিবেশিনীকে ঘরে ফিরতে শুনলুম। সেদিন সকালেই যে একটা ঘাঘ্‌রাকে দরদালানের শেষে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে দেখেছি, সে-বিষয়ে আমি একরকম নিঃসন্দেহ ছিলুম। ঘাঘ্‌রাটা অপমানকর নয়।

আমি ভাবতে লাগলুম : ও দাসী হ'তে পারে না, ওর পায়ে তো চটি নেই, ও যে গোড়তোলা জুতা। উপরন্তু ঘরের কোণে ও এই সবে একটা ছাতা রাখলে। ও বাইরে থেকে আসছে ; ও কোনো আফিসে কাজ করে। খুব দেরি অবধি খাটতে হয় তো! আর যে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। চেয়ারে ব'সে ও ভাবছে। আঃ! ওই যে উঠেছে। ও দু-এক পা চলছে। ও বিষণ্ণা ও একাকিনী। ঠিক আমার মতো, কেন-না আমিও একা এবং সম্ভবত বিষণ্ণ। হাঁ, নিশ্চয়ই, অত্যন্ত বিষণ্ণ, তারই মতো। আঃ! ও যে ওই চুল খুলছে।

চুলের কাঁটা পড়লে যে লঘু শব্দ হয় আমি সেই শব্দ শুনলুম। তারপরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঠিক যেন একটি আর্তনাদ। শেষে একটা অনুচ্চ খস্‌খস্‌ আওয়াজ : পোশাক খুলে পড়ছে। আমি ভাবলুম : ও এখন নগ্ন, এবং আমি যে-সংবেদনটা অনুভব করলুম, তা তীক্ষ্ণ।

প্রায় অপ্রীতিকর, যেন আমার পৃষ্ঠের সমস্ত রোমগুলি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠেছে। তারপর আমার কানে এল জলপতনের মৃদুধ্বনি ; তার একটু পরে বেড়ার পেছনে, আমার অতি সন্নিকটে, খাটখানা মচ্‌মচ্‌ ক'রে উঠল, আমার এত কাছে যে আমার ভয় হ'ল। এই নারীদেহটি হঠাৎ আমার খাটেই পড়ল নাকি? গৌরীদের সৌরভ-সুবাসিত, নিটোল ও আতপ্ত একটি তনু।

কোনো নারীর সঙ্গে সমস্ত রাত্রি কাটানো আমার কখনো ঘ'টে ওঠেনি। হয়তো এই রাত্রিটা আমার প্রথম প্রণয়-রাত্রি হবে। প্রথমটা দুটো কানই মুক্ত রাখবার জন্যে আমি চিৎ হ'য়ে শুয়েছিলুম। যাতে ক'রে বেড়ার ও-পাশ থেকে যে-আওয়াজগুলো আমার কাছে পৌঁছনো সম্ভব, তার একটিও যেন-না অশ্রুত থাকে। তার একটু পরে সেই বেড়াটার উপরে কান পাতবার জন্যে আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুলুম।

আমি দেখতে পেলুম যে আমার পায়ের তলায় জনলা দিয়ে আগত বহুবর্ণ আলোকের সুরার মতো ছাপ, কিন্তু আমার অন্তরে সহস্র শিখায় রঙিন, কল্পনাপুষ্ট আবেগমণ্ডিত কতকগুলি মূর্তি। মাঝে-মাঝে আমার সুরূপা প্রতিবেশিনী পাশ ফিরছিল, এবং আমি নূতন ক'রে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস, অর্ধ উচ্চারণ, হয়তো-বা মুখের কথা-সুদ্ধ নির্ণয় করতে পারছিলুম। সে কি এখন সুপ্তা? সে কি এখন স্বপ্নরতা? তার উদ্দীপ্ত নির্জনতায় সে আবাহন করছে কাকে? নিপীড়িত দন্তে, বদ্ধমুষ্টিতে সে কি আহ্বান করছে আমাকেই?

দেওয়ালে আস্তে-আস্তে আঁচড়ানোর ইচ্ছা আমার হ'ল, এবং আমি তাই করতে শুরু করলুম। কিন্তু একটা যেমন-তেমন জবাব যে আমাকে কীরকম অপ্রতিভ ক'রে দিলে তা কল্পনা করা অসাধ্য ; আমি হৃতনিঃশ্বাস হ'য়ে, উদ্বেগে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ক্ষান্ত হলুম।

আশপাশের যে-রমণীগুলিকে ভাগ্য আমার আয়ত্তের মধ্যে সমর্পণ করেছিল, (উষার একটু আগে) আমি তাদের গুণে দেখলুম : প্রথমত আমার এই সুকোমলা প্রতিবেশিনী, তারপরে সেই ভোজনশালার রক্তবেশিনী পরিচারিকাটি ও তার সেই লঘু রোমে ঢাকা দেহখানি, তারপরে রুটিওয়ালার সেই মদালসা ও অবজ্ঞাপূর্ণা যুবতী মেয়েটি, মোটা-কাপড়-পরা সাম্রাজ্ঞীর মতো গর্বিতা। হাঁ, তাকেও বাদ দিইনি, পোষ-না-মানা হিংস্র পশুশাবকের মতো হ'লেও, আমি তাকেও ধরেছিলুম।

দিনের সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। এই ক্ষতিকর প্রভাত-নিদ্রা আমাকে স্বেদের যে গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত ক'রে রেখেছিল, তার থেকে আমায় টেনে বার করলে আমার অতি সন্নিকটের একটা দ্বারের শব্দ। আমি তখনই শুধু জামা প'রেই উঠে দাঁড়ালুম ; তখনই চাবি তালাটাকে দিলে পীড়া। আমি সেই দরদালানে একটা নিষ্ফল চাহনি নিক্ষেপ করলুম। আমি শুনতে পেলুম একটা লঘু পদধ্বনি সিঁড়ির ভিতরে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। দেরি হ'য়ে গেছে, বড়ো দেরি হ'য়ে গেছে : আমার প্রতিবেশিনী যে বিগতা।

সেই দিনটা ব্যাপৃত হ'ল অসংখ্য আনাগোনায় ও সত্যকার গৃহস্থাপনার প্রাথমিক ভাবনায়। আমার গৃহস্থালীর জন্যে একজন গৃহপালিকার দৈনন্দিন খরচ বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাজেই পক্ষান্তরে একজন এমন লোকের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হ'য়ে

পড়ল যে সপ্তাহে দুই বা তিন ঘণ্টা আমাকে দিতে পারবে, এবং ভারি কর্তব্যের থেকে আমায় পরিত্রাণ করবে। গোটাকয়েক ঠিকানা প্রদত্ত হ'য়ে আমি সারা পাড়াটায় মন্থন ক'রে বেড়ালুম। মিছে। প্রায় বেলা দশটার সময় আমি এক আমুদে ও দাড়িওয়ালা দ্বার-পালিকার সামনে এসে আটকে পড়লুম ; সে শেষে ঘোষণা করলে : 'আপনার যা-দরকার তা আমার আছে।'

সে আমাকে তার ইমারতের উঠানে টেনে নিয়ে গেল এবং সহকারী সেনানায়কদের মতো কণ্ঠস্বরে চতুর্দিক নিনাদিত ক'রে ডাকলে : 'আঁজেল! ও আঁজেল!'

তারপরে যে কোমল মুখখানি একটি জানলাতে উদিত হ'ল, তা আমি কখনো ভুলব না : তার সৌষ্ঠব ম্যাডোনার মতো, তার কবরী অসংযত, তার দেহ শিথিল, তার দশন জ্যোতির্ময়। বৃদ্ধা চিবুক চালনা ক'রে মাথা উল্টে আমার সঙ্কটের ব্যাখ্যা করলে। আঁজেল হাসলে ও চোখের পাতার সাহায্যে অনুমোদন করলে। সে বললে : 'আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার বাসা দেখতে আর আপনার সঙ্গে ব্যবস্থা করতে আসছি।'

দ্বার-পালিকা আবার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সে কুৎসিত হাসি হেসে, কেশে, অবশেষে আমায় ঠেলে বাইরে বার ক'রে দিয়ে বললে : 'ওকে কিছুতে ছাড়বেন না। যতদিন চলে চলুক না।'

তাহ'লে আঁজেল চিত্ত-চঞ্চলা, সত্য? বেশ তাকে আকর্ষণ করবার, তাকে ধ'রে রাখবার ব্যবস্থা হ'তে পারবে। তার চিকণ বেণী তার কপালকে যেন কৌমার্যের ছাঁচে নির্মাণ করেছিল ...।

আমি আবার হিসাব করলুম : প্রথমত আমার রূপসী প্রতিবেশিনী — সকলের চেয়ে কাছেরটিকেই আগে ধরা যাক্ — তারপর ভোজনশালার অধ্যক্ষের সেই পরিচারিকাটি, রুটিওয়ালার মেয়েটি, এবং অবশ্যই আমার তন্বী আঁজেল। সর্বসমেত চারটি, আরম্ভের জন্যে এমন কিছু মন্দ নয়।

আমার বিছানাপত্র ও কাপড়চোপড়ের মধ্যে শৃঙ্খলার অন্তত একটা আভাস আনবার চেষ্টায় আমি বাড়ি ফিরে গেলুম। এগারোটার একটু পরে একটা এমন মন্থর, এমন অলস পদভারে সিঁড়িটাকে আর্তনাদ করতে শুনলুম যে তা আমার প্রায় লক্ষ্যই হ'ল না। অবিলম্বে আমার দ্বারে কে আঘাত করলে। আমি দরজা খুললুম : সে আঁজেল।

মুখের উপরে একটুখানি বিবর্ণ হাসি এঁকে সে প্রথমটা চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল কষ্টে, এবং যদিও আমি তখনো সে-সমস্ত বিশেষ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ ছিলুম না, তবুও আমি তখনই লক্ষ করলুম যে সে অন্তত সাত-আট মাসের গর্ভবতী।

আমি কম্পিত কণ্ঠে বললুম : 'আসুন, মাদ্‌মোয়াসেল।'

সে আমার ইজিচেয়ারে বসতে আপত্তি করলে না, এবং শ্বাস খুঁজতে-খুঁজতে মুহূর্ত-মধ্যে সে স্বীকার করলে : 'বেজায় উঁচু।' তারপর সে আমার ঘরখানা নিরীক্ষণ ক'রে বিনা-দ্বিধায় বললে, 'মস্ত তো।'

এই শেষোক্ত মন্তব্যটার উচিত ছিল আমায় হাসানো ; তা আমায় গর্বে ভ'রে দিলে। আমার রাজ্যটাকে আমি অভিনিবিষ্ট হ'য়ে নিরীক্ষণ করলুম। তার চারটে দেওয়ালকেই আমি

স্থানচ্যুত না-হ'য়ে স্পর্শ করতে পারতুম। আমি তার কথায় সায় দিয়ে বিনয় সহকারে বললুম : 'নেহাৎ ছোটো নয়।'

আমার তৈজসপত্রের উপরে আঁজেল তার দৃষ্টি চালনা করলে। আমার মনে হ'ল, তার চাহনিটা উদ্যমহীন, কিন্তু অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সে মাথা নেড়ে আস্তে-আস্তে বললে : 'অনেক কাজ! বইয়ের রাশ! কাপড়চোপড়ের গাদা! ওঃ! ওই মড়ার মাথাটা! কী ভয়ানক!'

সেই বিখ্যাত মুণ্ডটাকে লুকাতে-লুকাতে আমি বললুম : 'মাদ্‌মোয়াসেল। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি।'

সে বিবাহের কোনো চিহ্ন বহন করছে না দেখে আমি তাকে মাদ্‌মোয়াসেল, এই কৌমার্যসূচক নামে ডাকাটাকেই ভালো ব'লে বিবেচনা করেছিলুম। আমার কেমন অপ্রতিভ, কেমন বিহ্বল লাগছিল; কিন্তু তবুও কল্পনাতে আমি আঁজেলের জীবনের, আঁজেলের নাটকের পুনর্গঠন করছিলুম, এবং আমি একটা সোৎসাহ করুণায় অভিভূত হ'য়ে পড়লুম, যেটা শীঘ্রই বাক্‌চপল হ'য়ে উঠল।

আমি সজোরে বললুম : 'মাদ্‌মোয়াসেল সবপ্রথম দরকার হচ্ছে আপনাকে পরিশ্রান্ত না-করা। এটা নিশ্চয় যে ভারি কাজগুলো করব আমিই। আর অন্যগুলোর জন্যে, এটা প্রত্যক্ষ যে স্ত্রীলোকের হাত, স্ত্রীলোকের চোখ ...।'

একরকমের উদার মত্ততার ভিতর দিয়ে আমি আমার বক্তৃতার অনুধাবন ক'রে চললুম। মাদ্‌মোয়াসেল আঁজেলকে আমি বুঝিয়ে দিলুম যে তার সবিরাম উপস্থিতিই, তার সুদূর স্বীকৃতিই আমার আভ্যন্তরিক সুশৃঙ্খলা নির্বাহের জন্যে যথেষ্ট হবে, যে, সে আমায় প্রধানত দেবে পরামর্শ, যে কখনো-কখনো সামান্য বাজার করবার সময়, আমি এমন-কি তার অল্প-স্বল্প কাজেও লাগতে পারি। যে-সময়ে আমি নিঃসন্দেহ তার আবশ্যকের তত্ত্বাবধান করার, তার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করার প্রস্তাব পাড়তে যাচ্ছিলুম, ঠিক সেইসময়ে ঊর্ধ্বশ্বাস হ'য়ে আমায় থেমে যেতে হ'ল।

আমরা মূল্য সম্বন্ধে একমত হলুম। সে ঘণ্টা-পিছু দশ সু ক'রে চাইলে। আমি রাজি হলুম, কিন্তু তা উদ্‌বিগ্ন শীঘ্রতার সঙ্গে, নিজেকে উপবাসী রাখার গূঢ় অনুভূতি সহকারে।

আমাকে সরভস বিশ্বপ্রেমিক ধ্যানের মধ্যে ফেলে রেখে আঁজেল চ'লে গেল।

অপরাহ্ণে আমি আয়ুর্বেদ-শাখার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি ছিলেন আমার পিতার বন্ধু। এবং আমার একখানা প্রশংসাপত্রও ছিল। একটি পুরো ঘণ্টা অপেক্ষার পর আমি একটি আড়ম্বর-বর্জিত সমাধি-শোভন ঘরে চালিত হলুম। উদ্‌ভ্রান্ত ছাগশ্মশ্রু-যুক্ত একটি লোক আমায় একখানা এমন নিচু ও গভীর আরামকেদারায় বসতে ইঙ্গিত করলে যে সেটাতে নিমজ্জিত হ'য়ে আমি লজ্জায় অধোবদন হলুম এবং নিজেকে আমার মর্যাদাহৃত মনে হ'ল। লোকটি আমার বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না-হ'য়ে কতকগুলি চিঠি শেষ করলে; তারপর একটা উদাস ও হৃদ্য কণ্ঠে সে আমায় সম্বোধন ক'রে বললে : 'তারপর রেসেগিয়ে মশাই?'

ফুটপাত ধ'রে চলতে-চলতে আমি যে ক্ষুদ্র নিবন্ধটি রচনা করেছিলুম, সেটাকে আমি

যেমন-তেমন ক'রে উচ্চারণ করলুম। সম্পাদক আবিষ্টভাবে আমার কথা শুনতে লাগলেন যেন তাঁর ভুরু দিয়ে। তিনি আমার কথা কেটে বললেন : 'আপনার পিতার সঙ্গে আপনার খুব সাদৃশ্য আছে।' আমার মনে হ'ল আমি লজ্জায় লাল হ'য়ে যাচ্ছি। আমি প্রতিবাদ ক'রে বললুম,—'আমার তা বিশ্বাস নয়।'—'তাহ'লে সেটা আপনার ভুল।' এই কথা ব'লে বৃদ্ধ থামলেন। এবং আমার একখানা হাত তাঁর দুটো হাতের মধ্যে চাপড়াতে-চাপড়াতে তিনি আমাকে টেনে নিয়ে চললেন দ্বারের দিকে। আমাকে বিদায় দেবার মুহূর্তে একটা অদ্ভুত বাগ্‌বহুল উদারতার বশবর্তী হ'য়ে তিনি আমায় বললেন : 'যখন খুশি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমার দ্বারা যা-হওয়া সম্ভব আমি করব। আপনার পিতাকে আমার প্রীতি জানাবেন। আঃ! আপনার সঙ্গে তাঁর কীরকম সাদৃশ্য! এটা আপনার খুবই রুচিকর হওয়া উচিত।'

আমি আবার রাস্তায় এসে উপস্থিত হলুম। এখন আমি একটা এমন অসঙ্গত সংবেদনের কবলে যে তাতে ক'রে আমার সমস্ত রক্ত ছুটে চলেছিল আমার গালে।

আমি আমার পিতার প্রতিকৃতি, সমস্ত অর্বাচীনদের এই কথা ঘোষণা করতে শোনা, তার চেয়ে আর কিছুতে আমার বেশি রাগ হ'ত না। আমি আমার পিতাকে শ্রদ্ধা করি, এটা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু আমার জীবনের একটা বড়ো অংশ আমি এমনভাবে চলেছি, যাতে ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সাদৃশ্যই না-থাকে। আমি আমার চলার ভঙ্গিকে নজরবন্দীতে রেখেছি, আমার প্রতিঘাতের উপরে গুপ্তচরবৃত্তি করেছি, আমার মুদ্রাদোষগুলোকে দণ্ড দিয়েছি। এর জন্যে আমার সহস্র কারণ আছে, কিন্তু তাদের বিষয় এখানে কিছু বলব না ব'লে যে আমি করেছি দৃঢ়সঙ্কল্প।

একটা সচেতন ক্রোধে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি স্ফীত হ'য়ে রইলুম। যখন ঘুমানোর জন্যে আমি বাড়ি ফিরলুম, তখনো সেটা প্রশমিত হয়নি।

নয়টা বাজা আমি সবেমাত্র শুনেছিলুম। আমি একটা এমন অসন্তোষ অনুভব করছিলুম যে প্রথমটা আমি ব'সে থাকতে অসমর্থ হলুম। আমি আমার বাতিটা জ্বাললুম, এবং একটা দেওয়াল হ'তে অন্যটা পর্যন্ত পায়চারি আরম্ভ করলুম : তার বৃহত্তম পরিসর মাত্র তিন পদক্ষেপ। কিছুকাল গত হ'ল। আমি আমার পাইপটা ভরছিলুম যখন শুনতে পেলুম দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি কারো প্রতীক্ষা করছিলুম না, আমি কাউকে চিনতুম না। আমি এ-রকম বিস্মিত হ'য়ে গেলুম, সেইসঙ্গে এতগুলো হাস্যাস্পদ ধারণা আমার মধ্যে উপস্থিত হ'ল যে, প্রথমটা আমি জবাব দিতেই ভুলে গেলুম। তখন আবার দ্বিতীয়বার কে করাঘাত করলে ও দ্বারটা খুলে গেল।

যে-ব্যক্তিটি আবির্ভূত হ'ল সে বর্ণনার যোগ্য। সে একটি খর্বাকার বৃদ্ধ, যেন একটা লম্বা কোটের ভিতরে ভাসছে। তার পা-দুখানি শিশুদের মতো, এবং নিশ্চয়ই নিজেকে বড়ো করবার জন্যে সে পরেছিল এক জোড়া উঁচু-গোড়ালিওয়ালা জুতা। মোটা-কাপড়ে-মোড়া তার বুকখানা সেই পাখার মতো দাড়িতে ঢাকা পড়েনি। একটা আঁটোসাঁটো টুপির ভিতরে

তার চুল গিয়েছিল অদৃশ্য হ'য়ে। সে আমায় লক্ষ করলে এবং তার সেই পুতুলের মতো হাত-দুখানা খুব উঁচুতে তুলে তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে লাগল :

—একজন যুবা! নেহাৎ ছেলেমানুষ! প্রায় শিশু!

আমি আরম্ভ করলুম : মশাই...।

সে আমায় বাধা দিলে :

—সহস্রবার আপনার মার্জনা চাইছি। আমি কোথায় ভাবলুম যে কোনো বুড়োর এমন-কি কোনো অসুস্থ বুড়োর সংস্রবে আসতে হবে। কাল রাত্রে আপনি কী মন্দই ঘুমিয়েছেন! ভগবান আমায় ক্ষমা করুন! আমি কি তবে স্বপ্ন দেখেছি? আমার মনে হয়েছিল যেন কে বেড়াটায় আঁচড়াচ্ছে। আমি উঠে যার সাহায্যে ছুটে আসতে যাচ্ছিলুম সে কে আপনার মনে হয়? সম্পূর্ণ সুস্থ একজন জোয়ান বালকের...। অবশ্য স্বীকার করছি যে দারোয়ানকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমাদের দারোয়ানের সম্বন্ধে সাবধান হবেন, মশাই। আমার নিজের তরফ থেকে বলতে পারি যে গত দশ বছর যাবৎ এই অসহ্য লোকটার সঙ্গে কথা কওয়ার থেকে আমি সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছি। হায়! কী শোচনীয় কল্পনা! আপনাকে বলবার সময় হয়েছে যে আমি আপনার প্রতিবেশী।

—আমার প্রতিবেশী?

আমার খাটের পেছনের বেড়াটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ;

—আপনার প্রতিবেশী, হাঁ, অবশ্যই ...মশায়ের নাম?

—আঁতোয়ান রেসেগিয়ে।

—রেসেগিয়ে। ঠিক হয়েছে।

জুরাতে কতকগুলি রেসেগিয়ে ছিলেন। একটি মাননীয় বংশ, সম্ভ্রান্ত বংশ। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় দুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর অনেকগুলি শিক্ষিত সমিতির সভ্য ওই-বংশের থেকেই নির্বাচিত হয়েছিল। আঃ! আবার একটি সুন্দর নরমুণ্ড! Alas! Poor Yorick! আপনি তাহ'লে ছাত্র?

আমি চোখের পাতা নেড়ে জানালুম, হাঁ। বৃদ্ধ সেই করঙ্কটাকে দু-হাতে ধ'রে গভীর বিষণ্ণতার সহিত সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। ইতিমধ্যে আমি আমার চিন্তাধারার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। তাহ'লে ইনিই আমার রূপসী প্রতিবেশিনী...আশা করি অবচ্ছায়া আমার এই নূতন লজ্জারাগটাকে প্রচ্ছন্ন করেছিল। নূতন ক্রোধোচ্ছ্বাস। সৌভাগ্যক্রমে আমার 'রূপসী প্রতিবেশিনী' এমন একটা উৎসাহের সঙ্গে আবার কথা জুড়ে দিলেন যে ক্রোধটা আমার নিজের প্রতিই সম্পূর্ণত প্রযুক্ত কি-না, তা ভেবে দেখবার আমার আর অবসর ছিল না।—বিমুক্ত পুস্তকের উপরে একটি নরমুণ্ড! আমি দেখছি আপনি একজন আসল দার্শনিক। প্রতিবাদ করবেন না ; আমি জানি। আমি চাই আপনি একবার চকিতের জন্যে আমার ঘরে এসে আমার প্রতি আপনার সখ্য জ্ঞাপন করেন। হাঁ, যেমন আছেন ঠিক তেমনিটি, ওই চটি প'রেই, প্রতিবেশীর মতন।

তার ক্ষীণ হাতখানি আমার জামায় আটকে গেল :

—আলোটা জ্বালাই রেখে আসুন : আমি আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুক্তি দেব! আঃ! আত্মপরিচয় দিতে পারি কি? এমে লেফোর। এ-নাম আগনাকে কিছুই বলছে না, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। অ্যাঁ, আপনাকে কী বলবে বলুন? আমি নগণ্য, অন্তত সমাজের সম্পর্কে নগণ্য। একটুখানি ছায়া, একটি পতঙ্গ। এমে লেফোর, বঁমারশে-র দোকানের, ফিতের বিভাগের কর্মচারী। একজন আড়ম্বরহীন, চিন্তাপ্রবণ পতঙ্গ-মাত্র।

আমরা আমার ঘর ছেড়ে তার ঘরে প্রবেশ করলুম। ঘরখানা এত অসংখ্য ফট্‌কি-নাট্‌কিতে, খেলনাতে, অপল্‌কা জিনিসে ভারগ্রস্ত যে তৈজসপত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবগুলো, আলমারি ও খাটখানা, দেখতে পাওয়া মুশকিল। দেওয়ালের গায়ে রাশিকৃত ফ্রেম। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছবি, পুরানো ও হালফ্যাশানের ফটো আর ডাকটিকিট-শোভিত সান্‌কি। আরশিটার কাঠামোতে ধারণাতীত পরিমাণের মেট্রোর টিকিট, তাস, খাদ্যতালিকা, যিশুর শেষ ভোজনের চিত্র। শশক-আঁকা মখ্‌মলের ঢাকা-দেওয়া দুটি সাবেকি তেলের আলো। আর কত বলব? বই, দূরবীন, মূর্তি, ছেলের খেলনা, কলকব্জা ও যন্ত্র।

মণ্ডলাকার করভঙ্গি ক'রে সে বললে : হাঁ, একটু অপরিপাটি হয়েছে বটে। কী এসে যায় তাতে! চিন্তাশীল পতঙ্গ। দার্শনিক-প্রবর, একবার শুধু দৃষ্টিপাত করুন।

সে আলমারিটা খুললে : টয়লেট-কাগজের মতো কতকগুলো সাদা তালে সেটা ভরা।

সে আবার উঁচু গলায় বললে : আপনি যে বুঝতে পারছেন না, সেটা খুব স্বাভাবিক। আমার সমস্ত জীবনটা ধ্যানের জীবন। ত্রিশ বছরের বেশি যাবৎ আমি ফিতে বিভাগের বেচার কাজ করছি। কাগজের যে-ফালি দিয়ে পণ্য ঢাকা থাকে, সেগুলোকে আমি জমাই। ওইগুলোর উপরেই আমি লিখি। আমি আমার চিন্তা লিপিবদ্ধ করি।

সে একখানা সেই পাকানো কাগজ তুলে নিয়ে, আলোর কাছে এগিয়ে এসে বললে :

—কেবল কয়েক ছত্র প'ড়ে দেখুন।

সেই পীতপ্রান্ত কাগজের উপরে যে-হস্তলিপিটা ছিল তা পণ্ডিতোপযোগী, স্বভাব-সরল ; তার লালিত্য শ্রমসাধ্য। সে আবার বললে :

—একটুখানি প'ড়ে দেখুন। দশ কী পনেরো সেন্টিমিটার।

আমি পড়লুম : 'যা মানুষের অবস্থাকে এত দুঃখময় করে, তা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষার বিরাটত্বের ও কর্মপন্থার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে অসামঞ্জস্য। একজন অসীম শক্তিসম্পন্ন মানবের কল্পনা করা যাক্...।'

কম্পিত ও বিদীর্ণ কণ্ঠে ক্ষুদ্র বৃদ্ধটি আবার বললে :

—আমার সমস্ত জীবন! আমার জীবন! একটি চিন্তাশীল পতঙ্গ।

এবং হঠাৎ পুনঃপ্রণোদিত হ'য়ে সে শিশুসুলভ হাসি হেসে বললে : আপনি তো দলেরই লোক, আপনার ওটা লাগল কেমন?

আমি জবাব দিলুম : খুব ভালো!

—কিন্তু এ-সমস্তই অন্তর্ধান হবে। আমার সঙ্গে সমস্তই জ্ব'লে, হাঁ, ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে। আমি আমার সব সংবিধান করেছি...। আঃ! আপনি জাঁতাকলটা দেখছেন।

টেবিলের উপরে সে একটি যত্নে সংগ্রথিত কাঠের জাঁতাকলের উপরে হাত দিয়েছিল।

—এই জাঁতাকলটি একটি ইতিহাস! আমি নিজের হাতে ওটাকে তৈয়ারি করি, কাটি, পালিস করি, রঙ দিই আমাদের দোকানেই। কিন্তু কেউ ওটা লক্ষ করেনি, না আমার মুনিবরা, না আমার সহকর্মীরা। আঃ! যখন কোনো একটা কিছু করতে আমি মনস্থ করি!

দরজার দিকে আমি একটা অনির্দিষ্ট সঙ্কেত করলুম। সে সেটা লক্ষ করলে এবং তার আনন কুঞ্চিত হ'য়ে গেল :

—আপনি চ'লে যেতে চাচ্ছেন? এরই মধ্যে! আমার দুর্ভাগ্য! হাঁ আমি জানি : আপনার কাজ! যান তবে। কিন্তু সময়ে-সময়ে আসবেন। আমি সুযোগমতো আপনার উপকারে লাগতে ইচ্ছুক। সেটা আসতে পারে। কে জানে বলুন। আপনি যদি আমাকে আপনার এতটুকুও উপকার করতে দেন, তাহ'লে আমার অত্যন্ত আনন্দ হবে।

সেই আলমারির দিকে সে অঙ্গচালনা করলে :

—আর তারপর আপনার যদি আরও পড়বার ইচ্ছা থাকে, আমি আপনাকে গোটাকয়েক তাল [.?.] ধার দিতে পারি। কিন্তু আপনার নিজের জন্যে, শুধু আপনার একার জন্যে।

চার কদমে আমি আমার ঘরে ফিরে এলুম। দ্বারে চাবি ঘুরিয়ে, আমি বিনা-ত্বরায় কাপড় ছাড়া আরম্ভ করলুম। আমি তখনো খুব বিশেষ ক'রে এমে লফোর মশায়ের কথা ভাবছিলুম না : আমার ধ্যানের মধ্যে সেই বৃদ্ধের মূর্তিটি পুনঃপুনঃ যাতায়াত শুরু করে আরো পরে, আরো অনেক পরে। না, আমি ভাবছিলুম আমার নিজের বিষয়ে। আমি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কেবল আমার নিজের কথা ভাবছিলুম এবং ধীরে-ধীরে বলছিলুম : সাবধান! একটা দিনের মধ্যে বিচারে দুটো ভুল। বড্ড বেশি। সাবধান! ধীরতা! আর জড়িয়ে পড়া নয়।

শয্যাতে আমি সেই প্রত্যাশিত শান্তি খুঁজে পেলুম। আমার সকালবেলার তালিকাটা যুক্তিসঙ্গতরকমের ছোটো হ'য়ে গিয়েছিল : সেথায় এখন বিরাজ করছিল শুধু সেই ভোজনশালার পরিচারিকাটি ও সেই সূপকারের মেয়েটি। এই দুটি রমণী যাদের সঙ্গে আমি তখনো বাক্যালাপ পর্যন্ত করিনি। সেটা দেখা যাবে অখন।

অর্ধনিদ্রার ভিতরে আমি লেফোর মশাইকে শয়ন করতে শুনলুম। একটা মৃদু সংবেদনার সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলুম যে আমার 'রূপসী প্রতিবেশিনী' বাস্তবের থেকে নিষ্কাশিত হ'লেও আমার চিন্তার থেকে আর কখনো বিতাড়িত হবে না।

[নামহীন অনুবাদ গল্প ৩]

বন্ধু, এই সংস্কারগুলোতে তোমার এত বিশ্বাস যে তুমি ব্যভিচার, প্রেম, দুরাকাঙ্ক্ষা, আধুনিক উপন্যাসের বশবর্তী সমস্ত প্রসঙ্গগুলো পরিত্যাগ করেছ জিল-দ'-রে-এর ইতিহাস লেখবার জন্যে — এবং একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললে :

— তার সেই ঘাটোয়াল-শোভন পদাবলির জন্যে অথবা তার সেই পায়খানা কী দাতব্যসত্রের উপযোগী শব্দসম্ভারের জন্যে বস্তুতন্ত্রের দোষ দিই না, কেন-না এমন করা হবে অন্যায় আর অসঙ্গত ; প্রথমত, এমনতর অনেক বিষয় আছে, যাতে এইরকমের শব্দ আপনা-আপনি এসে পড়ে। তারপর এইসমস্ত উক্তির আবর্জনার সাহায্যে, এইসমস্ত শব্দের আলকাতরা দিয়েও কোনো-কোনো প্রকাণ্ড ও প্রবল পুস্তক গ'ড়ে তোলা সম্ভব, জোলার *আসোমোয়ার*-ই তার প্রমাণ ; না, বিচার্যটা হচ্ছে অন্য। আমি যে-কারণে প্রকৃতিবাদের নিন্দা করি, তা তার রচনারীতির গুরুভার সাজসজ্জার নয়, সেটা তার চিন্তা-প্রণালীর জবড়-জঙ্গিমা ; আমি তাকে দোষ দিই সাহিত্যে জড়বাদকে মূর্তিমান ক'রে তোলার জন্যে, কলায় গণতন্ত্রকে মহিমামণ্ডিত ক'রে তোলার জন্যে!

হ্যাঁ, তোমার যা খুশি তুমি বলতে পার, কিন্তু সে-সমস্ত সত্ত্বেও, কী জঘন্য মস্তিষ্ক-সঞ্জাত সিদ্ধান্ত! কী ক্ষিন্ন ও সঙ্কীর্ণ পদ্ধতি! দেহের আস্তাকুঁড়ে আত্মাকে অবরুদ্ধ করার অভিলাষ, জ্ঞানাতীতকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্কল্প, স্বপ্নকে অস্বীকার করার সাহস, সংজ্ঞা, কাজ যেখানে শেষ হয় কলার কৌতূহলীর যে সেইখানেই আরম্ভ এমন-কি এটা সুদ্ধ না-বোঝা!

তুমি কাঁধ তুললে বটে, কিন্তু দেখা যাক্, তোমার প্রকৃতিবাদ, আমাদের পারিপার্শ্বিক উৎসাহ-হন্তা রহস্যগুলোর ভিতরে কী খুঁজে পেয়েছে? কিছুই না — যখন একটা মামুলি-ধরনের উদ্দীপনারও ব্যাখ্যা করার সময় এসেছে, যখন কোনো ক্ষতের গভীরতা মেপে দেখবার, আত্মার থেকে কোনো হিতৈষী ভূতকেও তাড়ানোর আবশ্যক হয়েছে, সে এইসমস্তের দায়িত্ব চাপিয়েছে ক্ষুধা আর প্রবৃত্তির উপরে। এ-রকম ক্ষেত্রে তার মতে রিরংসা আর উন্মত্ত অসংযম ছাড়া অন্য কোনো ব্যাধি নেই। সঙ্ক্ষেপে, সে অনুসন্ধান করেছে কেবল নাভির নিচের দিকটিতে, আর তা-ও উরুসন্ধিতে পৌঁছানো মাত্রই সে দিয়েছে অশ্লীলরকমের চম্পট। ওটা হচ্ছে ভাবজগতের hernial বিশেষ, আত্মার জাঙিয়া মাত্র। এছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর দেখো, দুর্তাল, ওটি অজ্ঞ, স্থূলবুদ্ধি, দুর্গন্ধময়, কারণ, ও করেছে নৃশংস আধুনিক

জীবনের সুখ্যাত, আচারে নূতন মার্কিনিপনার বড়াই, ওর অবসান পশুশক্তির যশঃকীর্তনে, লোহার সিন্দুকের অভিষেকে। দীনতার আতিশয্য দ্বারায় ও করেছে জনতার জঘন্য রুচিতে শ্রদ্ধা, কলাপদ্ধতিকে অবজ্ঞা। সমস্ত উচ্চ চিন্তাকে তাচ্ছিল্য, আর অলৌকিকের দিকে, আধিভৌতিকের পানে সমস্ত স্ফূর্তির নিরাকরণ।

অবশিষ্ট, অনুৎকর্ষ [য] মাঝারিদের প্রতিনিধিত্বে ও এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছে যে, দিব্যি ক'রে বলছি, আমার মনে হয় ও যেন 'ভাঁতর্-দ-পারি'র কসাইনি আর হোমে-র সঙ্গম-সঞ্জাত!

একটু ঝাঁঝাল স্বরে দুর্তাল উত্তর দিলে : বেশ চালাচ্ছ, মাতঁ্যা। তারপর সিগারেট ধরিয়ে সে বলতে লাগল : জড়বাদে আমার বিতৃষ্ণা তোমারই মতো প্রবল, কিন্তু তাই ব'লে বস্তুতান্ত্রিকরা কলার যে অবিস্মরণীয় উপকার করেছে তা অস্বীকার করা যায় না ; কারণ শেষ-'পরে রোমান্টিসিজমের অমানুষিক পুতুলগুলোর থেকে আমাদের রেহাই দেয় সে তারাই, আর আদর্শবাদের আরামশয্যার থেকে চিরকুমার-কীর্তিত বৃদ্ধার রিক্ততার থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে সে-ও তারাই! মোট কথা, বালজাকের পরে ধরা-ছোঁয়া-যায় এমন প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা তারাই, আর এদের সঙ্গে এদের প্রতিবেশের একটা সামঞ্জস্যের স্থাপয়িতা তারাই ; রোমান্টিকদের দ্বারা আরব্ধ ভাষার পরিপোষণে তারা করেছে সাহায্য ; তারা পেয়েছিল আসল হাসির পরিচয়, আর ক্বচিৎ-কদাচিৎ অশ্রু-সম্পদের অধিকার ; আর সবশেষে, তুমি যে-অবরতার সংরাধনার কথা বলছ, সব-সময়ে তা দিয়ে এরা অনুপ্রাণিত হয়নি।

—হ্যাঁ হয়েছে, কেন-না তারা তাদের শতাব্দীকে ভালোবাসত, কাজেই সেই দিয়ে তারা বিচার্য!

[অসম্পূর্ণ]

[নামহীন অনুবাদ গল্প ৪]

আমার নাম এল্‌স্‌-লোরাঁ-জাক্‌ মেনেট্রিয়ে। আমার পিতা লেওনার মেনেট্রিয়ে স্যাঁ-জাক্‌-রাস্তায় রেন-পেডোক-চিহ্নিত ভোজনালয় চালাতেন। সকলেই জানে ওই রানীর পা হাঁসেদের মতন জোড়া ছিল।

স্যাঁ-বেনোয়া-ল-বেতুর্নের সামনেই অবস্থিত ছিল তাঁর দোকানের উন্নত উদ্‌গত তেকোণা ছাপ। তার একপাশে কাপড়ওয়ালি মাদাম গিলের দোকান, যেখানে ছিল ত্রোয়া পুসেলের চিহ্ন ; অপর পাশে সেন্ট ক্যাথারিনের মূর্তি-আঁকা ম্যঁসিয় ব্লেজোর পুস্তকের দোকান। অদূরে রু-দ-করদিয়ের মোড়ে আঙুরপাতা-শোভিত পেতি-ব্যাকাসের রেলিং। তিনি আমায় খুব ভালোবাসতেন। রাত্রি-ভোজনের পরে আমি যখন আমার ছোট্ট বিছানায় শুয়ে থাকতুম, তিনি আমার হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে আমার আঙুলগুলি এক-এক ক'রে উঠিয়ে বলতেন, 'এইটি বলে খাব-খাব ; এইটি বলে কোথায় পাব ; এইটি বলে ধার করো-না, এইটি বলে শুধব কোথা। এইটি বলে লবডঙ্কা।'

তারপরে তিনি উচ্চ হেসে উঠতেন। আমিও হেসে-হেসে ঘুমিয়ে পড়তুম, আর আমার মা দিব্য করতেন যে পরের দিন সকালেও সে-হাসির রেখা আমার অধরপ্রান্তে লেগে থাকত।

আমার পিতা ছিলেন উৎকৃষ্ট পাচক, এবং ঈশ্বরে ছিল তাঁর ভয়। সেইজন্যেই ঝাঁঝরি ও সুবর্ণ তালপাতাধারী সেন্ট লরেন্সের সুন্দর মূর্তি-বোনা সূপকার সম্প্রদায়ের নিশান উৎসবের দিনে তিনিই বহন করতেন। পিতা আমাকে বলতেন : 'জাকো, তোর মা একজন সাধ্বী, শ্রদ্ধেয় রমণী।'

এই বাক্যের পুনরুক্তি করতে তিনি ভালোবাসতেন। আর সত্যি বলতে কী আমার মা প্রতি রবিবারে বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপা *বাইবেল* নিয়ে গির্জেতে যেতেন। তার কারণ তিনি ছোটো অক্ষর ভালো ক'রে পড়তে পারতেন না। তিনি বলতেন যে ছোটো হরফ যেন তাঁর মাথার ভিতর থেকে চোখদুটোকে টেনে বার ক'রে আনে। রোজ বিকেলে আমার পিতা এক থেকে দু-ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করতেন পেতি-ব্যাকাস্‌ পানশালায়। সেখানে আর যেত বীণাবাদিকা জানেৎ এবং সাধন-নিপুণা কাথারিন। আর যখনই সেখান থেকে ফিরতে তাঁর অপেক্ষাকৃত একটু দেরি হ'য়ে যেত, তিনি তাঁর রাত্রির টুপি পরতে- পরতে মৃদু গলায় বলতেন, 'বার্‌ব। তোমার নিদ্রা শান্তিময় হোক্‌। এখনো বেশিক্ষণ হয়নি খোঁড়া ছুরিওলাকে আমি বলছিলুম, তুমি সত্যই একজন সাধ্বী ও শ্রদ্ধেয় নারী।'

তখন আমার বয়স ছ-বছর, যখন একদিন পরিচ্ছদ ঠিক করতে-করতে, এটা তাঁর মনঃস্থির করার একটা সনাতন চিহ্ন ছিল, তিনি আমাকে অনুবর্তী কথাগুলি বললেন : 'আমাদের বিশ্বাসী কুকুর, মিরো এই চৌদ্দ বছর ধ'রে শিক্-কলটা চালিয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। সে ভালো চাকর, কখনো আমার পেরুর বা হাঁসের এক টুক্‌রোও চুরি করেনি। বকশিস্ হিসেবে কাবাবের শিক্ কদাচিৎ চাটতে পেলেই সে সুখী। কিন্তু সে হ'য়ে পড়ছে বুড়ো, তার থাবা হ'য়ে আসছে আড়ষ্ট ; সে আর দেখতে পায় না, আর কল চালানোতে সে অকর্মণ্য। যত্ন করলে একটু অভ্যাসের পরে তুমিও তার মতোই কৃতকার্য হ'তে পারবে।'

মিরো এই কথাগুলি শুনে অনুমোদনের সঙ্কেতে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

পিতা বলতে লাগলেন : 'বেশ তাহ'লে এই টুলের উপর ব'সে তুমি শিক্ ঘোরাবে। তবুও তোমার মন গঠন করবার জন্যে তুমি প্রশ্নোত্তরমালা পড়তে পারো, এবং যখন পরে তুমি সমস্ত ছাপার অক্ষর পড়তে সক্ষম হবে, তখন ব্যাকরণের বা সৎশিক্ষার কোনো বই অথবা *বাইবেল*-এর নব্য ও প্রাচীন সংহিতা কণ্ঠস্থ করতে পারো। কেন-না ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ভালোমন্দের ভেদ-বোধ আমার মতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মেও প্রয়োজন। এই কাজের পদমর্যাদা অবশ্য অল্পই, কিন্তু এটা সৎ, আর সবশেষে এই আমার বাপ-পিতামহের কাজ, এবং ভগবান প্রসন্ন হ'লে একদিন এই কাজই তোমারও হবে।'

সেদিন হ'তে বরাবর সকাল থেকে রাত্রি অবধি চুলি-কোণে ব'সে, কোলের উপরে প্রশ্নোত্তরমালাখানি খুলে আমি শিক্ ঘোরাতে লাগলুম। আমার বাবার কাছে ভিক্ষা নিতে ঝুলি হাতে-ক'রে যে একটি সদাশয় পরিব্রাজক আসত, বর্ণমালা শেখায় সে আমাকে সাহায্য করতে লাগল। এ-কাজ সে খুব খুশি হ'য়েই করত, যেহেতু আমার পিতা শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবন্ধন, বেশ এক টুক্‌রো পেরু ও একটি বৃহৎ পাত্র-ভরা দারু দিয়ে তাকে গুরুদক্ষিণা দিতেন। তাই অবশেষে মাত্রা ও শব্দ যোজনায় আমার মাঝারিরকমের দক্ষতা দেখে শ্রমণটি আমার জন্যে একখানি সুন্দর সেন্ট মার্গারেটের জীবনী এনে দিলে এবং আমাকে সেখানি অনায়াসে পড়তে শেখালে।

একদিন তার থলিটি অভ্যাসমতো টেবিলের উপর রেখে সে আমার কাছে এসে বসেছিল, এবং খালি পা-দুখানি চুলির ছাইয়ের ভিতর গরম করতে-করতে আমাকে দিয়ে শততমবার পুনরাবৃত্তি করাচ্ছিল :

'হে কুমারী, মনীষী গো —
সুপবিত্রা, রূপবতী,
গর্ভবেদন করতে বহন
সহায় তুমি হও, হে সতী —
দয়া রেখো মোদের সবার 'পরে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে যাজকীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত স্থূলাকৃতি কিন্তু সুদর্শন একটি লোক পাকশালায় প্রবেশ ক'রে উচ্চ স্বরে হেঁকে বললে : 'ওহে কর্তা! একটা কিছু ভালো পরিবেষণ করো দিকি।'

পলিতকেশের তলেও তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন জীবনের, বীর্যের প্রারম্ভে। তাঁর ওষ্ঠাধর হাস্যময়, তাঁর চক্ষু দীপ্যমান। তাঁর নাতিগুরু গণ্ড এবং ত্রিবলি-চিবুক রাজসিক লীলায় গলাবন্ধ-উপরে হেলে পড়েছে। এই পরিধেয়টি যে তদুপরি প্রলম্বিত গলকম্বলের সহিত সহানুভূতিতেই তৈলাক্ত, তা নিসঃন্দেহ। উপজীবিকাবশত আমার পিতা ছিলেন বিনয়ী। তাই তিনি টুপি খুলে প্রণাম করতে-করতে বললেন : 'শ্রদ্ধেয় মহাশয় যদি আমার চুলিতে নিজেকে ততক্ষণ উষ্ণ করেন, আমি যা-দরকার নিয়ে আসি।' বিনা-পীড়াপীড়িতেই মোহন্তটি আগুনের সামনে, ভিক্ষুটির পাশে আসন গ্রহণ করলেন।

'হে কুমারী, মনীষী গো —
সুপবিত্রা, রূপবতী,
গর্ভবেদন করতে বহন
সহায় তুমি হও হে সতী।'

এই শ্লোক শ্রমণটি পড়ছে শুনে তিনি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলেন : 'কী আশ্চর্য জীব! কী অসাধারণ মানুষ! পড়িয়ে কাপুশিন! তোমায় কী ব'লে ডাকে, ভায়া?'

আমার গুরু উত্তর দিলে, 'Brother Ange, একজন অপদার্থ পরিব্রাজক।'

আমার মা উপরের ঘর থেকে কথার আওয়াজ শুনে কৌতূহল-পরবশ হ'য়ে দোকানের ভিতর নেমে এলেন।

এরই মধ্যে মৈত্রী-মিষ্ট দাক্ষিণ্য সহকারে তাঁকে অভিবাদন ক'রে মোহন্তটি বললেন, 'একে সমাদর করা উচিত। ভায়া একজন কাপুশিন, অথচ তিনি পড়তে পারেন।'

আমার মা জবাব দিলেন, 'উনি যাই লেখা হোক্ সব পড়তে পারেন।' ভিক্ষুর সমীপবর্তী হ'য়ে পুণ্যোদক ছিটানোর পাত্র হাতে ধর্মার্থ-নিহতা কুমারীর ছবি দেখে মা সেন্ট মার্গারেটের স্তব চিনতে পারলেন।

তিনি বললেন, 'এই স্তবটি পড়া শক্ত কেন-না কথাগুলো খুব খাটো এবং কদাচিৎ পৃথক্। সুখের বিষয় যন্ত্রণার সময় খুব ব্যথার জায়গায় এটিকে প্রলেপের মতো লাগালেই যথেষ্ট। এমন-কি আবৃত্তির চেয়ে এমনি ব্যবহারেই এটি বেশি কাজ করে। এই যে আমার ছেলে জাকোর জন্মের সময় আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি।'

আঁজ বললেন, 'আপনি তাতে সন্দেহ করবেন না। আপনি যার কথা বলছেন, তার জন্যে সেন্ট মার্গারেটের স্তব একটি সেরা প্রতিকার, কিন্তু এই স্পষ্ট শর্তে যে কাপুশিন দলের ভিক্ষুদের ভিক্ষা দিতেই হবে।'

এই কথা ব'লে আঁজ, মা তার জন্যে যে-পাত্রটি কানায়-কানায় পূর্ণ করেছিলেন, সেটি নিঃশেষ ক'রে, কাঁধের উপর ঝুলি ফেলে চ'লে গেলেন পেতি-ব্যাকাসের দিকে। পিতা মোহন্তকে একখণ্ড মুরগি এনে দিলেন, আর তিনি পকেট থেকে এক টুক্‌রো রুটি, এক বোতল মদ্য এবং প্রাচীন স্তম্ভারূঢ় রোমক সম্রাট-সদৃশ স্বর্গীয় রাজার মূর্তি-খোদিত তামার বাঁটওয়ালা একখানি ছুরি বার ক'রে ভোজন শুরু করলেন।

কিন্তু একাধিক গ্রাস মুখে দেবার আগেই তিনি থামলেন, এবং পিতার দিকে ঘুরে নুন চাইলেন, যেন ইতিপূর্বে তাঁকে লবনদানি দেওয়া হয়নি তাতে তিনি আশ্চর্যান্বিত।

তিনি বললেন, 'আতিথেয়তার নিদর্শন-স্বরূপ লবন প্রদান করা প্রাচীনদের মধ্যে প্রথা ছিল। উপরন্তু মন্দিরে দেবতাদের সম্মুখেও তারা লবনাধার স্থাপন করত।'

চুলিকোণে যে-কাষ্ঠপাদুকার ভিতরে ময়লা নুন থাকত পিতা সেটি মোহন্তের হাতে দিলেন। দরকার-মতো লবন নিয়ে তিনি বললেন : 'প্রাচীনেরা লবনকে সমস্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপস্কর ব'লে দেখত এবং ওটাকে তারা এত উঁচু ব'লে গণ্য করত যে যে-সব রসিকতা আলাপনের সুস্বাদ বাড়ায় তাকে রূপকে লবন নাম দিয়েছিল।'

আমার পিতা বললেন, 'আঃ আপনার প্রাচীনেরা নুনকে যতই ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকুক্‌-না-কেন, আজকালকার লবনশুল্ক কিন্তু তার দাম আরো উচ্চে নির্ধারণ করেছে।'

পশমের মোজা বুনতে-বুনতে মা এইসব শুনছিলেন ; তিনিও কথায় যোগ দিয়ে বললেন : 'নুন যে ভালো জিনিস তা বিশ্বাস করতেই হবে। কেন-না দীক্ষার সময় পুরোহিত শিশুর জিভে এক কণা নুন দিয়ে দেয়। আমার জাকো, যখন জিহ্বাতে নুনের স্বাদ পেলে, তখন সে মুখভঙ্গি ক'রে উঠেছিল। অত অল্পবয়সেও তার কিছু-কিছু বুদ্ধি হয়েছিল। মোহন্ত মশাই, আমি আমার ছেলে জাকোর বিষয় বলছি। এই যে এখানে উপস্থিত রয়েছে।'

মোহন্ত আমার দিকে চেয়ে বললেন : 'ও তো এখন বেশ বড়ো হয়েছে। ওর মুখের উপর নম্রতা চিহ্নিত, ও নিবিষ্ট মনে পড়ছে সেন্ট মার্গারেটের জীবনী।'

আমার মা উত্তর দিলেন, 'ওঃ ! ও বিপাদিকা সারানোর স্তব, সেন্ট হার্বার্টের স্তবও পড়তে পারে। ওই দুটি আর ঈশ্বরের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করার ফলে ফোবুর্গ স্যাঁ-মারসেলে কয়েকটি দানবের দ্বারা যে-লোকটা ভুক্ত হয়েছিল তার ইতিহাস ওকে আঁজ দিয়েছেন।'

পিতা সহর্ষ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে মোহন্তর কানে আস্তে বললেন যে আমি যা-ইচ্ছা করি সে-সবই সহজাত এবং স্বাভাবিক অনায়াসে শিখে ফেলি।

মোহন্ত জবাব দিলেন, 'তা যদি হয়, তাহ'লে ওকে সৎসাহিত্যের আস্বাদন দেওয়া আমাদের কর্তব্য। ওটাই হচ্ছে মানবের অলঙ্কার, এ-জীবনে একটা সান্ত্বনা, এবং সমস্ত রোগের প্রতিকার, কবি থিয়োক্রিটাসের মতে এমন-কি প্রেমের সুদ্ধ।'

আমার পিতা বললেন, 'যদিও আমি পাচক মাত্র, জ্ঞানকে আমি শ্রদ্ধা করি, আর মহাশয় যা-বলছেন যে জ্ঞান প্রেমেরও ঔষধ, তা বিশ্বাস করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ওতে ক্ষুধা নিবারণ হয়।'

মোহন্ত উত্তরে বললেন, 'হয়তো-বা ওটা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি নয়, কিন্তু অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অতি সুগন্ধ মলমের ধরনের কতকটা শান্তি এনে দেয়।'

যখন তিনি এইরূপ কথা কইতেছিলেন কানের উপর টুপি বাঁকিয়ে অবিন্যস্ত ওড়না জড়িয়ে সীবনকারিণী ক্যাথারিন দ্বারদেশে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে আমার মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং তাঁর সেলাইয়ে তিনটে ঘর বাদ প'ড়ে গেল।

ক্যাথারিন বললে, 'মেনেত্রিয়ে-মশাই এসে একবার চৌকিদারদের সঙ্গে কথা কন। যদি

না-করেন তারা আঁজকে অতি অবশ্যই কারাগারে নিয়ে যাবে। বেচারা ভিক্ষু মুহূর্তেক আগে পেতি-ব্যাকাসে এলেন এবং সেন্ট ফ্রান্সিসের নিয়মের প্রতি অসম্মানের ভয়ে দাম না-দিয়ে দুই-তিন জালা মদ পান করলেন। কিন্তু এ-ঘটনাটার সর্বাপেক্ষা খারাপ অংশ হচ্ছে যে লতামণ্ডপে আমাকে কয়েকজন বন্ধুর সহিত দেখে তিনি আমাকে একটা নূতন স্তব শেখাবার জন্যে আমার নিকটে এলেন। আমি তাঁকে বললুম যে সময়টা সমীচীন নয়, কিন্তু তাঁর নির্বন্ধের ফলে আমার পার্শ্বস্থ খোঁড়া ছবিওয়ালা দাড়ি ধ'রে তাঁকে টেনে সরিয়ে দিলে। তারপর আঁজ ছুরিওয়ালার উপর গিয়ে পড়ল। ছুরিওয়ালা টেবিল ও পাত্রটাত্র নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে গেল। শব্দ শুনে সরাইওয়ালা এল ছুটে এবং টেবিল উল্টানো মদ ছড়ানো আর ছুরিওয়ালার মাথার উপর এক পা রেখে আঁজকে টুল সঞ্চালন ক'রে সমাগতদের মারতে দেখে, এই দুষ্টু সরাইওয়ালা উপদেবতার মতো অকথা-কুকথা বলতে-বলতে প্রহরী ডাকতে ছুটল। মেনেত্রিয়ে-মশাই অবিলম্বে আসুন, আসুন। বেচারাকে পাহারাওয়ালার হাত থেকে উদ্ধার করুন! উনি পুণ্যাত্মা, ওঁর জন্যে এ-বিষয়ে কোনো অজুহাতই করা চলবে না।'

ক্যাথারিনের প্রতি প্রিয়াচরণ করতে বাবা ছিলেন ইচ্ছুক। তবুও এবারটা সীবনকারিণীর কথা তার আশানুযায়ী ফলপ্রসূ হ'ল না। তিনি রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন যে শ্রমণের অনুকূল কোনো ছুতোই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, এবং যে-মঠের সে লজ্জার এবং গ্লানির কারণ তারই আঁধারতম অন্ধকূপে শুষ্ক রুটির ও শুধু জলের উপর থেকে তার যেন উচিত-মতো শাস্তি হয়। এই তাঁর প্রার্থনা।'

কথা কইতে-কইতে তিনি গরম হ'য়ে উঠে আরো বললেন : 'মাতাল ও কামুক! যাকে আমি প্রত্যহ সুপেয় ও সুখাদ্য দিই, সে কি-না যায় পানশালায় ভ্রষ্টাদের সাথে মাতামাতি করতে। আর তারা এতই উৎসৃষ্ট যে তাদের কাছে ভিক্ষুর ও ছুরি-ফিরিওয়ালার সঙ্গও পাড়ার সৎ-ব্যবসায়ীদের সংসর্গের থেকে শ্রেয়স্কর। ছিঃ! ছিঃ!'

তীব্র গঞ্জনার এইখানে এসে তিনি হঠাৎ থেমে মাকে চোরের মতো দেখে নিলেন। মা সিঁড়ির পাশে সোজা শক্ত হ'য়ে দাড়িয়ে সঙ্ক্ষেপ ও তীব্র সূচি-চালনে বুনছিলেন।

ক্যাথারিন এই মন্দ অভ্যর্থনায় স্তম্ভিত হ'য়ে শুষ্ক স্বরে বললে : 'তাহ'লে তাঁর সপক্ষে আপনি সরাইওয়ালা কি প্রহরীকে কোনো ভালো কথাই বলবেন না?'

'তুমি যদি চাও ভিক্ষুর সঙ্গে ছুরিওয়ালাকেও নিয়ে যেতে তাদের বলি।'

সে হেসে বললে, 'কিন্তু ছুরিওয়ালা যে আপনার বন্ধু।'

পিতা বিরক্তির স্বরে বললেন 'আমার থেকে তোমার বন্ধু। খঞ্জগতি মোটবাহী হতভাগা।'

'ওঃ, তা যদি বলেন সে সত্যই খোঁড়ায়। সে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে।' হাস্যে অস্থির হ'য়ে সে ভোজনালয় ছেড়ে চ'লে গেল।

মোহন্ত ছুরি দিয়ে একখণ্ড হাড় চাঁচছিলেন। পিতা তাঁর দিকে ফিরে বললেন : 'মহাশয়কে যা-বুঝাচ্ছিলুম। এই ভিক্ষুটা আমার ছেলেকে লেখাপড়ায় যা শিক্ষা দিয়েছে তার সমস্তের মূল্যস্বরূপ আমি তাকে গেলাস-গেলাস মদ, খণ্ড-খণ্ড রসাল খরগোশ, শশক, হাঁ, এমন-কি শ্যামতিতির ও খাসি মোরগ-সুদ্ধ দিয়ে এসেছি। ওটা একটা মাতাল এবং লম্পট।'

মোহন্ত জবাব দিলেন, 'তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু ও যদি পুনরায় আমার বাড়িতে পদার্পণ করতে সাহস করে, সম্মার্জনীর অগ্রে আমি ওকে বিদায় করব।'

মোহন্ত বললেন, 'খুব ঠিক। এই ভিক্ষুটি একটি গর্দভ। ও আপনার ছেলেকে কথা কইতে না-শিখিয়ে, শেখাবে রাসভ-নাদ করতে। এই সেন্ট মার্গারেটের জীবনী, বিপাদিকা-আরোগ্যের ওর স্তব, বৃকরূপী মানবের এই গল্প যা দিয়ে পরিব্রাজকটি আপনার সন্তানের মন বিষাক্ত ক'রে দিচ্ছিল, এ-সমস্ত আগুনে নিক্ষেপ করলে আপনি ভালো করবেন। অধ্যাপনার জন্যে আজ যে-মূল্য পাচ্ছিলেন, সেই দামে আমিও রাজি আছি। আমি বালকটিকে লাটিন ও গ্রীক, এমন-কি ফরাসি, যে-ভাষাকে ভোয়াতিয়ুর ও বাল্‌জাক এত শ্রীসম্পন্ন করেছেন তা সুদ্ধ শেখাব। এইরূপে দ্বিগুণ সৌভাগ্যের ফলে কেন-না এটা যুগপৎ বিরল এবং শুভদ, জাক্ তুর্নব্রোশ্ হবে বিদ্বান্, এবং আমি প্রত্যহ পাব একটি ক'রে ভোজ।'

পিতা বললেন, 'তথাস্তু। বার্ব দুটো গেলাস আনো। বিভিন্ন পক্ষেরা সম্মতির চিহ্ন-স্বরূপ যতক্ষণ-না পাত্রে-পাত্রে ঠেকান, ততক্ষণ কোনো কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। আমরা এখানেই পান করব। এই ভিক্ষুটা আর এই ছুরিওয়ালাটা আমার এতই ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছে যে পেতি-ব্যাকাসে আমি আর পদার্পণ করতে চাই না।'

মোহন্ত উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর চেয়ারের পেছনে হাত রেখে ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন : 'এই লালনশীন গৃহস্থলীতে আমাকে আনয়ন করার জন্য আমি সর্বসমক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-স্রষ্টা এবং ব্রহ্মাণ্ড-পালক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। একাকী তিনিই আমাদের চালান, এবং মানবের সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর সস্নেহ ভবিষ্যদর্শন স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য, যদিচ তাঁকে অন্ধের মতো পালন করা সময়ে-সময়ে অশোভন এবং অবিমৃশ্যকারিতা। কারণ যেহেতু সেটি সর্বজনীন। ঈশ্বরের বিধাতৃশক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হরেকরকম সঙ্ঘটনে। সেগুলি ঈশ্বরের সংস্পর্শে নিশ্চয়ই উদাত্ত, কিন্তু মানবের সংসর্গে জঘন্য এবং হাস্যকর। শুধু এইদিকটাই আমাদের চক্ষুগোচর। অতএব শ্রমণ ও বৃদ্ধাদের মতো মার্জারের প্রত্যেক উল্লম্ফনে ঈশ্বরের হস্তের আবাহন করা আমাদের অনুচিত। আসুন আমরা ঈশ্বরের স্তুতি করি এবং তাঁর নিকটে মিনতি জানাই যে এই শিশুকে যে-শিক্ষা দান করব, তার সমস্ত তমঃ যেন দূর হয়। অন্যত্র পুঙ্খানুপুঙ্খতে জ্ঞানলিপ্সা রহিত হ'য়ে আসুন আমরা তাঁর পূত ইচ্ছার সম্মুখে প্রণতি করি।'

তারপর পাত্রটিকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে তিনি মদে একটি প্রকাণ্ড চুমুক দিলেন।

তিনি বললেন, 'এই মদটি নর-দেহের ক্রিয়ার মধ্যে একটা কোমল ও স্বাস্থ্যকর উত্তাপ উৎপাদন করছে। এ-সুরাটি টিয়সে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে পানগাথার ছত্রপতিদের দ্বারা কীর্তিত হবার যোগ্য। এটা আমার কিশোর শিষ্যের অধরে লাগা চাই।'

তিনি আমার চিবুকের নিচে পাত্রটি তুলে ডাকলেন : 'এসো, এথেন্স-কাননের মধুপবৃন্দ এসো, এবং জাকোবাস তুর্নব্রোশের আজ থেকে কলাদেবীদের নিকট সুপবিত্র অধরে শ্রবণসুভগ সঙ্ঘে অবতরণ করো।'

আমার মা বললেন, 'মোহন্ত-মশাই, মদ, বিশেষত যখন মদ মিষ্ট হয়, মদ যে মৌমাছি

আকর্ষণ করে সেটা সত্য। কিন্তু ওই খারাপ পোকাগুলো আমার জাকোর ঠোঁটে বসুক, এ-কামনা আপনি করবেন না, কারণ ওদের কামড় বড়ো নিষ্ঠুর। একদিন একটা পিচ খেতে গিয়ে একটা মৌমাছি আমার জিভে কামড়ে দিয়েছিল। ফলত আমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর যতক্ষণ-না আঁজ আমার মুখে একছিটে থুথু-ভেজা মাটি দিয়ে সেন্ট কস্‌মাসের স্তব উচ্চারণ করলেন ততক্ষণ আমি কিছুতেই আরাম পাইনি।'

মোহন্ত তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি রূপকচ্ছলে অলির নাম করেছিলেন। পিতা তাঁকে তিরস্কারের স্বরে বললেন : 'বার্ব, তুমি সাধ্বী ও শ্রদ্ধেয় রমণী। কিন্তু আমি প্রায়ই লক্ষ করেছি যে গুরুত্বপূর্ণ আলাপের ভিতরে ভীমবেগে অসময়ে প্রবেশ করার একটা অপ্রিয় অভ্যাস তোমার আছে।'

মা জবাব দিলেন, 'হয়তো হবে। কিন্তু লেওনার্ড তুমি যদি আমার উপদেশে বেশি মন দিতে, তাহ'লে তোমার অবস্থা আরো ভালো হ'ত। আমি যে সমস্তরকমের মৌমাছি চিনব, তা আশাতীত। কিন্তু কী ক'রে গৃহস্থালি চালাতে হয়, আর যে সংসারী নিজের গণের নিশান-বাহক, সে মধ্যবয়সী লোকের কোন্‌টা উচিত চালচলন তা আমি জানি।'

পিতা কান চুলকাতে-চুলকাতে মোহন্তর জন্যে আরো খানিক মদ ঢেলে দিলেন। মোহন্ত বললেন : 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, রোমবাসীদের মধ্যে জ্ঞানের যেমন খাতির ছিল আমাদের দিনে ফরাসি রাজ্যে আর তেমন নেই। আদিম সদ্‌গুণের থেকে তাদের বিচ্যুতি হবার পরেও ইউজিনিয়াস অলঙ্কারের জোরেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। আলোক-তাপহীন চন্দ্রশালে দক্ষ লোককে বাস করতে দেখা আমাদের দিনে বিরল নয়। Exemplum ut talpa — আমি তার একজন উদাহরণ।

তারপর তিনি আমাদের তাঁর জীবনবৃত্তান্ত শুনালেন। সেটি আমি আপনাদের জানাব কেবল সেই স্থানগুলি ছাড়া, যেগুলি আমার কোমল বয়সের দরুন আমি বুঝতে পারিনি এবং ফলত স্মরণে সংরক্ষণ করতে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হয় যে, যখন তিনি তাঁর বন্ধুত্ব-দানে আমায় সম্মানিত করেছিলেন, তখনকার কথাবার্তা থেকে আমি ঈদৃশ শূন্যতাগুলিও পূর্ণ করতে সক্ষম হব।

খামখা খুশি

বর্‌থা য়ং তিরিশ পেরিয়েছিল ; কিন্তু এখনো মাঝে-মাঝে তার ঘাড়ে চাপত এইরকমের ভূত। তখন সে না-চ'লে দৌড়তে চাইত ; তার সাধ যেত নাচের তালে-তালে একবার ফুটপাথের উপরে ওঠে, একবার ফুটপাথ থেকে নামে, চাকার হাল ঘোরাতে-ঘোরাতে ছোটে তার পিছনে-পিছনে, যা-তা একটা কিছু উপরে ছুঁড়ে হাত পেতে আবার তাকেই ধরে অথবা থম্‌কে থেমে লুটোপুটি খায় শুধু-শুধু হাসির হঠাৎ হর্‌রায়।

তিরিশ পেরোনোর পরেও, নিজেদের রাস্তার মোড়েই, এমনতর খামখা খুশিতে যদি কারো মনে হয় যে আচম্‌কা বৈকালী সূর্যের জ্বল্‌জ্বলে টুক্‌রো গিলে কল্‌জে পুড়ে যাচ্ছে, ফুল্‌কি ফুটে বেরচ্ছে সারা গায়ে, হাতে-পায়ে, তবে আর কী কে করতে পারে?

এই যার হাল, মাতলামি ছাড়া তার কদর দেখানোর আর কোনো সুরাহা নেই কি? আদব-কায়দা সত্যিই ঝকমারি। দামি বেহালার মতো বরাবর যদি সিন্দুকে পোরা থাকবে, তবে ছাই বহাল তবিয়তে লাভ কী?

লাফিয়ে সিঁড়ি চড়তে-চড়তে বর্‌থা ভাবলে, 'না, আমি যা-বলতে চাই, ওই-বেহালার কথায় তার ছিটে-ফোঁটা নেই।' থলিতে হাত দিয়ে সে দেখলে চাবি নেই, রোজকার মতো আজও সেটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছে। কাজেই তখন চিঠির বাক্সটা ঠক্‌ঠকিয়ে সে আবার কবুল করলে : 'না, নালিশ আর কিছু নয়, কেন-না —আহা, মেরি, আমার জন্যে তোমার কী হায়রানি।' তারপর সামনের কামরায় ঢুকে বর্‌থা শুধালে, 'খুকির নানি ফিরেছে?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'ফল কৈ?'

'সব এসে গেছে।'

'সেগুলোকে খাবার ঘরে আনো তো, গুছিয়ে উপরে যাব।'

খাবার ঘরের আলো-আঁধারিতে শীতের বেশ একটু আমেজ ছিল ; তবু বর্‌থা কোটটা খুলে ফেললে। আঁটো জামার বেড়ি সে আর একলহমাও সইতে পারছিল না ; আর সঙ্গে-সঙ্গে কন্‌কনে হাওয়া ছোঁ মারলে তার আদুর হাতে। কিন্তু তার বুকের আড়ালে সেই গন্‌গনে জায়গাটা জ্বলছিল তো জ্বলছিলই, তখনো ফুলঝুরি ফুরোয়নি। আর যে সওয়া যায় না—সে ভাবলে। নিঃশ্বাস টানতেও সে যেন ভয় পেলে—শেষটায় ভিতরকার আগুন যদি আরো বেড়ে ওঠে! তবু নিতে হ'ল নিঃশ্বাস, ছাতি ভ'রে, আস্তে-আস্তে। সামনের ঠাণ্ডা

আরশিখানার দিকে চাইতে তার সাহসে কুলাচ্ছিল না—তবু তাকাতে হ'ল আর সেখানে যে-মেয়েটি ধরা দিলে তার জলুস যেন ফেটে পড়ছিল। ঠোঁটে কাঁপছিল হাসি, ঘোর রঙের ডাগর চোখজোড়ায় জমেছিল সবুর, সে যেন কান পেতে রয়েছে—ঘটবে, নির্ঘাত ঘটবে সেই আশমানি ঘটনা।

এমন সময় মেরি এল। প্রকাণ্ড থালায় ফল, সঙ্গে ছোটো একটা কাচের গাম্‌লা আর চমৎকার একখানা নীল রেকাবি যার আজব চেক্‌নাই যেন দুধে ডুব-দেওয়ার বক্‌শিস্‌।

'আলো কি জ্বালিয়ে দেব?'

'না থাক্‌, বেশ দেখতে পাচ্ছি।'

থালাটায় ভিড় করেছিল কমলালেবু, পাকা লিচুর মতো ঘন গোলাপি আপেল, হল্‌দে রঙের রেশ্‌মি ন্যাসপাতি, যেন রুপোর পাতে-মোড়া একগোছা শাদা আঙুর আর এক থোলো বেগুনি। ওই শেষের থোকাটা সে কিনেছিল খাবার ঘরের আনকোরা গাল্‌চের সঙ্গে খুব মিলবে ব'লে। হাঁ, কারণটা এখন নাছোড়বান্দারকমের আজগুবি শোনায় বটে; কিন্তু ওইটাই এ-সওদার আসল অজুহাত। দোকানে তার মনে হয়েছিল যে, বেগুনি কার্পেটখানাকে টেবিল অবধি তুলতে চাইলে বেগুনি গোছাটার নেহাৎ দরকার; আর তখন কথাটায় মানের ঘাট্‌তি ধরা পড়েনি। গোল-গোল, চক্‌চকে ফলগুলোকে দু-ভাগে চুড়োর মতো ক'রে সাজিয়ে, সবটা জড়িয়ে কেমন দেখাচ্ছে তা বোঝবার জন্যে, সে যখন টেবিল থেকে স'রে দাঁড়াল তখন তার চোখে পড়ল একটা তাজ্জব ব্যাপার : মনে হ'ল ঘোর টেবিলটা যেন গ'লে আব্‌ছা আলোর মধ্যে মিশে গেছে, আর সেই নীল রেকাবির সঙ্গে কাচের গাম্‌লাখানা ভাসছে ফাঁকা হাওয়ায়। বলা মিথ্যা যে তখনকার মেজাজে ব্যাপারটা, ভাবা যায় না, তার কীরকম সুন্দর ঠেকল; সে আবার হাসতে লাগল।

'আঃ, শেষে কি হিস্টিরিয়ায় ধরল নাকি?' এই কথা ব'লেই থলি আর কোট কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটল দোতলায় খুকির ছেলেদের ঘরের দিকে।

খুকি তখন সবে স্নান সেরে খেতে বসেছে। একটা নিচু টেবিলের পাশ থেকে ঝি তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিল। খুকির পরনে সাদা ফ্লানেলের ঘাগ্‌রা, তার উপরে নীল রঙের পশ্‌মি জ্যাকেট। তার পাতলা কালো চুল চুড়ো ক'রে টেনে আঁচড়ানো, ভারি মজার দেখায়। মার উপরে চোখ পড়তেই খুকি নাচতে লাগল।

দাই বললে : 'জাদুমণি আমার, লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও।' দাইয়ের ভাবভঙ্গি বর্‌থার চেনা ছিল; মানে খুকির ঘরে আসার পক্ষে সময়টা খুব প্রশস্ত নয়।

'খুকি দুষ্টুমি করেনি তো, নানি?'

নানি ফিস্‌ফিসিয়ে জানালে : 'না, সারা বিকেল সোনা-মেয়ে হ'য়ে ছিল। আমরা আজ গিয়েছিলুম সরকারি বাগানে বেড়াতে। সেখানে আমি একখানা চেয়ার নিয়ে বসলুম আর খুকিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলুম খেলতে। তারপরে একটা মস্ত কুকুর এসে আমার কোলে মাথা রাখলে আর খুকি তার কান-নাক ধ'রে কী টানাটানি! সেইসময়ে যদি ওকে দেখতেন!'

বর্‌থার ইচ্ছা হ'ল বলে যে অজানা কুকুরের কান আর বিপদ ডেকে আনা এক কথা। কিন্তু সাহসে কুলাল না। কাজেই সে আড়ষ্ট হাত-দুখানা ঝুলিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। গরীবের মেয়ে আমীরের মেয়ের খেলার পুতুল এমনি ক'রেই দেখে।

খুকি আবার চোখ তুলে মায়ের দিকে একদৃষ্টে চাইলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখখানি এ-রকম মন-মজানো হাসিতে ভ'রে গেল যে বর্‌থা না-ব'লে থাকতে পারল না : 'নানি। ছাড়ো-না, আমি ওকে খাওয়াই, আর তুমি ইতিমধ্যে স্নানের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখো।'

নানি আবার ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল : 'কিন্তু খাবার সময় এমনতর হাত বদ্‌লানো ভালো নয়। ওতে অনিয়ম হয়, ফলে বেচারার অসুখ করতে পারে।'

মেয়ে যদি পরেরই দখলে থাকবে, তাহ'লে তাকে পেটে ধ'রে লাভ কী? ব্যাপারটা ঠিক দামি বেহালা সিন্দুকে পুরে রাখার মতো নয় বটে, কিন্তু সেই গোছেরই।

বর্‌থা বললে : 'তা হোক্, দাও আমাকে!'

রাগে ফুলতে-ফুলতে নানি খুকিকে তার কোলে তুলে দিলে।

'বেশ, খাবার পরে ওকে যেন নাচিয়ে যাবেন না। জানেন তো আপনি এলেই খুকি কীরকম ধিঙ্গিপনা করে। তারপরে ঠেলা সামলাতে হয় আমাকে।'

যাক্ যেন একটা ফাঁড়া কাটল! ভিজে তোয়ালেগুলো নিয়ে নানি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বর্‌থা বললে, 'মানিক আমার। এইবারে তোকে একলা পেয়েছি।' খুকি মায়ের গায়ে এলিয়ে পড়ল।

মহানন্দে খুকি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে খেলে। কখনো চাম্‌চের জন্যে মুখ বাড়ায়, আবার হাত নেড়ে সরিয়ে নেবার হুকুম চালায়। মাঝে-মাঝে চাম্‌চেখানাকে মুখের মধ্যে কয়েদ করতে চায়, দু-একবার-বা ভরতি চাম্‌চে মারে ঠেলা, খাবারদাবার ছিট্‌কায় ছত্রাকারে।

শেষে গ্রাস ফুরোলে বর্‌থা আগুনের দিকে ঘুরে বসল।

মেয়ের গরম গায়ে চুমো দিতে-দিতে সে বললে, 'তুই সুন্দর। ভারি সুন্দর! আমি তোকে বড্ড ভালোবাসি। কত ভালোবাসি তার হিসেব নেই।'

বর্‌থা সত্যই খুকিকে খুব ভালোবাসত। হঠাৎ খুকি সামনে ঝুঁকল, অমনই সঙ্গে-সঙ্গে খ'সে পড়ল তার পিঠের ঢাকা, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার ছোট্টো-ছোট্টো পায়ের ফটিকের মতো আঙুলে ফুটে বেরুল আগুনের লাল্‌চে লাভা। সেটা দেখবামাত্র বর্‌থার খামোখা খুশি আবার উথ্‌লে উঠে তাকে ডুবিয়ে দিলে। কিন্তু এ-বারেও সে-খুশি জাহির করার রাস্তা সে খুঁজে পেলে না, বুঝতে পারলে না সে-খুশি কী কাজে লাগবে।

হঠাৎ নানি গুমরে ফাটতে-ফাটতে ফিরে এসে, খুকিকে ছিনিয়ে নিয়ে বললে, 'আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।'

বর্‌থা নিচে ছুটল। ও-ধারে হ্যারি কথা কইছিল।

'কে? তুমি নাকি, বর্‌থা? দেখো, আমার বাড়ি পৌঁছতে দেরি হবে। ট্যাক্সি ধ'রে নিয়ে

যত তাড়াতাড়ি পারি যাচ্ছি, কিন্তু খাওয়ার সময় মিনিট-দশেক পিছিয়ে দাও। দেবে তো? শুনছো?'

'হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই। ও হ্যারি!'

'কী?'

বলার কী আছে? কিছুই তার মাথায় এল না। সে তাকে ডেকেছিল যাতে তাদের লেনদেন সম্বন্ধ-সূত্রটা আরো খানিকক্ষণ অটুট থাকে। কিন্তু পাগলের মতো শুধু-শুধু কে চেঁচাতে পারে। বলা চলে না : আজকের দিনটা কী নিরুপমরকমের চমৎকার হ্যারি!

অন্যদিক থেকে ঝাঁঝালো গলায় সওয়াল : 'কী হয়েছে, কী।'

'কিছু না। বুঝতে পেরেছি।' ব'লে বর্থা টেলিফোন নামিয়ে রাখলে। লেফাফা-দুরস্তেরা কী বোকা! সত্যিই সভ্যতার মতো নির্বোধ জিনিস আর নেই।

সেদিন ওদের ওখানে কয়েকজনের খাবার কথা ছিল। প্রথমত নাইট-দম্পতি — স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই খুব খাঁটি লোক—নরমান নাইট তখন একটা থিয়েটার স্থাপনের উদ্যোগ করছিল আর তার স্ত্রী নাম কিনেছিল আসবাবপত্রের ওস্তাদ হিসেবে। দ্বিতীয়ত, এডি ওয়ারেন নামে একজন তরুণ কবি সম্প্রতি একখানা কবিতার বই বেরোনোর পরে ভোজে যার ডাক পড়ছিল অনবরত। আর আসছিল পার্‌ল্‌ ফুল্‌টন। পার্‌ল্‌ বর্‌থার আবিষ্কার। মিস্‌ ফুল্‌টনের পেশা কী তা বর্‌থা জানত না, কিন্তু ক্লাবে দেখবামাত্র সে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। যেমন তার মন কেড়ে নিয়েছিল আরও অনেক রূপসী যাদের চেহারায় থাকত আজবের (এইরকম) ইশারা। ব্যাপারটার মধ্যে উস্‌কানির খোঁচা ছিল এইখানে যে এতবার দেখাশোনার পরেও, একসঙ্গে এত ঘোরাঘুরি, প্রাণ খুলে এত কথাবার্তা সত্ত্বেও বর্‌থার কাছে তার রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হয়নি। মিস্‌ ফুল্‌টনের অসাধারণত্ব আশ্চর্যকর সরলতায়ও কোথায় যেন একটা বাধা ছিল, সেই সীমা তাঁকে কখনো অতিক্রম করতে দেখা যায়নি।

সত্যিই কী সে-বাধার আড়ালে কিছু ছিল? হ্যারি বলত না। সে ধার্য করেছিল যে পার্‌লের বুদ্ধি একটু নিরেট। অন্যান্য গৌরী মেয়েদের মতো সে-ও যেন কেমন নিরুৎসুক, তার মগজেও যেন রক্তের অভাব। কিন্তু বর্‌থা হ্যারির কথায় সায় দিতে পারত না। অন্তত তখনো না।

'না, হ্যারি, পার্‌লের ওই যে মাথা একপাশে হেলিয়ে হাসিমুখে ব'সে থাকার ভঙ্গিটা, ওর পিছনে একটা কিছু আছে ; সেটা কী তা আমায় বার করতেই হবে।'

হ্যারি জবাব দিয়েছিল, 'খুব সম্ভবত সেটা কেবল অরুগ্ন পরিপাকশক্তি।'

এইরকম জবাব দিয়ে বর্‌থাকে ফাঁদে ফেলা ছিল হ্যারির অভ্যাস। 'অমুকের লিভার জ'মে গেছে।' 'এটা সুদ্ধু গরহজমের ফল।' 'তার হয়েছে কিডনি রোগ' এইধরনের উত্তর দিতে সে ভালোবাসত। কোনো অস্পষ্ট কারণের জন্যে এতে বর্‌থা বিরক্ত হ'ত না, বরং হ্যারির এই অভ্যাসটাকে সে ভাবত প্রশংসনীয়।

বর্‌থা বৈঠকখানায় গিয়ে আগুনটা জ্বালালে ; তারপর মেরির যত্নে-সাজানো তাকিয়াগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, কউচ-কেদারার উপরে এলোমেলো ক'রে ছড়িয়ে দিলে।

এইটুকু তফাতেই সমস্ত বদ্‌লে গেল, মনে হ'ল ঘরটা যেন চকিতে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। শেষ তাকিয়াটাকে ছুঁড়তে গিয়ে বর্‌থা হঠাৎ সেটাকে নিবিড় আবেগে বুকে চেপে ধরলে। এতে সে নিজেই আশ্চর্য হ'ল বটে, কিন্তু তার অন্তর্দীপ্তি নিবল না। বরং উল্টো।

বৈঠকখানার জানলার বাইরেই একটা সরু বারান্দা, তার উপর থেকে সারা বাগানখানা নজরে আসে। বাগানের প্রান্তে, দেওয়ালের লাগোয়া একটি লম্বা, কৃশ ন্যাসপাতি গাছ, তার আগাগোড়া ফুলের গহনায় ঢাকা ; জেডের মতো সবুজ রঙের আকাশের গায়ে এই নির্বাত নিশ্চল গাছটিকে নিখুঁত দেখাল, মনে হ'ল ওটি যেন রূপের আকর। এত দূর থেকেও বর্‌থা না-ভেবে থাকতে পারলে না যে তার ডালে কোথাও একটি ঘুমন্ত কুঁড়ি বা পাপড়ি নেই। নিচে বাগানের কেয়ারিতে পীতলোহিত টিউলিপ্‌-গুলো ফুলের ভারে যেন সন্ধ্যার গায়ে হেলে পড়েছিল। একটা পাঁশুটে বিড়াল গুঁড়ি মেরে ঘাসের উপর দিয়ে চ'লে গেল, তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রে চলল একটা কালো বিড়াল। এ-দুটোর একাগ্র ক্ষিপ্রতা বর্‌থাকে কেমন যেন শিউরে দিলে।

সে বাধো-বাধো স্বরে বললে, 'বিড়ালগুলো কী সুড়সুড়ে জানোয়ার!' তারপর জানলা ছেড়ে এসে, পায়চারি শুরু করলে।

গরম ঘরখানায় জনকুইল ফুলের গন্ধ কী তীব্র। খুব বেশি কি? না, নিশ্চয়ই না। কিন্তু তবু বর্‌থা যেন অভিভূত হ'য়ে পড়ল। একটা কউচে গা-ছড়িয়ে সে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলে। এবং গুন্‌গুনিয়ে বললে, 'এত আনন্দ সওয়া যায় না।'

তার মনে হ'ল, বন্ধ চোখের পাতার ভিতর দিয়ে সেই অরূপ ন্যাসপাতি গাছের ফুটন্ত কুঁড়িগুলোকে সে দেখতে পাচ্ছে। ও-গাছটা যেন তার জীবনের প্রতীক।

সত্যি, তার তো কিছুরই অভাব নেই, বয়স বেশি না, হ্যারি আর তার প্রেমের বন্ধন এখনো আগের মতোই অশিথিল, আশ্চর্য তাদের মনের মিল, আসলে যেন বন্ধু। তার মেয়েটিকে ভালো না-বেসে থাকা যায় না। টাকাকড়ির জন্যে চিন্তা নেই। বাড়ি-বাগানে সন্তুষ্ট হ'তেই হয়। আর তাদের বন্ধুরা আধুনিক, কেউ লেখক, কেউ কবি, কেউ-বা সমাজসংস্কারে অদ্বিতীয়—এইরকম বন্ধুই তো চাই. এদের সংসর্গে যেন পুলক জেগে ওঠে। তাছাড়া বই রয়েছে। সঙ্গীত রয়েছে, তার দর্জিটি একটি অত্যাশ্চর্য শিল্পী। গরম পড়লেই বিদেশে যাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা হয়েছে। আর তাদের রাঁধুনি, অমলেট বানানোয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া দুষ্কর।

'আমি কিন্তু প্রলাপ বকছি। নিছক প্রলাপ।' সে উঠে বসল, মনে হ'ল মাথা ঘুরছে, সুরার মাত্রা যেন একটু বেশি হ'য়ে গেছে। এর জন্যে বসন্তই নিশ্চয় দায়ী।

হাঁ, নিশ্চয় বসন্ত দায়ী। হঠাৎ সে ক্লান্তি অনুভব করলে, এত ক্লান্তি যে মনে হ'ল কাপড় ছাড়তে উপরে ওঠাও সাধ্যে কুলাবে না।

সাদা পোশাক, একছড়া জেডের মালা, সবুজ জুতো আর মোজা। এই বেশবিন্যাস-সন্নিবেশটা স্বেচ্ছাকৃত নয়। বৈঠকখানার জানলায় গিয়ে দাঁড়ানোর বহু আগেই এটা সে পরিকল্পনা ক'রে রেখেছিল।

পাপড়ি-কাটা পোশাক খস্‌খস্‌ করতে-করতে বর্‌থা এসে নাইট-জায়াকে চুমো দিলে।

তিনি তখন তাঁর কোট খুলতে ব্যস্ত ছিলেন। কোটটা ভারি মজার, রঙ নারেঙ্গি, তার পাড়ে আর ছিলেতে সারি-সারি কালো বাঁদর।

'আচ্ছা বলো তো? ভদ্দরলোকেদের মন এত ভারি কেন? তারা কি ঠাট্টা ব'লে কিছু বোঝে না! ভাই, আজ এখানে যে পৌঁছেছি, সে কেবল বরাত-জোরে আর নরমানের পাহারা দেবার বাহাদুরিতে। আমার প্রিয় বাঁদরগুলি ট্রেন-সুদ্ধু লোককে এমনি উত্যক্ত ক'রে তুললে যে তারা একজোটে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে আমায় প্রায় খেয়েই ফেলেছিল আরকী। একবার কেউ হাসলে না, কেউ একটু ঠাট্টার চেষ্টা-সুদ্ধ করলে না—তাতে আমি খুশিই হতুম। কেবল হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল, মনে হ'ল তাদের চাউনি আমায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিচ্ছে।'

একটা প্রকাণ্ড শিং-বাঁধানো মনক্‌ল্ চোখে গুঁজতে-গুঁজতে নরমান বললে, 'কিন্তু সব সেরা ব্যাপারটি হচ্ছে ... বলায় তোমার তো আপত্তি নেই, আনন?' (ঘরে, এবং বন্ধু-বান্ধবদের সামনে স্বামী স্ত্রীকে আনন ব'লে ডাকত, তার স্ত্রী স্বামীর নাম দিয়েছিল বদন।) সেরা ঘটনাটি ঘটল যখন ইনি তিতিবিরক্ত হ'য়ে পাশের স্ত্রীলোকটির দিকে ঘুরে বললেন: 'আপনি কি আগে কখনো বাঁদর দেখেননি?'

আশপাশের হাসিতে যোগ দিয়ে নাইট-পত্নী বললেন: 'ঠিক-ঠিক! আচ্ছা তুমিই বলো, এইটাই কি চূড়ান্ত নয়?'

এর চেয়েও মজার জিনিস হ'ল এই যে, কোট খোলার পরে নাইট-পত্নীকে একটি খুব মেধাবীধরনের বাঁদরের মতো দেখাতে লাগল—এমন-কি তাঁর হল্‌দে পোশাকটা মনে হ'ল যেন কলার খোসা চেঁছে তৈরি। আর তার এম্‌বারের কানের দুলদুটি, সে দুটি যেন বাদাম-জাতীয় একটা কিছু।

খুকির ঠেলাগাড়ির সামনে থেমে বদন বললে: 'কী শোকাবহ অধঃপতন! ঠেলাগাড়ি স্থান পেল যেদিন সদরে—।' ছড়াটার বাকি পদটা সে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলে।

দরজায় ঘণ্টার আওয়াজ হ'ল এবং রোগা ফ্যাকাসে এডি ওয়ারেন এসে জুটল। বোঝা গেল যথাক্রমে সে অত্যন্ত বিপন্ন ও বিব্রত।

সে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে: 'এইটাই তো ঠিক বাড়ি বটে?'

হাসির সুরে বর্‌থা জবাব দিলে: 'অন্তত আমার তাই বিশ্বাস!'

'এক ট্যাক্সিওয়ালার পাল্লায় প'ড়ে আমার যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল, সে আর কী বলব। লোকটা একেবারে শয়তান! তাকে থামাতে পারি না। এই আজব লোকটা যখন ছোট্টো চাকার উপর ঝুঁকে পড়ল, তখন চাঁদের আলোয় তার চেপটা মাথাটা ...।'

সে শিউরে উঠে সাদা রেশমের একটা প্রকাণ্ড গলাবন্ধ খুলতে লেগে গেল। বর্‌থার নজরে পড়ল যে তার মোজা-জোড়া সাদা — কী চমৎকার!

বর্‌থা উঁচু গলায় বললে: 'কী ভয়ানক?'

তার পিছু-পিছু বৈঠকখানায় ঢুকে এডি বললে: 'সত্যিই তাই। আমার মনে হ'ল যেন একটা অবিনশ্বর টাক্সিতে চ'ড়ে অনন্তের মধ্যে চলেছি।'

এডির সঙ্গে নাইট-দম্পতির আলাপ ছিল। ঠিক হয়েছিল যে নরমানের থিয়েটারের জল্পনা-কল্পনা যখন কাজে পরিণত হবে, তখন এডি তার জন্যে একখানা নাটক লিখবে।

নরমান নাইট শুধালেন : 'কীহে, ওয়ারেন, নাটকখানার হালচাল কী?' মনক্‌ল্‌টা নাইটের চোখ থেকে খ'সে পড়ল এবং এই নিমেষের ফাঁক পেয়ে তার উৎপীড়িত চোখটা যেন একবার ভেসে উঠল উপরে।

মিসেস্ নাইট বললেন ; 'বাঃ, মিস্টার ওয়ারেন, আপনার মোজা-জোড়া তো ভারি সুন্দর!'

পায়ের দিকে তাকিয়ে এডি জবাব দিলে : 'আপনার পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলুম। চাঁদ ওঠার পরে ও-দুটো যেন আরো সাদা দেখাচ্ছে।' তারপর বর্‌থার দিকে রোগা বিষণ্ণ কাঁচা মুখখানি ফিরিয়ে বললে, 'জানেন তো, চাঁদ উঠেছে?'

বর্‌থার ইচ্ছে হ'ল চেঁচিয়ে ওঠে : জানি বৈ-কি, প্রায়ই জানতে পারি।

সত্যি লোকটি খাসা। কিন্তু আনন আর বদনও কম চমৎকার নয়। ইতিমধ্যে আনন সেই কলার খোসা-ঢাকা দেহখানাকে কুঁকড়ে-মুকড়ে আগুনের সামনে আশ্রয় নিয়েছিল। সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বদন জিজ্ঞাসা করলে : 'কিন্তু বরাগমে বিলম্ব কী হেতু?'

'ওই এসেছে!'

ধড়াম্ ক'রে সদর দরজা খুলল, বন্ধ হ'ল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে হ্যারি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হে, তোমরা সব করছ কী? এলুম ব'লে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।' শোনা গেল সে ভীমবেগে উপরে উঠছে। বর্‌থা না-হেসে থাকতে পারলে না ; এইরকমের শশব্যস্ত হ'য়ে কাজ করাতেই যে হ্যারির আনন্দ, তা জানতে তার বাকি ছিল না। এই পাঁচ মিনিট বেশি-কমে কী আসে যায়?

কিন্তু নিজের মনকে চোখ বেঁধে হ্যারি বলত, এই অতিরিক্ত পাঁচ মিনিটের উপকারিতা অপরিমেয়। এই হুড়োহুড়ির পরে বাড়াবাড়িরকমের ধীর-স্থির ঢঙে বৈঠক-খানায় উদয় হওয়াতেই ছিল তার গর্ব।

জীবন সম্বন্ধে হ্যারির প্রচণ্ড ঔৎসুক্য বর্‌থা খুব পছন্দ করত। হ্যারি যেন সর্বদাই খাঁড়া উঁচিয়ে আছে, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনাই যেন তার ব্যক্তি-সাহসের পরীক্ষক—তার দু-দুটো গুণ বুঝতে বর্‌থার কষ্ট লাগত না। এর জন্যে অপরিচিতেরা মাঝে-মাঝে হয়তো হ্যারির বিষয়ে ঠাট্টা-মশকরাও করত, কেন-না এমনও দু-একবার হয়েছে যে রণসজ্জায় উপস্থিত হ'য়ে হ্যারি শত্রুর ছায়া-সুদ্ধ দেখতে পায়নি। কিন্তু লোকের কথা! হাসতে, কথা কইতে বর্‌থা এমনি মশ্‌গুল হ'য়ে ছিল যে হ্যারি আসা পর্যন্ত সে লক্ষই করেনি যে তখনো পার্‌ল্ ফুল্‌টন্ অনাগত।

'হয়তো-বা মিস্ ফুল্‌টন্ ভুলে গেছেন?'

হ্যারি বললে, 'আমার তাই বিশ্বাস, তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে নাকি?'

'বাঁচা গেল, ওইযে একটা ট্যাক্সি।' বর্‌থার হাসিতে একটা মালিকিয়ানার ভাব দেখা গেল, তার আবিষ্কৃত স্ত্রীলোকদের গূঢ় নতুনত্ব যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকত, ততদিন এই আত্মপ্রসঙ্গটুকু টিঁকিয়ে রাখা বর্‌থার সাধ্যে কুলাত না। 'ট্যাক্সিতেই পার্‌লের বসতি।'

ডিনারের ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে হ্যারি ধীর স্বরে বললে : 'তা যদি হয়, মিস্ ফুল্টনের গায়ে গত্তি লাগতে আর দেরি নেই। গৌরী মাত্রেরই সম্বন্ধে এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কা বর্তমান।'

তার দিকে চেয়ে হেসে বর্থা সতর্ক স্বরে বললে : 'হ্যারি, থামো!'

মিস্ ফুল্টনের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে আরো কিছুক্ষণ এমনি হাসি-ঠাট্টায় কাটল। কিন্তু এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত অজ্ঞানতা যেন একটু বাড়াবাড়ি। অনতিবিলম্বে মিস্ ফুল্টন্ ঘরে ঢুকলেন ; তাঁর আগাপাশতলা রুপোয় মোড়া, সোনালি চুল রুপালি জালে বাঁধা, মুখে হাসি, ঘাড় ঈষৎ হেলানো।

'আমার কি বড্ড দেরি হয়েছে?'

'মোটেই না। এইবারে যাওয়া যাক্' ব'লে বর্থা তার হাতের ভিতরে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে খাবার ঘরে চলল।

পার্লের ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে একটা কী ছিল যার গুণে বর্থার সেই অকেজো আনন্দের আগুনটা আবার দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল ; কে যেন তাতে পাখার বাতাস দিলে।

মিস্ ফুল্ট্ন্ তার দিকে দেখছিলেন না। কিন্তু মানুষের দিকে সোজা দৃষ্টিতে না-চাওয়াই তাঁর অভ্যাস। সেই ভারি পাতায় ঢাকা চোখ, সেই ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসির ইশারা দেখলে মনে হ'ত তিনি সারাজীবন কেবল কানই পেতে আছেন, চোখের ব্যবহার করেননি। কিন্তু পার্ল্ ফুল্টন্‌কে ছাইরঙের সান্‌কিতে চমৎকার লাল সুপটা নাড়তে দেখে বর্থা হঠাৎ বুঝলে যে তার আর পার্লের অনুভূতি হুবহু একরকমের—যেন এদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধ'রে খুব অন্তরঙ্গধরনের একটা সূক্ষ্মদৃষ্টির বিনিময় হ'য়ে গেছে, একজন যেন আরেকজনকে বলেছে : 'তোমার দশাও দেখছি আমারই মতো?'

কিন্তু অন্যেরা? ওইযে আনন আর বদন, এডি আর হ্যারি চাম্‌চে তুলছে আর নামাচ্ছে,—ন্যাপ্‌কিন দিয়ে মুখ পুঁছছে, রুটি পিষছে, কাঁটা গেলাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ওরা?

'তার সঙ্গে আমার এল্‌ফা থিয়েটারে দেখা। কী কিম্ভূতকিমাকার মানুষ। চুল তো ছোটো ক'রে ছাঁটাই, এমন-কি বোধ হ'ল তার হাত-পা, গলা, নাক সব থেকেই অল্প বিস্তর বাদ দেওয়া হয়েছে।'

'তার সঙ্গে মাইকেল ওটের সম্বন্ধটা খুব নিবিড়, নয়?'

'ওই-লোকটিই না *দাঁতবাঁধানো প্রেম* লিখেছে?'

সে আমার জন্যে একটা নাটক লিখতে চায়। এক অঙ্ক। একটি পাত্র। নায়ক আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেছে। এ-কাজ উচিত কি-না তার বিষয়ে দু-তরফের সমস্ত যুক্তি উজাড় ক'রে ফেলে, তারপর, হয়তো কাজটা করবে, নয়তো করবে না, এ-কথা যেই তার মনের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল, অমনি যবনিকা পতন। কল্পনাটা মন্দ নয়।'

'নাম কী হবে, "উদরাময়"?'

'মনে হচ্ছে ঠিক এইরকমের একটা কী, একখানি ছোটো ফরাসি পত্রিকায় পড়েছি, কাগজখানা ইংলন্ডে একেবারেই অখ্যাত।'

না, ওরা কেউ বর্থার মনোভাবের অংশীদার না। কিন্তু ওদের পছন্দ না-ক'রে উপায়

নেই। এইরকমের উপাদেয় পানাহারে ওদের ডাকতে বর্থার খুবই ভালো লাগে। তার ইচ্ছা হ'ল সে ওদের জানিয়ে দেয় ওরা কীরকম আমুদে লোক। টেবিলের চারপাশে ওদের দলটাকে কীরকম মানিয়েছে। ওরা একজোটে এসেছে ব'লেই প্রত্যেকের যেন বেশি খোল্তাই হয়েছে। ওদের দেখে, চেকভের লেখা একটা নাটিকা বর্থার মনে এল।

হ্যারি খাওয়াটা উপভোগ করছিল। খাবারের সম্বন্ধে বড়াই করা হ্যারির স্বভাব, না ঠিক স্বভাব নয়, ঢঙ তো নয়ই, তবে ওই-ধরনের একটা কিছু 'চিঙড়ি মাছের সাদা শাঁস', মিশরি নর্তকীর চোখের পাতার মতো সহজ ও শীতল, পেস্তার কুল্‌পি ইত্যাদির প্রতি প্রবল পক্ষপাতের কথা ব'লে হ্যারি গর্ব অনুভব করত।

হঠাৎ বর্থার দিকে চেয়ে হ্যারি যখন বললে : 'এই সুফ্‌লেটার প্রশংসা না-ক'রে থাকা যায় না।' তখন বর্থার ইচ্ছে হ'ল শিশুসুলভ খুশিতে সে কেঁদে ওঠে।

কিন্তু আজ রাত্রে এই আকস্মিক বিশ্বপ্রেমের মানে কী? সবই ভালো, সবই ঠিক। প্রত্যেক ঘটনাই যেন তার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-পেয়ালাকে আরো ভর্তি ক'রে তুলছে।

মনের আড়ালে এখনো সেই ন্যাসপাতি গাছটাকে সে দেখতে পাচ্ছিল। এতক্ষণে এডি বেচারার চাঁদের আলোয় সেটা নিশ্চয়ই রূপালি হ'য়ে উঠেছে। মিস্ ফুল্‌টনের মতো রূপালি। তিনি তখন তাঁর সুগঠিত হাতে একটা কমলালেবু নিয়ে খেলা করছিলেন। আঙুলগুলো কী ধব্‌ধবে যেন তার থেকে আলো ফেটে বেরুচ্ছে।

একটা জিনিস বর্থা মোটে বুঝতে পারছিল না। এটা তার কাছে অলৌকিক ব'লে লাগছিল, মিস্ ফুল্‌টনের মনোভাবটা সে কী ক'রে এত শিগ্‌গির অত ঠিকভাবে আন্দাজ ক'রে নিলে? তার আন্দাজে ভুল আছে, এমন সন্দেহ মুহূর্তের জন্যেও তার মনে উদয় হ'ল না, অথচ বিশ্বাসের ভিত্তি কী? একেবারেই কিছু না।

'আমার বিশ্বাস, মেয়েদের মধ্যে এমন ঘটনা খুব ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঘ'টে থাকে। কিন্তু পুরুষদের ভিতরে কখনো ঘটে না। হয়তো বৈঠকখানায় কফি বানানোর সময় পার্‌লের কাছ থেকে একটা কিছু ইঙ্গিত পাব।

তার কথার মানে কী, তা সে নিজেই বুঝলে না ; তার কল্পনায় এল না, এরপরে কী ঘটবে।

এইসব চিন্তা যখন তার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন তার হাসিঠাট্টার বিরাম ছিল না। হাসির দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিই তাকে কথা কওয়াতে লাগল। সে মনে-মনে বলল — 'না-হাসলে ম'রে যাব।'

কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলে যে আনন বুকের ফাঁকে কী একটা গুঁজে রাখছে, ঠিক যেন এক থোলো বাদাম, তখন তাকে সজোরে হাত মুঠো ক'রে অত্যধিক হাসি চাপতে হ'ল।

অবশেষে খাওয়া শেষ ক'রে বর্থা বললে : 'চলো আমার নতুন কফির কল দেখবে।'

হ্যারি বললে : 'মাত্র পনেরো দিন অন্তর আমরা একটা ক'রে নতুন কল আমদানি করি।' এবাবে বর্থার পাশে চলল আনন ; ঘাড় হেলিয়ে মিস্ ফুল্‌টন্ তাদের অনুসরণ করলেন।

বৈঠকখানার আগুন তখন নিবু-নিবু হ'য়ে এসেছে। তার দিকে চেয়ে আনন বললে : 'ঠিক যেন ফিনিক্স-বাচ্চাদের বাসা।'

'থাক্, আলোটা আর একটুক্ষণ নিবুনো থাক্', এই কথা ব'লে আনন আবার হুম্‌ড়ি খেয়ে আগুনের সামনে পড়ল। তার শীত কখনো নিবারণ হ'ত না। বর্‌থা ভাবলে : লাল ফ্লানেলের ছোটো জামাটা নেই কি-না, তাই।

ঠিক এইসময়ে মিস্ ফুল্‌টনের কাছ থেকে সেই প্রত্যাশিত ইঙ্গিতটা পাওয়া গেল।

তাঁর ঠাণ্ডা ঘুমন্ত স্বর জিজ্ঞাসা করলে : 'তোমাদের বাগান কোথা?'

কথাগুলো বর্‌থার এতই মধুর লাগল যে, আজ্ঞা পালন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ঘর পেরিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে সে উঁচু-উঁচু জানলাগুলো খুলে দিলে।

নিচু গলায় বললে : 'ওই যে।'

দু-জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফুলে-ঢাকা সরু গাছটার দিকে তাকালে। কোথাও হাওয়ার লেশমাত্র ছিল না, তবু মনে হ'ল গাছটা যেন দীপশিখার মতো লম্বা ছুঁচলো হ'য়ে উঠছে, মনে হ'ল জ্যোৎস্নায় যেন কাঁপছে; তাদের নিবিষ্ট চোখ যেন দেখলে সেটা উচুঁ হ'তে-হ'তে শেষে প্রায় ঠেকেছে গিয়ে চাঁদের রূপালি চাকার কিনারায়।

কতক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইল? দু-জনেরই মনে হ'ল তারা যেন অমর্ত্য আলোর পরিমণ্ডলে বন্দী। তাদের অনুকম্পনের মধ্যে কোথাও যেন খিঁচ নেই, তারা যেন অন্য কোনো লোকের জীব। তারা কেউই বুঝতে পারল না তাদের অন্তরে যে-আনন্দবহ্নি উন্মুখ হ'য়ে জ্বলছে, তাদের চুল থেকে, তাদের হাত থেকে যে-স্ফুলিঙ্গ ফুলঝুরির মতো পড়ছে ঝ'রে, তাকে নিয়ে তারা করবে কী?

কতক্ষণ, অনন্তকাল না একনিমেষ? মিস্ ফুল্‌টন্ কি সত্যই বললেন : হ্যাঁ ওটাই ঠিক? না কি এটা বর্‌থার স্বপ্নমাত্র?

তারপর আলোটা ঝট ক'রে জ্ব'লে উঠল। আনন লেগে গেল কফি বানানোর কাজে এবং হ্যারি বললে : 'মিসেস্ নাইট আমায় কিন্তু খুকির কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার সঙ্গে তার কখনো দেখা হয় না। যতদিন পর্যন্ত তার একটি প্রেমিক না-জুটছে, ততদিন তার সম্বন্ধে আমার এতটুকু ঔৎসুক্য নেই। বদন ফুলঘরের কাচের জানালা থেকে চোখ ছাড়িয়ে নিয়ে আবার তাকে কাচের আড়াল করলে এবং এডি ওয়ারেন এক চুমুক কফি খেয়ে এমন উদ্বেগ-সূচক মুখভঙ্গি ক'রে বাতিটা নামিয়ে রাখলে যেন সে একটা জীবন্ত মাকড়সা গিলে ফেলেছে।

'আমি চাই তরুণদের জন্যে একটা আসর জোগাড় করতে। আমার বিশ্বাস লন্ডন শহরটা অলিখিত নাটকে গিজগিজ করছে। আমি তাদের বলতে চাই : 'এই নাও থিয়েটার। এবার চালাও পুরোদমে।'

'শুনেছ, ভাই, জেকব নাথানের একটা ঘর সাজানোর ভার আমার ওপর পড়েছে। লোভ হচ্ছে ভাজা মাছ আর আলুর ছবিতে একটা নক্‌শা তৈরি করি; চেয়ারের পিঠগুলো হবে খোলার আকারের আর পর্দার উপরে ছুঁচের কাজে আঁকা থাকবে সুন্দর-সুন্দর আলুভাজা।'

'আমাদের তরুণদের বিপদ হচ্ছে যে তারা এখনো বেজায় রোমান্টিক। সমুদ্রে গেলে

বমনরোগ অনিবার্য, ফলে ছিলিম্‌চে জাতীয় কিছুও অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই ছিলিম্‌চের নাম নেওয়া তাদের সাহসে কুলায় না কেন?'

'সে ভয়ঙ্কর কবিতায় একটা নাক-খসা ভিখিরি এক ছোট্টো বনের মধ্যে একজন মেয়ের উপরে বলাৎকার করে...।'

মিস্ ফুল্‌টন্ সবচেয়ে গভীর আর নিচু চেয়ারটায় ডুব দিলেন এবং হ্যারি হ'ল সিগারেট বিতরণে ব্যস্ত।

মিস্ ফুল্‌টনের সামনে দাঁড়িয়ে রুপোর বাক্সটাকে ঝাঁকানি দিতে-দিতে সে রূঢ় স্বরে বলতে লাগল : 'ইজিপ্‌সিয়ান? টর্‌কিনা? ভর্‌জিনিয়ান? সব মিশে খিচুড়ি হ'য়ে গেছে।' হ্যারির কথার ভাবে বর্‌থা উপলব্ধি করলে যে পার্‌লের সংসর্গে সে উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছে। পার্‌লেকে তার মোটেই পছন্দ নয়। মিস্ ফুল্‌টন্ বললেন : 'না, থাক্। এখন সিগারেট খাব না।' এর ভিতবেও এমন কিছু ছিল যাতে বর্‌থার বুঝতে বাকি রইল না যে তিনিও এই অশিষ্টতা অনুভব করেছেন, এবং এতে তিনি ব্যথিত।

'আহা, হ্যারি, ওকে অপছন্দ ক'রো না। ও-মানুষটিকে তুমি একেবারেই ভুল বুঝেছ। ও সত্যিই আশ্চর্য, অত্যন্ত আশ্চর্য। আর তাছাড়া যার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা এত উঁচু, তাকে তুমি অমন আড়বুঝভাবে দেখ্‌ই-বা কী ক'রে! রাত্তিরে বিছানায় বলব আজ কী ঘটেছে। ওতে-আমাতে আজ কী ঐশ্বর্য ভাগ ক'রে নিয়েছি।

শেষ কথাগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে একটা অপূর্ব, ভয়াবহরকমের চিন্তা বর্‌থার মনে ছুটে এসে হাজির হ'ল ; এই অস্পষ্ট চিন্তা মুচ্‌কি হেসে তার কানে-কানে বললে : এরা সকলে এখুনি চ'লে যাবে। বাড়িটা হবে নিশুতি, একেবারে নিশুতি, আলো নিববে, আর সেই অন্ধকার ঘরে, সেই গরম বিছানায় শুধু থাকবে তুমি আর হ্যারি—।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সে পিয়ানোর দিকে ছুটল।

'কেউ না-বাজালে কিন্তু বড়ো আফশোস থেকে যাবে!'

বর্‌থা ইয়াং জীবনে এই প্রথম তার স্বামীকে কামনা করলে।

সে তার স্বামীকে ভালোবাসত তাতে সন্দেহ নেই, খুবই ভালোবাসত, সবরকমে ভালোবাসত, কেবল ওইদিক দিয়ে ছাড়া এবং সঙ্গে-সঙ্গে সে এটাও জানত যে তার স্বামীর প্রকৃতি একেবারে আলাদা। বিষয়টার তারা অনেকবার আলোচনা করেছিল। প্রথম-প্রথম নিজের উদাসীনতায় সে বিষম চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে মনে হয়েছিল, তাতে কিছু আসছে-যাচ্ছে না। ওদের মধ্যে কপটতা ছিল না। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তারা নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা কইত। আধুনিক হওয়ার সুবিধা তো ওইখানে।

কিন্তু এখন--বাসনার কী উত্তাপ! কী প্রচণ্ড উত্তাপ! কথাটা যেন তার জ্বলন্ত শরীরের মধ্যে ব্যথার মতো ফিরতে লাগল। সেই আনন্দের অনুভূতিটার পরিণতি কি এইখানে। কিন্তু তারপর — তারপর —।

নাইট-পত্নী বললেন : 'ভাই, আমাদের লজ্জার কথা তো জানই। আমরা সময় আর ট্রেনের দাস, থাকি হ্যাম্পস্টেডে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যেটা ভারি আমোদে কেটেছে।'

বর্‌থা বললে : 'দাঁড়াও আমি তোমাদের সঙ্গে সদরে আসছি। তোমরা এসেছ ব'লে আমি যে কী খুশি তা বলতে পারি না। কিন্তু শেষ ট্রেনটাকে যেতে দেওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। তার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই।'

হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল : 'নাইট, যাবার আগে একপাত্র হুইস্কি খেয়ে গেলে হ'ত না?'

'না, বন্ধু, ধন্যবাদ।'

এই জবাব দেওয়ার জন্যে করমর্দনের সময় বর্‌থা নাইটের হাত নিবিড় কৃতজ্ঞতায় টিপে দিলে।

দেউড়ির সিঁড়ির উপর থেকে চেঁচিয়ে বললে : 'আজ তবে এই অবধি, আচ্ছা এসো।'

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হ'ল যে-ব্যক্তি নরমান-দম্পতিকে বিদায় দিলে, সে নিজেও চিরকালের মতো বিদায় হ'ল।

সে যখন বৈঠকখানায় ফিরে এল তখন অন্যেরাও উঠি-উঠি করছে।

'... তাহ'লে আপনি তো আমার ট্যাক্সিতে কতকটা পথ আসতে পারেন।'

'আজকের ভীষণ বিপদের পরে আবার এক্‌লা গাড়ি চড়তে না-হ'লে আমি সত্যিই খুব খুশি হব।'

'রাস্তার শেষে ট্যাক্সি দাঁড়ানোর একটা জায়গা আছে। সেখানে ট্যাক্সি চাওয়া খুবই সহজ হবে। এর জন্যে কয়েক গজের বেশি হাঁটতে হবে না।'

'শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। যাই কোটটা পরিগে।'

মিস্ ফুল্‌টন্ সদরের দিকে চললেন। বর্‌থাও তাঁর অনুগমন করছিল, কিন্তু হ্যারি প্রায় তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল।

'দিন, আমি পরিয়ে দিই।'

বর্‌থা বুঝলে সে তার অশিষ্টতার জন্যে অনুতপ্ত, তাই তার যাওয়ায় বাধা দিলে না। এক-এক বিষয়ে হ্যারি ভারি ছেলেমানুষ, এত খেয়ালি, এমন সাদাসিধে।

তখন আগুনের কাছে রইল শুধু এডি আর বর্‌থা।

এডি আস্তে-আস্তে বললে : 'মনে-মনে বিচার করছিলুম। আপনি বিলক্‌সের 'থোড়বড়িখাড়া' নামের নতুন কবিতাটা দেখেছেন কি-না? সত্যি ভারি অদ্ভুত কবিতা। ওই শেষ চয়নিকাখানায় প্রকাশ হয়েছে। আপনার বইখানা আছে নাকি? কবিতাটা আপনাকে দেখাতে চাই। একটা অসম্ভবরকমের সুন্দর লাইন দিয়ে কবিতার শুরু : 'প্রতিদিন এই থোড়বড়ি ছাড়া অন্য কিছু কি নেই?'

'হাঁ' ব'লে বর্‌থা নিঃশব্দে বৈঠকখানার বাইরের টেবিলটার দিকে গেল। এডিও তার অনুসরণ করলে নিঃশব্দে। সে ছোটো বইখানা তুলে বর্‌থা তার হাতে দিলে ; এ-ব্যাপারে একটুও আওয়াজ হ'ল না।

এডি যতক্ষণ কবিতাটাকে খুঁজতে লাগল বর্‌থা ততক্ষণে একবার ঘাড় ফিরিয়ে সদরের দিকে দেখে নিলে। এবং সে দেখলে : হ্যারি মিস্ ফুল্‌টনের কোট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আর মিস্ ফুল্‌টন্ তার দিকে পেছন ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কোটটাকে ছুঁড়ে

ফেলে দিলে এবং তাঁর কাঁধ ধ'রে সজোরে তাঁকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলে। তার ঠোঁট বললে : আমি তোমার পূজা করি। আর মিস্ ফুল্‌টন্ তাঁর চন্দ্রকণার মতো আঙুলগুলি হ্যারির গালে ছুঁইয়ে সেই ঘুমন্ত হাসিটা হাসলেন। হ্যারির নাকের ডগা কেঁপে উঠল। একটা বিকট হাসিতে তার মুখ গেল বেঁকে, সে ফিসফিস ক'রে বললে : 'তবে কাল।' চোখের পাতার ইশারায় মিস্ ফুল্‌টন্ জানালেন : আচ্ছা।

এডি বললে : 'এই পেয়েছি। প্রতিদিন এই থোড়বড়ি ছাড়া অন্য কিছু কি নেই? আপনার মনে হয় না কথাগুলো খুব গূঢ়রকমের সত্য। থোড়বড়ির নিত্যতা বড়ো ভয়ানক।'

সদর থেকে হ্যারির আওয়াজ এল—অত্যন্ত চড়া : 'যদি চান তো টেলিফোন ক'রে একটা গাড়ি আনিয়ে দিই।'

'না থাক্, কোনো দরকার নেই' ব'লে মিস্ ফুল্‌টন্ বর্‌থার কাছে এসে তাঁর সরু আঙুলগুলো বর্‌থার মুঠিতে পুরে দিলেন।

'আজ তাহ'লে আসি, অনেক ধন্যবাদ।'

বর্‌থা বললে : 'তবে এসো।'

মিস্ ফুল্‌টন্ তার হাতখানাকে আরো কিছুক্ষণ ধ'রে রাখলেন।

চুপিচুপি বললেন : 'তোমার অপরূপ ন্যাসপাতি গাছটি।'

তারপর তিনি চ'লে গেলেন এবং সাদা বিড়ালের অনুচর কালো বিড়ালের মতো এডি তাঁর পিছে-পিছে ছুটল।

অত্যন্ত বাড়াবাড়িরকমের স্থির-ধীরভাবে হ্যারি বললে : 'তবে এইবার দোকান বন্ধ করা যাক্।'

'তোমার অপরূপ ন্যাসপাতি গাছ, ন্যাসপাতি গাছ, ন্যাসপাতি গাছ।'

বর্‌থা পাগলের মতো খোলা জানালার দিকে ছুটল।

কিন্তু ন্যাসপাতি গাছের সৌন্দর্য একটুও ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তার পুষ্পিত পূর্ণতায় কোনো অভাব ঘটল না। একটি কম্পন দেখা গেল না তার অবিচলতায়।

[নামহীন অনুবাদ গল্প ৫]

বড়োদিনের কুয়াশাচ্ছন্ন আর্দ্র রাত্রি। শহর ছেড়ে নদীর দিকে যতই এগুনো যায়, ধোঁয়া ততই ঘনিয়ে ওঠে, ঠাণ্ডাও বাড়ে সেই পরিমাণে। নিউ ইয়র্কের আমেরিকান আটলান্টিক লাইনের ডকে ম্যামথ নামক জাহাজখানা ছাড়বার জোগাড় করছে, সর্বত্রই বাঁধাবাঁধির ধুম। ওই-কোম্পানির নবতম এবং সুন্দরতম পোতাবলির মধ্যে ত্রিশ হাজার টনের এই অর্ণবযানটিই শ্রেষ্ঠ। সারা বছর তার কাজ হচ্ছে নিউইয়র্ক থেকে য়ুরোপে পাড়ি দেওয়া, শুধু শীতকালে খেয়াপথ থেকে সরিয়ে তাকে নিযুক্ত করা হয় ধনকুবেরদের সেবায়, তখন সে যাত্রা করে গ্রীষ্মমণ্ডলের সন্ধানে। ৬১ নম্বর জেটির দরজায় একখানা হল্‌দে রঙের বিজ্ঞাপনপত্র ঝোলানো, সংহত হিমের তলায় তার আকর্ষণ সূর্যের মতো তৃপ্তিপ্রদ। তাতে একটি জুলুর ছবি ; সে উঠপাখির পালকের শিরোপা প'রে শুষ্কচর্মের ঢাল আস্ফালন ক'রে নাচছে। তার তলায় লেখা :

আফ্রিকা পরিক্রমা

৯৭ দিনে ২৮০০০ হাজার মাইল!

> সমগ্র আফ্রিকা : কৃষ্ণকান্ত আফ্রিকা! অতিকায় বানরের জন্মস্থান—যুদ্ধবিগ্রহের বিহারভূমি—শ্যামাঙ্গিনীর সঙ্কেতস্থল—জামবাজি-প্রপাতের বজ্রগর্জন কুহেলি, মোমবাজিকের আরব বণিকের পর্ণকুটীর—অন্তরীপের ফুলফসলের চিরন্তনী প্রদর্শনী—কিমবারনির হীরকখনি—জোহান্‌স্‌বার্গ পর্বতের চূর্ণ স্ফটিক—প্রিটোরিয়ায় ক্রুগার ও তাহার বিরাট আলবোলা—বুলাওয়ায়োতে সিসিল রোডসের প্রস্তরমূর্তি--জানজিবারের সুরভিসার লবঙ্গবন—মোমবাসার প্রবালদ্বীপ—কেনিয়ার গণ্ডারসমূহ—নাইরোবির অবগুণ্ঠিতা রূপসী—ভিক্টোরিয়া নায়াঞ্জার বিমানযান—চন্দ্রগিরি-উগান্ডার জলহস্তী—নীলনদ! পথিক, আসুন. আমেরিকা আটলান্টিক লাইনের জাদু-গালিচাতে আরোহণ করুন। সুরুচি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রগতির পরাকাষ্ঠা এই ম্যামথ কেবলমাত্র অর্ণবপোত নহে, বাস্তবিকপক্ষে ইহা একটি অভিজাত গোষ্ঠীচক্র। সভ্যসংখ্যা মাত্র দুই শত, প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ, সদস্যবৃন্দ সযত্ননির্বাচিত। আসুন এই বরিষ্ঠ সভায় যোগ দিন!!

ম্যামথের প্রথম সিংহনাদ শোনা গেল। অন্ধকার জলকণা জাহাজের আলোকে

স্ফুলিঙ্গের রূপ ধরলে। দীপান্বিত বাতায়নগুলোর ভিতর দিয়ে কামরাগুলো দেখা যেতে লাগল, প্রত্যেকটিই মহামূল্য কাষ্ঠে নির্মিত, আসবাবপত্রে রেশম কিংখাপের ছড়াছড়ি। কলকব্জার চাপে একসঙ্গে চার-চারটে চিম্‌নি দিয়ে জাহাজের ধূমজিহ্বা নির্গত হ'ল। ফলে নিচের দিকে আলোর ধাক্কা কুয়াশাকে হটিয়ে দিলে বটে কিন্তু উপরে ধোঁয়ার প্রাবরণী রাত্রিকে আরো তমোময়ী ক'রে তুললে। আবার সেই গর্জন, কিন্তু এবারে এতই কর্কশ যে তার ভিতরে কপিকল চলার আওয়াজ-সুদ্ধ শোনা গেল না।

ছ-মিনিটের মধ্যে নোঙর তোলা হবে। একজন পরিচারক উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে এসে জাহাজের ভাণ্ডারীকে সাবধান ক'রে দিলে : এ-ডেকে দু-নম্বর কামরায় এখনো কেউ আসেনি।

ভাণ্ডারী তার মানচিত্রে দেখলে যে উপরের তলায় মাত্র দু-সারি ঘর, দুটোই খুব জাঁকজমকে ভরা। একটা সারি বস্টনের সিনেটর এপলজ্যাক ও তাঁর পরিবারবর্গ এরই মধ্যে দখল ক'রে বসেছিলেন ; অন্যদিকে বসবার ঘর, নিজস্ব খাবার ঘর, দুটো স্নানের ও দুটো শোবার ঘর ছিল। সেগুলো সব নিউ ইয়র্কের মিসেস্ লুইসে তাঁর নিজের ও সঙ্গিনীর নামে নিয়ে রেখেছিলেন।

জাহাজের বাঁশি তৃতীয়বার বাজার সঙ্গে-সঙ্গে দু-জন রমণী এসে উপস্থিত হলেন। বিদায়ের সময় আগত, এই কথা যাত্রীদের বন্ধু-বান্ধবকে জানিয়ে দেবার জন্যে ইতিমধ্যেই জাহাজের চারদিকে ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছিল। *নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্* কাগজের সংবাদদাত্রী, শশব্যস্ত হ'য়ে আগন্তুকদুটির দিকে এগিয়ে এলেন। এই অতিকায় জলযানগুলোর সম্বন্ধে চুট্‌কি খবর সংগ্রহ করার ভার ছিল তাঁরই উপরে।

পেশাগত প্রগল্‌ভতা স্মিতহাস্যের সাহায্যে সহনীয় ক'রে নিয়ে তিনি প্রথমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এই দারুণ শীতে আফ্রিকা যেতে পারা সৌভাগ্যের কথা, কী বলেন মিসেস লুইসে?'

'মাদাম লুইসে আমার ফরাসি দাসীর নাম। ঘরগুলো ওরই মারফতে নেওয়া হয়েছে।'

যিনি জবাব দিলেন তিনি তরুণী ; সর্বশরীর মহামূল্য পশুচর্মের কোটে অবরুদ্ধ, সে-পরিচ্ছদটির চাকচিক্য, ঘন বর্ণ, কাটছাঁট দেখলে নারীমাত্রেই হিংসায় অভিভূত হ'য়ে পড়বে। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, ওষ্ঠাধর অতি রক্তিম, নাসিকা পর্যন্ত টানা ওড়নার তলায় উজ্জ্বল চোখদুটির মধ্যে একটা পরদেশী আলো।

সংবাদদাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন : 'বলতে পারি কি আপনি নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা?'

ঠিক যেই উত্তরটা তাঁর কানে পৌঁছবে অমনি জাহাজের সাঁকো ন'ড়ে উঠল ; মুহূর্ত-মধ্যেই পাটাতনখানা আকাশমুখী হবে, তখন প্রশ্নকারিনী পড়লেন উভয়সঙ্কটে — একদিকে কর্তব্য এবং অন্যদিকে নিগ্রোদেশে, অন্ততপক্ষে স্টাটেন দ্বীপের পাইলটবোট পর্যন্ত রপ্তানি হ'য়ে যাওয়ার বিরক্তিকর সম্ভাবনা। ফলে পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে-সঙ্গে কপিকলের ঘূর্ণির প্রথম ধাক্কায় জাহাজখানা কেঁপে উঠলে এবং অনতিবিলম্বে পচা ডিমের গন্ধ বিস্তার করতে-করতে নোঙরটা জল থেকে তুললে মাথা।

২

দু-দিন বাদে হাটরাস অন্তরীপ পার হ'তে-না-হ'তে আকাশ-বাতাসে উত্তাপের আমেজ পাওয়া গেল। নাচের পরে লোরেন এপল্‌জাক ডেকে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। সমস্ত আরামকেদারাগুলো ভাঁজ করা, ফলে সেই একশো গজ লম্বা, দশ গজ চওড়া কাষ্ঠ-সৈকত চমৎকার মল্লভূমিতে পরিণত। রাত্রি প্রায় দুটো হবে, কামরায়-কামরায় মেয়েরা শোবার আগে বসনভূষণ ছেড়ে আরশিতে নিজেদের নগ্ন চেহারা দেখতে ব্যস্ত এবং বাইরে লোরেন এপল্‌জাকের মুগ্ধদৃষ্টি সেই ছায়াঙ্কিত ঘষা-কাচের জানলার উপরে আবদ্ধ। হঠাৎ সব বাতি নিবে গেল, চারদিকে কেবল উত্থানপতনশীল সমুদ্রের বেড়া আর নিঃসঙ্গ নীরবতা। যন্ত্রের আসুরিক নাসিকা গর্জনের মধ্যে কয়েকটা অপ্রতিষ্ঠ প্রসাধনসামগ্রী নিদ্রিত জাহাজের এখানে-ওখানে সশব্দে স্থানচ্যুত হ'য়ে পড়ল।

হারভার্ডে শেষ বছরটা কাটিয়ে লোরেন এপল্‌জ্যাক্ আফ্রিকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল মা-বোনের সঙ্গে। পাঠ্যাবস্থায় লোরেন ছিল কলেজের লাক্রস্ খেলার দলের সর্দার এবং ছাত্রদের ব্যঙ্গপত্রিকার কর্তা, কাজেই সকল ক্রীড়াকুশলী লোকের মতো সে-ও সুদর্শন ; ও-ধরনের অঙ্গসৌষ্ঠব সচিত্র সাপ্তাহিকগুলোর মলাটে-মলাটে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তার বংশ ম্যাসাচুসেট্‌সের শিক্ষিত, শুচিগ্রস্ত ও অবস্থাপন্ন পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম। তার নবোন্মেষিত জীবন সামাজিক উৎসব-ব্যসনের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ।

ঢেউয়ের আওয়াজে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না, তবু তার মনে হ'ল, কে যেন তাকে অনুসরণ করছে ; ঘুরে দাঁড়াতেই একটি মেয়ে তার নজরে পড়ল ; রমণীটিকে সে এ-পর্যন্ত লক্ষ করেনি, তার পরনে মহামূল্য পশুচর্ম, গায়ের বর্ণ অনুজ্জ্বল. চুল প্রায় নীল রঙের। নিশ্চয়ই কোনো বিদেশিনী হবে ; সিনেমার ছবিতে ঐধরনের মেয়েরাই শীতের নৈশ দুর্যোগে বিনা-নিমন্ত্রণে অপরিচিত যুবার ঘরে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করে। তারা পরস্পরের প্রতি চাইলে ; মেয়েটিকে লোরেনের পছন্দ হ'ল।

পরের দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় জাহাজ যখন বেরমুডা দ্বীপপুঞ্জের সীমান্তে, তখন ভোজনশালার ইতালীয় অধ্যক্ষ একমুখ হেসে যেন একটা অতি উপাদেয় কিছু পরিবেষণ করছে এমন ভাব দেখিয়ে লোরেনকে জানালে যে সে যদি বিকেল পাঁচটার সময় পিছনের ডেকে উপস্থিত হয় তাহ'লে একটা সামুদ্রিক সমাধিকার্যে সহায়তা করতে পারবে, 'সি' ডেকের একজন পরিচারক পূর্বরাত্রে প্লুরিসি রোগে মারা গেছে।

পাঁচটার সময় লোরেন একটা উঁচু মঞ্চে চড়ল, সেখানে জাহাজের সমস্ত পিছন দিকটা নজরে পড়ে। তার সামনে জাহাজের সমস্ত লোক-লশকর সেনাবাহিনীর মতো কাতার দিয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। ডাইনে সাদা কাপড় প'রে পরিচারকের দল ; বাঁয়ে ধোঁয়ায় কালো, তেল-চর্বিতে চিত্রিত খালাসি ও মিস্ত্রির সারি ; উল্টোদিকে ধাই, পরিচারিকা আর ফরাসি পাচকের মেলা, শেষোক্তদের প্রত্যেকের চিবুকে ছাগল-দাড়ি, গলায় ঝাড়ন জড়ানো। সবশেষে একখানা খোলা নিশানের তলায় শবদেহটি কাষ্ঠফলকের উপরে শায়িত! অদূরে নায়ক-পরিবৃত পুরোহিত প্রার্থনার পরিচ্ছদে ধ্যান-নিরত।

[অসম্পূর্ণ]

[নামহীন অনুবাদ গল্প ৬]

উরুকের অধিপতি মেরোদাক যখন আসরে বসতেন, তখন তাঁর পাদপীঠ হ'ত বিজিত শত্রুরা ; কারণ তাঁর পরাক্রম ও অনুকম্পার জীবন্ত সাক্ষীস্বরূপ একশত রাজাকে হস্ত-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বঞ্চিত ক'রে, তাদের অন্তত টেবিলের নিচে নিয়ে রাখা তিনি অভ্যাস করেছিলেন। মেরোদাকের টেবিল থেকে যে-ভুক্তাবশিষ্ট মাটিতে পড়ত, তাই দু-আঙুলে সযত্নে কুড়িয়ে রাজারা তাদের পেট ভারাত ; এবং মেরোদাক যখন সেই প্রক্রিয়ার দারুণ দুরূহতা দেখতে পেতেন, তখন তিনি মানুষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেওয়ার জন্যে দয়াময়কে জানাতেন ধন্যবাদ।

তিনি বলতেন, 'বুড়ো আঙুলের অভাব ঘটলেই আমরা তার ব্যবহার জানতে পারি। যা নেই, তার উপকারিতা বুঝতে আমাদের কখনো অন্যথা হয় না। যদি কারো চোখ উপড়ে তাকে অন্ধ ক'রে দেওয়া যায়, তবেই সে শেখে যে চোখের কাজ দেখা।'

মেরোদাক এ-রকম কথা কইতেন, কারণ তাঁর বৈজ্ঞানিক মনে ভগবানের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে কৌতূহলের অবধি ছিল না, এবং তাঁর বক্তৃতা শেষ হ'লে অমাত্যদের মুখে আর সাধুবাদ ধরত না।

তারা সমস্বরে বলত, 'মহারাজের অমিত প্রতাপ, তাঁর অপার জ্ঞান পরমাশ্চর্য।' এবং উরুকাধিপের কানে সেই প্রশংসা এত মধুর লাগত যে তিনি তার অঙ্কস্ত্রাণ ঘন-ঘন সঞ্চালিত ক'রে, পদানত শত্রুদের মধ্যে ভূরি-ভূরি ভুক্তাবশিষ্ট বিলোতেন। কিন্তু একদিন টেবিলের নিচে থেকে হঠাৎ এক বিদ্রূপকর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'মহারাজের অমিত প্রতাপ, তাঁর অপার জ্ঞান পরমাশ্চর্য ; কিন্তু সেই প্রভূত প্রতাপ আর অগাধ জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জন্যে নতুন আঙুল তৈরি ক'রে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই।'

এই পরিহাসে ক্রুদ্ধ হ'য়ে মেরোদাক সভাসদদের আদেশ দিলেন বক্তাকে টেবিলের নিচে থেকে ধ'রে আনতে ; এবং তারা যে-লোকটিকে বের করলে, তার নাম শাল্মানেজার, সে একদিন ক্যাল্ডীয় ভূপালদের অন্যতম ছিল। প্রথমে মেরোদাকের মন শাল্মানেজারের প্রাণ নিতে চাইলে ; কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে বন্দী মৃত্যুই কামনা করে, তখন তাঁর হৃদয় ভিজল, এবং অমাত্যদের দিয়ে তিনি তাকে আবার টেবিলের নিচে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে পাঠালেন।

তিনি বললেন, 'প্রতাপ আর প্রজ্ঞায় আমি সত্যিই মহৎ। তাই আমার সামনে শত্রুরা সত্য বলার সৎসাহস হারায় না।'

আহারান্তে মেরোদাক যখন টেবিল থেকে উঠে প্রাসাদ-শিখরের পুষ্পোদ্যানে বুলবুলির গান শুনতে চ'লে গেলেন, তখন টেবিলের নিচের রাজারা শাল্মানেজারের দাড়ি উপড়ে তার সর্বাঙ্গে মুষ্টিবর্ষণ শুরু করলে ; কারণ তার বাগ্‌বিস্তারের পরে মেরোদাকের আমন্ত্রণ আর একবারও বিচলিত হয়নি এবং ফলে রাজারা সে-রাত্রে অর্ধভুক্তই রইল।

বাগানে বেরিয়ে মেরোদাক চারদিকে ঘুরে বেড়ালেন ; অলক্ষ্য নীড় থেকে অসংখ্য বুলবুলির ঐকতান তাঁর কানে ভেসে এল ; রাত্রির শীতল স্পর্শে ফুল ফুটে উঠে তাঁকে বহুবিধ সুরভিসার উপহার দিলে ; এবং মেরোদাক যেহেতু প্রাণভয়ে সদাসন্ত্রস্ত থাকতেন, তাই তাঁর পিছনে-পিছনে, পঞ্চাশ কদম দূরে, সঙ্গে চলল একদল সশস্ত্র শরীররক্ষী। মার্জিত ইষ্টকের উপর শিশির প'ড়ে চন্দ্রালোকে ভাস্বর হ'ল। এবং পুষ্প-পল্লবের হিমকণা কাঁপতে লাগল আণবিক নক্ষত্রপুঞ্জের মতো। মেরোদাক একটা প্রাচীরের উপরে ভর দিয়ে নদী-সংলগ্ন স্বরচিত নগরের পানে চাইলেন, তাঁর চোখে পড়ল ইউফ্রেটিসের বক্ষে দীপান্বিত ও সঙ্গীত-মুখরিত নৌবাহিনীর যাতায়াত ; এবং অন্ধকার-ভেদী মন্দিরগুলোর উন্নত চূড়ার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তিনি আত্মগরিমার শোকাহত চিন্তায় ডুবে গেলেন।

তিনি বললেন, 'দু-দিনেই আমি মরব, কিন্তু যে-নগর আমি গ'ড়ে গেলুম, পৃথিবী থেকে মানুষের বাস না-ওঠা পর্যন্ত তার সাক্ষ্য থাকবে অটুট।'

হঠাৎ ময়ূরপঙ্খীগুলো থেকে শ্রুতিমধুর সঙ্গীত তিমিরস্রোতে ভেসে এল, এবং মেরোদাক বিষণ্ণ অন্তরে ভাবতে লাগলেন যে অচিরে তাঁকেও মরতে হবে। তখন আর এই পুষ্পোদ্যানে সান্ধ্যভ্রমণে কেউ আসবে না, তিনি আর সেই নগরের কলকোলাহল শুনতে পাবেন না। ফোটা ফুলের গন্ধোচ্ছ্বাস তখন থাকবে অনাঘ্রাত।

তিনি বললেন, 'দু-দিনেই মনুষ্যজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে ; তখন আর আমার নাম কারো মনে রইবে না, কিন্তু সেদিনেও আমার বিজন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে আজকের তারাই করবে জ্যোতিঃ-বিতরণ।'

শব্দে-গন্ধে-ভারাতুর নৈশ সমীরণ শিহরিত পত্রপুষ্প থেকে শিশির ছড়িয়ে, তাঁর রেশ্‌মি পরিচ্ছদে ঢেউ খেলিয়ে, চ'লে গেল ; এবং মেরোদাক হঠাৎ জিজীবিষায় অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। তিনি মনে-মনে বললেন, 'দু-দিন পরে এই তারামালাও নিবে যাবে।'

হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে বামাকণ্ঠ শোনা গেল ; পুরনারীরা তাঁরই সেবার অপেক্ষায় বসেছিল। মেরোদাক দ্রুত পদে সেইদিকেই এগিয়ে চললেন, কারণ একা থাকতে তিনি চিরদিনই ভয় পেতেন।

[অসম্পূর্ণ]

দ্বৈপায়ন

এক মানুষ ছিল যে দ্বীপ ভালোবাসত। সে জন্মেছিল একটাতে, কিন্তু সেটা তার পোষাল না, কারণ সেখানে সে ছাড়াও আরো অনেকে থাকত। সে চেয়েছিল এমন একটা দ্বীপ যেটা কেবল তারই হবে : সে যে সেখানে একা থাকবে, এমন নয়, সেটা হবে তার নিজের জগৎ।

দ্বীপ যদি যথেষ্টরকমের বড়ো হয়, তবে তার সঙ্গে মহাদেশের আর তফাৎ কী? দ্বীপের মতো দ্বীপ নেহাৎ ছোট্টো হওয়া দরকার ; কত ছোটো হ'লে তবে তাকে নিজের স্বরূপে ভ'রে তোলা যায়, তা দেখা যাবে এই গল্প থেকে।

ঘটনাচক্রের এমনি সমাবেশ হ'ল যে পঁয়ত্রিশ পার হবার আগেই একটা আসল দ্বীপ এই দ্বীপ-বিলাসী ব্যক্তিটির হাতে এল। এটাতে তার মৌরসিপাট্টা হ'ল না বটে, কিন্তু এটাকে সে নিরানব্বই বছর ধ'রে ভোগদখল করার অধিকার পেলে। এবং এ-কথা মানতেই হবে যে একজন মানুষ আর একটা দ্বীপের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের দিক দিয়ে, এই ব্যস্ততা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতোই পাকা। কারণ দুর্মর আব্রাহামের অনুকরণে তুমি যদি চাও যে তোমার সন্তান-সন্ততি সমুদ্রতটের বালুরাশির মতো অগণ্য হয়, তবে তুমি তোমার বংশপত্তনের জন্যে নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপকে পছন্দ করবে না। তাহ'লে অবিলম্বে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য, তাহ'লে স্থান-সঙ্কুলান ক'রে ওঠা অসম্ভব, তাহ'লে বস্তি-জীবনের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য। যে-লোক দ্বীপকে ভালোবাসে অবিচ্ছিন্নতার খাতিরে, তার পক্ষে এমন আশঙ্কা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর। না, যথার্থ দ্বীপ একটি ছোট্টো নীড়ের মতো, তাতে ডিম ধরবে মাত্র একটি। দ্বৈপায়ন নিজেই হচ্ছে সেই অদ্বিতীয় ডিম্ব।

আমাদের ভাবী দ্বৈপায়ন যে-দ্বীপটি অধিকার করলে সেটি অকূলপাথারের মধ্যবর্তী নয়, জন্মভূমির প্রত্যন্তে। তার বেলাভূমির সীমান্তে নারিকেলের ঘনরেখা কিংবা সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন, অথবা ওই-জাতীয় অন্য কোনো অলঙ্কার ছিল না, ছিল কেবল একটি শক্তধরনের বসতবাড়ি। এই বাড়িটি বন্দরের ঠিক উপরেই, এবং একটু ঝুপ্‌সিধরনের। তার পিছনে একটি ছোটো গোলাঘর আর গোটাকয়েক চালা, এইগুলোর চারপাশে চষা ক্ষেত। সমুদ্রের ধারে, যেখানে খেয়া এসে থামত, সেখানে ছিল সারি-সারি তিনখানা কুটীর, সবক-টাই বেশ ছিমছাম আর চুনকাম-করা।

[অসম্পূর্ণ]

[নামহীন অনুবাদ গল্প ৭]

যৌবনের গুণে, বুদ্ধির জোরে, চেহারার দৌলতে আঠারো বছর বয়সেও আমার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্ঠতা ছিল না। তাই ঝড়তি-পড়তি আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। পোর্ল্যা ভালো চাকরি করত ; এবং তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা কারো কাছেই নগণ্য ঠেকত না। আমিও যৌতুক হিসেবে এনেছিলুম প্রায় তত টাকা। এক বৎসর বাদে আমাদের একটি ছেলে জন্মাল ; আর সঙ্গে-সঙ্গে আমি আমার স্বামীকে হারালুম। আপনি হয়তো বলবেন, শোকে আমি চারদিক অন্ধকার দেখলুম। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ পোর্ল্যাঁব পাশবিক ব্যবহার শুধু আমাকেই কষ্ট দেয়নি, সংসার-সুদ্ধ লোককে জ্বালিয়ে মেরেছিল। কাজেই সে বেঁচে থাকলে, তার স্বভাবদোষেই আমাদের যৌথ কারবার অধঃপাতে যেত। তা ছাড়া সে-বিবাহ বাপ-মায়ের শুভেচ্ছা-ঘটিত ; আমি তাকে যেমন ভালোবেসেছিলুম, তেমন ভালোবাসা কোনো মানুষের দুষ্প্রাপ্য নয়। অন্তত পক্ষে বৈধব্যের অব্যবহিত পরে আরেক ব্যক্তির সঙ্গে যখন আমার আলাপ হ'ল, তখন স্বামীর জীবন-মরণের চিহ্নমাত্রও নিজের মধ্যে খুঁজে পেলুম না, আগন্তুকই আমার মন মজালে ; অপরের সন্তান সমেত আমাকে ব'রে নিতে সে কোনোরকম আপত্তি তুললে না। কিন্তু এই নূতন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বাবাকে জানাতেই তিনি আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন। 'না, মারী, না ; তা হবে না, কিছুতেই হবে না। তুই আর এখন স্বাধীন নয়, নিজের কথা ভাবার, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার দিন আজ ফুরিয়েছে।'—আমি তাঁকে শুধোলুম, 'সেদিন এলই-বা কবে, কবে আমি স্বাধীন ছিলুম?' — 'সত্যি বলতে কী মা, কখনোই নয়, নিজেকে বিকোবার অধিকার কোনো মানুষের নেই। আমিই কি মর্জিমতো চলতে পেরেছি? এক মুহূর্তের জন্যেও পারিনি। তোদের, সাত ভাই-বোনের ভাবনাতেই আমার সারাজীবন কেটেছে—বিশেষত তোর ভাবনা ভেবে। তুইও সর্বপ্রথম গাব্রিয়েল-এর মা, একা গাব্রিয়েল ছাড়া আর সবাই তোর বিচার-বিবেচনার বাইরে। তার মঙ্গলের জন্যে আত্মবলিদানই তোর কর্তব্য, তোর কাছে সে একাই আমার সাতটির সামিল।'—'তাহ'লে আমার যত-কিছু চাওয়া-পাওয়ার শেষ এইখানে? এই কুড়ি বছরেই?'—'হ্যাঁ। কিন্তু তোর উপযুক্ত পাত্র আছে একজন।'—'আঃ! দয়া ক'রে বলবে তিনি কে?'—'আর কে, পোর্ল্যাঁর ভাই।'—'সে কেন?'—'কারণ একা সেই গাব্রিয়েলকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতে পারবে। হাজার হোক্, সে তার বাপের ভাই বটে তো ; একই রক্ত। তোর গর্ভে রেমদ্-এরও যদি ছেলে না-হয়, তাহ'লে ভিয়োলেদের যত বিষয়সম্পত্তি সবই গাব্রিয়েলকে অর্শাবে,

আর যদি আবার তোর সন্তান-সম্ভাবনা হয়ই, তাহ'লেও গাব্রিয়েলকে ভাই ব'লে মেনে নিতে তাদের ততটা বাধবে না, যতটা বাধবে অন্য কোনো বংশের।' আমি জবাব দিলুম, 'তুমি যা-বলছ, সবই খুব ন্যায্য ; কিন্তু কোনো নিকট-আত্মীয় আমাকে সহবাসে ডাকলে আমার শরীর-মন যেমন বিষিয়ে উঠত, রেমদ্-এর ছেলে পেটে ধরতে হবে শুনেও ঠিক তেমনি বিতৃষ্ণাতেই আমার অন্তরাত্মা পুড়ে যাচ্ছে। তবু তোমার কথার যুক্তিসঙ্গতি না-মেনে উপায় নেই। কিন্তু রেমদ্ আমার পাণিপ্রার্থী, এ-কল্পনা আমার কাছে কীরকম বীভৎস, তা জানলে এমন পরামর্শ কখনোই তোমার মুখ দিয়ে বেরোত না। অল্পকথায়, একবার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একজন ভিয়োলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলুম ব'লেই এবারে, আবার অনিচ্ছা সত্ত্বে[ও], আরেকজন ভিয়োলের বিবাহ-প্রস্তাবে কান পাতা আমার সাধ্য নয়। ভেবে দেখো, বাবা, তোমার মত যাতে বজায় থাকে, তাছাড়া অন্য কোনো আপদকে আমি একদিনের জন্যেও আমল দিইনি ; আজও তোমার মন জুগিয়ে চলাই আমার উদ্দেশ্য, এখনো সেই ছোট্ট, সেই বাধ্য, সেই আদুরে মেয়েটিই তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সকাল-বিকেল, বেরুনোর আগে আর ফেরার পরে, হাঁটু গেড়ে ব'সে যে প্রত্যহ তোমায় জুতো পরাত, খুলত। কিন্তু পোল্যাঁর অত্যাচারেই আমি বিয়ে হ'য়েও দাম্পত্য-জীবনের আস্বাদ পাইনি, সে ভিন্ন অন্য কোনো মানুষের ত্রিসীমানায় আসিনি ; কিন্তু আজ আমার চোখ ফুটেছে, আজ কত ধানে কত চাল, তা বুঝি, সম্প্রতি এমন একজন লোকের সংস্পর্শে এসেছি, যার আমাকে ভালো লাগে, যাকে আমার ভালো লাগে।'

কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা পালনের অভ্যাস ভাই-বোনেদের মতো আমার ধাতেও এমনভাবে ব'সে গিয়েছিল যে প্রেমাস্পদের দীর্ঘনিঃশ্বাস সত্ত্বেও, নিজের অজান্তেই, আবেগাতিশয্য কমাতে-কমাতে আমি আমাদের সম্বন্ধটাকে আস্তে-আস্তে নেহাৎ নীরস ক'রে ফেললুম। ইতিমধ্যে পারিবারিক ষড়যন্ত্র পাকতে লাগল, এবং অবিলম্বে একদিন যখন দেখলুম যে পিতৃপক্ষের নেপথ্য পরিচালনায় রঙ্গমঞ্চে নেমে রেমদ্ আমার সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে আলাপ জমিয়েছে, তখন ব্যাপারটা মোটেই বিস্ময়কর ঠেকল না, ততক্ষণে আমিও বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলুম। অবশ্য সেদিনে সে যা-বললে তা মুখস্থ পড়া। কিন্তু তার আবৃত্তি ভালোই লাগল ; এবং থেকে-থেকে যদিও দু-জনেই বুঝলুম যে বেশি কিছু নয়, একবার একটু হাত নাড়লেই অদৃষ্টের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ে যাবে, তবু সে-অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি জোগাল কই? বরং মনের কথা চোখে ফুটতেই আমরা মুখ ফিরিয়ে বসলুম, বিরক্তি ধরা পড়ছে ভেবে অশক্তির আধিক্য দেখালুম, এবং আমাদের অসহযোগেও সমস্ত বোধ-ব্যবস্থা এমন পাকারকমের হয়েছিল যে অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠানগুলোয় যোগ দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর রইল না। ব্যবসাগতিকে আমি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতুম, কাজেই আমার বিছানার অংশীদার হবার জন্যে রেমদ্ একদিন রাত্রে একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে এল মাত্র। কিন্তু এইখানেই খোল্সা ক'রে বলা ভালো যে তাহ'লেও এই অযাচিত সম্পর্কে আমরা দম্পতি-সুলভ অন্তরঙ্গতার অবকাশ রাখিনি। দু-জন সহকর্মীর মধ্যে যতখানি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা স্বাভাবিক, তারই উপরে সংসার পাতলুম। আমাদের সমস্ত সময় ও সম্মিলিত মন জুড়লে আমার ছেলে

আর সেই যৌথ কারবার। বাস্ সেই পর্যন্ত। তার বেশি নয়। আমি জানতুম রেমদ্-এর উপপত্নীর অভাব নেই, কিন্তু এজন্যে তার উপরে কখনো চটতে পারিনি, বরং মুখ-বুজে গোপনে-গোপনে তার আনন্দেই আমিও আনন্দ পেয়েছি। আমরা গাব্রিয়েলকে পরম যত্নে মানুষ করছিলুম এবং আমার আয় বাড়ানোর শক্তি আর রেমদের সম্পত্তিরক্ষার ক্ষমতা একত্রে মেশায় গাব্রিয়েল-এর জন্যে আস্তে-আস্তে বেশ-কিছু পয়সা জ'মে উঠছিল। রেমদ্-এর প্রশংসায় এ-কথা মানতে আমি বাধ্য যে সে গাব্রিয়েলকে কখনো ভাবতে দেয়নি তার বাপ নেই, এমন-কি পিতৃ-বিয়োগই যে তার সৌভাগ্যের কারণ, গাব্রিয়েলের মনের কোণে বাসা বেঁধেছিল হয়তো এই লজ্জাকর উপলব্ধি। প্রকৃতির পরিকল্পনা সবসময়ে মানুষী কীর্তিকলাপের মতো নিখুঁত নয়, সেইজন্যেই একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষকের উপকারিতা একজন নিকৃষ্ট পিতার চেয়ে অনেক বেশি।

তা সত্ত্বেও আজকে কালের চূড়ান্তে পৌঁছে অতীতের পানে চাইলে এ-কথা আমায় স্বীকার করতেই হয় যে আমার আর রেমদের অত পরিশ্রম একেবারে বিফলে গেছে, না-লেগেছে আমাদের নিজেদের কাজে, না গাব্রিয়েলের। এখুনি দেখতে পাবেন উন্নতির চাকা কী ক'রে উল্টোদিকে ঘুরে, কোথায় এসে থামল। প্রথমে শুধু যুদ্ধ বাধল, তারপর চার বৎসর ধ'রে ডোবা জাহাজের নরক-যন্ত্রণা। ভুগে-স'য়ে, চোট খেয়ে তিন-তিনবার মরতে-মরতে বেঁচে, গাব্রিয়েল হঠাৎ একদিন সস্ত্রীক বাড়ি ফিরল, যেন সে নেহাৎই যমের অনাদরণীয়। তার স্ত্রী আদ্রিয়েন ছিল চাষার মেয়ে, সুন্দরী বটে, কিন্তু কেমন যেন নগণ্য। সে যৌতুক হিসেবে মাত্র পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ আনলে, শুনলুম, ভবিষ্যতে আর কিছু পাবে, এমন আশাও তার নেই। আমরা তখন অন্তত চার লাখ ফ্রাঁর মালিক, কাজেই তার যৌতুকের টাকা আমাদের কাছে খুবই অল্প ঠেকল। কিন্তু এখন সমাজের হাওয়া বদ্‌লেছে, ছেলেমেয়েদের বাধা দেওয়া এ-যুগের ধর্ম-বিরুদ্ধ। তাই তারা পরস্পরকে কতখানি ভালোবাসে ভেবে মুখ বুজলুম। কিন্তু বিয়ের ঘটাঘটির মধ্যেই রেমদের হঠাৎ সখ হ'ল, সে গড়ের মতো প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি বানাবে। তখনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল তার দিন ফুরিয়েছে। যাবার সময় যখন ঘনায়, তখনই মানুষ এইরকম ক'রে পাথর আঁকড়ে ধরে ; এবং রেমদ্ বেচারাও আর বেশিদিন টিকল না। ছাদ পেটার আগেই সে আমাদের মায়া কাটালে। সঙ্গে-সঙ্গে গাব্রিয়েল বিছানা নিলে ; এবং তার স্ত্রীও আর খাড়া রইল না, রেনের জন্ম দিয়েই সে শুয়ে পড়ল। মৃত স্বামী, অসুস্থ পুত্র আর পুত্রবধূ, সদ্যোজাত পৌত্র, আমি কার মুখের দিকে চাইব ভাবছি, এমনসময় ডাক্তার গম্ভীর গলায় আমায় বললে, 'মাদাম ভিয়োলে, বুক বাঁধতে হবে, দু-জনকেই যক্ষ্মা ধরেছে, কিন্তু আদ্রিয়েন্-এর আর কোনো আশা নেই, ওর রোগ দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। এক্ষনি ওদের আলাদা করা আর ছেলেটিকে সরানো দরকার। ফলে গাব্রিয়েল এক সুইস্ চিকিৎসালয়ে আশ্রয় নিলে ; এবং নাতিকে ব্রিটনির এক স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে, ভাঙা বুকে, ভারবাহী পশুর মতো, আমি একা রইলুম আমার পুত্রবধূর পরিচর্যায়। আমাদের অত কষ্টের তিল-তিল সঞ্চয় মুঠোয়-মুঠোয় চারদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সেজন্যে আমি আদ্রিয়েন বেচারিকে দূষি না। তার সেবায় যে-অর্থ, যে-যত্ন ঢেলেছি,

তার জন্যে আমার এতটুকুও অনুতাপ নেই। দুঃখ এই যে তার মায়ের কাছ থেকে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া আর কোনো সাহায্যই কোনোদিন পাইনি ; দুটো ট্রেনের মধ্যবর্তী অবকাশগুলো তার দীর্ঘনিঃশ্বাসে একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠত। তেমন দীর্ঘনিঃশ্বাস তো আমরাও ফেলতে পারি। তবু ফেলিনি, কারণ এ-মার ভগবানের মার, আমার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ব'লেই অদৃষ্টের সমস্ত বোঝা তিনি আমার দুর্বল কাঁধে চাপিয়েছেন। অবশ্য সে-বিশ্বাসের যোগ্য হওয়া কিছু সহজ নয়, নিজের মেয়ের মতো ক'রে দিনরাত্রি পুত্রবধূর শুশ্রূষা খুবই শক্ত ; বিশেষত যখন মনে পড়ত যে তার জন্যেই ছেলেকে অজানাদের হাতে সঁপতে হয়েছে, তখন যেন কাটা-ঘায়ে কে নুন ছিটাত ; কিন্তু আমার মনের অবস্থা আদ্রিয়েনকে কখনো ঘুণাক্ষরেও জানাইনি, অধৈর্যের সময়ে নিজেকে বুঝিয়েছি যে আমি তার জন্যে যা করছি, অপরে আমার ছেলের জন্যে তাই করবে। তাকে যে নাড়া যায়নি, সে তো ভগবানেরই ইচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছেতেই তার সঙ্গ গাব্রিয়েল-এর পক্ষে বিপজ্জনক! তাই আমি নিজেকে বলতুম যে এ-ব্যবস্থা আমারই মঙ্গলের জন্যে, আমার মুখ চেয়েই ভগবান আদ্রিয়েনকে বেশি অসুস্থ করেছেন। সর্বনাশের সামনে এমনি ক'রেই মানুষ যা-পায়, তাই আঁকড়ে ধরে, তারপরে আসে ঔদাসীন্য, যখন মন্দকেও সে মেনে নেয় ; এখানে কোনোরকম বাছবিচার নেই। সে যাই হোক্, বারোটি মাস ভুগে আদ্রিয়েন মারা গেল, এবং আমার কোলে মাথা রেখে মরবার জন্যেই শোকে পাগল হ'য়ে গাব্রিয়েল এল তার জায়গা জুড়তে। এইবার আমার যন্ত্রণার ষোলো কলা পুরল ; কিন্তু তবু মরতে পারলুম না ; আমায় বাঁচতে হ'ল নাতির জন্যে, এবং তার মুখরোচক নধরকান্তি দেখে আমার যত-বা [স্নেহ] জাগল, তত-বা উথ্‌লে উঠল ভালোবাসা। হাজার মায়ের স্নেহ আর আর্তি একত্রে জুগিয়ে আমি তাকে মানুষ করতে লাগলুম ; সে যে আমার ছেলের ছেলে, আঁধার রাতের শেষ সল্‌তে। অবশ্য এই মমতাবোধকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনতুম না, সে না-থাকলে আমার কী হবে, তা ভাবার সময় পেতুম না, কেবল মুগ্ধ চোখে চারদিকে চাইতুম আর মনে-মনে বলতুম, সে অদ্বিতীয় রত্ন ; মনুষ্য-সংসারে তার জোড়া নেই, সে-রকম বুদ্ধি আর হৃদ্যতা, সে-রকম সাহস আর মর্যাদাজ্ঞান ভূত-ভবিষ্যতেও দুর্লভ। তারই জোরে সেদিন কোনোক্রমে টিঁকেছিলুম, এবং শেষপর্যন্ত সে নিজেকে বাঁচাতে পারলে না বটে, কিন্তু ইহলোক ছেড়ে গিয়েও সে-ই আজ আমার একমাত্র নির্ভর। এগারো বছর বয়সে মহানিদ্রায় চোখ বোজার আগে সে ডাক্তারকে কী বলেছিল জানেন? 'ডাক্তার সাহেব, আপনাকে জোড়-হাতে বলছি, আমায় মরতে দেবেন না। এ-অনুরোধ আমার নিজের জন্যে নয়, আমার বুড়ি ঠাকুরমা, যিনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর জন্যে। আমি ছাড়া জগতে ওঁর আর কেউ নেই, আমি চ'লে গেলে সংসারে উনি একেবারে নিরাশ্রয় হবেন। সেটা অত্যন্ত অন্যায়, বিশেষ অবিচার।' তবুও তাকে রাখা গেল না, অস্ত্রোপচারের পনেরো মিনিট কী আধ ঘণ্টা বাদেই তার প্রাণ বেরল। তার মৃত্যু হয়তো ন্যায্যই, ভগবানই জানেন তিনি আমাদের কাছে কী চান। কিন্তু সে মরার পর থেকে যা-চলেছে, আজকে আমার চারদিকে যা-ঘটছে, তা একেবারে বর্বরতার চূড়ান্ত, তার মধ্যে বিচার-বিবেচনার নামগন্ধ নেই ; কারণ যে-অনিষ্ট আজ আমি সইছি সে-মার অদৃষ্টের নয়,

মানুষের। পারলে একবার ভেবে দেখুন যে আজ যখন আমি একেবারে এক্‌লা, আজ যখন আমার শক্তি নেই, সহায় নেই, অনন্ত শোক অন্তরে-বাইরে কালি মেড়ে দিয়েছে, আজ, এইসময়ে তারা কি-না কানুনের তর্ক তুলে দাবি করে—বুঝলেন, দাবি করে--যে আমার যথাসর্বস্ব, আমার অন্তিম সম্বল কেড়ে নেবার অধিকার আইনত তাদের। কিন্তু আমার নাতির জন্যে তার নিকর্মা মামা দিদিমা কবে কী করেছে যে তাদের আর এতটুকু ত্বর সইল না, অভাগার মরার পরদিনই তাদের মাথায় ঢুকল তারাই তার উত্তরাধিকারী? বাছা যখন মরছে তখন তো তাদের টিকি দেখা যায়নি, তাকে কবর দেবার সময়ে তো তাদের টনক নড়েনি। অথচ গোরস্থান থেকে ফিরতে-না-ফিরতে আমি, যার বুকের রক্তে সে মানুষ, আমার বাড়িতে শীল পড়ল তাদের হুকুমে! হ্যাঁ, এ-কথা আমি মানছি যে বিয়ের সময়ে আদ্রিয়েন যৌতুক বাবদ পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে-টাকা তার আত্মীয়দের ফিরিয়ে দিতে আমি সর্বদাই রাজি, যদিচ আমার বর্তমান দুরবস্থার একমাত্র কারণ তার সেবা-শুশ্রূষা। তার আর আমার নিজের আপনজনের সেবা-শুশ্রূষা। কিন্তু তাতে হবে না ; যা ন্যায্য, তাতে চলবে না। আইনসম্মত অধিকার ফলানো চাই। এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক যাকে উচিত বলে তার কথাই উঠছে না, আইনের কেতাবে ছাপার অক্ষরে যা-লেখা আছে, এ হচ্ছে সেই পাওনার কথা, কারণ তার জন্যে নাড়ির যোগ বা রক্তের টান দরকার নেই, দলিল-দস্তখতের বাধা না-থাকলেই হ'ল। কিন্তু অত শত আমার জানা ছিল না ; তাই ভিয়োলেদের সঙ্গে উত্তরাধিকারের কোনো পাকাপাকি বন্দোবস্ত আমি করিনি। ফলে এখন শুনছি যে আইন-অনুসারে আমার নাতি যেমন তার বাপের ওয়ারিশ, তেমনি আমার নাতির ওয়ারিশ তার মায়ের মা আর তার মায়ের ভাই। তাছাড়া আজ যখন আমার নাতি বেঁচে নেই, তখন বংশগত সম্বন্ধ থাক্ বা না-থাক্, তার মধ্যবর্তিতায় তারা রেনের বাপেরও ওয়ারিশ। আইনের চোখে এ-দিক দিয়ে তাদের আর আমার মধ্যে নাকি কোনো তফাৎ নেই। বরং জোর সেই নিষ্কর্মাদেরই বেশি। এত বেশি যে রেনে চোখ বুজতে-না-বুজতে তারা আমার যথাসর্বস্ব বেচার ফিকিরে ঘুরছে। বিশ্বাস করুন, বিষয়াসক্তি আমার আর নেই, আমি চাই বিচার, ন্যায়বিচার ; সেইজন্যেই সম্পত্তি রক্ষা আমার কর্তব্য, কারণ এ-সম্পত্তি শুধু যে আমাতে দু-দুবার বর্তেছে, তা নয়, আমি না-থাকলে, পোল্যাঁ বা রেমদ্, তাদের বাপ বা মা কেউ কারবার চালাতে পারত না, এ-ধরনের ব্যবসায় উন্নতি করতে হ'লে যে-প্রতিভার দরকার তা তাদের কারো ছিল না। ছিল আমার, আমার এক্‌লার। সে-প্রতিভা যে কী তা যারা ব্যবসাবাজ লোক তারাই কেবল বুঝবে। কিন্তু এখন আর সে-কথা তুলে কী হবে? আজ যখন সত্তরে পা দিয়েছি, শোকে-তাপে খাটাখাটুনিতে প্রাণটুকু ছাড়া আর কিছুই যেতে বাকি নেই, আজ কি-না আমার শেষ আশ্রয় এই চালখানাকেও তারা নিলেমে তুলবে ব'লে কোমর বেঁধেছে। এখন আর এমন সঙ্গতি নেই যে নিলেম ডেকে বাড়িটাকে ফের কিনে নেব, বন্ধক দিয়ে সে-পথ অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাজেই একদিন সকালে উঠে হয়তো দেখব যে আমার মরবার জায়গা-সুদ্ধু নেই, যে-চারটে দেওয়ালের মাঝে আমার সকল আত্মীয় মরেছে, তার ভিতর থেকে আমায় উন্মূল না-করলে ওরা শান্তি পাবে না। আসলে এ-বাড়ির সঙ্গে আমার এত

স্মৃতি বিজড়িত যে এটাকে ছেড়ে যাওয়া আর রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরা আমার পক্ষে সমান। অন্য কোথাও আমার শিকড় গজাবে না, আবার নতুন ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহের অভ্যাস আমি গ'ড়ে তুলতে পারব না। সে-রকম ক'রে নির্বাসনে যাওয়ার চেয়ে এখনই সোজাসুজি গোরস্থানে গিয়ে আমার বাছার কবরের উপরে শুয়ে দেহ হিম হ'য়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা বরং ভালো। তাহ'লে অবিলম্বেই তার সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটবে। সত্যি, কালকে যা-দেখা হয়েছে, তারপরে আর বাঁচার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। স্বচক্ষে না-দেখলে কখনোই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে রাজপুরুষরাও এমনি ক'রে [...।]

[অসম্পূর্ণ]

[নামহীন অনুবাদ গল্প ৮]

গাড়ির মধ্যে মাত্র দু-জন মানুষ ছিল—একজোড়া স্ত্রী-পুরুষ। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। ফিরতি বেলাতেও নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা ভুগব, কিন্তু পথকষ্ট সম্ভবত আর বীভৎস ঠেকবে না। এবারে অন্তত আসনদুটোর মাঝখানে বাক্স জুড়ে একটা কাজ-চলা গোছের বিছানা বানাতে পারব। আসার মুখে যে-যন্ত্রণা সইতে হয়েছিল, তা দুঃস্বপ্নেই শোভা পায় ; সেই ভিড় আর গরম, সেই অনিদ্রা আর অধৈর্য ভোরের ঠিক আগে সেই তেল-চিট্চিটে, নোংরা, অকথ্য-রকমের জঘন্য আলো-আঁধারির মুহূর্তটা ভুলতে বেশ কিছুদিন লাগবে।

প্রথমটা সহযাত্রীদের সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জাগেনি। তাদের মালপত্তর দেখে আন্দাজে বুঝেছিলুম যে প্রাচ্যের কোথাও অসুখে প'ড়ে তারা হয়তো নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধারে বাড়ি ফিরছে। দু-জনেই সমান পাণ্ডু আর শীর্ণ, উভয়েই প্রায় সমান নির্জীব। পুরুষটির বয়স চল্লিশ নাগাদ, না-ঢেঙা, না-বেঁটে, রং ময়লা, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথাটা শরীরের পক্ষে কেমন যেন একটু বড়ো। স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর চেয়ে বছর দশেকের ছোটো। কিন্তু মাথায় দু-এক ইঞ্চি লম্বা, তার ডাগর-ডাগর নীল চোখ-জোড়া পরিশ্রান্ত পাটের মতো নিষ্প্রাণ ছাঁটা বাদামি চুলগুলো একখানা শিঙের কাঁকুই দিয়ে সুসংযত। তারা বেশি কথাবার্তা কইছিল না ; স্বামী ছিল বই পড়ায় ব্যস্ত, আর স্ত্রী আবিষ্ট অবসাদে তাকিয়েছিল জানলার বাইরে।

তারপর রাত্রিভোজন সেরে বুঝলুম যে তাদের বিষয়ে আমার কৌতূহল বেড়েছে। তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। প্রকৃতির শোভা আর নজরে পড়ে না। অথচ মন বসে না পড়াতে। তা ছাড়া আচম্কা গাড়িতে ঢুকে তাদের মুখে যে অতর্কিত হাসির অভিব্যক্তি লক্ষ করলুম, তার গভীর তন্ময়তা সাধারণের দ্রষ্টব্য নয় ব'লেই হয়তো আমার চেতনাকে একটু বেশি টানলে।

তাদের চোখ দেখে বোধ হ'ল, তারা যেন ভাগ্যবিধাতার প্রথম প্রিয়পাত্র, তাদের প্রতি অদৃষ্টের বিশেষ অনুগ্রহ না-থাকলে তারা কখনোই ঠিক সেখানে ও সেইমুহূর্তে মিলনের অধিকার পেত না। অবশ্য আমি ফিরেছি জেনেই তাদের মুখে আবার মুখোশ নামল। কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ হাস্যবিনিময়ের ফলে তারা আমার কাছে একেবারে বদ্‌লে গিয়েছিল, আমি আর ঔৎসুক্য ঠেকাতে পারলুম না, তাদের বাক্সে লট্‌কানো লেবেলের দিকে চোরা চাউনিতে তাকাতে লাগলুম।

নামটা দীর্ঘ ঠেকল, হস্তাক্ষর দুষ্পাঠ্য এবং শেষকালে যখন লিপিরহস্য ভেদ করতে

পারলুম, তখনো মন শান্তি পেলে না। পেন্‌গ্রিফিন্‌? কোথাও-না-কোথাও অনতিপূর্বে পেন্‌গ্রিফিন্‌ উপাধিধারী কাদের সম্বন্ধে কী যেন পড়েছিলুম বা শুনেছিলুম। আমি আমার স্মৃতির পুঁজি হাতড়াতে লাগলুম, এবং কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর অনেক আগেই ট্রেনখানা হাঁপাতে-হাঁপাতে, হেল্‌তে-দুল্‌তে, মাইলের পর মাইল মাড়িয়ে, প্যারিসের দিকে বেশ একটু এগিয়ে গেল। হঠাৎ আমার বিস্মৃতির কুয়াশা কাটল। মাস-খানেক কী মাস-দুয়েক আগে সংবাদপত্র প'ড়ে জেনেছিলুম যে চীনে ডাকাতেরা জন পেন্‌গ্রিফিন্‌-নামক এক ইংরেজ প্রচারককে সস্ত্রীক ধরেছিলেন। কিন্তু কেবল ওই সার কথাটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার নজরে আসেনি, বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়ে থাকলেও তা আমার চোখ এড়িয়েছিল এবং পরে তাদের ভাগ্যে কী ঘটে, সে-খবরে আমি ফাঁকি পড়েছিলুম। আবার তাদের দিকে চাইলুম, এবং তাদের বিষয়ে যতই ভাবলুম ততই নিঃসন্দেহ হলুম যে তারাই সেই যাজক-দম্পতি। উপরের থাক থেকে কী-একটা পাড়বার অছিলায় আমি তাদের মালপত্র সাবধানে পরীক্ষা করলুম ; যা খুঁজছিলুম, অবিলম্বেই তার প্রমাণ মিলল, তাদের বাক্সে আঁটা বংবেরঙের লেবেলের মধ্যে একটা ব'লে দিলে যে তারা চীন থেকেই ফিরছে।

[অসম্পূর্ণ]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

গ ল্প সং গ্র হ

পরিশিষ্ট

[উপন্যাসের উপক্রমণিকা]

স্ত্রীর সম্বন্ধে তার মনোভাব হরিচরণ নিজের কাছেও গোপন রেখেছিল। তার জন্ম ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে ; কাজেই অন্যান্য ধ্যান-ধারণার মতো, তার নারী-সংক্রান্ত আদর্শও ছিল স্কট্ প্রমুখ ইংরেজ লেখকদের দান। অবশ্য বাইরনের নামও সে জানত ; এবং দরকার হ'লে *ডন জোয়ান*-এর আগাগোড়া মুখস্থ বলায় তার নিশ্চয়ই কোথাও বাধত না। কিন্তু তার এই বিদ্যাটা ছিল সহধর্মিণীর মন্ত্রচর্চার সমান ; অর্থাৎ এর থেকে সে যে-পুণ্য অর্জন করত, তা কেবল ধ্বনির গুণে, অর্থের সাহায্যে নয়। পত্নী কৃষ্ণভামিনীর বিবেচনায় প্রাচীন আর্যদের আচার-ব্যবহার যতটা পরদেশী ঠেকত, হরিচরণের বুদ্ধিতে বাইরনের চপলতা তার চেয়ে কম দুরূহ ছিল না।

এ-কথা মানতেই হবে যে সে স্বভাবত কোমল প্রকৃতির হ'লেও, তার সুকুমার বৃত্তির অনেকখানিই ছিল আবশ্যিক। হরিচরণের পূর্বপুরুষেরা যজমানি ক'রে বেশ কিছু জমিজমা জমিয়ে গিয়েছিলেন বটে, তবু পিতা বিষ্ণুচরণকে, সেকালের সরল জমাখরচেও, বড়োলোক বলা চলত না। পিতৃবিয়োগের পরে হরিচরণ যে শহরময় ধনী নামে বিখ্যাত হ'য়ে পড়ল, সে নিজগুণে নয়, বিষ্ণুচরণের নির্ভুল দূরদৃষ্টির কল্যাণে। তিনি মিউটিনির পরের লোক ; তাই হয়তো তাঁর পক্ষে বোঝা শক্ত হয়নি যে পিতৃপিতামহের পেশা গ্রহণ করলে পরলোকের পথ যতই সুগম হোক্. ইহলোকে বিশেষ সুবিধা হবে না। ফলে তাঁর নাতিদীর্ঘ শিখা তৈলচিক্কণ সিঁথির প্রান্তে অনায়াসেই আত্মগোপন করলে ; তাঁর চটি-চাদর নির্বিরোধে হ্যাট-কোটের প্রাধান্য মানলে ; তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের পাট কমতে-কমতে শেষে কেবল দুর্দিনের জন্যেই সঞ্চিত হ'য়ে থাকল। কিন্তু এত ক'রেও সেকালে যাকে ফিরিঙ্গি বলত, তা তিনি হ'য়ে উঠতে পারলেন না। হয়তো হবার ইচ্ছাও ছিল না, কারণ অপচয় — তা সে অর্থ, বাক্য বা চেষ্টা, যারই হোক্-না-কেন — তাঁর ধাতে সইত না। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন যে সাহেবিয়ানা একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে, নিজের কলে প'ড়ে নিজেই মরে। শক্তিমানের নকল করা বাঞ্ছনীয়, কারণ অনুকারকের বাঁদরামি দেখে সে নিজের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এমনই নিঃসন্দেহ হ'য়ে ওঠে যে জন্তুটিকে কলা-মুলো উপহার দিতে তার আর কার্পণ্য থাকে না ; কিন্তু খুশি মনে প্রতিযোগীর উন্নতি কামনা করা সাদা-কালো সকলের পক্ষেই অস্বাভাবিক। সুতরাং বিষ্ণুচরণের আন্‌কোরা বাড়িতে একদিকে যেমন মখ্‌মলে-মোড়া কুরসি-কেদারা, কলে-ছাপা শেয়াল শিকারের ছবি, হুইস্কি-ব্র্যান্ডি, মুরগি-মটন ইত্যাদির অভাব ছিল না,

অন্যদিকে তেমনি শালগ্রাম শিলা থেকে আরম্ভ ক'রে দোল-দুর্গোৎসব অবধি হিন্দুদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই সমান সম্মান পেত। এ দুটোর মধ্যে কোন্‌দিকে তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল, তা বলা অসাধ্য। দু-নৌকোয় দু-পা রেখে তিনি এমন অটলভাবে জীবন-নদী পেরিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁকে নিরপেক্ষ মনে করাই হয়তো সবচেয়ে সঙ্গত। অন্ততপক্ষে এমন ভাবায় দোষ নেই যে বিষ্ণুচরণ আধ্যাত্মিক প্রেরণার থেকে বৈষয়িক প্রয়োজনকেই বড়ো ব'লে দেখতেন ; তাঁর মতে সকল আচারই চারের কাজ করত ; অনুষ্ঠান মাত্রেই ছিল রুই-কাৎলাকে ছিপে গাঁথার উপায়। মাঝে-মাঝে যখন বিধাতাকে না-হ'লে চলত না, তখন তিনি ফেলতেন মন্ত্রতন্ত্রের জাল ; আবার কার্যগতিকে সাহেবসুবোকে দরকার পড়লে, তাঁকে নিতে হ'ত বিলেতি মসলার শরণ। আসলে ম্লেচ্ছ আর্য কাউকেই তিনি অযথা আশকারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন-কি একমাত্র পুত্র হরিচরণকেও নয়।

সত্য বলতে গেলে শুধু বিষ্ণুচরণ কেন, পিতা মাত্রেই হরিচরণের মতো পুত্রকে দুরদৃষ্ট ব'লে ভেবে থাকেন। তাঁর মনটা স্বভাবত নরম ছিল বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি স্বাভাবিক ছিল তাঁর বেতসীবৃত্তি। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা যে-লক্ষণকে জগতের মূলধর্ম ব'লে বর্ণনা করছেন, সেই ন্যূন চেষ্টার অভ্যাসটাই ছিল হরিচরণের প্রাক্তন বৈশিষ্ট্য। এ-কথা ঠিক যে বিষ্ণুচরণ ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে সময়ে নজর দিলে তার সাতজন্মের সংস্কারকেও সংস্কৃত করতে পারতেন। কিন্তু দেবতাদের অনেক ভয় ও লোভ দেখানোর পরে হরিচরণ যখন ভূমিষ্ঠ হ'ল, তখন তাঁর যৌবন তো বিগত বটেই, এমন-কি জরাও দ্বারাগত। সে-অবস্থায় তিনি ভাবলেন যে ছেলেকে মানুষ ক'রে তোলার মতো অবকাশ হয়তো তাঁর মিলবে না ; তাই সে-পণ্ডশ্রমে সময় না-কাটিয়ে তিনি চক্রবৃদ্ধির সার্থক হিসাবে মন দিলেন। কালে দেখা গেল তাঁর মৃত্যুভয় অমূলক, কিন্তু এ-আবিষ্কারের বহুপূর্বেই সুলগ্ন অতীত হয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে যে নিষ্প্রয়োজন জিনিসটা সমাজে শিক্ষা নামে পরিচিত, তাতে হরিচরণ বেশ পারদর্শী হ'য়ে উঠছিল, চার-পাঁচজন মাস্টারের যত্নে স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলোকে সে পেরিয়ে চলছিল বেশ সুযশে। কিন্তু এই সফলতার জন্যে তার বুদ্ধি ততটা প্রশংসাভাজন ছিল না, যতটা দায়ী ছিল তার নিরীহতা। পড়ার চেয়ে দৌরাত্ম্যই হয়তো তাকে বেশি টানত ; কিন্তু গোটাকয়েক বাড়াবাড়ির পরে, মিতভাষী পিতার কাছে তাকে যে-কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল, সেই দুঃস্বপ্নের দুর্বহ স্মৃতি হরিচরণ বৃদ্ধবয়সেও ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। এ-রকম ক্ষেত্রেও বিষ্ণুচরণ চেঁচামেচি পছন্দ করতেন না। কিন্তু পুত্রের ঊর্ধ্বশ্বাস বক্তব্য শান্তভাবে শুনে, তিনি যখন মঙ্গলীয় চাহনিতে তার দিকে চাইতেন, তখন হরিচরণের মনে হ'ত তার অস্থি নেই, মাংস নেই, দেহ নেই ; নিঃসঙ্গ, নীরব, নিরাশ্রয় ব্রহ্মাণ্ডে তার অনাবৃত আত্মাপুরুষ একজোড়া অপলক চোখের আকর্ষণ এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় কেবলই উধাও হ'য়ে ছুটেছে। এ-সময়ে পিতার কণ্ঠস্বর যত বিলম্বিত হ'য়ে আসত, পুত্রের উৎকণ্ঠা বাড়ত সেই অনুপাতে ; এবং শেষকালে যখন তিরস্কারের আভাসমাত্র না-দিয়ে বিষ্ণুচরণ ধীর গলায় বলতেন — 'এবার যাও, এমন কথা আর কখনো যেন না-শুনি', তখন হৃৎকম্পের অবিরত জলদে সে-আওয়াজ তার কানেই পৌঁছত না। এ-অবস্থায় পিতার শ্যেনদৃষ্টির অন্তরালে থাকাই

হরিচরণের একমাত্র লক্ষ্য হ'য়ে উঠল, এবং সে শৈশবেই আবিষ্কার করলে যে গুরুমশাইদের প্রশংসাপত্র তাকে যতখানি আওতা দেয়, অকৃত্রিম অসুখ পর্যন্ত তেমন রক্ষাকবচের সন্ধান রাখে না। সে আরো দেখলে যে ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়, মাথা জিনিসটাও পেটের মতো, তারও পণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে কেবল অভ্যাসের উপরে। তাছাড়া পিতার উদাসীনতা বাদেও ভালো ছেলে হওয়ার অন্য পুরস্কার আছে ; তার ফলে খেলা নামক ধস্তাধস্তি, গল্প নামক চেল্লাচেল্লি, ছুটি নামক উপসর্গ ইত্যাদিকেও অনায়াসেই এড়িয়ে চলা যায়।

ভাগ্যগুণে তার শিক্ষকও মিলল উপযুক্ত। মহেন্দ্রবাবু ছিলেন সেকালের এক রোমহর্ষক এম.এ.। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও তিনি পেতে পারতেন, কিন্তু প্রবেশিকা পাশ করার পর থেকে ছ-বৎসর ধ'রে তিনি এমনি বিভোরে সরস্বতীর ধ্যান করলেন যে দেবীর পাষাণহৃদয়ও ভক্তের জন্যে উচাটন হ'য়ে পড়ল, উপায়ান্তর না-দেখে তিনি মহেন্দ্রবাবুকে প্রায়ান্ধ ক'রে তাঁর প্রাণ বাঁচালেন। দৈবজ্ঞদের ভাবিকথন আরো একটা ক্ষেত্রে অপূর্ণ র'য়ে গেল, যশোস্থানে ফাঁক পেয়ে শনি এসে তাঁর অর্থস্থানে জুড়ে বসল, এবং জজিয়তির আশা ছেড়ে মহেন্দ্রবাবু অগত্যা অবতীর্ণ হলেন মাস্টারিতেই। কিন্তু এখানেও সুনাম অর্জন তাঁর ভাগ্যে ছিল না। তাঁকে অবিলম্বেই স্বীকার করতে হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা আর যাদুবিদ্যা ঠিক একজাতীয় নয়, বড়োলোকের বাড়ির গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার জন্যে ওই শেষোক্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তিই অত্যাবশ্যক। কিন্তু অভ্যাসদোষ সহজে যায় না, কাজেই ঘটনাক্রমে হরিচরণ যখন তাঁর তত্ত্বাবধানে এল, তখন তিনি মনে নিরাশ হ'লেও প্রকাশ্য সদুপদেশে নির্বন্ধাতিশয় দেখাতে লাগলেন, এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাশার অঙ্ক শূন্য ছিল ব'লেই হয়তো নূতন ছাত্রটি অল্পদিনে তাঁকে স্তম্ভিত ক'রে দিলে। এতদিনে তিনি বুঝলেন মাটির মানুষ বাক্যটির যথার্থ অর্থ কী! তার সম্বন্ধে মাটি শব্দও হয়তো অত্যন্ত কঠিন ; সে একেবারে কাদা ; একেবারে আবাদের মতো নির্বিবাদ ও নির্বিচার। তার সরস মনে অকালবৃদ্ধ মহেন্দ্রবাবুর শীর্ণ স্বপ্নও মুহূর্তেকে আকাশকুসুমে পরিণত হ'ল। তিনি ভাবলেন, এতদিনে শোধবোধের পালা এসেছে ; দুষ্টগ্রহের অত্যাচার, সুহৃদ্-জগতের অবজ্ঞা, সে-সমস্তের দাদ তিনি এই একটি ছেলের সাহায্যে তুলবেন, জজ তো কোন্ ছার কথা, হরিচরণ ভাইস্-চান্সেলার হবে। এমন-কি — কিন্তু এখানে তাঁর উপবাসী কল্পনা সদ্যজাগ্রত দুঃসাহসের অনুগমন করতে পারলে না, শুধু এইটুকু ব'লেই তাঁকে ক্ষান্ত হতে হ'ল : তখন দেখা যাবে অন্ধ কে — আমি না সমাজ, আমি না ভগবান! পুত্র-পরিবার থাকলে মহেন্দ্রবাবুর মনে হয়তো বিষ জমতে পারত না। কিন্তু বাংলা দেশে তখন নব্যতন্ত্র সবেমাত্র শুরু হয়েছে ; একবার মানুষের রক্ত খেলে বাঘ যেমন মানুষ ছাড়া আর কিছু শিকার করে না, তেমনি টাকার প্রথম স্বাদে আত্মহারা হ'য়ে তখন বাঙালি ফিরছে কেবল স্বর্ণমৃগের সন্ধানে। মহেন্দ্রবাবুর মতো অকিঞ্চন, অকুলীন, অসুস্থ পাত্রের অনূঢ় থাকাই সে-অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু অপুত্রক হ'লেও বাৎসল্যের বিড়ম্বনা চোকে না, বরং আরো হিংস্র হ'য়ে ওঠে ; কাজেই ছাত্র সম্মতি জ্ঞাপন করার আগেই গুরুর পুত্রস্নেহ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। অবশ্য হরিচরণের মত চাইলেও তার গররাজি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বিরোধমাত্রকে সে তো ভয়ের চোখে দেখতই, উপরন্তু কারুর হৃদয়ে সর্বেসর্বা

হ'য়ে-ওঠা তার কাছে এতই অভাবনীয় ছিল যে, এই অপূর্ব অভ্যাঘাতে সে কোনোমতেই আত্মরক্ষা করতে পারলে না। তার মনের অবিশ্বাসকুণ্ডলী কেমন যে[ন] শিথিল হ'য়ে পড়ল ; তার মজ্জাগত জড়তায় কীসের একটা জাগরণ দেখা দিলে, আজন্মের অধুনা-নির্ভরতা অতিক্রম ক'রে, হরিচরণ একদিন ব'লে বসল যে অচির-ভবিষ্যতে সে-ও মহেন্দ্রবাবুর যোগ্য হবে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের জীবনে সিদ্ধিই সঙ্কল্পের একমাত্র পরিণতি নয়। পণ করা যত সহজ, পণ ভাঙা হয়তো তার চেয়েও অনায়াসসাধ্য, এবং মনোরথের গতি হয়তো ফাঁকা হাওয়াতেই সবচেয়ে ক্ষিপ্র ও অবাধ। সে যাই হোক্, এই মৌল অনিশ্চয়-বিধির দরুন খুব উতল হওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমাদের ইচ্ছাশক্তি যদি সত্যই কাল্পনিক হয়, তবে ব্যর্থতা, সাফল্য দুই দৈবাধীন ; এবং যে-নিয়তির খামখেয়ালে আমাদের কথার খেলাপ ঘটে, তার আশীর্বাদে সে-কথার সার্থকতাও সম্ভব। এর জন্যে দরকার কেবল অখণ্ড অবসর আর অফুরন্ত সুযোগ ; অভিজ্ঞতার সমস্ত রকমফেরের মধ্যে পায়ে-পায়ে এগুতে পারলে, কেবল বিয়োগের সাহায্যেই হয়তো অমৃতযোগে পৌঁছনো যেতে পারবে। যখন ছ-টা বাঁদরের অবিরাম কথা-কাড়কাড়ি খেলা কদাচিৎ শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলিকেও হার মানাতে বাধ্য, তখন অনন্তকালের অনুগ্রহ পেলে হরিচরণও যে একদিন মহেন্দ্রবাবুর মুখরক্ষা করত, তাতে সন্দেহ নেই। এটা যে ঘটল না, তার জন্যে হয়তো মহেন্দ্রবাবুই দায়ী। হয়তো দায়ী কথাটা একটু বেশি কড়া হ'ল, কারণ ভাইস্‌-চান্সেলারি অথবা তার চেয়ে কোনো বড়ো লক্ষ্যভেদের ব্রহ্মাস্ত্র মহেন্দ্রবাবুর মতো অকারী মানুষের কাছে না-থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যদিক থেকে ভাবলে আবার এটাও নিশ্চিত যে যারা আজন্ম অপদার্থ তারা মনে-মনে কৃতকর্মাদের একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখে। সে যাই হোক্, অন্ততপক্ষে এ-কথা জোর গলায় বলা যেতে পারে যে মহেন্দ্রবাবু আসলে তাঁর ছাত্রের জন্যে কোনো পথই ছ'কে দিতে পারেননি, তিনি তাঁর প্রভূত বাগ্মিতা ব্যয় করেছিলেন উন্নতির বিপদ-বর্ণনায়। উদাত্ত মুহূর্তে তিনি হরিচরণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-নাটক গড়তেন, তার নায়কের মধ্যে রক্তমাংসের কোনো চিহ্ন থাকত না, মনে হ'ত সে যেন ঋষি-কল্পিত মানবাত্মা, নিরাকার, নির্বিকার, নিরবদ্য, তার কেবল গুণ আছে, দোষ নেই ; মহত্ত্ব আছে, ক্ষুদ্রতা নেই ; উদ্যম আছে, নৈরাশ নেই ; শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির অপচয় নেই। 'জগৎ', মহেন্দ্রবাবু বলতেন, 'উদারতা ছাড়া জগৎ চলতে পারে না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ-প্রতিপত্তি, এমন-কি স্বাস্থ্য-সামর্থ্য, এর কোনোটাই অপরিহার্য নয়। দরকার কেবল নিজের উৎকর্ষে আত্মস্থ হ'য়ে, চারপাশের ভেড়ার পালকে এড়িয়ে যাওয়া। তারা চরছে, চরুক্, থাক্-না তাদের স্বাস্থ্য, তাদের বুদ্ধিও তো সেই স্বাস্থ্যের মতোই পাশবিক। কুকুর চাঁদকে দেখে চেঁচায়, কিন্তু সেইজন্যেই চাঁদ কি তার সঙ্গে টক্কর দিতে নেমে আসবে? না, হাসতে-হাসতে এই ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কির ওপর দিয়ে নিজের গন্তব্যে চ'লে যাবে? ধরো, আমি যদি এই মূর্খদের ওপরে টেক্কা দিতে যেতুম — তাতে কার ক্ষতি হ'ত, — তাদের, না আমার? ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানেই তো নিজেকে খাটো করা। শঠের সঙ্গে যুঝতে পারে শঠ, তেমনি জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ার। থাকুক্ ওরা ওদের খোঁয়াড়ে, ওদের পাশ

কাটিয়ে চলো, ওদের চিৎকার সইতে শেখো ; কিন্তু ওদের কখনো ভুলতে দিও না যে আমরা — আমরা — ।' মহেন্দ্রবাবু তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন না, কিন্তু তাতে হরিচরণের দুঃখ ছিল না। সে অত কথার ধার ধারত না, এমন-কি সমস্তটার প্রতি মন দেওয়া হয়তো তার সাধ্যের অতীত ছিল ; যেটুকু সে বুঝত সেটুকুর সঙ্গে তার নিজের সহজ প্রবৃত্তির সাদৃশ্য এত বেশি ছিল যে তার সমস্ত বুদ্ধি তাদের অন্তর্নিহিত কুটুম্বিতার সন্ধানে তন্ময় হ'য়ে যেত ; মাস্টারমশায়ের স্বীকারোক্তি শোনার অবকাশই সে পেত না।

এইরকম সময়ে হরিচরণের অমনোযোগে তার অহৃদয়তার পরিচয় খুঁজলে অন্যায় হবে। বস্তুত সে মহেন্দ্রবাবুকে যতখানি ভালোবেসেছিল, ততখানি বা সে-ধরনের নিষ্কাম ও সশ্রদ্ধ ভালোবাসা সে কখনো কাউকে দিতে পারেনি। এমন-কি বিষ্ণুচরণের সঙ্গে তার একবার মাত্র সঙ্ঘর্ষের কারণও বোধহয় মহেন্দ্রবাবু। একদিন হরিচরণ মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বোট্যানিক্যাল বাগানে বেড়াতে যাবে ব'লে বেরুতে যাচ্ছে, এমনসময়ে সদর দরজার কাছে এক বৃদ্ধ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। শশব্যস্ত হ'য়ে, হরিচরণ খবর ক'রে জানলে যে বুড়ো তাদেরই একটি বস্তির প্রজা, এক বছরের খাজনা বাকি পড়ায় আদালত থেকে তার উচ্ছেদের হুকুম হয়েছে। 'আমি কী করব', ব'লে সে পাশ কাটিয়ে পালাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর নিবদ্ধদৃষ্টি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে থামিয়ে দিলে। বৃদ্ধ বললে, 'বাইশ বছর আপনাদের আশ্রয়ে আছি, ধর্মাবতার, কখনো কোনো কিস্তির খেলাপ হয়নি। আট মাস আগে জোয়ান ছেলেটা একদিনের ওলাওঠায় মারা গেল। তাই — ।' বেচারা আর এগুতে পারলে না, নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলে, কিন্তু অশ্রুর দমক থামল না, তাকে চোখ বুজে মাথা নোয়াতে হ'ল। হরিচরণের মন হয়তো খুব বিচলিত হ'ল না, কিন্তু তার চোখে কেমন যেন অনুকম্পনের ছোঁয়াচ লাগল ; দুরবস্থা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সে একটু উগ্র স্বরে বললে : 'তা আমার কাছে এসেছ কেন? বাবা সাতদিন বাদে কলকাতায় ফিরবেন, তখন তাঁকে জানিও।' বৃদ্ধের চোখে তখনো জল ঝরছিল, সে জবাব দেবার আগেই চেঁচামেচি শুনে বিষ্ণুচরণের গোমস্তা উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধ'রে এসে তার সামনে হাত-পা নেড়ে বললে : 'ব্যাটার-ছেলে আর কাঁদুনি গাইতে জায়গা পাসনি? তোকে-না চ'লে যেতে বললুম! ছোটোলোকেদের ভালো কথায় কিছু হয় না, মুখের ওপর ঘা-কতক জুতো দিলে তবে শায়েস্তা—।' বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে কেমন একটা সঙ্কোচ দেখা গেল, বিনামাপ্রহার যেন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ; সে ময়লা গামছার কোণে চোখ মুছে নিরাশ নিষ্প্রাণ গলায় বললে : 'রাগ করবেন না গোমস্তাবাবু, হুজুর হুকুম দিলেই চ'লে যাব। কিন্তু আপনি তো জানেন, ঘর আমি ইচ্ছে ক'রে জুড়ে নেই। ছেলেটা মারা গিয়ে অবধি—।' গোমস্তা হুঙ্কার ছাড়লেন : 'দারোয়ান!' এই সুযোগে চুপি-চুপি পালাবার মতলবে হরিচরণ মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকালে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অগত্যা বিরক্ত হ'য়ে গোমস্তার আস্ফালনে বাধা দিয়ে, সে বললে : 'তকরার না-ক'রে, এখন কী চাও শুনি?' বৃদ্ধ কাতর স্বরে জানালে যে পুত্রবিয়োগের পরে থেকে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য একটু-একটু ক'রে ভাঙতে-ভাঙতে দু-হপ্তা হ'ল সে একজ্বরী হ'য়ে প'ড়ে আছে ; পাড়ার ডাক্তারবাবুকে হাতে-পায়ে

ধ'রে আনা হয়েছিল, কিন্তু তিনি রুগীকে জবাব দিয়ে গেছেন ; আর ক-টা দিনেরই-বা ওয়াস্তা, এই ক-টা দিন যাতে তাদের নড়তে না-হয়, সে এই আর্জি পেশ করতে এসেছে। সে আবার সংযম হারিয়ে হরিচরণের পায়ে হাত রেখে বললে : 'ধর্মাবতার, ভগবান সাক্ষী, আমি আপনাদের ফাঁকি দিতে চাইনি। নগদ এক আধলাও আমার আর নেই, কিন্তু বুড়ি মারা গেলে পর দু-একখানা যা বাসনকোসন গয়নাগাঁটি আছে বেচে দেনা শোধ ক'রে চ'লে যাব। কিন্তু এই ক-টা দিন—।'

হরিচরণ কিছু বলার আগেই গোমস্তা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে শুরু করলে : 'তোমার পরিবারের শ্বাস হয়েছে ব'লে আমাদের ভাড়াটে রাস্তায় ব'সে থাকবে। এখানে ও-সব ন্যাকামি হচ্ছে না, বড়োবাবু ব'লে গেছেন, আদালতের হুকুম পেলেই চুলের মুঠি ধ'রে ঘর থেকে বার ক'রে দিতে। দেখি তোকে কে রক্ষা করে?' হঠাৎ হরিচবণের আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠল : এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি তার সমস্ত বিকেলটা মাটি হবে? তাছাড়া বুড়ো তো এমন কিছু অন্যায় আবদার করছে না, — সত্যিই তো, বেচারা এই অবস্থায় কোথায় উঠে যাবে! অতএব সে কর্কশ গলায় গোমস্তাকে বললে : 'তুমি অত ওস্তাদি ক'রো-না দিকি!' তারপর পিছনদিকে আড়চোখে মহেন্দ্রবাবুকে দেখে নিয়ে, বৃদ্ধকে বললে : 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না ; বাড়িতে কেউ নেই, রুগী রেখে এসেছ, যাও, শিগ্‌গির ফিরে যাও! এ-ক-দিন আর তোমায় এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

২

আদালতের পেয়াদারা সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলে এবং বৃদ্ধও কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করতে-করতে মুমূর্ষু স্ত্রীর শয্যাপ্রান্তে ছুটল, কিন্তু ব্যাপারটার সেখানেই শেষ হ'ল না। শহরে ফিরতেই ঘটনাটার শাখা-সমন্বিত ইতিহাস যখন গোমস্তার মারফতে বিষ্ণুচরণের কানে গেল, তখন তাঁর অটল ধৈর্যও ক্ষণকালের জন্যে ভেঙে পড়ল। তাঁর অবশ্য বুঝতে কষ্ট হ'ল না, জিনিসটা আসলে অতি তুচ্ছ ; কিন্তু আজন্মের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি শিখেছিলেন যে কড়া-ক্রান্তিগুলো যার নজর এড়িয়ে যায়, তাকে দশ-বিশ লাখের হিসেব রাখতে দেওয়া নেহাৎ মিছে। তাঁর ছেলের কি এইটুকু সহজজ্ঞানও নেই? একটা কোথাকার দাগাবাজ এসে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেললে, আর তার এত জন্ম-জন্মান্তের শিক্ষা-সংস্কার ধুয়ে-মুছে সাফ্ হ'য়ে গেল। হঠাৎ বিষ্ণুচরণ চোখে অন্ধকার দেখলেন, মনে হ'ল তাঁর জীবন ব্যর্থ, তাঁর সাধনা পণ্ডশ্রম, এতদিন ধ'রে প্রাণপাত ক'রে তাঁর বিষয়বুদ্ধি সে কেবল পাঁচ ভূতের নাচের আসরকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে। মুহূর্তের জন্যে সর্বনাশের শোকাবহ ছবি তাঁকে অভিভূত ক'রে ফেললে। অবশ্য এই সর্বস্বান্ত ট্রাজিডির মুখ্য ভূমিকায় তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন না বটে, এবং চীরপরিহিত হরিচরণের মূর্তিও তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারলে না, তবু অন্তত কিছুকালের জন্যে তাঁর সবল আত্মপ্রতিষ্ঠা একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, মনে হ'ল মানুষের মহত্তম চেষ্টা এবং শিশুর ফুৎকৃত বুদ্বুদ, এ-দুয়ের মধ্যে প্রভেদের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ অদৃষ্টের অন্যায় অত্যাচারে তিনি দিশাহারা হ'য়ে পড়লেন, বুঝলেন যে বিধাতাপুরুষ

হাল আমলের অকৃতজ্ঞ ভৃত্যের মতো, তার পারিশ্রমিকের হার যে-পরিমাণে বাড়ানো যায় তার সেবাপরায়ণতা কমে সেই অনুপাতে ; শেষ পর্যন্ত সে দানই চায়, আর প্রতিদান দিতে প্রস্তুত থাকে না, এবং যদি কখনো কোনো কারণে এই অনর্জিত দান তার কাছে যথাসময়ে না-পৌঁছয়, তাহ'লে অন্যান্য ইতরদের মতো তার কাণ্ডজ্ঞানও নিমেষের মধ্যে লোপ পায়, তখন সাধারণ সর্বহারার ন্যায় সে-ও মরীয়া হ'য়ে ওঠে, এমন-কি সহজ জীবযাত্রা যে মৌলিক অহিংসা ও সহ্যগুণের উপরে নির্ভর করছে, তাতে হাত দিতেও তার সঙ্কোচ আসে না, এ-অবস্থায় সে যে কেবল প্রভুশ্রেণীরই উচ্ছেদ করে, তা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের অন্নজলের পাটও যে চিরদিনের মতো উঠে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল থাকে না।

অন্তরঙ্গতায় কোনোদিনই বিষ্ণুচরণের আস্থা ছিল না, কিন্তু নিঃসঙ্গতার নিরাশ্রয় যন্ত্রণা তিনি এই প্রথম অনুভব করলেন। এ-অবস্থায় তিনি যদি শিল্পসৃষ্টিতে অভ্যস্ত হতেন, তবে হয়তো তাঁকে কাব্যলক্ষ্মীর কাল্পনিক চরণে ধর্না দিতে দেখা যেত। কিন্তু তাঁর বিবেচনায় মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে ভাষার রসায়নে সাহিত্যে উন্নীত করা ছিল অপদার্থতার অপরিহার্য লক্ষণ। তাই তিনি অপরিচিত গ্রীক নাট্যকারের প্রতিধ্বনি ক'রে এ-কথা বলার প্রয়াস পেলেন না যে মানুষকে অন্তঃকাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে না-দেখে তার সম্বন্ধে সুখী বিশেষণের প্রয়োগ শুধু জন্মমূঢ়েরই কাজ, তাঁর তখন কেবল এইটুকু মনে হ'ল যে তিনি হৃদ্‌রোগী, এবং হৃদ্‌রোগীদের মৃত্যু অনিবার্য তো বটেই, অনিশ্চিতও। এই বিশ্বাস একবার জাগবার পরে হরিচরণের ঐকান্তিক অযোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। কারণ বিষ্ণুচরণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশজাত হ'লেও তত্ত্ববিদ্যার কূটতর্ককে তিনি ভয়ের চক্ষে দেখতেন। তিনি জানতেন যে নির্বিকল্পতার দিক দিয়ে কাকতালীয় ন্যায় যতই হাস্যকর হোক্-না-কেন, কার্যসিদ্ধির ও ছাড়া অন্য উপায় নেই। সুতরাং তাঁর যখন মনে পড়ল যে উক্ত রোগের সূত্রপাত হয়েছিল হরিচরণের জন্মের অনতিপরেই, তখন তার থেকে এ-সিদ্ধান্তে আসতে তিনি মোটেই কষ্ট পেলেন না যে পুত্রই তাঁর শনি এবং পুত্রের অনাচারের সাঙ্ঘাতিক সঙ্ঘাতেই তাঁর অপঘাত ঘটবে। অবশ্য তিনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারতেন যে এ-সময়ে হরিচরণ অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছিল এবং এই আঠারো বছরে শুধু যে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমোন্নতির পথ থেকে একবারও স্খলিত হয়নি, তা নয়, উপরন্তু তাঁর ভাণ্ডারে লক্ষ্মীও এই দীর্ঘকাল একেবারে অবিচলিত হ'য়ে বসেছিলেন। তাঁর জীবনে বিষ্ণুচরণকে সত্য সম্বন্ধে উদাসীন হ'তে অনেকবার দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তথ্য সম্বন্ধে তিনি আমরণ কখনো ঠিকে ভুল করেননি। তাই পুত্র প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাবকে বিস্মৃতিপ্রসূত ব'লে না-ভেবে, এইটা মনে করাই হয়তো প্রশস্ত যে তাঁর সহধর্মিণীর অকালমৃত্যুর দায় তিনি তখন হরিচরণের উপরেই চাপাচ্ছিলেন।

ভাবুক না-হ'লেও একটা কার্যকারণ শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা বিষ্ণুচরণ চিরদিনই অনুভব করতেন, এবং তাঁর পত্নীর হঠাৎ মৃত্যুর যে-ব্যাখ্যা তাঁর পরিচিতবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেটাকে বিনা-তর্কে মেনে নিতে তাঁর সঙ্গতিবোধে বাধত। তাঁর স্ত্রী মনের দুঃখে মারা গেছেন, এই জনরবের পিছনে কতখানি ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা উহ্য আছে, তা বিষ্ণুচরণের মতো

বিচক্ষণ লোকের অবিদিত ছিল না, এবং সত্য বলতে কী, পারিপার্শ্বিক বিদ্বেষে তিনি বরাবরই একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ পেতেন। কিন্তু আশপাশের হিংসা উদ্রেক করার অনেক পদ্ধতি আছে, তার জন্যে মন-বাচক অলৌকিক বস্তুকে প্রশ্রয় দেওয়া অনাবশ্যক ; এবং যদি মাঝে-মাঝে ওই নামধেয় উপসর্গটাকে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর না-থাকে, তবু তার উৎপাতে দেহপাত হ'তে পারে, এমন আষাঢ়ে গল্পের কোনোই সার্থকতা নেই। তার চেয়ে এ মনে করা অনেক সহজ যে হরিচরণের মায়ের মতো কমজোর স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্ভধারণের কষ্ট দুঃসহ এবং পুত্রপালনের হাঙ্গাম মারাত্মক। অবশ্য এমন বিশ্বাসের সাহায্যেও তাঁর পত্নীবিয়োগের দায় হরিচরণের উপরে এসে পড়ে না। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতিতে আস্থাবান হ'লেও বিষ্ণুচরণ জানতেন যে কোনো-না-কোনোদিন অহৈতুককে আহ্বান করতে মানুষ মাত্রেই বাধ্য। তাই তাঁর বোধ হয়েছিল যে পৈত্রিক সম্পত্তিকে নিঃসঙ্কোচে উড়িয়ে দিতে যে-ছেলের এতটুকু ভাবতে হয় না, মাতৃহত্যার অপবাদ বহন করা তার পক্ষে সহজ ব্যাপার। বিকল্পে নিশ্চয়ই এ-কথা মনে করা যেত যে সোহাগ ও অনুকম্পাই হচ্ছে কোনো-কোনো জীবের প্রধান পথ্য, এবং এরা সচ্ছলতার অভাবকে যদিও বহুদিন পর্যন্ত উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে, তবু ওই দুটো নিঃস্বত্ব সামগ্রীতে একবার সত্যকারের অনটন পড়লে এদের আর কোনোমতেই বাঁচানো যায় না। কিন্তু বিষ্ণুচরণের পক্ষে এমনতর আশুক্লান্ত প্রাণীদের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভবপর হ'লেও, তাদের সহ্য করা কখনোই তাঁর সাধ্যে কুলাত না ; এবং যেহেতু জীবন-নির্বাহনীতির অনেকখানিই হচ্ছে দুর্বিষহকে এড়িয়ে চলা, তাই তাঁর দাম্পত্যজীবনে মমত্ববোধের নাস্তিত্ব তিনি কোনোদিনই অনুভব করতেন না।

অনুভব করলেও হয়তো বিশেষ ফল হ'ত না, কারণ হরিচরণের জন্মের ঠিক অনতিপূর্বে এবং পরে বিশ্রম্ভালাপ তো দূরের কথা, বিষ্ণুচরণ মরবার-সুদ্ধ অবকাশ পেতেন না। তখন প্রায়ই তাঁকে কাজে বেরুতে হ'ত ভোর ছ-টায়, স্নানাহার কোথায় ও কেমন ক'রে হ'ত তা অনেকসময়ে তিনি নিজেও মনে রাখতে পারতেন না, এবং রাত্রি দশটা বা এগারোটায় তিনি যখন শ্রান্ত দেহে ও সুপ্ত মনে বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রেমালাপ থাক্, চাকর ডেকে বেশ পরিবর্তন করাও প্রত্যহ তাঁর ঘ'টে উঠত না। তখন তাঁর মনে হ'ত ত্রিভুবনে কাম্য শুধু ঘুম, ঘুম, মৃত্যুর সহোদর ঘুম। বিষ্ণুচরণ স্বভাবকৃপণ ছিলেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের উপদ্রব তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু নিঃস্বপ্ন নিদ্রা যেহেতু মরণেরই নামান্তর, তাই উক্ত দৌরাত্ম্য তাঁকে মানতে হয়েছিল ; এবং তাঁর কর্মপ্রবৃত্তির ব্যাপকতা ছিল এতখানি যে সুপ্তাবস্থাতেও সাধারণত তিনি দেখতেন আয়-ব্যয়ের হিসাব। কিন্তু ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাঁর স্বপ্নের রূপান্তর ঘটত, তখন যে-দৃশ্য তাঁর মুদ্রিত চোখের সামনে ফুটে উঠত সে হচ্ছে কোনো এক অভাবনীয় হেমন্ত-সন্ধ্যার নিষ্করুণ নিঃসঙ্গতার ছবি। তখন তিনি দেখতেন এক অবাধ প্রান্তরের প্রান্তে একটা বরফের পাহাড় নীল আকাশের পানে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিচ্ছিল গাত্র অস্তগামী সূর্যকিরণে স্বর্ণাভ, এবং তাই বেয়ে তাঁকে ঊর্ধ্বে উঠতে হচ্ছে অতি সন্তর্পণে, প্রভূত পরিশ্রমে। তাঁর গন্তব্য হচ্ছে পাহাড়ের অভ্রভেদী চূড়া, কারণ সেখানে যে-শিশুটি মুখ ঢেকে তাঁর অপেক্ষা করছে, সে তাঁরই সন্তান। অথচ সে দুর্লভ, তার কাছে পৌঁছনোর পথ অসম্ভব-

রকমের দুর্গম, এবং এই দুরারোহ স্থানে উপনীত হ'তে হ'লে যে-পরিমাণে একাগ্রতার প্রয়োজন তা তাঁর নেই, নিচে থেকে উপহাসকের একটা অদৃশ্য দল অশ্লীল হাসি হেসে তাঁকে অন্যমনস্ক করিয়ে দিচ্ছে অনবরত। প্রতিবার ঠিক এইখানে এসে তাঁর স্বপ্ন ভাঙত, এবং ক্ষোভে, পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে রুদ্ধশ্বাস বিষ্ণুচরণ চোখ মেলে চাইতেন অন্তর ও বাহিরের অন্ধকারে।

তখন প্রায়ই আবার ঘুমনো সম্ভব হ'ত না, এবং জানলার দিকে তাকালেই অবিলম্বে বোঝা যেত যে দিনের কর্মনিষ্ঠা সুদূরপরাহত। কাজেই পার্শ্ববর্তী সুপ্ত পত্নীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তিনি আর কী করবেন ভেবে পেতেন না। কিন্তু এখানে যদিও একটা যান্ত্রিক জাগরণ উৎপন্ন করা শক্ত হ'ত না, তবু প্রাণের যথার্থ সাড়া পাওয়া ছিল একান্ত দুর্ঘট। খানিকক্ষণ নিরুৎসুক চেষ্টার পরে বিষ্ণুচরণ কীরকম একটা নির্বিশেষ বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়তেন, এবং তাঁর মনে হ'ত আদিরসের মধুরিমা একেবারেই রূপকথা। সময়ে-সময়ে তাঁর সমাহিত সংযমের পরতে-পরতে কীসের একটা অকথ্য অভিযোগ যেন ভ'রে উঠত, এবং উগ্র উষ্মার সঙ্গে তিনি ভাবতে শুরু করতেন যে কোনো দুর্গ্রহের ঋষ্টিতে তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেইজন্যেই তাঁর জীবনে পাশবিক খাটুনি আছে, নেই মানবীয় বিশ্রাম, স্ত্রী আছে, নেই সংসার, প্রভূত সম্পত্তি আছে কিন্তু সেই সম্পত্তি ভোগ করার উত্তরাধিকারী আজ পর্যন্ত অনাগত। তেমন রাতে অভ্যস্ত মিতভাষণ কেমন যেন তাঁর বুক চেপে ধরত, ইচ্ছা হ'ত অমানুষিক অত্যাচারে সুষুপ্ত রমণীর উদাসীনতা তিনি জয় করেন, এবং তারপরে তার দেহের ও মনের প্রত্যেক কণাটি অসহ্য বেদনায় জেগে উঠলে তাকে বলেন তাঁর প্রচ্ছন্ন জীবনের অসারতা, তাঁর বঞ্চনাবোধের দুঃখ, তাঁর দুরাশার অনির্বচনীয় উন্মাদনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এইধরনের অসংহত ভাবকে ভাষায় সংগ্রথিত করার সময় তিনি কোনোদিনই পেতেন না, কথার মাল্য সম্পূর্ণ হবার বহু পূর্বেই প্রত্যূষের সুস্থ আলোক আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ লজ্জা থেকে তাঁকে রক্ষা করত।

কিন্তু একদিন এই ভ্রান্তিবিলাস নাটিকার ক্রমানুবর্তনে কেমন একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা গেল, — সে তার শেষ অঙ্কে, প্রায় শেষ দৃশ্যে। আজ উনিশ বৎসর বাদে বিষ্ণুচরণের হঠাৎ মনে পড়ল যে, সেদিনে তাঁর ক্লান্তির মাত্রাটা ছিল অত্যধিক-রকমের বেশি এবং পরবর্তী নিঃস্বপ্ন নিদ্রার আর যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না, সেদিন তিনি প্রায় তাঁর আদর্শে পৌঁছেছিলেন, — এমন ঘুম তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল যার মধ্যে মৃত্যুর নিরুপধি নির্বাণ সমুদারভাবে পরিব্যাপ্ত, নেই কেবল মৃত্যুর ভয়। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা সার্বভৌম উপনিপাতের সংক্রমণ তাঁর মহানিদ্রা ভেদ ক'রে তাঁকে আবার জঙ্গম জগতে ফিরিয়ে আনলে। আজন্মসঞ্চিত সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে তিনি কোনো কষ্টে চোখ খুলে দেখলেন যে ব্যাপারটা আসলে অতি তুচ্ছ, এবং তিনি যে-আওয়াজকে বাইবেল-বর্ণিত প্রলয়শিঙার ধ্বনি ব'লে ভুল করেছিলেন, সেটা প্রকৃতপক্ষে তেমন ভয়াবহ কিছুই নয়, শুধু তাঁর স্ত্রীর প্রগাঢ় কণ্ঠস্বর। কিন্তু ঘুম তখনো তাঁকে এমন নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে মন, উপেক্ষা, টাকা ইত্যাদির মতো দু-একটা পরিচিত শব্দ কানে যাবার পরেও, এই বিচ্ছিন্ন কথাগুলোর

পরস্পরের সম্বন্ধ অথবা তাঁর পত্নীর বক্তব্যের মর্মার্থ, এ কিছুই তাঁর বোধগম্য হ'ল না ; শুধু সেই অর্ধজাগরিত অবস্থাতেও তাঁকে লক্ষ করতে হ'ল যে তার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে একটা অবর্ণনীয় সনির্বন্ধতার ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে, তার আপাতনম্র নিবেদনের পটভূমিতে একটা অপূর্ব দৃঢ়তার প্রতিভাস। তখন বিষ্ণুচরণের দেহ অবসন্ন, বুদ্ধি মূর্ছাগ্রস্ত, কিংকর্তব্য স্থির করার সাধ বা সাধ্য তখন তাঁর ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। কিন্তু তা থাকলেও তাঁর পরবর্তী আচরণে যে কোনোরূপ অন্যথা ঘটত, এ-কথা কল্পনা করা কঠিন ; কারণ তিনি ছিলেন সেই প্রাগৈতিহাসিক জাতের জীব যাদের আমরা মুখে বস্তুবাদী ব'লে ঠাট্টা করলেও, মনে-মনে কর্মবীর ব'লে শ্রদ্ধা করি, এবং এই শ্রেণীর লোকের কাছে মনের অকারণ উদ্বেগ শুধু নিরর্থ নয়, অবিদ্যমানও বটে। সুতরাং তিনি তাঁর সহধর্মিণীর বাক্যস্রোতকে কথার বাঁধে থামাবার চেষ্টাও করলেন না, কেবল তাঁর নিদ্রাগুরু হাতখানাকে পত্নীর কাঁধের উপরে কাতরে রাখলেন কণ্ঠাশ্লেষের কপটাভিনয়ে। তারপরে কী হ'ল তা আর ভালো ক'রে তাঁর মনে রইল না, কিন্তু কিছুদিন তাঁর দিশাহারা দিনান্ধ স্মৃতি কত শত অতল গহ্বরে কী অনুসন্ধান ক'রে ফিরলে, অন্ধকার আকাশের অসীমে কার অভিসারে ছুটল, এবং শেষকালে বিগলিত হ'য়ে মিশিয়ে গেল অব্যক্তির নিরুদ্দেশে। শুধু কেমন একটা পরাভববোধকে তিনি বহুদিন যাবৎ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না, এই অনুভূতি প্রথমে অসংহতরূপে উদয় হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর মূর্তি পরিগ্রহ করলে ; এবং এর অল্প পরেই তিনি যখন শুনলেন যে পত্নী অন্তঃসত্ত্বা তখন হিতবুদ্ধির অছিলায় অবিলম্বে শয়নকক্ষ পরিবর্তন ক'রে বিষ্ণুচরণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

তারপর? তারপর বিষ্ণুচরণ তাঁর পত্নীকে আর সহধর্মিণীরূপে দেখতে পারলেন না, তাকে দেখতে লাগলেন তাঁর পুত্রের প্রতিপালিকা-রূপে। এবং তাঁর জীবনে যেহেতু অবৈধতার তিলমাত্র স্থান ছিল না, তাই প্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত না-হ'লেও, তাঁর পক্ষে স্ত্রীসংসর্গ আর সম্ভব হ'ল না। সত্য বলতে গেলে এর জন্যে অবকাশও ক্রমশ ক'মে আসছিল। বিষ্ণুচরণের উদ্যম কলকাতার মতো প্রকাণ্ড শহরেও যেন দমবন্ধ হ'য়ে মারা যাবার উপক্রম করছিল, কাজেই তাঁকে তাঁর অতৃপ্ত কর্মপ্রবর্তনার খাদ্যসংগ্রহে বেরিয়ে পড়তে হ'ল কলকাতার বাইরে. বাংলার বাইরে, এমন-কি ভারতের বাইরে। ফলে বছরে অন্তত আট মাস তাঁর বিদেশে-বিদেশে কাটতে লাগল, এবং ঘরের জন্যে আর যে চার মাস বাকি থাকল. তাতে এমন একটি মুহূর্তও ফাঁক রইল না যা গৃহস্থালির অকিঞ্চিৎকর উদ্যোগে উৎসর্গিত হ'তে পারে। ইতিমধ্যে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে-খবর মাঝে-মাঝে পরোক্ষে তাঁর কানে পৌঁছতে লাগল, তাতে তিনি বিচলিত না-হ'লেও, চিন্তিত হলেন। কিন্তু ডাক্তার-বৈদ্যের অবিরত আনাগোনার পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়াতেও বিশেষ কোনো ফল ফলল না, এবং একদিন হঠাৎ মান্দ্রাজে তার পেয়ে, একটা বৃহৎ ব্যাপার অসম্পূর্ণ রেখে, কলকাতায় ফিরে তিনি শুনলেন যে তার পত্নী পূর্বরাত্রে নির্বিশেষ ব্যাধিতে মারা গেছেন। এই আকস্মিক আঘাতে তিনি আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলেন বললে ভুল হবে। কিন্তু বাইরে অটল অচল থাকলেও, ভিতরে তাঁকে কতখানি দুশ্চিন্তা সহ্য করতে হয়েছিল তা তাঁর আশপাশের লোকে মোটে ধারণাতেই আনতে পারেনি।

আজ ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে কণ্টকিত শয্যায় শুয়ে-শুয়ে বিষ্ণুচরণের মনে হ'তে লাগল যে সেদিনে তিনি মৃত স্ত্রীর জন্যে শোক না-ক'রে যে জীবিত পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন, তা সর্বতোভাবে সার্থক ও সঙ্গত। এটা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ যে শোক জিনিসটা অপচয়েরই অন্তর্গত, যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার সাহায্যে অতীত আবার বর্তমান হ'য়ে ওঠে, তার মধ্যে সাশ্রু মমতার সংস্পর্শ আদৌ নেই ; এবং এটাও হয়তো বিচার্য যে অতীত ব'লে সত্যই কিছু আছে কি-না। কারণ যাদের আমরা বিগত ব'লে ভেবে থাকি, তারা তো আসলে অনুপস্থিত নয়, কেবল তাদের দেহই অদৃশ্য হ'য়ে যায়, পিছনে প'ড়ে থাকে তাদের শত্রুতার উত্তরাধিকার, তাদের স্বতন্ত্রতাই অলক্ষ্যে মিশোয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিতার দুঃসহ বিরোধ তারা বংশানুক্রমে ঘনীভূত করতে থাকে, অস্ত্রবাহক হয়তো মরে কিন্তু মরার আগে তারা তাদের ধনুর্বাণ তুলে দিয়ে যায় সন্তানের হাতে। বিষ্ণুচরণ সহসা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, এবং বেশ জোর গলায় পারিপার্শ্বিক নীরবতাকে শুনিয়ে বললেন : 'না, তা কখনোই হ'তে দেব না, আমার বাড়িতে অন্তর্বিরোধের আর জায়গা নেই, আমি যদি টাকা ছাড়া আর কিছু না-বুঝি, তবে আমার আশ্রয় যারা চাইবে তাদেরও শুধু বুঝতে হবে টাকাকে।'

৩

পরদিন প্রাতে যখন পিতাপুত্রের সংবাদ ঘটল, তখন হরিচরণ পূর্বরাত্রের অশরীরী যুদ্ধবিগ্রহের খবরটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না। কিন্তু আকস্মিক দিব্যদৃষ্টির আশীর্বাদে সে যদিই-বা পিতার অলক্ষ্য ক্ষতের সন্ধান পেত, তবু তার ব্যবহারে যে কোনো বৈষম্য দেখা যেত, তা মনে করা কঠিন। কারণ জীবনে এই প্রথম সে ভয়মুক্তির উদগ্র উন্মাদনায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য যথাসময়ে দেখা গেল যে উক্ত অসমসাহসিকতা ততটা তার মজ্জাগত হয়নি, যতটা হয়েছিল মুখস্থ। কিন্তু সেই ভ্রান্তিবিনাশের পালার উপরে যবনিকা নামতে তখন ঘণ্টা-খানেক দেরি ছিল, এবং ইতিমধ্যে হরিচরণ পিতার হাবভাবে এমন কোনো অপ্রত্যাশিত রূঢ়তার ইশারা দেখলে না, যার ধাক্কায় তার তন্দ্রাচ্ছন্ন সদ্‌বুদ্ধি সচকিত হ'য়ে উঠতে পারে। এটা মানতেই হবে যে তার মধ্যে যত দোষই থেকে থাকুক্-না-কেন, মূঢ়তা সেগুলোর একটা ছিল না ; এবং জীবনের কোনো অংশেই মহাশত্রুরাও তাকে হঠকারী ব'লে ভাবতে পারেনি। কিন্তু ষোলো থেকে বিশ-বাইশ পর্যন্ত বিপজ্জনক বয়সটায় মানুষ মাত্রের মনেই একটা স্বপ্ন-প্রবণতা দেখা যায়, এবং এইসময়ে হরিচরণের স্বাভাবিক বিঘ্নবিদ্বেষও মাঝে-মাঝে ফাঁকা কথার স্ফীত আওয়াজে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে পড়ত। অবশ্য সাংসারিক হিসেবে আত্মবিস্মৃতি ক্ষণিকের হ'লেও, তা অমার্জনীয়, এবং এটাও সত্য যে তার জীবনের এই একমাত্র সঙ্কটে সে যদি মাথা ঠান্ডা রেখে চলত, তবে হয়তো তার অবাধ ভোগস্পৃহার অভিলষিত পরিতৃপ্তি অতখানি পিছিয়ে যেত না। কিন্তু এখানেও তার সপক্ষে বলবার কথা ছিল বিস্তর, এখানেও আমরা মানতে বাধ্য যে পদস্খলনের যতখানি প্ররোচনায় দুর্গতি তার যতটুকু ঘটেছিল, জনসাধারণ তত সহজে কর্মফল থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

তাছাড়া এ-প্রসঙ্গে হরিচরণের চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় জানলেই যথেষ্ট হবে না, মহেন্দ্রবাবুর

অলৌকিক বাক্‌প্রতিভারও উল্লেখ করা চাই। জগতে প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষ একদিকে বঞ্চিত হ'লে, অন্যদিকে সে অতিরিক্ত মুনাফা পায়। কাজেই সর্ববিষয়ে অকর্মণ্য মহেন্দ্রবাবু যে অন্তত ভাষাব্যবহারে একটা অভূতপূর্ব নৈপুণ্য অর্জন করবেন, কেবল এই ঘটনার মধ্যে আশ্চর্যকর কিছুই নেই। এর ভিতরে যেটা বিস্ময়াবহ সে হচ্ছে তাঁর শব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্যহীনতা, তার অদ্ভুত রিক্ততা ও অচিন্ত্য নিরপেক্ষতা। লোকে অনেকসময়েই নিছক আলাপের খাতিরে কথা কয় বটে, কিন্তু বাক্যের পিছনে যে বস্তুর পটভূমি আছে, তা চেষ্টা ক'রেও তারা ভুলতে পারে না। মহেন্দ্রবাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি চেষ্টা ক'রেও সেই নির্বিকার নির্দেশের দিকে মন দিতে অক্ষম হতেন। তাঁর বাগ্মিতা ছিল আধুনিক যুগের বিশুদ্ধ কাব্যের মতো, যার সাহায্যে শ্রোতার চিত্ত কোনো প্রকৃত বস্তু বা তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, হয় শুধু আমন্থিত, ধ্বনিবিজ্ঞানের সার্বজনীন নিয়মানুসারে। সম্ভবত মানুষের ইতিহাসে এইরকমের লোকেরাই আবহমানকাল গণপতি হ'য়ে এসেছেন। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে মহেন্দ্রবাবুর গম্ভীর কণ্ঠ যখন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার নামে জীমূদমন্দ্র ক'রে উঠত, তখন হরিচরণের সর্বাঙ্গ যেত পুলকাঞ্চনে [?] ভ'রে ; তখন অর্থের বা সঙ্গতির সন্দেহমাত্র তার শূন্য মস্তকে প্রবেশ করত না, শুধু তার স্ফীত ধমনীর মধ্যে ছুটে বেড়াত একটা উদ্দাম উৎসাহের উদ্দীপ্ত বিদ্যুৎ। তখন সে যদি অভিধানের সাহায্যে মহেন্দ্রবাবুর আকাশবাণীর অর্থ বুঝতে চাইত, তবে হয়তো সে দেখতে পেত যে তাঁর বর্ণিত জগতে দুঃখ, দৈন্য ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই নেই ; কিন্তু দৈহিক প্রতিক্রিয়ার প্রসাদে যে-জগতের ছবি আপনা-আপনিই তার মানস-নয়নে ফুটে উঠত তাতে সে কেবল পেত সাধনাশূন্য সার্থকতার সন্ধান। সৌভাগ্যক্রমে হরিচরণের জাগ্রত সুপ্তাবস্থা বেশিক্ষণ টিঁকত না ; কারণ তার সঙ্কীর্ণ স্বপ্নলোকের প্রত্যন্ত দেশে ছিল তার পিতার প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য ; এবং সে বহু অভিজ্ঞতার ফলে শিখেছিল যে তার নিজের শাসনতন্ত্রকে নিরাপদ করতে হ'লে ওই প্রতাপশালী প্রতিবেশীর বশ্যতা প্রকাশ্যে স্বীকার করাই একমাত্র পন্থা।

কিন্তু এবারে নগদ-বিদায়ের অভাবে এবং স্নেহ, প্রশংসা, ও হুইটম্যানের আধিক্যে সে তার মৌলিক হিতবুদ্ধিকে প্রায় হারাতে বসেছিল। সেই প্রজা-সংক্রান্ত ব্যাপারের পরে দু-একদিন সে মনে শান্তি পায়নি। কিন্তু পরিণামচিন্তায় বহুকাল বিমর্ষ হ'য়ে-থাকা এমনই তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল যে গুরুদীক্ষা থেকে উপযোগী সান্ত্বনা সংগ্রহ করতে তার দেরি লাগেনি। সেদিন বোট্যানিক্যাল গার্ডনে সেগোপামের বীথিকায় শরতের স্বর্ণ-সায়াহ্নে বেড়াতে-বেড়াতে মহেন্দ্রবাবু সক্রেটিসের নাম নিয়ে তাকে বলেছিলেন : 'অকপট আত্মপরীক্ষা ক'রে যে-কাজটাকে ঠিক ব'লে বুঝেছ, তার ফলাফল সম্বন্ধে কখনো উদ্বিগ্ন হ'য়ো না। মানুষের চৈতন্য একটা বৃহত্তর চৈতন্যের অংশ মাত্র, আর সে-চৈতন্য যখন অনবদ্য তখন মানুষও যদি আপনার শুদ্ধ চৈতন্যের নির্দেশে কোনো কাজ করে তবে তার পরিণাম মঙ্গলময় হ'তে বাধ্য। এইজন্যেই প্রাচীনেরা মানুষকে আত্মজ্ঞ হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন, এইজন্যেই তাঁরা বলেছিলেন যে ধর্ম আর জ্ঞানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কারণ যা ভালো সে-সম্বন্ধে আর তর্ক চলে না, তা তোমার কাছেও ভালো, তোমার পিতার কাছেও তাই, সেই ভালোকে

জানবার জন্যে দরকার শুধু জ্ঞান ; শুধু আত্মজ্ঞান।' তার সহজজ্ঞান তাকে এত সহজে দ্বন্দ্বাতীত কল্যাণের সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে দিয়েছে, এটা জেনে হরিচরণ যদিও একটা তীব্র আত্মপ্রসাদ অনুভব করলে, তবু কথাগুলোর জন্যে সে মহেন্দ্রবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ হ'তে পারলে না। হয়তো স্বজ্ঞার প্রতি তার আস্থা ছিল না ব'লেই সে ভাবতে লাগল যে উক্ত মঙ্গলময় আত্মজ্ঞান কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা মহেন্দ্রবাবুর মতো কাণ্ডজ্ঞানে একেবারে বঞ্চিত। কিন্তু এই সন্দেহটাকে ভেঙে বলার প্রয়োজন সে দেখলে না, তাই অভিযোগের সুরে মুখে বললে : 'বাবাকে তো আর আপনি চেনেন না, সেইজন্যে ও-কথা বলছেন। আমার কিন্তু প্রায়ই সন্দেহ হয় যে তাঁর ভিতরে মামুলি রক্ত-মাংসের লেশ পর্যন্ত নেই। জগতে যে টাকা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে, জীবনে যে ভালো-মন্দের লড়াই সদাসর্বদা চলছে, এমন আশঙ্কা একবারের তরেও তাঁর মনে আসে না। তাঁর কাছে সুবিচারের আশা — হুঁ।' উত্তরে মহেন্দ্রবাবুর অশ্রুরুদ্ধ চোখ অস্তগামী সূর্যের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল ; আবেগকম্পিত ডান হাতখানিকে ছাত্রের স্কন্ধে রেখে তিনি অপূর্ব করুণার স্বরে বলেছিলেন : 'তা যদি হয়, তবু দুঃখ ক'রো না, হরিচরণ ; যীশুর প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ক'রে ভগবানকে তোমার পিতার অজ্ঞানতা ক্ষমা করতে ব'লো। এটা যেন সবসময়ে মনে থাকে যে সৃষ্টির শুরু থেকে সকল মহাপুরুষকেই এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এই অগ্নিপরীক্ষায় তুমিও যদি পবিত্র হ'তে পার, তবে তোমার স্থানও হয়তো হবে সেই প্রাতঃস্মরণীয় দলে। তখন তোমার পিতার একলার যে-স্নেহ তুমি হারাবে, তার লক্ষগুণ, কোটিগুণ ভালোবাসা তোমায় দেবে বিশ্ববাসী। আর যখন বিপদ চারদিক থেকে ছেঁকে ধরবে, তখন মনকে কোনোমতেই ভুলতে দিয়ো না যে শুধু দেবপ্রিয়েরাই মারা যায় অল্পবয়সে, যে কেবল যোগ্যকেই ভগবান ডাক দেন সঙ্কটের মধ্যে। এটা তোমার দুঃসময় নয়, হরিচরণ, এটা সুযোগ, সুযোগ, তোমার জীবনের প্রথম মাহেন্দ্রক্ষণ।'

এরপরের সাতদিন হরিচরণ কথা বলার আর বড়ো একটা ফাঁক পায়নি, তাকে কেবল কান পেতে থাকতে হয়েছিল মহেন্দ্রবাবুর জাগরূক ভাবসমুদ্রের দূরাগত উদাত্ত গর্জনে। ক্রমশ এই শান্তিপ্রদ বাক্যস্রোতের অবিরাম কল্লোলে সে এমনই অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ল যে শেষের কয় রাত্রি তার অভাবে সে যেন আর ঠিকমতো ঘুমুতে পারলে না। মানুষকে তলিয়ে দেখার তাগিদ সে যদিও কখনোই অনুভব করেনি, তবু পিতার চিন্তাধারার সঙ্গে তার ছিল প্রাক্তন পরিচয়। বিষ্ণুচরণের মতো সে-ও অন্তরে-অন্তরে জানত যে সর্বহারাদের সঙ্গে তার প্রভেদ জন্মগত, এবং এই প্রভেদকে আবহমানকাল বজায় রাখাই তার কর্তব্য আর ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কিন্তু পিতা যেখানে মনোভাবকে চাপা দেওয়া দরকার মনে করতেন না, পুত্র সেখানে আত্মপ্রসাদ পেত উদারতার অভিনয়ে। তার গুরুভক্তি এই আত্মপ্রসাদ থেকেই উৎপন্ন কি-না, তা কে বলতে পারে? বুদ্ধি দিয়ে না-বুঝলেও, সে হয়তো অবচেতনার সাহায্যে জেনেছিল যে সমাজে মহেন্দ্রবাবুর মতো মরীয়াদের সংখ্যাই অধিক ; সুতরাং তাদের চটালে চলবে না, তাদের ভাবতে দিতে হবে যে আসলে তারাই জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তাদের পরামর্শ না-পেলে, তাদের সমর্থন-ভিন্ন সমাজপতিদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হ'ত। কিন্তু

তাহ'লেও সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে, এবং মহেন্দ্রবাবুর মতো আশুতোষ মানুষকে খুশি করার জন্যে আয়কর সম্পত্তির অবমাননা যে অপব্যয় এমন একটা আশঙ্কা তাকে পেয়ে বসেছিল। অবশ্য এরপরে মাস্টারমশাই যে আজীবন তার কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবেন, সে-বিষয়ে হরিচরণের এতটুকু সন্দেহ ছিল না ; এবং তার চতুর আচরণে মহেন্দ্রবাবুর মতো বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়তে পারে, তবে বিষ্ণুচরণের মতো স্থূল প্রকৃতির মানুষকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসা তার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। এখানে যদি সে জয়ী হ'তে পারে, তবে একটা সামান্য সম্পত্তির কয়েকদিনের আয় ছেড়ে দেওয়া যে শুধু সঙ্গত নয়, অবশ্যকর্তব্যও, তা হরিচরণ অনায়াসেই বুঝেছিল ; এবং বুঝেছিল ব'লেই তার মনে হচ্ছিল যে মহেন্দ্রবাবুর নিঃসার সান্ত্বনাবাক্য ব্যতীত সে কোনোমতেই বাঁচবে না।

[05 সেপ্টেম্বর 1932] [অসম্পূর্ণ]

বিলেত-যাত্রা

সে আজ অনেকদিনের কথা ; মনে হয় যেন সে আরেক যুগের কাহিনী। কতদিন আগে তা স্মরণে থাকলেও বলব না, কারণ তাহ'লে আমার বয়সের সঠিক খবরটা দেওয়া হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি যে তখন ছেলেমানুষ বললে ক্রোধে জ্ব'লে উঠতুম ; আর আজ যদি কেউ বয়সটা এক বছরও কম মনে করে তো তার পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছা হয়।

আমি অনাথ। মায়ের প্রাণের উপাদানে আমার প্রাণের গঠন। শুনেছি, বাবার আর মায়ের প্রীতিবন্ধন এতই সংহত ছিল যে বর্ষনেমির একবার সম্পূর্ণ বিবর্তনের পূর্বেই বাবাও মার অনুবর্তী হলেন। আমি রইলুম পাছে ; আমায় প্রতিপালন করবার ভার রইল জ্যাঠাইমার উপর। জ্যাঠাইমার সন্তান-সন্ততি ছিল না ; কাজেই সেই বিরাট বুকের সঞ্চিত মাতৃস্নেহের অধিকারী হলুম একা আমি। তিনি একদিনের তরেও আমায় জানতে দেননি, আপনার মায়ে আর পালিত[কা] মায়ে কী তফাৎ। বলাই বাহুল্য, আমার ভাগ্যে আদরের একটু আধিক্য ঘটেছিল।

জগতের নিয়ম হচ্ছে যে একদিকে পর্যাপ্তি হ'লে, অপরদিকে বঞ্চিত হ'তে হয়। আমার পক্ষে এই সত্যটা সম্পূর্ণ ঠিক না-হ'লেও, কতক পরিমাণে ফলেছিল। জ্যাঠামশাইও আমাকে ভালোবাসতেন ; কিন্তু জ্যাঠাইমার স্নেহে যে-অবিচলতা, যে-অতলস্পর্শিতা ছিল, জ্যাঠা-মশায়ের বাৎসল্যে সেটার অভাব উপলব্ধি করতুম। তাঁর স্নেহ পার্বত্য নদীর মতো চপল, ফেনিল, মুখর কিন্তু অগভীর। তা ব'লে কেউ যেন মনে না-করেন যে আমি যখন যা-চেয়েছি তখন তা পাইনি। মোটেই না ; একরকম বলতে গেলে বাল্যে আমাদের গৃহস্থলীতে আমার ইচ্ছাই ছিল আইন। বোধ করি জ্যাঠামশাই মাঝে-মাঝে বুঝতেন যে এটা আমার পক্ষে ভালো হচ্ছে না ; কিন্তু গৃহিণীর বিরক্তির ভয়ে আমায় বাধা দিতে সাহসী হননি।

আমরা মফস্বলে থাকতুম। বিশ-ত্রিশ বিঘে বাগানের মাঝে একতলা বাড়ির চিত্র আজও আমার মনে বেশ স্পষ্ট রয়েছে। পড়াশুনার হুড়ো ছিল না। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর জ্যেঠাইমা প্রকাশ্যে ঘুমুতে যেতেন আর জ্যাঠামশাই একটা মস্ত চুরুট জ্বালিয়ে, আরাম-কেদারায় শুয়ে, খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঢুলতেন ; আমায় বই নিয়ে, অঙ্কের খাতা নিয়ে পড়তে বসতে হ'ত। জ্যাঠামশায়ের চুরুটটি ছিল আমার মুক্তির নিশানা। যখন দেখতুম, সেটা সহসা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেল তখনি বুঝতুম যে আমার কষ্টের অবসান হয়েছে, তিনি সুখতন্দ্রাগত। অমনি আমার চোখের সঞ্চিত জড়িমা কেটে যেত, অঙ্কের খাতার

পাতাগুলি নিয়ে হাওয়া খেলা শুরু ক'রে দিত ; রাজভাষা দারুণ অপমানে ধূলায় গড়াগড়ি খেত ; আর আমি কেঠো চেয়ার ছেড়ে আমবাগানের স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় তৃণাসনে শুয়ে স্বপ্নসৌধ বিরচনে বিভোর হতুম।

আমার প্রথম আদর্শ হচ্ছে একজন দ্বিতীয় নেপোলিয়ন হওয়া। বেশ মনে পড়ে টিনের তলোয়ার কাঁধে ক'রে মাটির কেল্লা জয় করা। তখন যদি কেউ আমায় বলতেন যে যুদ্ধ আমার যোগ্য পেশা নয়, তাহ'লে তদ্দণ্ডে সেই টিনের কৃপাণে তাঁর মাথা ছিন্ন না-করি, অন্ততঃ দীর্ণ ক'রে দিতুম। কিন্তু আজ যদি ধানি পটকার আওয়াজ শুনি তো ছুটে গিয়ে গৃহের কোণে শশকের মতো মুখ লুকাই। একবার জ্যাঠাবাবুর মুখ থেকে ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী শুনে বিপুল হর্ষে ঠিক করেছিলাম যে অপরাধীর অনুসন্ধান ক'রেই জীবনযাপন করব। তখন অপরাধ সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলা সরল ছিল ; আজ কে অপরাধী, কে বিচারক এ-বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ জাগছে। আর আজ ডিটেক্‌টিভ্ তো দূরের কথা, এখন লাল রঙের আভাস পেলেই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। এইরকম কত আকাশকুসুম যে আমার চোখে ফুটে উঠত তার আর সংখ্যা নেই। তবে যা কখনো হ'তে চাইনি সেগুলা মনে আছে। খেলনাপসারী হবার সাধ কখনো হয়নি। তার কারণ বোধ করি আমার খেলনার প্রাচুর্য। প্রতি শনিবার-শনিবার কলকাতা থেকে আমার জন্য নূতন-নূতন খেলনা আমদানি হ'ত। অপর যেটা হ'তে চাইনি সেটা হচ্ছে রূপকথার রাজপুত্তুর। ঠিক কেন হ'তে চাইনি তা বলতে পারি না। বোধহয় রূপকথা বেশি শুনতে পেতুম না ব'লে। কিন্তু আজ যদি কোনো জিনিস আমার একান্ত সাধের হয় তো সেটা হচ্ছে সর্বজয়ী রাজপুত্তুরের মতো চিরকিশোর থাকা।

এমনি কত মহাপুরুষ, অন্ততঃ তখন মনে করতুম মহাপুরুষ, আমার মধ্যে দিয়ে ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠল, আবার পলকে মিলিয়ে গেল। সেই অমর কবির চিরন্তন পদটি

"কত না কুসুম অলখিতে হায়,
মরুর বাতাসে শুকাইয়া যায়"—

আমার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য, যদি "কুসুম" অর্থে আকাশকুসুম, "অলখিতে" অর্থে আমি ছাড়া অপরের অদর্শনে আর "মরুর বাতাস" অর্থে মধ্যাহ্নের উষ্ণ হাওয়া এইরূপ টীকা ক'রে নেওয়া যায়। মাঝে-মাঝে ভাবি, সেই দারুণ দুপুর-রোদ্দুরে কী ক'রে বাগানে শুয়ে থাকতুম। তখন অবশ্য "ঠিক দুপ্পুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা" বাক্যটার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করিনি। বিনিদ রাতই তখন এই শ্রেণীর প্রাণীদের জন্য আলাদা ক'রে রাখা ছিল ; দুপুর ছিল ভবিষ্যতের স্বামিত্বে। কিন্তু আজকে নিঃসুপ্তি, রাত্রির তো কথাই নেই, নিরিবিলি মধ্যাহ্নেও তারা দলে-দলে এসে পঙ্গপালের মতো আমায় ছেঁকে ধরে। জ্যাঠামশাই কাগজ দিয়ে মুখ ঢাকতেন আমায় আড়াল করবার জন্যে নয়, কেবল এই ভূতের ভয়ে, এটা আজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

তারপর একদিন শরৎ-সন্ধ্যায় মে[হে]দি ঝোপের মধ্যে ব'সে কী একটা কল্পনায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অস্তমেঘের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের প্রথম সাড়া আমার বুকে পৌঁছুল। আর সকল আদর্শ, সকল স্বপ্ন, সকল ধ্যান খ'সে প'ড়ে গেল, জেগে রইল ওই এক কামনা, ওই এক

আকাঙ্ক্ষা, ওই এক তৃষ্ণা, বড় হ'য়ে বিলেত যাব। বিকার শিশুর অধিকার সত্য বটে, কিন্তু আবার স্থিরত্ব এবং নিসংশয়তাও তার বিশেষত্ব। এই দিন থেকে বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না ; যদিও সেখানে গিয়ে কী করব, কী হব এইসব ক্ষুদ্র কথাগুলির বিষয় আমি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত রইলুম। আজকে হ'লে হয়তো সাতবার ভাবতুম অজানা জায়গায় আমার স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো হানি হবে কি-না : সেখানে গিয়ে আর কী লাভ, একটা লেজ হবে না তো ; তবে মিছে পয়সা খরচ ক'রে আর কী হবে ; সেই বিষম শীতে হয়তো-বা নিউমোনিয়া হবে ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বালক অজানিতকে, নূতনকে ভয় পায় না। তাতেই তার আনন্দ, তাতেই তার উল্লাস, তাতেই তার আশা-ভরসা সকল কিছু নিহিত রয়েছে। অচিনকে সন্দেহের চোখে দেখে প্রৌঢ়।

আমার ধারণা যে-আগুন অপর সকলকে গ্রাস ক'রে আমার মনে জ্ব'লে উঠেছিল তা-ও অন্যান্য বহ্নির মতোই নির্বাপিত হ'ত। হয়তো কিছুদিন বেশি থাকত, কিন্তু নিবতই-নিবত ; কারণ চিরদিনই আমার মধ্যে একাগ্রতার অভাব। কিন্তু তা হ'ল না ; যখনই নির্বাণমুখ হ'ত, জ্যাঠামশাই তাতে ঘৃতাহুতি ঢেলে আবার তাকে বাড়িয়ে তুলতেন। কাজেই সেটা মাঝে-মাঝে ছাই চাপা পড়েছে বটে, কিন্তু মরেনি। আমি যখনই কিছু একটা অনুচিত কাজ করতুম শুনতুম যে, এমন করলে আমার বিলেত যাওয়া ঘটবে না ; বিলেত ভূস্বর্গ বিশেষ ; সেখানে সকলই পূর্ণ ; ছেলেরা লক্ষ্মী, শান্ত, বয়স্থেরা রাগবিহীন, দয়ালু ; এই বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল।

এতদিন সন্ধ্যা ছিল জ্যাঠাইমার কাছে দাবি করবার জন্য ; কিন্তু এখন থেকে সে-সময় জ্যাঠাবাবুর কাছে দরবার করতে যেতাম বিলেতের গল্প শুনবার অভিলাষে। জ্যাঠাবাবুর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তিনি অনুর্বরকে উর্বর করতে পারতেন, ছোটোকে বড়ো করতে পারতেন। তাঁর হাতে ক্ষীণ চারা কৃত্রিম ডালপালা সংযুত হ'য়ে প্রাচীন বটের আকার ধারণ করত। আমার মনে হয় তিনি ছেলেবেলা থেকে চেষ্টা করলে একজন মস্ত কবি হ'তে পারতেন। হয়তো কথাটা অতি সামান্য, আমি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হব। কিন্তু সেই দক্ষ শিল্পীর স্পর্শে জাহাজে প্রথম পদার্পণের দিন থেকে আমার জীবনের সুপক্ক কলি অবধি ফুটে উঠত। সেই কাঠামোর উপর কত রং-বেরঙের কারুকার্য রচিত হ'ত ; যথা ডানাকাটা পরীর সঙ্গে বিবাহ, গৃহ আলোকিত ক'রে পুত্ররত্নের জন্ম, এবং পরিশেষে একটা লাট, লুট কিছু হওয়া; এর মাঝে থাকত আদালতে একছত্রত্বের ইতিহাস, ভবিষ্যতের স্ফটিক প্রাসাদের কথা, দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের গল্প, আমার কাছে অতীত-বন্ধুদের উমেদারির কাহিনী। এমন-কি পৌত্র-পৌত্রীদের জীবনীও বাদ যেত না। একটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম আমি যা-হওয়াই ধার্য করি-না-কেন, আমার উৎকর্ষ অনিবার্য। তাঁর চক্ষে, বেশি না-হোক্ আধ ঘণ্টার জন্যও, আমি সর্বশক্তিমান হ'য়ে উঠতাম।

আগে ভাবতুম আমার বিলেত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে প্রণোদিত ক'রে তিনি কাপট্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আজ বুঝেছি যে সে-সময় আমায় বিলেত পাঠাতে সত্যই তাঁর ইচ্ছা ছিল।

তাঁর মধ্যে সাহেবিয়ানার একটা প্রবল প্রয়াস দেখতে পেতুম। চালে-চলনে, আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, খাওয়াদাওয়ায়, পোশাক-আশাকে তিনি ছিলেন পাকা সাহেব। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল মুসলমানি আমলের পণ্ডিতদের মতো,—যাদের একঘরে করাই ছিল কার্য, নিবারণেই ছিল আনন্দ, উদারতাতেই ছিল আতঙ্ক, সঙ্কীর্ণতাই ছিল পোষ্য। কাজেই তিনি স্বদেশী দীনতাগুলি ছাড়তে পারেননি, আর বিদেশী মহত্ত্বও নিতে পারেননি। ফিরিঙ্গিয়ানা ছিল তাঁর খোলস, স্মার্ত্যয়ানা তাঁর মজ্জা। মানসিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইউরেশিয়ান। পোশাক যতদিন নূতন থাকে, ততদিন তাতে শীত, তাপ আটকায়। তাঁর বয়স যতদিন অল্প ছিল, রক্ত গরম ছিল, দেশী কুসংস্কারগুলো বর্তমান থাকলেও ছিল প্রচ্ছন্নভাবে ; কিন্তু পরদেশী অন্তরটা যতই জীর্ণ হ'তে লাগল, গোঁড়ামিটা ততই প্রস্ফুটিত হ'য়ে চলল। অবশেষে তিনি সেই পুরানো যাত্রাস্থলীতে ফিরে এলেন যে কালাপানি পার হ'লে হিন্দুর হিন্দুত্বের হানি ঘটতে পারে। আমি বলছি না তাঁর জাত যাওয়ার ভয় ছিল ; কারণ তিনি জাত-বিচারকে কুসংস্কার ব'লে ভাবতেন ; কিন্তু সপ্তসিন্ধুর পরপারের দৈত্যপুরী বেচারা বাঙালি-সন্তানের পক্ষে বিপদসঙ্কুল এ-কথা তিনি মানতেন, যদিচ তাঁর ভয়ের নিদান স্বয়ং দৈত্য, কি দৈত্য-পত্নীরা তা আমি ঠিক করতে পারিনি। আমার জ্যাঠামশায়ের জীবনীতে হিন্দুধর্মের অবিনশ্বরতা প্রমাণিত। নব্যতন্ত্রীরা হয়তো বলবেন, "তা নয় ; তাঁর ইতিহাস হচ্ছে স্বভাবের চরম বিজয়ের কাহিনী।"

২

মন্থর গতিতে দিন যায়, আমার উৎসাহ বর্দ্ধিষ্ণু বেগে চলে, জ্যাঠামশায়ের আগ্রহও অল্প-অল্প ক'মে আসে। ক্রমশঃ তাঁর মনে সন্দেহের বীজ প্রবেশ করলে ; দিন-কয়েক পরে সেগুলো অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠল, সময়ের গমনের সঙ্গে-সঙ্গে শাখা-পল্লব ছড়িয়ে গেল। শৈশব ছাড়িয়ে এখন কৈশোরে এসে পৌঁছেছিলুম ; তাই তাঁর সঙ্গে গল্প করার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে যখন বিলেত যাওয়ার প্রসঙ্গের কথাবার্তা হ'ত, তখন আর আমার আগামী-জীবনের অব্যর্থ উন্নতির উপর তাঁর সেই প্রাচীন বিশ্বাস খুঁজে পেতুম না। এখন শুনতুম কর্মহীন ব্যারিষ্টারের দুঃখ ; বিলেতি শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ; কাঁচাবয়সে বিদেশ যাওয়ার ফলাফল, ইত্যাদি নানারূপ কথা।

কথা হয়েছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রে আমি বিলেত যাব। পরীক্ষায় আমি চিরদিন অপটু। হয়তো-বা একটা বিষয় আমি মাঝারিরকমের জানি ; কিন্তু যখন সেই ছাপা রং-বেরঙের কাগজের টুক্‌রাগুলি কৃষ্ণ দন্তরুচি বিকাশ ক'রে আমার পানে চেয়ে হাসে, তখন হৃদয়ে সঞ্চিত দৌর্বল্যই জেগে উঠে,—যা-জানি যা-না-জানির মধ্যে লুপ্ত হয়। পরীক্ষকদের বিচক্ষণতারূপ কষ্টিপাথরে আমার খাদেরই পরখ হয়েছে, সোনার ভাগটা ধরা পড়েনি। বোধ করি এই খাদের প্রাচুর্যের জন্যই জীবনের অনেক কঠোর ব্যবহার সহজেই সইতে পেরেছি। যে-সব খাঁটি সোনারচাঁদ ছেলেরা তাঁদের মনে বিশুদ্ধত্বের চিহ্ন এঁকেছিল তারা তেমন ব্যবহৃত হ'লে এতদিনে বেঁকে তেউড়ে যেত।

সে যাই হোক্, সেবার প্রবেশিকা আমি ভালো ক'রেই পাশ করলুম। প্রথম শ্রেণীর ছাপ সোৎসাহে ব'য়ে জ্যাঠামশাইকে "গেজেট" দেখাতে গেছলেম। সে-গৌরবটীকা অদ্যাবধি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে পারিনি।

তা দেখে জ্যাঠামশাই একটু মৃদু হেসে বললেন, "খুব ভালো, আশীর্বাদ করি চিরকাল এমনি ক'রে বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।" তখন বুঝিনি আজ বুঝেছি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে গেলে নিজের মুখ কালো করতে হয়। তিনি কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, "কলকাতায় একখানা ছোটো বাড়ি নিয়েছি। আমার বন্ধু শরৎ সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবে ; তুমি দু-একদিনের মধ্যেই এখান থেকে রওনা হ'য়ো।" আমি তো অবাক, জিজ্ঞাসা করলুম, "কিসের বাড়ি ?" তিনি উত্তর করলেন, "আমার মনে হ'ল মেসে থাকতে তোমার কষ্ট হবে তাই বাড়ি নিয়েছি।" আমি আরো বিস্মিত, "মেসে থাকতে গেলুম কেন ?"

"কলেজে যেতে হবে না ? ম্যাট্রিক দিয়েই কি পড়ার পালা শেষ হ'য়ে গেল নাকি।"

"না, পড়ার পালা শেষ হয়নি, তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা শেষ হ'য়ে গেছে।"

"দেখো, তোমায় এতদিন বলিনি, তোমার এক্‌জামিনের পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে ; আমি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি, যে এত অল্পবয়সে তোমার বিলেত যাওয়া হ'তেই পারে না। আই.এ. পাশ করো, তারপর দেখা যাবে। এখন তোমার মন নরম, তাতে অনায়াসেই মন্দের ছাপ লাগতে পারে। আর দিন-কতক বাদে মন শক্ত হ'লে যেও।"

কাঁচা মাটি বিকৃত হ'লেও করুণ করের স্পর্শে সহজেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কাঁচা মনের রেখা অনুতাপের অশ্রুতে ধৌত হ'য়ে যায় ; কিন্তু শুকনো হ'য়ে গেলে অল্পাঘাতেই তা চূর্ণ হয় ; এ-কথা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করিনি কারণ তখন তা আমি নিজেও জানতাম না। আমি নিরুত্তরে নৈরাশ্যের বোঝাখানি নিয়ে সেই শৈশবের তরুচ্ছায়ায় তিক্তলোরের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলুম। শুনেছি লোকে যখন ডুবে যায় তখন একনিমেষে জীবনের সকল স্মৃতি তার মনের মাঝে ফুটে উঠে। সেদিন আমারও তেমনি হয়েছিল। বৈকল্যের জ্বালা সুদূরের সুখস্বপ্ন স্মরণে তীব্রতর হ'য়ে উঠেছিল।

আহারে আমার রুচি গেল, মুখের হাসি উধাও হ'ল ; চিন্তা এসে বাসা বাঁধলে আমার মাথার ভিতর। আমি কূলকিনারা হারিয়ে অশ্রুপাথারে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। প্রথমত্বে একটা হৃদয়স্পর্শিতা আছে যা পরত্বে অনুপস্থিত। ক্রিশ্চানদের মতে আমাদের আজকের দুঃখ-কষ্ট, সেই আদিম পাপের জন্য। আদি গান বেদ ; যা শুনলে বুঝি বা না-বুঝি, একটা অকথনীয় আনন্দ পাই। আর প্রথম প্রণয়ের ক্ষণস্থায়ী অসীমতা লিখে বুঝানো যায় না ; প্রথম চুম্বনের তো কথাই নেই। এতদিন কখনো কোন কিছুতে হতাশ হইনি ; কাজেই এই প্রথম আশাভঙ্গটা বুকে বড়োই বেজেছিল। এখন মনে হয় যে যদি জীবন আমার প্রত্যহ শুধু এমনি আঘাত ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত, তাহ'লে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা থাকত না। তখন ভেবেছিলাম এই বুঝি চরম পরম ব্যথা।

৩

কলকাতায় এলুম। প্রথম-প্রথম কিছুই ভালো লাগত না। কলেজ যেতে কান্না পেত। বাড়ি থেকে এক পা-ও বেরুতুম না। সঙ্গীহীন শহরে আমার গেঁয়ো প্রাণ আইঢাই করতে থাকত।

এইসময় শম্ভুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। শম্ভু আমার অবিভাবক শরৎবাবুর ছেলে। সে বি.এ. পাশ ক'রে ওকালতি পড়ত। আমাদের দু-জনের সৌহৃদ্য সে-সময় জগতের অষ্টম আশ্চর্য ব'লে গণ্য হ'তে পারত। মধ্যবয়সে চার-পাঁচ বছরের তফাৎ তফাৎ ব'লেই ধরা হয় না। এখন শম্ভুকে যদি কেউ বয়স জিজ্ঞাসা করে সে বলে যে সে আমারই বয়সী। আমায় পুছলে আমি বলি সে আমার চেয়ে আট-দশ বছরের বড়ো। কিন্তু কী ক'রে জয় করেছিলাম তা মনে নেই। আমাদের মৈত্রী মুখে নয়, আন্তরিক ছিল এবং আছে। শম্ভু সম্পূর্ণ শহুরে ছেলে, পাড়াগাঁ কাকে বলে তা জানে না। অমন প্রত্যুৎপন্নমতি আমি আর কারুর দেখিনি। এককথায় বলতে গেলে তার মতন তুখোড় ছেলে মেলা দুরূহ।

ছেলেবেলার কথা চাপা থাকে না। আজ যদি আমাদের প্রথম পরিচয় হ'ত তাহ'লে সে নিশ্চয়ই আমার মনে যে-কথাটি সতত জাগছে তার অস্তিত্বও জানত না। কিন্তু তখন আলাপ হবার পাঁচ মিনিট পরেই সে আমার কুষ্ঠি, কুলজি সব জেনে নিয়েছিল। তার কাজ ছিল অকাজ। বি.এ. পাশ ক'রে সে যে একজন কর্মহীন পুরুষ হ'য়ে গেছে এ-কথাটা সে জানিয়ে দিতে সর্বদা উৎসুক। আমায় শহুরে করবার ভার সে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিলে।

তার সঙ্গে যখন থাকতাম তখন সব ভুলে যেতাম। অনেক লোকের সঙ্গে তার আগে বা পরে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তার মতো আমুদে, তার মতো আলাপী, তার মতো মজলিসি লোক আর কখনো দেখলুম না। দুনিয়ায় এমন জিনিস ছিল না যা সে জানত না, এমন ব্যাপার ছিল না যার বিষয় কথা বলতে পারত না, এমন লোক ছিল না যাকে সে সমালোচনা করত না। সকল সন্দেহ সে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিত, তাই যখন সে আমার বিষণ্ণ হওয়ার কারণ শুনলে তখন তো হেসেই খুন। বললে যে এই সামান্য বিষয় নিয়ে যে-লোক দিনরাত মুখ ফুলিয়ে ব'সে থাকে তার সম্বন্ধে আর কোনো আশা নেই। তারপর আমি যখন এই কথা নিয়ে মাথা ঘামাতাম সে আমায় বলত, "আমি তোমার জ্যাঠামশাইকে বেশ ভালো ক'রে জানি। তুমি আরেকটা এক্‌জামিন্‌ পাশ করো, তারপর তাঁর যদি মত না-করিয়ে দিতে পারি তো আমায় তুমি যা-ইচ্ছে তাই ব'লো।" তাকে যা-ইচ্ছে তাই বললে যে আমার বিলেত যাওয়া একটুও এগুবে না বা আমার নৈরাশ্যের এককণাও হ্রাস হবে না, এমন সংশয় সে উপস্থিত থাকলে আমার মনে কখনো জাগত না।

কলকাতার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প'ড়ে দু-বছর দেখতে-না-দেখতে কেটে গেল। রগ ঘেঁসে মাধ্যমিক পরীক্ষাটাও পাশ করলাম। এক্‌জামিন্‌ দিয়েই গেলাম জ্যাঠামশায়ের কাছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে পূর্বের অন্তরঙ্গতা আর ছিল না। আমার দিক থেকে ছিল একটা দারুণ অভিমানের আড়াল, আর তাঁর দিক থেকে ছিল সঙ্কোচের ব্যবধান। কাজেই বিলেত যাবার কথাটা পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার আগে হয়নি।

যখন শম্ভুর তার গিয়ে পৌঁছুল তখন দুপুর ; জ্যাঠামশাই আগের মতোই নির্বাপিত চুরুটটি

মুখের কোণে গুঁজে, কাগজ পড়ার ভানে একটু আমেজ করছিলেন। আমি নির্দয়ভাবে সশব্দে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম আমার হৃদয়ের কথাটা পাড়তে। কী মীমাংসা হবে পূর্বেই জানতুম, কিন্তু এই অনিশ্চিতত্ব আর আমার সইছিল না ; তাই তাড়াতাড়ি তার নিষ্পত্তি করতে গেলাম।

আমার জুতার আওয়াজে মুখ থেকে কাগজখানা নামিয়ে তিনি চুরুটটা পুনরায় ধরালেন। আমি বললুম, "আপনি সেবার বলেছিলেন যে আই.এ. পাশ করলে আমায় বিলেত পাঠাবেন। এইমাত্র তার পেলুম পাশ করেছি। এইবার যদি মত করেন তো এই বেলা থেকে যোগাড় করতে হবে নচেৎ অক্টোবর মাসে সেখানে কোথাও জায়গা পাওয়া অসম্ভব।"

তিনি বললেন, "ভারি খুশি হলুম। আমি এ-সম্বন্ধে তুমি আসা অবধিই ভাবছি ; তোমার জ্যাঠাইমার সঙ্গেও কথা হয়েছিল। আমাদের দু-জনেরই মত যে তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। এত কমবয়সে গেলে ব'খে যেতে তো পারই এবং যাবেও, কিন্তু তার ওপর আবার যদি একটা মেম বিয়ে ক'রে আনো তো চিরজীবন তার ফল ভুগতে হবে।"

আমি উত্তর দিলুম, "ব'খে যাওয়া এখানে যতখানি সম্ভব, সেখানে তার চেয়ে বেশি নয়। কলকাতাতে আমি অভিভাবকহীন রয়েছি, আর কলকাতাতে যে বিলিতি ইউনিভার্সিটির অপেক্ষা কম প্রলোভন আছে তা তো মনে হয় না। ইচ্ছে করলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানেই ব'খে যেতে পারি।"

তিনি চ'টে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, সেইজন্যই আমি তোমাকে পাঠাতে চাচ্ছি না, এখানে একরকম চোখের সামনে থেকেই যখন তোমার এ-সব অদ্ভুত ধারণা হচ্ছে, সেখানে গেলে যে কী ধিঙ্গি হবে তা কে জানে!"

"তাহ'লে কি আপনার আদৌ ইচ্ছে নেই যে আমি যাই।"

"না, আমি তা বলছি না ; যদি যেতে চাও তো বিয়ে ক'রে যাও।"

"আপনার বিশ্বাস যে সেখানে আমি ব'খে যাব। যদি বিয়ে ক'রে যাই সে-সম্ভাবনার কিছু কমি আছে কি? বরং আমায় অন্যায়ের পথে চলতে আদেশ দেওয়া হ'ল। সে-সম্ভাবনা যদিও মোটেই নেই তবু আমার মনে হয় যে এই দুয়ের মধ্যে মেম বিয়ে করাটাও অল্প অপরাধ।"

বয়স্থেরা সাধারণতঃ ভেবে থাকেন তাঁদের ছোটোরা চিরকালই ছোটো থাকবে। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের কোনো কথা জানা বা বলাই উচিত না। বিশেষত যখন তারা অনূঢ়। এই ধারণাটার আদিতে হয়তো অর্থ ছিল, কারণ তখন বাল্য, ঠিক বলতে গেলে শৈশবে, বিবাহের ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু এখন আর তার কোনো মূল্য নেই যেহেতু অন্তত পুরুষের পক্ষে সে-প্রথাটা উঠে গেছে। সে যাই হোক্, জ্যাঠামশায়ের মুখ লাল হ'য়ে গিয়েছিল, তার কারণ বোধহয় ক্রোধ, সঙ্কোচ দু-ই। তিনি বললেন, "আমি এ-বিষ[ে]য় তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না। যদি যেতে চাও, বিয়ে ক'রে যেতে হবে।"

এবার আঘাতটা কমই লেগেছিল, রাগটাই হয়েছিল বেশি। "যাওয়া হোক্ বা না-হোক্, আমি বিয়ে করতে নারাজ।" এই কথা ব'লে আমি দ্রুতপদে সেখান থেকে চ'লে এলুম।

সেইদিন বিকেলে পশ্চিমের বারান্দায় ব'সে-ব'সে জগতের অসামঞ্জস্য, অভিভাবকদের অত্যাচার, অদৃষ্টের অন্ধতা ইত্যাদি গুরুতর চিন্তার অবসরে আপনার দুঃখে আপনি আত্মহারা হ'য়ে, সন্ধ্যার আগমন দেখছিলুম, এমনসময় পাশের ঘর থেকে জ্যাঠাইমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। "দোষ তোমার। আমি তো তখুনি বলেছিলুম, 'যখন যাবে, তখন তার কথা, এখন থেকে বিলেত-বিলেত ক'রে নাচানোর কী দরকার।' ওর জীবনটা যদি নষ্ট হয় সে-দায়িত্ব তোমার।"

"হ্যাঁ, সেটা আমার ব'লেই এখন পাঠাতে চাচ্ছি না। কিন্তু ভুগতে হবে তোমাকেই, আমি আর ক-দিন। যদি মেম-বউয়ের সঙ্গে ঘর করতে পারো তো ওকে পাঠাও। আমার কী বলো।"

এই অখণ্ডনীয় যুক্তির ফলে জ্যাঠাইমা নির্বাক হ'লেন। আমি তাঁর দরদ হারালাম।

আমি যখন শম্ভুর কাছে এই গল্প করেছিলুম, সে উত্তর দিয়েছিল, "এ তে তোমার দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। সহমরণ উঠে যাবার পর থেকে সকল মায়ের মনেই একটা প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে যে তাদের অধিকার বুঝি-বা বেহাৎ হ'য়ে যায়। অবশ্য তাঁদের রাজত্ব ক্ষুদ্র, কিন্তু এই অল্পতাই হচ্ছে এই ভয়ের কারণ ; যদি দৈনিক কাগজ পড়ার অভ্যাস থাকে তো জানবে যে জার্মানির বিজয়াকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে সেই মুষ্টিমেয় বেলজিয়ামটি। ইউরোপের ম্যাপে বেলজিয়াম যতটা জায়গা জুড়ে আছে তার চেয়ে সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে একটা ভাঁড়ার ঘর বেশি স্থান নেয়। তবে সেই অধিকার রক্ষা করার জন্যে যখন মাতৃস্থানীয়ারা হুলুস্থূল বাধান, তার জন্য আক্ষেপ কেন?"

আমার বিলেত-যাওয়ায় জ্যাঠাইমার অমত প্রকাশ আর এই দীর্ঘ বক্তৃতা কোন্ যুক্তির সূক্ষ্মসূত্রে সংযুক্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে আমায় বলেছিল, "তোমার জ্যাঠাইমার সহানুভূতি শুকিয়ে গিয়েছে ভয়ে, তিনি তোমার জ্যাঠার মতে সায় দিয়েছেন আত্মরক্ষার চেষ্টায়। বিলেত গিয়ে তুমি অপর যা ইচ্ছে করতে পার তাতে তাঁর আপত্তি হবে না, কিন্তু ওই যে মেম বিয়ের কথা উঠেছে তাতেই তাঁর আত্মা শুকিয়ে গেছে। ১০।১২ বছরের দেশী মেয়ের ভয়েই যখন মাতৃকুল আকুল তখন এতে তিনি সামান্য সন্দিগ্ধ হয়েছেন সেটা আর আশ্চর্য কী? তাঁর প্রাণ বধূমাতার শুশ্রূষার জন্য লালায়িত, কাজেই তুমি যেথায় বিবি বিয়ে করতে পারলেও পারো সেখানে পাঠাতে তিনি অসম্মত।

"তুমি যদি একটি আস্ত গর্দভ না-হ'তে তো জানতে যে মানুষের স্বভাবই হচ্ছে আত্মগত ঐশ্বর্য ছেড়ে পরগতের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। এই কারণে মা ছেলের ভক্তি হেলায় ফেলে বউয়ের শ্রদ্ধার জন্য কাতর হন ; এইজন্যই নিজের বাগানের ফল ছেড়ে বালক পরের বাগানের ফল চুরি করে ; আর লোকে নিজের স্ত্রী ছেড়ে পরের স্ত্রীর পাছে দৌড়য়।"

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে বললে, "তুমি কি বিলেত যেতে একেবারে কৃতসঙ্কল্প?" আমি একটু চ'টে উত্তর দিলাম, "সে-বিষয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে কী হবে, বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে?"

"আরে চট্‌ছো কেন? যদি একান্তই মনঃস্থির ক'রে থাকো তো বলো, আমি একটা উপায় বাৎলে দিই।"

আমি আরো চ'টে বললাম, "রাতদিন অত ঠাট্টা ভালো লাগে না। অমন ঢের উপায় দেখেছি, আর উপায় দেখবার সাধ নেই। কারুর সাহায্য বা দরদ চাই না, যা করবার আমি নিজেই করব। এইটা জেনে রেখো, আমি বিলেত যাবই যাব, সে তুমি মস্করা করলেও যাব, জ্যাঠামশায়ের অমত থাকলেও যাব, যাবই যাব, যাবই যাব, যাবই যাব।"

আমার এই আকস্মিক উত্তেজনার মূলে হচ্ছে নিরাশের তিক্ততা, অপারগের বিদ্রোহ। অনেকসময়ে প্রচণ্ড আঘাতে বাইরে বেশি ক্ষতি না-হ'লেও ভিতরে নিদারুণরূপে লাগে। আমার এবারকার ক্ষত শোষের মতো, মুখটা তার ছোট্ট, কিন্তু বিস্তার তার সমস্ত অঙ্গ ভ'রে। সে বোধহয় তা বুঝতে পারলে তাই পরিহাস ছেড়ে বললে, "তা যদি তুমি ধার্য ক'রে থাকো তো আমার একটা প্ল্যান আছে। তুমি আবার যে ধর্মভীরু মানুষ শুনলে হয়তো আঁৎকে উঠবে। তবে যদি 'শরীর পতন কিংবা কার্যের সাধন' অবস্থা হ'য়ে থাকে তো বলি —।"

"প্রস্তাবনাটা একটু কম ক'রে আসল নাটকের অবতারণা করলে ভালো হয় না?"

"আমার মৎলব অকাট্য। যে-কারণে তোমার জ্যাঠাইমা বিলেত যাওয়ায় অমত করছেন, সেই কারণেই তিনি তাতে মত করবেন।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে ভদ্দর ভাষায় মনের কথাটা বললে বাধিত হব।"

"তাঁর অমতের ভিত্তি হচ্ছে যে তুমি সেখানে মেম বিয়ে করতে পারো। আচ্ছা ধরো তুমি যদি এখানেই একটা অযোগ্য বিয়ে করবার জন্য মেতে ওঠো তাহ'লে কী হয়?"

"আকাশখানা যদি হঠাৎ ভেঙে পড়ে তাহ'লে কী হয়? এমন প্রসঙ্গের উল্লেখ করার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম মা। শুধু-শুধু অযোগ্য বিয়েই-বা করতে যাব কেন, আর করতে গেলেই-বা মিলছে কোথায়?"

"সে ভার আমার, তুমি রাজি আছ তো?"

"মোটেই না, বিয়ে করতে আমি রাজি নই। তোমার গাঁজাখুরি রেখে দাও। ঠাট্টার স্থান, কাল, পাত্র আছে।"

"না, তোমায় নিয়ে আর চলল না। আমার এমন প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল। তাইতেই শাস্ত্রে বলেছে, বানরের গলায় মুক্তার মালা।"

উপমা-সংমিশ্রণ অলঙ্কারশাস্ত্রে যে কতদূর দোষের তা আর তাকে বোঝাবার চেষ্টা না-ক'রে, আমি এই সঙ্গীয়িত চালের আশায় ব'সে রইলুম।

সে বললে, "তোমায় বিয়ে করার জন্য কে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে। নাই-বা করলে বিয়ে। তবে বিয়ে করবার জন্য তুমি যে পাগল এ-কথাটা প্রকাশ করতে কি কিছু দোষ আছে?"

"কিছুই না, তবে বিয়ে তো আর ইচ্ছে করলেই হয় না। মেয়েমানুষ যদি হতুম না-হয় প্রথম মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের হাতে আপনাকে চিরদিনের জন্য সঁপে দিতুম; দেবতা যদি হতুম না-হয় কলাগাছটাছ একটা কিছুকে বধূ করতুম। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ হ'য়ে তা তো আর হয় না।"

"সে-ভাবনা তোমার নয়, আমার। আমি যদি উপযুক্ত পাত্রী—।"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "অনুপযুক্ত পাত্রী বলো।"

"আচ্ছা তাই, আমি যদি একটা অপাত্রী যোগাড় করি তুমি তার জন্য আত্মহারা হ'তে পারবে তো?"

"হ্যাঁ সেটা কিছু শক্ত নয়। তোমার সঙ্গে যেদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়েছি সেদিন থেকেই পাত্রাপাত্রের বিচার করা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তাতে ক'রে বিলেত যাওয়ার কী সুবিধে হবে?"

"বুদ্ধিটা যদি মোটা একটু কম হ'ত তো আর বিশদ ক'রে বোঝাবার বিফল চেষ্টা আমায় করতে হ'ত না। তুমি যদি একজন ব্রাহ্মিকা বিয়ে করতে চাও, তাহ'লে তোমার জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার মতে যে তা হবে এটা আমার মনে হয় না। আমার plan of action হচ্ছে এইরকম : 'আমি তোমার জ্যাঠামশাইকে চিঠি লিখব যে তুমি এখন আমাদের সঙ্গে আর বড়ো একটা দেখাসাক্ষাৎ করো না, শুনতে পাচ্ছি একদল ব্রাহ্মদের হাতে তুমি পড়েছ। তাদের বাটী নাকি একটি কুৎসিত, ধেড়ে মেয়ে আছে তার সঙ্গে তোমার আশনাই চলছে। তার গুণের মধ্যে দু-কথা ইংরেজি বলতে পারা আর মেয়ে-মদ্দানি ক'রে একলা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। মোদ্দা কথা, তোমায় এই বেলা না-বাঁচালে তুমি জাহান্নমে যাবে।' এ-কথা শুনলে তাঁর মনের যে কী ভাব হবে সে আর ভাবতেও পারি না। তরপর দেখা যাবে কী হয়। রাজি আছ?"

অন্যসময় হ'লে রাজি হতুম না। কিন্তু তখন প্রতিহিংসা-কামনাটা আমার মনে বড়োই প্রবল ছিল। যদিও এমন বিয়ে করার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, তবু তাঁদের জব্দ করা যেতে পারে ভেবে অল্পসময় অনিচ্ছার ভান ক'রে সায় দিলুম।

সবই বন্দোবস্ত-মাফিক চলতে লাগল। শম্ভু একটি পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলে। তাদের কন্যারত্নটি তার বর্ণনার অনুযায়ী হয়েছিল বটে। তার গুণের মধ্যে বাঁকিয়ে বাংলা, আর ভুল ইংরেজি বলা। রূপ অরূপ ; মুখমসীর উপর পাউডারের বাহার অনেকটা কালো-সাদা মোসেইকের মেজের মতো ; সে-গঠনের জোড়া মেলা দুষ্কর ; জ্যামিতির রচয়িতা যদি অহিফেন-সেবী হতেন তো তাঁর মাথায় তেমন কোণ-এর কল্পনা আসলেও আসতে পারত। কণ্ঠস্বরটি অনাড়ির হাতে বেহালার মতন সুমধুর। অন্যান্য সৌষ্ঠবগুলিও এর অনুরূপ।

প্রথম তাকে দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার বাসনা এতই প্রবল হয়েছিল যে তা আর অন্তরে নিহিত থাকেনি মুখেও ফুটে উঠেছিল। কাজেই, শম্ভুর কড়া হাতের একটি কঠোর চিম্‌টি আমায় সহাসে সহ্য করতে হয়েছিল।

সব সরঞ্জাম তয়ের হ'লে পর শম্ভু জ্যাঠামশাইকে এক চিঠি লিখলে যে আমি এক ব্রাহ্মিকাকে বিয়ে করবার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। মেয়েটির যেমন ছিরি, তেমনি চালচলন। সব দিক থেকেই এই বিয়ে অচিন্তনীয়। এ-ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায়ের কলকাতায় অনতিবিলম্বে আসা দরকার। এই চিঠি যাবার একদিন পরেই জ্যাঠামশায়ের তার পেলুম, যে তিনি পরদিন সন্ধ্যার

সময় কলকাতায় পৌঁছবেন। শম্ভুর কাছে তাড়াতাড়ি গেলুম। সে বললে, "মাছে টোপ গিলেছে এখন হচ্ছে খেলানোর দরকার। আমি ঠিক বলছি তোমার বিলেত যাওয়া অনিবার্য।"

আমি জবাব দিলুম, "বিলেত যাওয়া যতদূরে ছিল ততদূরেই আছে, মধ্যে একটা বিষম কাণ্ড যে ঘনিয়ে এসেছে তার সন্দেহ নেই।"

সে বললে, "লঙ্কাকাণ্ডই রাবণের প্রথম হার, আর রামের প্রথম জিৎ।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে রামের পক্ষেই ন্যায়টা ছিল, ওখানেই তাঁর সঙ্গে আমার গরমিল হ'য়ে গেল। তবে ভরসা আছে আমার একটি হনুমান সহায় আছে। এখন তাঁর যুক্তি শোনা যাক্।"

সে বললে, "তুমি জ্যাঠামশাইকে আনতে স্টেশানে যেও না। বরং তোমার হবু অর্ধাঙ্গিনীকে চায়ে নেমন্তন্ন করো।"

"তাহ'লে কি আর রক্ষা আছে, একেই তো জ্যাঠামশাই অগ্নিশর্মা হ'য়ে আসছেন, তার উপর যদি বাসায় এসে দেখেন যে গুণধর ভাইপো তাকে আনতে না-গিয়ে বাড়িতে ব'সে-ব'সে আশনাই করছে, তাহ'লে সেইখানেই একটা হুলুস্থূল বেধে যাবে।"

"আমি তো তাই চাই। তুমি যাও, এখুনি তাদের কাল সন্ধ্যার সময় চায়ে আসতে বলোগে।"

আমি যাচ্ছিলুম, সে বাধা দিয়ে বললে, "দেখো আরেকটা কথা, জ্যাঠামশাই যদি তোমায় বিলেত যাবার কথা বলেন তো তুমি ঘোর অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রো।"

আমি আর কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে চ'লে এলুম। শম্ভুর উপর আমার একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে যে-কাজে হাত দেয় সেটা যে বিফল হবে এমন ধারণা আমার মনে একদিনও আসেনি। অল্পবয়েসে বিশ্বাস সহজেই আসে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় চা যখন খুব জ'মে এসেছে, বাড়ির দরজায় একটি ট্যাক্সি থামল। আর সঙ্গে আমার হৃদয়টা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই জ্যাঠামশাই ঘরে ঢুকলেন, পেছুনে-পেছুনে শম্ভু। আমি তো অবাক। এদের দু-জনের দেখা হ'ল কোথা? উঠে তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম ক'রে আহূতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক'রে দিলুম। সে-সময় জ্যাঠামশায়ের মুখ একটা দেখবার জিনিস। আমি বললুম, "এঁদের নেমন্তন্ন করেছিলুম ব'লে স্টেশনে যেতে পারিনি। মাফ্ করবেন।"

তিনি বললেন, "যাক্, সে-কথা নিয়ে আর এখন মাথা ঘামিয়ে কী হবে। শম্ভু গেছ্‌ল, আমার কোনো অসুবিধে হয়নি।"

তারপর কথাবার্তা চলতে লাগল। মেয়েটির মুখ নাখ চোখ সবই কথা বলে। সে-বাক্যের বন্যার সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য। জ্যাঠামশাই একটুক্ষণ সহ্য ক'রেই ক্লান্তির ওজরে চম্পট দিলেন। জানি না আমার আরো কতকক্ষণ সইতে হ'ত, কিন্তু শম্ভু সহায় হ'ল। সে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, "ওহে ভুলে যাচ্ছ নাকি, আজ আমাদের বাড়িতে যে তোমার খাবার কথা। সাতটা বাজে প্রায়।" এইতেই আপদের শান্তি হ'ল। তাঁরা বিদায় নিলেন।

আমি শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হে ব্যাপারখানা কী খুলেই বলো না।"

"ব্যাপারখানা জ্যাঠামশায়ের মুখ থেকেই শুনতে পাবে। আমি চল্লুম।"

"সে কি? তুমি বাধালে হাঙ্গাম, আর আমি সইব ঠেলা। তা হ'তে পারে না, তোমায় থাকতে হবে।"

আর বেশি কথা কওয়া হ'ল না ; জ্যাঠামশাই সহসা ঘরে এসে হাজির, তার সঙ্গে শম্ভুর প্রস্থান।

তিনি কোনো প্রস্তাবনা না-ক'রেই বললেন, "ওই মাগীটা নাকি তোমায় ফাঁসাবার মতলবে আছে?"

তিনি কী বলছিলেন আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, তবুও না-বোঝার ভান ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার কথার মানে?"

"মানে, তোমায় ফাঁদে ফেলে বিয়ে করবার যোগাড় করছে? আমি আশা করেছিলুম যে তোমার বুদ্ধি এত কম নয়, কিন্তু—।"

আমি বাধা দিয়ে উত্তর দিলুম, "আপনি বোধহয় জানেন না যে মিস্ ব্যানার্জিকে রাজি করতে আমায়—।"

"মিস্ ব্যানার্জি? ও কি বামুন নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার ওখানে বিয়ে করা হ'তেই পারে না। স্বজাত হ'লেও হ'তে দিতুম না, কিন্তু তার ওপর আবার যখন বামুন, ও-বিয়ে কখনোই হবে না।"

আমি একটু গরম হ'য়ে বললুম, "মাফ্ করবেন, কিন্তু আমি ওঁকে বিয়ে করবই। আপনার মতো উদারচেতা লোকের কাছ থেকে সামান্য জাতের জন্য আপত্তি আমি কখনো কল্পনা করিনি। আপনিই তো আমায় শিখিয়েছিলেন যে জাত-বিচার একটা বিষম কুসংস্কার, সেটা যতদিন আমাদের সমাজ থেকে না-যায় ততদিন আমাদের মঙ্গল নেই। আজ আবার আপত্তি করলে চলবে কেন?"

তিনি একটু সপ্রতিভ হ'য়ে জবাব দিলেন, "জাত-বিচার একটা মস্ত কুসংস্কার হ'তে পারে, কিন্তু সেটার ওপরে আমাদের সমাজের ভিত্তি, সেটা লঙ্ঘন করলে সমাজও চুরমার হ'য়ে যাবে। সব জিনিস [নিজের] মতানুযায়ী করা যায় না, বিশেষ যখন সভ্য সমাজের ভেতরে বাস করতে হয়। আমি ভাবতে পারি যে—।"

তাঁর যুক্তির বাকিটুকু না-শুনেই আমি ধাঁ ক'রে বললুম, "অর্থাৎ নিজের বেলা আঁটিসুঁটি পরের বেলা দাঁত কপাটি। বক্তৃতা দেবার সময় বলব জাত-বিচার খারাপ, কিন্তু কাজের বেলা জাতটা সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখে চলব। আমার ধারণা অন্যরকম।"

এবার তিনি ভয়ানক চ'টে গিয়েছিলেন, বললেন, "তোমার ধারণা? এক রত্তি ছেলের আবার ধারণা কি? এ-বিয়ে কিছুতেই হবে না।"

"আমার নিজের জীবনকে আমার নিজের মতন ক'রে গড়বার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আগে একবার যখন বিলেত যেতে চেয়েছিলাম, তখন আপনি বাধা দিয়ে আমার জীবনের গতি বদ্‌লে দিয়েছেন। এবার আর আমি অপরের বারণ মানব না।"

"বিলেত যেতে চাও যাও, আমিও ভাবছিলুম তোমায় এবার পাঠাব, কিন্তু এ-বিয়ে হ'তেই পারে না, বিশেষতঃ তুমি এখন বড্ড ছেলেমানুষ এর মধ্যে বিয়ে করবে কি?"

"আপনি নিজেই তো বলেছিলেন যে বিয়ে ক'রে বিলেত যাও, আমি নিজের ইচ্ছানুসারে বিয়ে করলেই কি বয়সের অল্পতার কথা মনে পড়ে। আর বিলেত যাওয়া? যখন যাবার জন্য অস্থির হয়েছিলুম, হয়নি, এখন আর যেতে আদৌ ইচ্ছে নেই। ধন্যবাদ, বিলেত যাওয়ার সাধ মিটে গেছে।"

"না, তা ইচ্ছে হবে কেন? ওই ডাইনির মোহে প'ড়ে ভালো ইচ্ছে যদি মনে থাকত সেটাই আশ্চর্যের বিষয় হ'ত।"

"মিস্ ব্যানার্জি অপরের কাছে যাই হোন্, আমার কাছে তিনি দেবী, তাঁকে অপমান করলে আমার গায়ে লাগে।"

"হ্যাঁ, দেবী কেমন জানা আছে। শম্ভুকে জিজ্ঞেস করো-না দেবীত্বের অনেক পরিচয় পাবে অখন।"

"শম্ভুর অন্য লোকের সম্বন্ধে কথা কইবার কী অধিকার আছে, জানবার জন্য আমার বড়ো ব্যগ্রতা হচ্ছে। আমি কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে চাইনে, নিজে যা-জানি তাইতেই তুষ্ট থাকব।"

"তোমার হ'ল কী, নিজের জ্যাঠা-জ্যাঠাই, নিজের বন্ধু-বান্ধব, সকলকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা পেত্নীর জন্যে পাগল হয়েছ, তা-ও আবার তোমার ডবল বয়সী। আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে শুনলুম যে, ওরা তোমার টাকার লোভেই এমন কাজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। শোনো, আমার কথা শোনো, আমি কালই তোমার বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি এ-পাগলামি ছাড়ো।"

এমনি কত তর্ক যে চলল তার আর ইয়ত্তা নেই। রাত বারোটার সময় যখন শুতে গেলুম তখন গলা ভেঙে গেলেও আশা ভঙ্গ হয়নি।

পরের দিন জ্যাঠাইমাকে আসবার জন্য তার করা হ'ল, তিনিও এসে হাজির। আবার তর্ক চলল, কত রাগ, কত উষ্মা, কত মান, কত অভিমান, কত বাক্, কত বিতণ্ডা সমাধা হ'য়ে গেল। অবশেষে শম্ভু আমায় উপদেশ দিলে যে এইবার আমার রাজি হবার সময় এসেছে। আমি তাইতে সায় দিলুম। আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হ'ল।

এই প্রসঙ্গে জ্যাঠাইমার সঙ্গে আমার নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়।

জ্যাঠাইমা বললেন, "বাবা, আমার নিজের ছেলেপিলে হয়নি তোর ওপর আমার সকল আশা-ভরসা। তা, তুই যদি পর হ'য়ে যাস তাহ'লে আমি বাঁচব না।"

"সে কি জ্যাঠাইমা, আমি পর হ'য়ে যেতে গেলুম কেন?

"সে মাগীর হাতে পড়লে কি আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ওরে সে যাদু জানে নয়তো কি আমার দুধের বাছাকে অমন ক'রে বশ করতে পারে! এতদিন তোকে কোনো কথা জোর ক'রে বলিনি, আজ আমার এই অনুরোধটি রাখ্।"

আমি বললুম, "কিন্তু জ্যাঠাইমা আমার সকল ইচ্ছেতেই যদি তোমরা অমত প্রকাশ করো, তাহ'লে আমার প্রতি কি দারুণ অবিচার করা হয় না?"

"আমি কি কোনোদিন তোর কোনো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করেছি। এই দেখ্-না তোর বিলেত যাওয়ার—।"

আমি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, "সে-কথা যাক্। বিলেত যখন না-যাওয়াই সঙ্কল্প করেছি, তখন আর সে-কথা নিয়ে চর্চা ক'রে কী হবে?"

"না, না, বাবা, রাগ করিস কেন? বিলেত যাবি বৈ-কি।"

"না, কখনোই যাব না। যাক্, সে-সব বাজে কথার কী ফল? তোমরা যাই বলো বাপু, মিস্ ব্যানার্জিকে বিয়ে করবই করব।"

"আমি বেঁচে থাকতে হবে না। তুই তো অমন ছিলি না। শোন্ আমার কথাটি শোন্, শেষে যদি পস্তাতে হয় তখন বলিস। তুই যদি এ-বিয়ে করিস তো আমি নিশ্চয়ই মারা যাব। যা, বিলেত যা ; সেখান থেকে একটা কিছু বড়ো হ'য়ে আয়। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাদের আর দগ্ধে মারিসনি।"

"কিন্তু বিলেত যখন যেতে চেয়েছিলুম তখন তো তোমরা ভয় করেছিলে পাছে মেম বিয়ে ক'রে আসি। মিস্ ব্যানার্জি কি মেমের চেয়ে খারাপ।"

"ঢের, ঢের, তাদের আর কোনো গুণ না-থাক্ তবু চেহারাখানা আছে। এখন বুঝতে পারছিসনি, ও তোর বুকের রক্ত শুষে খাবে।"

"পরের কথা আমি ভাবছি না, কিন্তু তাঁকে বিয়ে না-করলে আমার বুকের রক্ত এখুনি শুকিয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ নেই।"

"কেন তোকে কলকাতায় আসতে দিয়েছিলুম রে!" ব'লেই জ্যাঠাইমা কান্না শুরু ক'রে দিলেন।

আমি ভাবলুম, যথেষ্ট হয়েছে, তাই বললুম, "আচ্ছা, যদি তোমাদের একান্তই অমত থাকে তো তাঁকে বিয়ে করব না। কিন্তু বিলেত আমি যাব না।"

তাঁর মুখে চার-পাঁচদিন পরে হাসির লেশ দেখা দিলে। তিনি বললেন, "জানি, আমার বাছাকে ভালো ক'রে বললে সে এমন কিছু নেই যা করতে পারে না। তাই তো উনি যখন কাল সন্ধ্যের সময় সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমি বললুম, 'আচ্ছা তাকে রাজি করানোর ভার আমার ওপর। তোমরা কথা কইতে জানো না, তাই সে তোমাদের কথা শোনে না।' কিন্তু দেখ্, তুই বিলেত যেতে অমত করিসনি।"

"ওটা আমায় অনুরোধ ক'রো না।"

"তুই বুঝতে পারছিসনি। আমি জানি, এই ঘা-টা তোর বুকে খুব লাগবে। এখানে থাকলে তাকে ভুলতে পারবিনি, আর সে-ডাইনিও তোকে ছাড়বে না। নতুন জায়গায় যা, সেখানে নানারকম দেখবি, তাকে ভুলে যাবি।"

মানুষের প্রকৃতিই এমনি, দুটো বিপদের মধ্যে কাছেরটাকে অল্প হ'লেও সে ভয় করে। যে-জ্যাঠাইমা একদিন মেমের আতঙ্কে আমায় বিলেত যেতে নিষেধ করেছিলেন, তিনি আজ

আস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সে-সম্ভাবনা তুচ্ছ ক'রে আমায় বিলেত যেতে সাধ্যসাধনা করছিলেন। আমার প্রতিশোধের চরম হয়েছিল, আমি তাঁর মতে সায় দিলুম।

বলাই বাহুল্য, এক মাসের মধ্যেই কালাপানি পার হলুম। যাবার সময় জ্যাঠাইমা বলেছিলেন, "দেখিস্ বাবা, সেখানে যেন আরেকটা কাণ্ড ঘটাসনি।" তাঁর বিশ্বাসের অপব্যবহার করিনি, ফিরে এসেছি অক্ষত।

মাঘ ১৩৩০

বিলেত-যাত্রা [২]

[দ্র এই বইয়ের পৃ ৫১, প ৬।]

... বেঁকে তেউড়ে কী যে হ'য়ে যেত তার ঠিক নেই।

সে যাই হোক্, সেবারে প্রবেশিকাটা আমি ভালো ক'রেই পাশ করেছিলুম। ছাত্রবৃত্তির খবর শুনে জ্যাঠামশাই বললেন, 'খুব ভালো, আশীর্বাদ করি চিরদিন এমনি ক'রে বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।' তখন বুঝিনি, আজ বুঝেছি বংশের মুখ উজ্জ্বল রাখতে গেলে, নিজের মুখে চুনকালি মাখতে হয়। কিন্তু সে হচ্ছে পরের কথা। আপাতত আমার বিলেত-যাওয়া হ'ল না। শুনলুম জ্যাঠামশাই অনেকদিন থেকে এইরূপ মনস্থ করেছেন ; আমায় বলেননি কেবল এই ভেবে যে, তাতে আমার পরীক্ষার ক্ষতি হ'তে পারে।

আমি জানতে চাইলুম মত পরিবর্তনের কারণ। জবাব পেলুম তাতে ক'রে নাকি আমার চারিত্র্যের অকল্যাণ হ'তে পারে। যৌবনের জন্ম-কালেই নাকি মানুষকে সাবধানে থাকতে হয়, মন যখন নরম থাকে বাহিরের প্রভাবে তার বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশি। তখন তো জানতুম না যে কাঁচা মাটি বিকৃত হ'লেও করুণ করের স্পর্শে সহজেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে ; কাঁচা মনের রেখা সহজেই অনুতাপের অশ্রুতে ধৌত হ'য়ে যায়, কিন্তু শুকনো হ'লে অল্পাঘাতেই হয় চূর্ণ। তাই নিরুত্তরে নৈরাশ্যের বোঝাখানি নিয়ে, আশৈশব পরিচিত সেই আম্রবনের সস্নেহ আশ্রয়ে তিক্ত লোরের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলুম। এই আমার প্রথম আশা-ভঙ্গ ; কাজেই আঘাতটা একটু বেশি-রকমের লেগেছিল। প্রথমত্বের একটা হৃদয়স্পর্শিতা আছে, যেটা পরত্বে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ সেদিনের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। এখন ভাবি, জীবন যদি আমাকে এমনি মেরেই ক্ষান্ত হ'ত, তাহ'লে আর আমার কৃতজ্ঞতার মাত্রা থাকত না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এই বুঝি চরম পরম ব্যথা।

৪

স্থির হ'ল ভবিষ্যতে আমি কলকাতাতে থেকে পড়াশুনা করব। কলকাতায় জ্যাঠামশায়ের বাল্যবন্ধু শরৎবাবু থাকতেন। তাঁরা দু-জনেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলেন, একসঙ্গে সমাজসংস্কারে, ধর্মসংস্কারে মেতেছিলেন, কেবল শরৎবাবুর উৎসাহের অন্ত হ'ল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে, আর আমার জ্যাঠামশায়ের বিবাহে। জ্যাঠামশাই তাঁদের বাড়িতে থেকেই কলকাতাতে লেখাপড়া করতেন, এবং এখনো যদি কখনো কদাচিৎ কলকাতায়

যেতে হ'ত শরৎবাবুর অতিথি হ'তে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। অতএব আমিও তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলুম।

শরৎবাবুর পরিবার ক্ষুদ্র—তিনি, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্র শম্ভু। শুনলুম শম্ভুর একটি বোন আছে, কিন্তু সে থাকে তার মামার বাড়িতে কোথায় মফস্বলে। তাঁদের বাড়িতে পদার্পণ করার দিন থেকেই শম্ভুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'ল। শম্ভু বি.এ. পড়ছিল, আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড়ো। অতএব আমাদের সৌহৃদ্য কিছু আশ্চর্যের। বেশিবয়সে তিন-চার বছরের তফাৎকে তফাৎ ব'লে ধরা হয় না, কিন্তু যৌবনের গোড়ায় এতটা ব্যবধান প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য। তার উপরে আবার আমি ছিলুম পাড়াগেঁয়ে, কলকাতার ছেলেদের চির-উপহাস্য। কিন্তু তবুও শম্ভু গোড়ার দিন থেকেই আমাকে সমকক্ষ ব'লে ব'রে নিলে।

তাকে যদি সহায় না-পেতুম তাহ'লে আমার দিন যে কী ক'রে কাটত জানি না। তার স্বতঃস্ফূর্ত আমোদের সংস্পর্শে আমার বেদনা দু-দিনে লাঘব হ'য়ে গেল। অন্তত যতক্ষণ তার কাছে থাকতুম ততক্ষণ আর হতাশের সেই সান্দ্র ব্যথা অনুভূত হ'ত না। তার চারিত্র্যের বিশিষ্টতা ছিল জগতের, মানুষের, সমাজের অন্তর্লীন সততার উপর তার প্রগাঢ় আস্থা। সে আমাকে যেমন প্রথম থেকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখেছিল, তেমন বি.এ. পরীক্ষার পর আমায় বিলেতে পাঠানো হবে জ্যাঠামশায়ের এই প্রতিশ্রুতির উপরও তার একদিনের জন্যও তিলমাত্র সন্দেহ হয়নি। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার অনেক তর্ক হ'ত, কিন্তু সবসময়েই শেষে দেখতুম আমি কোন্ এক মুহূর্তে তার মতে মত দিয়েছি ; বিশ্বের প্রতি তার সেই বিপুল বিশ্বাস আমারও বুকে সঞ্চারিত হয়েছে।

আর ছিল তার জ্ঞানলিপ্সা, সর্বভুক্ জ্ঞানলিপ্সা। পৃথিবীতে বোধহয় এমন কিছু ছিল না যার তলা অবধি পৌঁছতে সে চেষ্টা করত না। সে বিশ্বাস করত বটে কিন্তু বিশ্বাস করত সজ্ঞানে, সব ভেবে, সব বুঝে, সব আলোচনা ক'রে। তার এই পাগলামি সে কতক পরিমাণে আমার উপরে অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছিল। ফলত অপাঠ্যের আকর্ষণ মেনে চ'লেও আমি কোনোরকমে প্রথমে আই.এ. এবং পরে বি.এ. এক্জামিনে উত্তীর্ণ হলুম।

৫

বি.এ. দিয়ে আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে গেলুম। এবারে কালাপানি পার হওয়ার একটা সর্বশেষ মীমাংসা ক'রে আসব, এই ইচ্ছা ছিল,—যদিও আগে থেকেই জানতুম জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বচসার ফল কী হবে। কিন্তু এইরকম উদ্দেশহীন, অন্তহীন জীবন আর আমার ভালো লাগছিল না।

কিন্তু কথাটা উত্থাপন করতে কিছুদিন সময় লাগল। জ্যাঠামশাই এবং আমার মধ্যে আর পূর্বের সেই অন্তরঙ্গতা ছিল না। আমার দিক থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল একটা দারুণ অভিমানের আড়াল, জ্যাঠামশায়ের দিকে একটু চক্ষুলজ্জার ব্যবধান। তাই শম্ভুর তারে আমার পাশ হওয়ার সঠিক সংবাদ পাবার আগে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারিনি। শম্ভুর

টেলিগ্রাম যখন গেল, তখন দুপুর। জ্যাঠামশাই আদিম পদ্ধতি অনুসারে কাগজে মুখ ঢেকে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁর নির্বাপিত চুরুটটি সনাতন প্রথা অনুসারে ধূলি চুম্বন ক'রে প'ড়ে ছিল। আমি জুতাতে মস্‌মসনি উঠিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

আমার জুতার আওয়াজে জ্যাঠামশাই চম্‌কে উঠলেন। কাজেই তার মেজাজটা যে একটু তিরিক্ষি হ'য়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? আমি বিনা-ভূমিকাতেই শুরু ক'রে দিলুম, 'আপনি সে-বারে বলেছিলেন যে বি.এ. পাশ করলে বিলেত পাঠাবেন। এই মাত্তর তার পেলুম পাশ হয়েছি। এবার আপনার মত পেলে যোগাড়যন্তর শুরু ক'রে দিই।'

তিনি বললেন, 'খুব ভালো খবর যে ফেল করোনি। কিন্তু কবে কোন্‌দিন কী অবস্থায় একটা কথা বলেছিলুম, এখন হয়তো তা না-ও খাটতে পারে। আমি তো তোমার জন্যে বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি। আজকাল একটা ধুয়ো উঠেছে এক্‌জামিন্ পাশ করলেই হ'ল তার ভালো-মন্দ কিছু নেই। আমাদের সময় থার্ড ডিভিসানে পাশ করার চেয়ে ফেল করা বেশি সম্মানের ছিল।'

আমি বললুম, 'তাহ'লে কি বুঝব আমায় পাঠাবেন না?'

তিনি বললেন, 'এখন না।'

'কেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'পড়াশুনো এখানেই যেমন করছ বিলেতে গেলে যে কী ধিঙ্গি হবে কে জানে! তোমায় পড়তে পাঠাব বলেছিলুম, বখামি করতে নয়।'

'দেখুন, ব'খে যাওয়া না-যাওয়া সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে। বিলিতি ইউনিভার্‌সিটিগুলোতে যে কলকাতার চেয়ে বেশি বখা ছেলে আছে তা তো আমার মনে হয় না। ইচ্ছা করলে আমি স্বচ্ছন্দেই এখানেও ব'খে যেতে পারি। মানুষের ভালো বা মন্দ হওয়া নিয়তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।'

'তোমার মতামত শোনবার জন্যে আমি ব্যাকুল নই। এইসমস্ত অদ্ভুত ধারণা নিয়ে সেখানে গেলে তোমার কি আর টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে তবু চোখের সামনে না-থাকলেও হাতের কাছে আছ, কিন্তু সেখানে?...'

'তাহ'লে আমি কি বুঝব যে আমার যাওয়া হবে না?'

'না, তা নয়। আরো দিন-কতক তোমায় দেখি, তোমার মতি-গতি বদ্‌লায় কি-না। একটা বিয়ে-থা করো। তারপর সে-কথা ভাবা যাবে অখন!'

এইবার আমি তাঁকে একটু শুনিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তাই বললুম, 'আপনার বিশ্বাস আমি সেখানে গেলে ব'খে যাব, বিয়ে ক'রে গেলে যে সে-সম্ভাবনা কী ক'রে কমবে, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

তিনি সক্রোধে উত্তর দিলেন, আমি তোমার কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নই। তা-ও যদি যাও, একটা বিবি বিয়ে তো আর করতে পারবে না।'

'মাফ্ করবেন, কিন্তু আমি আপনার কথার ঠিক মানে বুঝতে পারলুম না। আপনার ধারণা আমি বিলেতে ব'খে যাব, সে বিয়ে ক'রে গেলেও যাব, না গেলেও যাব। তাহ'লে বিয়ে দিয়ে

আমায় সেখানে পাঠানো আমার অন্যায়ের পথে চলাতে কি সম্মতি দেওয়া হ'ল না? যদিও তেমন হবার কোনো আশঙ্কা নেই, তবুও আমার মনে হয় এ-উভয়ের মধ্যে মেম বিয়ে করাটাই অল্প পাপ।'

বয়স্কেরা ভেবে থাকেন তাঁদের কনিষ্ঠেরা চিরদিনই কচি খোকাটি থাকবে। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের কোনো কথাই জানা বা বলা অনুচিত। এই ধারণার মূলে হয়তো অর্থ ছিল, কারণ তখন বাল্য, ঠিক বলতে গেলে শৈশব-বিবাহের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন আর তার কোনো মানে নেই যেহেতু বাল্য-বিবাহ পুরুষের মধ্যে উঠে গেছে ; আর যৌনশাস্ত্রে এঁচোড়ে-পক্কতা স্ত্রীলোকের স্বভাবগত।

সে যাই হোক্, জ্যাঠামশায়ের মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এ-প্রসঙ্গে তোমার জ্যাঠামি আমি শুনতে চাই না। বিলেত যদি যেতে চাও বিয়ে ক'রে যেতে হবে।'

এবারে আঘাতটা কমই লেগেছিল, রাগই হয়েছিল বেশি। 'যাওয়া হোক্ বা না-হোক্ আমি বিয়ে করব না, কখনোই নয়', এই কথা ব'লে আমি সেখান থেকে চ'লে এলুম।

পরদিন কলকাতায় ফিরে গেলুম এম.এ. আর আইন পড়তে।

৬

পূর্বে বলেছি যে এবারে আঘাতটা অপেক্ষাকৃত কম লেগেছিল। কিন্তু বস্তুত তা নয়। একরকম ক্ষত আছে যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু অন্তরে তার ব্যাপ্তি সমস্ত অঙ্গ জুড়ে, এ-আঘাত সেইধরনের। অর্থাৎ জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন কলকাতায় আমি ফিরলুম, তখন তাঁরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, আমার উদ্যম, আশা-ভরসা, জীবনানন্দ কীরকম ক'রে ভেঙে গিয়েছিল। যদি আমার প্রকাশ্য হাসির কাঠিন্য এবং গূঢ় মর্মস্পর্শিতা তাঁরা বুঝতেন, তাহ'লে সম্ভবত, এ-আখ্যায়িকার রচনা হ'ত না। কিন্তু আমার মনে জেগে উঠেছিল একটা অপরিমেয় কঠোর অহঙ্কার, যার ফলে আমি ভেবেছিলুম যে, আমার মনোভাব, আমার আত্মমমতা তাঁদের সামনে প্রকাশ করার দীনতা কিছুতেই স্বীকার করব না। আমার মনে হয়েছিল, ভবিষ্যতে আমি মুক্ত, কারুর সাথে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ; আমি নির্ভরহীন, আমার নিজের জীবন আমায় গঠন করতে হবে পরের সাহায্য ব্যতিরেকে ; আমি বিদ্রোহী – স্নেহের, মমত্বের, কৃতজ্ঞতার গণ্ডির বাইরে।

নিজের কল্পিত দুঃখে আমি এমনিতরই বিভোর হয়েছিলুম যে, শরৎবাবুর পরিবারের মধ্যে যে একটা কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল অনেকদিন। কিন্তু এটা নিশ্চয় বলতে পারি যে আমার সেই আত্মহারা অবস্থার মাঝেও প্রথম পরিচয় থেকেই মঞ্জুলিকা আমার অনুভূতিহীন মনের ভিতরে জাগিয়ে দিয়েছিল একটা ক্ষীণ বিস্ময়ের সাড়া। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল যেন তাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি, কিন্তু কবে কোথায় আমাদের আদি আলাপ তা আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলুম না। মঞ্জুলিকা শরৎবাবুর প্রথম পক্ষের কন্যা, শম্ভুর সহোদরা। সে এতদিন তার মাতামহীর

কাছেই ছিল। সম্প্রতি তার দিদিমার মৃত্যু হওয়ায় সে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছে। কাজেই তার সঙ্গে পূর্বে আমার দেখাশুনা হয়নি।

শুনেছি শরৎবাবু যখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন মঞ্জুলিকার বয়স ছিল বছর-চারেক। কিন্তু সেই অল্পবয়সেই সে একটা দারুণ বিরোধের কারণ হ'য়ে ওঠে। শরৎবাবুর নবীনা গৃহিণীর যখন নিজের সন্তানাদি হ'ল না, তখন তাঁর স্বামীর সমস্ত অপত্যস্নেহের অধিকারিণী যে তাঁর সতীনের ওই ছোট্ট মেয়েটি হ'য়ে থাকবে, এই অবিচার তিনি কিছুতে সহ্য করতে পারেননি। ফলত শরৎবাবু মঞ্জুলিকাকে তার মাতুলগৃহে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে মফস্বলে থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ ক'রে, কলেজে ভর্তি হ'তে যাবে, এমনসময় তার দিদিমা মারা যান। তার পিতা দেখলেন, মেয়ের বয়স হচ্ছে, তার বিয়েও দিতে হবে, আর মামার বাড়িতে তার যোগ্য অভিভাবক কেউ নেই, কাজেই বাধ্য হ'য়ে শরৎবাবু মঞ্জুকে কলকাতায় আনলেন। কিন্তু মঞ্জু গৃহে প্রবেশ করা মাত্রই এতদিনের অশান্তির ছাই-চাপা আগুন আবার জ্ব'লে উঠল। এবারে আর মঞ্জুলিকা নিঃসহায় ছিল না, তার তরফে তার দাদা যোদ্ধৃবেশ ধারণ করলে। ফলত আমি কলকাতায় ফিরে দেখলুম যে পিতা-পুত্রে একটা বিষম মনান্তর চলছে। শম্ভুর আইন পরীক্ষা আগত-প্রায়। শুনলুম, এক্‌জামিনে পাশ হ'লে সে মফস্বলে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করবে। এই অতৃপ্তির বহ্ন্যুৎপাতের মধ্যে অটল, অচল, সজ্ঞাহারা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল লাঞ্ছিতা মঞ্জুলিকা। বয়সের সঙ্গে তার বোঝবার শক্তি বেড়েছিল বটে, কিন্তু বাক্‌শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি হয়নি। এটা যেন তার অগ্নিপরীক্ষা।

মঞ্জুর রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে কিছু শক্ত, কেন-না আমি তার কোনো উপমান খুঁজে পাচ্ছি না। তবে তাকে সুন্দরী বললে, সুন্দর শব্দের অবমাননা করা হয়। সে রূপসী মোটেই ছিল না, কিন্তু তার চেহারার মধ্যে যে একটা অপরিসীম লাবণ্য ছিল, সেটা স্বীকার না-ক'রে গত্যন্তর নেই। তার উপযুক্ত উপমা একটা খুঁজে পেয়েছি। আমি পশুতত্ত্ববিদ্ নই বা কখনো শিকার করিনি, কিন্তু আমার মনে হয় যে একবার আহত হরিণী যেমন প্রতি পদক্ষেপে নূতন আঘাতের ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে চলে, বাঁচার আনন্দে অধীর হ'য়ে ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ নিজের গতি সংযত ক'রে, ভয়ব্যাকুল নেত্রে চারদিক চেয়ে দেখে, মঞ্জুর মুখে তেমনিতর একটা উৎকণ্ঠার ছায়া দেখতে পাওয়া যেত, যেন অলখ ফাঁদের আশঙ্কায় সততই সে ত্রস্তা। প্রখরা ব'লে মনে হ'ত না। কিন্তু তাই ব'লে যে তাকে নির্বোধ ভাবা যেতে পারত তা-ও নয়। সে যেন জন্মান্ধ, আলো কাকে বলে কখনো দেখেওনি, কাজেই আলোর মহিমা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা, তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আলোকের তাৎপর্য কতকটা বুঝে নিয়েছে। এইটেই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এছাড়া তার অবয়বগুলি সুগঠিত, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে অসম, ইংরেজিতে হ'লে বলতুম irregular; চোখদুটি বড়ো-বড়ো, ভাসা-ভাসা, ঘন-পাটল বর্ণের ; নাকটি ক্ষুদ্র, একটু বাঁকা, ঈষৎ ঊর্ধ্বমুখী ; ঠোঁট পুরুষ্টু ; মুখটি আরেকটু ছোটো হ'লে ভালো হ'ত ; দেহের গঠন মামুলিধরনের ; দৈর্ঘ্যে একটু বেশির দিকে, প্রস্থে তার উল্টো ; বর্ণ পাকা ফসলের মতো।

আমার বর্ণনা যে নিখুঁত হ'ল না, তা আমি জানি। কিন্তু প্রতি অঙ্গটিকে বিশ্লেষণ ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃতি করবার মতো চিত্র মঞ্জুলিকা আমার মনে এঁকে যায়নি, কেন-না সে

ছিল আমার প্রিয়, আমার একান্ত প্রিয়। যারা আমাদের মনের মধ্যে সত্যিকারের ঘা দেয়, তারা তো আমাদের মানসপটে ফটোগ্রাফ রেখে যায় না, তারা এঁকে যায় সময়ের তুলি দিয়ে অবিনশ্বরের আলেখ্য—যার মাঝে প্রতি অবয়বের উপর সমান ঝোঁক দেওয়া হয়নি, বিকশিত হ'য়ে আছে শুধু একটি অঙ্গের বৈশিষ্ট্য, যার মাঝে ব্যষ্টির কোনো বার্তা নেই, শুধু ফুটে আছে একটি অনুপম, চিরন্তন সমষ্টি। তার উপরে এ আবার অনেকদিন আগের ঘটনা। আজ আমি নিজেই তাকে আর স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই না। সেইজন্যেই আজ বলতে পারছি যে সৌন্দর্যশাস্ত্রের হিসেবে তার আসন খুব উঁচুতে ছিল না। তখনকার দিনে তাকে রমণী-শিরোমণি ব'লেই ভেবেছিলুম, কারণ সে যে আমার নব বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী।

৭

কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, তাতে ক'রে দোষ তো স্খালন হয় না, বরং অপলাপের বোঝা স্থায়ী হ'য়ে যায়। এখানেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি যে সমস্তর জন্যেই দোষ আমার, সহস্রবার আমার। মঞ্জু যে শহরের বাইরে লালিত হয়েছিল, নাগরিকার কৃত্রিমতা, নাগরিকার অকালপক্কতা, নাগরিকার বালপ্রৌঢ়ি তার স্বচ্ছ, ঋজু স্বভাবকে আবিল ক'রে তুলতে পারেনি। তার হৃদয়ের মধ্যে স্নেহের যে-মন্দাকিনী অন্তঃসলিলা হ'য়ে ব'হে চলেছিল, তাতে প্রতিবিম্বিত ছিল অন্ধকার, মোহন, নীরব, অনন্ত অন্ধকার ; তাতে ছিল না বাসনার রশ্মি, তাতে ছিল না কামনার প্রলাপ ; তাতে শুধু ছিল গভীরতা, পাবনের শীতলতা, অবিচ্ছিন্ন, অনাদ্যন্ত শান্তি। সেই নির্ঝরিণীকে জগতের সমালোচনার ক্রূর আলোকে টেনে বার করেছিলেম আমি ; তাকে মুখর করেছিলেম আমি ; তার মুকুরিত বক্ষে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আনন্দে বিভোর হয়েছিলেম আমি ; আবার তাকে মরুর প্রান্তে দিশাহারা অবস্থায় রেখে ধর্মের ছায়ায় পালিয়েছিলেম, সে-ও আমি। তার অপরাধ সে আমায় বিশ্বাস করেছিল, তার দোষ আমার শঙ্খনাদে ভেবেছিল সে বুঝি সত্যই ভস্মাবশেষকে পুনর্জীবিত করতে যাচ্ছে।

তবে নিজের তরফ থেকে এইটুকু বলতে পারি যে তখন সত্যই ভেবেছিলুম, আমার মধ্যে জীবনীশক্তি আর একটুও নেই নৈরাশের আগুনে জ্ব'লে-পুড়ে ভিতরে সব ছাই হ'য়ে গেছে, বাইরে প'ড়ে আছে শুধু আমার খোলস, সত্তাহীন, বিলোল, শূন্য খোলস। মনে হয়েছিল আমি দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল, অনুভূতিহীন, চলৎশক্তিহীন, উদ্দেশ্যহীন অন্ধ মাত্র। কাজেই তখন মঞ্জুকে আঁকড়ে ধ'রে নিজের তুলাসাম্য পুনরায় বজায় করতে [রাখতে] হয়েছিল, তার স্থৈর্যে অনুভূত হয়েছিল জগতের স্থায়িত্ব, তার প্রণয়ে খুঁজে পেয়েছিলুম জীবনের লক্ষ্য। এক কথায় তখন মঞ্জুলিকাই হ'য়ে উঠেছিল আমার বাঁচার একমাত্র কারণ।

অন্যসময় হ'লে এমনতর মনোভাব বেশিদিন থাকত না, শম্ভুর নির্মম বিশ্লেষণে আমার আত্মমমতা অচিরেই পরিহসনীয় হ'য়ে পড়ত। কিন্তু এবারে শম্ভুর কৌতুকের উৎস গৃহদাহের আগ্নেয়াদ্রির তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল। যে শম্ভুর উপরে নির্ভর ক'রে আমি আমার নবযৌবন গ'ড়ে তুলেছিলেম, তাকে সম্পূর্ণ নির্ভরহীন দেখে আমার আত্মবিশ্বাস কিছু বাড়বার কথা নয়। তার উপরে আবার আজকাল তাকে আর পাওয়াই যেত না। সে সমস্ত দিন থাকত

বাড়ির বাইরে, যেন আমার কাছে তার অনুভূতির গভীরতা ধরা দিতে চায় না। আমারও কলকাতায় অপর বন্ধু ছিল না ; বাল্যাবস্থা পাড়াগাঁয়ে কাটিয়ে আমি শহুরে ছাত্রের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হ'য়ে গিয়েছিলুম, তারাও আমার কোনো হদিস খুঁজে পেত না। ফলত গর্বিত ব'লে ছাত্রমহলে আমার একটা দুর্নাম হ'য়ে পড়েছিল, যদিও বস্তুত সেটা গর্ব নয়, সঙ্কোচ। কাজেই এখন মঞ্জু ছাড়া আর আমার গতি ছিল না।

আমাদের সখ্যের শুরু উভয়ের সাহিত্যানুরাগে। এত শীঘ্রই যে তাকে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল, তাতে মঞ্জু হয়েছিল অত্যন্ত মর্মাহত। শরৎবাবু যে তাতে সহানুভূতি প্রকাশ করেননি তা নয়, কিন্তু তাঁর অপত্যস্নেহ সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকত তাঁর দাম্পত্যপ্রীতির নিষ্পেষণে। কাজেই মেয়েকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধ থেকে তিনি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার লেখাপড়ার ভার আমার উপর দিয়ে।

তারপরে শম্ভু গেল গয়ায় জীবিকা উপার্জনে। যে-শম্ভু অবিচলতায় আমার আদর্শ সেই যখন মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ পুঁছে আমায় কাঁপা গলায় 'তুমিই আমার ভরসা, মঞ্জুর উপরে যেন-না অত্যাচার হয়। একটু চোখ রেখো', এই কথা ব'লে বিদায় নিলে, তখন মঞ্জুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা যে একটু বে[ি]শ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী? আমার মনে এতদিন ছিল শুধু বন্ধুত্ব, এখন থেকে তার সঙ্গে মিশে গেল রক্ষণীয়তা। তার ভিতরের কথা বলতে পারি না। কিন্তু একটা গর্ব আছে যে শম্ভুর উপরে তার যে-বিশ্বাস, যে-নির্ভর ছিল, তার অধিকাংশই সে আমায় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ক্রমশ গোল বাধতে লাগল আমাদের শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্কে। এতদিন আমরা দু-জনে একসঙ্গে সমস্ত পাঠ্যাপাঠ্যই অবাধে প'ড়ে যেতুম, কিন্তু আজকাল তেমনভাবে প্রেমের কবিতা পড়তে গেলে কীসের সঙ্কোচে যে আমাদের বাক্‌রোধ হ'য়ে আসত, তা বুঝতে পারতুম না। আস্তে-আস্তে সেই সঙ্কোচ আবেগে পরিণত হ'ল ; তারপরে কখন একসময়ে অলখিতে আমার চিরন্তনী নায়িকার শূন্য সিংহাসন মঞ্জু অধিকার ক'রে নিলে।

ইতিহাস লেখার একটা বড়ো অসুবিধা আছে যে, তাতে ঘটনার অনুপাত রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। ছাপার পাতার মধ্যে সময়ের চঞ্চল চরণের চিহ্ন একটু অস্বাভাবিক-রকমের ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠে। কিন্তু তার কোনো প্রতিকার দেখতে পাই না কারণ অতীতের চিত্র পরিপ্রেক্ষণশূন্য ; অনেকসময়েই স্মৃতি বড়োকে ছেড়ে দিয়ে সঞ্চয় ক'রে রাখে অণিমাগুলিকে বিশেষতঃ সে-স্মৃতি যদি হয় প্রণয়-স্মৃতি। যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যাপারের সংস্পর্শে সেই যুগান্তরের একটি বছর আমার কাছে মহিমামণ্ডিত হ'য়ে আছে, তার বিস্তারিত বিবরণ কারুরই ভালো লাগবে না, কেন-না তার গৌরব যে আজকে আমারই চশমা-পরা চোখে ম্লান ব'লে লাগে। কিন্তু যেদিন আমরা সখ্যের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রেমের উলঙ্গ নির্মল স্বরূপকে দেখতে ভয় পাইনি, যেদিন আমরা সত্যের আহ্বানে স্তব্ধ হ'লেও, কর্ণরোধ করিনি, যে-দিন আমি

"দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে",

সেদিনের কাহিনীটা একটু বলা আবশ্যক। সে যে আমার স্বপ্ন-প্রয়াণের শেষদিন।

সেদিন শীতের ছোটো বেলা ফুরিয়ে গেছে। সন্ধ্যার ধূমলিমায় আমার ঘরটি আচ্ছন্ন-প্রায়। কিন্তু আমার শরীরটা ছিল না ভালো ; তাই আমি নিয়মমতো না-বেরিয়ে, খোলা জানলার ধারে ব'সে দিগঙ্গনাদের দীপালি জ্বালানো দেখছিলুম। আমার পায়ের গোড়ায় কারপেটে একখানা কী কেতাবের বাকি কয়েক পাতার উপর ঝুঁকে প'ড়ে মঞ্জু চেষ্টা করছিল অন্ধকারকে ফাঁকি দিতে। ঘরে তখনো আলো দেওয়া হয়নি। কাজেই দক্ষিণের বারান্দাস্থ শরৎবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর পক্ষে আমাদের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আগে কী কথা হয়েছিল শুনিনি বা লক্ষ করিনি। হঠাৎ গৃহিণীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে আমার নির্লিপ্ত মনে প্রণিধান জেগে উঠল।

তিনি তাঁর স্বামীকে বলছিলেন, 'তোমার মতন এমন বাপ তো সাতজন্মে দেখিনি।' শরৎবাবু যথাযোগ্য বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

তাঁর পত্নী বললেন, 'কেন? মেয়েটি তো বুড়োধাড়ি, তার বিয়ে দিতে হবে না?'

'সেইজন্যেই তো ওকে এখানে এনেছি, কিন্তু পাত্র না-পেলে কী করি বলো। তবে এক উপায় আছে, কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখব তাকে কন্যাদান করলে, কাজটা এখনই সুসম্পন্ন হ'য়ে যায়।'

'ঠাট্টার কি একটা সময়-অসময় নেই? এদিকে কলকাতা শহর-সুদ্ধু লোক যে টিটি করছে। অমন বয়সে আমাদের সাতবার বিয়ে হ'য়ে গেছে।'

এই আকস্মিক দুঃসংবাদেও শরৎবাবু বিচলিত হলেন না।

'আর লোকেরই-বা কী দোষ। অত বড়ো সমর্থ মেয়ে, কোথায় ঘরের কাজ শিখবে, তা নয় চব্বিশ ঘণ্টা কোথাকার কে বাইরের ছোঁড়ার সঙ্গে কাটাচ্ছে। কী হচ্ছে, না পড়া। পড়া না আমার মাথা। কী যে করে ভগবানই জানেন।'

শরৎবাবু এবারে ভীত স্বরে বললেন! 'ছি, ছি, ও কী কথা বলছ! সুরেশ বাইরের ছেলে কী ক'রে হ'ল? ওর জ্যাঠা আর আমি যে ভায়ের মতো ছিলুম। আর তুমিই তো বলেছ, একশোবার বলেছ যে ওর মতো ছেলে আজকাল আর দেখা যায় না।'

'তখন কি আর ওর গুণের কথা জানতুম?'

শরৎবাবু আরো সঙ্কুচিত স্বরে বললেন, 'কী গুণ?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে গৃহিণী বললেন, 'তা ও যদি অত ভালো, ওরই সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে দাও না।'

'সে কী ক'রে হবে? আমরা যে ব্রাহ্ম। ওর জ্যাঠা এখন শুনেছি বড়ো গোঁড়া হ'য়ে গেছে। এ-বিয়েতে সে রাজি হবে কেন?'

তাঁর স্ত্রী গর্জন ক'রে উত্তর দিলেন, 'তা যদি না-হবে ভাইপোর অন্য ব্যবস্থা করতে পারেনি, ভাইপোকে গেরস্তর মা-বোনকে বেইজ্জত [করতে] বারণ করতে পারেনি? আমরা ব্রাহ্ম ব'লে কি আমাদের মানসম্ভ্রম কিছু নেই?'

'তুমি অত চ'টে যাচ্ছ কেন? এ তো ব্যস্ত হবার কথা নয়?'

'জানি না বাপু, নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ যদি ব্যস্ত হবার কথা না-হয় তবে ব্যস্ত হবার কথা কী? আমি কিন্তু ব'লে দিলুম, অন্য কারুর সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া দুষ্কর হবে।'

'তোমার সন্দেহ আমার মনেও নিচ্ছে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহ'লেও তো কিছুদিন অপেক্ষার দরকার। সুরেশ যে এখনো বড্ড ছেলেমানুষ।'

'তবে তাই করো। সুরেশ বড়ো হোক্, মেয়েটির সর্বনাশ ক'রে এখান থেকে পালাক, অন্য বিয়ে করুক, আর তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে অপেক্ষা করো। আমারও-বা ছাই পরের মেয়েকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? যা হবার হবে। আমায় কিন্তু দোষ দিও না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা তুমি রাগ করো কেন, আমি এ-বিষয়ে মঞ্জুর আর ওর দু-জনেরই মত জানব অখন। একটু সবুর করো না।'

'আমার নাকে-কানে খৎ আর যদি কখনো তোমার আদুরে মেয়ের কথা তুলি। কিন্তু স্বভাব। চোখের সামনে এমনটা হ'য়ে যাবে দেখব অথচ কিছু বলব না, পারি না। কী জানি, বাপু, একসঙ্গে দিনরাত থাকছে, পাশের ঘরে রাত্তিরে শুচ্ছে। তাতেও যদি দোষ না-হয়, তবে দোষ যে কী তা তো বুঝি না। আমার কী, নিজেই ভুগবে।' এই কথা ব'লে গৃহিণী নীরব হ'লেন। মনে হ'ল যেন অশ্রু মুছছেন।

রাগে, ক্ষোভে, অপমানে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছিল, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমি নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ছিলুম, শরৎবাবুর পত্নীর নীচতায় আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলুম। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলুম আমার প্রতি এই অত্যধিক আদরের অর্থ কী। শম্ভু গয়ায় যাওয়ার পর থেকে আমার যত্নের মাত্রাটা এত বেড়েছিল যে আমার মতো আদুরে ছেলেও একটু চমৎকৃত হ'য়ে যায়। শম্ভুর শোবার ঘর আমাকে দেওয়া, খাবার সময় মঞ্জুকে দিয়ে আমার তত্ত্বাবধান করানো, আমাকে নিজের পেটের ছেলে ব'লে সম্বোধন করা, এ-সমস্ত যে একটু অস্বাভাবিক তা আমি উপলব্ধি করেছিলুম। কিন্তু শরৎবাবু আমাকে গোড়া থেকেই খুব ভালোবাসতেন আর আমি ভেবেছিলুম যে শম্ভুর মতো চক্ষুশূলের সঙ্গ করি ব'লেই তার বিমাতা আমাকে পছন্দ করতেন না। এখন বুঝলুম যে সে-সব উদ্দেশ্যবিহীন নয়, মঞ্জুকে বিদায় করবার একটা কৌশল মাত্র।

এতক্ষণ অবধি আমি মঞ্জুর পানে তাকাতে পারিনি। এইবারে অতিকষ্টে সঙ্কোচ সত্ত্বেও তার দিকে চাইলুম। সে নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, ঘর অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল, তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু মনে হ'ল তার চোখদুটি আমার মুখের 'পরে ন্যস্ত, আর সে-দুটো জ্বলছে; নিখিলের নিরুদ্ধ বাসনায় জ্বলছে; যেন চিরতুষার ঢাকা গিরিশৃঙ্গের প্রথম বহ্ন্যুৎপাত। আমি ডাকলুম, 'মঞ্জু!' সে কোনো উত্তর না-দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কী এক নবজাগরিত রুদ্রশক্তির তাড়নায় আমার উপর ঝুঁকে প'ড়ে রূঢ়তার সঙ্গে আমায় একবার চুমু খেয়েই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। উঃ! আমার মনে হ'ল কে যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে আমার ঠোঁটদুটোকে পিষে, আমার হৃদয় অবধি সমস্ততে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমি তার অনুসরণ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু প'থের মধ্যে অন্ধকারে, একটা টেবিল প'ড়ে গেল এবং আমারও মত্ততা কাটল। আবার এসে চেয়ারে বসলুম। কিন্তু একটা অশান্তির দানব আমার ঘাড়ে

চেপেছিল, সে-ঘরটা মঞ্জু-বিহনে হঠাৎ অসহ্য হ'য়ে উঠল। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলুম।

৮

নির্জন কলেজ স্কোয়ারে পাগলের মতো দ্রুত পায়চারি করলে শরীরে যে-তাপ সঞ্জাত হয় তাতে ক'রে পৌষ-রজনীর কন্‌কনানি নিবারণ হয় না, বিশেষত দেহটা যদি থাকে অর্ধাবৃত। শরৎবাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করব না, এই সঙ্কল্প নিয়ে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার মনের মধ্যে যে একটা অতনু আনন্দ লুকিয়েছিল, তার অস্তিত্ব তখন অনুভব করিনি। ক্রমশ আমার মাথা ঠান্ডা হ'য়ে আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে সেই হর্ষ-নীহারিকার মধ্যে থেকে এক অনুপম স্বপ্ন-জগৎ অল্প-অল্প ক'রে আকার পেতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলুম যে তাঁরা আমায় কৌশলে বিবাহজালে ফেলতে প্রয়াস পাননি, আমিই তাঁদের বাধ্য করেছি মঞ্জুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে। চলতে-চলতে হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলুম যে মঞ্জুকে না-পেলে আমার দিন দুর্বহ হ'য়ে উঠবে। মঞ্জুই যে আমার জীবনের একমাত্র সার্থকতা, তাকে বাদ দিলে আমার জীবনের আর বাকি কী থাকবে! একবার এক মুহূর্তের জন্যে আমার চোখের সামনে ভেসে এল জ্যাঠামশায়ের অপ্রসন্ন মুখের ছবি, একবার এক মিনিটের জন্যে জ্যাঠাইমার অশ্রু-আকুল চোখের কল্পনায় আমি বিচলিত হ'য়ে পড়লুম, একবার চকিতের মতো বিলেতের বাঁশি আমার পথিক হিয়াকে সিন্ধুপারে আহ্বান করলে, কিন্তু সে-সমস্তই পলকের; সে-সব ছাড়িয়ে তাড়িয়ে জেগেছিল মঞ্জুর দুটো নির্নিমেষ নয়ন। সে দুটি আঁখির তলায় যে আদিম, অসীম, অসংযত বহ্নির অচির বিদ্যুৎপ্রকাশ আমি দেখেছিলুম, তার জাগরণ যে আমারই মন্ত্রে, তার দীপ্তি যে আমারই জন্যে। সেই আগুনের শিখায় বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যতের খাদ শূন্য হ'য়ে হয়েছিল কাঞ্চনময়। কিন্তু মানুষের মনোভাব কি কখনো বিশুদ্ধ, কখনো অবিমিশ্র? আমার বুকের কোনো এক কোণে কি জ্যাঠামশায়ের উপর শোধ তোলার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল না? এ-প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? আমি তো না।

সেদিন রাত্তিরে যখন শরৎবাবুর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে তাঁর ঘরে গেলুম আমার ইচ্ছা ছিল আমাদের আলাপন হয় নিভৃতে। কিন্তু তা ঘ'টে উঠল না। তাঁর স্ত্রী-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সত্য বলতে কথাবার্তার ভার তাঁর স্ত্রী-ই স্বয়ং নিয়েছিলেন, শরৎবাবু ছিলেন শ্রোতা মাত্র, অলঙ্কার মাত্র। কলেজ স্কোয়ারের নৈশ নির্জনতায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল বাস্তবিক তত সহজ হ'ল না। অল্পক্ষণ কথা কওয়ার পরেই গৃহিণী আমাকে বিনা-বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন যেন আমি একজন ঘোর পাপিষ্ঠ, তবুও সদয় হ'য়ে তিনি আমায় বিমুখ করতে ইচ্ছা করেন না। শেষে প্রায় দু-ঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর, বাক্যের আদি-অন্তে আমায় পিতৃ সম্বোধন ক'রে তিনি যখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন, তখন আর আমার আত্মসম্ভ্রমের এক তিলও অবশিষ্ট ছিল না। আমার সত্যিই মনে হ'ল আমি একান্ত দীন, হীন, অভাজন, আমার হাতে কন্যা সমর্পণ করা আর তাকে জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। তখন

যদি শুনতুম যে মঞ্জুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, সেটা আমার কাছে কিছুই আশ্চর্য লাগত না, ভাবতুম সেটাই ন্যায়সঙ্গত। মঞ্জুর সৎমার কাছে আমি যে চিরকৃতজ্ঞ, এমনতর মনোভাব হবার আগে ছুটি পাইনি। শরৎবাবু শুধু একটা শর্ত করেছিলেন যে আমার জ্যাঠামশায়ের মত চাই-ই চাই। তিনি তাঁকে পত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর আমি, মুখ্যত তাঁর স্ত্রী, স্থির করেছিলুম যে আমি নিজে গিয়ে জ্যাঠামশায়ের সম্মতি নিয়ে আসব। পরের দিন সকালে রওনা হওয়া স্থির হ'ল।

সেদিন রাতে আমি আধো-জাগরণ আধো-ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলুম যে মঞ্জু আমার ঘরের ভিতরে ঢুকতে চাইছে কিন্তু পারছে না। সে কাঁদছে, মিনতি করছে, মাথা খুঁড়ছে, তবুও আমি দরজা চেপে দাঁড়িয়ে আছি। সেটা যে আমার ইচ্ছাতে তা নয়, কার কঠোর আদেশে, সে-দরজার থেকে এক পা-ও নড়বার আমার শক্তি নেই ব'লে। আমি চাইছি তাকে এইটুকু বুঝিয়ে বলতে, কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলতে পারছি না, কারণ আমি জানি যে আমার সমস্ত হৃদয়টা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, কথা বলতে গেলেই সেই ছাইয়ে আমার গলা বন্ধ হ'য়ে যাবে। চম্‌কে আমার ঘুম ভেঙে গেল কী এক অজানা উৎকণ্ঠায়, কী এক ভাবী বিপদের আশঙ্কায়, কী এক অনামা দুর্ভাবনার গুরুত্বে। দেখলুম সেই শীতের মধ্যেও আমার কপালে ঘাম। তারপরে শত চেষ্টাতেও ঘুম এল না। ভয়ে, উত্তেজনায়, আকাঙ্ক্ষায় আমার হৃদয়ের ভিতরে যে তীব্র স্পন্দন চলেছিল, তা কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারলাম না। সেই ঘরে প্রতি রাত্রে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছি, কিন্তু সেদিন আর কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না যে আমার আর মঞ্জুর মাঝে তফাৎ হচ্ছে শুধু একটি অর্গলিত দ্বারের।

খানিকবাদে আবার ঢুলতে শুরু করলুম, কিন্তু হঠাৎ পাশের ঘরের থেকে ছিট্‌কিনি খোলার শব্দে আমার বিজড় দেহ বিষম সজাগ হ'য়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভীষণ ভয় হ'ল, ইচ্ছা করল ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় ছুটে পালাই। আমার চোখ চাইতে সাহস হচ্ছিল না পাছে দেখি মঞ্জু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এমনিভাবে যেন এক যুগ কাটল, কিন্তু সমস্তই নীরব। তখন আস্তে-আস্তে চোখ খুললুম। কই কেউ তো কোথাও নেই। কিন্তু তবুও সেই ছিট্‌কিনির আওয়াজটা যে মিথ্যা তা ভাবতে পারলুম না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে বিছানায় ব'সে-ব'সে কাঁপছিলুম, আর মঞ্জুর দ্বারটা পরীক্ষা ক'রে দেখব কি-না ভাবছিলুম, এমনসময় আবার সেই আওয়াজ। এবারে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে ছিট্‌কিনিটা কেউ যেন বন্ধ ক'রে দিলে। কম্পিত চরণে, শিহরিত দেহে, স্পন্দিত হস্তে তাব দরজাটা ঠেললুম। সময় যে চ'লে গেছে, দ্বার যে বন্ধ, আর খুলবে না, আর কিছুতেই খুলবে না। আমি আস্তে-আস্তে সেই রুদ্ধ দ্বারের আড়াল থেকে ডাকলুম 'মঞ্জু', 'মঞ্জু'। কোনো সাড়া পেলুম না। শুধু মনে হ'ল, কে যেন ও-পাশে মুখের ভিতরে আঁচল দিয়ে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে! ভোরের ময়লা আলোতে ঘর অল্পে-অল্পে ভ'রে উঠল।

৯

ট্রেনে উঠলেই আমার একটা চাঞ্চল্য হয়। সেটা অনেকসময় গন্তব্য স্থানে পৌঁছনোর আগ্রহে, অনেকসময় যাত্রাস্থল ছাড়ার বিষাদে। সে-বারে কিন্তু যে-অস্থিরতা আমার উপরে আধিপত্য করেছিল, তা উপরোক্ত কারণদুটোর কোনোটার জন্যেই নয়। কলকাতায় ফেরাতে আমার ইচ্ছা থাকলেও, তার সঙ্গে একটা ভয় মিশ্রিত ছিল ; আর জ্যাঠামশায়ের কাছে যেতে আমি ছিলুম সম্পূর্ণ অনুৎসাহ। তাঁর সঙ্গে আমার বচসার পরিণাম যা হবে তা আমার অবিদিত ছিল না। আমি যাচ্ছিলুম তাঁর মত নিতে নয়, তাঁকে শুধু বুঝিয়ে দিতে যে আমার 'পরে তাঁর আর কোনো জোর নেই, আমি মুক্ত, আপনার ভাগ্যের স্বামী। কাজেই দেশে ফিরছিলুম দম্ভের সঙ্গে, ভয়ের সঙ্গে নয়। কিন্তু তবুও এত উদ্বিগ্ন কেন হ'য়ে পড়েছিলুম? কী জানি কেন আমার কেমন মনে হচ্ছিল যে মঞ্জুর সঙ্গে আমার মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নয়। সে যখন আমাকে ডেকেছিল আমি যে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি, সে যখন আমার প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল, আমি যে ছিলেম নিশ্চল। এখন যে-দ্বার বন্ধ হ'য়ে গেছে, সে-আগল তো আর খুলবে না। এখন যে-সময় চ'লে গেছে, হাজার মাথা খুঁড়লেও তো আর সে-মুহূর্ত ফিরবে না। একটা কোনো বিস্মৃত ইংরেজি পুস্তকের একটা লাইন কেবলই আমার মনে আসছিল, 'আমাদের অনুতাপ, আমাদের তীব্রতম অনুতাপ, সে তো আমাদের পূর্ব-কৃত পাপের জন্যে নয়, সে শুধু আমাদের মূঢ়তার জন্যে।'

জ্যাঠামশাই খামখেয়ালিপনা কোনোদিনই ভালোবাসতেন না, আমার হঠাৎ আবির্ভাবে তাঁর মেজাজ প্রসন্ন হ'ল না। তিনি বললেন. 'যদি বিলেত-যাওয়া নিয়ে ফের গোলমাল করতে এসে থাক, আগেই ব'লে রাখছি, আমার মতের কিছুই বদল হয়নি, বিলেত-যাওয়া এখন তোমার হবে না, আগে বিয়ে করো তারপরে।'

জ্যাঠাইমা স্নেহার্দ্র স্বরে আমার হ'য়ে জবাব দিলেন, 'আহা, বাছা এতটা পথ এল কোথায় তাকে একটু আদর-যত্ন করবে, না খেঁকিয়ে কথা শুরু। আয়, আয় বাবা। তোর শরীর কি ভালো নেই? মুখখানি অমন শুক্‌নো কেন?'

আমি রইলেম নিরুত্তর। জ্যাঠামশায়ের তর্জন-গর্জন চিরদিনের তরে নীরব করার অস্ত্র আমার কাছে লুকুনো ছিল।

কিন্তু বোধহয় জ্যাঠামশাই মনে-মনে প্রমাদ গনেছিলেন। বিনা-তর্কে সদুপদেশ নেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, আমার মৌনীতে তাঁর শঙ্কিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। কাজেই কথাটা আমাকেই পাড়তে হ'ল। পরের দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর কোনোরকমে চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে আমি ব'লে ফেললুম, 'বিয়ে না-করলে আপনি কি আমার বিলেত যাওয়ায় কিছুতেই মত দেবেন না?'

জ্যাঠামশাই মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে উত্তর দিলেন, 'এক কথা আমি বার-বার বলতে পারি না। কিছুতেই না।'

'আমি বিয়ে করতে রাজি আছি।'

'তোমার সুমতি দেখে খুশি হলুম, কিন্তু বিয়ে তো আর বললেই হয় না।'

'কলকাতায় পাত্রী স্থির ক'রে আপনাদের মত নিতে এসেছি।'

ব্যঙ্গের আড়ালে ক্রোধ লুকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব আনন্দের কথা। এখন আমাদের ভাবী বৌমার রূপবর্ণনাটা শোনা যাক্।'

আমি একটু রুষ্ট স্বরে বললুম, 'তিনি আপনার অপরিচিতা নন, শরৎবাবুর ও-পক্ষের মেয়ে মঞ্জু।'

জ্যাঠামশায়ের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হ'য়ে গেল, তাঁর চোখে ক্রোধের আগুন হঠাৎ নিবে গেল। কীরকম এক নির্জীব সুরে তিনি যেন নিজেকে নিজে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'এ-বিয়ে কী ক'রে হ'তে পারে? কিছুতেই না, কিছুতেই না।'

তিনি অনেক যুক্তি দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনোটাই তাঁর মুখ দিয়ে ভালো ক'রে বেরুল না। আমার মনে হচ্ছিল যেন তাঁর কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে। তাঁর চোখে দেখলুম একটা কীসের কাতরতা, তাঁর কথার মধ্যে একটা অজানা মিনতি। কিন্তু আমি তাতেও টললুম না। আমি বললুম, 'দেখুন, এ-বিয়ের উপর আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এতে আপনার কোনো অধিকার নেই। বার-বার আপনি যে আপনার মর্জি অনুসারে আমার জীবন নিয়ে খেলা করবেন তা হবে না। আপনার মত থাকে বা না-থাকে মঞ্জুকে আমি বিয়ে করবই।'

আমার এই নভেলিয়ানাতেও জ্যাঠামশাই ক্রুদ্ধ হ'লেন না। তিনি আরো নরম সুরে আমায় বললেন বিলেত যাও যা খুশি করো, যাকে ইচ্ছে বিয়ে করো কিন্তু মঞ্জুকে না।

আমি জ্যাঠামশাইকে এমন নরম আর কখনো দেখিনি। জিনিসটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। আমি ঝগড়া করবার জন্যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে কোমর বেঁধে এসেছিলুম, এই বিনয়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। আমার মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সব কথা খুলে বলছেন না। অন্য কিছু হ'লে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে তাঁর কথায় সায় দিতুম। কিন্তু এ যে মঞ্জুর মধ্যে আর জ্যাঠামশায়ের মধ্যে নির্বাচন।

আমায় অচল দেখে শেষে তিনি বললেন, 'দেখো সুরেশ, তুমি ছোটো ; আমার ছেলের সমান, তোমার কাছ থেকে আজ্ঞাপালন আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমি তোমাকে জ্যাঠা হিসেবে কিছু বলছি না, বন্ধু হিসেবে অনুরোধ করছি, তুমি এ-কাজ ক'রো না! তোমাকে সব কথা বলা যায় না, কিন্তু এটা জেনো আমি তোমার সুখের জন্যেই এই অনুবোধ করছি।'

কথাগুলো আমার বড়োই বেসুরো, বেখাপ্পা লাগল। আমার সঙ্কল্প আর পূর্বের মতো দৃঢ় ছিল না। কাজেই কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের দুর্বলতার শোধ তুলে আমি উত্তর দিলুম, 'আমি আপনার কথা শুনতে রাজি আছি যদি আপনি এ-বিয়ের বিরুদ্ধে কোনো সঙ্গত যুক্তি দিতে পারেন। নয়তো আমার চিরদিনের সুখশান্তি বলিদান দেওয়ার কারণ দেখি না।'

জ্যাঠামশাই আরো নিস্তেজ হ'য়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কী একটা বলবার জন্যে মুখ খুললেন, তারপরে আবার কী ভেবে নির্বাপিত চুরুটটিকে জ্বালিয়ে নীরবে ব'সে রইলেন। আমি বুঝলুম, তিনি একটা কোনো আবেগ চাপতে চেষ্টা করছেন।

একটু বাদে কাজের অছিলে ক'রে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি একুশ বৎসরের মধ্যে তাঁকে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরুতে দেখিনি।

১০

সন্ধ্যার সময়ও জ্যাঠামশাই ফিরলেন না, ব'লে পাঠালেন যে ক্লাবে খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমার মেজাজ ক্রমশ অত্যন্ত রুক্ষ হ'য়ে আসছিল। এ কীরকমের আবদার, কিছু বলবেন না কইবেন না, অথচ তাঁর অনুরোধ আমাকে রাখতে হবে। আমার রাগের আসল কারণ যে আমি যে-সমস্ত বক্তৃতা মনে-মনে রচনা ক'রে এসেছিলুম, তার একটাও প্রয়োগ করতে হ'ল না। আমি আশা করেছিলুম রাগ, চিৎকার, কিন্তু পেলুম মিনতি, নির্বাক মিনতি। আমি ঠিক করেছিলুম যে বাড়ি থেকে আমি বীরদর্পে বেরিয়ে যাব, কিন্তু কার্যত হ'ল যে জ্যাঠামশাই চোরের মতো পালালেন। এ-সবই অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত, আমার একটুও ভালো লাগছিল না। যত বেলা যেতে লাগল আমার মন একটা অজানা অমঙ্গলের সূচনায় ছমছম্ করতে লাগল। ইচ্ছা করল পালাই, এ-সকল পেছুনে ফেলে মঞ্জুর কাছে পালাই। আমি জানতুম যে আমি যদি জোর ক'রে বিয়ে করি জ্যাঠামশাই প্রতিবাদ করতে সাহস করবেন না। কিন্তু কেন করবেন না সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটন না-ক'রে সেখান থেকে আমার নড়বার শক্তি ছিল না। আমার বুকের মধ্যে চলেছিল একটা দুর্‌দুরুনি, আমার হাত-পায়ে একটা থর্‌থরানি, যেটা আমবাগানে অনেক পায়চারি ক'রেও, ইঁদারার ধারে অনেকক্ষণ ব'সেও আমি কিছুতেই থামাতে পারলুম না। এই অকারণ আতঙ্কের জন্যে নিজের উপর ভয়ানক রাগ হ'তে লাগল। তাই শেষে গেলুম জ্যাঠাইমার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

জ্যাঠাইমা অভ্যাসমতো কুটনো কুটছিলেন, তাঁর মুখে একটা প্রসন্নতার হাসি, তাঁর বুকে একটা অন্তর্লীন আনন্দের উৎস যেন ফেটে বেরুচ্ছে। কাজেই ঝগড়া করাটা সহজ হ'ল না, চুপ ক'রেই ব'সে রইলুম।

জ্যাঠাইমা আলু কুটতে-কুটতে একটু হেসে বললেন, 'আমি জানি তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিস। কিন্তু, বাবা, আমি তো তোর বিয়েতে অমত করিনি ; আমি বলছি, তুই তোর মঞ্জুকেই বিয়ে কর। বুড়ি জ্যাঠাইমাকে না-হয় দু-বছর পরে ভুলতিস — না, না, মিথ্যা কথা ব'লে তোকে আর পাপ বাড়াতে হবে না,—এ না-হয় দু-দিন আগেই ভুললি। তুই কারুর কথা শুনিসনি, এই বিয়েই কর। আমরা তো দু-দিনের, কিন্তু তোর স্ত্রী যে চিরদিনের রে। সে কি মনের মতো না হ'লে চলে?'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মনে-মনে কী বিচার ক'রে জ্যাঠাইমা আবার বলতে শুরু করলেন, 'তোর জ্যাঠার তো আর নিজের কথা মনে নেই, তাই আপত্তি করছেন। উনিও ছেলেবেলায় তোরই মতন ছিলেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া-জানা একটি একেলে মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু আমার শ্বশুর তাতে রাজি হলেন না। কাজেই আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হ'ল। তোর কাছে আর বলতে কী, বাবা, সেইজন্যেই আমাদের মনের আর কখনো মিল হ'ল না। উনি ওঁর স্ত্রীর কাছে চেয়েছিলেন সঙ্গ, আমি কিন্তু ছিলুম বড্ড সেকেলে, স্বামীর সঙ্গে খোলাভাবে মেলামেশা আমার জ্ঞানের বাইরে। কাজেই আমি ওঁকে সঙ্গ দিতে পারিনি, দিয়েছিলুম শুধু সেবা। কিন্তু আমি মনে-মনে ওঁর সমকক্ষ হবার চেষ্টা করতুম। ওঃ সে কি কম হাঙ্গাম ; বাপ-পিতেমর কুসংস্কারগুলোকে একে-একে শুধরে নেওয়া। সে তো আর

একদিনের কাজ নয়, লেগেছিল দশ-বিশ বছর। যখন ভাবলুম, আমি ওঁর সঙ্গী হবার উপযুক্ত, মনের গড়নে প্রায় একরকম হ'য়ে এসেছি, তখন হঠাৎ একদিন দেখলুম, উনি গেছেন বদ্‌লে ; আমি যাকে কুসংস্কার ব'লে অনেকদিন আগে পথের ধারে ফেলে দিয়ে এসেছি, উনি তাকে ফেরার পথে অমূল্য ধন মনে ক'রে বুকে তুলে নিয়েছেন। ওঃ সে কী কষ্ট! তখন তো আর আমার ফেরার উপায় ছিল না, অত বয়েসে কি আর নতুন ক'রে শেখা যায়। আর গেলেও যাকে অনেক চিন্তার পরে মিথ্যা ব'লে ত্যাগ করেছি, তাকে কি ফের সত্য ব'লে নেওয়া যায়। হয়তো সে-অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চেষ্টা করতুম, কিন্তু তখন আমার জীবনে একটা নতুন উদ্দেশ্য এসেছে, তোকে মানুষ করা। ফলে হ'ল উনি যে-পথ ছেড়ে এসেছেন আমি চললুম সেই পথের অন্তের সন্ধানে, আর উনি—আমার ছাড়া-পথের গোড়া খুঁজতে।'

জ্যাঠাইমা চুপ করলেন। সেই অসীম স্নেহের কী উত্তর দেব খুঁজে পেলুম না। অকারণে আমার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল, গলা এল বুজে। আনাজের উপর বঁটি চলার কচ্‌কচানি শব্দ সান্ধ্য নীরবতাকে যেন কর্ণগোচর ক'রে দিলে।

১১

ন-টা বাজল ; আমাদের খাওয়াদাওয়া হ'য়ে গেল। দশটা বাজল। তবুও জ্যাঠামশায়ের দেখা নেই। জ্যাঠাইমা বললেন, 'শুতে চ।' কালকে ঝগড়াঝগড়ি করিস অখন।' আমি বললুম, 'না, আজকেই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।' জ্যাঠাইমা ঘুমুতে গেলেন। আমি ব'সে-ব'সে মঞ্জুকে চিঠি লিখলুম—তাতে তাকে জানালুম, জ্যাঠাইমার মত পেয়েছি, জ্যাঠামশাইও রাজি, আমি কাল-পরশু কলকাতায় যাব। তারপরে আর যা-লিখেছিলুম, তাতে অপর কারুর কোনো কৌতূহলই থাকতে পারে না। চিঠি লেখা হ'লে নিজে গিয়ে সেখানা ডাকে দিয়ে এলুম। ফিরে এসেও দেখি জ্যাঠামশাই আসেননি। শেষে গেলুম লাইব্রেরিতে তাঁর আগমন-

ইংরেজরা বলে, লোকের পাঠ্য থেকে, তাকে চেনা যায়! জ্যাঠামশাই সম্বন্ধে এই কথা খুব খাটত। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন উদারপন্থীদের বই নিয়ে,—সোশিয়ালালিজম্‌, ফেমিনিজম্‌, বিপ্লববাদ, ইবসেন, টলস্টয়, নীট্‌শে, শোপেনহাওয়ার ইত্যাদি নিয়ে। সে-বইগুলোর অধিকাংশেরই অর্ধেকের বেশি পাতা কাটা হয়নি। তাঁর লাইব্রেরিতে তাদের উপস্থিত কাজ ছিল শুধু জগতের ধূলির বোঝা মাথার 'পরে বওয়া। এখন তাঁর পাঠ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল মাসিকপত্র, স্টেশন বুকস্টলের উপন্যাস, হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণ করবার জন্যে লেখা পণ্ডিতমূর্খদের প্রবন্ধাবলি, প্রেতকাহিনী এবং থিয়সফি। এখন তাঁর নারী-বিদ্রোহের কথা শুনলে হাসি পেত ; শ্রমিক-আন্দোলনের নামে নাসা আকাশে উঠত ; বিপ্লবের উল্লেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত।

বলাই বাহুল্য, আমায় আকর্ষণ করত তার প্রথম জীবনের বইগুলি। সেদিনেও বাধ্য হ'য়ে ধূলিধূসর শেল্‌ফ্‌ থেকে একখানা বই নামিয়ে বসেছিলুম। বইটার নাম মনে নেই বা কী বিষয় তা-ও মনে নেই, কেন-না আমার মনে একাগ্রতা ছিল না। আমি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলুম

জ্ঞান অর্জনের জন্যে নয়, সময় হত্যার জন্যে। আমার মনে হচ্ছিল মিনিটগুলো চলছে যেন শতাব্দীর চালে।

বইখানার পাতা উল্টাতে-উল্টাতে হঠাৎ একখানা কী লেখা কাগজ মাটিতে প'ড়ে গেল। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলুম একখানা হাতে-লেখা চিঠি, জ্যাঠামশায়ের শিরোনামা লেখা। সে কোন্ অতীত যুগের সাক্ষ্য, সময়ের নিষ্পেষণে বিবর্ণ, বিশীর্ণ। হাতের লেখাটি কোনো স্ত্রীলোকের, কিন্তু তাই ব'লে কোনো অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতার নয়। তার প্রতি ছত্র একটা পরিচ্ছন্নতার, একটা চিত্তোৎকর্ষতার [চিত্তোৎকর্ষের], একটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিচ্ছে ; লেখিকার চরিত্র যেন সেই পত্রখানিতে শৃঙ্খলাসমৃদ্ধ। আমার বড়ো কৌতূহল হ'ল জানতে এ-অপরিচিতা কে? চিঠিখানি এইরূপ :

'তুমি লিখেছ তোমার স্ত্রীর প্রতি, তোমার সমাজের প্রতি, তোমার কুলগৌরবের প্রতি কর্তব্যের কথা। কিন্তু সত্যের প্রতি কি তোমার আমার কোনো কর্তব্য নেই? আমার স্বামীর প্রতি আমার কি কিছু কর্তব্য নেই? তুমি লিখেছ, আমাদের মিলন বিধাতার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। তা হ'তে পারে। কিন্তু যে-বিধাতা মানুষকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে তাকে সেই সর্বনাশ গোপন করবার যুক্তি দেন, তিনি আমার বিধাতা নন। জগতে যদি ধর্ম ব'লে কিছু থাকত তাহ'লে প্রসবের সময়ের সেই মূর্ছা থেকে আমায় আর ফিরে আসতে হ'ত না। জগতে যদি ভগবান ব'লে কিছু থাকত, তাহ'লে ওই মেয়েটিই আমার স্বামীর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের অকূল স্নেহের অধিকারিণী হ'ত না। আমি যদি এই জীবন্ত ভ্রান্তি-বিলাসের নায়িকা না-হতুম, তাহ'লে প্রহসনটাতে হাসিই পেত। আমার স্বামী যখন মঞ্জুকে বুকে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান শোনান, তখন আমার হাসি পায় বটে, কিন্তু সে-হাসি হাসলে আমার বুক ফেটে যাবে। তিনি তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। তাঁর মেয়ে। ওঃ আমার ইচ্ছা করে আত্মহত্যা করতে। কিন্তু সে-সাহস কোথায়! তিনি কি এতই অন্ধ? মঞ্জুর মুখে তোমার মুখের প্রতিচ্ছবি যে আমি অহোরাত্র দেখি...!'

আমার আর পড়া হ'ল না। আমার মাথা ঘুরছিল, অঙ্গে-অঙ্গে অবসাদ যেন সীসে ঢেলে দিয়েছিল, ঘন-ঘন মূর্ছা আসছিল। আমার মস্তিষ্ক হ'য়ে গিয়েছিল নিস্তেজ। চিঠির নিচের মণিকা নামটি যে শরৎবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সেটা মনে পড়তে কিছু সময় লাগল। কিন্তু তার আগে থেকেই আমি আবছা-আবছা সব বুঝতে পারছিলুম। এইজন্যেই মঞ্জুকে দেখেই মনে হয়েছিল, তার আর আমার আলাপ যেন কত বৎসরের! এইজন্যেই জ্যাঠাবাবুর মিনতি। এইজন্যেই আমার প্রাণে অনিষ্ট-আশঙ্কা। সে আমার বোন! সে আমার বোন! ইচ্ছা হ'ল জগৎ-সমক্ষে চিৎকার ক'রে উঠি, মঞ্জু আমার বোন। তারপরে আবার সমস্ত উত্তেজনা চ'লে গেল। আমার মনে হ'তে লাগল, এ-সমস্ত একটা দুঃস্বপ্ন। আমার মনে হ'তে লাগল, আমি ব'লে জগতে কেউ নেই। আমার দেহ প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু প্রাণ-মন সমস্ত কে চেপে গুঁড়িয়ে ধুলা ক'রে উঠি[ড়]য়ে দিয়েছে!

কতক্ষণ এমন গেল জানি না। বেহারা এসে খবর দিলে জ্যাঠামশাই ফিরে এসেছেন। আমি যন্ত্রের মতো চিঠিখানা বইয়ের ভিতরে পুরলুম। সেখানাকে যথাস্থানে তুলে রাখলুম ;

তারপরে জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমার গতি সে যেন স্বপ্ন-প্রয়াণের গতি! আমি শুনতে পেলুম, আমি তাঁকে বলছি, 'আপনার কথাই শুনব। মঞ্জুকে বিয়ে করব না।'

তার উত্তর যেন জীবনের পরপার থেকে এল, 'তবে?'

আবার শুনলুম নিজে বলছি, 'বিলেতেই যাব।' তিনি সেই প্রেতের স্বরে জবাব দিলেন, 'বেশ।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আগামী বেস্পতিবারেই যাব, এখান থেকে সিধে বম্বাই।'

তিনি বললেন, 'তাই হবে।'

তারপর আবার কলের মতো নিজের ঘরে গিয়ে শুলুম। আমার বোধ হচ্ছিল যেন আমি যা বলছি, শুনছি, করছি, তার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি যেন নির্লিপ্ত, দর্শক মাত্র।

আমার মূর্ছা ভাঙল বিলেত যাবার দিন। গাড়িতে উঠতে যাব, ডাকপিওন এসে হাতে শম্ভুর চিঠি দিলে। এটা আমার কলকাতায় লেখা বিয়ের খবরের চিঠির জবাব, কোন্ জন্মান্তের ক্ষণিক স্মৃতি। সে লিখেছিল,...[।]

[অসম্পূর্ণ]

দুকূলহারা

ছেলেবেলা থেকেই অবলা আমার চোখে প্রবলা। আমার জীবনগঠনে তাঁদের কোমল হাতের দায়িত্ব যে কতটা তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত। যতদিন মনে পড়ে, একজন-না-একজন নারী আমার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছেন, দেখতে পাই। কবে থেকে এমন চ'লে আসছে বলতে পারি না ; তবে প্রথম যেদিন এ-তথ্যটা আবিষ্কার করি, তখন ৮/৯ বছর আন্দাজ বয়স হবে, তার চেয়ে বেশি কখনোই নয়। তখন চলছে আমার এক দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার অধিকার। একদিন আমি হঠাৎ জানতে পারলুম যে, তাঁকে ছেড়ে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব! তাঁর বয়স আমার তিনগুণ না-হ'লেও দ্বিগুণ, তিনি থাকতেন আমাদের বাড়িতেই। চেহারাখানির কথা ঠিক মনে নেই, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না। এখনো বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে, সে ছুটির দিনটা হিন্দু সমাজের অন্যায় অত্যাচারের কথা ভেবেই কেটে গিয়েছিল। কারণ, তাঁর সঙ্গে পরিণীত হবার এই আত্মীয়তা ছাড়া আর যে কোনো বাধা থাকতে পারে তা আমি মোটেই ভাবিনি। তখন অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসটা অটুট ছিল ; কাজেই বিধাতার কাছে অনেক প্রার্থনা জানিয়েছিলুম, অনেক পূজা মেনেছিলুম, যাতে ক'রে পলকের মধ্যে আমরা উভয়ে ক্রিশ্চান বা মুসলমান হ'য়ে যাই। সেদিন জানতুম না যে, হিন্দুর দেবতায় আর মুসলমানের দেবতায় সতত বিরোধ ; তাঁরা আর যা-করুন বা করতে পারুন সহসা ধর্ম বদ্‌লে দিতে নারাজ এবং অক্ষম। অবশ্য আমার এই প্রথম প্রণয়ের দৌড় কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে ব্যর্থ প্রণয়ীর সকল কষ্ট আমার সহ্য করতে হয়েছিল, এমন-কি প্রিয়ার নিষ্ঠুর পরিহাস পর্যন্ত। কেন-না যখন তাঁকে আমার আশা-ভরসার কথা বলেছিলুম, তিনি হেসে লুটিয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে মার কাছে যখন সে-কথা উঠল তখন বকুনি থেকে আরম্ভ ক'রে প্রহারে আমার নির্যাতনের অন্ত হ'ল। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে যে, দান শুরু হয় বাড়িতে। সেটা কতদূর সত্য তা জানি না, কিন্তু অনুরাগ বাড়িতেই যে আরম্ভ হয় এতে আর সন্দেহ নেই। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ। জানি, এ-কথা শুনে অনেকে শিউরে উঠবেন, বলবেন এটা বিকৃতচেতাদের বিষয়ে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অলীক। তাঁদের কাছে আমার আর্জি এই যে, তাঁরা যেন মনু-পরাশরের রচিত চশমা ছেড়ে স্বাভাবিক চোখে নিজ-নিজ জীবনের দিকে দেখেন। সুস্থ দৃষ্টি চশমার সাহচর্যে ঝাপ্‌সা হয়। এ-দোষটা চশমার নয়, বা চশমা-কারকের নয়, চশমা-ব্যবহারীর ; যেহেতু তিনি যোগ্যতা না-বিচার ক'রেই চশমা চোখে লাগিয়েছেন।

এই পূর্বরাগের অভিনয়ের উপর যবনিকা-পতন হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে 'শতং বদ মা লিখ' বাক্যটা কতদূর মিথ্যা। লেখার একটা গুণ আছে যে, সেটা লোকে সাধারণত পড়ে না, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার মোটেই বিরল নয়, বিশেষত যখন কথাটা অন্য লোকের বিষয়ে। তাই সেদিন থেকে স্ত্রীজাতিকে দূর থেকেই ভালোবেসে এসেছি, মুখ ফুটে বলতে সাহস করিনি (দু-একবার ছাড়া)।

২

আমার প্রকৃতির কতকটা পরিচয় দিয়েছি। এখন যদি বলি যে ললিতার প্রভাব অল্পবয়স থেকেই অনুভব ক'রে আসছি, তাহ'লে সেটা কিছু আশ্চর্য শোনাবে না।

ললিতা ছিল আমার বাল্যসখী। তার বাপ মি. পি. সি. চ্যাটার্জি সেকালের একজন বিখ্যাত সাহেব এবং নাম-করা ব্যারিষ্টার ছিলেন। মিস্টার চ্যাটার্জির পুরো নাম আজ অবধি জানলুম না। বোধহয় খাঁটি সাহেবদের নাম একপদী হবে। দেশী ললিতা তাঁর হাতে প'ড়ে হয়েছিল বিলেতি 'লিলি'। আমরাও তাকে এই ব'লেই ডাকতুম।

মি. চ্যাটার্জি 'লিলি'কে ইংরেজি ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। তাকে বাংলা শেখানো হয়নি বটে, কিন্তু ইংরেজিতে তার অসাধারণ দখল ছিল। ওই ভাষাতে এমন বই নেই যা সে পড়েনি, পাঠ্য, অপাঠ্য, কুপাঠ্য সকলরকম। নামের সার্থকতা বড়ো একটা দেখা যায় না। আমি একজন শশীমুখীকে জানতুম, তাঁকে মসীমুখী বললেই ভালো হ'ত। কিন্তু লিলি সত্যই কুমুদের মতো অমল, তার মনে ছায়ার লেশমাত্র ছিল না। চেহারাও লিলির মতোই অনুদ্ধত, লিলির মতোই কোমল, লিলির মতোই বিনীত। সে সাধারণের চক্ষে হয়তো-বা সুন্দরী ব'লে ঠেকবে না। দেশী মতে তার একটু লম্বা কম হওয়া উচিত ছিল। মুখখানি আরেকটু পুরুষ্টু হ'লে ভালো হ'ত। ঠোঁটদুটি একটু বেশি পুরু, চোখ হরিণীর মতো নয়, ভুরু তুলি দিয়ে আঁকা ক্ষীণ রেখা নয়। কিন্তু আমার মনে হয় ভারতে সৌন্দর্যের বিচার হয় শুধু মুখ দেখে। দেহের গঠনের উপর লাবণ্য আর রূপ যে কতটা নির্ভর করে তা আমরা বুঝি না বা বুঝতে চেষ্টা করি না। কাজেই অনেক রূপসীর ঠাট কাঠসদৃশ, অপরের-বা জালার মতন। এককথায় বলতে গেলে দেশী সুন্দরীরা মুখসর্বস্ব। কিন্তু লিলির দেহে কোথাও একটু খুঁত ছিল না, একটি সরলরেখা ছিল না ; সকল অবয়বই বঙ্কিম এবং পূর্ণ, কিন্তু বেশি পূর্ণ নয়। আমি তাকে অনেকবার বলেছি, 'লিলি, তুমি সুন্দর যেহেতু চাঁদ সুন্দর, তোমাদের দু-জনের মধ্যেই ওই ষোড়শ কলাটির অভাব।' আর তার চোখ, অমন চোখ আমি আগে কখনো দেখিনি। যখন ছায়ায় থাকত তখন যেন ধূসর, কিন্তু যদি তাতে আলোর একটি রশ্মি লাগত, অমনি সে দুটি পাটল মখমলের মতো হ'য়ে উঠত। একবার Impressionist School-এর একটি রমণীর ছবি দেখেছিলুম। তাতে মুখের অন্যান্য অংশ ক্ষীণ রেখায় ব্যক্ত ক'রে শিল্পী চোখদুটিকে অস্বাভাবিক-রকমের বড়ো ক'রে এঁকেছিলেন। তখন বোধ হয়েছিল ছবিটা অর্থহীন, অসুন্দর। কিন্তু লিলির মতো মেয়ের ছবি আঁকতে গেলে ওই চোখের উপর সমস্ত

জোর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ তার মুখের বিশেষত্বই ছিল তার চোখ ; সত্যই যেন তার আত্মার গবাক্ষ।

লিলির সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। অল্পবয়সে আমরা দু-জনে অনেক স্বামী-স্ত্রী খেলা করেছি, অনেকবার ঘরকন্না পেতেছি, মারামারি করেছি। আবার কৈশোরে সে মেয়েমানুষ ব'লে নাক সিঁটকেছি, তাকে ঘেন্না করেছি। ফের যৌবনের গোড়ায় তাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছি। আমাদের দু-জনের অনেক বৈষম্য থাকলেও মনের একটা মিল ছিল। আমরা উভয়ে ছিলুম নবীন পথের পথিক, উভয়ে ছিলুম পুরাতন-দ্রোহী। তবে আমি ছিলুম নরম, আর সে ছিল গরম। আরেকটা সূত্র আমাদের দু-জনকে বেঁধে রেখেছিল। সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ, আর বাংলা ভাষার প্রতি দারুণ বিরাগ।

তখন বয়স ছিল অল্প, চিন্তা ছিল অনুপস্থিত। কাজেই ধার ক'রে ভাবনা আনতে হ'ত। কী তর্ক হ'ত যেন আমরা দু-জন হচ্ছি জগতের হর্তা, কর্তা, বিধাতা ; মানবের সুখ-দুঃখের কর্ণধার, জীবন-গঙ্গার ভগীরথ। দু-ঘণ্টার বিচারে আমরা যে-সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে ফেলতুম, সেগুলি নিয়ে কতশত মনীষী গত পাঁচ হাজার বৎসর মাথা ঘামিয়ে আসছেন। তবে নিজের পক্ষে একটা কথা ব'লে রাখি। আমার অপরাধটাই কিছু লঘু ছিল, কারণ আমি বেশি আশা করতুম না। হয়তো-বা জীবনের কী উদ্দেশ্য তাই নিয়ে কথা চলত। লিলির একটা বিশ্বাস ছিল যে মানুষের বিকাশের সীমা নেই। আমার মধ্যে এ-ভ্রমটা ছিল না। আমি জানতুম যে মানুষ একটা পরিমাণের বেশি পূর্ণতা লাভ ক'রে না। সেইজন্যেই সভ্যতার পতন এবং অভ্যুদয় আমরা ইতিহাসে বারে-বারে দেখতে পাই। লিলি এ-কথা শুনলে রেগেই আগুন হ'ত, বলত, 'তুমি হচ্ছ ভীষণ pessimist। তাই যদি হবে তবে এই যে যুগ-যুগ ধ'রে মানুষ প্রয়াস ক'রে আসছে তার অর্থ কী?' আমি উত্তর দিতুম, 'অর্থ? কোনোই অর্থ নেই। যা-আছে তাই থাকবে। সকলই একটা অন্ধ নিয়তির চাকায় প'ড়ে একই জায়গায় ঘুরছে। কিন্তু মানুষ আশা না-হ'লে বাঁচতে পারে না, তাই ভাবে সে বুঝি এগুচ্ছে।' এ-কথা তার সহ্য হ'ত না তাই আমায় জিজ্ঞাসা করত, 'তবে কি বলতে চাও তোমার জীবনে কোনো উদ্দেশ্য, কোনো আদর্শ, কোনো লক্ষ্য নেই!' আমি বলতুম, 'হ্যাঁ আছে একটামাত্র, জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলা। আমার মনে হয় জীবন একখানি পারসি গাল্‌চের মতো। গাল্‌চে-রচয়িতার শুধু এক উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেটা হচ্ছে যেন রংগুলো চোখে ভালো লাগে ; কিন্তু কোনো একটা বাঁধা নক্‌শা করতে গেলেই কারপেট নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি আর কোনো অপরাধ মানি না, কেবল সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে যে-পাপ তাকে দমন করা উচিত মনে করি।' সে আমায় pessimist বলত বটে, কিন্তু আমি আবার তাকে optimist বলতুম, কাজেই শেষে কার যে জয় হ'ত তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন।

তবে আমরা উভয়েই সমানভাবে বিশ্বাস করতুম যে, উপস্থিত রীতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ দু-জনেই মনে করতুম আমরা শ্রেষ্ঠ, আমাদের মতে যেটা ভালো সেইটাই হওয়া উচিত। সে বলত শিক্ষা ভালো হ'লেই মানুষ আপনি বদ্‌লে যাবে। আমি বলতুম শিক্ষা

যে কোন্‌টা ভালো তা এখনো আবিষ্কার হয়নি। আর আবিষ্কার হ'লেও মানুষকে তা দেওয়া যাবে না। তাকে জোর ক'রে যা ভালো তাই করতে হবে।

সেদিনকার তর্কের কথা মনে পড়লে আজ হাসি পায়। কী বিষম গর্ব! কী দারুণ ভ্রান্তি! তখন একদিনের তরেও মনে হয়নি আমরা যা ভাবি তাছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আমি বরাবর ব'লে এসেছি ভুল দেমাক যৌবনের অধিকার। তার জন্য তাকে মার্জনা করা যেতে পারে।

লিলি যে শুধু জীবনের উদ্দেশ্য বা অর্থ খুঁজত তা নয়, সে-অন্বেষণের অত্যাচার থেকে সাহিত্যও বাদ যেত না। আমি তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করতুম যে, কলা অর্থের বোঝা মাথায় ক'রে বাঁচতে পারে না। সেইজন্যই ইংরেজি সাহিত্যের একটা যুগ অত নিষ্প্রাণ। ডাক্তার জনসনের লেখায় উদ্দেশ্য আছে ব'লেই অল্পায়ু, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা মানের ধার ধারত না ব'লেই অত উপাদেয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভাবত তার কাব্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য। তাই সেগুলি কীট্‌স্‌ বা শেলির কবিতাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। এই কারণেই অস্‌কার ওয়াইল্ড সুখপাঠ্য আর পিনারো অপাঠ্য। হিউগোর লেখার মধ্যে অর্থের বহুলতা আছে, কিন্তু তা অসুন্দর ; আর আনাতোল ফ্রাঁস নিরর্থ, কিন্তু রূপের রসের সাগর। পরিশেষে এটাও তাকে বলেছিলুম যে ভের্‌লেনের সময় থেকে ফরাসি কবিতার উৎকর্ষের কারণই হচ্ছে এই যে, তাতে মানের প্রাচুর্য নেই। বাংলা সাহিত্য আমাদের কাছে হেয় ছিল, নচেৎ দেখিয়ে দিতে পারতুম যে, বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতই প্রশংসনীয় হোক্‌-না-কেন, কাব্যের দিক দিয়ে তা টেঁকে না। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকেরা মানেটা একটু কম ক'রে যদি রূপটার দিকে লক্ষ্যটা একটু বেশি রাখতেন, তাহ'লে তাঁদের এত শীঘ্র পাত্‌তাড়ি গুটোতে হ'ত না।

কিন্তু এ-সব কথা বৃথাই বলতুম, সে মানে বা যুক্তি না-হ'লে কলার আদর করতে পারত না।

৩

আমাদের সম্বন্ধ ছিল মৈত্রীর। কবে যে সহসা সখ্য প্রণয়েতে পরিণত হ'ল, তা ঠিক ক'রে বলতে পারি না। শুনেছি উত্তাপ সব দ্রব্যের মধ্যে নিহিত থাকে, প্রচ্ছন্নভাবে। আমার মনেও তেমনি আসক্তি অনেকদিন থেকেই লুকুনো ছিল। কিন্তু বাল্যকালের সেই দারুণ শিক্ষা আমি ভুলতে পারিনি। এখন আর চট্‌ ক'রে মনের কথা বলতুম না। তার কাছে যখন থাকতুম তখন তর্ক ক'রে, গল্প ক'রে সময় সুখেই কেটে যেত। কিন্তু যখন তাকে ছেড়ে যেতুম, তখনই আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠত। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলুম যে লিলি সুন্দরী ; কারণ তার রূপ শস্তা, আপাতরমণীয় ছিল না। তেমনি অনেক বিনিদ্র রাত জেগে উপলব্ধি করেছিলুম তাকে কত ভালোবাসি। কিন্তু নিজেকে নিজে বাহাদুরি না-দিয়ে থাকতে পারছি না, কেন কথাটি কাউকে জানতে দিইনি, এমন-কি লিলিকে অবধি না। কাজেই যেদিন হঠাৎ

আমরা আবিষ্কার করলুম যে পরস্পরের প্রতি আমরা অনুরক্ত, সেদিন যে কী বিপুল হর্ষ হঠাৎ অন্তরে জেগে উঠেছিল তা যাঁরা তেমন ঘটনাচক্রে পড়েননি বুঝতে পারবেন না।

সে আজ অনেকদিনের কথা ; স্মৃতি একটু মলিন হ'য়ে এসেছে। তাই সেদিন লেখা ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত করছি :

"আজকের দিনটা চিরকাল আমার মনে অঙ্কিত থাকবে। আমার কোনো কুসংস্কার নেই, তবু মনে হচ্ছে কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিলুম। মানুষের ভাগ্যে এত সুখ, এত আনন্দ থাকতে পারে তা জানতুম না। মনে হচ্ছে সকল কামনা মিটে গেছে সকল ভোগ সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। আজকে যদি মরণ এসে আমাকে ডাকে, আমি তাকে বলতে পারব, 'চলো, আমি যেতে প্রস্তুত।'

"লিলিদের বাড়িতে আজ 'টেনিস পার্টি' ছিল। যেতে একটু দেরি হ'য়ে গেল। গিয়ে দেখি দুই পাকা খেলোয়াড় টেনিস খেলতে ব্যস্ত, আর দর্শকেরা তাই দেখতে তন্ময়। কে-ই-বা আমার দিকে ফিরে চাইবে, কে-ই-বা আমার সঙ্গে কথা কইবে। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মিসিবাবা কোথায়?' সে উত্তর দিলে, 'উন্‌কা তবিয়ৎ আচ্ছা নহি হ্যায়, উস্ লিয়ে উ[ন্]হোনে আপ্‌নে কাম্‌রে পে হ্যায়, বাহার নেহি আয়েঙ্গে।' আমি লিলির খোঁজে গেলুম।

"লিলি তার বুডোয়ারে একটা সোফার উপর শুয়ে বই পড়ছিল। আমি যেতেই বইখানি মুখ থেকে নামিয়ে বললে, 'বাঃ, তোমায় ফ্লানেল প'রে বেশ দেখাচ্ছে।' আমি বললুম, 'সেটা কিছু আশ্চয্যি নয়, চিরদিনই আমি সুপুরুষ, কিন্তু রুগী সাজলে তোমায় বেশ মানায়।' সে বললে, 'না, সাজা নয়, সত্যিই আজ শরীরটা ভালো নেই, আর রোদ্দুরে বেরুইনি। তুমি কেন আমার কাছে ব'সে রইলে, যাও খেলগে না।'

"আমি॥ খেলার কি আর জো রেখেছ, যে দুটি জোঁক খাড়া করেছ, অন্য লোকে টেনিস কোর্টে প্রবেশ করে সাধ্য কী! আর আমার খেলার বহর তো জানোই। এত লোকের সামনে বাঁদর সাজতে প্রস্তুত নই। তোমার কাছেই বরং বসি। কী পড়ছ?

"লিলি॥ শেলি। শেলি যে কত বড়ো সমাজ-সংস্কারক তা আমি আগে ভালো ক'রে জানতুম না।

"আমি॥ যেখানে শেলি সমাজ-সংস্কারক হ'তে গেছে সেখানেই বিপদ ঘটিয়েছে। সেইজন্যই শেলি কখনো কীট্‌সের বিশুদ্ধতার অংশী হ'তে পারেনি।

"লিলি বইখানি হাত থেকে নামিয়ে উঠে বসল। আমি চেয়ার ছেড়ে গিয়ে তার পাশে স্থান অধিকার করলুম। কিন্তু আগের ব্যবধানই ছিল ভালো, কাছে যেতেই কী একটা অজানা সঙ্কোচ আমাদের পেয়ে বসল। আর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তার বিষয়ে বলতে পারি না, তবে আমার নিজের মনে হচ্ছিল যেন আমার বুকটা বর্ষার মেঘের মতো বিদ্যুতে ভরা ; কখন যে হঠাৎ চিক্‌মিক্ ক'রে উঠবে তা জানা নেই ; কোনো এক অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা আমায় যেন গিলতে আসছিল। অনেকসময় আলাপ করতে-করতে এমনি এক-একটা আচম্‌কা অসহ্য বিরাম এসে পড়ে, যা শেষ করতে আমরা অশেষ চেষ্টা করি, কিন্তু মুখ ফোটে না। সাধারণত সেই নীরবতার মূলে থাকে কথার অভাব, আজকের এটা কিন্তু তেমন নয়, এর

উৎপত্তি যেন কথার প্রাচুর্য থেকেই। আমার বোধ হচ্ছিল যেন এরপর যা কথা হবে সে অনেকদিনের জমা কথা।

"এমনি অবকাশকেই আমি বহুদিন থেকে ভয় ক'রে আসছিলুম। যা ভয় করেছিলুম আজ তাই হ'ল।

"আমি বইটা নিয়ে পাতা উল্টোতে লাগলুম। দু-জনেই নির্বাক। দু-একবার হাতে হাত ঠেকল, দু-একবার চোখে চোখ পড়ল আর অমনি আমার ঘাড়ে একটা কী ভূত চাপল, আমার লজ্জা কেটে গেল, প্রতিহত হবার ভয় কেটে গেল, আমি ব'লে উঠলুম, 'আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি শেলি একটা কথা ব'লে গেছেন, যেটা চিরন্তন সত্য, 'What are all these kissing worth, if thou kiss not me.'

"লিলির গালে একনিমেষের জন্য স্নায়ুর সমস্ত রক্ত ছুটে এল, চোখে একটা কীসের দীপ্তি জ্ব'লে উঠল ; মুহূর্তেই আবার মিলিয়ে গেল। এক সেকেন্ড কাটল, দু-সেকেন্ড কাটল ; আমার কাছে সেটা যেন একটা যুগ, চুপ ক'রে থাকতে আর পারছিলুম না। কী একটা বলতে যাচ্ছি, এমনসময় সে হঠাৎ আমায় নিজের দিকে টেনে নিলে ; ও-হাতে যেন আগুন ছুটছে মনে হ'ল, যেন গাল পুড়ে গেল, তারপর একপলের জন্য তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করলে। আমার মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলছিল। শিরায়-শিরায় রক্ত যেন ফেটে বেরুতে চাচ্ছিল। তার অসাড় দেহ বাহুর মধ্যে তুলে নিলুম। তারপর সেই চুমোর বৃষ্টি আর থামে না। সে স্পন্দহীন, শ্লথ ; কেবল চোখের মধ্যে একটা ব্যাকুলতার চিহ্ন দেখতে পেলুম, যেন আমায় বলছে, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আর সইতে পারি নে।' তাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে আমি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলুম।

"নিঃশ্বাসটা একটু সহজ হ'লে জিজ্ঞাসা করলুম, 'লিলি এর মানে কী?'

"সে বললে, 'কৈফিয়ৎ তো আমার দেয় নয়, আমার প্রাপ্য।'

"আমি উত্তর দিলুম, 'অনেকদিন থেকেই জানতে পেরেছি তোমায় কত ভালোবাসি, কিন্তু সাহস করিনি বলতে। আজকে সকল সংযম খ'সে গেছে। অঙ্কুর মাটির নিচে কেমন ক'রে বাড়ে তা জানা যায় না। একদিন হঠাৎ দেখি যে কিশলয় গজিয়ে উঠেছে। আমারও তেমনি ঠিক।'

"সরলভাবে সে বললে, 'ভালোবাসা জানানো তো মেয়েমানুষের কাজ নয়, তাই বলতে পারিনি। আজকে তোমার কথায় লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ধরা দিয়েছি।'

"তারপরে আবার আমরা নীরব হলুম। খানিক পরে সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। তাকে বললুম, 'আমি চললুম, আমায় মাফ্ করো। আজকে আর তৃতীয়ের উপস্থিতি আমি সইতে পারব না।'

"আজকে আমার সব দেহ, মন, আত্মা বলছে, 'কীসের ভয়, কীসের ভাবনা, লিলি তোকে ভালোবাসে।' এই নির্জন ঘর বলছে, 'কীসের ভয়, লিলি তোকে ভালোবাসে।' হাওয়া কানে-কানে ওই-কথাই বলছে। এমন-কি এই ডায়ারির পাতা-সুদ্ধ বলছে, 'আর তোর কোনো চিন্তা নেই, লিলি তোকে ভালোবাসে।"

আমার এই আবেগ দেখে যেন কেউ আমায় sentimental আখ্যা দিয়ে না-বসেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, তখন আমার বয়স ছিল খুব জোর ২২। আর তোড়জোড় ক'রে প্রেম করা আমার সেই প্রথম ; এর আগে স্ত্রীলোককে দূর থেকে উপাসনা ক'রে এসেছি, কিন্তু কাছে ঘেঁষতে সাহস করিনি। অন্য আরেককটা কথা মনে রাখতে হবে, পূর্বে আমিই ভালোবেসেছি, আমায় কেউ ভালোবাসেনি। আর যদিও-বা কেউ আমায় প্রীতির চোখে দেখে থাকে, ব্যক্ত ক'রে বলেনি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই অসীম উচ্ছ্বাস কি একান্ত অমার্জনীয়?

৪

গোল বাধল কিন্তু এখন থেকেই। আবার পুরানো ডায়ারি থেকে গোটাকয়েক ছত্র তুলে দিই। এটা হচ্ছে তার পরদিনের কথা :

"আজকে সকালে উঠেই প্রথম কথা মনে পড়ল যে লিলি আমায় ভালোবাসে। ছুটে তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ফিরে এলুম। ভোর ছ-টার সময় কারুর সঙ্গে দেখা করা চলে না, এমন-কি লিলির সঙ্গেও না।

"বেলা আর কাটতে চায় না। খবরের কাগজ নিয়ে বসলুম ; কিন্তু কী পড়ছি কিছুই মাথায় ঢুকল না। খালি মনে আসছে লিলির মুখখানি। বই নিয়ে একটু পাতা উল্টোলুম, কিন্তু তাতেও মন বসল না। যাই হোক্ কোনোরকমে ১০।৷৹ বাজল। এই বেশ প্রশস্ত সময়। মি. চ্যাটার্জি এখনই কোর্টে চ'লে যাবেন ; লিলির সঙ্গে কথা কওয়ার অনেক সময় পাব।

"হায় রে আশা! যা-ঘটল কল্পনাতেও আনতে পারিনি। এ কী? এর মানে কী? কেন? কেন এমন হ'ল?

"আমি তাদের বাড়িতে গেলুম। বেয়ারাকে দিয়ে লিলির কাছে খবর পাঠালুম যে তার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার। বেয়ারা ফিরে এসে বললে, 'মিসিবাবাকা তবিয়ৎ বহৎ খরাব হ্যায়, আপ্‌কো সাথ মুলাকাৎ কর্‌নে নেহি সেকেঙ্গে।' আমি ভাবলুম, বুঝি লিলি বুঝতে পারেনি আমি এসেছি ; উজবুক বেয়ারাটা কী বলতে কী বলেছে। তাই একটা কাগজের উপর লিখে পাঠালুম, 'লিলি, তোমায় না-দেখে আর থাকতে পারছি না। ছ-টার সময় একবার আসতে যাচ্ছিলুম, অতি কষ্টে নিজেকে সংযম[ত] ক'রে রেখেছি। যদি শরীর বিশেষ খারাপ না-হ'য়ে থাকে, তো কাছে যেতে অনুমতি দাও। শপথ করছি পাঁচ মিনিটের বেশি থাকব না।'

"এবারেও বেয়ারা ফিরে এসে বললে, না, তিনি দেখা করতে পারবেন না। আমি আকাশ থেকে পড়লুম ; তার কী এত শরীর খারাপ যে এককলম লিখে পাঠাতে পারলে না কী হয়েছে! চাকরটাকে আবার পাঠাতে যাচ্ছিলুম জিজ্ঞাসা করবার জন্য কখন তার সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে। এমনসময় দেখি মি. চ্যাটার্জি কোর্টে যাচ্ছেন। আমি ছুটে তাঁর দিকে গেলুম, জিজ্ঞাসা করলুম, 'লিলির অসুখ করেছে শুনলুম, কী হয়েছে?' তিনি একবার আমার দিকে ফিরে চাইলেন, চোখদুটো ঘৃণায় ভরা, তারপর কথার কোনো জবাব না-দিয়ে সটান

গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমি অবাক, চাকরটার দিকে ফিরে চাইতেই সে হাসি সংবরণ করলে। আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলছিল, মনে হচ্ছিল লজ্জায় মুখ বুঝি জবার মতো লাল হয়েছে; কান দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। কোনো কথা না-ব'লে চাকরটাকে সজোরে এক লাথি মারলুম। সে প'ড়ে গেল। রাগে ফুলতে-ফুলতে ছুটে বাড়ি ফিরে এলুম।

"এর কারণ কী? মি. চ্যাটার্জি চিরদিন আমায় যথেষ্ট খাতির এবং স্নেহ ক'রে এসেছেন; আজকে হঠাৎ চাকরদের সামনে আমার প্রতি কেন এ-অবিচার?"

কারণ যে কী, তা বুঝতে অনেকদিন লেগেছিল। মনে আছে, সেদিন রাত্রে লিলিকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। কী লিখেছিলুম ঠিক মনে নেই, তবে তাতে যে রাগের আর দ্রোহের গরল ঢেলে দিয়েছিলুম তা আজও স্মরণে আছে।

সে-চিঠির আর জবাব আসে না। এক হপ্তা কেটে গেল তবু লিলি নিরুত্তর। ঠিক করেছিলুম প্রথমে, আর তার সন্ধান করব না; নিজেকে যথেষ্ট অপমান করেছি, আর নয়। কিন্তু তা হ'ল কই? আর থাকতে পারলুম না, ভাবলুম তাদের বাড়ি যাই। কিন্তু ভয় হ'ল এবার হয়তো ঢুকতেই পাব না। তাই আত্মসম্ভ্রম পায়ে দ'লে, নিজেকে ধুলাতে অবনত ক'রে, ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে লিলিকে পত্র লিখলুম, "আমার অপরাধের সীমা নেই। তুমি ছাড়া অন্য কেউ হ'লে ক্ষমা চাইতেই সাহস করতুম না। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ আমার নয়। মি. চ্যাটার্জির মুখে যে-ঘৃণার চিহ্ন দেখেছিলুম, সেটা আমার কল্পনা হ'তে পারে; কিন্তু আমার ভদ্র প্রশ্নের উত্তরে তাঁর একেবারে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাওয়া উচিত হয়নি। এটা যখন ঘটল তখন আমি সম্পূর্ণ আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিলুম, তখন যা-করেছি সেটার জন্য আমায় দায়ী করা ঘোর অবিচার হবে। তুমি আমার প্রকৃতি ভালো ক'রেই জানো। রাগ যে আমার মজ্জাগত নয় তা তোমায় বুঝিয়ে বলার কোনো দরকার নেই। চিঠিতে আমার মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারব না। যদি কাছে যাবার অনুমতি দাও, তো নিজের কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে তোমার মার্জনা পেতে পারব আশা রাখি।"

অনিশ্চিতের মর্মঘাতী তাড়না থেকে এবার অব্যাহতি পেলুম। লিলি চিঠির জবাব দিলে। তার পত্রখানা ইংরেজিতে লেখা। কতকটা এইরকম :

"প্রিয়তম,

"এই সম্বোধন আর কাউকে কখনো আগে করিনি. করবার আশাও রাখিনি। এটা আমার অন্তরের শেষ নিষ্ফল আবেগ ব'লে জেনো।

"তুমি মার্জনা চেয়েছ। কিন্তু মার্জনার আগে দোষ থাকা চাই। কোন্ অপরাধের জন্য তোমায় ক্ষমা করব? মাপ যদি কাউকে চাইতে হয় সে আমায়।

"সেদিন তুমি যাবার পর অমেয় আশায়, বিপুল আনন্দে বাবাকে আমাদের প্রণয়ের কথা জানিয়েছিলাম। উঠেছিলুম স্বর্গে, পড়লুম পাতালে। তিনি বলেছেন, আমাদের মিলন ঘটতে পারে না। এর কারণ? তুমি জিজ্ঞাসা করছ? কারণ তুমি শূদ্র আর আমি ব্রাহ্মণকন্যা। অনেক তর্ক করেছিলুম, অনেক অশ্রুজল ঢেলেছিলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্কল্প অটল। তাঁর দেহে যতদিন একফোঁটা রক্ত আছে, ততদিন এ-বিয়ে ঘটতে দেবেন না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে মানা,

তোমায় চিঠি লিখতে বারণ। অনেক ক'রে একবার লিখবার আদেশ পেয়েছি, তাই জবাব দিতে এত দেরি। যখন তুমি এ-পত্র পাবে আমি কলকাতা ছেড়ে যাব। কোথায়, সে-কথা জানিয়ে কোনো ফল নেই। তাই এই শেষ সুখটা, এই শেষ voluptuousnessটা আমার স্বপ্নজীবনের অন্তিম মুহূর্ত অবধি স্থগিত রেখেছিলুম।

"পূর্বেই বলেছি দোষ সম্পূর্ণ আমার। একনিমেষের অসংযমের পরিণাম এত শোচনীয় হবে ভাবিনি। কিন্তু অনবধানতা অপরাধ স্খালন করে না। যতদিন মনে পড়ে তোমায় প্রীতির চোখে দেখে আসছি। তুমি যখন স্নেহ করেছ তখন আশায় বিভোর হয়েছি, যখন অবজ্ঞা করেছ তখন নীরবে অনেক কেঁদেছি। কিন্তু অন্তরের কথা প্রকাশ করতে সাহসই হয়নি, কারণ চিরদিনই মনে-মনে জানতুম তোমায় কখনো লাভ করতে পারব না। অবশ্য, এমন ভাবার প্রধান কারণ যে, কল্পনাতেও আনতে পারিনি, তুমি আমাকে ভালোবাসো, কিন্তু বাবার অমতের জন্য যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলুম, তা বলতে পারিনি [-না]। সমাজকে আমি খুব ভালো ক'রেই চিনি, কিন্তু সকলেই আশা করে যে তার নিজের জন্য নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে। সে যাই হোক্, সেদিন হঠাৎ তোমার মনোভাব ব্যক্ত হ'তে আর আত্মসংবরণ করতে পারিনি। তারপর তোমার তপ্ত চুম্বনে সকল সংশয়, সকল কুণ্ঠা, সকল সন্দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলুম জয় হবে। যাক্ সে-কথা!

"মনে গর্ব ছিল যে আমি স্বাধীন, সমাজ-বাঁধন ছিন্ন করেছি। সে-ভুলও আজ গেছে। যদি বন্ধনমুক্ত হতুম তো সবার বারণ দ'লে তোমার কাছে ছুটে যেতুম। কিন্তু সে-সাধ্য আমার নেই। এমন-কি এ-কথাও বলতে পারব না যে তোমায় যদি পেলুম না অন্য কাউকে গ্রহণ করব না। বাঙালির মেয়ের পক্ষে চিরদিন অবিবাহিত থাকা অসম্ভব। অন্তত আমার সে মনের জোর নেই। একবার অন্যায় করেছি, মিথ্যা শপথে অপরাধ দ্বিগুণ করব না। কাজেই এখন তোমার কাছে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর অপর গতি নেই।

"হয়তো, তোমার সেদিনের ভাব ক্ষণিকের, তা যদি হয় তো এ-সব বলা তোমায় বৃথা। কিন্তু ব'লে তবু কতকটা শান্তি পাচ্ছি, তাই বললুম।

"আমার চিঠিখানা অনেকটা নভেলি-ধরনের হ'ল, হয়তো। কিন্তু জীবনের সঙ্গে পরিচয় হবার সুবিধা ঘটেনি, নভেল-নাটকেই এতদিন মানুষ হয়েছি, তাই আমার নভেলিয়ানায় বিশেষ আশ্চর্য হবার নেই। আরেকটা কথা ব'লে রাখি, যদিই নভেলি ধাঁচের হ'য়ে থাকে, তো বলতে হবে নভেল সত্য-সত্যই জীবনের চিত্র।

"যদি ক্ষমা করতে পারো, তো ক'রো।"

চিঠিখানা প্রথমবার প'ড়ে বুঝতে পারলুম না। আরেকবার পড়লুম। ক্রমে-ক্রমে যখন স্পষ্ট ক'রে বুঝলুম তখন মনে যে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল তাতে জগৎ ধ্বংস হ'তে পারত। চিঠিখানাকে টুক্রো-টুক্রো ক'রে ছিঁড়ে, সেগুলোকে পায়ের তলায় ফেলে দিলুম, জুতো দিয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিলুম। তবু শান্তি পাই না ; ইচ্ছে হ'ল ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার ক'রে দিই।

এমনি উত্তেজনার বশেই মানুষ খুন-জখম করে। ছুটে বেরুলুম লিলিদের বাড়ি যাবার

জন্য। আধরাস্তায় মনে পড়ল যে সে আর কলকাতায় নেই ; আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে এলুম। তারপর এল অবসাদ। উঃ, মনে হ'ল যেন সমস্ত আকাশ আমার কাঁধে বোঝা হ'য়ে চেপে আছে। পা আর চলে না, অতি কষ্টে ফের নিজের ঘরে এসে ব'সে পড়লুম।

অন্ধকার হ'য়ে গেল ; আলো জ্বালাতে উঠবার যে-শক্তির আবশ্যক সেটুকুও আমায় ত্যাগ ক'রে গেছ্‌ল। মনে হচ্ছিল যেন মনটাকে কে ধুয়ে দিয়েছে ; কিন্তু ভালো ক'রে নয়। সে যেন ছোটো ছেলের শ্লেট, মোছা সত্ত্বেও তাতে কত কী রেখা, কত কী আঁচড় বিদ্যমান, কিন্তু একটাও পড়া যায় না। চিন্তা ছিল না, কিন্তু চিন্তার সকল কষ্টই অনুভব করছিলুম। অনেক রাত্রি হ'ল ; অসুখ করেছে ভান ক'রে শুতে গেলুম। বিছানায় শুতেই চোখ জড়িয়ে এল বটে, কিন্তু ঘুম হ'ল না।

এর্‌পর স্মৃতিগুলো বড়োই অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। শুধু মনে আছে যে এত যাতনার মধ্যেও লিলিকে দোষ দিতে পারিনি ; আর ক্রোধে অন্ধ হ'লেও তার চিঠিতে সে কতটা উদারতা দেখিয়েছে আর কতদূর নির্ভয়ে সত্য কথা ব'লে গেছে, সে-বিষয়ে অন্ধ হ'তে পারিনি।

মি. চ্যাটার্জি বোধ করি আমার গুণপনা বাবাকেও জানিয়েছিলেন। কেন-না এইসময় বাবার সঙ্গে যে একটা তুমুল কলহ হয় তা অল্প-অল্প মনে পড়ছে। কিন্তু তার ফলাফল বেশিদূর এগুয়নি, কারণ দু-একদিন পরেই আমার nervous breakdown হ'ল। শুনেছি অনেকদিন ভুগতে হয়েছিল।

রোগমুক্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেলুম লিলির বিয়ে হ'য়ে গেছে। কার সঙ্গে, কতদিন আগে তা জানবার বিশেষ আগ্রহ রইল না। এবার আর রাগ হ'ল না। কেবল একটা সীমাহীন, দারুণ দুঃখ আমার হৃদয় অধিকার ক'রে বসল। ভাবলুম, এত তাড়ার কী কারণ ছিল? দু-চারদিন সবুর করায় কী আপত্তি ছিল? এ-দিকে আমায় নিয়ে যখন মরণ-বাঁচন সংগ্রাম চলছিল, তখন লিলির মনে নূতন-পুরাতন প্রণয়ের দ্বন্দ্ব ঘটেছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে প্রাচীনেরই জয় হ'ল! আর লিলির মন নবীনে জিনে নিলে। বাঃ, নিয়তির পরিহাস বড়ো মজার।

৫

বঙ্গসমাজে শুধু যে মেয়ে অরক্ষণীয়া হয় তা নয়, ছেলেও এই অবস্থাপ্রাপ্ত হ'তে পারে। আমারও সেই দশা হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই নানা দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। একে তো অবস্থাপন্ন লোকের পুত্র, তার উপর আবাব যখন বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে একটা লেজ গজালো তখন তো আর কথাই নেই! সঙ্ক্ষেপে বলতে গেলে বিবাহ-বাজারে আমি সর্বতোভাবে গণ্য, মান্য এবং পণ্য ছিলুম ; অনেক মেয়ের বাপের বাঞ্ছিত ধন, অনেক মেয়ের মা-র সুখস্বপ্ন। সে-সময় সেটা বিরক্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু আজকে সে-কথা স্মরণে গৌরব অনুভব করি। জীবনে অন্য কোথাও গণ্যমান্য তো হ'তে পারিনি ; এমন-কি অপর কেউ আমায় ক্রীতদাস করতে রাজি হ'ত কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে ; কেন-না ক্রীতদাসের অন্য গুণ না-থাক্, দৈহিক বল অথবা সৌন্দর্য থাকা দরকার। কিন্তু যে-লোক সকল স্থানে অনাদৃত, সকল কাজে অপটু, সে যে বিয়ে করার অযোগ্য, এ-কথা তো কখনো

শুনিনি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে যত অকর্মণ্য, সে তত বাঞ্ছনীয়। ছেলেবেলা কাঁচা বুদ্ধির তাড়নায় ভাবতুম এমন হওয়া গর্হিত, কিন্তু আজ সে-ভুল গেছে। নিঃস্ব বাঙালি-সন্তানের অনাদর সর্বত্র ; তার উপর আবার যদি তার গর্ব করার, জোর করার, আদর পাবার শেষ স্থানটি কেড়ে নেওয়া যায়, তাহ'লে কি তার প্রতি দারুণ অত্যাচার করা হয় না? তাই তো আমি বলি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্বশুরালয় চিরদিন সমভাবে বর্তমান থাক্।

সে যাই হোক্, পরিণয়-পাশ এতদিন কোনোরকমে এড়িয়ে আসছিলুম, কিন্তু আমার মুক্তির মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। আমার দেহ, মন শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল, আত্মরক্ষা করবার বা প্রতিবন্ধ ঘটাবার সামর্থ্য ছিল না। এর আগে বাবার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি, তাঁর রাগে ভীত হইনি, তাঁর দুঃখে বিচলিত হইনি ; বিয়ে করতে কখনো রাজি হইনি। এবার সুস্থ হবার পর, আবার যখন সেই প্রস্তাব উঠল তখন আমি বাধা দেবার জন্য দু-একবার নিষ্ফল প্রয়াস করেছিলুম বটে, কিন্তু সাধারণত নিশ্চেষ্ট ছিলুম। আমার ঔদাস্যের মধ্যে প্রতিশোধের ইচ্ছে যে ছিল না, তা নয়। ভেবেছিলুম, লিলি যদি এত শীঘ্র ভুলতে পারে, আমিও তাকে ভুলতে পারব, অন্তত তাকে দেখাব যে ভুলেছি। হায়, হায়, তখন বুঝিনি আগুন নিয়ে খেলতে গেলে গৃহদাহের আশঙ্কা আছে!

কিন্তু আমার দেহ যত সবল হ'তে লাগল, মন তত সন্দিগ্ধ হ'তে লাগল। ক্রমশই বুঝতে পারছিলুম কাজটা কতটা অন্যায় হচ্ছে। এখন যদি উপায় থাকত তো এ-বিয়ে হ'তে দিতুম না ; কিন্তু সে-পথ বন্ধ হয়েছিল। তবে, নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ব'লে মানতে পারি না। এখনো লিলিকে শিক্ষা দেওয়ার অভিলাষ ছাড়তে পারিনি ; অবমানিতের দারুণ দেমাকও ভুলতে পারিনি। তা যদি পারতুম তাহ'লে এ-বিয়েও বন্ধ করতে পারতুম। অবশ্য পিতৃদেব বিষম কুপিত হতেন, কিন্তু কারুর রাগকে কখনো ভয় করতে শিখিনি।

তারপর সে শুভ (ঠিক বলতে গেলে অশুভ) দিন এসে উপস্থিত হ'ল। আরেকবার আমার ডায়ারির সাহায্য নিতে হ'ল দেখছি :

"আজকে আমায় ঘিরে আনন্দ চলেছে, কিন্তু আমার মনে হাসি কোথায়! ওই যে নহবৎ বাজছে—মনে হচ্ছে ওটা যেন আমারই কান্না। আমার একটা আদর্শ ছিল যে মনে এক ভাব মুখে এক ভাব কখনো করব না। তাইজন্যই কি আমার ভাগ্যে চিরদিন অপলাপ করতে হবে। কখনো কোনো কিছুর কারণ খুঁজিনি, কিন্তু আজ না-জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পারছি না, 'আমার উপর এ-অভিশাপ কেন?' চিরদিন ভেবে আসছি জগৎটা মন্দ নয়, কিন্তু আজ আমার সে-বিশ্বাস কোথায়! এই আলো, এই হাওয়া, আজকের নব বসন্তের পুলক, মনে হচ্ছে এ সকলই মায়া ; যেন একটা কী বিরাট দুঃখ এই আস্তরণে ঢাকা রয়েছে। এতদিন যা-বুঝিনি আজ জেনেছি, জগৎ ষোড়শীর নয়নকোণে সূর্যাস্ত প্রতিফলিত স্বর্ণ অশ্রুর মতো। দেখতে বড়োই সুন্দর, কিন্তু একবার তলিয়ে ভাবলে তার মধ্যে যে কত ব্যথা কত নিষ্ফলতা সকলই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!"

"বিয়ে তো হ'য়ে গেল, কিন্তু যন্ত্রণার এই তো সবে শুরু। কোথায় গিয়ে শেষ হবে ভেবে পাচ্ছি না। উঃ, বিয়ের রাত্রি। মানুষে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে এত যাতনা সহ্য করতে পারে

তা জানতুম না। সকলের চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস হচ্ছে যে এত কষ্টের মধ্যেও মুখখানা সহাস রাখতে হয়েছিল।

"আমার স্ত্রী! কথাটার যথার্থ মানে বুঝতে পারছি না। তার আমার সঙ্গে কী সম্বন্ধ? পুরুতে একবার মন্ত্র আউড়ে গেল আর আমরা দু-জনে এক হ'য়ে গেলুম! এ-বাঁধন আর জীবনে ছিঁড়বে না! ভার্যা! সে চিরকাল ভার হয়েই থাকবে ; অন্য কোনো সম্পর্ক তার সঙ্গে সম্ভব না।

"একটা কথা কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি, 'কেন এমন করলুম।' আমার ফিলসফি এ-পরীক্ষা সইতে পারলে না। ভেবেছিলুম জীবনের কাছে কোনো দাবিদাওয়া করব না ; কিন্তু যা-আসে তাকে মাথা পেতে নেবার শক্তি কই? আরেকটা কথা। নিজের জীবন নষ্ট করার অধিকার আমার আছে ; কিন্তু পরের জীবন ব্যর্থ করছি কোন্ নীতির জোরে? সে হয়তো অনেক আশা করেছিল!"

৬

সুদূর ব্যবধানের চশমা প'রে দেখতে পাচ্ছি আমার স্ত্রী সুন্দরী ছিল। কিন্তু তখনো লিলির ছবি অস্পষ্ট হয়নি। লিলি ছিল আমার নারী বিষয়ে উপমান, কাজেই তার পাশে প্রতিভাকে রূপসী ব'লে বোধ হয়নি। কিন্তু সে যে আমায় লিলির চেয়ে কম ভালোবাসত তা মনে হয় না, যদিও তখন সেটা উপলব্ধি করিনি।

তখন ভাবতুম যে এত অল্পসময়ের মধ্যে তার আমায় ভালোবাসা সম্ভব নয়, বিশেষত যখন আমি তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিইনি। কিন্তু তখন জানতাম না যে বাঙালির মেয়ে স্বামী হবার আগে থেকেই স্বামী ধারণাটার সহিত পরিচিত এবং তার প্রতি অনুরক্ত। তাইতেই চার চক্ষুর মিলন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা নিজেদের প্রাণ পতির পায় বিলিয়ে দিতে সমর্থ হয়।

এ-কথা আমি তখন বুঝিনি, তাই তার প্রেমের প্রতিদান দিতে পারিনি বা চেষ্টা করিনি। মা আমার অল্পবয়সেই মারা গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে অন্য স্ত্রীলোকও ছিলেন না ; কাজেই তার আমি ছাড়া আর গতি ছিল না। সে যখন দেখলে যে আমাদের উভয়ের সম্পর্ক নিকট করবার জন্য আমি কোনো চেষ্টা করি না, তখন লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের উপরেই সেই ভার নিয়েছিল।

প্রতিভা প্রথমে ভেবেছিল নিজেকে আড়ালে রেখে সেবায় আমায় তুষ্ট করবে। দেখতুম আমার সকল প্রয়োজন পূর্ব হ'তেই সাধিত হচ্ছে। সে নিজের হাতে আমার কাজের টেবিলটা ঝাড়ত, কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখত, খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বাবধান করত। কিন্তু তাতে যখন আমার মন পেলে না, তখন বেশভূষাতে, কথায়বার্তায় চিত্তাকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল। আমি মনে-মনে হাসতুম। একটা নির্দয়তা আমায় আশ্রয় করেছিল।

একদিনের কথা এখনো বেশ মনে আছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, আমি এক্‌লা আমার বসবার ঘরে ব'সে আছি ; সহসা প্রতিভা এসে হাজির হ'ল। আমি জানলার দিকে চেয়ে পূর্ব্ববৎ ব'সেই রইলুম। তার বেশের পারিপাট্য দেখে ভারি হাসি পেয়েছিল, কষ্টে সেটাকে সংবরণ করলুম।

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল ; তারপরে আস্তে-আস্তে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি যেমন নীরব তেমনই রইলুম। খানিক বাদে তার কম্পিত উষ্ণ হাত আমার স্কন্ধ স্পর্শ করলে। হঠাৎ ব'লেই বোধহয় আমার গা যেন উঠল শিউরে। আমি তাড়াতাড়ি একটু স'রে গিয়ে তার মুখের দিকে চাইলুম। ওঃ, সে-চোখের মধ্যে কী নীরব ব্যথা, কী আকুলতা, কামনা যেন উথলে পড়ছে। একটুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে প্রতিভা বললে, 'তুমি রাতদিন কী ভাবো বলো দিকি? আমার সঙ্গে কথা কওয়া তো একরকম বন্ধ ক'রে দিয়েছ।'

আমি হেসে উত্তর দিলুম, 'তা বেশ সময় কথা কইতে এসেছ, এখন তো দেখছি কোথায় বেরুচ্ছ, তাই একবার যাবার সময় আপ্যায়িত ক'রে যাওয়া হ'চ্ছে। আর দোষ হ'ল আমার।'

সে বললে, 'কে বললে আমি বেরুচ্ছি?' আমি জবাব দিলাম, 'তোমার সাজ! বাড়িতে কেউ অমন বেশে থাকে না।'

তার চোখ যেন জ্ব'লে উঠল, আর কোনো কথা না-ব'লে সে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে যখন শুতে গেলুম, দেখলুম প্রতিভা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার গালে শুষ্ক অশ্রুর কৃষ্ণরেখা।

৭

চার-পাঁচ বছর এমনিভাবে কেটে গেল। তারপর বাবা মারা গেলেন, আমারও কলকাতার শেষ বন্ধন টুটল। এতদিন কোনোরকমে টিঁকে ছিলুম। কিন্তু এখন আর এক্‌লা সংসার করতে মন সরছিল না। আমি ঠিক করলুম ভবঘুরে বেরুব। গোড়ায়-গোড়ায় প্রতিভাকে এক্‌লা ফেলে যেতে দ্বিধা বোধ হয়েছিল। কিন্তু অনেক ভেবে যাওয়াই ঠিক করলুম। মনকে প্রবোধ দিলুম এই ব'লে যে এমন অনাদর আর বেশিদিন পেলে প্রতিভার হৃদয়ে যে অবশিষ্ট প্রীতিটুকু আছে তা ঘৃণায় পরিণত হবে। বিচ্ছেদের একটা গুণ হচ্ছে যে সে-সময় দোষগুলো ভুল হ'য়ে যায়, কেবল গুণগুলো মনে থাকে। আরো ভাবলুম, নূতন জায়গায় গিয়ে নূতন দৃশ্য দেখে পুরানো কথা ভুলে যাব। পরে ফিরে হয়তো বেশ সুখেই তার সঙ্গে ঘর করতে পারব। কিন্তু প্রতিভার যে অত আপত্তি হবে তা কখনো ভাবিনি।

সে যখন শুনলে, আমি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ যাচ্ছি, তখন আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বললে, 'তা হবে না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি যদি এক্‌লা থাকতে না-পারো তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকোগে।'

সে বললে, 'আমার তো বাপ-মা নেই, কাকীর সঙ্গে বনে না, আমি সেখানে যাব না।'

আমি বললুম, 'তবে আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না-হয়।'

সে বললে, 'যদি একান্তই যাবে তো আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।'

আমি উত্তর দিলুম, 'আরে, তা-ও কি কখনো হয়, মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে কি কখনো বেড়ানো যেতে পারে। না, না, অমন অবুঝ হ'লে চলবে কেন?'

সে বললে, 'আমি অবুঝ হলুম! এখানে কী নিয়ে থাকব? যখন সন্তান চেয়েছিলুম, তুমি সে কামনা পুরাওনি ; তাহ'লে বলতে পারতে ছেলেপিলে রয়েছে, এক্‌লা থাকতে পারবে।'

আমি বললুম, 'সে পুরানো কথা তোলার দরকার কী? তোমায় তো বলেছি, তুমি ছেলেপিলে ভালোবাসতে পারো, আমার বাপু ও-সব পোষায় না।'

সে বললে, 'আমার কি তবে কোনো অধিকার নেই। আমায় যখন বিয়ে করেছ তখন ফেলতে চাইলে চলবে না।'

এবার আমি চ'টে গিছ্‌লুম, বললুম, 'আমি অতশত অধিকার-টধিকার বুঝি না। তোমার অভাব কোন্‌খানে আমি বুঝতে পারছি না। যাদের ছেলে হয় না তাদের যদি স্ত্রীকে না-নিয়ে এক-পা নড়বার আদেশ না-থাকে তাহ'লে তো সংসারে বাস করা চলে না। বিয়ে করেছি ব'লে তো আর নিজেকে বিক্রি ক'রে দিইনি। যতদূর সুখস্বাচ্ছন্দ্য হ'তে পারে তা তোমার জন্য ক'রে দিয়েছি, কিন্তু আমি অচল হ'য়ে ব'সে থাকতে পারব না।'

সে বললে, 'হ্যাঁ, স্বাচ্ছন্দ্যের হানি একদিনও হয়নি ; কিন্তু সুখের কথা উত্থাপন ক'রে কী লাভ? কথায় কথা বেড়ে যায়! আমি তোমায় অচল হ'য়ে থাকতে বলছি না, রাগ, গোঁসা করছি না, পায়ে ধ'রে মিনতি করছি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো। আমি যদি এক মিনিটের জন্যও বোঝা হ'য়ে উঠি আমায় রাস্তায় ফেলে যেও।'

আমি বললুম, 'এ তো ছেলেখেলার কথা নয়। সে হ'তে পারে না, তুমি হেথায় থাকো, আমি যত শীঘ্র ফিরে আসব।' ব'লেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

তিন-চারদিন পরেই বেরিয়ে পড়লুম। যাবার দিনের ছবিখানি আজও হৃদয়ে খোদা আছে। তার চাহনি যেন বুকে বিঁধতে লাগল। মনে হ'ল কাজটা অন্যায় হচ্ছে, ফিরে যাই। তারপর আবার মনে হ'ল তার দাবির কথা। ভাবলুম, 'আমি তো তাকে আমায় বিয়ে করবার জন্য সাধ্যসাধনা করিনি, আমার উপর দাবির কী অধিকার আছে? একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। মেয়েমানুষের জাতকে প্রশ্রয় দিতে নেই, সর্বদা শাসনে রাখতে হয়।'

৮

তারপর সারা ভারতবর্ষটা চ'ষে ফেললুম। কত শহর দেখলুম, কত নদী পার হলুম, কত পাহাড়ের চূড়ায় উঠলুম। কোথাও কিন্তু দু-দণ্ড স্থির হ'য়ে বসতে পারছিলুম না। এতদিন যে-চঞ্চলতা হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ ছিল তা আজ যেন ছাড়া পেয়ে আমায় কশাঘাত ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। অতীতের বোঝা আমার বুক থেকে অনেকটা নেবে গিয়েছিল, কিন্তু নবীনের নেশা এখনো কাটেনি। মাস-ছয়েক প্রায় গত হ'ল। শেষে পুরীতে এসে উপস্থিত হলুম। তখন গরমের মুখ, লোক আর ধরে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লোকের ভিড় ছেড়ে এক দূরপ্রান্তে এক্‌লা বসেছিলুম। কয়েকদিন ধ'রে কলকাতায় ফেরবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জেগেছিল। আজ হঠাৎ প্রতিভাকে দেখবার

জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠলুম। ভাবছিলুম, সিধা কলকাতায় যাব, না কোনারক দেখে ফিরব, এমনসময় সহসা চোখের সামনে দিয়ে কে একটি স্ত্রীলোক চ'লে গেল। মনে হ'ল যেন আমার দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। কে ও? ও-না লিলি!

আমার বুক একবার কেঁপে উঠল, তারপর যেন একেবারে থেমে গেল। আমি ধাঁ ক'রে উঠে তার পেছু-পেছু ছুটলাম। লিলি বুঝি বুঝতে পেরেছিল আমি তাকে ধাওয়া করছি, সে-ও তার গতির বেগ বাড়ালে। আমি ডাকলুম, 'লিলি'। তার পা আরো জোরে চলল। আবার ডাকলুম, 'লিলি'। এবারে সে থেমে আমার দিকে ফিরে চাইলে। আমার নিঃশ্বাস তখন বেগে বইছিল, আমি কষ্টে বললুম, 'লিলি, কীসের ভয়ে আমার কাছ থেকে পালাচ্ছিলে?' সে, সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে?'

'ভবঘুরে। আর তুমি?'

'শরীর ভালো নেই ; ডাক্তারের উপদেশে। আজ সন্ধে হ'য়ে গেছে, যাই।'

'অত ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। এত বৎসর তোমার সন্ধান করিনি। কিন্তু যখন দেখা হয়েছে আজ সহজে ছাড়ছি না। একটা কৈফিয়ৎ তোমার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য।'

'তুমি কী জিজ্ঞাসা করবে জানি। "কেন বিয়ে করলুম?" কিন্তু আমি তো কোনোদিন বলিনি যে কুমারী হ'য়ে থাকব।'

'তা বলোনি বটে, কিন্তু এটাও বলোনি যে দু-মাস না-যেতে-যেতে বিয়ে করবে। আমি তোমাকেও ভালো ক'রে জানি, তোমার বাবাকেও চিনি। তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে এ-বিয়ে হয়েছে তা কেমন ক'রে বিশ্বাস করব। কেন এটা জানবার অধিকার কি আমার নেই?'

'অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু কারণ আমি নিজেও জানি না। আগে ধারণা ছিল কারণ ছাড়া, অর্থ ছাড়া জগতে কোনো কিছু ঘটে না। এই নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। কিন্তু এখন বুঝেছি, মানে অনেক জিনিসেরই নেই।' এই ব'লে সে যেতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আরেকটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়। আমাদের আর দেখা হবে কি-না জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি সুখী?'

তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে গেল। সে রূঢ় স্বরে উত্তর করলে, 'আমায় সে-প্রশ্ন করবার কারুর অধিকার নেই। এমন-কি তোমারও না।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'তোমার কথা জানি না, তবে আমি তোমায় একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি', কিন্তু হঠাৎ তার শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল লিলি কেমন বদ্‌লে গেছে ; কী তা ঠিক করতে পারছিলুম না। হঠাৎ দেখলুম, তার সে সুন্দর গঠন নেই। তার কটিটা এখন অক্ষীণ। সে-আঘাত যে বুকে কীরূপ বেজেছিল তা ব্যক্ত ক'রে বলতে পারি না। আমার নিঃশ্বাস রোধ হ'য়ে এল। মনে হ'ল এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন। তারপরে লিলির দিকে আবার চাইলুম। না, এ তো স্বপ্ন নয়, এ যে সত্য। আমার মাথা ঘুরছিল, গা, হাত, পা কাঁপছিল, কে যেন কানে-কানে বলছিল প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চনা, জগৎ জুড়ে একটা বিরাট

প্রবঞ্চনা চলছে। হৃদয়ের তিক্ততা চাপা দিতে পারলুম না। বিকট হাসি হেসে বললুম, 'ও বুঝেছি। আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আর দরকার নেই।'

লিলির মুখ ফ্যাকাসে হ'ল, চোখের আগুন নিবল, সে আস্তে-আস্তে চ'লে গেল।

৯

আবার এক মুসাফিরখানা থেকে অপর মুসাফিরখানায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আমার কাঁধে যেন অশান্তির এক ভূত চেপেছিল। বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা ছেড়ে দিলুম। প্রতিভার পত্রগুলো খুলেও দেখতুম না। একপল বিরাম নেই, কোনো আশ্রয় নেই। ভূ-ভারতময় পর্যটন ক'রে বেড়াতে লাগলুম। এক বৎসর কেটে গেল।

তখন আমি আগ্রায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাজমহলে যমুনার উপর চাতালটায় ব'সে ছিলাম। সেদিন পূর্ণিমা, তাজমহল অমল আলোকে ধৌত। চারদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে ; কোথাও একটি শব্দ নেই, কোথাও একটি মানুষ নেই। বসন্ত তখনো যায়নি কিন্তু তার পালা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ফুলগুলো সব পূর্ণপ্রস্ফুটিত। আর দক্ষিণ হাওয়া যাওয়ার আগে কিশলয়ের সঙ্গে শেষ খেলা খেলে নিচ্ছে। চারপাশে সবুজের লহরী, আর পাতার গান সে-শান্তিকে যেন আরো শান্ত ক'রে তুলছে। আমার বোধ হ'ল আমার মনেও তেমনি ক'রে নূতনের তরঙ্গ উঠছে, আরেকটা বিরাট নির্বাণ বুক দখল ক'রে নিয়েছে।

লিলির মুখ ক্ষীণতর হ'য়ে গেছে, আর তার জায়গায় প্রতিভার ছবি প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কী একটা অজানিত আনন্দে চিত্ত ভ'রে গেল। এমনই হৃদয়ের গতি। এখন কালো মেঘে অন্তর ভরা। ক্ষণিকের পাগল হাওয়ার স্পর্শে পরিষ্কার হ'য়ে নীলিমা জাগবে। ঠিক করলাম নিষ্ফল ভ্রমণ অনেক হয়েছে। পরিব্রাজকবৃত্তি ছেড়ে গৃহী হব। অশেষ আগ্রহে তাড়াতাড়ি কলকাতার জন্য রওনা হলুম। সে-রেলপথ আর ফুরোয় না।

বাড়িতে এসে পৌঁছুলুম প্রায় দেড় বছর বাদে। কোনো খবর দিইনি কারণ প্রতিভাকে অবাক ক'রে দেবার ইচ্ছা ছিল। বাড়িতে ঢুকেই প্রতিভা, প্রতিভা ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কোনো সাড়া নেই। অনেকক্ষণ বাদে একটা অচেনা চাকর বেরিয়ে এল। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কে, কাকে চান?' আমি আত্মপরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউমা কোথায়?' সে বললে, 'জানি না, তিনি মাস-খানেক আগে কোথায় গেছেন, বোধহয় বাপের বাড়ি।'

আমার কথাটা ভালো লাগল না। আমায় না-জানিয়ে প্রতিভা বাপের বাড়ি গেছে বিশ্বাস হ'ল না। তারপর মনে পড়ল যে তার চিঠিগুলো না-প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলতুম। কিন্তু মন তবু প্রবোধ মানলে না, কত সন্দেহ, কত সংশয় আমাকে অভিভূত ক'রে ফেললে। আমি আমার খুড়শ্বশুরের কাছে তার করলুম। সন্ধ্যের পর তারের জবাব এল। 'প্রতিভা এখানে নেই। এক মাস আগে তার শেষ চিঠিতে জেনেছি সে তোমার কাছে যাচ্ছে।'

আমি তারটা হাতে ক'রে গৃহকোণে ব'সে রইলুম। রাত্রি ঘনিয়ে আসছিল। চাকর এসে বলল, রাত্রে তার থাকার কথা নয়, অনুমতি দিলে সে যায়। ক্রমশ শহরের কোলাহল থামল,

পথ বিজন হ'ল। আমি অন্ধকারের মধ্যে নিঃসাড়ে ব'সে-ব'সে দেখছিলুম আমার জীবনের ধ্বংসাবশেষ। সন্ধের আগে থেকে মেঘ করেছিল। এখন কালবোশেখির প্রথম উচ্ছ্বাস আমার শিথিল মুঠি থেকে তারখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল। নিচে থেকে অর্গলমুক্ত দ্বারপতনের আওয়াজ ভেসে এসে আমার একাকীত্ব স্পষ্টতর ক'রে তুললে। তারপর আকাশ চিরে বৃষ্টি নামল ; সে যেন বিধাতার তপ্ত অশ্রু!

২৪-২৯ মাঘ [১৩৩০]

চার্বাক চট্টোপাধ্যায়

আমার বাংলা লিখতে শুরু করার একটা ইতিহাস আছে। তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়েছি। তাঁর প্রণয় কষ্টে এড়াতে পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু তিনি আমার সমস্ত দেহ-মনের উপরে এমন গুটিকয়েক সোহাগ-চিহ্ন দিয়ে দিয়েছিলেন, যা সহজে মুছে ফেলা অসম্ভব। এইসমস্ত নখদংষ্ট্রাঘাত দেবাদিদেব প্রজাপতির কাছে বিশেষ আদরের, সত্য। তার কারণ যে তিনি পিতামহ এবং পিতামহদের যেটা বৈশিষ্ট্য — অর্থাৎ প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়ে থাকা, তা-ও তাঁর মধ্যে প্রবল , সেইজন্যই বোধহয় এই কামরেখাধারীরা অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হয় না। পুরাতন ভারতে তো এমনি রীতিই ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর কন্যা বড়োই হালফ্যাশানের হ'য়ে পড়েছেন। এইধরনের লাঞ্ছনা তাঁর এতই অপছন্দ যে, আমাদের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রেমিকদের কাছে আসা তো দূরের কথা, তিনি আমরা যে-দেশে বাস করি, সেটি সুদ্ধ প্রায় পরিত্যাগ করেছেন।

অনেকে হয়তো বলবেন, বেশ, ভারতীর সাহায্য যদি না-মেলে অন্তদেশের কলাদেবীদের আহ্বান করতে আপত্তি কি? আপত্তি আর কিছুই নেই, কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের পর থেকে তাঁরা গা ঢাকা দিয়েছেন ; এখন তাঁদের পাওয়া ভার। অবশ্য এটা মানতে হবে যে মিল্টন ইত্যাদি দু-একজন সাধক তাঁদের ডেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু মিল্টন তাঁদের ভাষা জানতেন কাজেই তাঁর নিমন্ত্রণ বিফল হয়নি। আমরা চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর পরিশ্রম ক'রে আর যা-শিখি, শিখি, মোদ্দা দেশী বা বিদেশী বাগ্‌দেবীর আরাধনায় যে বিভিন্ন মন্ত্রের আবশ্যক, সেটা শেখা ঘ'টে উঠে না ; এই দুটো মিলিয়ে যে একটা নূতন মন্ত্রের সৃষ্টি হয় তাতে সরস্বতীর মন ভেজানো অসাধ্য।

এখানে অনেকে বলবেন, 'হ্যাঁ, সে-সব না-হয় মানলুম, কিন্তু মাইকেল?' আমি অস্বীকার করছি না যে মাইকেলের রকম-সকম, আঁচ-ধাঁচ বিলিতি-ধরনের ছিল ; কিন্তু মাইকেল অভিধান থেকে এমন দাঁত-ভাঙা সব কথার সন্ধান বার করেছিলেন, যে বাগ্‌দেবী তার আবহনী গান শুনে বুঝতে পারেননি যে সেগুলি অসংস্কৃত। স্বর্গ যে কতদূর, তা যাঁরা সেখানে যেতে চেষ্টা ক'রে থাকেন, তাঁরা বেশ ভালো ক'রেই জানেন। কাজেই বাগ্‌দেবীর কানে মাইকেলের ডাক যে একটু অস্পষ্ট শুনিয়েছিল সেটা কিছুই আশ্চর্যের নয় ; আর মিল না-থাকার দরুন দেবভাষা ব'লেও ভ্রম হওয়া সম্ভব। অবশ্য সরস্বতীর ভ্রান্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কাছে এসেই তিনি আসল ব্যাপার দেখলেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে উধাও হলেন।

তর্কের জবাব দিতে-দিতে অনেক দূর এগিয়ে পড়লুম। কী বলছিলুম প্রায় ভুলেই গেছি। যাক্ এ-সব কথা। আমার বাংলা লেখার কাহিনীটা এবার অবতারণা করা যাক্।

বৃদ্ধার প্রীতি যতই গৌরবকর হোক্-না, তা নিয়ে যুবক তুষ্ট থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় তার যা হোন্, তিনি নবীনা মোটেই নন। কাজেই কেবল তাঁকে নিয়ে আমার সানাচ্ছিল না ; কিন্তু অন্য কী যে করব তা-ও ঠিক করতে পারছিলুম [না] ; আর ঠিক করলেই-বা ফল কী? তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ঘরকন্না ক'রে অপর সমস্ত বিষয়ে অপারগ হ'য়ে পড়েছিলুম। এমনি তাঁর প্রেম।

এমনতর যুবকদের জন্য দুটি উৎকৃষ্ট পন্থা খোলা আছে। একটি হচ্ছে গলাবাজি, অপরটি হচ্ছে কলমবাজি। কিন্তু প্রথমটি আমার পক্ষে বন্ধ, কারণ আমার কণ্ঠের একটা অদ্ভুত রোগ আছে। বেশি লোক দেখলেই সেই অঙ্গটি শুষ্ক হ'য়ে যায়, তা দিয়ে গোমুখী ধারার মতো কলস্রোতে বক্তৃতা আর বেরুয় না। তাই আমায় অগত্যা লেখকই হ'তে হ'ল। কিন্তু রাজনীতি পরিত্যাগ করলেও রাজভাষার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনি। তাই দিস্তে-দিস্তে কাগজ মসীময় ক'রে সম্পাদকদের অস্থির ক'রে তুললুম। ব্রিটিশ জাতির আদর্শ হচ্ছে সমতা। যে-ডাকে প্রবন্ধ পাঠানো যায়, তাতেই ফেরৎও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই সম্পাদকদলের সঙ্গে আমার অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলতে লাগল। এ-যুদ্ধের একটা বিশেষত্ব ছিল ; এতে শত্রুপক্ষকে দেখবার জো নেই। কিন্তু পোষ্ট অফিস-শরাসনের সাহায্যে প্রবন্ধ এবং প্রত্যাখ্যান-অস্ত্রের প্রচুর ব্যবহার চলতে লাগল।

এই সংগ্রাম যে কতদিন চলত তার ঠিক নেই, যদি বিধাতা না বাম হতেন। কোনো এক সংবাদপত্র থেকে আমার একটি প্রবন্ধ ফিরে এল ; তার উপরে লেখা ছিল. 'আমরা বিশেষ দুঃখিত যে আপনার প্রবন্ধ ছাপাতে পারলুম না। কিন্তু এমনতর ইংরেজি আমাদের পত্রিকায় স্থান পেতে পারে না। বিশুদ্ধতার জন্য আমাদের একটা খ্যাতি আছে। সেটা উৎসর্গ করতে আমরা অনিচ্ছুক, এমন-কি আপনার চরণেও। অতএব আশা করি আমাদের মার্জনা করবেন। ইতি সম্পাদক।' সেই লিপিখানি পেয়ে মনের অবস্থা যে কী-রূপ হয়েছিল তা আর বিশদ ক'রে বলবার দরকার হবে না। ভাবলুম যে, ইংরেজিতে লিখে আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি, দেখা যাক্ ক্ষতি কার।

লিখতে যাওয়ার এক মুশকিল আছে, একটা ভাষার দরকার। ইংরেজি ছাড়লুম, কিন্তু ইংরেজি আমায় ছাড়ে কই? ইংরেজি শিক্ষাব প্রথম যুগে একজন বলেছিলেন, আমাদের ইংরেজিতে কথাবার্তা, বলা, লেখা, ভাবা ইত্যাদি তো করতেই হবে, এমন-কি ইংরেজিতে স্বপ্ন-সুদ্ধও দেখতে হবে। তাঁর উপদেশ আমি গ্রহণ করেছিলুম, অবশ্য আংশিকভাবে। অর্থাৎ যে-ভাষায় চিন্তা-অচিন্তা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আলাপ-প্রলাপ সম্পন্ন করতুম, তা ইংরেজি হয় তো না-ও হ'তে পারে, কিন্তু বাংলার কোনো সম্পর্কই রাখত না। তাই হঠাৎ যখন আমার শ্রীহস্তের লেখনী দিয়ে বঙ্গবাণীর সম্পদ বৃদ্ধি করতে গেলুম, তখন মহাবিপদে পড়লুম। দেখলুম, বাংলা আমার দান চায় না। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা ; কাজেই যে-সব মহামূল্য রত্নগুলি মাসিক পত্রিকায় পাঠাতে লাগলুম, সেগুলি উপাখ্যানের বানরের গলায় মুক্তার

হারের মতোই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ধুলায় গড়াগড়ি যেতে লাগল। এবারে হয়তো কলম-চালনা একেবারেই ছেড়ে দিতুম, কিন্তু বঙ্গভূমির এবং আমার নিয়তি অন্যরূপ অভিরুচি করলেন, আমার চার্বাক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

২

সেদিন আমার শততম ছোটগল্পটি অশ্বমেধের অশ্বের মতো সমস্ত সম্পাদকের হস্ত ছাড়িয়ে পুনরায় আমার কাছে ফিরে এসেছিল। সেই ফিরে-আসা, ধূলি-ধূসর প্রবন্ধটি হাতে ক'রে আমি ভাবছিলুম সাহিত্য-জগতে যখন শতক্রতু উপাধি যখন পেয়ে গেছি, তখন এইবার ক্রিয়াকলাপ বন্ধ ক'রে বাণপ্রস্থের অবসাদময় জীবন আরম্ভ করা যাক্। এমনসময় আমার এক বন্ধু এসে বললেন, 'আজ 'মুষ্ট্যাঘাত' সমিতির একটি অধিবেশন আছে। চলো সেখানে যাওয়া যাক্। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে যখন বাণপ্রস্থের ইচ্ছা হয়েছে তখন আর মুষ্টি-পদাঘাত ইত্যাদির কথা ভাবা শোভা পায় না। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। আমায় তাঁর অনুবর্তী হ'তে হ'ল।

পথে যেতে-যেতে এই সমিতির কতকটা পরিচয় পেলুম। সভাপতির নাম চার্বাক চট্টোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত কবি (যদিও তখনো তাঁর কোনো লেখাই আমি পড়িনি)। পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুষ্টি ব্যবহারে লেখকদের কীর্তি প্রচার করা। যদি এই সভার কোনো সভ্যের লেখা সম্বন্ধে কোনো পত্রিকা রূঢ় সমালোচনা করে, তাহ'লে তার ভবলীলা যে অচিরেই সমাপিত হ'তে পারে, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। আমার তখন সম্পাদকদের প্রতি যে কী প্রগাঢ় প্রীতি, তার কতকটা পরিচয় দিয়েছি। তাই আমার বন্ধুটিকে ধ'রে বসলুম যে আমাকেও এই দলের একজন ক'রে দিতে হবে।

অনেক বক্তৃতা হ'ল, অনেক সম্পাদককে সাবধান ক'রে দেওয়া হ'ল ; দু-একখানা কাগজের আয়ু সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশিত হ'ল, তারপর অধিবেশন খতম হ'ল। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে শুনছিলুম। অন্যসব বক্তৃতাগুলির কথা মনে নেই, কিন্তু সভাপতির অভিভাষণটা খুবই ভালো লেগেছিল, কারণ তার একটি বর্ণও বুঝতে পারিনি।

সভাভঙ্গ হ'লে পর চার্বাকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল।

নর-সুন্দর এবং দর্জির হাতে পড়লে চার্বাক সুপুরুষ ব'লে পরিগণিত হ'তে পারত, কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন লম্বা-লম্বা রুক্ষ চুল আর অহিফেন-সেবী স্বপ্নবৎ পোষাকে তাকে অনেকটা ঝোড়ো কাকের মতো ক'রে তুলেছিল। সে কথা কইত সাধারণত সপ্তম সুরে, নচেৎ গলাটা মন্দ ছিল না।

আমি তাকে বললুম, 'আপনার কাব্য পড়বার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আপনার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছি।'

সে বললে, 'আমার কাব্য পড়েননি শুনে আনন্দিত হলুম। আমার ইচ্ছে নয়, আমার কাব্য সকলে পড়ে।'

আমি তো স্তম্ভিত। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে আমার জ্ঞান অল্পই, কিন্তু লোকে যদি না-পড়লে তো কাব্য লেখার স্বার্থকতা কী, তা বুঝতে পারলুম না।'

সে বললে, 'আপনার জ্ঞান যে অল্প তা আপনার কথা থেকেই বুঝছি, বিশদ ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।'

অপরে কেউ এমন কথা বললে তাকে যে কী করতুম বলতে পরি না, কিন্তু যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তেমন লেখকদের প্রতি এ-সময়ে আমার আস্থাটা প্রবল ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ভুলতে পারিনি যে চার্বাক 'মুষ্ট্যাঘাত' সভার মালিক। তাই চুপ ক'রেই রইলুম।

সে আবার বললে, 'কলার আদর্শ হচ্ছে মহত্ত্ব। যা-লিখলুম তা যদি সকলেই পড়লে তবে আর বৈশিষ্ট্য রইল কোথা?'

আমি বললুম, 'যেটা সাধারণের দুর্ব্যবহারেও অমলিন থাকে সেটাই কি সত্যকারের মহৎ নয়?'

সে বললে, 'এবার হয়তো-বা বলবেন যে-কাপড় পাঁকে চুবিয়ে নিলে ময়লা হ'য়ে যায় সেটা বাস্তবিক সাদা নয়।'

আমি উত্তর দিলুম, 'এ দুটো কথা এক হ'ল না। আর লোকে যাতে আপনার লেখা না-পড়ে, তাই যদি আপনার অভিরুচি, তবে এই 'সম্পাদক-চৌদ্দপুরুষনাশিনী সমিতি'র সৃষ্টি করেছেন কেন?'

সে বললে, 'আপনার বুদ্ধির দৌড় অনেক আগেই বুঝে নিয়েছি। যে-বিষয়ে জানেন না সে-সম্বন্ধে ব'কে আর ভালো ক'রে পরিচয় দিচ্ছেন কেন? আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে সম্পাদকরা আমাদের লেখা নিক, আমরা তার জন্য থোড়াই তোয়াক্কা রাখি। আর যখন তাদের আমাদের জন্য কিছুই করতে হচ্ছে না, তখন সমালোচনা করবার কী অধিকার আছে?'

আমি বললুম, 'সমালোচনা করবার অধিকার সকলের। আসল জিনিসের সমালোচনায় কোনো অপকার হয় না, তা সে সমালোচনা যতই অন্যায় হোক্। আর যারা তেমন সমালোচনার ভয়ে পাততাড়ি গুটোন, তাদের আসরে না-নামাই উচিত ছিল।'

চার্বাক উত্তর দিলে, 'আসল জিনিস, ভালো জিনিস আপনি চিনবেন কী ক'রে, যে অত বড়ো-বড়ো-কথা বলছেন। আর দেখুন, কুকুরের চেঁচাবার অধিকার আছে; কিন্তু তাই ব'লে যদি গৃহস্থের বাড়ির সামনে শোরগোল তোলে তাহ'লে কি গৃহস্থ তা সইবে। কখনোই না, তদ্দণ্ডে তাকে লগুড়াঘাতে দূর ক'রে দেবে।'

আমি এবার চ'টে গিয়েছিলুম, তাই জবাব দিলুম, 'গৃহস্থেরা সাধারণ মানুষ। তারা নিজেকে তো মামুলির স্রোত থেকে পৃথক্ রাখে না, তাই তাদের এমন ব্যবহার শোভা পায়। কিন্তু কুকুর চাঁদকে দেখে যখন চেঁচায়, তখন চাঁদ যদি তাকে তাড়াবার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসে, তাহ'লে আমরা তাকে আর চাঁদ ব'লে মানব না। আমি ভালো মন্দের বিচার না-করতে পারি, কিন্তু লিখেছি অনেক, আর আপনাদের তুলায় তৌল করলে আমি একজন মস্ত লেখক, কেন-না আমার লেখা সাধারণে পড়েনি। কিন্তু আমার আদর্শ হচ্ছে অন্যরূপ। কুকুরে চেঁচালে

কুকুরের গলা ভেঙে যাবে, চাঁদের তাতে কোনো ক্ষতি বা বৃদ্ধি নেই। সাধারণেই দেখুক আর আপনার মতো কবিই দেখুক সে সবসময়েই হাসছে।'

আমিও একজন লেখক শুনে, চার্বাক একটু নরম হ'ল। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'মশায়ের লেখা কীসে বেরিয়েছে?'

আমি বললুম, 'কিছুতেই না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষেরা আমার লেখার মূল্য বুঝতে পারেননি। তাই তো আপনাদের সভার শরণাপন্ন হয়েছি। আশা আছে আপনারা সহায় হ'লে তাঁদের অন্ধতা কেটে যাবে।'

সে বললে, 'পত্রিকায় লেখা বার ক'রে দেওয়া আমাদের কাজ নয় ; আর যে এইসকল ঘৃণ্য জিনিসের সংস্পর্শে নিজেকে কলুষিত করে তাকে আমরা আমাদের সভায় নিই না। আপনার যদি আমাদের দলে মেশবার ইচ্ছে থাকে তাহ'লে আপনি ওই কর্মটি করবেন না। তার চেয়ে একখানা বই বার করুন না।'

লিখতে গেলে যে-আত্মশ্লাঘা থাকার দরকার তা আমার সম্পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু আমার দৌড় ছিল মাসিকপত্র পর্যন্ত। মানে, আমি যে একজন খুব উঁচুদরের লেখক তা আমি জানতুম, এবং এটাও মানতুম যে আমার লেখা সকলের পড়া উচিত। কিন্তু মৎ-প্রণীত গ্রন্থ যে অপরে পয়সা খরচ ক'রে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। মাসিকপত্র নেয় লোকে নানান কারণে ; যথা ছবি, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাতে যা প্রবন্ধ বা অন্যান্য পাঠ্যবিষয় আছে, তা পড়বার জন্য কারুর মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। এটাই হচ্ছে মাসিকের বিশেষত্ব। কিন্তু নগদ মূল্য এক টাকা খরচ ক'রে বই কিনলে সেটা প'ড়ে দেখবার একটা দায়িত্ব এবং আগ্রহও সঙ্গে-সঙ্গে কিনতে হয়। তাই আমার লক্ষ্য মাসিক-রূপ তরুশিরেই নিহিত ছিল, পুস্তকরূপ নভোতলে আকৃষ্ট হয়নি। সে যাই হোক্, চার্বাকের কথায় আমার মনে প্রথম লোভ জাগল। আমি বললুম, 'বই বার করতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু পড়বে কে?'

সে বললে, 'আপনাকে এই এক ঘণ্টা ধ'রেবোঝাতে চেষ্টা করছি যে লোকের পড়বার জন্য বই লেখা হয় না।'

আমি বললুম, 'আমার ইচ্ছে আমার বই লোকে পড়ে।'

সে বললে, 'বেশ, তাই যদি ইচ্ছে হয় তাই করুন। লোককে পড়ানো শক্ত নয়। আপনার কী লেখা অভ্যাস, উপন্যাস, নাটক না কবিতা?'

আমি জানালুম যে গল্প লেখাই আমার ইচ্ছা, এবং বিশ্বাস যে, তাতে আমার কিছু শক্তিও আছে।

সে বললে, 'বেশ, তাহ'লে একটা নভেল লিখুন যাতে কলিকাতার বিখ্যাত ধনীর পুত্র কুমতি বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাধ্বী স্ত্রী সুশীলাকে ছেড়ে বাইজি ভুবনমোহিনীর মোহে পড়েছে। শেষে ভুবনমোহিনী কুমতির ভদ্রাসনে এসে মৌরসিপাট্টা গাড়লে, আর সুশীলা তার পদসেবায় নিযুক্ত হ'ল। একদিনের তরেও সুশীলার মুখে কেউ টুঁ শব্দটি শুনত না। অন্যে যদি তাকে বিদ্রোহ করতে বলত—সে উত্তর দিত, "সে কি? স্বামী যাকে ভালোবাসেন তার পদসেবা করব সে তো পুণ্যের কথা। ক-জনের এমন সৌভাগ্য ঘটে। না, আমি

ভুবনমোহিনীর দাসী হ'য়েই জীবন কাটাব।" কিন্তু তার মনের ভেতর দারুণ আন্দোলন চলবে। শেষে মরার আগে সে ভুবনমোহিনীকে ডেকে তার হাতে স্বামী কুমতিকে সমর্পণ ক'রে যাবে, বলবে, "আমি ওঁকে সুখী করতে পারলুম না, তুমি ক'রো।" তারপর কুমতি হঠাৎ সুমতি হ'য়ে পড়বে। ভুবনমোহিনীকে তাড়ানোর উপায় দুটো আছে। হয় কুমতি তাকে "পাপীয়সী", "রাক্ষসী", "মায়াবিনী" ব'লে পদাঘাত ক'রে রাস্তায় বের ক'রে দেবে ; নচেৎ ভুবনমোহিনী কুমতির লোহার সিন্ধুক থেকে ১০।২০ লাখ টাকার গয়না চুরি ক'রে পালাবে। আমার মনে হয় শেষোক্ত উপায়টাই বেশি বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহ'লে আবার পুলিস ডিটেক্‌টিভের কথাও তোলা চলবে, আর অন্তে ভুবনমোহিনীকে দ্বাদশবর্ষ সশ্রম কারাদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে। শেষ পরিচ্ছেদে কুমতি হয় সব সম্পত্তি দেবোত্তর ক'রে দিয়ে বিবাগী হ'য়ে যাবে, নচেৎ সুশীলার বোন সরলাকে বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাকবে। বিয়ে দিয়ে গল্প শেষ করাই ভালো। মধুরেণ সমাপয়েৎ। এর উপরে যদি একটু "বন্দে মাতরম্", "জয় ভগবানের জয়" ছড়িয়ে দিতে পারেন তাহ'লে তো আর কথাই নেই। রামধনুক রঙের বাঁধাই করতে ভুলবেন না। এমনতর একখানা *পতি পরম গুরু* ছাপান দিকি ; দেখি কেমন বিক্রি না-হয়।'

সেদিন এই অবধি হ'য়েই স্থগিত রইল। অবশ্য, আমি চার্বাকের উপর ভয়ানক চ'টে গিয়েছিলুম। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করতে পারি না যে তার প্রতি আমি আকৃষ্টও হয়েছিলাম। অবশ্য গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম তার মুখে-মনে মিল নেই, কিন্তু তার সকল কথা যে ঢঙের খাতিরে তা বুঝতে আমার বিলম্ব হয়েছিল। আজ জেনেছি তার এই চাল শুধু নিজেকে জাহির করবার জন্য। কিন্তু তখন তো আর তার প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ হয়নি, কাজেই তার ব[ই]য়ের বিক্রি কত তা জানতুম না। পরে শুনেছি যে এই মুষ্ট্যাঘাত সমিতি স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গে তার নাম এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে এক বছরের মধ্যে তার কাব্যগ্রন্থের আট-দশ সংস্করণ করতে হয়। প্রাচীন উদ্ভটকার বলেছেন, 'ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশ জনঃ।' অনেক দেখে শিখেছি যে, বক্রয়ানা আত্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু যাক্ সে-কথা ; যথাসময়ে তার উত্থাপন করা যাবে।

৩

একদিন বিকালে এক বন্ধুর সহিত কথা কচ্ছি, চাকর এসে খবর দিলে চার্বাকবাবু এসেছেন। আমি তো আশ্চর্য। মনে-মনে যে একটু গর্ব অনুভব করেছিলুম, তা-ও অস্বীকার করতে পারি না। আমি একজন অপ্রকাশিত লেখক, আর চার্বাক নামজাদা কবি। তাই সে যে আমার বাড়িতে যেচে আসবে এ কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমার বন্ধুটিও অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তার কারণ কিন্তু অন্য। তিনি ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, কাজেই চার্বাক নামধেয় লোক যে এখনো জগতে আছে এই সংবাদটা হজম করতে তাঁর কিঞ্চিৎ সময় লেগেছিল। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন, কিন্তু সেটা ঘটল না, চার্বাক ঘরে প্রবেশ করলে।

সে আসতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভালো আছেন তো?'

সে তো চ'টেই আগুন। 'আপনার চোখ যে খারাপ তা তো আগে শোনাননি। ভালো যদি না-থাকব তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কী ক'রে?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম, 'তা দেখুন, বাইরে দেখে তো সবসময় বোঝা যায় না। এমন অনেকসময় হয় যে বেশ হেঁটে বেড়াবার শক্তি থাকে ; ভেতরে অসুখ লুকুনো থাকে।'

'সেটাও যে আমার ক্ষেত্রে নেই আপনার বোঝা উচিত ছিল। নয়তো আপনার কাছে আসতুম না। আপনার বাক্যাবলির এমনি গুণ যে তাতে সুস্থ শরীরও ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। যখন স্বেচ্ছায় সে-যন্ত্রণা বরণ ক'রে নিয়েছি তখন বুঝতে হবে আমি খুব ভালোই আছি।'

আমি এ-কথার প্রতিবাদ না-ক'রে, আমার বন্ধুটির সঙ্গে চার্বাকের আলাপ করিয়ে দেবার সূত্রে, তার দিকে দেখিয়ে বললুম, 'ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত কবি শ্রীচার্বাক চট্টোপাধ্যায়।'

চার্বাক ধাঁ ক'রে ব'লে উঠল, 'আপনাকে সেদিন অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলুম, এখন দেখছি বৃথাই, যে আমার বিখ্যাত হবার কোনো ইচ্ছে বা চেষ্টা নেই।' তারপর আমার বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন, নিবেদন কেন প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ ক'রে আমার কাব্যগ্রন্থ *সারণ* পড়বেন না।'

আমার বন্ধুর মুখখানি এইসময়ে স্তম্ভিত-বিষ[স্ম]য়ে অতুল হ'য়ে উঠেছিল।

চার্বাক ফের আমার দিকে ফিরে বলতে লাগল, 'দেখুন, আরেকটা কথা আপনাকে বলবার আছে। ভবিষ্যতে আমার নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করবেন না।'

এইবার আমি সুযোগ পেয়েছিলুম, তাই চট্ ক'রে বললুম, 'আপনি যে শ্রীহীন তা আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি, বৃথা ব'লে আর কষ্ট করছেন কেন?'

সে বললে, 'যদি জানেন তো অজ্ঞের মতো আমার নামের আগে শ্রী লাগিয়ে দিলেন কেন? আমার লক্ষ্মীমন্ত হবার কোনো বাসনা নেই। লক্ষ্মী বৈশ্যের দেবতা, আমার তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার মতে শ্রীযুত হওয়া বেনেপনার চূড়ান্ত।'

আমার বন্ধুটি মৃদু স্বরে বললেন, 'কিন্তু একটা প্রাচীন পদ্ধতি চ'লে আসছে সেটাকে অযথা লঙ্ঘন করার কী দরকার, কাউকে কামড়াচ্ছে না তো।'

চার্বাক বললে, 'প্রাচীন পদ্ধতি! আমি পদ্ধতি-টদ্ধতির ধার ধারি না। বাঁধা পথে চলা আমার পেশা নয়। নিয়মের গণ্ডিতে আটকানো থাকে সাধারণ মানুষে ; প্রতিভাবান সে-সব মানে না। আমরা যা করব সেটাই পদ্ধতি হবে। এইজন্যেই আমি চার্বাক নাম নিয়েছি।'

আমি বললুম, 'কীরকম?'

সে উত্তর দিলে, 'তা জানতেন না, বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিল লক্ষ্মীপদ। আমি দেখলুম আমি কারুর পায়ের তলায় থাকতে পারি না, বিশেষত লক্ষ্মীর চরণে।'

আমার সুহৃদ্ তো অবাক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী মশাই? বাপে-মায়ে নাম দিলে আর আপনি—।'

চার্বাক বাধা দিয়ে বললে, 'এতে আশ্চর্য হবার কি কিছু আছে? আমার বাবা ছিলেন ৫০্ টাকা মাইনের কেরানি। তাঁর কাছে লক্ষ্মীই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তাই ব'লে আমার কাছেও

যে তাই হবে এর কোনো মানে নেই। আর বাপের দেওয়া নাম তো সকলেরই আছে তাতে আর নূতনত্বে মাধুর্য রইল কোথা। তাইতেই তো আমি চার্বাক নাম পছন্দ করিছি। এর কারণ কী, আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন। কারণ দুটো ; প্রথম, যে এটা আর কারুর পছন্দ হয় না ; দ্বিতীয়, যদি আদিম ভারতে কেউ পূজনীয় বা অনুসরণীয় থাকে তো সে হচ্ছে ওই এক মহাপুরুষ। আমার বিশ্বাস আমি যদি সে-সময় জন্মাতুম তাহ'লে আমিই চার্বাক হতুম। এমন নাম আমি আবিষ্কার করতে পারতুম যা অপরে গ্রহণ করেনি। কিন্তু সে-মহাত্মার উপরে উঠবার আমার শক্তি নেই ; তাঁর কাছে হার মানলুম।'

আমার বন্ধুটি আবার বললেন, 'যাঁরা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন যাঁদের কাছে আপনি সকল বিষয়ে ঋণী, তাঁদের দেয়া নাম আপনি কী ক'রে উল্টে দিলেন আমি বুঝতে পারছি না।'

চার্বাক বললে, 'ঋণী! আমি বাপ-মার কাছে শুধু জন্ম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ঋণী নই। আমার প্রতিভা, সে কি তারা দিয়েছে? তাহ'লে ৫০্ টাকা মাইনের কেরানি ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারতুম না। ঋণী কি? আমি কারুর ধার ধরি না। শাস্ত্রে একটা খাঁটি কথা বলেছে, 'স্বনামো পুরুষ ধন্য।' আমি যা করেছি তা নিজের জোরে, নিজের বুদ্ধিতে। কৃতজ্ঞতার আমার অভাব নেই। কিন্তু যার যা-প্রাপ্য তার বেশি দিতে আমি নারাজ। চট্টোপাধ্যায় আখ্যাটা বদ্‌লে দিইনি, এটাই আমার সৌভাগ্য। আমার জন্ম দেবার সময় কি তারা আমার কথা ভেবেছিল, না নিজেদের স্পৃহার?'

পূর্বেই বলেছি, আমার বন্ধুটি একটু পুরানো-ধরনের লোক ছিলেন। এ-কথাগুলো তাঁর কাছে যে অপ্রিয় লাগছিল সেটা বলাই বাহুল্য। আমি নব্যতন্ত্রী ব'লে গর্ব ক'রে থাকি, আমারই সেগুলা কটু লাগছিল, তা তাঁর কথা তো দূরে। তিনি ভীষণ চ'টে গিয়েছিলেন, তাই তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটুকু কৃতজ্ঞতাও দেখাচ্ছেন কেন, বলুন-না আপনার জন্মেতেও আপনার পিতার কোনো হাত নেই।'

অন্য কেউ হ'লে চুপ ক'রে যেত, কিন্তু চার্বাক চাটুজ্যে তেমন পাত্র নয়। সে বললে, 'সে-সৌভাগ্য যদি হ'ত তাহ'লে কি বলতে বাকি রাখতুম। আমার জীবনে একটা দুঃখ র'য়ে গেল, আমি অনিয়মে জাত সন্তান নই। আমার বাবা শাস্ত্রের ব্রাহ্মণের দাসবৃত্তি সম্বন্ধে নিষেধ ভুলে চাকরি নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা' বিধানটা ভুলতে পারেননি।'

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কিন্তু আমার বন্ধুবরের মুখের ভাব দেখে বুঝেছিলুম যে এবার একটা বিপদ ঘটবে, তাই চার্বাককে চুপ করাবার জন্য বললুম, 'আপনি ঠাট্টা করছেন বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ঠাট্টা করার পাত্র আছে। নিজের পিতা-মাতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করা কুরুচির পরিচয় দেয়।'

সে বললে, 'রুচি কাকে বলে শিখুন, তারপর আমাকে কুরুচি সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। আপনি বোধহয় জানেন না যে আগেকার দিনে প্রায় সকল মহাত্মারাই, অবশ্য আমার মতে মহাত্মা নয়, জন্মের ঠিক ছিল না। এমন-কি আপনাদের আদর্শ পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অবধি নয়। নিয়মে তো সকলেই জন্মায় ; অবৈধতায় যাদের উৎপত্তি তারাই সত্য ক্ষণজন্মা। আমার

একটা খেদই হচ্ছে ওই। তাইজন্যই আমি নিজেকে সর্বতোভাবে বড়ো ব'লে মনে করতে পারি না।'

আমার বন্ধু বললেন, 'মশাই বোধহয় অবিবাহিত নচেৎ অমন কথা বলতে সাহস করতেন না, কী জানি গৃহিণী যদি উপদেশ-মাফিক ক্ষণজন্মার মাতা হ'তে প্রয়াস পান।'

চার্বাক বললে, 'আজ্ঞে, তা বলতে পারব না, সে-নিয়মটা পালন করেছিলুম, কিন্তু আমি চিরকালই স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাঁকে এমনি মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিলুম, যে তিনি পরিশেষে এ-কায়াবন্ধনও সহ্য করতে পারলেন না। দেহমুক্ত হ'য়ে আশা করি এখন নরকে রাস করছেন।'

আমার বন্ধু বললেন, 'ভগবানের মার, ভগবানের মার। আপনার চোখ খুলে দেবার জন্য তিনি এমন করেছেন। সাবধান হ'ন, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। তাঁরও ধৈর্যের সীমা আছে।'

চার্বাক বললে, 'তাঁর ধৈর্যের সীমা আছে কি-না জানি না, কিন্তু আমার ধৈর্যের সীমা আপনি পেরিয়ে গেছেন। আপনার সঙ্গে আর বকতে পারি না। আমি দুগ্ধ-পোষ্য নই যে আমায় ভগবানের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখবেন। আজ প্রায় বিশ বছর নাগাদ আমার বিচারবুদ্ধির ভয়ে বরং তিনিই আমার উপর থেকে স্বীয় আধিপত্য গুটিয়ে নিয়েছেন।'

আমার সখার আর সহ্য হ'ল না, তিনি আমায় বললেন, 'এ-রকম নাস্তিকের সঙ্গে যতদিন সম্পর্ক রাখবে, ততদিন তোমার বাড়িতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব।' এই কথা ব'লেই তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

চার্বাক হাসতে লাগল।

৪

আমায় একটা কথা স্বীকার করতে হবে, যার জন্য হয় তো লোকে আমায় বিকৃতচেতা বলবেন। সেটা হচ্ছে যে চার্বাকের সহিত আমার সখ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি বুঝতুম যে তার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা শুভকর নয়, কিন্তু তার কী সম্মোহনী ছিল, যা এড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। আমি চিরদিন বিশ্বাস ক'রে আসছি যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা লাভ করা ; আর যেহেতু সে-সম্পদটা কারাগারের মধ্যে লাভ করা যায় না, আমি নানারকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। চার্বাক যে একটা অসুলভ এবং চিত্তগ্রাহী শ্রেণীর লোক তা মানতেই হবে।

নিজের দোষ ঢাকতে, অন্তত কমাতে সকলের চেষ্টা থাকে ; তাই এটা না-ব'লে পারছি না যে আমাদের মৈত্রী সম্পূর্ণ আমার অভিলষিত নয়। আমার স্বাভাবিক একটা নম্রতা আছে, যার জন্য বন্ধুত্ব-স্থাপনে প্রথম চেষ্টা সাধারণত আমার দিক থেকে হয় না। চার্বাকের যে-পরিচয় দিয়েছি তার থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে তার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে চট্ ক'রে কেউ এগুবে না, আমার মতন নিরীহ লোকে তো নয়ই। বোধহয় আমার এই নিরীহতাই আমাদের নৈকট্যের মূল। তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, সে-সময়ে চার্বাক কতটা একাকী ছিল। আমি ভুলিনি যে সে মুষ্ট্যাঘাত সমিতির সভাপতি ইত্যাদি

ইত্যাদি। কিন্তু সে-সভায় তার বুদ্ধিবৃত্তির সমকক্ষ কেউ ছিল না ; আর থাকলেও তার অদ্ভুত ধারণাগুলি শুনে তার কাছে কেউ এগুতে সাহস করত না। তাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল বটে সঙ্কীর্ণতা নাশ আর বেনেপনা উচ্ছেদ কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে বেনেপনার অংশটা কিছু বেশি। মুষ্ট্যাঘাতের সভ্যরা আর যা-হোন্ অনন্যসাধারণ নন, অবশ্য চার্বাক ছাড়া।

লেখার দরুন যে বন্ধুলাভ হয়, চার্বাকের তা ঘটেনি। অবশ্য তার কবিতা হালফ্যাশানের যুবকদের মধ্যে দিন-কতকে একটা ধুয়ো হয়েছিল। কিন্তু তার স্থিতি অল্পদিনের জন্য। তার বই কিনত তারা যারা তার সঙ্গে অল্পসময়ের জন্য কথা বলেছে। সম্পাদক-প্রভুদের শুভদৃষ্টি পেলে সে যে খুব বিখ্যাত হ'তে পারত, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্য-জগতে তাকে কেউ চিনত কি-না জানি না, বোধহয় না। তার কাব্যের মধ্যে এমন-কিছু ছিল, যার জন্যে সে এই দলের আদর পেতে পারে।

আমার একটা ভয় হচ্ছে, বুঝি তার লেখার প্রতি অন্যায় করছি। তার কবিতার সঙ্গে আমার এমন জানাশুনা নেই যাতে ক'রে সমালোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই অপরিচয়ের জন্য দোষ আমার নয়। তার সাথে আলাপ হবার দিনই আমি তার বই *সারণ* কিনি। কিন্তু *সারণ* বোঝবার জন্য যত টাকার অভিধানের দরকার তত সম্পত্তির মালিক আমি নই। আমার কাছে তার বইখানি যে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল তার কারণ আমার বাংলা ভাষায় অনধিকার হ'তে পারে। কিন্তু তাকে যখন এই কাঠিন্যের হেতু জিজ্ঞাসা করেছিলুম সে বলেছিল, 'আমার চেষ্টা যাতে সাধারণে বুঝতে না-পারে। কলার আদর্শ বদ্‌লানো দরকার। এতদিন শুধু সৌন্দর্যেই লোকে তুষ্ট থাকত, আমার কাজ হচ্ছে কলাকে আভিজাত্য দান করা। ঠিক বলতে গেলে জগতে এ অবধি একটা কবিও জন্মায়নি ; আমিই প্রথম। সেইজন্যেই আমার বইয়ের নাম দিয়েছি *সারণ*।'

প্রণয়-স্মৃতি

এটার্নি আফিসের আবহাওয়ায়, হাবভাবের, আসবাবপত্রের বা অভ্যাগতবৃন্দের মধ্যে এমন কিছু নেই, যার সংস্পর্শে জেগে উঠতে পারে মেদুর-করুণ সুদূর অতীতের ছবি। কিন্তু আজকে আমার ভাগ্যবিধাতা অন্যরূপ অভিরুচি করেছেন। এই চিরাভ্যস্ত প্রতিবেশও যে স্মৃতি-বাঁধা কর্মে অন্যমনা ক'রে দিয়ে প্রকাশের ভাষা মাগে, তাকে দমিয়ে রাখবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যে-শপথ করেছিলুম সেটা আজকে ভাঙতে আমি বাধ্য, — আর না-ই যদি ভাঙলুম তবে আর শপথ করায় লাভ কী? ফের কলম ধরেছি। আঃ, কাগজের উপর লেখনীর সেই সর্‌সরনি শব্দ! কতদিন পরে আবার সেই চিরপুরাতন সঙ্গীত শুনছি! কী মধুর ধ্বনি!

আপনারা ভয় পাবেন না যে বাংলাদেশেও বুঝি কোনো প্রুস্তের আবির্ভাব হ'ল। প্রুস্ত প্রথম পুস্তক প্রকাশ করবার পর সতেরো বৎসর নীরবে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন। আমিও পনেরো বৎসর চুপ ক'রে আছি, তবে সেটা অভিজ্ঞতা আহরণ করবার জন্যে নয়, অর্থ উপার্জন করবার জন্যে। এতটা অবধি তাঁর সঙ্গে আমার মিল। কিন্তু তাঁর মতো চৌদ্দ-খণ্ড-ব্যাপী উপন্যাস লেখবার অধ্যবসায় বা আগ্রহ আমার নেই। আর থাকলেও পারব না। উপন্যাসের উপকরণ মানুষ ও সজীব মন বিশেষ ক'রে তার প্রসার যদি চতুর্দশ [খণ্ড] অবধি হয়। মানুষের এবং সজীব মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়তো বাংলাতেও হয়; কিন্তু এটার্নির আফিস সে-মিলনের ক্ষেত্র হ'তে পারে না। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা 'মনুষ্য-রূপেন মৃগাশ্চরন্তি' না-হ'লেও, মনুষ্যরূপী মৃগদের ধরবার, মারবার কলকৌশলের অন্বেষণেই আসেন। এখানে পনেরো বৎসর অতিবাহিত ক'রে হয়তো আমার শিক্ষা হয়েছে মৃগয়া বিষয়ে, হয়তো আমার কৃতিত্ব হয়েছে ফাঁদ নির্মাণে, হয়তো আমি পারদর্শী হয়েছি গণিতশাস্ত্রে, কিন্তু চিরপ্রাণের সন্ধান খুঁজে পাইনি। আজকে যে-সম্বন্ধে লিখতে কলম চালাচ্ছি তা এই পঞ্চদশ-বর্ষ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, তার পূর্বের দশ-বিশ-বৎসর-ব্যাপী স্বপ্নপ্রয়াণের একটা অঙ্কের কাহিনী মাত্র।

কয়েক লাইন উর্ধ্বে যে আপনারা ব'লে সম্বোধন করলুম সেটা কাদের? পাঠকদের? এমনিই অভ্যাসের দোষ। একদিন ছিল যখন মহাসমারোহে নিজেকে কলম-সর্বস্ব ব'লে জাহির করতে প্রয়াস পেয়েছিলুম। কিন্তু সে-পাগলামি আজ নেই। আজ যে লিখছি সেটা শুধু আত্মপ্রসাদের জন্যে; সেটা লিখছি লেখবার আদেশ এসেছে ব'লে, যে-আজ্ঞা আমার

লঙ্ঘন করবার উপায় নেই ; সেটা লিখছি লেখার মধ্যে যে-বিলাস আছে তা উপভোগ করবার জন্যে। আজকের লেখার উদ্দেশ্য নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। যখন এই ক্ষণিকের নোদনা, নোদনা কথাটা ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করলুম ; আমার উপস্থিত দশা বর্ণনা করতে এই কথাটি ছাড়া অপর কোনো বাক্য খুঁজে পাচ্ছি না ব'লে, আত্মম্ভরিতার নিদর্শনস্বরূপ নয় — যখন এই ক্ষণিকের নোদনা ফুরিয়ে যাবে, খানকয়েক সাদা কাগজ নষ্ট করা শেষ হবে, তখন এই আয়াসসাধ্য, নিষ্ফল পত্রগুলো আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব।

উপরোক্ত কথাগুলি লিখলুম, লেখার খাতিরে। নিজের মনকে আঁখি ঠেরে কোনো লাভ নেই। আমি জানি, নিশ্চয় জানি যে এই রচনাটা নষ্ট করব না ; লেখা সমাধান হ'লে ছাপাব ; লোকেও কিনবে এবং পড়বে। কেন-না লেখক ব'লে আমার নামের একটা খ্যাতি আছে। আঃ, ওই খ্যাতিটা যদি না-থাকত বাঁচতুম। কবি এবং এটার্নির সংযোগ উভয়ের কারো পক্ষেই শুভদ নয়। সমালোচকরা ভাবে আইন-ব্যবসায়ী আবার লিখবে কী, ভাবজগতের সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক। আবার মক্কেলরা মনে করেন যে, যে-উকিল কাব্যকথা নিয়ে থাকে তার দ্বারা হস্তান্তরপত্র কোনোমতেই সুচারুরূপে রচিত হ'তে পারে না। যিনি আকাশে নিজের অধিকার চালাতে চান, তিনি যে মর্ত্যবাসীদের স্বত্ব-স্বার্থ বাঁচিয়ে দলিল-দস্তখতের মধ্যে নিজেকে তলিয়ে দিতে পারবেন, তাতে তাঁদের সন্দেহ হয়।

আমার বিশ্বাস যে লেখাতে আমার একটা স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি আছে। সেটা যে একটা কিছু গৌরবনীয়, তা আমার মনে হয় না ; কিন্তু হাতে কলম পড়লে মনের বিষয় বা প্রকৃতির বিষয় আমি বেশ গুছিয়ে লিখতে পারি। এই ক্ষমতাটা যে কেন প্রতিভা ব'লে বর্ণিত হয়, বুঝতে পারি না। কেউ-কেউ সহজে অনেক খেতে পারেন, সহজে বারো ঘণ্টা ঘুমুতে পারেন, সহজে অনেক পথ চলতে পারেন, সহজে অনেকরকম খেলা খেলতে পারেন ; এমন-কি বিনায়াসে সমস্ত আটঘাট বেঁধে চুক্তিপত্রও লিখতে পারেন, তাঁদের তো কেউ প্রতিভাশালী ব'লে গালি দেয় না। গালি বললুম, কেন-না লোকে যখন বলে অমুক লোকের প্রতিভা আছে, সেটা এমন স্বরে বলে যেন অমুক লোক পাগলের সামিল। আর আমারও যে এই লেখবার শক্তি সে হচ্ছে বিশেষ-ধরনের রচনার শক্তি। আমি ছন্দের নিয়ম রক্ষা ক'রে, বন্ধনের, অক্ষরের, চরণের, মিলের মর্যাদা মেনে স্বচ্ছন্দেই চলতে পারি। কিন্তু অভিযোগপত্রের ছেদহীন ক্রিয়াহীন অসীমতার মধ্যে হ'য়ে যাই একদম দিশাহারা। কাজেই মক্কেলদের সংশয় যে সম্পূর্ণ অমূলক তা বলা অসম্ভব।

অতএব যেটা আমার আসে, যেটা করতে লাগে ভালো, সেটা করব, তাতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। অবশ্য এবারেও লোকে বলবে। কেউ বলবে যে আমার এই গল্পটির মধ্যে রুশ-সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি বেশ স্পষ্ট ; কেউ বলবে ফরাসি লেখকদের কাছে আমি পরম ঋণী ; কেউ বলবে ইংরেজি উপন্যাসের একটা ধারায় আমার আখ্যায়িকা পরিপ্লুত ; আবার কেউ বলবে এ-সমস্ত কথাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে চুরি ; পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমবাবুও ঠিক এইরূপ বর্ণনাই ক'রে গিছলেন। কথাগুলো মিথ্যা নয়। আধুনিক যুগে লেখক হওয়ার একটা মস্ত আপত্তি হচ্ছে যে নতুন কিছু বলবার আর বাকি নেই। প্রাচীন কবিরা যখন

লিখেছিলেন তখন ভাষার পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধিত হয়নি, কাজেই তাঁদের নূতন কথা সৃষ্টি ক'রে বাহবা নেবার সুবিধা ছিল। তখনো সর্বসাধারণের শিক্ষা, অর্থাৎ অশিক্ষা, পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, অতএব তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী ছিল না ; আর যেহেতু নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা অনেক শ্রেয়, তাঁদের অবিচিত্র মন্তব্যপূর্ণ, যুক্তবর্ণে গম্ভীর একঘেয়ে পয়ারগুলিও আমাদের কাছে পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে, ভাবপ্রবণতায় অনবতুল ব'লে লাগত। তখনো মুদ্রাযন্ত্রের অত্যাচার শুরু হয়নি, কাজেই অরসিকদের হাতে প'ড়ে তাঁদের কাব্যের অমর্যাদা হবার সম্ভাবনা ছিল না। যে কাব্য পড়তে জানে তার আবৃত্তিতে মামুলি কবিতাও অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পারে। আর অজ্ঞদের নীরস রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বহু পরিশ্রমে সাধিত বর্তমানের নূতন নৃত্যচপলা ছন্দগুলিও পাগলের প্রলাপের মতো শুনায়। তখনো মানুষের সভ্যতার চরম বিকাশ হয়নি, তখনো মানবচরিত্রের, এতরকম অদ্ভুত রহস্য প্রচারিত বা সৃষ্ট হয়নি ; কাজেই গোটাকয়েক চিরন্তন সত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই সাহিত্য নির্মাণ করা চলত ; নিত্যনূতন মনস্তত্ত্বের সাহায্য নেওয়ার দরকার হ'ত না। পাঠকরা, ঠিক বলতে গেলে শ্রোতারা অল্পেই তুষ্ট হ'য়ে যেত।

কিন্তু আজকাল আর সেই সত্যযুগ নেই। আজ যদি আমি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো *দুর্গেশনন্দিনী* লিখি, তাহ'লে সেখানি তো কেউ পড়বে না-ই, এমন-কি চুরির দায়ে জরিমানাও দিতে হ'তে পারে। কাজেই আজ আমাদের নানা স্থান থেকে অল্প-অল্প পরিমাণে চুরি ক'রে তবে নিজেকে ধনী ব'লে প্রচার করতে হয়, অমন এক দম্‌কা লুণ্ঠন আর লোকের বরদাস্ত হয় না। ভারতীয় মানুষ আর এখন কূপমণ্ডুক হ'য়ে নেই, সে এখন বাইরেকে চিনতে শিখেছে ; বাইরের সঙ্গে তার যে-যোগ চিরদিনই আছে, আজ সেটা বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাই আজ তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে, তার সঙ্গে তার পাশ্চাত্য ভায়ের যে মিল আছে সেটা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠে, আর আমরা লেখকরা চুরির অপবাদে অভিযুক্ত হই ; কিন্তু এটাকে চুরি বলা যায় কী ক'রে? সে-হিসাবে জগতের সকল জাতিই মহাদস্যু, কেন-না আজকাল আর একদম নিজস্ব ব'লে কিছু নেই। ম্যানচেস্টারে যে-কাপড় তৈরি হয় তার তুলো যায় ভারত থেকে, আবার বোম্বায়ে যে-বস্ত্র বোনা হয় তার সুতো আসে ম্যানচেস্টার থেকে, তাই ব'লে কি বোম্বায়ের বণিকদের চোর বলা চলে, না বিলেতি কাপড়কে দেশী ব'লে চালানো যেতে পারে। বর্তমান সমাজনীতির ভিত্তিতে হচ্ছে Exchange, অর্থাৎ অদলবদল, যার যেটা শ্রেষ্ঠ সে সেটাকে বানাবার জন্যে অপরের যেটা মামুলি সেটার সাহায্য নেয়। Oscar Wilde-কে এইরকম পুরনো লেখকদের সম্পত্তি চুরি করার অভিযোগ দেওয়াতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন কারুর বাগানে সুন্দর চতুর্দল কোনো ফুল দেখি, আমার ইচ্ছে হয় তেমনি ফুল আমার বাগানে ফুটাতে ; কিন্তু সে-ফুল যখন আমার যত্নে ফুটে, তখন সেটি আর চতুর্দল থাকে না সেটা হ'য়ে উঠে শতদল, এমনি আমার কৌশল, এমনি আমার ইন্দ্রজাল।' তবু কিন্তু এই পরের ধনে পোদ্দারি করার অপবাদ আর ঘোচে না। আজকাল আমরা প্রাচীনদের থেকে ঢের বেশি গভীর এবং মরমীয়া কথা বলি, কিন্তু শুনি যে সেগুলি হচ্ছে চিরপুরাতন। আরে বাপু মানুষও যে চিরপুরাতন, আমরা তাকে বদ্‌লাই

কী ক'রে? আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র, ব্রহ্মা নই, এটা ভুললে চলবে কেন! হিন্দুরা বলত যে মানুষের পুনর্জন্ম আছে। আমার বিশ্বাস পুনর্জন্ম হচ্ছে এই। আমরা ম'রে যাই কিন্তু এই যে একটু কিছুর সামান্য সূত্রপাত ক'রে দিয়ে গেলুম, সেটা যুগ-যুগান্তরে ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে চলে। পরবর্তী [মানুষ] সেটার যতই উন্নতি করুক তাকে স্বীকার করতে হবে যে তার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন কেউ অতীত লোক।

আগে এ-কথা আমার জানা ছিল না, তাই সমালোচকরূপী পণ্ডিত-মূর্খদের তাড়নায় বিচলিত হ'য়ে পড়তুম। কিন্তু আজকে সে-সমস্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ সমালোচনাগুলি পড়লে হাস্যসংবরণ করা হ'য়ে উঠে অত্যন্ত দুষ্কর। এবারেও কেউ লিখবে "সনাতন হিন্দু ধর্মের, চিরপবিত্রতা, বঙ্গসমাজের বিশুদ্ধতা তো বিদেশীর আগমনে লুপ্তপ্রায়, যেটুকুও-বা বাকি আছে তা-ও এই আচারভ্রষ্ট, হিন্দু-কুলকলঙ্গ, দেশদ্রোহী, প্রাশ্চাত্য সভ্যতার চাটুকার লেখকের কলুষ লেখনীর চালনে গেল ব'লে। আর রক্ষা নাই। থাকত যদি আর্য রাজা তাহ'লে ঈদৃশ পাষণ্ডকে তপ্ত-তৈলের কটাহে নিক্ষেপ করা হ'ত। তবে একান্ত নিরাশ হবার কারণ নাই। কলি প্রায় ভরপুর, এবারে দর্পহারী মধুসূদন নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হবেন। যে-ভারতে গঙ্গা-যমুনা সমস্ত কলঙ্ক মোচন ক'রে বারিধির দিকে ধাবিত হচ্ছেন, সেখানে এই ম্লেচ্ছাচারী দুর্বৃত্তের অত্যাচার কতদিন থাকবে। হিন্দু ধর্মের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে স্বয়ং ভগবান হবেন আবির্ভূত। ভয় নাই, ভয় নাই, নিদ্রিত ভারতের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের সেই অমোঘ আশার আকাশবাণী ধ্বনিত হচ্ছে : 'যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ' ইত্যাদি। কেউ লিখবে, 'ইংরেজি কবি Tennyson ব'লে গেছেন, 'Old order changeth yielding place to new' এই সত্যটা যদি বৃদ্ধেরা সর্বদা স্মরণ রাখেন তাহ'লে, তথাকথিত সাহিত্যের অত্যাচার হ'তে আমরা নিস্তার পেয়ে যাই। কিন্তু বৃদ্ধদের এমনই অহমিকা যে তাঁরা ভাবেন তাঁদের এ-জগতে অধিকার সনাতন। তাঁরা ভাবেন, সাহিত্যসাধনা এতই সহজ যে, ওকালতির কুটিলতার অল্প অবকাশে লিখিত আত্মচরিতও সাহিত্যক্ষেত্রে আসন পেতে পারে। কিন্তু হায় রে অন্ধ, তোমার কাল যে ফুরিয়ে গেছে, এই বাস্তবের যুগে তোমার ওই কল্পনা-রঙীন জীর্ণ প্রেমের তুচ্ছ শুষ্ক কাহিনী কে শুনবে। আমরা খুঁজি সত্যকে, ওই-সমস্ত স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের কীসের সম্বন্ধ? বাস্তবের নিরাবরণ রূপে আমরা ভয় পাই না · আমরা চিনতে চাই আসল মানুষকে। কামনাকে আমরা পূজা করি। *হিতোপদেশ*-এর অন্ধ এখন স্তব্ধ, তোমার ওই নীতিপূর্ণ কথাগুলি আমাদের করুণার মমতার উদ্রেক করে বটে, কিন্তু সেটা তোমার জন্যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বাহাত্তুরে ধরা দুঃখের বিষয়।'

তা তারা যদি বলে বলুক। বলার উপরে আমার আস্থা আর নেই। আমার লেখার যুগ ফুরিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যেটাকে সত্য ব'লে উপলব্ধি করেছি, সেটা চিরকালই সত্য থাকবে। আজ আমার খেয়াল হয়েছে, মর্জি হয়েছে আমি লিখছি। কেউ তা পড়ে ভালোই, না-পড়ে কুছ পরোয়া নেই। সত্যকে অপলাপ মূঢ়ের চিরস্বভাব। এখন আমার তাতে কোনো দুঃখ হবে না। আমায় কেউ বুঝলে না, এই ব'লে গোপনে অশ্রুমোচন করবার বয়স আর

নেই। কেউ কাউকে বুঝবে, এ-আশা আর আমি রাখি না। আমি দেখেছি বোঝার চেয়ে, না-বোঝাই শত শ্রেয়।

কিন্তু চিরদিন এমনতর ছিল না ; একসময় গেছে যখন কথায়, খ্যাতির আশায়, নিন্দার ভয়ে আমি উঠতুম-বসতুম। সেটাও যে বৃথা তা আমি বলছি না। জীবনে সবরকম অভিজ্ঞতাই থাকা দরকার। আর লোকের কথার কাছে আমার ঋণ অনেক। এই কথার বশেই আমি লেখা আরম্ভ করি। আমার পিতার লেখক ব'লে নাম-ডাক ছিল। কাজেই তিনি ভেবেছিলেন যে লেখক হওয়াটাই জীবনের চরমোৎকৃষ্ট। আমি তাঁর পুত্র হ'য়ে অলেখক যে কেমন ক'রে হ'তে পারি তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন না। সেইজন্যেই জ্ঞান হ'য়ে অবধি শুনে আসছি যে আমার মধ্যে কবির প্রায় সমস্ত শক্তিই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে। সভাসমিতিতে এমন সুনাম নিয়ে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু অভিভাবকের মনে যদি এমন একটা ধারণা উদয় হয় তাহ'লে ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে যে জীবনযাত্রা একটু বিসদৃশ হ'য়ে উঠতে পারে, তা নিঃসন্দেহ। প্রদোষে পাঁচটার সময় সূর্যোদয় দেখতে-ওঠা যৌবনের প্রারম্ভে সখের খাতিরে একদিন-দু-দিন চলতে পারে। কিন্তু সাত-আট বৎসর বয়সে নিত্যকর্মস্বরূপ হ'লে প্রীতিকর হয় না, বিশেষত তারপরে যদি ঘুমচোখে সেই দৃশ্যটা বর্ণনা করতে হয় ছড়াতে। অপরাহ্নে সমবয়সীদের সঙ্গ ছেড়ে শ্মশ্রুযুক্ত পিতার সহিত সুদূর নির্জন অরণ্যানিতে ঘুরে-ঘুরে ছড়া বলা এবং কাব্যকথা শোনা শিশুর শরীর বা মনের পক্ষে মঙ্গলকর নয়।

এমন আরো কতদিন চলত বলতে পারি না, কিন্তু আমার শুভাদৃষ্ট, অল্পদিনেই আমার পিতৃবিয়োগ হ'ল। মা আমাকে এক্‌লা রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না, আমায় দিলেন বোর্ডিং স্কুলে। ভাবলুম এইবারে মুক্তি পাব, কিন্তু হায় রে আশা। সেখানেও আমার সুনাম আমায় অনুসরণ করলে। সহপাঠীরা সাধারণত চমৎকার প্রত্নতাত্ত্বিক। তাদের কাছে এর জন্যে কতই নির্যাতন সহেছি। তখন অদৃষ্টকে দোষ দিতুম। আজ মনে হয় এমনতর যদি আরো কিছুদিন সইতে হ'ত, তা হ'লে হয়তো লেখার ব্যাধি চিরদিনের জন্যে সেরে যেত। কিন্তু কথাটা উঠল শিক্ষকদের কানে। আমাদের স্কুলের একটা গর্ব ছিল যে সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ আধুনিক। আমাদের স্কুলের প্রস্‌পেক্‌টাসে বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে লেখা ছিল যে ছাত্রদিগের স্বাভাবিক বৃত্তি, স্বাভাবিক ক্ষমতা, অভিরুচি, ঝোঁকগুলিকে এখানে বাধা দেওয়া হয় না ; বর্তমান বালকের মধ্যে যে ভবিষ্যতের মহাপুরুষ লুপ্ত হ'য়ে আছেন তাঁর আগমনের জন্যে পথ পরিষ্কার [ক'রে] দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু দুরদৃষ্টবশত কর্তৃপক্ষেরা ছাত্রকুলের মধ্যে এখনো কোনো অতিমানবের সন্ধান পাননি। কাজেই আমার অ-সাধারণ খ্যাতি তাঁদের কানে পৌঁছুতেই আমাকেই তাঁরা আঁধার ঘরের শেষ সল্‌তের মতো যত্ন করা আরম্ভ ক'রে দিলেন। পিতৃদত্ত শিক্ষার পুনরারম্ভ হ'ল, আমার সম্বন্ধে হেডমাস্টার সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সহপাঠীদের ঘৃণ্য থেকে পরম মান্য এবং আদর্শ হ'য়ে দাঁড়ালুম। একেই বলে দাস-চিত্তবৃত্তি ! তবে এবারে আমার দুঃখ আরেকটু বাড়ল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশীয় কবিদের দুর্বোধ্য লাইনগুলি মুখস্থ এবং অনুকরণ করবার আদেশ পেলুম। সেগুলো তখন যে ভালো লাগত বলতে পারি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে

বলতে হ'ত যে অতি উপাদেয়। "পিয়োর আর্ট" ইত্যাদি বুক্‌নিও আমার এইসময়ে শেখা। আর কারুর বিয়ে-থা হ'লে তো আর রক্ষা নেই ; তখন আমায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে পাতার পর পাতা বধূমঙ্গল লিখতে বসতে হ'ত।

কিন্তু কেমন ক'রে বলব, সে-সমস্ত মিথ্যা, সেই প্রয়াস নিষ্ফল, অহিতকর। যে-শিক্ষার ফলে বঙ্গগৃহের নিষেধ-শাসনের বোঝা কোমল স্কন্ধ হ'তে নেমে গিয়ে সাহিত্যের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারণের মার্গ উন্মুক্ত হ'য়ে যায়, সে কি বৃথা? কখনোই না। আজকে আমি যে ভ্রমান্ধহীনতা খুঁজে পেয়েছি তার অঙ্কুর রোপিত হয়েছিল সেইদিন আমার মনে। স্বাধীনতাও যে শিক্ষণীয়, কবিতা লেখা যে আয়াসসাধ্য। লোকের একটা কেমন বিশ্বাস যে কবি মায়ের পেট থেকে প'ড়েই কাব্যে কান্না জুড়ে দেয়। একটা পুরানো গল্প মনে পড়ছে। এক [পিতার] নিকটে একটি গণক এসে বলে যে তার সাত পুত্রই প্রভূত অর্থশালী হবে। কৃষক মহা-আনন্দে তার আজীবনের সঞ্চয়ের পুঁজি শেষ ক'রে গণক-বিদায় দিলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে যা-কিছু সহায়-সম্পত্তি ছিল সমস্ত বেচে এমন-কি ভদ্রাসন কুটিরখানি অবধি বন্ধক দিয়ে ছেলেদের রাজার হালে অন্তত তার চোখে রাজকীয় চালে, মানুষ করতে লাগল। গৃহে যতই অভাব বাড়ে সে ভাবে এইবারে বুঝি পুত্রদের মাথায় মোহরবৃষ্টি শুরু হবে। কিন্তু শেষপরে মরবার সময় তাঁর পুরানো মনিবের হাতে-পায়ে ধ'রে সাত ছেলেকে ঠিকে-কৃষাণ ক'রে দিয়ে তবে বৃদ্ধ নিশ্চিন্তে মরল। এই গল্পের নীতিটি হচ্ছে যে মেওয়া শুধু অপেক্ষা-সাপেক্ষ নয়, পরিশ্রমসাধ্য। অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অনেক মাটি খুঁড়ে, মেওয়া গাছ পুঁতে, অনেক রৌদ্র, বৃষ্টি স'য়ে তাতে সজ[ল]সেচন করলে তবে হয়তো মেওয়া পেলেও পাওয়া যেতে পরে। অতএব আজকালকার প্রেরণা-চালিত কবিদের আমি দূর থেকে প্রণাম করি এবং ঈর্ষা করি, কিন্তু তাঁদের শক্তির হদিশ খুঁজে পাই না। আমি যখন ছোটো ছিলেম, তখন এমন-কি নবজাত শিশুকে দু-একদিন চিনির জলে ভেজানো সল্‌তে চোষানো অভ্যাস না-করিয়ে মাতারা স্তন্যদানে সাহসী হতেন না।

অনেক পাতা কালির আঁচড়ে ভরলুম, কিন্তু যে-কথা শুনাবার জন্যে আজ পনেরো বৎসর পরে লেখনী ধরেছি, সেটি এখনো অকথিত। যখন লিখেছি তখন আর কাটলুম না। শুনেছি, ফ্লোবেয়ার নাকি সম্বন্ধবাচক পদের পূর্ণতাসাধন-মানসে তিন সপ্তাহকাল একটি বাক্য নিয়ে পরিমার্জিত করতেন, কিন্তু আমার ততটা অধ্যবসায় নেই, বা ততটা সৌন্দর্যবোধ নেই, বা হাতে অত সময়ও নেই। আর আমার শিক্ষার একটা দোষ হ'য়ে গেছে বাল্যে যখন রচনা করতে শিখি, তখন তার শোধন ছিল শিক্ষকদের হাতে। কাজেই পরে নিঃসহায়ভাবে লিখে, সেটা যে বিশেষ ঘষা-মাজা দরকার তা আমি ভুলে গেছলুম, এবং তার ফলে আমার বইয়ের কাট্‌তিও কিছু কম হয়নি। আজ যদি পাঠকরা আমার বাচালতায় অস্থির হ'য়ে উঠেন, তার জন্যে আমি দায়ী নই, দায়িত্ব তাঁদের। তাঁরা যখন নব্য লেখকদের সমাজ-সংশোধন, নারী-বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা পড়তে দুঃখিত হন না, বরং বাহবা দেন, তখন আমার বয়স-সিদ্ধ বাক্য-বহুলতা যে কেন ... [।]

[অসম্পূর্ণ]

[নামহীন গল্প ৬]

[দ্র. এই বইয়ের পৃ ২০৮, প ৩২ থেকে পৃ ২০৯, প ২৮ অংশের ভিন্নতর পাঠ]

এমনিভাবে কতদিন কাটল বলা শক্ত ; তরুণের কালসংজ্ঞা হারিয়ে গিয়েছিল, মুহূর্ত ও শতাব্দীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সে তখন সম্পূর্ণ অপারগ। কিন্তু তারও চমক একদিন ভাঙল, সে বিস্ফারিতচক্ষে চেয়ে দেখলে তারই বোন মণিকা কৈশোরের শেষ পইঠেতে পা দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল যে তার নিজের বয়সও কুড়ির কোঠায় আট্‌কে নেই। সময়ের অলক্ষ্য গতি বি.এ., এম.এ. ও আইনপরীক্ষার মুসাফিরখানাগুলো ছাড়িয়ে তাকে নিয়ে এসেছে একটা দিশাহারা মরুর মাঝখানে, যেথায় দাঁড়িয়ে দিক্‌-নির্ণয়ের চেষ্টা একান্ত ধৃষ্টতা ; যার মধ্যে অঘটন-সঙ্ঘটনের আশাপথ চেয়ে থাকাই শেষরক্ষার একমাত্র উপায়। সে অতীতের পানে পিছন ফিরে তাকালে, মনে হ'ল সমস্তই যেন তার জাতীয় স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ, অনিজক ঐতিহ্যের একটা অধ্যায়। সে-উমেশদা, সে-তরুশ, মনে হ'ল তারা যেন প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের অসংস্কৃত কল্পনা, যাদের বৈকল্যবার্তা ততটা শোকাবহ নয়, যতটা পরিহসনীয়। অমনি তার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, চোখের একটা পরদা খুলে গেল, সে দেখলে যে তার নির্ভার অনাড়ম্বর জীবনের আধারবিন্দু হবার পক্ষে মণিকার যোগ্যতা অপ্রচুর নয়। মুহূর্তের জন্যে তার সন্দেহ হয়েছিল, প্রতিবাদ ক'রে বুদ্ধি বলেছিল, মণিকাও আরেকটি মরীচিকা ; তাকে অনুসরণ করলে আবার সঙ্কটে পড়তে হবে, তৃষ্ণা বাড়বে কিন্তু গন্তব্য কাছে আসবে না। এ-ধারণাটাকে সে বদ্ধমূল হবার অবকাশ দিল না, চকিতদৃষ্টিতে বোনের দিকে চাইলে এবং আশ্বস্ত হ'ল। তার অস্তিত্ব তর্কের অতীত ; ওই যে সে সামনে ব'সে প্রথম লজ্জার দুর্দান্ত ঝলক প্রাণপণ যত্নে ঢাকতে চেষ্টা করছে।

ভগ্নীর বিদ্যমানতা গত কয়েক বছরের মধ্যে তরুণের অত গা-সওয়া না-হ'য়ে উঠলে, এই পুনর্জীবনের পালাটা সেদিনে ঘটত কি-না সন্দেহ। সে ভুলে গিয়েছিল যে মণিকা একটি বৃদ্ধিশীল জীব ; মণিকার সঙ্গে তার পিতৃগৃহের অস্থাবর সম্পত্তিগুলোর কোনো পার্থক্য আছে, এ-কথা তার মনেই ছিল না। সে-বাড়ির অন্যান্য সামগ্রীর মতো সে-ও যে নিত্যকার নির্বিকার, সুপরিমার্জিত, তারও সংস্থান একটা বিশেষ ঘরের গণ্ডির মধ্যে, যে-ঘরের নাম বাংলায় অনুবাদ করতে হ'লে ধাত্রীশালার মতো একটা অশ্রাব্য শব্দ বানাতে হবে। অবশ্য এ-ঘরের অন্যান্য আসবাবের চেয়ে সে-ই মহার্ঘ, অতএব দ্রষ্টব্য এবং উপভোগ্য। সে ছিল একটা বহুমূল্য পুতুলের মতো, যাকে নিয়ে সন্তর্পণে খেলা ক'রে তরুণের অনেক অলস বেলা

আমোদে কেটে গেছে। কাজেই সেই খেলার পুতুলকে হঠাৎ একদিন জীবন্ত যুবতীর মতো আচরণ করতে দেখে তরুণের মন বিস্ময়ের ধাক্কায় জেগে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

সেদিন পড়তে-পড়তে তরুণের বোধশক্তি হঠাৎ আট্‌কে গিয়েছিল ; শত চেষ্টাতেও বিনা-সাহায্যে মানে ঠিক করতে না-পেরে, সে নিজের পুঁথিপত্র সমস্ত হাঁটকালে, কিন্তু কোথাও কিনারা পেলে না। অগত্যা তাকে বাপের লাইব্রেরির শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। মাইটর-সাহেবের লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘরে। সেখানে জন-সমাগম অল্প হ'লেও, বইয়ের রাশি ছিল অফুরন্ত, ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে শুরু ক'রে গ্রীক ট্র্যাজিডি পর্যন্ত। তবে তাদের অধিকাংশই অক্ষতপৃষ্ঠা, কেউ কখনো মাইটর-সাহেবকে খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কিছু পড়তে দেখেনি, কিন্তু তাহ'লেও বই না-কিনে তাঁর উপায় ছিল না। লাইব্রেরিহীন দেশনায়কের কথা কে কবে শুনেছে? কাজেই তাঁর গ্রন্থসঞ্চয় বেড়ে উঠেছিল বইওলাদের ফিকিরে। যত বই দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য এবং অপণ্য সে-সমস্তই অবশেষে চড়ত মাইটর-সাহেবের স্কন্ধে। এমন মানচিত্রহীন অবিস্মরণীয় ক্ষেত্রেই তরুণের মন সাধারণত ছাড়া পেত, কিন্তু পিতার লাইব্রেরি-কামরায় সে পারতপক্ষে কখনো প্রবেশ করত না। ছেলেবেলার অন্ধকূপের পর্বগুলো এইখানেই অভিনীত হয়েছিল ; শৈশবের ভয়ার্ত বিতৃষ্ণা সে যৌবনেও জয় করতে পারেনি।

সেদিন সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলে, তার অন্তর্জ্ঞানের হয়তো আশঙ্কা ছিল যে অনাবশ্যক শব্দে শৈশবের প্রেতসঞ্চরিত বিভীষিকা আবার জেগে উঠবে। কাজেই আলমারি খুলতে-খুলতে একটা আচম্‌কা আর্তনাদ যখন তার কানে পৌঁছল, তখন তার স্পন্দিত হৃদয়ে অলৌকিক বিপদের কথাটাই আগে এসেছিল। কিন্তু তার ত্রস্ত দৃষ্টি মণিকার উপরে থেমে যেতে সে একটা অভাবনীয় স্বস্তি অনুভব করলে, প্রথমটা তার মনেই পড়ল না সেই লাইব্রেরি-কামরায় মণিকার মধ্যাহ্নে আবির্ভাব একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। সে খুব বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী রে মণিকা, তুইও-যে এখানে!'

কিন্তু মণিকা তার কথার জবাব না-দিয়ে একখানা হস্তচ্যুত বই কুড়ুতে যত্নবতী হ'ল। পুঁথিখানা ছিট্‌কে পড়েছিল ঠিক তার নাগালের বাইরে ; ফলে তরুণ সলম্ফে সেখানাকে সংগ্রহ ক'রে, বোনের হাতে দিতে গিয়ে লক্ষ করলে বইখানা একজন অনামধেয় প্রকাশকের অধ্যবসায়ে প্যারিসে ছাপা, হল্‌দে কাগজের মলাটের উপরে লাল অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা *কাসানোভার প্রণয়জীবন* এবং তার তলায় একটি চিত্রার্পিত স্তনিতম্ববহুল রমণী একজন বিবস্ত্র পুরুষের সামনে আকর্ষিত অন্তরীয়ের ছিন্নাংশ দিয়ে লজ্জানিবারণের চেষ্টা করছে।

'এখানা আবার কোথা থেকে পেলি?' বিরক্তির স্বরে এই প্রশ্ন ক'রে তরুণ বইটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজর পড়ল মণিকার মুখে। তার চম্পককান্তি গলিত-কাঞ্চনের মতো দুঃসহ উত্তাপে লোহিত হ'য়ে উঠেছে, তার মাথা জ্ঞান-কৃত অপরাধের ভারে বিনত. তার সমস্ত শরীরের নিবদ্ধ অক্ষমতা যেন শাসনের প্রতীক্ষায় নিশ্চল হ'য়ে আছে। নিমেষের মধ্যে আকস্মিক করুণার প্লাবন তরুণের চিত্তমরুকে সবুজ ক'রে দিলে, অনুকম্পার

প্রদোষালোকে সে আব্‌ছার মতো দেখতে পেলে যে তারই বোন মণিকার উদ্‌ভিন্ন দেহ মৃত্যুঞ্জয় জীবনের প্রাক্তন আবেগে আচঞ্চল। অমনি কোন্‌ অতীতের পরপার থেকে তার মনের কূলে ভেসে এল তার নিজের যৌন জাগরণের স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো নিঃশোক বিষাদে উতলা।

—